মধুমাধবী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

সৃষ্টির চালচিত্র

রোমি সাহা আমার কন্যাপ্রতিম। বিভিন্ন সময় সে আমার কাছ থেকে আমারই অজান্তে সংগ্রহ করেছে এই উপন্যাসগুলির পটকথা। তার এই আন্তরিক আগ্রহের সঞ্চয়গুলি লেখককে পাঠকের আসনে বসিয়ে সৃষ্টির চালচিত্র দেখার অবকাশ করে দিল।

আঁধার পেরিয়ে

'পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি
আস্তে একটু চলনা ঠাকুরঝি।
ওমা এ যে ঝরা বকুল!-নয়?
তাই তো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল মধু মদির বাসে—
আকাশ পাতাল—কতই মনে হয়!.'

স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা অন্ধ এক বধূর মর্মবেদনা নিয়ে লেখা যতীন্দ্রমোহন বাগচীর এই কবিতাটি একসময় আমার কিশোর-চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঝরাবকুলের করুণ সুবাসে অন্ধবধূর হৃদয় বেদনার গন্ধ পেয়েছিলাম। 'আঁধার পেরিয়ে' উপন্যাসটির বীজ সেদিনই রোপিত হয়েছিল আমার অন্তরে।

যৌবনে ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে। অধ্যাপনার বৃত্তি নিয়েছিলাম, তাই গ্রীষ্ম কিংবা পুজোয় একটানা বেশ কয়েকটা দিন ছুটির সুযোগ পেয়ে যেতাম।

অমনি 'বলাকা'র কয়েকছত্র কবিতা আমার মনটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেত নতুন দিগন্তের দিকে

'শুধু ধাও, শুধু ধাও নাহি ফিরে চাও
উদ্দাম উধাও,
যা কিছু তোমার দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।'

এমনি এক ভ্রমণের দিনে সিমলা থেকে দূরপাল্লার বাসে যাবার সময় আমার পরিচয় হয় একটি পরিবারের সঙ্গে। স্বামী স্ত্রী আর ভদ্রলোকের তরুণী শ্যালিকা। তাঁরা চলেছিলেন কুলুর দশেরা উৎসব দর্শনে। বধূটি সুন্দরী, তাঁর চোখে ছিল মেঘছায়া রঙের একটি গগলস্।

অল্প সময়ের ভেতরেই বুঝতে পারলাম, বধূটি অন্ধ। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে তাঁর সপ্রতিভ আচরণ আমাকে বিস্মিত করল।

তাঁর পাশেই বসেছিল কৌতুকময়ী তরুণী বোনটি। সে তার জামাইবাবুর সঙ্গে ছোট ছোট রঙ্গ কৌতুক করছিল। ঠোঁটের হাসি আর মুখের রেখায় বোঝা যাচ্ছিল অন্ধবধূটি তাঁর স্বামী আর বোনের রঙ্গরসিকতা উপভোগ করছেন।

কিন্তু একটি বিষয় আমার লক্ষ্য এড়ালনা। বধূটি পাশে রাখা ব্যাগ খুলে খাবার বের করে নিজেই সবাইকে পরিবেশন করলেন। জলের বোতল পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ছুরিতে ফল কাটলেন নিজেই। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর বারণ আছে।

তাঁর স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করে জেনেছিলাম, বধূটি জন্মান্ধ নয়। বিশেষ কোন অসুখে তাঁর দুটো চোখের দৃষ্টিই ধীরে ধীরে নিভে গেছে। এখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ।

আশ্চর্য! এ অবস্থায় কোনও রকমের অসহায়ত্ব বোধ তাঁর নেই।

আমি ভদ্রলোককে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওঁকে নিয়ে দশেরা উৎসব দেখতে চলেছেন, উনি নিজের চোখে না দেখে কি উপভোগ করতে পারবেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমিও ওকে একটু ভিন্নভাবে এই প্রশ্নই করেছিলাম। ও কি উত্তর দিয়েছিল জানেন?

আমি চোখেমুখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে তাকাতেই উনি বললেন, মিসেস আমাকে বলেছিলেন, কেন, আমি তোমার চোখ দিয়েই দেখব।

এরপর আর কোন কথা চলে না, তাই সঙ্গে নিয়ে চলেছি। ঘরসংসারের প্রায় সব কাজই ও একা হাতে সারে। কাউকে কাজের ভেতর নাক গলাতে দেয় না। এই অন্ধত্বের জন্য আমি ওকে কোনদিন আক্ষেপ করতে শুনিনি। ওর একটিও দীর্ঘশ্বাস কখনো আমার কানে এসে পৌঁছয়নি। তাই ওকে নিয়ে কোন দুঃখই নেই আমার।

কুলু ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই আমি 'আঁধার পেরিয়ে' উপন্যাসটি লিখি। অন্ধকার পেরিয়ে একটি মেয়ে কিভাবে আলোর জগতের স্পর্শ পেতে চেয়েছিল সে কথাই আমি জানাতে চেয়েছি উপন্যাসে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ মশায় আমার চেয়েও জোরালভাবে তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মাধবী দেবীকে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

কিন্তু আর একটি ক্ষেত্রে আমি আশাহত হয়েছিলাম। স্বাতি আর শান্তনুর ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে। সেখানেও ছিল 'আঁধার পেরিয়ে' যাবার অন্য এক তাৎপর্য।

মানালী থেকে রোটাং যাত্রার ধকল সইতে পারবেনা বলে কাজল থেকে গেল হোটেলে। পথে পাওয়া বান্ধবী স্বাতিকে নিয়ে শান্তনু গেল রোটাং পাসে। শান্তনু অন্ধ স্ত্রীকে একা হোটেলে ফেলে রেখে যেতে চায়নি, কিন্তু কাজলই তাকে উৎসাহ দিয়ে রোটাং-এ পাঠিয়েছে।

ফটোগ্রাফার শান্তনু রোটাং-এর ছবি তুলেছে স্বাতিকে সামনে রেখে। দারুণ ফটো জিনিক ফেস তার। হাসিখুশিতে ভরা মেয়েটি যেন একটি উচ্ছল পাহাড়ি ঝর্ণা।

ফেরার পথে শুরু হল বিপর্যয়। সন্ধ্যা নামল, সহসা ছুটে এলো পাহাড়ি ঝড়। লণ্ডভণ্ড করে দিল চরাচর। বিশাল একটা গাছ ভেঙে পড়ে অবরুদ্ধ করেছে পথ। গাছ না সরালে গাড়ি আর এগোবে না। পরদিন প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাত্রীদের।

ঝড় থামল। চাঁদের আলোয় প্লাবিত হল পথ প্রান্তর। পেছনে ফেলে আসা পাহাড়ি বস্তির দিকে যাত্রীরা ছুটে গেল রাতের আশ্রয়ের জন্য। কেবল থেকে গেল দুজন, স্বাতি আর শান্তনু। তাদের মানালী ফিরতেই হবে, একা ফেলে রেখে এসেছে অন্ধ কাজলকে। কিছুদূরে পাহাড়ের প্রান্তে দেখা যাচ্ছে আলোর ঝিকিমিকি। মানালীর নৈশ-দীপাবলী।

ওরা কোনরকমে গাছটা পেরিয়ে ওপারের পথে গিয়ে উঠল। কিন্তু বিপর্যয় এলো অন্যদিক দিয়ে। প্রবল পাহাড়ি শীতের একটা শানিত তলোয়ার যেন অমূল বিদ্ধ হয়ে গেল স্বাতির শরীরে। সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তার কাঁপুনি আর থামে না। পথের ধারে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা চালা। টুকিটাকি বিক্রির ছোটখাট একটা দোকান ঘরের মত। স্বাতিকে জড়িয়ে ধরে সেদিকে নিয়ে গেল শান্তনু।

দোকানি সাঁঝের আগেই তালাবন্ধ করে চলে গেছে তার পাহাড়ি বস্তিতে। ওরা দেখল এক চিলতে দাওয়ায় একটা খাটিয়া পড়ে আছে। শান্তনু তারই ওপর শুইয়ে দিল স্বাতিকে। সে তার গরম পোশাক সহ বুকের মধ্যে চেপে ধরল তাকে।

একটি বলিষ্ঠ যুবকের বাহুবন্ধনে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল তরুণী স্বাতির দেহমনে।

কামনার একটা কালো অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছিল। হঠাৎ স্বাতি সব কিছু দুহাতে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শান্তনুদা, চারদিকে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

ওরা মানালীর পথে হাত ধরাধরি করে দ্রুত চলতে লাগল।

আমি এ অংশটিতে বলতে চেয়েছি, একটি বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানুষ কামনার অন্ধকারে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তার ভেতর শুভ শক্তি জাগ্রত হলে সে 'আঁধার পেরিয়ে' উত্তীর্ণ হয়ে যায় আলোর জগতে।

চলচ্চিত্রের রোটাং-পরিভ্রমণ পর্বে কামনার ইঙ্গিতপূর্ণ অন্ধকার জগত থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি।

মণিমুকুট

কলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রথম বর্ষের একটি ছাত্রীর চিঠি পেলাম।

প্রিয় লেখক,

আপনার লেখা 'মণিমুকুট' পড়ে আমার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। এ অশ্রু আনন্দের কী দুঃখের তা আমি জানি না।

যে গরীব সৎ ছেলেটি মিথ্যে চুরির অপবাদ নিয়ে একদিন গ্রাম ছেড়েছিল, সে আসলে ছিল একজন জাত-শিল্পী। মাকড়সার জালের ওপর যখন শিশিরবিন্দুগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করত সে তখন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত সেদিকে। তার মনে হত ওগুলো শিশিরবিন্দু নয়, হীরে মুক্তো মাণিক দিয়ে গাঁথা অপূর্ব এক মণিহার।

জীবনে এক সময় তার শিল্পপ্রতিভা সোনার অলঙ্কাব রচনার কাজে লেগেছিল। কলকাতার নামী এক জুয়েলারি হাউসের তিনি ছিলেন নামকরা এক গরিৎকার। কত বিয়ের কনে যে তাঁর হাতের তৈরি অলঙ্কারে সেজেছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু এই অতি সৎ মানুষটির কী দুর্ভাগ্য! মা মরা একমাত্র মেয়েকে একটুকরো সোনায় কখনও সাজাতে পারেননি তিনি।

পিতৃভক্ত কন্যাটি গরীব কিন্তু আত্মসম্মান বোধ আছে তার। সবে কলেজে ঢুকেছে, একটুকরো আভরণ নেই গায়ে তবু তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটি ঢাকা পড়েনি।

প্রিয় লেখক, আপনার লেখাগুলিই আমি আর একবার মনে মনে স্মরণ করছি। আপনার সেই 'মিস ক্যালকাটা' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ছবিটুকু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। উপন্যাসের ওই অংশটি আমার সব থেকে ভালো লেগেছে।

জুয়েলারি হাউসের মালিকের নির্দেশে গরিৎকার তৈরি করেছেন একটি অপূর্ব মুকুট। বিজয়িনীর মাথায় সেই দুর্লভ মুকুটটি শোভা পাবে। এতে হবে প্রতিষ্ঠানের বিরাট পাবলিসিটি।

রাতে স্বপ্ন দেখছে গরিৎকারের সেই গরীব মেয়েটি,—সে যোগ দিয়েছে সেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। মঞ্চের ওপর দিয়ে অন্যান্য প্রতিযোগিদের সঙ্গে তাকে কয়েকবার হেঁটে যেতে হল। হলভরা দর্শকেরা করতালি দিচ্ছে তাদের দেখে।

একসময় বিচারকেরা ঘোষণা করল শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর নাম। আশ্চর্য! তারই নাম ধরে ডাকছে ঘোষক।

হলভর্তি লোকের উল্লাস আর ঘন ঘন করতালির ভেতর সে এসে দাঁড়াল মঞ্চে। তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল তারই বাবার তৈরি সেই অমূল্য অপূর্ব মুকুটটি।

সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল তার বাবাকে। মুকুটটি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন বলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি।

সাদামাটা পোশাকে, অতি সঙ্কুচিত হয়ে তিনি বসেছিলেন পেছনদিকের দর্শক আসনের এক কোণে।

সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার বাবার চোখে চিকচিক করছে জল, অমনি তার চোখও শুকনো রইল না। অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দু'চোখের কোল বেয়ে।

প্রিয় লেখক এ পর্যন্ত পড়ে আমার চোখও জলে ভরে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, আমিই সেই দরিদ্র অভিমানী মেয়েটি যে সবাইকে হারিয়ে মুকুট জিতে নিয়েছে।

আপনার এই উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে পাঠক যে নিজেকে একেবারে একাত্ম করে নেবে, অন্তত আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্যটুকু আমি বলতে পারি।

আমার প্রণাম নেবেন।

নিবেদিতা।

এই লেখাটি সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল।

শারদীয় পত্রিকাটি সঙ্গে নিয়ে আমি সে বছর কাশ্মীর চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে একটা বেশ বড় আকারের মিষ্টির প্যাকেট রেখে গেছেন। আমার বাড়ির কেয়ারটেকার মেয়েটি ওই মিষ্টি-গুলির স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে কিন্তু দাতার নামটি স্মরণ রাখেনি। বলা বাহুল্য, আমি আকাশ-পাতাল টুঁড়েও ওই মিষ্টি-দাতাটিকে আবিষ্কার করতে পারলাম না।

বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ 'নবকল্লোল' অফিসে গিয়ে সেই দাতাটির পরিচয় আবিষ্কার করলাম। তিনি নবকল্লোল অফিস থেকে ঠিকানাটি সংগ্রহ করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। মানুষটি আর কেউ নন, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী 'যাদব'-এর অন্যতম কর্মকর্তা।

কৌতূহলী হয়ে একদিন আমি তাঁদের দক্ষিণ-কলকাতার দোকানে দেখা করতে গেলাম।

ভদ্রলোক আমার নাম শোনামাত্রই আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তিনিই আমার বড়িতে মিষ্টির বাক্স পৌঁছে দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

কারণটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা গেল।

আমাদের এই দক্ষিণ কলকাতার দোকানে প্রতিদিন নানা ধরনের সন্দেশ আসে। এক একটা আইটেম একশো, দেড়শো পিস করে। হঠাৎ দেখলাম, একটা বিশেষ সন্দেশের চাহিদা বেড়ে গেল। দিনে প্রায় চার পাঁচশো পিস করে বিক্রি হতে লাগল। এমনটা চলেছিল প্রায় তিন চার মাস ধরে। ক্রেতা কারা জানেন?

বললাম, কি করে জানব বলুন।

স্কুল কলেজের টিন-এজার ছেলেমেয়েরা।

আশ্চর্য! কেবল ওদেরই ভেতর এই বিশেষ সন্দেশটি কেনার হিড়িক পড়ল কেন?

ভদ্রলোক বললেন, একদিন আমি একজোড়া তরুণ তরুণীকে এই বিশেষ ধরনের সন্দেশটি কেনার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তরুণটি বলল, এবারের শারদীয় নবকল্লোল পত্রিকাটি পড়েননি? ওর ভেতর মণিমুকুট উপন্যাসটি পড়ে নেবেন, উত্তর পেয়ে যাবেন।

মেয়েটির মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল।

ওরা মিষ্টি কিনে নিয়ে চলে যাবার পর হেঁয়ালির রহস্য ভেদের জন্য এক কপি শারদীয় নবকল্লোল কিনে আনলাম। তারপর আপনার লেখা 'মণিমুকুট' উপন্যাসটি পড়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে রহস্যের সামাধান হয়ে গেল।

আমার তখন সবকিছু মনে পড়ে গেছে। আমি বললাম, আপনাদের তৈরি 'আবার খাব' সন্দেশের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল তো?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিক তাই।

উপন্যাসের ঘটনাটি দুচার কথায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার জের যে এতদূর গড়াবে তা আমি ভাবতে পারিনি।

কাহিনীর সেই দরিদ্র মণিকার বিপ্রদাসবাবুর মেয়ে দেয়ার সঙ্গে একটি বইয়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল অবস্থাপন্ন বাড়ির সুভদ্র এক তরুণের। ধীরে ধীরে তাদের ভেতর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সেই সূত্রে একদিন ওরা বকখালি বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা নেয়। তরুণ ইন্দ্র গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তার পাশে বসে দেয়া।

এবার কাহিনীর পাতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তুলে ধরা যাক্।

একসময় দেয়া চঞ্চল হয়ে উঠল, কিছু খেলে হয় না?

ইন্দ্র বলল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসার সময় খাবার কেনার কথা মনে নেই।

দেয়া বলল, খুব হয়েছে, আর খাবার তদারকি করতে হবে না।

ব্যাগ থেকে একটি একটি করে সে বের করল জলের বোতল, দুটো প্লাস্টিকের প্লেট আর এক প্যাকেট খাবার।

ইন্দ্র হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ দারুণ। জাত-মহিলার সব রকমের গুণ রয়েছে আপনার ভেতর।

দেয়া জলের বোতলখানা ইন্দ্রের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চুপ, কথা না বলে চটপট হাত ধুয়ে নিন। তা বলে হাত ধুতেই সব জলটুকু শেষ করবেন না যেন।

ইন্দ্র বলল, এই দেখুন, পুরুত মশাইয়ের মত কোশা থেকে দু ফোঁটা জল তুলে হাতে মাখিয়ে নিলাম।

দেয়া হেসে ইন্দ্রের হাতে প্লাস্টিকের প্লেটখানা ধরিয়ে দিয়ে বলল, সামান্য একটুখানি খাবার। মুখে ফেলতে না ফেলতেই মিলিয়ে যাবে।

কয়েকখানা মাছের ডিমের বড়া আর আলুভাজা সহ দুটো পরটা ইন্দ্রের প্লেটে দিয়ে দেয়া বলল, হাত চালান, আরও আছে দেব।

ইন্দ্র বাঁ হাতে প্লেটখানা ধরে ডান হাত মুঠো করে ওপরে তুলে বলল, একসঙ্গে খাব, আগে আপনার প্লেটে তুলুন দেখি।

সত্যি আমার জন্য রেখেছি।

কই প্লেটে তুলুন দেখি।

দেয়া নিজের প্লেটে খাবার তুলল।

ইন্দ্র একটা মাছের ডিমের বড়া মুখে তুলতে গিয়ে বলল, এবার খাব।

দেয়া অমনি বলল, আমার কাছে এমন জিনিস আছে যা পেলে আপনি আবার খেতে চাইবেন।

সে কি? বলুন না কি জিনিস?

হাতটা মুছে একটা মিষ্টি কৌটো থেকে তুলে নিয়ে ইন্দ্রের প্লেটে দিয়ে দিল দেয়া।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিটা মুখে পুরে স্বাদ নিতে নিতে বলল, দারুণ মিষ্টি তো এটা।

বলেছি তো আবার খেতে চাইবেন। ওটা যাদবের দোকান থেকে এনেছি। 'আবার খাব' সন্দেশ।

আবার খেতে চাইলে দিতে পারবেন?

এখুনি।

নিজের ভাগেরটি তো?

এত খোঁজে আপনার দরকার কি। যা দিই লক্ষ্মীছেলের মত খেয়ে নিন।

নিজের মিষ্টিটা তুলে নিয়ে দিয়ে দিল ইন্দ্রের প্লেটে।

আপনার কই? দেখান।

আপনি খান তো।

সত্যি আর নেই? আমি তাহলে খাবওনা, এঁটো প্লেট থেকে তুলেও দেব না। বটগাছের ডালে যে দুটো শালিক বসে আছে, ওদের জন্যে রেখে দিয়ে যাব।

দেয়া অমনি ইন্দ্রের প্লেট থেকে মিষ্টির আধখানা ভেঙে নিয়ে বলল, শালিককে বিলোবার জন্যেই তো কষ্ট করে মিষ্টিটা বয়ে এনেছি। নিন খান। আধাআধি ভাগ করে নিলাম।

এই অংশটুকু পড়েই নবীন বসন্তের ছোঁয়ালাগা টিন-এজাররা যাদবের 'আবার খাব' মিষ্টির জন্যে ভিড় জমিয়েছিল।

আমিও তাদের এই মাতামাতির সুবাদে এক বাক্স মিষ্টি পেয়েছিলাম, যদিও তা আমার ভোগে লাগেনি।

নির্জনে খেলা ● নির্ঝরের গান ● তিন্‌নির রোদ আর বৃষ্টি

হিমালয়ের কান্তিময়ী কন্যাদের ভেতর কুলু অন্যতমা। কাশ্মীর, কিন্নর, কুলু, কাংড়া, এই চার রূপবতী কন্যা পিতৃগৃহ আলো করে মত্ত হয়ে আছে আনন্দ-লীলায়। আমি আমার প্রথম যৌবনে নবীন সওদাগরের মত হাজির হয়েছিলাম ঐ নন্দনলোকের দ্বারে শুধুমাত্র চোখের কৌতূহল মেটাব বলে। কিন্তু ওদেব দর্শনমাত্রেই আমি এক অদৃশ্য যাদুর সুতোয় জড়িয়ে পড়লাম। বার বার ফিরে এসেছি আমার কর্মস্থানে, কিন্তু কাজের মাঝেই টান পড়েছে সেই সম্মোহনী সুতোয়। অমনি প্রেমিকার দুর্নিবার আকর্ষণের মত ছুটে গেছি তাদের মাঝখানে। সেদিনগুলো ছিল আমার চোখের-উৎসব আর মনের উত্তেজনায় ভরা। ধীরে ধীরে প্রেমিকা একদিন প্রেয়সী হল। সে খুলে দিল আমার প্রেরণার উৎস-মুখ। আমি অনেকগুলি উপন্যাস লিখলাম ঐ আশ্চর্য রূপের জগতগুলিকে স্মরণ করে। কন্যা-কাশ্মীর, কিন্নরী, কালের রাখাল, নির্জন নির্ঝর উপন্যাস চারখানি এই চার কন্যার কথাতেই ভরা।

নির্জন নির্ঝর উপন্যাসটিতে আমি নববধূর মত সলজ্জ কান্তিময়ী কুলুর অবগুণ্ঠন উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছি।

ঋতু-আবর্তনে কুলুর প্রসাধন-লীলা আমি দেখেছি দুচোখ ভরে। বাক্যহারা বিস্ময়ে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি পাহাড়ী পথে চীর-পাইন বনের আলোছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো ক্লান্ত হলে বসে পড়েছি পাহাড়ী ছইয়ের (ঝর্ণা) ধারে। নুড়িতে নাড়া দিয়ে এক সুখকর শব্দের সৃষ্টি করে নিচের দিকে নেমে চলেছে সে জলধারা। সামনে বিস্তৃত মানালীর উপত্যকা। ওপারে পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যের সংসার। ঠিক তার পরেই পীরপাঞ্জালের শুভ্র শৈল-শিখর। একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে উপবীতের মত। বসন্ত উৎসবের আনন্দ কলরব কানে এসে বাজছে। আপেলের ডাল সাদা আর পিঙ্ক কুসুম স্তবকে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে সুসজ্জিত বন-কন্যারা শাখাবাহু মেলে অচেনা পথচারীদের ডাকছে উৎসবের আনন্দে যোগ দিতে।

তউন্দি বা গরমকালে ছোট ছোট ফিকে সবুজ পেয়ারার মত ফল ধরে আপেলের ডালে। বইতে থাকে গরম হাওয়া। সে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় মিহি পাহাড়ী ধুলো। মধ্যদিনে মনে হয় পাতলা একটা কাপড়ের পর্দা চোখের সামনে দুলছে। পর্দার ওপারের ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি অবধি গদ্দী পহালরা ভেড়ার পাল নিয়ে ভ্যালি ছেড়ে ওপরের পাহাড়ে উঠতে থাকে।

সে এক সুদৃশ্য সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। কোন কোন পালে পাঁচ সাতশো ভেড়া বক্‌রী দেখা যায়। লোমওয়ালা কুকুরগুলো ছুটে ছুটে ঘ্যাকঘোঁগ করে লাইনগুলো সিধে রাখে। ওরা জোৎ (পাস) পেরিয়ে নতুন নতুন বুগিয়ালের (চারণভূমি) সন্ধানে চলতে থাকে।

গদ্দী মেষচারকদের পোশাক ভারী মজার। ঘাড় থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঢাকা একটি চোল। পায়ে নাগরা। মাথায় কুলুর কাজ করা সাদা টোপি। আর বক্‌রীর লোমে তৈরী একটা কালো লম্বা ডোর (দড়ি) পাকে পাকে কোমরে জড়ানো। ঐ ডোর থেকে পয়সা রাখার বজ্‌লু (থলে) আর একটা কুলহারা (কুঠার) ঝুলছে। গরম আর বর্ষা কালটা বৃষ্টিবিহীন বরফ ছাওয়া পর্বতের কোলে কাটিয়ে ওরা আবার

নামতে থাকবে শরতের শুরু থেকে ভ্যালির দিকে।

প্রচলিত প্রবাদে আছে, গদ্দানরা (গদ্দী রমণী) আরাধ্যদেবতা শিবকে ধূপ দিয়েছিল তাই খুশি হয়ে শিব তাদের দিলেন রূপ। গদ্দানদের চোখের দৃষ্টিতে নাকি ভানুমতীর খেলা আছে। তাই বিজ্ঞ মানুষরা সেদিকে তাকাতে বারণ করেন।

আমি কিন্তু বিভিন্ন গদ্দী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেছি। তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। আমি তাদের যাযাবর সংসারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে আতিথ্য পেয়েছি তা ভোলার নয়। শিবের বরে গদ্দানরা যথার্থই রূপবতী হয়েছে। তাদের মুখের হাসি, চোখের অভিব্যক্তি সুন্দর কিন্তু চাহনিতে কোথাও কুহক-মায়ার ছায়া দেখিনি।

যারা ভুট্টা ক্ষেতে, ধান গমের ক্ষেতে কাজ করছে সে সব মেয়েরা ভারী হাসি-খুশি আর রসিকা। যারা গান গাইছে আর ধান রুইছে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোন যুবক যদি হেসে তাকায় অথবা কিছু মন্তব্য করে তাহলে ঐ মেয়ের দল খিলখিল করে হাসি ছড়াবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেবে তার পোশাক। বেচারী তখন পড়ি কি মরি করে পালাতে পথ পাবে না। ও যত ছুটবে, সারা মাঠের মেয়েরা কাজ ফেলে ওর চলার পথে জলতরঙ্গের মত হাসি ছড়াতে থাকবে।

যেসব মেয়েরা ভোরবেলা বনে কাঠ কুড়োতে যায় অথবা আপেল বাগানে আপেল তুলে ঝুড়ি ভর্তি করে তাদের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, ভোরের সোনালী সূর্যের জলে স্নান সেরে দিনের কাজে নেমেছে দেবকন্যারা।

পাহাড়ী নারীপুরুষের রক্তে এখনও পবিত্রতা, সততা প্রবাহিত হচ্ছে। সমতলবাসীদের ধূর্ততা অথবা মালিন্য এখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।

এখানে প্রকৃতি আর মানুষ এমন অভিন্ন যোগে যুক্ত যে প্রকৃতিকে মানব-সংসারের একটি চরিত্র বলেই মনে হবে।

জুনের মাঝামাঝি থেকে বরসাৎ শুরু হয়। মেঘসজ্জায়, বিদ্যুৎচমকে সে এক দৃষ্টি-নন্দন সমারোহ। নালা, নালু, ছই, কুহল—ছোট বড় সব স্রোতস্বিনী জলের স্পর্শ পেয়ে উতরোলে ধাবিত হয় বিপাশার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

এখানেও মেঘসজ্জা হলে বকের পাঁতি শ্বেতপদ্মের গ্রন্থিহীন মালার মত ভেসে ভেসে যায়। একবার মেঘ-গর্জন হলে বহুক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে সে শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এরই ভেতরে কিন্তু নির্ভীক পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা উপত্যকায় বহমান ছোট্ট নদী থেকে মৎস্য শিকার করে বেড়ায়। মোবি, পাল্‌লু, কুন্‌নি, গুলগুলি—আরও কত মিষ্টি মধুর সব মৎস্য-নামাবলী।

নীলে সোনায় মাখামাখি হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে কুলু উপত্যকা। শরৎ পায় সোনার সিংহাসনের অধিকার। শুরু হয়ে যায় আপেল বাগিচায় কুলুর বিখ্যাত সোনালী আপেল তোলার কাজ। অক্টোবরে ঘরে ঘরে সদ্য ক্ষেত থেকে তোলা ভুট্টার সে কি শোভা। প্রতিটি ঘরের ছাদ আর বারান্দায় বিছিয়ে দেওয়া হয় সোনালী আর কমলা রঙের ভুট্টার দানা। এক ঝাঁক চিড়ি পাখি 'কুইক্ কুইক্' আওয়াজ তুলে ফর্‌ফর্ পাখা টেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার দানাগুলো লুটে নেবার জন্যে।

এবার সেরা উৎসব দশেরা এসে যায়। কুলুর বিভিন্ন গাঁও থেকে বিপাশার কূলে ঢোল-ময়দানে এসে জড়ো হয় গ্রাম্য দেবতারা। প্রধানত নরসিং দেবতা। ঝকঝকে পেতলের মূর্তি। ভক্তের কাঁধে পালকি-বাহিত হয়ে দেবতারা এসে সম্মিলিত হন। কুলুর রাজা প্রথা মেনে পুরানো দিনের ঝলমলে পোশাক গায়ে চাপিয়ে এসে পৌঁছন মেলা-প্রাঙ্গনে। তিনি বিপাশার তীর অবধি টেনে নিয়ে যান রথ। শুরু হয়ে যায় উৎসব।

রাতে খোলা আকাশের নিচে বনের কোলে স্টেজ বেঁধে আসর বসে নাচ আর গানের। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে শিল্পীরা সে উৎসবে যোগ দিতে। সেই সম্মিলিত, দ্বৈত আব একক নাচ না দেখলে কলাবতী কুলুকে পুরোপুরি জানা যাবে না। সে নাচ গন্ধর্বলোকেই বুঝি সম্ভব। বিপাশার কূলে, অরণ্যের কোলে সামান্য রঙের ছোঁয়ালাগা সাদা পোশাকে নারী আর পুরুষ যথার্থই গন্ধর্ব, গন্ধর্বী।

নাগ্গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর পাশে দুটো ফারগাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ের নিচে উপত্যকা। নানা ধরনের সবুজ ক্ষেতের চৌকো চৌকো খোপ। মাঝখান দিয়ে মুক্তো গাঁথা চওড়া হারের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। এখানে ওখানে সবুজ আর নীলে মেশা টিলা পাহাড়। প্রথম শীতের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে সারা কুলু উপত্যকায়। নীল নীল পাহাড়ের গায়ে উড়ছে সাদা মসলিনের মত কুয়াশার উত্তরীয়।

আমার চোখের সামনে পাশাপাশি দুটি নীলাভ পাহাড়। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জালের ঝকঝকে সাদা চূড়ো। কতক্ষণ তাকিয়ে আছি সেদিকে! এত শোভা, এত মহিমার মাঝখানেও মন আমার বিষণ্ন। আমি আজ বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম বিশ্ববন্দিত রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখের শিল্পকর্মগুলি দেখব বলে। শিল্পী রোয়েরিখ ভারতবর্ষকে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। এখানে নাগ্গর পাহাড়ে বসে তিনি তাঁর জীবনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি এঁকেছেন। এখানেই প্রকৃতির সীমাহীন রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি অসীম আনন্দলোকে চিরপ্রস্থান করেন।

আজ কোন একটি উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আর্ট গ্যালারী বন্ধ। এতখানি পাহাড়ের ওপর উঠে এসে ইচ্ছা পূর্ণ হল না, তাই হতাশা।

দ্বাররক্ষী আমাকে এই খবরটুকু জানিয়েই স্থানান্তরে চলে গিয়েছে। আমি এখন ঘুরে ঘুরে শিল্পীর স্থান নির্বাচনের কথা ভাবছি। হঠাৎ মেয়েলি গলার একটা আওয়াজ পেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

আসুন, আজ ছুটির দিন তাই বন্ধ ছিল। এতটা ওপরে উঠে এসে ফিরে যাবেন, দেখে যান।

টিপিক্যাল কুলুর পোশাক পরা এক তরুণী। গোল্ডেন অ্যাপেলের মত মুখ। লম্বা বিনুনী। শেষ প্রান্তে লাল একটা ট্যাসেল ঝুমকোর মত ঝুলে আছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওকে অনুসরণ করে আর্ট গ্যালাবীতে ঢুকলাম। পাশ থেকে দেখলাম, ওর ছোট্ট কানের দুলটা টুলটুল করে নড়ছে।

তরুণী আমাকে যত্ন করে সবকটি ছবি দেখাল। ব্যাখ্যা করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বলে চলল।

দ্বিতীয় কোন দর্শক নেই। তাই তরুণীটি অনেকখানি সময় আমার জন্য ব্যয় করল। আর যেটা একেবারেই প্রত্যাশা করিনি তাও করে বসল। আমাকে ছবির সমঝদার ভেবে ও নিয়ে গেল ওর ছোট্ট কোয়ার্টারে। ওর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে একটি ছবি টেনে বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, রোয়েরিখ সাহেবের এই ছবিটা দেখুন। এটি কিন্তু আমি ত্রিবান্দ্রম থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।

প্রায় হালকা একটুখানি নীলাভ রঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়ে আঁকা।

এক স্বপ্নময় পরিবেশে একখণ্ড শিলাসনে বসে আছেন ভাবুক এক সুদর্শন পুরুষ। স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। দৃষ্টির সামনে হালকা কুয়াশার আস্তরণ। ঐ কুহেলিকার ভেতর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শ্বেত প্রস্তরের সৌধরাজি।

নিচে লেখা আছে ঃ 'রামায়ণের জন্ম'।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে আদি কবি বাল্মীকি আর অযোধ্যা নগরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একসময় বেরিয়ে এলাম বাইরে। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। বাঁক ঘোরার আগে একবার ফিরে তাকালাম পেছন দিকে। তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। হালকা একখণ্ড কুয়াশা মসলিনের ওড়নার মত দুলছে তার সামনে।

সারা কুলু উপত্যকা সেই মুহূর্তে আমার চোখের ওপর একটা স্বরলিপির পাতা মেলে ধরল। আমি মনে মনে গুনগুন করে সুর সাধতে লাগলাম। সেই সুরের ভেতর থেকে জেগে উঠল এক তরুণী। আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের নায়িকা 'ঝিন্নি'।

'নির্জনে খেলা' উপন্যাসটি কবি-সম্পাদক মনীন্দ্র রায় পাণ্ডুলিপি অবস্থায় কিছু অংশ পড়ে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুগান্তর গোষ্ঠীর 'অমৃত' সাপ্তাহিকে লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান।

কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পাঠকদেব কাছ থেকে চিঠি আসতে শুরু করে। আমি উৎসাহিত হই।

কুলুর মোহময় পরিবেশে যখন ডাক্তার মুখার্জী ও ঝিন্নির হৃদয়-বিনিময়ের খেলা একটা বিশেষ পর্বে এসে পৌছেছে, ঠিক তখনই এক দরিদ্র পণ্ডিতজীর মাতৃহারা কন্যা বালুর আবির্ভাব। তরুণী বালুর ভেতর বিশেষ এক ধরনের বিনম্র আবেদন আছে। ডাক্তার মুখার্জী দরিদ্র পরিবারটিকে সাহায্যের জন্য বালুকে তাঁর ডিসপেন্সারীর কাজে নিযুক্ত করেন। দূর পাহাড়ী পল্লীতে ডেলিভারি কেসগুলো অ্যাটেণ্ড করার জন্য টাট্টুতে চড়ে যখন ডাক্তার যাত্রা করেন তখন ডাক্তারের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায় বালু। কখনো বা সে ডাক্তারের কাজে সাহায্য করে। রাতে যখন চাঁদ ওঠে তখন হয়ত দেখা যায়, ভ্যালিতে নেমে ডাক্তার হেঁটে আসছেন, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বালু।

এ খবরটুকু পৌছে যায় নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গেলাবিতে ডাঃ মুখার্জীর প্রেমিকা ঝিন্নির কানে। একটা চাপা বেদনা হেমন্তের কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করতে থাকে ঝিন্নির হৃদয়।

উপন্যাসের এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভেতর যখন আমি এসে পড়েছি তখন একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। তাতে আমি পাঠকের হৃদয়ের খবর যেমন পেলাম, তেমনি আমার সমাপ্তি পর্বের সুস্পষ্ট একটা পথরেখাও পেয়ে গেলাম।

সেদিন আমার মর্ণিং কলেজের কাজ শেষ করে আমি চারতলা থেকে নিচে নামছিলাম। প্রশস্ত সিঁড়ি, মেয়েরা ওঠা নামা করছে। হঠাৎ তিনতলার ল্যাণ্ডিং-এর মুখে চারটি মেয়ে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল।

আমার কলেজে ছাত্রীসংখ্যা প্রচুর। অনার্সের কয়েকটি ছাত্রী ছাড়া আমি নামে প্রায় কাউকে চিনি না। তবে ছাত্রীদের প্রায় প্রতিটি মুখ আমার চেনা। কিন্তু যে চারজন মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মুখগুলো আমার অচেনা লাগল।

স্যার আপনাকে একটি কথা বলতে এসেছি।

নিজের সন্দেহভঞ্জনের জন্য জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোন ইয়ার?

আমরা ফাইনাল ইয়ার বাংলা অনার্সের ছাত্রী, তবে এ কলেজের নয়।

পাশাপাশি কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে তাঁদের ক্লাশে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে। তাই ভাবলাম, ওবা ক্লাশ করতে এসেছে। বললাম, আজ আমার আর ক্লাশ নেই, অন্য একদিন এসো।

ওদের একজন বলল, না স্যার ক্লাশ করতে আসিনি, একটা কথা জানাতে এসেছি।

বল।

একটি মেয়ে অসংকোচে বিনীত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, আপনি ঝিন্নির ওপর অবিচার করবেন না স্যার।

মুহূর্তে বুঝে নিলাম, ওরা আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের নায়িকা ঝিন্নির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে তোমরা ঝিন্নিকে খুব ভালবেসে ফেলেছ।

খু-উ-ব, -সোচ্ছ্বাসে বলল আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের অনুরাগিণী পাঠিকারা।

বললাম, তোমরা কি মনে কর স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে ভালবাসে না? বুঝেছি তোমাদের আশংকার কারণটা।

ওদের চোখেমুখে তখন ফুটে উঠেছিল অদম্য কৌতূহলের চিহ্ন।

নতুন চরিত্র বালুর আবির্ভাবে তোমরা খুশি হতে পারনি। সন্দেহেব ছায়া ঘনিয়েছে। এই তো সবে শুরু, দেখই না।

একটি মেয়ে বলল, আপনাব বেশীর ভাগ কাহিনীই বিয়োগান্ত। তাই..

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, তাই তো তোমরা লেখককে মনে রেখেছ। যদি সমাপ্তিগুলো মিলনান্ত হোত তাহলে আজ এখানে তোমাদের দেখা পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটা পড়ে যাও। সঠিক জায়গায় ছেদচিহ্ন দেখতে পাবে।

ওরা সেদিন চলে গেল, আমার মগজে নতুন একটা ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে। হয়তো আমি পরিণতিটা বিয়োগান্তের দিকেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আমার সেদিনের পাঠিকাদের কথা মনে রেখে সমাপ্তিটাকে এমনভাবে টানলাম, যাতে মিলন বিরহের মাঝখানের ভূমিতে দাঁড়িয়ে রইল আমার নায়ক নায়িকা। নাগ্‌গরে কোলি-রি-দেওয়ালির হাউই উঠছে রাতের আকাশকে আলোয় ভরে দিয়ে। হীরে মাণিক্যের ফুল ফুটছে, আবার সে ফুল ঝরে পড়ছে ঝরঝর করে।

উৎসবের মাঝে আত্মগোপন করে দূরে সরে যেতে চাইছে নায়ক, কিন্তু নায়িকার দৃষ্টি তাকে ঠিক খুঁজে পেয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে তার ডাক, ছোটে সাহেব, ছোটে সাহেব..।

সরে যেতে গিয়েও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল নায়ক। বাতাসে ভেসে আসা ডাকটা তার বুকের ভেতর বাজতে লাগল।

ফোন করলেন শ্রদ্ধেয় সংগীত-শিল্পী দিলীপ রায়, সমাপ্তিটা দারুণ লেগেছে, এমনটি সচরাচর দেখা যায় না।

আপনিও পড়েছেন।

না পড়ে কি বলছি।

এদিকে অনেকগুলি চিঠি পেলাম, যে সব চিঠি লেখককে চিরদিন প্রেরণা যোগায়।

এরই ভেতর একটি রিপ্লাই কার্ড পেলাম বীরভূম থেকে। ক্লাবের বন্ধুরা উপন্যাসটি শেষ করে দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একপক্ষ বলছে ট্রাজেডি অন্যপক্ষ বলছে কমেডি। এখন লেখককে তার সমাধান করে দিতে হবে।

লিখলাম, দুদল বন্ধুই ঠিক বলেছেন। দুদলকে একইভাবে ভাবতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। সংসারজীবনে একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও নরনারী অনেকসময় মনের দিক থেকে দুই মেরু ব্যবধানে থাকে, আবার ঘটনাচক্রে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ভালবাসার বন্ধন অটুট থাকে আজীবন।

— * এতসব তত্ত্বকথা বলেও নিজের ভাবনায় স্থির হয়ে থাকতে পাবলাম না। ভিন্ন একটি পত্রিকায় 'নির্ঝরের গান' লিখে ঝিন্নি আর ডাক্তার মুখার্জীর বিরহ বিধুর প্রেমলীলাকে মিলন মধুর করতে হল। সেখানে ঝিন্নির কোল জুড়ে এল দুজনের দুস্তর বিরহের অবসান ঘটিয়ে তিন্‌নি। যেন সংক্ষুব্ধ মানস সরোবরকে শান্ত করে ফুটে উঠল একটি কমল।

— * এ লেখার পনেরো ষোল বছর পরে আমার নিত্যকালের মানস-প্রিয়া বলল, তিন্‌নি এখন পরিণত কিশোরী। ভেবে দেখো, তার কথা লিখে তোমার প্রেমের ট্রিলজি সম্পূর্ণ করা যায় কিনা।

সেই প্রেরণাতেই সৃষ্টি হল, 'তিন্‌নির রোদ আর বৃষ্টি'।

সকরুণ বেণু

অনেকদিন পরে এক সাহিত্য সভায় ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমর দেখা হয়ে গেল। প্রথমদিনের দেখায় যেমন উদ্ভাসিত মুখে তিনি আমাকে একটি নমস্কার করেছিলেন, আজও তাই করলেন।

আমি প্রতি নমস্কার জানাতেই উনি সহাস্যমুখে এগিয়ে এলেন।

কেমন আছেন? —স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ।

মৃদু হেসে ঘাড় কাত করলাম। আমার পাশে খালি চেয়ারটিতে ওঁকে বসতে ইঙ্গিত করায় উনি এসে বসলেন। মুখে বললেন, আজকের সভায় আপনি আমন্ত্রিত অতিথি জেনেই আমি এসেছি।

বললাম, কযেক বছর আগে হীরেনদার বাড়িতে আপনাকে শেষ দেখেছিলাম একটা অনুষ্ঠানে, আজ

এতদিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল।

প্রথম দিনও আপনার সঙ্গে আমার দেখা ঐ হীরেনদারই বাড়িতে। ওঁর লেখা আর সুর দেওয়া কয়েকটা গান আমি সেদিন তুলে নিতে গিয়েছিলাম।

বললাম, আপনার গলার আওয়াজ এখনও আমার কানে লেগে আছে।

সভা শেষ হল। আমার বাড়ির কাছেই সভাগৃহ। উদ্যোক্তারা গাড়ি করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি এটুকু পথ পায়ে হেঁটে যাব বলে স্থির করলাম। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। আমার বাড়ি ছাড়িয়ে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ ওঁদের বাড়ি।

উনি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।

এখনও গান করছেন তো?

হেসে বললেন, ওই একরকম। হীরেনদা চলে গেলেন, এমন উৎসাহদাতা আর পাব কোথায় বলুন?

আলো ছায়া পেরিয়ে পেরিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। যতবার ওঁর দিকে চোখ পড়ল ততবারই প্রসন্ন উদ্ভাসিত একটি মুখ দেখতে পেলাম। অন্তর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ না হলে এমন ছবি মুখে ফুটে ওঠে না।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে আমরা বিদায় নিলাম। মুখে সেই উজ্জ্বল হাসি, নমস্কারের ভঙ্গিতে দুটি হাত জোড় করা।

উনি চলে গেলেন। নির্জন রাস্তায় লাইটপোস্টের ধারে দাঁড়িয়ে আমি সেই মহীয়সী মহিলাটির কথা ভাবতে লাগলাম।

কলকাতার একটি নামী দৈনিকে এক মায়ের কাতর আবেদন বেরোয়। কন্যার কিডনি ট্রানস্-প্লান্টের জরুরী প্রয়োজন। বিশ্ববিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডঃ মেণ্ডেস বিনা পারিশ্রমিকে অপারেশনের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু আমেরিকা যাতায়াতের খরচ এবং সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার খরচ যোগাবার সামর্থ তাঁদের নেই। তাই জনসাধারণের কাছে জননীর সকরুণ আবেদন।

আবেদনটি এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যাতে বহু মানুষ অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। প্যাসেজ মানি জোগাড় হয়ে যায় কিন্তু সেখানে থাকার অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মনের জোরে জননী তাঁর কন্যাকে নিয়ে সুদূর আমেরিকায় চলে যান। সেখানে পরিশ্রমের বিনিময়ে ইস্কনে একটা থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

মানব-দরদী ডাঃ মেণ্ডেস কেবল তাঁর ফি-ই ছেড়ে দেননি, হসপিটালে থাকা-খাওয়া এবং ওষুধের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। কন্যার জন্য মা-ই তাঁর কিডনিটি দিয়েছিলেন।

ওঁরা ফিরে এলে ওঁদের বাড়ি উৎসব-মুখর হয়ে উঠেছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী পেসেন্টের কাছে লেখা ডাঃ মেণ্ডেস-এর কয়েকটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন। সব কটি চিঠি মমতায় পূর্ণ। এ কাজের সফলতার জন্য ঈশ্বরের করুণার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছিলেন।

হাসি খুশি মেয়েটি কাজে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু একদিন দুর্ভাগ্যের শিকার হল এই আনন্দময় পরিবারটি। ভদ্রমহিলা প্রথমে স্বামীকে হারালেন। কন্যাটি সম্পূর্ণ অন্য অসুখে অকালে হারিয়ে গেল

বিধাতা মহিলার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিলেন, কিন্তু কাড়তে পারেননি মুখের সেই অমলিন হাসিটি।

এই উপন্যাস একটিমাত্র পার্শ্ব চরিত্র এবং কিছু ঘটনা ছাড়া সম্পূর্ণ সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত।

কমল হীরে

জব্বলপুরে একবার ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। আমার অনুজপ্রতিম এক অধ্যাপকের ওই অধিবেশনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ ছিল। সে বছর জব্বলপুর যাত্রায় আমি তার সঙ্গী হই। উদ্দেশ্য ছিল জব্বলপুর দর্শন এবং আমার গুণমুগ্ধ পাঠিকার সাক্ষাৎলাভ।

'অমৃত' সাপ্তাহিকে আমার 'নির্জনে খেলা' ধারাবাহিকটি পড়ে তিনি কয়েকটি চিঠি লেখেন এবং জব্বলপুরে তাঁর অতিথি হওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সেই শিক্ষিতা, সুমার্জিত মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং অনেক কথাও হয়েছিল কিন্তু আমি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে পারিনি।

আলাপচারিতার সময় তিনি তাঁর জীবনের একটি সংঘাত সঙ্কুল কাহিনী বলেন এবং তাই নিয়ে আমাকে একটি উপন্যাস রচনার জন্য অনুরোধ জানান।

উপন্যাস রচনার সময় আমি পটভূমির পরিবর্তন ঘটিয়ে জব্বলপুরের জায়গায় সমুদ্র-বিধৌত অপরূপা গোয়াকেই নির্বাচন করলাম।

জব্বলপুর আমার মনোহরণ করলেও কেন যে সেদিন পটভূমি হিসাবে গোয়াকে নির্বাচন করেছিলাম তার সঠিক কারণ আজ আর আমার মনে নেই। হতে পারে, এটি একটি খেয়ালের খেলা।

আঁধার পেরিয়ে

চুলের ভেতর পাঁচটা আঙুল চালিয়ে দিয়ে মাথাটা একটু কাৎ করে দাঁড়াল শান্তনু। কাজলের নির্বিকার মুখখানার ওপর চোখ দুটো রেখে হতাশ গলায় বলল, তাহলে এটিও পছন্দ হল না?

কাজল তেমনি স্থির। শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথাটাকে অবলীলায় একবার দুলিয়ে নিলে।

শান্তনু এবার একটু চড়া গলাতেই বলল, দে· ·ব সময় .তামার ঐ ভরতনাট্যমের মাথানাড়া আমি বুঝতে পারি না। সোজাসুজি বলেই ফেল যে ৩৭নং বাড়ির মত পেল্লাই ইমারৎ ছাড়া তোমার চলবে না।

উপরের নম্বরটি বলাবাহুল্য কাজলের বাপের বাড়ির।

রাগ করার কথা তবু রাগ না করে হেসেই ফেলল কাজল। বলল, ভরতনাট্যমের খোঁচাটা নাই বা দিলে। তারচেয়ে মাথা নাড়া বুড়ো পুতুলটার সঙ্গে না হয় .....।

শান্তনুর এ সময় দারুণ চটে যাবার কথা কিন্তু সেও চটল না। তাবও হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল কাজলের দিকে চেয়ে।

কাজল দস্তুর মত স্কুল কলেজে পড়ার সময় তালিম নিয়েছিল নাচের। বড়বাড়ির মেয়েকে কাজলের বাবা দক্ষিণী গুরু রেখেই নাচ শিখিয়েছিলেন। ভরতনাট্যমে মুখখানাকে ঘাড়ের ওপব ডাইনে বাঁয়ে নাড়ার একটি বিশেষ মুদ্রা আছে। কাজল স্বভাবতই ওটিতে বিশেষ রপ্ত ছিল।

তার কোনকিছু পছন্দ না হলেই সে অমনি ঐ বিশেষ মুদ্রাটি প্রয়োগ করত।

একদিন বেজায় চটে গিয়েছিল শান্তনু। অবশ্য রাগের কারণও ছিল। রথের মেলায় কাজলকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে।

কাজল তেমনি ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়েছিল।

শান্তনু আর কোন কথা বলেনি। সিঁড়ির দুটো করে ধাপ ডিঙিয়ে দুম্‌দুম্ আওয়াজ তুলে নিচে নেমে গিয়েছিল। কাজল ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলেছিল, কেষ্টনগরের ভাল পুতুল পেলে নিয়ে এসো কিন্তু।

শান্তনুর রাগ তখন তুঙ্গে। সে একবার শুধু ওপরের দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকিয়েছিল। ওকে আরও রাগাবার জন্যে আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথাটা দুলিয়েছিল কাজল। শান্তনু ছিলার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল তীরের মত।

ফিরল যখন রাত বারোটা। কাজল জানালায় বসে রাস্তার ওপর তাকিয়ে। চোখ বেয়ে টপটপ গড়িয়ে পড়ছিল জলেব ধারা।

শান্তনু ওপরে উঠে এসে কাজলকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

কাজল কাঁদতে কাঁদতেই এলোপাথাড়ি ঘা কতক কিল বসিয়ে দিয়েছিল শান্তনুর বুকে।

তারপর একসময় যখন আষাঢ়ের মেঘ ভেঙে ভেজা চাঁদটা উঁকি মারল তখন শান্তনু কাজলের হাত ধরে বলল, ওঘরে দেখবে চল, তোমার জন্যে কি এনেছি।

কাজল তখন শান্ত হয়েছে। সে শান্তনুর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল না। চলতে চলতেই বলল, চাইনা আমার কিছু। তুমি আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছ আজ। অনেক কাঁদিয়েছ।

পাশের ঘরে ঢুকে টুক করে আলোটা জ্বালল শান্তনু।

ঝড়ো হাওয়ায় বুড়োর মাথা দুলছে। ডাইনে বাঁয়ে সে কি দুলুনি।

কোথায় গেল কান্না। হাওয়ার ঠ্যালায় মেঘ ওড়ানোর মত হাসির দাপটে কান্না গেল উড়ে।

দুলছে পুতুলের মুখ। থামলেই আবার কাজল তাকে দিচ্ছে দুলিয়ে। নিজের অজান্তে কখন সে পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখখানাকেও দুলিয়ে চলেছে।

আজ তাই নতুন বাসার খোঁজ করতে এসে শান্তনুর কথায় কাজলের মনে পড়ে গেল মাথানাড়া বুড়ো পুতুলটার কথা।

শান্তনু বলল, হাসি দিয়ে তো সমাধান হবে না সমস্যার। এখন বল, তোমার ইচ্ছাপূরণ হয় কি করে?

কাজল বলল, ইচ্ছাপূরণ হলেই তো আর ইচ্ছা বলে কিছু রইল না। তার চেয়ে পূরণ না হওয়াটাই ভাল নয় কি?

শান্তনু বলল, দালাল নীচে দাঁড়িয়ে আছে, সে যদি আমাদের নাটক শোনে তাহলে ওখান থেকেই ভেগে পড়বে।

কাজল বলল, তাহলেই আর কি। খুব চিনেছ। সারারাত নাটক চালিয়ে গেলেও এক পা নড়াতে পারবে না ওদের। সুযোগ পেলে সব সময়েই সাইড রোলে হাজির।

শান্তনু দেখল কাজল এখন বেশ খোশ মেজাজে। সে অমনি কাজলের কাছে সরে এসে বলল, আচ্ছা কাজল, আমার এই সামান্য সাধ্যের ভেতর যতদূর সম্ভব ভাল ফ্ল্যাট খুঁজছি। আর এ ফ্ল্যাটখানাও তো কোনদিক থেকেই একেবারে অপছন্দ হবার মত নয়। অন্ততঃ তুমি এখন যেখানে বাস করছ, সে তুলনায় স্বর্গ। তবু তোমার পছন্দ হচ্ছে না কেন বলতে পার? স্পষ্ট করে মনের কথাটা না বললেই বা আমি ঝোপঝাড় পিটিয়ে মরি কাঁহাতক।

কাজলের ঐ এক কথা।

সব তোমাকে বলে বোঝাই কি করে। মেয়েদের অনেক কথা আছে যা তোমাদের শুনতে নেই।

শান্তনু দুটো হাত হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেবাঃ ন জানন্তি .....।

কাজলের বুঝি মায়া হল। সে বলল, আমার ছোট ঘর হোক, কিন্তু একটা জিনিস থাকা চাই।

শান্তনু যেন অনেক অন্ধকার হাতড়ে একটুখানি আলোর সন্ধান পেল। সে অমনি বলে উঠল, বল কি চাই।

একটা রাস্তা চলে যাবে ঘরের সামনে দিয়ে। আমার জানালাটা খোলা থাকবে সেদিকে। ব্যস্, আর কিছু চাইনা।

শান্তনু অমনি ভরা গলায় শুরু করে দিলে :

> 'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে—
> আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে!
> বলে দে আমায় কী করিব সাজ
> কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
> পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরনের বাস।
> মাগো, কী হল তোমার, অবাক্ নয়নে মুখপানে কেন চাস?
> আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
> সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
> ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—
> শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।'

আবৃত্তি থামিয়ে শান্তনু বলল, তোমার সে রাজার দুলালটি কে তা জানতে পারি কি?

কাজল বলল, সে আমার দুঃখী রাজপুত্র। তার জন্যেই তো যত আমার পথ চাওয়া আর চোখের জল ফেলা।

শেষটায় ঘর পাওয়া গিয়েছিল। ছোট ঘর, তা হোক, জানালায় চোখ পাতলেই রাস্তাটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। উঠোনে বাড়তি লাভ ছিল একটা চাঁপার গাছ।

প্রেস ফটোগ্রাফারের কাজ শান্তনুর। তাই তাকে কখনো-সখনো দু'চারদিন বাড়ির বাইরে কাটাতে হত। কোথাও যাবার সময় হলেই বলত, ওখানে যদি মেঘটেঘ পাই তাহলে দূত করে পাঠাবার চেষ্টা করব। তুমি বিরহে কাতর হয়ে পড়ো কিন্তু! নইলে আমার পাঠান দূতটি তোমাকে চিনতে না পেরেই ফিরে যাবে। তাছাড়া সামনের উঠোনে তো চাঁপার গাছ রইল। একটি করে ফুল তুলে রোজ সাজিয়ে রেখ। ঐ ফুল দিয়েই করো তোমার বিরহের দিন গণনা।

এই বলে শান্তনু মজা করে ক্যালেন্ডারটা দেয়ালের দিকে উল্টে দিত।

কাজল বলত, হে বাক্যবাগীশ, স্নানের সময় পার হয়, নেয়ে খেয়ে এখন আমাকে উদ্ধার কর।

অথবা কখনো বলত, মাঝে মাঝে অদর্শনটা মন্দ নয়। ফিরে এলে নতুন করে পাওয়া যায়।

শান্তনু অমনি বলত, এরই ভেতর পুরনো হয়ে গেলাম, বলো কি!

পুরোনো হলেই বা, ক্ষতি কি। ওল্ড ইজ গোল্ড। পুরোনো জিনিসের চাহিদা সারা দুনিয়া জুড়ে।

তোমার মনের মিউজিয়ামে যখন রাখবে শ্রীমান শান্তনু চৌধুরীর স্মৃতিগুলো তখন তার দাম না হয় বেশি করেই দিও। আপাততঃ তোমার মালঞ্চের মালাকর হতে পারলেই খুশী।

'প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টি খানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব ....।'

কাজলের চোখ অমনি কান্নায় টলোমলো।

না হয় তুমি লেখক, তাবলে অন্যাকে কাঁদাবার কোন অধিকারই তোমার নেই।

শান্তনু অবাক। কি হল ব্যাপারখানা।

আমি কি এমন কিছু বলেছি যাতে তুমি দুঃখ পাও?

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কাজল বলত, মিউজিয়াম, স্মৃতি এগুলো বুঝি খুব ভাল কথা।

অমনি শান্তনু কাজলের মুখখানাকে দুহাতে চেপে ধরে ওর চোখের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকত।

কাজল বলত, কি হচ্ছে?

ডুবছি।

মানে?

তোমার আঁখির সাগরে ডুবুরী হয়ে ডুব দিচ্ছি। দেখি কতগুলো মুক্তো কুড়োতে পারি।

এই ছাড়ো। ছাড়ো। এমন জোরে মুখখানাকে চেপে ধরেছ।

মুখখানা ছেড়ে দিয়ে শান্তনু বলত, বড় অসভ্যের মত চেপে ধরেছিলাম বুঝি?

কাজল অমনি ফোঁস করে উঠত, কবে আবার সভ্যের মত ধরো তুমি। ডাকাত, লুঠেরা সভ্য হয় নাকি কখনো।

সবে বিয়ে করে ওরা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের চেনা চোখের আড়ালে কয়েকদিনের জন্যে হারিয়ে যেতে চাইল।

ওরা এসে উঠল পুরীর একটা হোটেলে। সময়টা ভীড় এড়াবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। সমুদ্রের ঢেউ সাদা ফেণা উগরে দিচ্ছিল, আর হোটেলগুলো থেকে উপচে পড়ছিল মানুষজন। ভীড় এড়াতে গিয়ে ভীড়ের ঠ্যালায় প্রাণান্ত।

কি করা যায়, তারই ভেতর একটু নিভৃতি খুঁজে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছিল ওরা।

গরমের সময় সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন ক্ষেপে যায়। স্নান করতে নামলেই তাড়া করে আসে। শান্তনু শোনার পাত্র নয়। ঘণ্টা দুয়েক তো বটেই, পারলে তারও বেশি জলে পড়ে থাকে। বড় বড় ঢেউ-এর

ওপরে উঠবে ও। কাজল বারণ করতে গেলেই মিনতি। এই আর একবার। তারপর বারের হিসেব হারিয়ে যায় শান্তনুর। ঢেউ ভেঙে ভেঙে ঢেউ-এর মাথায় চেপে কতদূর চলে যাওয়া। ভারী কান্না পেয়ে যায় কাজলের। হোটেলে ফিরে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাট বসায় ও।

এক্ষুনি টিকিট কাট, আমি আর সমুদ্র দেখতে চাই না।

শান্তনু বলে, বেশ তো সমুদ্র না দেখবে নেই, মন্দির দেখবে চল। ভুবনেশ্বর, কোনারক।

কাজলের গলায় কান্না উপচে পড়েছে ততক্ষণে।

কোথাও যেতে চাইনে আমি। কোথাও না।

শান্তনু বলল, কোথাও যেতে না চাইলে যেখানে আছ সেখানেই থাকতে হয় যে।

কাজল এবার সত্যিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলে।

শান্তনু প্রথমটায় অসহায়। কি করবে ভেবে পেল না। একসময় কাজলের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বসল, আর সে জলে নামবে না।

অবশ্য এতটা চায়নি কাজল। শেষে কাজলই ঠিক করে দিলে সমুদ্র স্নানের সময় সীমা।

কিন্তু আর এক বিপত্তি। এক সকালে শ্রীমান শান্তনু উধাও।

বেলা বাড়ে দেখা নেই। কাজল ঘুমিয়েছিল। জেগে দেখে একটুকরো কাগজ শিয়রে। খপ করে তুলে চোখের সামনে মেলে ধবতেই, জানা গেল, শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে শান্তনু। ছবি শিকার। তার জন্যে কেউ যেন অকারণ ভাবনা না করে।

এমন বরাভয়েও ভীত না হয়ে পারলনা কাজল। যখন দেখল বেলা বাড়ে মানুষের দেখা নেই।

পড়ে রইল ব্রেকফাস্টের সব আয়োজন। হোটেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। দশটা নাগাদ দেখা গেল শান্তনু সমুদ্রতীর থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে। ভিজে জামা প্যান্ট লেপটে আছে গায়ে। সে এক দৃশ্য। হাতে ঝুলছে ক্যামেরা।

ঘরে ঢুকেই বলল, খুব একটা ভাবটাব নি তো। ঘুমুচ্ছিলে তাই চিঠিতে সব জানিয়ে ....।

সেই মুহূর্তে কাজলের মাথা কাৎ করে চুলের জট ছাড়ানোর জন্যে চিরুণী চালাবার দরকার হয়ে পড়ল। শান্তনুর বিলম্ব যেন কাজলের বিচলিত হবার পক্ষে যথেষ্ট কোন কারণই নয়। এমনি ভাব।

শান্তনু এবার বলল, ক্যামেরাটা বাঁচাবার জন্যে জলে পড়তে হল।

কাজল স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

এই দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আগে ঢুকি। ভেজা অবস্থায় থাকি কি করে।

কে শোনে কার কথা। একটু পরেই ভেতর থেকে শাওয়ারের শব্দ এল। তার সঙ্গে মিহি গলায় গুণগুণিয়ে গান।

শ্রীমান শান্তনুকে অগত্যা দাঁড়িয়ে থাকতে হল ঠায়।

মধ্যাহ্নভোজ পৃথক পৃথক সারা হল। একজন দোতলায় অন্যজন নীচে ডাইনিং হলে। সূর্য ডোবার আগে আর রাগ পড়ল না কাজলের।

শেষে যখন ওরা সহজভাবে কথা শুরু করল তখন শান্তনু বলল তার প্রভাত ফেরীর কাহিনী।

সমুদ্রে গিয়ে ফটো তুলবে বলে একটি নুলিয়াকে কয়েকদিন ধরে জপিয়েছিল। তারপর তার অতি ক্ষুদ্র জেলে তরণীতে সকালে শুভ যাত্রা।

সমুদ্রে দোল খেয়ে আর কিছু জল খেয়ে যখন শ্রীমান শান্তনুর চৈতন্য হল তখন নৌকোর কর্ণধারের ওপর আদেশ হল, তরণী তীরে ভেড়াও।

এইটুকু শুনেই কাজল বড় বড় চোখ করে বলল, তুমি নুলিয়াদের নৌকোতে ঐ সাংঘাতিক সমুদ্রে গিয়েছিলে! তুমি একটুও ভাবলে না আমার কথা। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।

শান্তনু অমনি বলল, এ যুগের কলেজে লেখা-পড়া শেখা মেয়েরা মাথা খুঁড়ে মরা-টরা বলে না কিন্তু। তুমি বড় ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছ।

কাজল ঝাঁঝিয়ে উঠল, থামো, এত বড় অন্যায় করেছ, তার ওপর আবার অন্যায় ঢাকবার অছিলা। যদি একটা কিছু অঘটন ঘটত তাহলে সেটা কার ঘটত শুনি।

শান্তনু কাজলকে আরও একটু ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বলল, শ্রীমতী কাজলদেবীর জন্মের মত মাছের কালিয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।

আমি কি মাছের ভক্ত যে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে।

শান্তনু বলল, ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার সহধর্মিনীটি একান্তই দুগ্ধপোষ্য।

কথাটার মোড় ঘুরিয়ে শান্তনু কাজলের হাত ধরে টান দিলে, দেখ, সমুদ্রের কি সুন্দর রঙ ফিরেছে।

আজ আকাশের বুকে কান্না নেই। মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে জলে ডাঙ্গায় আর ঐ ঝাউগাছের ঝিলিমিলি পাতার ফাঁকে। দেখ, দেখ, সমুদ্র কেমন ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ি পরেছে। সামনে হাল্‌কা সবুজ, একটু দূরে নীল, তার পাশেই হাল্‌কা বেগুনীর স্রোত। সত্যি অদ্ভুত। আবার ঠিক যেন শ্রীমতী কাজলের মত ফুঁসছে।

কাজল রাগ না করে হেসেই ফেলল এবার। শাড়িও সে পরেছে আজ সাগর-সবুজ রঙের।

হাসি থামলে কাজল বলল, থাম, আর কথা ঘোরাতে হবে না। যত অপকর্মের ওস্তাদ তুমি।

শান্তনু এবার নিজের কৃতিত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়েছে। সে বলল, একবার ঘরে ফিরে ছবিগুলো ডেভেলপ করি, তারপর দেখাব সমুদ্র থেকে কি রত্ন আহরণ করে এনেছি।

খুব হয়েছে, আমার অমন কৃতিত্ব দেখে কাজ নেই।

শান্তনুকে তখন কথার তুবড়ীতে পেয়ে বসেছে। সে বলল, সিগালগুলো ঢেউয়ের মাথায় ডানা মেলে কি সুন্দর ভঙ্গীতে যে উড়ে এসে পড়ছিল। প্রায় একটা রিলই ওদের পেছনে খরচ করে ফেলেছি। তাছাড়া পাশাপাশি নৌকো আর নুলিয়াদের দারুণ দারুণ সব ছবি তুলেছি।

কাজল বলল, খুব ভাল কথা, শুনে সুখী হওয়া গেল। কিন্তু কোডাকের একটা রিলের দাম কত খেয়াল আছে।

তুমি বিশ্বাস করবে না কাজল, মাত্র সাত টাকায় এক একটা পেয়েছি।

চালাকি রাখ, বাজে ধাপ্পাগুলো দিয়ে আমাকে আর ভুলিও না। সেদিন পার্কস্ট্রীটে লেন্সহুড কিনতে গিয়ে দর করছিলে না কোডাকের? দামটা আঠারো বলছিল না। স্মৃতিশক্তি কি আমার এতই ভোঁতা মনে কর।

শ্রীমান শান্তনু কথা ঘোরাবার একখানি। সে অমনি বলল, তুমি ঠিক বলেছ। বাজারে দুষ্প্রাপ্য কোডাক আঠারো কেন বিশেও যাচ্ছে, কিন্তু অলকের কথা আলাদা। ওর পুরোনো স্টক থেকে একেবারে অনেক কালের কেনা দামে ও আমাকে সাপ্লাই করে।

অলকের নাম শুনেই ক্ষেপে গেল কাজল।

দেখ, ঐ এক বদ স্বভাবের ছোক্‌রার সঙ্গে তোমার দোস্তি দেখলে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

শান্তনু ফটোগ্রাফার কাম ফটো গুড্‌স্ বিক্রেতা অলক মিত্রের স্বপক্ষে কিছু বলতে যাচ্ছিল। থামিয়ে দিল তাকে কাজল।

বলল, ভুলে গেছি তোমাকে ওর কুকীর্তির কথা বলতে। এই কদিন আগে শিখা আমাকে বলে গেছে।

শিখা কাজলের বান্ধবী গোষ্ঠীর অন্যতমা। কথা জমানোতে আশ্চর্য দক্ষতা। চানাচুর পরিবেশনে অসামান্য নৈপুণ্য। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিতে পারে।

শান্তনু শিখাকে অগ্নিশিখা বলেই সম্বোধন করে। শিখা জবাবে বলে, ঘরেরটি নিশ্চয়ই দীপশিখা।

শান্তনু অমনি বলে, দুটিই সমান। আগুনের ছোটবড় নেই, সমান দাহিকা শক্তি।

কাজলের কথায় শান্তনু জানতে চাইল, শিখা কি বলেছে অলকের সম্বন্ধে।

তোমার কাছে অলকের প্রশংসা শুনে ও গিয়েছিল অলকের স্টুডিওতে ফটো তুলতে। শেষে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।

শান্তনু বলল, তোমার বান্ধবীটি তো নাস্তানাবুদের মেয়ে নয়।

কাজল ধমকে উঠল, থামো, অলকের সাফাই আর তোমাকে গাইতে হবে না। শোন আগে ওর কুকীর্তির কথা।

শান্তনু চুপ করে বইল। কাজল বলে চলল, শিখা গিয়েছিল সন্ধ্যেবেলা অলক মিত্রেব স্টুডিওতে। খদ্দেব ধবাব অপেক্ষায় বসেছিলেন অলকবাবু। শিখাকে দেখে নাকি চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

শান্তনু কথাব ভেতবে ফোড়ন না কেটে পাবল না। বলল, অগ্নিশিখাব দীপ্তিতেই ওব চোখদুটো নিশ্চযই জ্বলছিল।

কাজল ডান হাতখানা ভাষণ দেবাব ভঙ্গিতে হাওয়ায় ছুঁড়ে বলল, থামো ব্যাবিস্টাব, কথা চাপা দেবাব চেষ্টা করো না। তাবপব কি হল শোন।

শিখা তোমাব আমাব কাবোই পবিচয দেযনি। ছবি তুলতে ভেতবে নিয়ে গিয়ে তাকে খাতিব কবে বসালেন অলকবাবু। ফ্যানের বেগুলেটাব বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন, যে অসহ্য গবম পড়েছে। তাছাড়া আপনাব ঐ সুন্দব মুখেব থেকে ঘামেব কুড়িগুলোকে মিলিয়ে যেতে দিন।

এই বলে শিখাকে বসিয়ে বেখে বাবু কোথায চলে গেলেন। শিখা ঠাণ্ডা হবে কি, সে তখন ঘামছে।

কিছুক্ষণ পবে দুহাতে দুকাপ চা নিয়ে অলকবাবুব প্রবেশ।

নিন এটুকু খেয়ে নিন।

শিখা বলল, ধন্যবাদ এখন আব আমি চা খাব না।

সে কি, চায়েব তো এখন তখন নেই। চা তো যখন তখনেব পানীয। তাছাড়া এ গবমে যদি একসঙ্গে দুকাপ খাওয়াতে চান এ হতভাগ্যকে তাহলে অগত্যা ।

শিখা অলকেব বাড়ানো হাতেব থেকে চায়েব কাপটা ধবে নিল। কোন বকমে গিলে ফেলল চাটুকু। তাবপব কাপটা বাখাব জন্যে উঠতেই বাজপাখিব মত ছোঁ মেবে ওব হাত থেকে কাপটা নিয়ে নিল অলক।

বলল, আপনি একটুও নড়াচড়া কববেন না, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বসে থাকুন। ছবিতে আপনাব সেই মুডই চাই।

তাবপব ছবি তোলাব সময নাকি অনেক আলো জ্বলল সেখানে সব কটা আলো নিভে গেল।

শিখাব তো দম বন্ধ হবাব জোগাড়।

আবাব আলো জ্বলল। এবাব ফ্যানটা বন্ধ কবে দিতে দিতে অলক বলল এখন আপনাকে একটু কষ্ট দিতে চাই। অবাধ্য চুলগুলো বড় বেশি খেলা শুরু কবেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ শিখাব মুখখানা ধবে বাঁদিকে ফিবিয়ে দিয়ে বলল, ওয়াণ্ডাবফুল। একটুও নড়বেন না যেন, এমনি থাকুন।

শিখা বলল, তখন নাকি তাব চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে কবছিল।

তাবপব স্টুডিও থেকে বেবিযে সেই যে চলে এসেছে আব ওমুখো হযনি।

শান্তনু বলল, শিখাকে বিয়ে কবতে বল, তাহলে অন্ততঃ একটা বডিগার্ডেব ব্যবস্থা হবে। একা একা পা ফেললেই সুন্দবীদেব জন্যে বিপদ ওৎ পেতে থাকে।

কাজল বলল, তুমি শিখাকে একেবাবেই দেখতে পাব না।

শান্তনু বলল, ঠিক অলক যেমন তোমাব চক্ষুশূল।

কাজল বাগ করে বলল, শিখাব সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান?

শান্তনু বলল, অলক সম্বন্ধে তুমি যতটুকু জান ততটুকুই।

কাজল বলল, শিখাব মত মেয়ে একটি খুঁজে আন দেখি। এমন সুন্দব চেহাবাব মেয়ে এতদিন বাপেব বাড়ি পড়ে আছে কেন ভেবে দেখেছ?

শান্তনু হেসে বলল, একজনেব ভাবনাতেই হিমসিম, তাব ওপব যদি আবও সুন্দবীদেব ভাবনা ভাবতে হয তাহলে শান্তনু চৌধুবীব অতঃপব নিবাস হবে বাঁচি।

কাজল বলল, কোনদিন ওব বাড়িব কথা আমি বলিনি তোমাকে। শুনলে তুমি বুঝবে, হাসি দিয়ে মেয়েটা কতখানি কান্নাকে আড়াল কবে বেখেছে।

শান্তনু চুপচাপ তাকিয়ে বইল কাজলেব দিকে। নতুন কিছু একটা শোনাব প্রতীক্ষায বইল সে।

কাজল একটু থেমে বলল, শিখাব আশ্রয বলতে একমাত্র বাবা। ভাইবোন ছিল না ওব। মা মাবা

যাবার পর বাবা অস্বাভাবিক হয়ে গেছেন। গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার পর চাকরীটা গেছে।

প্রথম দিকে উনি ছাদের ওপর উঠে তারাগুলোর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতেন। নীচে নেমে এলে মনে হত যেন অন্য কোন জগৎ থেকে তিনি নেমে এলেন। শিখার কেমন ভয় করত। ওর বাবা কিন্তু কোন উৎপাৎ উপদ্রব করতেন না। শিখার দিকে তাকিয়ে বলতেন, আকাশের দিকে ভাল করে তাকালে অনেকগুলো জগৎ দেখতে পাওয়া যায়। অস্পষ্টভাবে তাদের অধিবাসী, তরুলতা-পল্লব, নদনদী গিরিগুহা সবকিছু দেখা যায়।

একদিন ছাদ থেকে শিখার বাবা অতি দ্রুত নেমে এলেন। মনে হল তিনি দারুণভাবে উত্তেজিত। শিখাকে সামনে পেয়েই বলে উঠলেন, আজ তোর মাকে চকিতের জন্যে দেখতে পেলাম। খুব অস্পষ্ট একটা আলো হঠাৎ অতি কোমল, অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই আলোয় দেখলাম তোর মা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। একবার আমার চোখের পলক পড়ল, আর উনি হারিয়ে গেল।

একটু থেমে কাজল বলল এখন উনি একেবারে উন্মাদ। কখন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন সেই ভয়ে একটা ঘরে ওকে শেকল তুলে রাখা হয়েছে।

শান্তনু বলল, জীবন সত্যি বিচিত্র। আমরা মানুষের ভেতরের কথা কতটুকুই বা জানি।

বিকেলে ওরা বেরলো। একটা বালির ঢিবির পাশে কয়েকটা ঝাউ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। ওরা পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে বসল।

টুকরো কথার পরে শান্তনু একসময় বলল, কাজল তোমার নয়নের মনির কথা আমি শুনেছি, এখন তোমার চক্ষুশূলের কথা আমাকে বলতে দাও।

কাজল বলল, ঐ অলকের কথা।

শুনতে আপত্তি আছে তো বলব না।

আপত্তি থাকবে কেন।

শান্তনু বলল, অলকের জীবনটাও কম বিচিত্র নয়। ও কিন্তু এমনটা ছিল না আগে। পড়াশোনা করবার জন্যে গাঁ ছেড়ে একসময় কলকাতা চলে এসেছিল। গরীব ঘরের ছেলের যা হয়, দিনে চার পাঁচটা টিউশনি চালিয়ে, থাকা খাবার ব্যবস্থা করতে হত ওকে।

অনেক কষ্টে বি-এটা পাশ করল। দুবছর ধরে চাকরীর চেষ্টা করেও বেকারত্ব ঘুচল না। শেষটায় কিছু পয়সার বিনিময়ে পার্টির পোস্টার লিখে বেড়াতে লাগল। নানারকম টাইপ ও লিখতে পারত। তারই জোরে কাজ পেতে ওর কষ্ট হয়নি।

ওর বিশেষ একটা কোন পার্টির ওপর আকর্ষণ ছিল না। রোজকারের ক্ষেত্রে সব পার্টিই সমান। তাই বিভিন্ন পার্টি অফিসে ঘুরে ঘুরে ও কাজ যোগাড় করে বেড়াত। এ সাময়িক রোজকার। ইলেকশানের মাস দুয়েক আগে খেটেখুটে কিছু কামিয়ে নেওয়া।

রাত শেষের ম্লান আলো, কিংবা নিশুতি চাঁদনি রাত ছিল ওর কাজের পক্ষে সুবিধের সময়। তখন ঘরের মালিকেরা থাকত ঘুমিয়ে। দিব্যি সেই সুযোগে ও চিত্রিত করত ওদের দেওয়াল।

একরাতে মই নিয়ে উঠেছিল এক দেওয়ালে। কাজও অনেক দূর এগিয়েছিল। হঠাৎ দেখল মইটাকে কে যেন ধাক্কা দিলে পাশের জানালা থেকে। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়। দারুণ লেগেছিল পায়ে। উঠতে পারছিল না ও। এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন, দেওয়ালে লেখার পুরস্কার মিলেছে তো। ফটাফট জুতোর আওয়াজ তুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। অলক তখন আহত পা-টাকে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। বেশিদূর যেতে পারেনি, ধরা পড়ে গেল।

চাঁদের আলোয় দুজন দুজনকে চিনতে পারল।

ভদ্রলোক এক পার্টির পাণ্ডা এবং ঐ পার্টির টিকিটেই বিধান সভার লড়াই-এ প্রস্তুত হচ্ছেন। অলককে তিনিই দেয়াল-লিখনের কাজ দিয়েছিলেন এবং রাতে কিভাবে সংগোপনে কাজটি হাসিল করতে হয় তার উপদেশ এবং কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন, তোমার এই কাজ। আমার কাছে টাকা খেয়ে অন্য পার্টির হয়ে আমারই দেয়ালে শ্লোগান লেখা!

অলক বলল, টাকা রোজকারের জন্য আমি পোস্টার লিখে বেড়াই। আমার কাছে শত্রুমিত্রের বাছবিচার নেই স্যার।

তাবলে আমার দেয়ালে লেখা। এই সবে স্নো-সিম কালার করিয়েছি সখ করে, আর হতভাগা দিলে কোলতার মাখিয়ে।

রাগে এক ঘা কষে বসিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

অলক গোঙাতে গোঙাতে বলল, আপনার দেয়াল বলে বুঝতে পারিনি স্যার।

এবার ভাল করে বোঝ, বলে ভদ্রলোক দুহাতে রাস্তা থেকে অলককে দেয়ালের কাছে টেনে এনে মাথাটা ঠুকে দিলেন।

অনেকক্ষণ প্রায় অচৈতন্য থাকার পর যখন অলক জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল তখন ভোর হয় হয়। সে অতি কষ্টে সবকিছু ফেলে রেখে পায়ে পায়ে সেখান থেকে সরে গেল।

তার পরের ঘটনার সবকিছু আমার জানা নেই। অলকও স্পষ্ট করে আমাকে কিছু বলেনি।

কাজল বলল, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?

সে এক মজার ব্যাপার, শান্তনু বলল।

একসময় আসছিলাম মেট্রোর পাশ দিয়ে। কাঁধে ঝোলান ছিল ক্যামেরাটা। এস্ এন্ ব্যানার্জী রোডটা ক্রস করতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে একটি ছোকরা বলে উঠল, আমার কাছে ক্যামেরার অনেক জিনিস পাবেন স্যার। বিলিতি ফিল্ম থেকে নানা রকমের ক্যামেরা।

তখন ফিল্ম পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া আমার ক্যামেরার জন্যে কয়েকটা ফিলটারেরও দরকার ছিল।

ঘুরে দাঁড়ালাম।

ও আমাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে এল প্রায় কুখ্যাত একটা গলিতে। আমার বেশ ভয় করছিল তখন। ক্যামেরাটা না হাতছাড়া হয়ে যায়। ও আমাকে একটা ভাঙা ঘরের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ঢোকাল।

সুটকেশ খুলে যা দেখাল তা প্রায় রাজার ঐশ্বর্য। দামী দামী ক্যামেরা থেকে পেন, ব্লেড আরও কত কিছু।

পকেটে টাকা ছিল, দুটো ফিলটার দরদস্তুর করে কিনলাম।

চলে আসার সময় ও বলল, আসবেন স্যার আবার, চিনে তো গেলেন। রাস্তায় কেনা বেচা করতে পারি না, আজকাল পুলিশের বড় ধরপাকড়।

মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব নিয়ে গেছি অলকের আস্তানায়। ওরা প্রয়োজন মত জিনিস পেয়েছে ওর কাছে।

একদিন আমাকে একলা পেয়ে ও বলল, দাদা আমাকে একটু ফটোর ব্যাপারটা শিখিয়ে দেবেন? এ কাজ আর পোষাচ্ছে না।

বললাম, এসো আমার বাসায়। যতটুকু জানি বলে দেব।

ও আমার কাছে প্রায়ই আসত। ওকে কাজ শিখিয়ে আমার কিছু সুবিধেই হল। আমার কাজগুলো ও করে দিত অনেক সময়। তারপর যখন অনেকটা শিখে গেল তখন নিজের স্টুডিও করে বসল। আমি কিন্তু একটুও অখুশী হইনি তাতে।

কাজল ফোড়ন কেটে বলল, তুমি মহাপ্রাণ ব্যক্তি।

শান্তনু বলল, নিজের সুবিধের জন্যে অন্যের উন্নতিতে কোনদিন আমাকে বাধা দিতে দেখেছ।

কাজল বলল, সে কথা যাক্, কিন্তু এই যে নষ্টামো, একে তুমি সমর্থন করবে কি করে?

দেখ কাজল, ছেলেটা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখল, আমরা কি তাকে সামান্য একটা চাকরী দিতে পেরেছি? সে সাধারণ ভাবেই তার জীবনটা চেয়েছিল, আকাশের চাঁদ ধরতে চায়নি কোনদিন। আমরা তাকে সেটুকু সুযোগও দিতে পারিনি। আজ অলক বাঁচার তাগিদে স্মাগলিং-এর কারবার শুরু করেছে। ঐ কালো পথে ঘুরতে ঘুরতে তার স্বভাবটার ওপরেও ছায়া পড়েছে। তাই সুযোগ পেলেই সে অন্যায়

করে সমাজের ওপর শোধ তোলার চেষ্টা করে।

কাজল একটা মীমাংসার সূত্র টেনে বলল, দেখ, দুঃখ ক্ষোভ সকলের ভেতরেই আছে। সেখানে শিখা আর অলকে কোন তফাৎই নেই। তাই শিখা সম্বন্ধে তুমি কিছু মন্তব্য করোনা, আমিও এবার থেকে অলকের ব্যাপারে কিছু বলব না।

শান্তনু বলল, এখন ওসব ভারী ভারী কথা ছেড়ে একবার তাকিয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে। অন্ধকারে ফসফরাস কি রকম ঝলমল করে জ্বলে জ্বলে উঠছে।

হাওয়ায় বালি উড়ছিল। কাজল পায়ের পাতা বালিতে ডুবিয়ে বসেছিল। গায়ে উড়ো বালিগুলো শিরশিরে একটা অনুভূতি জাগায়।

কতক্ষণ.ওরা পরস্পরের আঙুল নিয়ে খেলা করল। তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। এখন জলস্থল সবই অন্ধকারের সমুদ্র হয়ে গেছে। একটা একটানা গর্জন এগিয়ে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

গান বেজে উঠল কাজলের গলায়।

'শুধু যাওয়া আসা
শুধু স্রোতে ভাসা
শুধু আলো আঁধারে
কাঁদা হাসা।'

কাজলের কথাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে ঝড়ো হাওয়ার সমুদ্র, কিন্তু সুরেব সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে তার।

গান থামলে শান্তনু ডাকল, কাজল।

কাজল মুখ তুলে শান্তনুর দিকে তাকাল।

জীবনে এমন অনেক আহ্বান আছে যার উত্তর কোন শব্দ উচ্চারণ করে দেওয়া যায় না।

শান্তনু আবার বলল, এই এমনি ডাকছি কাজল। এমনিতে বড় একটা তো ডাকিনা আমরা। প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের ডাকগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন প্রয়োজনগুলো কোথায় যেন পালিয়ে যায়। তখন শুধু নাম ধবে ডাকা। কেবল অপ্রয়োজনের আনন্দটুকু পাবার লোভ।

কাজল শান্তনুর হাতে সামান্য জোরে চাপ দিল। শান্তনু বুঝতে পাবল কি এক অনাস্বাদিত আবেগে কাজলের মনটা আজ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পরের দিন শুরু হল বৃষ্টি। আকাশ জুড়ে ধূসর রঙের ধেনুগুলো গোষ্ঠলীলায় মাতল। আড়ালে থেকে আহিরি মেয়েরা তাদের দোহন করতে লাগল। শত ধারায় ঝরে পড়ল দুধ। পৃথিবীর পাত্রগুলো ভরে উঠল ক্ষণে ক্ষণে। হোটেলে বন্দী কাজল আর শান্তনু। বাইবের জগৎ মুছে গেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

শান্তনু বলল, অসময়ে বৃষ্টি নামল কাজল। ক্ষ্যাপা কালবোশেখী কেবল বালির ঝড় তুলল না, বৃষ্টির ঝড়ও তুলল। এর আসা যাওয়ার খেলাটা বড় আকস্মিক। চমকে দেবার মত।

কাজল বলল, ঠিক তোমার মত। কখন যে ঘরে তোলপাড় কর আবার কখন যে হুট্ কবে বেবিযে যাও তার হদিস মেলা ভার।

শান্তনুর হঠাৎ করে একটি কথা মনে পড়ে গেল। অমনি সে খাট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়ল।

কাজল বলল, কি হল তোমার, এমন করে খাট থেকে নামলে যে?

কি দারুণ মিসই না করতাম। শোন কাজল, সে কথা এখন নয়। বলতো আজ তারিখটা কত ?

বেড়াতে এসে ক্যালেন্ডারের হিসেব কবে কে মনে রাখে।

বেরিয়ে গেল শান্তনু ঝড়ের বেগে ঘর খুলে। দরজাটা কালবোশেখীর দাপটে দু-একবার আছাড় খেল। কাজল তাকে বন্ধ করে দিয়ে এসে ভাবতে বসল ব্যাপাবখানা কি।

প্রায় দুঘণ্টা পরে ঝড়ো কাকের মত বাইরে থেকে ভিজে ফিরল শান্তনু। হাতে প্যাককরা কি একটা বস্তু।

ঘরে ঢুকেই বস্তুটিকে এক কোণায় রেখে শান্তনু বলল, এটির বিষয়ে অশাকরি কাজল দেবী এখন আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন না এবং অকারণ ঔৎসুক্য প্রদর্শনেও বাধা আছে।

কাজল বলল, একটু আগেই বলেছিলাম না, যে তোমার ব্যাপার স্যাপার একেবারে কালবোশেখীর মত।

পোষাক ছেড়ে এবার শান্ত হয়ে বসল শান্তনু। ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রকৃতিতে ঝড়ের চিহ্নমাত্র আর রইল না।

বিকেলে বেড়াতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ওরা, এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

শান্তনু দরজা খুলতেই তিন জোড়া হাতের সশ্রদ্ধ নমস্কারের মুখোমুখি হল।

আপনিই তো লেখক অতনু চৌধুরী?

শান্তনু মথা নাড়ল। কিছুটা বিস্মিত সে। বলল, ওটা কিন্তু আমার আসল নাম নয়। ছদ্মনাম।

দেখুন ঠিকই চিনেছি আপনাকে। কোন কোন পত্রিকায় আপনার ছবিও দেখেছি।

বিব্রত হল শান্তনু।

ওঁদের ভেতর একজন আসল কথাটি পাড়লেন, দেখুন আমরা প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করে থাকি। এবার আমাদের খুবই ভাগ্যের ব্যাপার যে আপনি এসে পড়েছেন। আমাদের এই হোটেলের হলেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। অংশ নিচ্ছেন অনেকেই। এখন পৌরহিত্য করবার ভার আপনার। এ আপনাদেরই অনুষ্ঠান। নিরাশ করতে পারবেন না কিন্তু।

শান্তনু কোনকিছু বলার আগেই অন্যজন কাজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিও যদি কোনকিছুতে অংশ নেন তাহলে খুবই আনন্দ পাব।

শান্তনু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, সব শেষে আমার জন্যে কিছু সময় রেখে দেবেন।

আপনার যতক্ষণ খুশি বলবেন। সময়ের অভাব কি।

আগামীকালই পঁচিশে বৈশাখের সেই মহালগ্ন। অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়।

পরদিন ভোরবেলা উঠেই শান্তনু জোর করে কাজলকে নূতন একখানা শাড়ি পরালে। তারপর গতদিনের আনা প্যাকিং করা বস্তুটির কাগজ খুলে বের করল একটি মূর্তি। মন্দিরাবাদিনী নৃত্যের ভঙ্গীতে মন্দিরায় ঘা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাজল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কি সুন্দর। এ মূর্তি তুমি কোথায় পেলে?

আজ তোমারও জন্মদিন কাজল। এ কথা তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। উড়িষ্যার একজন শ্রেষ্ঠ কারিগর ভুবনেশ্বর মহাপাত্র। তাঁকে পুরীতে এসেই অর্ডার দিয়েছিলাম এ মূর্তি। এ তোমার জন্ম দিনের উপহার।

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কাজলের।

শান্তনু কাজলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুমি আজ কাঁদছ কাজল!

বৃষ্টিভেজা মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজল মাথা নেড়ে জানাল সে কাঁদেনি।

শান্তনু তবুও বলল, তোমার চোখের জল দেখে সত্যি আজ বড় দুঃখ পেলাম।

কাজল বলল, সব কান্না যে দুঃখের নয় সে কথা কি বলে দিতে হবে লেখক মশাইকে।

এবার ওরা মূর্তিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এমন লীলায়িত ভঙ্গী আর মধুর হাসির সমাবেশ ঘটেছে মূর্তির ভেতর যে একে কিছুতেই নিষ্প্রাণ পাথরের সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যায় না।

শান্তনু বলল, তোমার কথা মনে রেখেই এই বিশেষ মূর্তিটি খোদাই করিয়েছি।

কাজল বলল, আমার কিন্তু এখন বড় কষ্ট হচ্ছে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে।

শান্তনুর চোখে প্রশ্ন।

কাজল বলে চলল, কতদিন নাচের অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মধ্যে কেবল তোমার আনন্দের জন্যে গান গাওয়া। ঐ মূর্তির ভেতর যে আনন্দের মুদ্রাটি ফুটে উঠেছে, আমার সারা মন কেঁদে উঠছে

তাকে ফোটাবার জন্যে।

শান্তনু বলল, আমি তো কতবার তোমাকে নাচের অভ্যেসটা রাখার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছি।

কাজল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে হয় না আর। তার চেয়ে গানই ভাল। পথে ঘাটে, গাছতলায় গেয়ে ওঠা যায় প্রাণের খুশী আর মনের দুঃখে।

সন্ধ্যায় বাঁধান সুসজ্জিত মঞ্চে সভা বসেছে।

মঞ্চের নীচে হলঘরের দুদিকে দুসারি চেয়ার। একদিকে বসেছেন মহিলারা, অন্যদিকে পুরুষেরা।

কতকগুলি সুনির্বাচিত আবৃত্তি ও সংগীত হল। দু একটি তরুণী গানের সঙ্গে নাচও পরিবেশন করল। দু একজন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানামুখী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করলেন যে স্মরণকালের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি তাবৎ বিশ্বে।

শেষে সভাপতির ভাষণ।

উঠে দাঁড়াল শান্তনু।

গুরুদেবের 'আবেদন' কবিতায় মহারানী রাজরাজেশ্বরী আর দীন এক ভৃত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সভাভঙ্গ হল যখন মহারানীর সেবকবৃন্দ তাঁর আজ্ঞা বহন করে জয়শঙ্খ সগর্বে বাজিয়ে বিশ্বরাজ্য পরিক্রমায় চলল তখন মহারানীর কাছে এসে হাজির হল তাঁর সর্বাধম ভৃত্য। বলল, 'জয়হোক মহারানী, রাজরাজেশ্বরী, দীন ভৃত্যে করো দয়া।'

রানী বললেন, সবাই যখন সব কাজ নিয়ে চলে গেল তখন 'ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কর, কী কাজে লাগিবি?'

ভৃত্য বলল, 'অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। ....
নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।'

আজকের অনুষ্ঠানে ভূমিকা আমার সেই মালাকরের। এখানে মহারানীর পরিবর্তে রয়েছেন স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট। আজ তাঁরই উদ্যানের ফুলে মালা গেঁথে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চাই। তাঁর গানের কুসুম চয়ন করে তাঁরই দেওয়া কথার সূতোয় সে মালা গাঁথব এই সাধ। আজ হাজার ফুলের বাগান থেকে কে আমাকে সাজি ভরে ফুল তুলে এনে দেবে! আমার যে আজ মালিনীকে বড় বেশি দরকার। সে মালিনী কি এখানে আছে যে আমাকে গানের কুসুম যোগাবে?

শান্তনু কথা থামিয়ে নীচে যেখানে মেয়েরা বসে আছেন সেদিকে তাকাল। হঠাৎ সবাই দেখল তারই ভেতর একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। বিষ্ণুপুরী গরদের লালপাড় শাড়িপরা। গায়ে একটি উত্তরীয়। প্রান্তে বাটিকের কাজ। মেয়েটির কপালে সুচিত্রিত একটি চন্দনের তিলক।

পায়ে পায়ে মেয়েটি এগিয়ে এল মঞ্চের দিকে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠল স্টেজের ওপর। ততক্ষণে আসন নিয়েছে শান্তনু। মেয়েটি এসে বসল তার পাশে। হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শুরু করল গান। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র গান। এক একটি গান শেষ হয়, আর অমনি শুরু হয় শান্তনুর কথা। শ্রীমতী রাধার আকুল বিরহের অপরূপ এক আলেখ্য রচিত হয় কথা আর গানে।

এক সময় শেষ হয় অনুষ্ঠান। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত আনন্দধ্বনি অভিনন্দিত করে কথক আর গায়িকাকে। যে নাটকীয় ভঙ্গীতে শান্তনুর আবাহন আর কাজলের মঞ্চে প্রবেশ তা দর্শকদের অভিভূত করে রেখেছিল বহুক্ষণ। ওদের ভেতর বহুজনেই জানত না কাজল আর শান্তনুর আসল সম্পর্কটা কি।

এরপর মালাকর আর মালিনী সমুদ্রের মায়া ছেড়ে চলে এল কোনারকের মন্দিরে। গভর্নমেন্ট রেস্টহাউসে থাকল কয়েকদিন। এখানে থেকে অতনু চৌধুরী হল ফটোগ্রাফার শান্তনু চৌধুরী। ভোরের আকাশে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত শান্তনুর ছবি নেওয়ার কাজ। সূর্যের আকাশপট থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে শেষ হত তার দিনের কাজ। কোনারক মন্দিরে এমন সব মূর্তি আর প্যানেল আছে যা না তুললে, শান্তনুর মত, ফটোগ্রাফার জীবনে কোন সান্ত্বনাই নেই।

কাজলের মেহনতও কম নয়। বড় বড় মূর্তির পাশে তাকে দাঁড়তে হয় সেই ভঙ্গীর অনুকরণে।
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজল বলে, আর পারিনে বাপু।
শান্তনুর কেবলই অনুনয়—আর একটু কষ্ট করে দাঁড়াও।
কাজল হেসে বলে, ওখানে তো ছিলাম মালাকরের মালিনী, এখানে আমার পরিচয়টা বলে দেবে কি?
শান্তনু বলে, শিল্পীর মডেল।
কাজল হাত পাতে, চুকিয়ে দাও আমার পাওনা। মোফতে হয় না মশাই।
শান্তনু বলে, কোন একটা বড় পার্টির বিজ্ঞাপন হয়ে তুমি শোরুম, সংবাদপত্রের শোভাবর্ধন করবে, সেটা কি কম?
তুমি তো আর বিনি পয়সায় ছবিগুলো তুলে দেবেনা পার্টির হাতে।
শান্তনু বলল, যা পাই তা তো দেবীর করপদ্মে এনে তুলে দিই।
কাজল হেসে বলে, তোমার দেওয়াটা কিরকম জানো, সেই 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় দেবযানীর উক্তির মত,

'তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ।'

কথা বলতে বলতে রোদ চড়লে ওরা মন্দির সংলগ্ন গাছতলায় বিশ্রাম করে। মন্দিরের ওপরে সংস্কারের কাজ চলছিল পুরোদমে। ওপরে ওঠা ছিল যে কোন দর্শনার্থীর ক্ষেত্রে বারণ। কিন্তু শান্তনুদের ক্ষেত্রে যত বাধা তত বাধা ভাঙার উদ্যম। যে কোন রকমে কাজ আদায় করে নেওয়াই তার কাজ। সে প্রথম দু দিন নিচের থেকে যা কিছু তোলা যায়, তাই তুলে বেড়াল। এদিকে খোঁজ নিয়ে জেনে নিল কাজের তদারকী অফিসারটি কোনসময় কাজের কাছে হাজির থাকেন। এক সময় তাঁকে আসতে দেখেই প্রেস ফটোগ্রাফারের কায়দায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটল শান্তনু। অনুরোধ জানাল, একমিনিট থেমে যেতে। তৃতীয় শ্রেণীর অফিসারটির বুঝতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল যে তিনি একজন কেউকেটা।
ততক্ষণে এদিক ওদিক থেকে শান্তনু সেই মহামান্য ব্যক্তির দু তিনটি সট নিয়ে নিয়েছে।
তারপবের পালা ঠিকানা নেবার। ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাঁর ঠিকানা জেনে নিয়ে নিজের ডায়েরীতে লিখে নিতে নিতে শান্তনু বলল, কলকাতা থেকে ওয়াশ করে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব। এত ছবি নিলাম কোনারকের আর আপনার একখানা ছবি থাকবেনা, সে কি হয়। মন্দির সংস্কারের কাজ যারা করছে, মন্দিরের সঙ্গে তাদেরও ছবি নিয়েছি আমি। মন্দিরকে আপনারা যাঁরা সংস্কার করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁরা মন্দিরেরই অঙ্গ বলে আমি মনে করি।
এরপর ভদ্রলোক শান্তনুকে চা আর কাজলকে ডাব খাওয়ালেন।
শান্তনু এবার আসল কথাটা পাড়ল, দেখুন স্যার মন্দিরের ওপরের মূর্তিগুলো এবার আর নেওয়া হল না।
ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, কেন নয়?
সরকারী বারনের নোটিশ যে আপনারা লটকে রেখেছেন।
হা হা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।
ওসব কি আপনার জন্যে নাকি। চলুন আমার সঙ্গে।
ভদ্রলোক কাজলকে ওপরে উঠতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।
ওরা অনেক ওপরে উঠে মুরলীবাদিনী, মৃদঙ্গবাদিনী মূর্তিগুলোকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল।
লোকগুলো ভাড়া বেঁধে কাজ করছিল। মোটা কাছি দিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কোমার বাঁধা।
কাজলকে মৃদঙ্গবাদিনী মূর্তির পাশে এক বিশেষ মুদ্রায় দাঁড় করিয়ে রেখে শান্তনু এক লাফ দিয়েই উঠে পড়ল বাঁশের ভারায়। কাজলের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। কাজ করছিল যে লোকগুলো তারা তো অবাক। শান্তনু কোনরকমে ভারায় দাঁড়িয়ে ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ লাগাল।

একটু হাসি কাজল, বড্ড গোমড়া হয়ে যাচ্ছ।

যত তাড়াতাড়ি ওর কথা শোনা যায় ততই মঙ্গল। কাজল একটা কৃত্রিম হাসি টানল মুখে। চোখ দুটো ক্ষোভে দুঃখে ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

ঘুরে ঘুরে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে বেশ কয়েকখানা মূর্তির ফটো নিল শান্তনু।

নিচে নেমে এলে ভদ্রলোক বললেন, কি ভয়ঙ্কর লোক মশাই আপনি। আমাকে এখুনি জেলে পাঠাতেন। এমন রিস্ক নিয়ে কেউ কখনো ফটো তোলে।

শান্তনু হেসে বলল, আপনি আমাকে চা খাইয়েছেন, আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত ওপরে উঠতে সাহায্য করেছেন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে পারি।

ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন, আপনার কথায় ভরসা পাচ্ছি না মশাই।

শান্তনু অভয় দিয়ে বলল, ভয় পাবেন না, এই আমাদের কাজ। বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও আমাদের ভয় পাবার জো নেই। বলতে হয়, এক সেকেন্ড স্যার, হাঁ হাঁ ঐ রকম 'হাঁ' করেই থাকুন।

ক্লিক্, ব্যস্।

কাজল হাসবে কি কাঁদবে বুঝে পেল না। তার পাখির মত বুকখানা তখনও ওঠাপড়া করছিল।

আর একটি দিনও বেশি নয়। এখানে থাকা মানে আরও কত বিপদের ঝুঁকি যে মাথায় নেওয়া। কাজল প্রায় তাড়া দিয়েই শান্তনুকে কোনারক ছাড়া করল।

আবার কলকাতা। কয়েকটা দিন রোদের সোনা ডানায় মেখে যে পাখিগুলো ওদের আকাশে উড়ে এসেছিল, তারা আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। তাদের অদৃশ্য ডানার আলপনাগুলো কিন্তু ওদের মন থেকে মুছে গেল না।

সেদিন সকাল সকাল ঘরে ফিরে এসে শান্তনু দেখল টেবিলের ওপর একখানা রেজিস্ট্রি পার্শেল পড়ে আছে। নেড়ে চেড়ে দেখল, নিখিলেশ পার্শেলটা পাঠিয়েছে। শান্তনু আর নিখিলেশ প্রায় একই সঙ্গে প্রেস ফটোগ্রাফির কাজ শুরু করেছিল? তারা ছিল অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। নিউজ এডিটর শান্তনুকে একা দেখলেই বলতেন, মানিকজোড়ের অন্যটি কোথায়?

শান্তনু উত্তর দিত, উড়ে গেছে স্যার।

সত্যিই একদিন মানিক জোড়ের অন্যতম নিখিলেশ উড়ল হাওয়াই রথে বিদেশে। এক সংবাদ সংস্থায় ফটোগ্রাফার কাম রিপোর্টারের কাজ নিয়ে। সেখান থেকে সে প্রায়ই চিঠি পাঠায় শান্তনুকে। আজ এখানে কাল ওখানে। এক দুর্গম অভিযাত্রীর জীবন যেন নিখিলেশের।

শান্তনু পার্শেলটা খুলল। কয়েকখানা ফটো, সঙ্গে একখানা চিঠি, আর কবিতা।

শান্তনু।

এখন যেখানে বসে তোকে চিঠি লিখছি সেটার চারদিকে খানিক আগে বেশ কয়েকখানা প্লেন হেভি বম্বিং করে গেছে। আমি একটা চষা ক্ষেতের আলের আড়ালে শুয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েছি। এখন চারদিক নিস্তব্ধ। একটু আগে প্রলয় হয়ে গেছে। রাক্ষসদের প্রাণ-ভোম্‌রাটাকে টিপে মারার পর রূপকথার হাজার হাজার রাক্ষস যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে আর্ত চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিয়েছিল এ ঠিক তাই। না, বুঝি তার চেয়েও বেশি।

আগুন জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি। বেলা শেষের আর বাকি নেই। দূরে আগুনের পাশ দিয়ে ছায়ামূর্তিব মত কারা সব ছুটোছুটি করছে। আহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পথে কোন গাড়ি নেই। শহরের সঙ্গে সংযোগের এই একটিমাত্র পথ জায়গায় জায়গায় ভেঙে গভীব গর্তের সৃষ্টি করেছে। দূর থেকে গর্তগুলো দেখা যাচ্ছে।

আমার একটু দূরে একটি মেয়ে ক্ষেতের ওপর শুয়ে পড়ে আছে। আমি তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি। এক হাত তার রাইফেল ছুঁয়ে আছে বুকের ওপর, অন্য হাতটি কপালের ওপর রাখা। এখন হাওয়া বইছে এলোমেলো। লক্‌লকে আগুনের শিখাগুলো সাপের মত এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে চলেছে। গাছের ডালগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে পাতাপত্তর সমেত। মেয়েটার চুলগুলো

কপালের পাশে উড়ছে। সবে যেন মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু ডাকেই চমকে উঠে দাঁড়াবে রাইফেলটা নিয়ে।

ও আমার সঙ্গে কথা বলছিল কিছু আগে। এই ক্ষেতটার পাশেই চলছিল ওদের নারীবাহিনীর সমর শিক্ষা। সবাই চলে গিয়েছিল দূরের ঐ ক্যাম্পে। ও ছিল ডিউটিতে। এমন সময় শোনা গেল সাইরেণের কাঁপা কাঁপা আওয়াজ। আমি পথ থেকে ছুটে আসছিলাম এই ক্ষেত লক্ষ্য করে।

মেয়েটি আমাকে আলের ধারে বসে পড়তে ইসারা করল।

আমি তাই করলাম। নির্বিকার মেয়েটা দেখলাম বসে বসে আখ চিবুচ্ছে। পাশে পড়ে রাইফেল। আমার দিকে এক টুকরো আঁখ ছুঁড়ে দিয়ে বলল, চিবোও, দেখ আমাদের মাটির আঁখ কত মিষ্টি।

বললাম, তোমরা মাটিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাস, তাই মাটি তোমাদের এমন মিষ্টি উপহার দিয়েছে।

ও আখ চিবুতে চিবুতেই বলল, জান কাল আমি আমার প্রেমিকের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। আজ অবধি চিঠিখানা পড়বার ফুরসৎ পাইনি।

বললাম, একটুকরো চিঠি পড়ার সময়টুকুও পাওনি।

বিশ্বাস কর, মেয়েটি বলল।

বলতে বলতে সে আখের টুকরো মাটিতে ফেলে বুকের জামায় হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করল।

আমি দেখলাম, ও এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে গেল।

হঠাৎ দেখলাম, চিঠিখানা ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে হাওয়ায় চরকির মত উড়ে উড়ে চলেছে।

ওদিকে ওর খেয়ালই নেই। বাঁ হাতখানা দিয়ে ও তার মুখখানা ঢাকলে।

আমি কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সব শেষ হয়ে গেছে।

বললাম, নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ কিছু আছে।

বলল, চিঠিখানা পথের পাশে ডাকে ফেলে দিয়েছিল বলে দেরীতে হলেও পেলাম। ও লিখেছে, ওদের গেরিলা বাহিনীকে চারদিক থেকে শত্রুরা ঘিবে ফেলেছে। ওরা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত। তবে এমন সব মাবণাস্ত্র নিয়ে শত্রুরা এগোচ্ছে যে ওদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। ওরা স্থির করেছে, শেষ হয়ে যাবার আগে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব শত্রুদের শেষ করে ফেলা।

ওকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। আর এও জানি মামুলি সান্ত্বনার কথা বড় কৃত্রিম হয়ে পড়বে।

শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর সেই মুহূর্তে কোটি কোটি ভোমরার আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল প্লেনগুলো। শুরু হয়ে গেল বম্‌বিং। আমি বম্‌বিং-এর সময়ের সাধারণ নিয়ম মেনে শুয়ে পড়লাম উঁচু আলটার আড়ালে। ওর দিকে তখন তাকানোর সময় বা অবস্থা আমার ছিল না। কেবলই দূরে কাছে গোলাগুলি ফাটার শব্দ শুনতে পেলাম।

প্লেনগুলো চলে গেলে আমি উঠে বসলাম। তাকালাম মেয়েটির দিকে। মনে হল ও হাঁটু গেড়ে প্রণামের ভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ ওকে নড়তে না দেখে কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিলাম। ও মাটিতে ঢলে পড়ল। গুলি লেগে ওর বুক আর পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমি ওকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। একটু আগে যে মাটিতে ও প্রণামের ভঙ্গীতে পড়েছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ওর প্রেমিকের চিঠিখানা ওর হাতের মুঠোয়। তবে কি উড়ে যাওয়া চিঠিখানা ও ধরতে গিয়েছিল!

আমি ওর দু তিনটে ছবি নিয়েছি। এই চিঠির সঙ্গে সম্ভব হলে তোকে তা পাঠিয়ে দেব। আজ এই পর্যন্ত।

নিখিলেশ।

ভিয়েৎনামে বর্বরতার কয়েকখানা ছবির সঙ্গে মেয়েটির একখানা ছবিও পাঠিয়েছে নিখিলেশ। শুয়ে আছে মেয়েটি, পাশে রাইফেল।

শান্তনুর আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল মেয়েটির মুখ। যন্ত্রণার কোন ছাপ ছিল না। মনে হচ্ছিল, সে যেন পরম তৃপ্তিতে মাটির ওপর শুয়ে গভীর আবেগে তার প্রেমিকের চিঠিখানা সবার কাছ থেকে আড়াল করে পড়ছে।

শান্তনু ডাকতে লাগল কাজলকে। গলাটা সত্যিই তার ভারী হয়ে উঠেছে।

কাজল রান্না ফেলে চলে এল।

কি হল তোমার, এমন করে ডাকছ কেন? পার্শেলটাই বা কার?

শান্তনু কাজলের হাতে এগিয়ে দিল নিখিলেশের চিঠি।

কাজল চিঠি পড়া শেষ করে তাকাল শান্তনুর দিকে। চোখটা তার জলে ভরে গেছে। সে শান্তনুর কাছে সরে এসে তার একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের মনের আবেগকে সামলাতে লাগল।

শান্তনু বলল, কাজল, মেয়েটির ভাগ্য ঈর্ষা করার মত। দুজন দুজনকে ভালবাসে, আবার দুজনের ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে তার দেশের মাটির ওপর। কি আশ্চর্য মৃত্যু মেয়েটির। দেখ, এত দূরে থেকেও আমাদের মাথা আপনি নত হয়ে এসেছে।

কাজল বলল, আমি ভাবতে পারছি না। আরও কত মেয়ে পুরুষেই না এমনি সব অতৃপ্ত ইচ্ছা বুকে নিয়ে মারা যাচ্ছে দেশের কাজে।

শান্তনু বলল, এমনি করে একটা জাতি জাগে কাজল। আমার সব চেয়ে প্রিয় বস্তুটিকে যদি আমি দেশের জন্য ত্যাগ করতে পারি তবেই সে দেশের মানুষ হিসেবে আমার বেঁচে থাকবার অধিকার।

একটু থামল শান্তনু। একটা অনিবার্য আবেগে সে তার কথা বলার শক্তিটুকুকে হারিয়ে ফেলল।

কিছু পরে আবার শান্তনু বলল, নিখিলেশ ভাগ্যবান কাজল। সে জীবনকে দেখছে, মৃত্যুকে চিনেছে। একজন রিপোর্টার, ফটোগ্রাফারের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া কি হতে পারে।

কাজল বলল, দুঃখ কর না তুমি, সকলের জীবনে সব জিনিস তো আর ঘটে ওঠে না। যা আছে তাই নিয়েই কিছুটা সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

শান্তনু এবার অশান্ত হল। ক্ষোভের সঙ্গে সে বলে উঠল, দেখ, কি জীবনই না এখন কাটাতে হচ্ছে আমাদের। অমুক ভি, আই, পি আসছেন, ছোট বিমানবন্দরে। তাঁর মুখের হাসিটুকুর জন্যে ওৎ পেতে থাক। একেবারে তৈরি করা মাপা হাসিটুকু।

অমুক মন্ত্রীবর হলকর্ষণ উৎসবে লাঙলে হাত লাগালেন, অমনি তোল তাঁর ছবি।

অমুক ব্যক্তি কোন একটা রিলিফ ফাণ্ডে দান করছেন পাঁচহাজার এক টাকা, তোল তাঁর ছবি। তিনি চেক্‌টি যাঁকে দিচ্ছেন তাঁর দিকে দৃষ্টি নেই, মুখখানি তাঁর ক্যামেরার দিকে ফেরানো।

এইসব বানানো সাজানো কৃত্রিম মুখগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখতে কি পরিমাণ কষ্ট, সে তো আমি বুঝি কাজল। বিশ্বাস কর, এক এক সময় মনে হয় ক্যামেরাটার যদি মর্ম ভেদ করার মত এক্সরে আই থাকত তাহলে ওদের বাইরের ভণ্ডামীগুলো ভেদ করে আসল চেহারাটা তুলে নিতে পারতাম।

শান্তনু এবার কয়েকটা ছবি হাতে তুলে দেখতে লাগল। নিখিলেশ শ্বাসরোধকারী কয়েকখানা ছবি তুলেছে। কি কৌশলে যে সে এই ছবিগুলো তুলেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

একটা মানুষের পা দুটোকে উঁচু করে তুলে ধরে, গলা সমেত মাথাটাকে জলে চোবান হচ্ছে। গোপন কথা আদায়ের চেষ্টা।

আবার অন্য ছবিতে একজন উত্তর ভিয়েৎনামের মানুষকে মটিতে চেপে ধরা হয়েছে। তার মুখ বেয়নেটের খোঁচায় রক্তাক্ত। কথা আদায়ের শেষ চেষ্টা হিসেবে তার উদরে আধখানা ছুরি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষটার মুখে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই। একটা পাথরের মূর্তি যেন নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে।

ছ'সাত বছরের একটি মেয়ে। দারুণ ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে। তাব বাবাকে সামনে শুইয়ে গলার ওপর একটা বাঁশ দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে। চোখ দুটো ঠেলে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।

কাজল বলল, আর দেখতে পারছিনা ছবিগুলো।

শান্তনু বলল, শুধু এই নয় কাজল, সারা ভিয়েৎনাম জুড়ে এমনি সহস্র ছবি ছড়িয়ে আছে। আগুনে

পুড়ে একটা জাতি কিভাব নিখাদ সোনায় রূপ নিচ্ছে, তার ভাস্বর উদাহরণ হল ভিয়েৎনাম।

এবার নিখিলেশের পাঠান কবিতাটি পড়তে লাগল শান্তনু।

এখন প্রেমের অশ্রু নয়
তোমার চোখের থেকে কখন মুছে গেছে
ভালবাসার দুফোঁটা জল,
সেখানে কাঁপছে স্ফুলিঙ্গ।
শুকনো পাতা উড়ছে আকাশ ছেয়ে
কন্যা, তোমার চোখের আগুনে জ্বালাও তাদের।
জ্বলুক আকাশ
জ্বলুক বাতাস
জ্বলুক ঐ ছেঁড়াপাতার রাশ।
সব জ্বলার শেষে
ফেল তোমার চোখের দুফোঁটা জল,
হাজার ফুল ফুটে উঠবে কন্যা,
তোমার ঐ মরা গাছের ডালে ডালে।

কবিতাটি নিখিলেশ লিখেছে। ও নিজেকে একজন সাচ্চা ভিয়েৎনামী বলে ভেবে নিয়েছে। শান্তনুর মনে হল, নিখিলেশ যেন এক প্রেমিক। সে তার মুক্তি যুদ্ধরত প্রেমিকার উদ্দেশ্যে এই কাবিতাটি লিখেছে।

কাজের ভেতরেও কদিন ভারী হয়ে রইল শান্তনুর মন। তারপর আস্তে আস্তে সে ভাব কেটে গেল। নিজের কাজে এখন শ্রীমান শান্তনু চৌধুরী মশগুল।

লেখার ভূতটা শান্তনুর ঘাড়ে চেপেছিল অনেকদিন আগে। দু-একখানা বইও ইতিমধ্যে বেরিয়েছে তার। বিক্রি হয়েছে যত কম, প্রশংসা হয়েছে তত বেশি। তার চেয়েও প্রকাশক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার অনেক বেশি।

এক বন্ধু শান্তনুকে এক অখ্যাত প্রকাশকের কাছে নিযে গিয়েছিল। প্রকাশক ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, ছাপতে পারি, কারণ আমার হাতে এখন খুব বেশি পাণ্ডুলিপি নেই।

শান্তনু ভদ্রলোকের কথা শুনে মুগ্ধ বিগলিত।

একটু পরে আসল রহস্য প্রকাশ পেল। প্রকাশক বললেন, নাম নেই আপনার, বই বিক্রির ঘরে শূন্য। তাই আগে নাম করা লেখকের নামে চালাতে হবে আপনার বই। দুপয়সা আমারও আসবে, আপনারও। তখন দেখবেন লেখায় কোটালের বান ডেকেছে। খালি পেটে কতক্ষণ ডন বৈঠক চলে মশাই। ও তো কেবল ছুঁচোতেই ডন মারে।

শান্তনু বলল, নাম ভাঙাতে পারব না মশাই। অন্যের নামে নিজের বই বলে চালাব, অসম্ভব।

তাহলে দণ্ডকারণ্যে চবে বেড়ান। নিজেব গাঁটের পয়সা দণ্ড দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ ছাপান। কিছু বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিন, আর বাকীটা রাখুন ঘরে পোষা উই আর ইঁদুরের জন্যে।

শান্তনু কিন্তু বাগ করল না। ভদ্রলোকের কথায় ভারী কৌতুক বোধ হল তার। সে বলল, আপমার তো দারুণ অভিজ্ঞতা মশাই।

উপহাস করছেন। ভাবছেন লোকটা ঠক জোচ্চোর। বলি, কে নয় মশাই। সব কত্তাদের হাঁড়ির খবর রাখে এ শর্মা।

শান্তনু বলল, কি বকম?

কি রকম? সে কি এক রকম, সহস্র রকম ঠকবাজী।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, অনেক রহস্য মশাই, অনেক রহস্য।

এডিসন বহস্য, অশ্লীল রহস্য, ঢক্কা নিনাদ রহস্য, আরও কত বলব।

শান্তনুর বন্ধু বলল, ব্যাখ্যা করে বলুন যুধিষ্ঠিরবাবু।

প্রকাশকের নাম যুধিষ্ঠির সৎপথী।

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, একদিনে কোন কোন লেখকের বই-এর দুটো করেও এডিসন হয়েছে, তা জানেন?

বিজ্ঞাপনে দেখেছি।

কেমন করে হয় মশাই?

শান্তনু বলল, এ আর এমন কথা কি। ক্রেতা কোন্ খাবার কতটুকু কিনবে তা দোকানদার আগেভাগেই জানে, তাই আগাম স্টক রাখে। প্রকাশকদের বেলাতেও ঠিক তাই। এক এডিসনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এডিসন তাঁরা তৈরি করে রাখেন।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে জানেন দেখছি। তবে এতই যখন জানেন তখন এও জানেন যে পঞ্চাশ, একশোখানা বই-এর পর পর টাইটেল পেজ পাল্‌টে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি এডিসন লেখা হয়।

শান্তনু বলল, এটা আপনার বাড়াবাড়ি।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার কথা শিরোধার্য! খ্যাতনামা লেখকদের নামচুরি করি যখন তখন আমি জোচ্চোর, কিন্তু এডিসনের খেলা দেখিয়ে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করে পকেট মারে যারা সংগোপনে তারা গাঁটকাটা পকেটমার নয় কেন, বুঝিয়ে বলবেন?

শান্তনুর বন্ধু হেসে বলল, কমপক্ষে কত বই হলে সংস্করণ হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সুতরাং কেউ যদি ব্যবসায়ের খাতিরে কম ছেপে ছেপে এডিসন বাড়ায় তাহলে বলবার কিছু নেই।

যুধিষ্ঠির বাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শান্তনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ঐ অশ্লীলতা রহস্য আর ঢক্কা নিনাদ রহস্যটা কি তা জানতে ইচ্ছে করে।

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, বইখানাকে অশ্লীল ছাপ দিতে পারলেই পোয়াবার। একটা লোক খাড়া করুন, যে আপনার নামে কোর্টে কেস ঠুকবে, অশ্লীল বই-এর লেখক বলে। তারপর সংবাদপত্রে কিছু চিঠি চালাচালি। স্বপক্ষে বিপক্ষে দুপক্ষেই ছাপবেন, নইলে পত্রযুদ্ধ জমবে না। ঐ চিঠির টানে বাইরের মানুষেরও দুদশখানা উড়ো চিঠি এসে পড়বে। আসরটা একবার যদি জমিয়ে নিতে পারেন তাহলে বাজিমাৎ। প্রকাশক তিনটাকার বই বিক্রি করবেন ব্ল্যাকে তেরো টাকায়।

হেসে বলল শান্তনু, তোরো টাকা কেন যুধিষ্ঠিরবাবু?

তিন টাকা তো হক্। বাকী দশটাকা কালাচাঁদ। তার কদর অনেক বেশি।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, আর ঢক্কা নিনাদ রহস্য। এটা ঠিক রহস্য সিরিজের ভেতর পড়ে না।

ধরুন, বহুল প্রচারিত একখানা কাগজ একটি লেখককে তুলে ধরতে মনস্থ করল।

শান্তনু অমনি বলল, লেখকের ক্ষমতা না থাকলে তাকে তুলে ধরবে!

আরে মশায় হয়, যুধিষ্ঠিরবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, নিজের ভাই বেরাদর হওয়া চাই। পত্রপত্রিকার মালিকের হৃদয় কুটরীতে সুড়ঙ্গ কেটে প্রবেশের পথ জানা চাই লেখকের।

তারপর?

তারপর আর কি, কাগজে শ্লীল অশ্লীল, যা খুশি ছড়িয়ে যান, আপনার রথযাত্রা ঠেকায় কে।

শান্তনু বলল, পাঠককে এত বোকা ভাবছেন কেন আপনি? তারাও আসল জিনিস চিনে নিতে জানে।

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, সব পাঠক যদি আসল মেকি ধরতে পারত তাহলে এই শর্মাকে কোন্ কালে কৌপিন নিয়ে বৈকুণ্ঠবাসী হতে হত।

শান্তনুর বন্ধু বলল, সে কথা ঠিক।

যুধিষ্ঠিরবাবু বলতে লাগলেন, কোন একজন লেখকের লেখা পাঠকের রুচিতে খারাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে যখন দিনের পর দিন দেখে যে পত্রিকাগুলো ঐ লেখককেই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের শিরোপা পরাচ্ছে, তখন তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিচারে তারই ভুল হচ্ছে। সে হয়তো যুগের

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না।

হেসে বলল শান্তনু, তা কি হয় নাকি, মানুষের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি বলে কি কিছু নেই?

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, আছে, কি রকম জানেন, সেই সংস্কৃত গল্পের বামুনের মত। বেচারা খাবে বলে ছাগলটিকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনটে ঠকের আব সহ্য হল না। তারা বামুনের চলার পথে কিছু দূবে দূবে দাঁড়িয়ে বইল। প্রথম ঠকের কাছে আসামাত্র সে বলে উঠল, আরে একি হল, ঠাকুরমশাই কুকুর কাঁধে নিয়ে চলেছেন!

বামুন মহাক্ষোভে তার দিকে এক দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে চলে গেল। লোকটা বলে কি! পাগল নাকি!

পরে দ্বিতীয় ঠকের কাছে আসতেই সেও ঐ একই কথা বলল।

কুকুর কাঁধে নিয়ে চলেছেন ঠাকুরমশাই? কি কাণ্ড!

এবার ঠাকুরমশায় সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে কাঁধের ছাগলটাকে মাটিতে ফেলে ভাল করে দেখতে লাগলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চললেন।

শেষে তৃতীয় ঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঠাকুরমশাইকে দেখে সে আঁৎকে উঠল, কলিকালে এ দেখছি কি, প্রণম্য ব্রাহ্মণ পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন কুকুর!

এরপর ছাগলকে কোন্ পাগলে ছাগল ভাবতে পারে বলুন। বামুন জলজ্যান্ত ছাগলটাকে কুকুর বলে পথের ধারে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তার কোন সংশয়ই আর রইল না যে ওটি যথার্থই একটি সারমেয়।

বারবার একটা জিনিসকে যদি কেউ ভাল বলে বলতে থাকে, তাহলে তাকে মন্দ ভাবতে গেলেই বিপদ। কিছুদিন পরে মনে হবে, নিজের মাথাটা ঠিক আছে তো!

শান্তনু আর কথা বাড়াল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, ধন্যবাদ। আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন. আমি কিন্তু পরের নামে বই ছাপতে পারব না।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন, সংসার প্রতিপালনেব অন্য ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে মশাই-এর। নইলে আমার ঘরেই বইটা দিয়ে যেতেন।

পথে চলতে চলতে যুধিষ্ঠিরবাবুর কথাগুলো সেদিন বারবার বেজে উঠছিল শান্তনুর কানে। তার মনে হচ্ছিল, লোকটা একেবারেই অসৎ।

নিজে কালো চশমা পরে সবকিছুকে কালো দেখে বেড়াচ্ছে।

কথাটা বলতেই শান্তনুর বন্ধু সেদিন বলেছিল, ওটা একটা চোর সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও মিথ্যে নয় যে চোরেবাই চোর ধরতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকতেই কাজল বলল, এমন সুমতি হয়েছে ছেলের, না জানি কবে আবাব সাধুবাবা হয়ে যায়।

শান্তনু কাঁধ থেকে ক্যামেরাখানা কাজলের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলল, সাধুবাবা হলে কি আর ঘরে ফিরতাম, বনবাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম।

কাজল বলল, সত্যি করে বল দেখি এত সকাল সকাল ঘরে ফেরার কারণটা কি? নিশ্চয়ই ঘবের টানে নয়।

শান্তনু দুহাতের করতল পেতে বলল, যাব্বাবা, ঘরে ফিরলেও যদি বাইরের টানে ফিরি তাহলে তো বাইরেই থাকতে হয় সারাদিন। তবু যদি কেউ ভাবে যে বাইরে থেকে আমি ঘরের কথাই ভাবছি।

কাজল বলল, থামো বাক্যবাগীশ, এখন বল দেখি কি খাবে? রান্নার অনেক বাকি।

শান্তনুর দুষ্টুমিতে পেয়ে বসল। সে বলল, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, যা ইচ্ছে করব তাই দেবে তো?

কাজল তার দুষ্টুমিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বাতাসে হাতুড়ি ঠোকার ভঙ্গীতে কয়েকটা কীল ছুঁড়ে মারল।

এই খাওযাব তোমাকে। লোভী হ্যাংলা কোথাকার।

শান্তনু ·   লকে ধরতে যাচ্ছিল, কাজল চেঁচিয়ে বলল, খবরদার কাছে এসেছ, কি ক্যামেরা ছুঁড়ে মারব।

শান্তনু বলল, হার মানছি। যে অস্ত্র ছোঁড়াব ভয় দেখালে তাতে একপা এগোয কাব এমন বুকের পাটা।

কাজল বলল, দেখলে তো কেমন ব্রহ্মাস্ত্রটি ধারণ করে আছি। আত্মরক্ষায় এ অস্ত্র অব্যর্থ। কাছে ভিড়ে কার সাধ্যি।

আমারও কাছে যেতে বারণ না কিরে? বলতে বলতে শিখার প্রবেশ।

শান্তনু বলল, আপনি তো সাংঘাতিক মহিলা মশাই। অন্তরালে থেকে পতিপত্নীর দাম্পত্য কলহ উপভোগ করছেন।

শিখা হেসে বলল, কলহ জিনিসটা চিরদিনই উপভোগ্য। তবে আপনাদেবটা ঠিক দাম্পত্য কলহের পর্যায়ে পড়ে না, ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলাই ঠিক।

কাজল বলল, দ্বন্দ্বযুদ্ধে মজা আছে ভাই। বলিস তো, তোব জন্যেও একটা লড়াই কবনেওযালা এনে দিই।

শিখা বলল, লড়াই দেখার সাধ যতটা, লড়াই করার সাধ্য ততটা নেই ভাই আমার। তাই আমার জন্যে কোনরকম চেষ্টা না করে তোমরা নিজেবা লড়াই চালিযে যাও। আমি বরং দেখি।

কাজল হাতে ধরা ক্যামেরাখানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে শিখার হাত ধবে বলল, চল, আমরা রান্না ঘরে বসিগে।

ওরা চলে যাচ্ছিল, শান্তনু পেছন থেকে মন্তব্য করল, যার যেথা স্থান।

শিখা পেছনে ফিরে একটু হাসল। কাজল তেমনি শিখার হাতটা ধবে চলতে চলতে বলল, শুনিস কেন ওর কথা। নারী বিদ্বেষের প্রতিযোগিতায় উনি অলিম্পিক চ্যাম্পিযান।

শান্তনু অমনি বলল, নাবীবিদ্বেষের স্বর্ণপদকটি যে পুরুষ লাভ কবে তাব স্ত্রীব মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে বল।

খিল খিল করে হেসে উঠল শিখা শান্তনুর মন্তব্যে।

বান্নাঘরে ঢুকল দুই বান্ধবী। শান্তনু ঘরের ভেতর তাব নতুন লেখাটাব পাতা খুলে বসল। আগেব দিনের লেখার খানিকটা অংশ পড়ে নিচ্ছিল। নতুন করে এগিয়ে যাবাব আগে পুবানোর সঙ্গে যোগসূত্রটা ঠিক করে নিচ্ছিল সে।

ঘরে ঢুকে শিখা বলল, আপনার চা।

শান্তনু চা টা হাতে নিয়ে বলল, বন্ধুটি কোথায়? আপনাকে দিয়ে কাজ সেবে নিচ্ছে দেখছি।

শিখা অমনি বলল, গৃহিণী ছাড়া অন্যের হাতে কিছু রোচে না বুঝি?

তারপর হেসে বলল, এখুনি নিরাশ হবার কিছু নেই। ক্রমশ প্রকাশ্য।

শিখা চলে গেল। কিছুপরে ঢুকল কাজল। একহাতে বেগুনীর প্লেট, অন্যহাতে একখানা লম্বা খাম।

শান্তনু কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, দেবী, 'একি রূপে দিলে দরশন।'

কাজল প্লেটটা শান্তনুর সামনে বসিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা বদ স্বভাবটা তোমার কবে যাবে বলতো? লেখার জন্যে নিচু ডেস্ক তৈরি করালে, এখন সেটা বাতিল করে সতরঞ্চে উপুড় হয়ে শুয়ে লেখা।

শান্তনু বলল, এসব তুমি বুঝবে না কাজল। যে বিষয নিয়ে লেখা তাব সঙ্গে সবদিক থেকে একাত্ম হয়ে যেতে না পারলে সে লেখার প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হবে না। তাই মাটিতে পেট চাপড়ে লিখছি।

কাজল ফোঁস করে উঠল, কি এমন তোমার লেখা, যাতে মাটিতে শুয়ে পড়ে লিখতে হবে?

শান্তনু অমনি বলে উঠল, জনগণের সাহিত্য রচনা করছি।

যাদের পেটে ভাত নেই, মাটিতে পেট চাপড়ে পড়ে থাকে, তাদেব কথা লিখছি এখন। তাই নিজেকে এমন মাটিতে টেনে নামিয়েছি।

বলেই শান্তনু আবৃত্তি করতে লেগে গেল।

'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভাল নয় ভাল নয় নকল সে সৌখীন মজদুরী।'

কাজল শান্তনুর মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, ওঠো তো এখন জনগণের কবি, একটা জনকল্যাণের কাজকর তো দেখি।

শান্তনু বলল, তোমার পাল্লায় যে পড়েছে তার লেখার বারোটা বেজেছে।

কাজল বলল, লেখার একটা সাবজেক্ট নিয়ে এসেছি বলতে পার।

শান্তনু বলল, কি রকম?

কাজল বলল, একটা বিজ্ঞাপন দেখে শিখা দরখাস্ত করতে চাইছে। তোমার যদি হাত থাকে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিককে কিছু বলে দিতে পার। চাকরীটা হলে শিখার কিছু উপকার হয়।

শান্তনু বলল, আমার এতদূর ক্ষমতা তাতো জানতাম না। বেশ, এখন চাকরীটা কি তাই বল?

মডেলের কাজ।

শান্তনু বলল, ভেরি ইন্‌টারেস্টিং। তোমার বান্ধবী মডেলের কাজ করতে চাইছে!

কাজল বলল, দেখ, আমিও প্রথমে ওর কথায় মত দিতে পারিনি, কিন্তু যখন দেখলাম, কোন পথ আর ওর খোলা নেই তখন সায় দিতে হল।

শান্তনু বলল, মডেলের কাজ নিয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারা আর বামাচার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা প্রায় একই কথা।

কাজল বলল, সাধনার কথা নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম কিছু বলনা তুমি। মুখে যা আসে, না বুঝে তাই বলাই তোমার স্বভাব। এখন আসল কথাটা বল দেখি, কিছু করা কি সম্ভব?

শান্তনু কাজলের হাত থেকে শিখার বিজ্ঞাপনের কাটিং আর দরখাস্ত খানা নিয়ে দেখল, এক শিল্পী তাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য মডেল চাইছেন। সেখানে শিল্প-শিক্ষার্থীরা যেমন মডেল ব্যবহার করবে, তেমনি এ্যাডভারটাইজিং কোম্পানীর কাজেও সে মডেলের ছবি ব্যবহার করা হবে।

শান্তনু বলল, এ কাজে আমাকে তুমি তদ্‌বির করতে বলছ কাজল! চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু কাজটা ভাল ঠেকছে না আমার।

কাজল জোর দিয়ে বলল, মডেল হওয়া মানেই কি তুমি বলতে চাও দারুণ ভয়ের ব্যাপার?

অন্ততঃ খুব বেশি ভরসার ব্যাপার বলেও মনে হচ্ছে না আমার। সে যা হোক্, দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে অগ্রসর হওয়া যাবে।

শিখা এবাব শেষের বেগুনীগুলো ভেজে নিয়ে ঢুকল ঘরে। থালাটা মেঝেতে রেখে দিয়ে বসল কাজলের পাশে।

শান্তনুব দিকে তাকিয়ে শিখা বলল, দেখুন কাজটা পেলে আমার সুবিধে হয় ঠিক, কিন্তু ভয় যে একেবারে পাইনি সে কথা বললে বোধহয় মিথ্যে বলা হয়।

শান্তনু বলল, কাজটার ভেতর কোনরকম নোংরামো আছে বলে আমি মনে করি না। একদল শিল্পী একটি মডেলের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। তাছাড়া মেয়েদের ছবি ছাড়া বিজ্ঞাপন অচল বললেই চলে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজীবন নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নয়। তবে এসব কাজের ভেতর নিজেকে ঠিক রাখাটাই সব চেয়ে বড় কথা। অবশ্য দেবী অগ্নিশিখা সম্বন্ধে সে ভাবনা আমাদের নেই।

শিখা হেসে বলল, কৃতার্থ হলাম আপানার কমপ্লিমেন্ট পেয়ে। এখন আত্মরক্ষা করতে পারলেই মুখরক্ষা।

শান্তনু বলল, দাহিকাশক্তি যার আছে, সহজে তার কাছে কেউ ভিড়বে না। অবশ্য পতঙ্গের কথা আলাদা।

শিখা বলল, জ্বালাতন তো পতঙ্গদের নিয়েই। আলো যারা উস্কে দিতে আসে, তাদের থেকে ভয় থাকে না। তাদের স্বাগত জানাবার জন্য মন সব সময়েই প্রস্তুত।

কাজল শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ, তুমি যে একটু আগে বললে, মেয়েদের ছবি ছাড়া বিজ্ঞাপন অচল, আমার কিন্তু এ ব্যাপারটা খুব সম্মানজনক বলে মনে হয় না।

কথার মোড় ঘুরল দেখে শান্তনু উৎসাহ পেল। বলল, যারা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, তারা নারী জাতিকে নিশ্চয়ই সম্মান জানাবার জন্যে বিজ্ঞাপন দেয় না, তারা তাদের জিনিসগুলো বেচবার জন্যেই এত খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয়।

কাজল বলল, দিনে দিনে যেভাবে নোংবা নগ্ন ছবি দেবাব চেষ্টা চলছে তাতে মেয়েদের ভেতর থেকে একটা প্রতিবাদ ওঠা উচিত।

শান্তনু হেসে বলল, তুমি কাজল, বড় সিরিয়াস হচ্ছ। সম্মিলিতভাবে যদি প্রতিবাদ জানাও তাহলে ঐ বেচারা মেয়েগুলোর কি গতি হবে বলতো। তাবা কোম্পানীর কাছ থেকে দেহের ছবি বেচে দু-পয়সা পাচ্ছে। ওরা বেকার হলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে প্রসেশান করে একদিন প্রতিবাদকারিণীদের কাছে চাকরীর জন্য এসে হাজির হয়েছে।

কাজল বলল, ছবি প্রকাশ করাতে তো আপত্তি নেই। প্রতিবাদ হচ্ছে সম্ভ্রম খুইয়ে দেহকে অনাবৃত করে প্রকাশ করাতে।

শিখা বলল, কিছু মনে করো না কাজল, আমি শান্তনুবাবুর পক্ষ নিচ্ছি বলে। আমার কথা হল, দেহকে অনাবৃত করার কোন সীমারেখা নেই। কালিদাসের যুগে মেয়েরা বল্কল পরেছে, তাতে সারা দেহ বড় অকটা আবৃত হয়েছে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া দেখ, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটা রীতি ছিল, মেয়েরা বুককে অনাবৃত করে রাখবে। এর বিপরীত হলেই সে পতিতা।

কাজল বলল, তোমাদের উদাহরণগুলো সবই সত্যি বলে মেনে নিলেও কথা থেকে যায়। সময় বা কাল বলে একটা কিছু মানতে হয়। আমাদের কালটা নিশ্চয়ই কালিদাসের কাল নয়। আর আমাদের দেশটাও নিশ্চয়ই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নয়। যে দেশের যেমন আচার।

শান্তনু ফোড়ন কাটল, উৎকট শালীনতাবোধও প্রশংসনীয় নয় কাজল।

কাজল বলল, সবকিছুই উৎকট নিন্দনীয়। তা বলে দিনের পর দিন এমনভাবে 'বস্ত্রহরণ' পালার অভিনয় চোখে দেখা যায় কি করে বল?

শিখা হেসে উঠল। শান্তনু সে হাসিতে যোগ দিল। কাজল কেবল হাসল না। সে বলে চলল, হাসির কথা নয় ভাই। দেহে বস্ত্র না থাকলে তুলোর চাষীবা বেকার হয়ে যাবে, এমন গোঁড়া ভাবুক আমি নই, তবে পোষাক কেবল শালীনতা রক্ষার উপায়ই নয়, সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ও বটে।

শান্তনু বলল, সাম্প্রতিককালে কতকগুলো ইংবাজী হিন্দি পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে। সেগুলোতে যে সব রঙীন ছবি দেখা যায়, তা যে কেবল পোষাকের বিজ্ঞাপন, সে কি কাউকে বলে দিতে হয়। ওগুলো এমন বিচিত্র, দেখলেই মনে হয়, কতকগুলো জিরাফ জেব্রা আর বেবুন দেখছি। ওগুলো দেখলেই আমার কেমন যেন এলার্জি এসে পড়ে। তখন মনে হয় বস্ত্রহীন আদীম জীবনই ভাল।

কাজল বলল, গুটি কয় অতি আধুনিক কিম্ভুতকিমাকারই স্টাইলের শেষ কথা নয়। রুচি যাদের আছে তারা যদি দমকা হাওয়ায় উড়ে না যায় তাহলে এ ধরণের এক্সপেরিমেন্ট বেশি দিন চলবে না।

শিখা বলল, ভাই সারা দুনিয়া জুড়ে এখন দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম। কোন কোন দেশে তো শোনা যায়, একখানা গাড়ি তিন মাস চালু থাকলেই ব্যাকডেটেড মডেলের পর্যায়ে পড়ে যায়।

শান্তনু বলে উঠল, এই দেখনা, জুল্‌পিটা কান ছাপিয়ে কত নিচে নামিয়েছি। কাজলের কথা শুনে ওটাকে কানেব মাঝ বরাবর রাখছিলাম, কিন্তু অফিসের বন্ধুরা এমন ক্ষ্যাপাতে লাগল যে হপ্তা দুয়েকের ভেতর গজিয়ে ফেলতে হল।

শিখা হেসে বলল, আপনার হাওয়া বদলের হিম্মৎ নেই বলুন।

শান্তনু বলল, মানছি সে কথা। এখন আবার দেখা যাচ্ছে গালপাট্টা ছেড়ে ফ্যাশন মেকাররা গুম্ফ নিয়ে পড়েছে। রাতারাতি নানা ধরণের মোটা মোটা গোঁফের মালিক সদর্পে পথ হাঁটছে।

কাজল খোঁচা দিয়ে বলল, দেরি কেন আর। ওটাও রাখ। নাহলে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে যে।

শান্তনু বলল, ওটা রাখলে কাজলদেবীর খুব সুবিধে হবে কি? সে দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে।

শিখ. মুখটা পাশের দিকে ফিবিয়ে হাসতে লাগল।

কাজল বলল, সরকার রাতদিন এত জিনিসের ওপর ট্যাক্স বসাচ্ছে, আর তোমার ঐ মুখখানার ওপর বসাতে পারে না। তাহলে অমন লাগামছাড়া বাক্যগুলো আর বেরোয় না।

শান্তনু বলল, মাছের দাম, তেলের দাম বাড়ছে বলে কি ওগুলো বাজারে পড়ে আছে কাজল। যত দাম বাড়বে, জানবে, মানুষ তত গজরাবে আবার তত কিনবে। আমার মুখে ট্যাক্স বসালেও ঠিক ঐ একই অবস্থা। বরং আরও নতুন নতুন কথার তোড়ে শ্রীমতী কাজলদেবীর ভেসে যাবার সম্ভাবনা।

শিখা বলল, কাজল, ভাই তোরা দাম্পত্য প্রেম জাহির কর, আমি এখন চলি। ওদিকে কদিন বাবার অবস্থাটাও ভাল ঠেকছে না।

শিখার বাবার কথায় আলোচনার মোড়টা ফিরে গেল।

কাজল বলল, মেসোমশাই কি কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ করছেন।

শিখা মাথানেড়ে জানাল, ঠিক তা নয়। উপদ্রব, উৎপাত উনি কোন দিনই করেন না। তবে কদিন হল, ছাদ থেকে নেমে এসে দীর্ঘরাত বিছানায় জেগে বসে থাকেন। কাছে গিয়ে গায়ে হাত বুলোই। উনি লক্ষ্যই করেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, জানালাগুলো খুলে দে তো মা।

ব্যস, আর কিছু না।

যদি বলি, বাবা, এখন একটু ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, তোমার অসুখ করবে যে।

উনি কিছু না বলে করুণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

দেখে মায়া হয়, জানালা খুলে দিই। উনি শিশুর মত আনন্দে জানালার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শান্তনু বলল, খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক আছে তো?

শিখা বলল, একেবারে কমে গেছে। পীড়াপীড়ি করতে গেলেই কাঁদতে থাকেন।

কাজল বিষণ্ণ দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শিখার দিকে।

শিখা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, চাকরীটার ব্যাপারে আমিও ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারছি না। যদিও দরকারটা আমার খুবই, তাহলেও সারাদিন বাবাকে ছেড়ে স্টুডিওতে পড়ে থাকাটা যে কি করে সম্ভব তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

শান্তনু বলল, অস্থির হয়ে কাজ নেই, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সেই দিনই রাত ন'টা নাগাদ শান্তনু ঢুকল গোপীনাথ লাহিড়ীর পত্রিকা অফিসে। সিনেমা পত্রিকা, 'ছায়ার মায়া'র একমাত্র কর্ণধার তিনি। সম্পাদক, পরিচালক, কোষাধ্যক্ষ। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। শান্তনু ওখানে পার্টটাইম কাজ করে। বিচিত্র সব ছবি তুলে ফিচার লিখে প্রকাশ করাই ওর কাজ।

গোপীনাথবাবু শান্তনুকে ঢুকতে দেখেই বললেন, এমন অসময়ে বৎস।

শান্তনু বলল, গোপীনাথদা, একটা আর্জি আছে।

গোপীনাথবাবু বলে উঠলেন, জল্‌দি পেশ করলে পুরণের সম্ভাবনা আছে। নচেৎ এ শর্মা সোমরসে ডুবলে ওঠায় কোন শালা।

শান্তনু বলল, ভণিতা না করেই বলব?

গোপীনাথবাবু বললেন, ভণিতা করে তুমি ভোলাবে গোপীনাথ লাহিড়ীকে।

শান্তনু এবার সোজাসুজি বলে বসল, একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

গোপীনাথবাবু সোজা হয়ে বসলেন। শান্তনুর আপাদমস্তকে এক জোড়া চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কার, তোর না তোর বৌ এর?

শান্তনু বলল, আপাততঃ দুজনের কারোরই নয়। তৃতীয় পক্ষ, একটি মহিলার।

গোপীনাথবাবু বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া, গুলিয়ে যাচ্ছে যে সব। মহিলাটি কি তৃতীয় পক্ষে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে? তাকে উদ্ধারের জন্যে তুই উঠে পড়ে লেগেছিস?

শান্তনু বলল, সত্যি গোপীনাথদা সিরিয়াসলি বলছি, মেয়েটা তার পাগলাবাবাকে নিয়ে একেবারে নাজেহাল।

গোপীনাথবাবু বললেন, আবার আনলি পাগলাবাবাকে। মেয়েটার বাবা পাগল্ল তো?

হ্যাঁ গোপীনাথদা, প্রফেসার ছিলেন, এখন পাগল হয়ে গেছেন।

গোপীনাথবাবু বললেন, হবেই তো, হাজারে হাজারে খাতা দেখা, চোখের জল মেরে ট্যাবুলেশনের কাজ করা, এক কথাকে হাজার বার করে বলা, এ সব আবশ্যিক উন্মাদ হবার উপাদান।

শান্তনু এবার বলল, মানুষটি বড় ভাল্ল ছিলেন। স্ত্রীকে দারুণ ভালবাসতেন। স্ত্রী মারা গেলে, তিনি পাগল হয়ে যান। এখন প্রায় সারাটা রাত আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকেন।

গোপীনাথবাবু চুপচাপ বসে রইলেন। চোখটা টেবিলের দিকে করে দুহাতে কপালের দুটো রগ চেপে রইলেন।

শান্তনু এতক্ষণে আসল জায়গায় ঘা দিতে পেরেছে গোপীনাথ লাহিড়ীর। মনে পড়েছে তাঁর স্ত্রীকে। পৈতৃক বেশ কিছু রেস্ত থাকায় চাকবী করতে যাননি কোনদিন গোপীনাথবাবু। বড়লোকের পিতৃহীন একমাত্র ছেলের দোষের মধ্যে ছিল পানীয়ের প্রতি আসক্তি। পানে উন্মত্ত হলে মানুষের নাকি কিছু বিক্রম বাড়ে। গোপীনাথবাবুও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি মত্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকেই স্ত্রীর ওপর বিক্রম জাহির করতেন। আস্ফালন কোন কোনদিন ষষ্ঠীর দ্বারা আক্রমণের কোঠায় গিয়ে পৌঁছত। ছায়াদেবী স্থির হয়ে মাতাল স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতেন। স্বামীকে ঐ বিশেষ সময়ে তিনি অসুস্থ বলেই ভাবতেন। যতকাল জীবিত ছিলেন সেবাযত্নের ত্রুটি কোনদিনই করেন নি।

স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে গোপীনাথবাবু স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতেন। তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। ছায়াদেবীর সখ ছিল সিনেমা মাসিক পড়ার। গোপীনাথবাবু স্ত্রীকে নানাধরণের পত্রিকা এনে দিতেন। ছায়াদেবী যখন আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোপীনাথবাবুর সকল অত্যাচারের বাইরে চলে গেলেন, তখন গোপীনাথবাবু স্ত্রীর কথা মনে করেই এই পত্রিকাটি বের করলেন। নাম দিলেন তার 'ছায়ার মায়া'।

আজ তাই বৃদ্ধ প্রফেসার স্ত্রীর শোকে পাগল হয়ে গেছেন শুনে, গোপীনাথবাবু দুর্বল হয়ে পড়লেন।

শান্তনুর দিকে চোখ তুলে এক সময় গোপীনাথবাবু বললেন, নিয়ে এসো মেয়েটিকে। প্রুফ দেখার কাজ দেওয়া যাবে। এখানে বসে দেখার দরকার নেই। বাড়ি বসে দেখলেই চলবে।

শান্তনু গোপীনাথবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, বাঁচালেন গোপীনাথদা।

গোপীনাথবাবু বলে উঠলেন, রাখে হরি মারে কোন শালা। এখন ভেগে পড় দেখি। তোদের পাল্লায় পড়ে নেশাটা জল হয়ে গেল।

শান্তনু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রাস্তায়। শিখার জন্যে একটা কিছু করতে পেরে শান্তনুর এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, সে যেন আশ্চর্য প্রদীপের মালিক মহাশক্তিমান আলাদীন। কাজলের তৃপ্তিভরা মুখখানার কথা ভাবতে ভাবতে শান্তনু ঘরে এসে পৌঁছল।

কাজল বলল, হুট্‌করে কোথায় বেরোলে, আবার রাত কাবার না করেই ফিরে এলে?

শান্তনু বলল, খিদে পেয়েছে দেবী, অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা কর সত্বর।

কাজল বলল, থামো, সবে ফুলকপিতে জল ঢেলে এসেছি। এই তো একটু আগে বেগুনীগুলো খেলে। এক পাক ঘুরতেই হজম হয়ে গেল। যা পেটুক দামু একখানা হয়েছ তুমি। কদিন খাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়।

শান্তনু বলল, এখটা জবর খবর দেব বলে এসেছিলাম, দিলে তো মেজাজটা খিঁচড়ে।

কাজল শান্তনুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মী সোনা, বলই না কথাটা। বলা শেষ হলে না হয় দারুণ একটা লণ্ডভণ্ড করে বস, আমি কিচ্ছু বলব না।

শান্তনু বলল, ডাকো তোমার বান্ধবীকে। তার জন্যে লটারীর যে টিকিটখানা কেটেছিলাম তা লেগে গেছে।

কাজল আনন্দে চেপে ধরল শান্তনুর গলাটা।

শান্তনু বলল, আরে ছাড় ছাড়, বন্ধুব জন্যে পতিঘাতিনী হবে নাকি? দম যে বন্ধ হয়ে গেল।

কাজল হাত দুটো শিথিল করে দিয়ে বলল, তা হলে মডেলের চাকরীটা শিখার হয়ে যাবে বলছ?

শান্তনু বলল, তোমার সখিটি নেই, এখন তবে বলি। মডেল হতে গেলেই দিগ্‌বসনা হতে হবে। তুমি যেমন পিউরিটান তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হতে তোমার বেশি সময় লাগবে না। অতএব তোমাদের চিরসখিত্ব বজায় রাখার জন্য এ দাস অন্য চাকরীর ব্যবস্থা করেছে। ঘরে বসে কাজ, আর কি চাই।

কাজল মহা ঔৎসুক্যে শান্তনুকে জড়িয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে বলল, বল না গো চাকরীটা কি ?

প্রুফ রিডারের কাজ, বলল শান্তনু, ঘরে বসে বসে রোজগার করতে পারবে। দিনের ভেতর একবারটি বেরিয়ে প্রুফ দিয়ে আসা আর নিয়ে আসা, ব্যস।

কাজল বলল, শিখা প্রুফ রিডিং জানে?

শান্তনু বলল, একবার শিখে নিলেই হল। এমন কিছু পরীক্ষা পাশের ব্যাপার নয়। তাছাড়া তুমি তো শিখে নিয়েছ। বন্ধুর শেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পার।

নিশ্চয়ই, বলল কাজল।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল কাজল, চাকরীটা কোথায় পাওয়া গেল বল না?

দি গ্রেট গোপীনাথদা দিলেন, আবার কে দেবে।

কাজল বলল, সত্যি গোপীনাথদার তুলনা নেই। ও লোকটা মাতাল না মহাপুরুষ বোঝা মুশকিল।

শান্তনু বলল, যখনই গোপীনাথদার কাছে যাই তখনই একবার করে আমাদের বিয়ের কথাটা মনে পড়ে।

কাজল বলল, গোপীনাথদা নামটা না হয়ে ওঁর বিপদতারণ মধুসূদন নাম হলেই ভাল হত।

শান্তনুদের বিয়ের ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। এয়ার হোস্টেসের কাজ করত কাজল। বড় বাড়ির মেয়ে বলে বসে থাকার পাত্রী ছিল না সে। ভাইবোন মিলে ওরা ছিল সাতজন। মা ছিলেন না, তাই ঘরের ভেতর মহলে ছিল না কোন শাসন। বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। সারাদিন থাকতেন ঘরের বাইরে। লেখাপড়া গানবাজনায় সাতটি ভাইবোনেরই একটা সহজাত অধিকার ছিল। তবে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পথ চলতে ভালবাসত। কাজল বি-এ পাশ করার ঠিক পরেই এয়ার হোস্টেসের চাকরীটা পেয়েছিল। বাবা একবার শুধু বিবেচনা করে দেখতে বলেছিলেন। কাজল এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবার পরেই বাবার কাছে খবরটা দিয়েছিল। তখন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল ও। বাবা আর বাধা দেননি। বলেছিলেন, বড় হয়েছ, নিজের ভালমন্দ বুঝে চলার ক্ষমতা হয়েছে, তাই বাধা আমি তোমাদের দিতে চাই না। তবে জীবনে আঘাত এখনও আসেনি। আঘাত এলে দুর্জয় সাহস আর স্থির বুদ্ধি নিয়ে তার মুখোমুখি হতে শেখ।

দুটি বছর মেঘের গায়ে সোনার আলপনা দেখতে দেখতে, মাটির বুকে খোপ খোপ কাজকরা সবুজ গালচে দেখতে দেখতে, আর দুনিয়ার বাজারে কিউরিও কিনতে কিনতে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল কাজলের তার ঠিক ঠিকানা নেই। আকাশে উঠলেই মনে হত, সে যেন আকাশ-বাসরের নায়িকা। কত বিচিত্র মানুষ, কত আনন্দ আশঙ্কায় জড়ানো সন্ধ্যা সকাল। তার মাঝখানে সে সবার মনোরঞ্জন করে চলেছে। এ জীবনে কোন দায় নেই। এ ক্ষণিক আনন্দ বিতরণে কোন পিছুটান নেই। তবু লন্ডনের পিটার, ইটালীর সোনিয়া, রাশিয়ার বরিস রোয়েরিক, শ্যামদেশের রত্নউবলা তার স্মৃতি থেকে ঝরে গেল না। সে অবসব সময়ে লিখতে শুরু করল। কত চরিত্র, কত দেশ, কত টুকিটাকি ঘটনা ভীড় করে এল তার লেখায়। লেখা শেষ হলে নাম দিল 'আকাশ বাসর'।

দু-একটি বান্ধবীকে পড়াল সে তার প্রথম লেখা পাণ্ডুলিপি। সমালোচনার চেয়ে উৎসাহ পেল বেশী।

ঠিক এমনি দিনগুলোতে হঠাৎ করে দেখা হল তার শান্তনুর সঙ্গে।

কোন এক ভি-আই-পির আসার খবর পেয়ে ছুটেছিল শান্তনু সকাল সকাল দমদমে। সেখানে প্লেনের দেখা পেল, কিন্তু যাকে দেখতে চেয়েছিল তাকে পেল না।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসছিল, এমন সময় দেখতে পেল সে কাজলকে। প্রথম দেখাতেই বিস্ময়ের ঘোর লাগল চোখে। সাদা ডানা মেলে রাণওয়ের ওপরে দাঁড়িয়েছিল যে শ্বেত সারস তার থেকে বেরিয়ে আসছিল কাজল। এয়ার হোস্টেসের সুন্দর নীল পোষাক আঁটা দেহখানা। প্রথম সূর্যের কোমল

হলুদ আলোটা এসে পড়েছিল তার ওপর। মনে হল শান্তনুর, দেবসভায় নৃত্যে তালভঙ্গের অপরাধে হয়ত মর্তে নির্বাসিত হয়েছে মেয়েটি।

শান্তনুকে দেখে নামতে নামতে হাসল সে। বলল, দেখে মনে হচ্ছে প্রেস থেকে এসেছেন?

শান্তনু মিষ্টি হেসে ওপরে নীচে কয়েকবার মাথাটা ঝাঁকাল।

মেয়েটি বলল, নিরাশ হলেন তো? যাঁর জন্যে এসেছিলেন, তিনি শেষ মুহূর্তে সামান্য অসুস্থতার জন্যে ফ্লাইট ক্যানসেল করলেন।

শান্তনু মনে মনে বলল, তোমাকে না দেখলে হয়ত নিরাশ হতাম, কিন্তু এখন বেশ উৎসাহ বোধ করছি।

মুখে বলল, নিরাশ হব যদি একখানা ফটো নেবার অনুমতি না দেন।

ঝিক্‌মিক্ করে উঠল কাজলের মুখের হাসি।

ক্লিক্ ক্লিক্ করে কয়েকখানা ছবি নিল শান্তনু।

কাজলের কাছে পরে শুনেছিল শান্তনু, সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে শান্তনুকেও নাকি অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল কাজল।

ছবি নিয়ে ফিরে আসার সময় ঠিকানা নিতে ভোলেনি শান্তনু। সেই সূত্র ধরে শুরু হল কাজলের বাড়ি যাতায়াত। আসা যাওয়ার পথের ধারে নতুন নতুন অনেক ফুল ফুটল, অনেক প্রজাপতি উড়ল।

শেষে যখন কাজল চাকরী ছেড়ে ঘর বাঁধতে এসে দাঁড়াল শান্তনুর পাশে, তখন তীব্র বাধা এল কাজলের বাবার কাছ থেকে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী, মেয়েকে কিছুতেই তুলে দিতে চাইলেন না প্রতিষ্ঠাহীন একজন প্রেস ফটোগ্রাফারের হাতে।

কাজল তখন শান্তনুময়। সে বাবার ঐশ্বর্য পেছনে ফেলে এসে দাঁড়াল পথে। শান্তনুর তখন প্রায় অদ্যভক্ষধনুর্গুণঃ অবস্থা। কাজলকে সে বিয়ে করে রাখবে কোথায়, এত বড় বাড়িব মেয়েকে খাওয়াবে পরাবেই বা কি।

শান্তনুর যখন এরকম বিমূঢ় অবস্থা, তখন তার মনে পড়ল গোপীনাথ লাহিড়ীকে। সে কাজলের হাত ধরে সোজা গিয়ে উঠল 'ছায়ার মায়া' অফিসে।

গোপীনাথ লাহিড়ী, শান্তনু আব কাজলকে পাশাপাশি দেখে বললেন, বেশ মানিয়েছে।

শান্তনু মৃদু হেসে বলল, সবটা না জেনেই মন্তব্য করলেন গোপীনাথদা।

ততক্ষণে কাজল গোপীনাথ লাহিড়ীব পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গোপীনাথ লাহিড়ী হেসে বললেন, ঐ রাস্কেলটা আমাকে কিছু না জানিযে ভাবলে, গোপীনাথদাকে খুব ধোঁকা দিলাম। কিন্তু ভি-আই-পির ফটো তুলতে গিয়ে সেদিন যে ভি-ভি-আই-পির ফটোখানা তুলে এনে আমাকে ডেভেলপ করে দেখালে, তখনি বুঝেছি, ভায়া আমার আকাশগঙ্গায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

তারপর কাজলেব দিকে ফিরে বললেন, তুমি ভাই বোস। এ রাস্কেলটা ফটোগ্রাফার কাম বিপোর্টাব হিসেবে যতখানি নির্ভরযোগ্য তার চেয়ে বেশি নির্ভবযোগ্য হবে সঙ্গী হিসেবে। তুমি নিশ্চিন্তে ওর হাত ধরতে পার।

শান্তনু এবার গোপীনাথবাবুর পায়ের ধুলো নিলে।

গোপীনাথবাবু অমনি বলে উঠলেন, কিরে বউ-এব দেখাদেখি ভক্তি তোব উৎলে উঠল।

শান্তনু বলল, এখনও লিগ্যাল ম্যাবেজ হয়নি গোপীনাথদা। তাই সাহস করে বউ বলতে পারব না।

থাম্, ধমকে উঠলেন গোপীনাথবাবু। লজ্জা করে না তোর ও কথা বলতে? একটা জলজ্যান্ত মেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিস, তারপরেও আবার বলছিস্ লিগ্যাল ম্যাবেজ হয়নি। ল'এর নিকুচি করেছে তোর। ও আমার বোন, আজ এই মুহূর্তে তোকে সম্পূর্ণ অপদার্থ জেনেও তোব হাতে তুলে দিলাম আমার বোনকে।

এরপর গোপীনাথবাবুই খরচ খরচা করে ওদেব বিয়ের সব ব্যবস্থা কবে দিলেন। কাজলের সেই এয়ার হোস্টেস জীবনের ডায়েরী 'আকাশবাসর' ছাপলেন নিজের কাগজে ধারাবাহিকভাবে। মোটা টাকা দিলেন, যাতে ওদের নতুন বাঁধা সংসার অচল হয়ে না পড়ে।

এদিকে কাজলকে বিয়ে করার পর পত্রিকা অফিসে দুটো ইনক্রিমেন্ট হল শান্তনুর।

খবরটা শুনে গোপীনাথবাবু শান্তনু আর কাজলকে ডেকে পাঠালেন। কাজলকে দেখিয়ে শান্তনুকে বললেন, দেখলি তো, কেমন পয়মন্ত আমার বোন, ঘরে আনতে না আনতেই দু দুটো ইনক্রিমেন্ট। একেই বলে স্ত্রীভাগ্যে ধনম্।

কাজল বলল, দাদা, একদিন যে বোনের রান্না খেতে হবে।

গোপীনাথবাবু বললেন, ও মাসের পনের তারিখের আগে নয়। তারপর যেদিন বলবে সেদিন যাব।

শান্তনু বলল, তাহলে ষোল তারিখই সাব্যস্ত রইল।

গোপীনাথবাবু একটু ভেবে বললেন, এইটিন্থ পাক্কা, তবে তোমার উন্নতির প্রথম পার্টি ভোজটা আমার এখানেই সেরে যাও। আজ তোমার অরন্ধন কাজল।

গোপীনাথবাবু সেদিন দুজনকে খাইয়ে দাইয়ে ছাড়লেন।

তারপব আঠারো তারিখে এলেন শান্তনুর বাসায়। ডাক দিতে দিতে ঢুকলেন, কি হে নেমন্তন্ন করে সব ভুলে বসে আছ তো।

কাজল বেবিয়ে এসে বলল, আসুন দাদা, আসুন, ভুলে যাব মানে। সকাল থেকে রান্না কবছি না? এই দেখুন, হাতে হলুদ কাপড়ে হলুদ। রন্ধন পটিয়সীর সার্টিফিকেট সেঁটে রেখেছি সারা অঙ্গে।

গোপীনাথবাবু হাসলেন। চাবদিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, গেল কোথায় সে পাষণ্ড, রান্নাঘবে ঢুকে তোমার রান্নাগুলো চেখে দেখছে বুঝি?

কাজল বলল, না দাদা, কোন্ এক বড় মানুষ নাকি গরীবদের কিছু কম্বল দানের জন্যে কাতর হযে পড়েছেন। তাঁর সেক্রেটারী কম্বল দান অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্যে ওকে ধরে নিয়ে গেছে।

গোপীনাথবাবু বললেন, মোটা দাঁও আছে তো, না হাফ্ বেগার?

কাজল বলল, এলে জিজ্ঞেস করবেন। এই এলাম বলে, সেই যে আটটায় বেরিয়েছে, এখন সাড়ে বারোটা বাজল।

গোপীনাথবাবু বললেন, ছেলেটা বড় ভাল রে কাজল। কাজ পেলেই ছুটল। তা ক্ষুদকুড়ো যা মেলে। তবে বড় বেশি বোকা। এ বাজারে খুব একটা সচল নয়। তুখড় ছোঁড়াগুলো দেখ চাবদিক তেড়ে ফুঁড়ে খাচ্ছে।

কাজল বলল, আশীর্বাদ করুন দাদা, যেন এইভাবে ওর জীবনটা কেটে যায়। আমি অতি বড় হতে চাই না।

গোপীনাথবাবু বললেন, বেচাল দেখলে ও কি এতদিন আমার কাছে টিকে থাকতে পারত। কবে মুখদর্শন বন্ধ হয়ে যেত।

কাজল বলল, আপনাকে খেতে দিয়ে দিই দাদা, ওর তো পাত্তাই নেই।

গোপীনাথবাবু বললেন, একটা পনের মিনিট অব্দি অপেক্ষা করব। তারপর তুমি তোমার থালা সাজিও। ঠিক দেড় ঘটিকা আমার নিত্যকার ভোজনের সময়। তখন বড়লাটের জন্যেও এ শর্মা অপেক্ষা করবে না।

কাজল ঘরের ভেতর গোপীনাথবাবুকে বসিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, পেছন থেকে তাকে ডাকলেন গোপীনাথবাবু। কাজল ফিরে এল।

গোপীনাথবাবু বললেন, কাজল, শান্তনুর সঙ্গে তোমার প্রথম দেখার তারিখটা মনে আছে?

একটু ভেবে কাজল বলল, আঠারোই সেপ্টেম্বর।

গোপীনাথবাবু বললেন, আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে, তাই না?

হ্যাঁ দাদা।

শান্তনু যখন আমাকে ষোল তাবিখে নেমন্তন্ন দিলে, তখন আমি আঠারো তারিখটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলাম।

কাজল হেসে বলল, দাদার সব দিকেই নজর।

গোপীনাথবাবু ব্যাগ থেকে প্যাক কবা একটা বস্তু বের কবে কাজলেব হাতে তুলে দিযে বললেন,

আজকের দিনে এটি তুমি শ্রীমান শান্তনুকে প্রেজেন্ট করবে। এটি দাদা হিসেবে আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম।

কাজল বিস্মিত।

কি আছে এতে দাদা?

ক্যামেরা। চোদ্দ তারিখে জাপান থেকে এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। তাকে অনুরোধ করেছিলাম, আশাহি পেনটাক্স ক্যামেরা একটা আনতে। বছরখানেক ধরে শান্তনু তার ক্যামেরাখানা নিয়ে বড় ভুগছিল। তাই ভাবলাম ওকে একখানা ক্যামেরাই দেওয়া যাক্।

এ তো অনেক দামী ক্যামেরা দাদা!

দামী জিনিস ব্যবহার করাই ভাল। আর তাছাড়া তোমাদের বিয়েতে তো দিতে পারিনি কিছু।

কাজল বলল, এ কথা ফিরিয়ে নিতে হবে দাদা। আপনি আমাদের যা দিয়েছেন তার পরিমাপ কোনদিনই করতে পারব না।

গোপীনাথবাবু বললেন, রাস্কেল বলি, পাষণ্ড বলি, আসলে ও তো জামাই আমাদের। সম্মান বলে তো ওর কিছু আছে। তোমার বাবা যদি শান্তনুকে চিনতে পারতেন, তাহলে তিনিই ওর জন্যে যা কিছু করার করতেন। তা যখন হচ্ছে না, তখন এ দাদার সাধ্যের ভেতর যতটুকু আছে তা তাকে করতে দাও।

কাজল বলল, দাদার দান ও মাথা পেতে নেবে।

গোপীনাথবাবু বললেন, উঁহু, এখন ও বস্তুটি ওকে দেখিও না। আমি চলে গেলে তখন তুমিই ওকে ওটা প্রেজেন্ট কর।

সে কি করে হয় দাদা, আপনিই তো প্রেজেন্ট করলেন।

বোকা মেয়ে হয়, হয়। আজকের দিনটা কতখানি স্মরণীয় তোমাদের জীবনে। ফটো তুলতে গিয়েই না মন দেয়া-নেয়া হল। তাই ফটোগ্রাফারকে তুমিই ওটা বিগত দিনের কথা স্মরণ করে প্রেজেন্ট কর। যদি দাতার কাছ থেকে নিতে বাধে, তাহলে আমার পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা দিয়ে না হয় দাম শোধ দিও।

কাজল বলল, আচ্ছা সে যা হোক হবে। আপনি একটু বসুন দাদা, আমি আসছি।

বাইরে থেকে গলা ভেসে এল শান্তনুর, কাজল আমি এসে গেছি।

ঘরের ভেতর থেকে গোপীনাথবাবু বলে উঠলেন, এই যে স্টুপিড, গেস্টকে ঘরে বসিয়ে রেখে দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ।

শান্তনু বলল, কতক্ষণ এসেছেন দাদা?

গোপীনাথবাবু বললেন, ভদ্রলোকেরা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যে সময়ে আসে।

শান্তনু বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেল দাদা।

গোপীনাথবাবু বললেন, তা হোক, সে দানবীর গাড়োলটার ছবি নিলি তো।

আপনি জানেন দেখছি।

গোপীনাথবাবু বললেন, নগদ বিদেয় কিছু পেয়েছ, না নিউজ এডিটারের ফরমায়েস পালন করেছ?

শান্তনু বলল, দানসাগরের সেক্রেটারীটি আগে ভাগেই নিউজ এডিটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেখেছিলেন। তাই অফিসের নির্দেশেই আমার যাওয়া। তবে একেবারে নিরাশ হইনি।

গোপীনাথবাবু বললেন, একটিতে হল, না কয়েকখানা নিতে হল?

আর বলেন কেন গোপীনাথদা। আমার দিকে তাকিয়ে কতখানি হাসবেন তার নির্দেশ দিচ্ছেন সেক্রেটারী ক্ষণে ক্ষণে। বেশি খুশী-খুশী দেখালে বলছেন, আর একখানা নিন। আবার গম্ভীর হয়ে গেলে বলছেন, একটু হাসুন। অমনি আরও একখানা নিতে হচ্ছে। এমনি সাত-সাতখানা ছবি তোলার পর নিষ্কৃতি পেলাম। অবশ্য আসার সময় ভাল একখানা জলযোগ করিয়ে, যাতায়াত বাবদ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে ছেড়েছে।

গোপীনাথবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, দরকার হলেই আবার ডাকবেন, স্যার, বলে এলি না?

তা আবার বলতে। শুধু কি তাই। এই দেখুন না 'ছায়ার মায়া'র ঐ কম্বল দানের ছবিটি ছাপার জন্যে একটা টাকার কনট্রাক্ট করিয়ে এনেছি।

গোপীনাথবাবুর হাতে সেক্রেটারীর সই করা কনট্রাক্টখানা শান্তনু তুলে দিল।

গোপীনাথবাবু কাগজখানা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, বেঁচে থাক বাবারা। দানে চিরদিন যেন তোমাদের মতি থাকে। আমরা অভাজনেরাও যেন ছিটেফোঁটা থেকে বঞ্চিত না হই।

প্রুফ দেখার কাজটা পেয়ে বড় উপকার হল শিখার। সে একদিন গিয়ে গোপীনাথবাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে এল। এসেই বলল কাজলকে, মানুষটার মেজাজ মর্জি বোঝাই ভার। তবে লোকটি যে সাধারণ পাঁচ জনের মত নয়, তা কিছুক্ষণ বসে থাকলেই বোঝা যায়।

কি বললেন তোকে ?

শিখা বলল, এক তাড়া প্রুফ আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, আরও চাইলে আরও পাবে, কিন্তু যথাসময়ে ফেরৎ চাই। যত দেখবে তত দাম, না দেখলে রোজগারের ঘরে শূন্য।

কাজল বলল, গোপীনাথদার কথাই ঐ রকম। কিছুদিন কাজ করে দেখ, তখন মানুষটার আসল পরিচয় পাবি।

কদিন পরে আবার শিখা এসে বলল, আজ গোপীনাথদা কি বললেন জানিস?

কি বললেন?

এতদিন ফাইনাল প্রুফ দেখে শিক্ষানবিশি করেছ। যাকে বলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছ এখন ফার্স্ট প্রুফের কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করতে হবে। চোখের জল শুকোবে। কদিন বাদে চশমাও উঠবে চোখে। এ সবের জন্যে তৈরি থেকো।

কাজল বলল, কথাটা ঠিক।

শিখা বলল, আমি গোপীনাথদাকে বললাম, প্রয়োজন আমার অনেক বেশি, তাই পরিশ্রমে আমি পেছপা হব না।

শুনে গোপীনাথদা খুশী হয়ে বললেন, তোমার রেট ফর্মা পিছু আজ থেকে দেড়গুণ হয়ে গেল।

কাজল অমনি বলে উঠল, দেখলি তো মানুষটাকে।

শিখা বলল, বাইরে লোকটি বড় মেজাজী, কিন্তু ভাই এমন দিল্ মেলা ভার। ·

কয়েকদিন পরে একটা ঘটনায় সকলে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। শিখা এসে কাজলকে বলল, সেদিন আমি পাশে না থাকলে বাবা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েই পড়তেন। ঘরে শেকল দেওয়াই থাকে, কিন্তু সেদিন ওঁকে একটু ছাদে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি বসেও ছিলেন চুপচাপ। তারপর আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেই বাবা আলসে ধরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে জানতে পেরে, আমি হাত ধরে জোরে টান দিতেই ছাদে পড়ে গিয়ে গা-হাত-পা ছড়লেন। ছেলে মানুষের মত সে কি কান্না। ওঁকে ধরে নিয়ে এসে আবার ঘরে পুরে শেকল দিলাম। এখন উনি লোহার গরাদে কেবল মাথা কুটছেন। রক্তাক্ত হয়ে গেছে কপালখানা। কি যে অশান্তি ভাই কি বলব।

শান্তনু ঘরে আসতেই কাজল কথাটা তার কানে তুলল। শান্তনু বেরিয়ে গেল 'ছায়ার মায়া' অফিসে।

ফিরে কাজলকে বলল, ট্রাঙ্ককলে উন্মাদ আশ্রমে একটা সিটের ব্যবস্থা করেছেন গোপীনাথদা। সত্যি লোকটা অসাধারণ।

কাজল বলল, এ ধরণের পাগলকে ওখানে নিয়ে যাওয়াও তো হাঙ্গামার ব্যাপার।

শান্তনু বলল, ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হবে। শিখাদেবী যাবে। অলককেও নিতে হবে সঙ্গে। ও বেশ দক্ষ আছে। সব কিছু বেশ গুছিয়ে করতে পারে। তাছাড়া ঘুমের পিল খাইয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কাজল বলল, কি যে হবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দু-দিনের ভেতরই শিখার চেহারাটা একেবারে বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। চোখগুলো বসে গেছে। বেচারার ঘুম নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই।

রাঁচি এক্সপ্রেসে উঠে বসল ওরা। অলক বাসা থেকে স্টেশন অবধি সারাটা পথ আগলে নিয়ে এল বৃদ্ধকে। ট্যাক্সিতে আধ ঘুমন্ত রোগীকে ওঠান-নামান এক ঝক্কি বইকি। শান্তনু অবশ্য সাহায্য করছিল অলককে। ট্রেনে তোলার পর আরও একটা ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ান হল রোগীকে। শিখা চুপচাপ বসে রইল শান্তনুর পাশে। অলক এখন একেবারে অন্য মানুষ। সে যেন শিখাকে চেনেই না। রোগীর সুবিধা সুযোগের দিকে তার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। বালিশ থেকে মাথাটা সরে গেলেই সে সজাগ হয়ে উঠছিল।

কি ভেবে শিখার চোখটা ছলছলিয়ে উঠল। সে আঁচল টেনে চোখ মুছল।

শান্তনু আস্তে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, বিপদের সময় মানুষ চেনা যায় শিখাদেবী। অলক যে ডাকা মাত্রেই আসবে, আর এমন করে প্রাণ দিয়ে কাজ করবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। ও আপনাকে দেখার আগে পর্যন্ত জানত না যে আপনার কাজেই ওকে রাঁচি যেতে হবে।

শিখা বলল, আমি ভাবতেই পারিনি শান্তনুবাবু যে ওঁর ভেতর এমন একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে।

ট্রেন চলেছে। ওরা টুকরো টুকরো কথা বলে চলেছে। কতকগুলো ফ্ল্যাগ স্টেশানের আলো জোনাকীর মত জ্বলে উঠে হারিয়ে গেল। রাতের হাওয়ায় চাঁদের সাদা চাদর উড়ছে। কামরার ভেতর জানালা দিয়ে ঢুকছে কুয়াশা। দূরের প্রান্তরে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ। তার তলায় দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে আগুন। শীতের রাতে শুকনো পাতা জ্বেলে আগুন পোহাচ্ছে কারা সব। ট্রেনগুলো, ট্রামগুলো অনেক সময় কেমন যেন ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলে। ঠিক ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলে যেমন ঝাঁকুনি লাগে তেমনি। গাড়ি শুদ্ধ লোকের ঢুলুনি এসেছে। গয়ে কম্বল চাপিয়ে প্রায় সবাই বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে। জ্বল জ্বল করছিল যে আলোগুলো তার সব কটা এখন নিভে গেছে। নীল আভার অস্পষ্ট কটা আলো প্রাণপণে অন্ধকার দূর করার বৃথা চেষ্টা করে চলেছে।

ঝিমুনি এসেছে শান্তনুর। শিখা গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়েছে কম্বলটা গায়ে দিয়ে।

অলক বসে আছে শিখার বাবার পাশে। তার গায়েও একখানা কম্বল।

কতক্ষণ পরে শিখার বাবা হঠাৎ উঠে বসলেন। চারদিকে তাকালেন। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের গলায় বললেন, জানালাটা একটু খুলে দেবে বাবা।

অলক জানালার সার্টার তুলে দিল। কাঁচের ভেতর দিয়ে শিখার বাবা চেয়ে রইলেন বাইরের আকাশের দিকে। একেবারে শান্ত, স্থির একটি বৃদ্ধের প্রস্তরমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল তাঁকে।

কতক্ষণ এমনি কাটল। বাইরের জগতের শীতের মাঠে পূর্ণিমার স্বপ্ন, কামরার ভেতর নীলাভ আলোর তরঙ্গ, মানুষগুলোর কর্মকোলাহল বন্ধ করে হঠাৎ নিজের ভেতর হারিয়ে যাওয়া, সবকিছু মিলে অলকের মনে হল, কেমন যেন একটা ঘুমের মিক্সচার। সে কখন যে ঐ কটা মিক্সচারের একটা দাগ খেয়ে ফেলল তা বোঝার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায়। দরজার কাছেই সিটের নম্বর পড়েছিল। চম্‌কে সিট্ থেকে উঠে দাঁড়াল অলক। শিখার বাবাকে সে তো এই মাত্র বসে থাকতে দেখেছে। একটুখানি তন্দ্রার বিচ্ছেদ। কোথায় গেলেন তিনি। বালিশ কম্বল তেমনি পড়ে। ছিট্‌কে অলক বাথরুমের দিকে চলে গেল। দরজা খুলে দেখল কেউ নেই। চোরের মত উঁকি দিয়ে দিয়ে আধো আলো অন্ধকারে সে প্রতিটি সিটের আশ পাশ তলা খুঁজে দেখল। কেউ নেই, গাড়ি চলছে। হঠাৎ কি মনে করে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এক ঝটকায় ভারী দরজায় টান দিতেই ভেজান দরজাটা খুলে গেল। হু হু করে কামরায় ঢুকে পড়ল শীতের হাওয়া। চেন টেনেই চীৎকার করে উঠল অলক, শান্তনু এ্যাকসিডেন্ট।

কামরার অনেকেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে ততক্ষণে। শান্তনু লাফিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শিখা উঠে দাঁড়িয়েছে। কি জন্যে চীৎকারটা হল, তার সঠিক কারণ বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রয়েছে। ট্রেনটা গতি কমাতে কমাতে থামল এসে একটা ছোট্ট স্টেশানে।

অলক ততক্ষণে শান্তনু আর শিখার কাছে এসে ইসারায় দেখিয়ে দিল শূন্য বাঙ্কখানা। তারপর খোলা দরজাটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে।

বাবা, বলে দুটো গাল চেপে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল শিখা। বাইরে শীতের রাতে সে চীৎকাব

ঝড়ের সমুদ্রে সাইরেণের মত শোনাল।

শিখার হাত ধরে টানতে টানতে শান্তনু নেমে এল গাড়ি থেকে। অলক ততক্ষণে লাইন ধরে ট্রেনের উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করেছে। শান্তনু শিখাকে ধরে ছুটতে লাগল অলকের পিছু পিছু।

ট্রেন লাইনের ধারের গাছগুলো জ্যোৎস্নার জলে যেন ডুবে আছে। ছায়াগুলো লাইন পেরিয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছে। মাঝে আলো ঠিকরে পড়ছে লোহার ঘষামাজা লাইনের থেকে। কয়েকটা অসংলগ্ন পায়ের আওয়াজ বেজে উঠছে।

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে যাবার পর অলক থেমে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর সেখানে এসে পড়ল আরও দুজন। একটা ঘন পাতায় ছাওয়া ছাতিম গাছের তলায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন শিখার বাবা। লাইনের ধারেই গাছটা। ট্রেন্ থেকে ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে গাছের তলায় এসে পড়েছেন। শিখা ডুকরে কেঁদে উঠতেই শান্তনু মুখে হাত রেখে তাকে বারণ করল। ওরা তিনজনেই নত হয়ে বসে দেখতে লাগল। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না। অধ্যাপক স্থির হয়ে আছেন। উন্মাদের কোন চিহ্ন নেই তাঁর চোখে মুখে। দুটি চোখ খোলা। আকাশের দিকে এখনও যেন চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ছাতিমগাছের পাতার ছায়াগুলো এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্বল জ্বল করছে কটা নক্ষত্র।

শান্তনু শিখার পিঠে হাত রেখে বলল, এখন কাঁদতে নেই শিখা। উনি এতদিন যাঁকে খুঁজে ফিরছিলেন আজ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দেখ, সমস্ত প্রকৃতি আজ নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওঁদের মিলন। চোখের জল ফেলোনা। বড় করুণ, বড় মধুর এ রাত।

কলকাতায় ফিরে এসে কটা দিন বড় বিষণ্ণ অবস্থায় কাটল সকলের। শিখা একদিন গেল গোপীনাথবাবুর অফিসে। পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল গোপীনাথবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, গোপীনাথদা, এটা কাজে লাগানোর আগেই বাবা চলে গেলেন। আর দরকার হবে না এর। আপনার দয়ার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

চোখটা ছলছলিয়ে উঠল শিখার।

গোপীনাথবাবু টাকাটা হাতে নিয়ে বললেন, রেখে যাও আমার কাছে। এই টাকায় তোমার নামে একটা এ্যাকাউন্ট খুলে দেব ব্যাঙ্কে। তারপর মাসে মাসে কিছু কিছু তোমার প্রাপ্য থেকে জমা দিয়ে গেলেই চলবে।

শিখা বলল, আমার নামে এ্যাকাউন্ট।

গোপীনাথবাবু বললেন, কাজ করছ, আর এ্যাকাউন্ট থাকবে না। কিছু কিছু ফোর্সড্ সেভিংশ ভাল। এ টাকাকে আমার দান বলে যেন ভেবে বস না। আমি ঠিকই কাজের থেকে কাটান করে নেব।

শিখা বলল, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনি করবেন।

গোপীনাথবাবু বললেন, তুমি কি আজ কাজ নিয়ে যাবে?

শিখা বলল, আজ হোক্ কাল হোক্ নিয়ে যেতে তো হবেই। কাজ নইলে আমার বা চলবে কি করে।

গোপীনাথবাবু বললেন, আমি তোমার মুখ থেকে ঐ কথাই শুনতে চেয়েছিলাম শিখা। কাজেব ভেতর জড়িয়ে থাকলে, তুমি তোমার দুঃখগুলোকে কিছু ভুলে থাকতে পারবে।

শিখা বলল, একটা অনুরোধ রাখবেন দাদা?

বল।

আমাকে আপনার অফিসের যে কোন একটা জায়গায় বসে যদি কাজ করতে দেন।

এ আর এমন কি কথা, বললেন গোপীনাথবাবু, তোমার যেখানে খুশি বসে কাজ করে যাও।

শিখা বলল, ঐ বাসাটাতে ঢুকতে গেলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, বাবা কত কষ্ট পেয়ে গেলেন। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে ঘরে পুরে শেকল তুলে রাখার কথা যখনই মনে পড়ে তখনই দাদা নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারি না।

গোপীনাথবাবু বললেন, প্রয়োজন বড় নির্মম শিখা। তুমি তোমার কর্তব্য করেছ, সেজন্য দুঃখ কব

না। যখন বাসায় একা একা মনে করবে তখন চলে এসো অফিসে, কোন বাধা নেই।

শিখা প্রণাম করতে যাচ্ছিল, গোপীনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, বার বার প্রণাম করতে নেই শিখা। আমরা এখন একই পরিবারের মানুষ। ঘরের লোককে কি ঘন ঘন প্রণাম করে পাগলী।

মাসখানেক পরের ঘটনা। শীত গিয়ে সবে দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া শহর কলকাতার বড় বাড়ি থেকে বস্তি বাড়ির জানালা দরজা খোলা পেলেই ঢুকে পড়ছে। কেউ তাকে দরজা জানালা বন্ধ করে শীতের হাওয়ার মত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখছে না। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে প্রেমিকার চিঠি পড়ার মত দু-একটা কোকিল সবে উড়ে এসে সন্তর্পণে উঁকিঝুঁকি মারছে ভিক্টোরিয়ার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। ময়দানে ট্রাম লাইন বরাবর বড় বড় ডালপালা ছড়ানো নেড়াগাছগুলোয় কে যেন রাতারাতি হাল্কা সবুজ ওপেল রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে। এমন একটা দিনে অলক ঢুকল শান্তনুর ঘরে। চেঁচিয়ে বলল, আজ রোববার, চা ভিক্ষে চাই বৌঠান।

ইদানিং অলক কাজলকে বৌঠান বলেই ডাকতে শুরু করেছে।

শান্তনু বলল, হতভাগা, সাতসকালে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে শুরু করলি কেন?

অলক বলল, কারণটা তো আগেই ঘোষণা করেছি।

শান্তনু বলল, আজ বারটা মনে আছে?

অলক বলল, ভট্টারক বার, মানে রোববার।

তবে?

অলক বলল, তাই তো উৎপাত করতে এলাম। তুমি যে এমন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছ তা কি জানি।

শান্তনু বলল, আয় বোস। সারা সপ্তাহটা অব্স্টাক্ল রেস করতে করতে রোববারটা একেবারে কাৎ হয়ে পড়ি। বাসি মুখে এক কাপ চা ছাড়া ওঠায় কার সাধ্যি।

অলক বলল, আমার তো আর সে সুযোগ নেই, তাই রোববার হলেই দরজায় দবজায় ধর্ণা দিয়ে বেড়াই।

শান্তনু বলল, বুঝেছি, শিবের চেলাকে সিদ্ধি দেবার পালা আজ আমার ঘাড়েই পড়েছে।

অলক চারদিকে তাকিয়ে বলল, বৌঠানকে দেখছি না যে। যাঁর নাম করে হাঁক পাড়লাম, তিনিই হাওয়া।

কাজল দু কাপ চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, চায়ের একটা কাপ একটু আগে হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে। তখনই বুঝেছি চায়ের ভাগীদার আসছে কেউ।

অলক কাজলের হাত থেকে চায়ের কাপটা ধরে নিয়ে বলল, আপনার অবশ্য করে বোঝা উচিত ছিল যে আমিই আসছি।

শান্তনু বলল, তোর বৌঠানকে তাহলে হাত গুণতে শিখিয়ে দিয়ে যাস্।

অলক বলল, এটুকু বুঝতে হাত গুণতে হবে কেন। না, দেখছি শান্তনুদা, ঐ ভোঁতা লোকগুলোব ফটো তুলতে তুলতে তোমার বুদ্ধিটাও কিছু ভোঁতা হয়ে এসেছে।

শান্তনু চেঁচিয়ে উঠল, স্ত্রীর সামনে এ কথা বলে ফেললি হতভাগা।

অলক জিভ কেটে বলল, এসব সিক্রেট এতাবৎ না জানার ফল।

কাজল বলল, আসল কথাটা চাপা পড়ে গেল যে অলকবাবু। আপনার আগমনটা আমার অবশ্য কবে জানা উচিত ছিল কেন বললেন না তো?

অলক বলল, কাপটা ভাঙার পরে বোঝা উচিত ছিল যে, এবার যে অতিথি আসছে তার ভাগ্যটাও ভাঙা। আব সেই ভাঙা ভাগ্যের একমাত্র অধিকারী বলতে তো, এই অধম বৌঠান।

শান্তনু বলল, তোর এত বুদ্ধি হয়েছে জানতাম না অলক।

কাজল বলল, বুদ্ধি না ছাই। আইবুড়ো মানুষগুলো সব আধ বুদ্ধি হয়।

শান্তনু ফোড়ন কাটল, আদার হাফের অভাবে।

অলক চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আজ বৌঠান একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। ফেলতে পারবেন না।

শান্তনু বলল, আর্জিটা প্রপার জায়গায় প্লেস কর।

অলক বলল, খুব হয়েছে, আর স্বামীত্ব ফলিও না শান্তনুদা। কোথায় কি বলতে হয় তা এ শর্মা জানে।

কাজল বলল, বলে ফেলুন চটপট। ওদিকে আঁচ রেগে গণগণ করছে।

অলক বলল, আজ বিকেলে একটু ভোজের ব্যবস্থা আছে। যৎকিঞ্চিৎ। না এলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব।

শান্তনু বলল, কার মুখ দেখে যে সকালে উঠেছিলাম, তাই এত বড় একটা সুসংবাদ শোনা গেল।

কাজল বলল, এমন ঘনঘটার কারণটা জানতে পারি কি ?

অলক বলল, কারণ অতি সাধারণ। যথাস্থানে গেলেই টের পেয়ে যাবেন। এখন আমি আসছি, আবার আসব চারটে নাগাদ। তৈরি থাকবেন।

অলক বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে শান্তনু বলল, বৌঠানের হাতের বেগুনীগুলো ছাড়লি তো হতভাগা।

অলক যেতে যেতে বলল, ওগুলো তোলা রইল পরের রোববারের জন্য।

অলক এল। চারটে বাজতে তখনও কিছু সময় বাকি।

কাজল বলল, আমি তৈরি অলকবাবু, এখন আপনার শান্তনুদাকে বলুন। ।

শান্তনু ঘরের ভেতর থেকে বলল, আজকাল প্যান্টগুলো এত রোগা রোগা হয়েছে যে তার ভেতর ঢোকে কার সাধ্যি।

অলক বলল, তার চেয়ে বল না, দিনে দিনে বপুর যে ভাবে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে প্যান্টগুলোকে মোটা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

শান্তনু জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল।

ক্যামেরাটা একটু নেবে শান্তনুদা।

শান্তনু বলল, ক্যামেরা আবার কি কারবারে লাগবে?

অলক বলল, এই এমনি বলছিলাম।

শান্তনু ঘরের ভেতর থেকে ক্যামেবাটা এনে অলকের হাতে দিয়ে বলল, নে ধর। সারা সপ্তাহ বইছি, আজ আর বইতে পারব না।

ক্যামেরাখানা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আগে আগে চলল অলক। শান্তনু আর কাজল চলল পেছনে।

এ্যায় ট্যাক্সি, ডাক দিল অলক।

কিরে, গুপ্তধন পেয়েছিস নাকি, বলল শান্তনু।

পেয়েছি দাদা, যথাস্থানে গেলেই দেখতে পাবে।

ওরা ট্যাক্সিতে উঠল। অলক বলল, রেস কোর্স।

শান্তনু বলল, বেস কোর্স কি রে অলক। বললি, খাওয়াবি, তা আজকাল রেস কোর্স খাওয়াবার জায়গা নাকি ? বরং গড়ের মাঠে লোকে জানি হাওয়া খেতে যায়।

চলই না শান্তনুদা। বৌঠানকে নিয়ে যাচ্ছি, আর যা করি ব্লাফ তো দিতে পারব না।

গাড়ি রেড রোড ধরে এল কিছুদূর। ভিক্টোরিয়া অবধি না গিয়ে অলক গাড়িটা রাস্তার ধারেই ছেড়ে দিলে।

ওরা নামল গাড়ি থেকে। ডানদিকে রাস্তা পেরিয়ে একটা মাঠের ভেতর মেহেদির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল। স্থানটা একেবারে নির্জন। মেহেদি বেড়ার ফাঁকটুকু আবিষ্কার কবতে না পারাব জন্যেই হোক অথবা এটা ফোর্ট এলাকার সংলগ্ন জমি ভেবেই হোক মাণিক-জোড়েরা এ জায়গাটাব সন্ধান রাখেনি।

একটুখানি গিয়েই একটা ছোট গাছেব তলায় বসল ওরা।

শান্তনু বলল, কি ব্যাপার বল দিকি !

অলক বলল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

এই বলে সে হাত ঘড়িটার দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল।

শান্তনু বলল, বাহবা দিতে হয় তোকে এ জায়গাটা আবিষ্কারের জন্যে। কলম্বাসের চেয়েও বড় আবিষ্কার সন্দেহ নেই। এ একেবারে প্রেমিকের ইডেন গার্ডেন।

কে যেন আসছে বলে মনে হল। হাতে ঝোলান একখানা ব্যাগ, সুন্দর পিঙ্ক রঙের একটা শাড়ি পরেছে।

এমন অবাক বোধহয় কোনদিনই হয়নি কাজল আর শান্তনু।

কাজল উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, শিখা!

শিখা ওদের সামনে ব্যাগটা বসিয়ে রেখে দিয়ে জড়িয়ে ধরল কাজলকে।

কাজল শিখার মুখটা তুলে ধরে বলল, সিঁথিতে সিঁদুর, আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকিরে।

শান্তনু বলে উঠল, স্বপ্ন হলেও সত্যি। তা তুই তো আমাকে কিছু বলিসনি অলক!

কাজল বলল, কালও শিখা গিয়েছে আমার সঙ্গে গল্প করতে। পেট থেকে একটা কথাও বেরোয়নি। ধন্যি মেয়ে বটে।

শান্তনু বলল, তোমার বান্ধবীটি ডুব সাঁতারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলতে হবে।

অলক বলল, অপরাধটা আমারই শান্তনুদা। ওকে মাথাব দিব্যি দিয়ে বাবণ করেছিলাম।

শান্তনু বলল, থাম্, বউ-এর পক্ষে আব সাফাই গাইতে হবে না।

কাজল আর শিখা বসল পাশাপাশি।

শান্তনু বলল, উঁহু, ওখানে নয় কাজল, সরে এসো আমাব কাছে।

কাজল শান্তনুর হাতে ক্যামেরা দেখে উঠে এল হাসতে হাসতে।

অলককে শিখার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল শান্তনু, যা প্লেস ঠিক করে নে।

কয়েকখানা ছবি সট্ সট্ করে তুলে নিল শান্তনু। বলল, নিজের স্টুডিও ছেড়ে বিশ্বকর্মার স্টুডিওতে এলি ছবি তুলতে। বেলা শেষের আলোটা বড় মিঠে হয়ে পড়েছে শিখা দেবীব মুখে।

শিখা বলল, কাজল, তোর পারমিশান নিয়ে বলছি, আজ থেকে তোর বব আমারও দাদা।

কাজল বলল, আজ বর দিতেই তো বেরিয়েছি। যা অভিরুচি তোর তাই হবে।

শিখা শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, আজ থেকে দেবী অগ্নিশিখা আব শিখাদেবীব অন্ত ঘটল। এখন থেকে শুধু শিখা।

শান্তনু হেসে বলল, বেশ তাই হবে।

ফটো তোলা শেষ হলে অলক বলল, এবার শান্তনুদা কিছু খাবার ব্যবস্থা কবা যাক্। ঐ খাবারেব ব্যাগটি এতক্ষণ আগলে উনি একাই বসেছিলেন ভিক্টোরিয়ায়। আমি গিয়েছিলাম তোমাদের আনতে। ঠিক সাড়ে চারটেয় কথা ছিল শিখা ঢুকবে এই কুঞ্জে। কথা রেখেছে ও। তবে বলতে পারছি না ব্যাগেব অবস্থাটা ঠিক আছে কি না।

শিখা তেড়ে উঠল, তোমার মত লোভী পেয়েছ আর কি।

শান্তনু বলল, আজ ঝগড়া নয় শিখা। খাই খাই বাইটা ছেলেদের একটু বেশিই থাকে।

ওরা প্রথমে দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ পেল। সকালেই ওখানে গিয়েছিল দুজনে। মন্দিরের সিঁদুর নিযে অলক পরিয়ে দিয়েছে শিখার সিঁথিতে। তারপর ফিরে এসে নিজের হাতে বসে বসে খাবার তৈরি করেছে শিখা।

সবাই মিলে খেতে খেতে টুকরো টুকরো গল্প কবল। গঙ্গাব দিকে মেঘে মেঘে অস্ত সূর্যেব বঙ লাগল। একটা বাঁশি বাজল জাহাজের। ওরা এবার উঠে পড়ল।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুযে কাজল বলল, সত্যি অবাক করে দিলে ওরা।

শান্তনু বলল, আমি খুশী হয়েছি কেন জান, তোমার আমার অনেককালের বিবাদটা মিটল বলে।

কাজল বলল, আমি ঐ ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম শিখাকে, কবে ওদের প্রথম কথা দেয়া নেয়া হল।

শান্তনু বলল, আমি অনুমান করছি, রাঁচি থেকে ফিরে এসে।

ঠিক ধরেছ, কাজল বলল, ঐ রাঁচিব পথেই নাকি মানুষটার আসল পরিচয় ও পেয়েছে। তারপর ফিরে এসে মাত্র দুবার অলক গিয়েছে ওর বাসায় ওকে সান্ত্বনা দিতে। তারই ভেতর ওরা ভেবে নিয়েছে, ঘর বাঁধলে ওরা সুখীই হবে।

শান্তনু বলল, সুখী হোক্ ওরা। দেখ কাজল, বড় অশান্ত জীবন ছিল ওদের দুজনের। অনিশ্চয়তার ভেতর কেবল ঘুরে ফিরছিল। এখন দুজনে দুজনকে চিনেছে। এর ভেতর আর কোন ফাঁকি রইল না।

কাজল বলল, দেখ, এক সময় ওর বাবার কথা মনে করে শিখা চোখের জল ফেলছিল। আমি বললাম, আজকের দিনে এমন করে না শিখা। ও কি বলল জানো। অলক আমার বাবার দান। বাবাকে না হারালে অলকের মনটাকে জানতে পারতাম না। বাবাই আমাদের মিলনটা ঘটিয়ে দিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারলেন না একসঙ্গে আমাদের দুজনকে।

শান্তনু বলল, কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে অলকের বিয়ের খবরটা।

কাজল বলল, ওসব করতে যেও না। যাদের টাকা পয়সা অঢেল অথচ খরচের পথ নেই, তারা ঐ সব বিয়ের ফটো আর খবর ছাপায়। খবরের কাগজে, ইংরাজী, বাংলা সাপ্তাহিক, মাসিকে দেখে কালচার্ড লোকেরা হাসে। ছেলে ছোকরারা বউটির চেহারা দেখে মজা পায়। আর আত্মীয় স্বজনেরা বিয়েতে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ছাপা নামের তালিকা থেকে তাদের নামটা বাদ পড়েছে কিনা দেখে নেয়।

শান্তনু বলল, দারুণ কথা বলেছ তো কাজল। আমরা ছবি তুলতে যাই, ছাপাইও, কিন্তু কথাগুলো তো মনে আসেনি।

কাজল বলল, এমনি করে মানুষ তার ভ্যানিটি স্যাটিসফাই করে। বাবা মা অথবা প্রিয়জনের মৃত্যুর তারিখ স্মরণ করার ভেতরেও ঐ একই প্রচারের ইচ্ছা। বিগত প্রিয়জনের স্মৃতি কত পবিত্র। সে স্মৃতি স্তব্ধ হয়ে স্মরণ করবার। অথচ তাকেই আমরা প্রচার করছি খবরের কাগজের মাধ্যমে। মৃত আত্মা যদি থেকে থাকে তাহলে তা অন্তরের আকুল ডাকে যতখানি সাড়া দেবে, খবরের কাগজ পড়ে নিশ্চয় ততখানি নয়।

শান্তনু বলল, এ সব তুমি বুঝি ভাব কাজল তোমার অবসর সময়ে।

কাজল বলল, একটু ভাবলেই এ সব ফাঁকগুলো সকলেরই চোখে পড়ে।

শান্তনু বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমাব আর গোপীনাথদার ভাবনার অনেক মিল আছে।

কাজল হেসে বলল, কি রকম?

শান্তনু বলল, কথায় কথায় গোপীনাথদাকে একদিন ধরে বসলাম, মদটা ছেড়ে দিন না দাদা।

গোপীনাথদা অমনি বললেন, তুই তোর বউকে ছেড়ে দিতে পারবি?

বললাম, না।

তবে আমাকে মদ ছাড়তে বলছিস কেন হতভাগা। আমার বউ নেই, মদ আছে।

বললাম, দুঃখ ভোলার জন্যে বহু লোকে মদ খায়, আপনার বেলায়ও কি তাই?

গোপীনাথদা তেড়ে উঠলেন, ওসব নাটক নভেল সিনেমার কথা। সব ব্যাটা নেশার ঘোরে খায়। দুঃখ ভোলাটোলা একদম গাঁজাখুরি। সে রকম মক্কেল লাখে যদি একটা মেলে।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, এই যে ইয়ং জেনারেশনটা জলের বদলে মদ গিলে যাচ্ছে, এও কি দুঃখ ভোলার জন্যে?

বললাম, পাশ করলে চাকরী নেই, একটুখানি আশার আলো নেই, যাদের ভালবাসছে তাদের ঘরে তুলে আনার সংগতি নেই, সে দুঃখ কি কম।

গোপীনাথদা বললেন, তুই সেই গাধাই রয়ে গেলি শান্তনু। মদ কেনার যদি পয়সা জোটে তাহলে সে ভিখারী হল কি করে। সামান্য টাকায় উদ্যোগী মানুষ কপাল ফিরিয়ে ফেলছে। পড়ে পড়ে কাঁদলে কেউ খাবার নিয়ে সেধে আসবে না শান্তনু। অন্যের দিকে তীর্থের কাকের মত না তাকিয়ে নিজে

কতটুকু কি করতে পারি সে চেষ্টা আমরা কজন করছি বল। খালি মদ কেনার রেস্ত আছে, স্বাধীনভাবে কাজ করার রেস্ত নেই। তোর কথা শুনে মনে হয় ছেলেগুলো যেন কাজ না পাওয়ার শোকে আকুল হয়ে সোমরসের সাগরে সাঁতার কাটছে। ·

বললাম, এ তো সঙ্গদোষ হতে পারে দাদা। সমাজের সব স্তবেব দাদারা টানছে দেখে তাদেরও ইচ্ছে জেগেছে।

গোপীনাথদা বললেন, ঘাটে আয়, এতক্ষণ এলোপাথাড়ি সাঁতার কেটে কেটে খাবি খাচ্ছিলি কেন। এই যে দেখছিস, আমাদের মত মদো মাতাল দাদারা, আমরাই সাতসকালে ওদের বারটা বাজিয়ে দিয়েছি। আমাদের ভেতর যারা আবার একটু বেশিরকম আঁতেলেক্‌চুয়েল তারাই আবার ব্রিলিয়েন্ট ছেলেগুলোর চুলো খুঁড়তে বেশী ওস্তাদ।

বললাম, গোপীনাথদা, মদ খাওয়া আজকাল স্টাইলে দাঁড়িয়ে গেছে। মদ যে খায় না, সে অষ্টাদশ শতাব্দীর পিউরিটান।

গোপীনাথদা বললেন, ছোঁড়াগুলোর গুরুরা সব বাইরে হাওয়া বদল করতে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এসেছে। ওদের গুরুর গুরুরা কানে মন্ত্র দিয়ে বলেছে, কারণ বারি পান, কারণ বারি প্রচার, এই একমাত্র সারাৎসার। এই মন্ত্রে শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই দেশজুড়ে ঐ মন্ত্র জপ চলছে।

বললাম, শোনা যায় নাকি সারা দুনিয়ার ইয়ং জেনারেশনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য কোন কোন মহান দেশের এই ব্যবস্থা।

গোপীনাথদা তেড়ে উঠে বললেন, তোকে খুব দামী দুষ্প্রাপ্য একটা বিষ দিচ্ছি, তুই গিলে ফেলতে পারবি? ভোজবাড়িতে জোর সাঁটিয়ে শরীর খারাপ করে যে ভোজবাড়ির অপবাদ দেয়, তার মত আহাম্মক কটা আছে বল। তাই বলি অন্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের ঘর নিজেকেই সামলাতে হয়।

শেষে গোপীনাথদা কি বললেন জান কাজল।

কি?

বললেন, শালা পাঁড়মাতাল শোনাচ্ছে ধর্মের কাহিনী।

এই বলে হো হো কবে হাসতে লাগলেন।

কাজল এবার অন্য কথায় মোড় ফেরাল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, শিখা আর গোপীনাথদার অফিসে প্রুফ দেখার কাজ করবে?

শান্তনু বলল, না করার কি আছে বল। দুজনে রোজগার করে সংসারটাকে আরও ভাল করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাজল। পরে বলল, আমি বুঝি, সংসারে তোমার একার ওপর বড় বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। আমি তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারছি না।

এ কথা কেন কাজল। শান্তনুর গলায় দুঃখ আর ক্ষোভের সুর।

যা সত্যি তাই বলছি।

শান্তনু বলল, সত্যিগুলো বড় বেশি নির্মম শোনাচ্ছে না?

কাজল শান্তনুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, সারাদিন তোমার খাটুনি। কত কষ্ট হয়, আমি কি কিছুই বুঝি না।

শান্তনু বলল, ঘরে এলে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায় কাজল। তুমি যখন আপন মনে গুণ গুণ করে গান গাও তখন আমি কান পেতে শুনি। তার প্রতিটি কথা প্রতিটি সুর মনে হয় যেন আমারই জন্যে তৈরি। আমার জন্যেই তুমি এমন করে গাইছ। তোমাকে এই গানের জগৎ, এই শান্তির জগৎ থেকে অন্য কোথায় সরিয়ে রাখি বল! তুমি আমার আকাশ কাজল। আমি তোমার ঐ শান্ত সুনীল মনটার ওপর মেঘের খেলা খেলি, রোদের হাসি ছড়াই, বৃষ্টির ধারা ঝরাই।

কাজল শান্তনুকে নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি কবি, তুমি আমার কবি। আমি তোমাকে গান শোনাব, শুধু গান শোনাব।

ধীরে ধীরে সুর এল কাজলের গলায়।

'তোমায় গান শোনাব
তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখ জাগানিয়া।।'

গান কখন থেমে গেল। ওরা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল দুজনে দুজনের ভেতর। এক মধুর প্রশান্তি সারাক্ষণ গন্ধরাজের গন্ধের মত ছেয়ে রইল ওদের অন্তর।

কদিন দারুণ উত্তেজনার ভেতর কাটছে ওদের। ছবি বাছাই, এনলার্জ, পুরোনো হাজার নেগেটিভ নাড়াচাড়া করা, এমনি সব কাজে মগ্ন হয়ে আছে ওরা। ওদিকে শান্তনু অফিস ভুলে প্রায় সময় পড়ে আছে অলকের স্টুডিওতে। নেগেটিভ ডেভেলাপ করা হচ্ছে। কম বেশি নানা ধরনের আলোর এক্সপেরিমেন্ট চলেছে।

আর সাতটি দিনও হাতে নেই এগজিবিশানের। শান্তনুর একক ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে ইনফরমেশান সেন্টারে।

শান্তনু একসময় দৌড়ে এসে কাজলকে বলল, কেরালার সেই নৌকো প্রতিযোগিতার ছবিটা পাচ্ছি না তো!

কাজল কাজ করছিল। বলল, এত ব্যস্ত হয়ো না, সব আছে। তোমার মত অগোছাল তো আমি নই, সব লিস্ট করে রাখা আছে আমার খাতায়। কোথায় কোন নেগেটিভ গ্রুপে কি আছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা পাবে আমার কাছে।

শান্তনু দুহাতে কাজলকে জড়িয়ে প্রায় তুলে ধরছিল আর কি।

অ্যায়, কি করছ, ছাড়ো ছাড়ো, পড়ে যাবো যে।

কাজলকে ছেড়ে দিয়ে শান্তনু খুশীতে ফেটে পড়ে বলল, তাই তোমাকে এত ভালবাসি কাজল। তুমি আমার সংসারে মূর্তিমতী শৃঙ্খলা।

কাজল বলল, তা বলে শৃঙ্খল পরাই নি কিন্তু মশাই।

কাজল উঠে গিয়ে খাতা দেখে নেগেটিভের তাড়া থেকে ঐ বিশেষ ছবিটি বের করে এনে শান্তনুর হাতে দিল। শান্তনু অতঃপর মুহূর্তে উধাও। কাজল বসল নেগেটিভ বাছাই-এর কাজে। খানিক পরে শিখা ঘরে এসে ঢুকল।

কাল রাত দুটোয় স্টুডিও থেকে ফিরেছে অলক। শিখা বলল।

কাজল অবাক। বলল, এত দেরী করল কেন রে? ও তো এসেছে এগারোটায়।

শিখা তার নির্দিষ্ট কাজে হাত লাগিয়ে বলল, শান্তনুদার কাজের পরে অন্য কটা আর্জেন্ট ছবি ছিল, তাই করতে রাত কাবার।

কাজল কাজ করতে করতেই বলল, কি করছিলি ভাই এত রাত জেগে?

শিখা ঠোঁট উল্টে বলল, আমার ভারি বয়েই গেছে সারারাত জাগতে।

থাম্ বাজে বকিসনে। একটা মানুষ সারা রাত ঘরের বাইরে আর তুই নাকে সরষের তেল ঢেলে ঘুমুচ্ছিলি, এই নির্জলা মিথ্যেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস।

শিখা হেসে ফেলল, তুই অভিজ্ঞ তো, তোকে আর ফাঁকি দেবো কি করে। কাল রাত দুটো অবধি কেঁদে কেঁদে চোখের জল শেষ করেছি।

কাজল বলল, জানিস কশ্চিনকালেও বলবে না যে ফিরতে দেরী হবে। তুই ভেবে ভেবে মর আর কি। আচ্ছা শিখা, এগুল্যোকি ওদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নাকিরে?

শিখা বলল, ওরা ভাবে, দেরি করি আর যাই করি, বউ তো রয়েছে ঘরে। তাকে হারাবার তো ভয় নেই। একটু না হয় কান্নাকাটি করবে। আদর করে দিলেই ঠাণ্ডা। অতএব যা ইচ্ছে তাই করে যাও।

কাজল কাজ করতে করতেই বলল, জানিস এসব রেসপনসিবিলিটির অভাব।

শিখা বলল, যা বলেছিস ভাই।

কাজল বলল, ভালবাসে বুঝি, তাবলে কাঁদানো তো ঠিক নয়।

শিখা বলল, ওদের মাথার স্ক্রুগুলো এমনভাবে তৈরি করে রেখেছেন বিশ্বকর্মা যে ঝটপট এদিক ওদিক ঘুরে যায়।

কাজল হেসে বলল, ভাল করে টাইট দিতে ভুলে গেছেন আর কি ?

শিখা বলল, মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে আচ্ছাসে টাইট দিয়ে দিই।

পর্দার বাইরে জোড়া গলার হো-হো হাসি শোনা গেল। পর মুহূর্তেই অলক আর শান্তনু ঘরে ঢুকল।

শান্তনু শিখার দিকে তাকিয়ে বলল, দাও টাইট দিয়ে, হতভাগাকে ধরে এনেছি।

শিখা অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগল।

কাজল বলল, তুমি বাদ যাবে মনে করেছ, ও আশাটি করো না।

শান্তনু কাজলের দিকে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাস হাজির।

অলক বলল, বৌঠান স্ক্রু-ড্রাইভারটা এনে দেব কি ?

কাজল আর শিখা ওদের রকম দেখে হাসতে শুরু করে দিয়েছে।

হাসি থামলে কাজল বলল, এখন কি জন্যে সাত তাড়াতাড়ি আগমন বল দেখি?

অলক বলল, অধমের স্টুডিও অঞ্চলে দীপ নির্বাপিত, সমীরণ প্রবাহও বন্ধ। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের বলী।

শান্তনু বলল, তার মানে কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ। ফাঁকির ষোলকলা পূর্ণ।

অলক বলল, বৌঠান, এখন নেগেটিভ ছেড়ে পজেটিভ কিছু করুন।

শান্তনু বলল, দারুণভাবে অভুক্ত।

কাজল গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, কি মিথ্যুক, সকালে চিড়েভাজা আর চা খেয়ে গেলে না।

শান্তনু বলল, আজকাল তুমি তোমার কোন্ পোষ্যপুত্তুরের কাছ থেকে যে চিঁড়ে আনতে আরম্ভ করেছ, গালে দেওয়া মাত্রেই হাওয়া। খেলাম কি না খেলাম, বোঝাই গেল না।

অলক বলল, আমি শান্তনুদার সঙ্গে একমত। সবচেয়ে সেরা চিঁড়ে ঘিয়ে ছেঁকে তুলে খাবেন তাঁরা, যাঁরা ফিন্‌ফিনে চুনট ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়ান। আমরা দিনমজুর, চিঁড়ে ভাজার বদলে চালভাজাই আমাদেব মহাপ্রসাদ। খেলে বোঝা যায়, একটা কিছু খাচ্ছি।

শিখা বলল, তাহলে এবার থেকে লোহার বল বিয়ারিং কিছু কিনে এনে রাখব। পকেটে নিয়ে যেও, ক্ষিদে পেলে মুঠো কবে খেও। মনে হবে গলা দিয়ে কিছু একটা নামছে।

কাজল বলল, আয় শিখা, রাক্ষস দুটোকে আগে বিদেয় করি, নাহলে কাজকর্ম সব পণ্ড।

চার জনের খেতে খেতে পরিকল্পনা আর ছবি বাছাই শুরু হল।

শান্তনু বলল, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মেয়েদের ছবিগুলোকে আলাদা করে সাজাতে হবে।

কাজল অমনি বলে উঠল, ঐ গ্রুপটার নাম দাও, 'ওরা কাজ করে।'

হৈ হৈ করে উঠল আর সবাই, দারুণ নাম হয়েছে।

শান্তনু বলল, সাধে কি তোমাকে বলি 'জিনিয়াস'।

কাজল বলল, কখ্খনো বল নি।

শান্তনু বলল, এইমাত্র বললাম তো।

এই গ্রুপেব ছবিগুলোর ভেতর ওরা নির্বাচন কবল : আদিবাসী বিহারী বমণী হাট থেকে ফিরছে। বাঁ-কাখে একটা বাচ্চা। ডান হাতে ঝুলছে সওদার পুঁটুলি। মাথায় চারটে বড় বড় হাঁড়ি। সবাব শেষেরটা কাৎ হয়ে আছে। কোমরে আর বুকে সামান্য কাপড় জড়িয়ে হেঁটে চলেছে মেয়েটি অবলীলায়।

দ্বিতীয় ছবি : তেলেগু নুলিয়া মেয়েরা মাথায় মাছের চুবড়ী নিয়ে চলেছে হাটের পথে।

তৃতীয় ছবি : ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে দুটি মেয়ে। পায়ের ঘায়ে ঢেঁকি একেবারে স্বর্গে উঠেছে।

শিখা বলল, সাব টাইটেলে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও' নাম দিলে কেমন হয়।

শান্তনু বলল, আশ্চর্য তো, মেয়েরাই দেখছি বাজীমাৎ করছে।

অলক বলল, আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না বলে।

কাজল ফোঁস করে উঠল, ঘামান না মশাই, কে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছে।

তারপরের ছবি এল : চা তুলছে তিনটি মেয়ে। পেছনে ঠিক তিনটি পাইন গাছের ফাঁকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে।

পরেরটি : কাশ্মীর কন্যা ছোট্ট নৌকোয় করে ফুল বেচতে বেরিয়েছে। মুখের হাসি যেন ফুল ছড়াচ্ছে।

অন্য ছবিতে : কুমায়ুনের ঘাসোয়ালী মেয়েরা অদ্ভুত ঝোলা পোশাক পরে, ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে, হাতে কাস্তে ধরে উঁচু-নীচু পথে ঝর্ণার মত এঁকে বেঁকে চলেছে।

আর একখানা ছবিতে : ভেড়ার পাল চরাচ্ছে একটি গুজর মেয়ে। গা ভর্তি রূপোর গয়না।

এমনি অজস্র ছবি শান্তনুর সংগ্রহ থেকে ওরা বেছে নিল।

এবার অন্য গ্রুপ। নৌকোর বিচিত্র রূপ আর বাহারের ছবি।

তালের ডোঙায় চড়ে ন্যাংটো দুটো ছেলে। একজন লগি ঠেলছে, অন্যজন শালুক তুলছে।

কলার মান্দাসে চেপে ঘুরিয়ে দীঘিতে জাল ফেলছে জেলে। ছত্রাকার জালটা ফটোতে ভারী সুন্দর ধরা পড়েছে।

খড় বোঝাই নৌকোর সারি। গুণ টেনে চলেছে দাঁড়ি। হালে বসে মাঝি একহাতে হুঁকো টানছে অন্য হাতে ধরা রয়েছে হাল।

পুরীর সমুদ্রে পাল তুলে এগিয়ে আসছে দীর্ঘ একসারি নৌকো। অন্ধ্র নুলিয়ারা এই নৌকোয় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়ায়।

অন্য একটি সিল্যুয়েট ছবি। তেলেগু নুলিয়ারা ভোরবেলা ভাসাচ্ছে কাঠের জোড়া লাগান সরু সরু নৌকো। মাথায় লম্বা টুপি। ঢেউ-এর চূড়োয় প্রথম আলোর টুকরো ঝলমল করছে।

কেরালার লম্বা মাথা-উঁচু শত দাঁড়ের নৌকোগুলো তীরবেগে জল কেটে চলেছে। নৌকোর বাইচ-প্রতিযোগিতা।

শেষেরটি : কাশ্মীরের সুন্দর সাজানো শিকারা। নৌকোর ওপর পাল্‌কীর মত ঘর। চারদিক খোলা। ঝালর লাগানো। ভেতরে মুখোমুখি দুটি সিংহাসনে অপরূপ সাজে সজ্জিত বর-বধূ বসে।

অলক বলল, কি নাম দেবে এ গ্রুপের?

শান্তনু বলল, ডি. এল. রায়ের গানের একটা লাইন যদি দেওয়া যায়, 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই।' অবশ্য 'এসে'র জায়গায় 'করে' দিয়ে দিলেই ভাল হয়।

কাজল বলল, 'জল বিহার' দিলে কেমন হয়?

শিখা বলল, ওটা ওদের দিয়ে দে। একেবারে সব কটা জিতে নিলে বেচারারা নার্ভাস হয়ে পড়বে।

কাজল বলল, তথাস্তু।

শান্তনু বলল, চাইনে তোমাদের করুণার দান। 'জলবিহার'ই সই।

কাজল বলল, আহা রাগ করছ কেন। নামটা তোমার সত্যিই ভাল হয়েছে।

অলক বলল, বৌঠানের 'জলবিহার' নামটাও থাকবে সাব টাইটেলে। শিকারার যাত্রী বর-বধূর ছবির নীচে।

এবার অন্য একটা গ্রুপ। বিস্ময়কর অতর্কিত মুহূর্তগুলি ধরা পড়েছে শান্তনুর ক্যামেরায়।

একটি সাপ প্রায় লেজের ওপর ভর দিয়ে ক্রুদ্ধ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর লাফ দিয়ে একটা বেঁজী শূন্যে ধরেছে ঠিক ফণার নীচের অংশটা।

আর একটি ছবিতে একটি মহিলা তের তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে যাচ্ছেন। আত্মহত্যার সেই মুহূর্তটি কি করে যে ধরল শান্তনু তা সত্যিই এক অবাক বিস্ময়।

শিখা বলল, এ ছবি কি করে তুমি তুললে শান্তনুদা?

বরাত শিখা, বলল শান্তনু। যাচ্ছিলাম বাড়িটার পাশ দিয়ে। দেখলাম পথের ওপর দাঁড়িয়ে কটা লোক আঙুল তুলে কি দেখাচ্ছে। প্রথমটা মনে হল মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই, একটা কিছু দেখলেই হল। পরে, যেহেতু আমি মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত, সেহেতু আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। একটি মেয়ে ততক্ষণে আলসের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঝট করে হাতখানা চলে এলো ক্যামেরায়। ইনফিনিট দিয়ে পাঁচশো স্পীডে ক্যামেরা সেট করে দাঁড়িয়ে রইলাম ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে। মেয়েটি আলসেতে উঠেই ঝাঁপ দেয়নি, তাই রক্ষে। নইলে অসম্ভব হত ছবিখানা নেয়া। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ও দাঁড়িয়েছিল প্রার্থনার ভঙ্গীতে। তারপরই দিল ঝাঁপ। ক্যামেরায ওকে ধরে ফেললাম। সবসুদ্ধ মিনিটখানেকের ভেতর ঘটে গেল ঘটনাটা।

এর পরের ছবিটিও সাংঘাতিক। চার-পাঁচটি তরুণ মিলে অন্য একটিকে ঘিরে ফেলে স্ট্যাব করছে। ছোরাটা প্রায় আধখানা ঢুকে গেছে কাঁধে।

অলক বলল, এটা যখন শান্তনুদা তোলে তখন আমি ওর পাশে বসে একই ট্রামে চলেছিলাম। হঠাৎ একটা ছেলে ট্রামের ড্রাইভারের কাছে এসে বলল, গাড়ি থামাও, চালিয়েছ কি ধড় থেকে মুণ্ডু খসিয়ে দেব। ট্রাম থেমে গেল। গেটের মুখে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। একটি তরুণ, বাঁচাও বাঁচাও চীৎকার করছে। তিন চারটে তারই বয়েসী ছেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে নামাল রাস্তায়। ড্রাইভারের কাছে দাঁড়ান ছেলেটি তখন দৌড়ে নেমে গেল নীচে। তারপর বসিয়ে দিলে ছুরিখানা। শান্তনুদার ক্যামেরাখানা সামান্য ক্লিক করে উঠল।

কাজল বলল, আপনারা এতগুলো লোক ট্রামে বসে দেখলেন ঘটনাটা। কেউ এগিয়ে গেলেন না।

অলক বলল, ওরা তো মারবার জন্যে মরীয়া হয়েই আছে। আমরা এগোলে আরও কয়েকজন বলী প্রদত্ত হতাম।

শান্তনু বলল, তাছাড়া বুঝছ না কেন, ওদের পকেটে বোমা, হাতে ছোরা আর পাইপগান। আমরা যে একেবারেই নিরস্ত্র। বাগে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাহস করে এগিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে কোনকিছু করা সম্ভব নয়, সেখানে মূর্খের মত এগিয়ে গিয়ে শহীদ হওয়ার অর্থ হয় না।

শিখা বলল, তার চেয়ে তুমি অনেক বেশি কাজ করেছ শান্তনুদা। একটা অশান্ত যুগের ইতিহাসকে ধরে ফেলেছ।

শান্তনু বলল, দেখ, কোনকিছু অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনলেই যেমন নেপালী দরোয়ানদের হাতটা আগে ভোজালীতে গিয়ে পড়ে, তেমনি ছবির গন্ধ পেলেই ফটোগ্রাফারের হাত গিয়ে পড়ে ক্যামেরায়। তখন পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ কই, ছবি শিকারেই ব্যস্ত।

ব্যাঙ্ক ডাকাতির ছবিটিও বেশ থ্রিলিং। কালো পোষাক আর কালো গগল্‌স্ পরা একটি লোকের হাতে স্টেনগানটি ধরা আছে। তার চোখ পথের দিকে। পেছনে একটি বাড়ি। লেখা আছে বিশেষ একটি ব্যাঙ্কের নাম।

অলক বলল, শান্তনুদা, এ ছবি তো আমি দেখিনি। ব্যাপারটা কি বলতো? কি করে তুললে?

শান্তনু বলল, প্রেসের গাড়ি করে ফিরছিলাম একটা বিশেষ জায়গা থেকে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। পথে গাড়ি ঘোড়া অনেক কম। রোদ্দুরে লোকজন বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ফটাফট গুলির আওয়াজ শুনলাম। গাড়িটা থেমে গেল পথের ওপর। ড্রাইভার বলল, ঐ ব্যাঙ্ক ডাকাতি হচ্ছে।

ঝট করে টেলিলেন্সটা লাগিয়ে গাড়ির ফাঁকে ঐ কালো গগল্‌স্ পরা লোকটার ছবি তুলে ফেললাম। ও লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে যাচ্ছিল। যাতে বাইরের লোক আতঙ্কে ওদিকে ভীড়তে না পারে।

কাজল বলল, এ গ্রুপটার কি নাম দেওয়া যায়। এটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার।

শান্তনু বলল, পুরস্কার ঘোষণা কর কাজল।

কাজল বলল, তোমাব ছবি, তুমিই ঘোষণা কর।

শান্তনু বলল, ছবিও তুলব আমি, আর পুরস্কারও দেব আমি, তা মন্দ নয়।

শিখা বলল, সত্যি কাজল তা হয় না। শান্তনুদা যে এ ছবিগুলো তুলেছেন এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি না হয় পুরস্কার ঘোষণা করছি। রোববার লাইট হাউসে বিজয়ীর অনারে সিনেমা দেখাব।

শান্তনু বলল, পতিগর্বে তোমারও কিছু করা উচিত কাজল।

কাজল বলল, বেশ, সিনেমা দেখে ফেরার পথে 'হাতারী'তে ডিনার খাওয়া যাবে।

অলক বলল, কিন্তু সব ব্যাপারটাই যে কেমন জগা খিচুড়ী হয়ে গেল। ওঁরা দুজন খাওয়ানোর ভার নিলেন, কিন্তু যদি ওঁদের ভেতর একজন জিতে যান? তাহলে বিজয়ী কি গাঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়াবে?

কাজল বলল, ঠিক আছে, ছেলেদের ভেতর কেউ জিতলে আমরা দুজন সিনেমা দেখানো আর খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব, আর আমাদের কেউ জিতলে আপনাদের দুজনকে ঐ ব্যবস্থা করতে হবে।

শান্তনু বলল, এতে আমি বাদ পড়লাম না, তাহলেও রাজি।

এবার চার মূর্তি ভাবতে বসল।

অলক গিয়ে বসল জানালার ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ও।

শান্তনু বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় কাৎ হয়ে আকাশ পাতাল ভেবে চলল।

কাজল বলল, চল, শিখা, আমরা ও ঘরে যাই। এরা বড় অপয়া, এদের মুখ দেখলে কিছু মনে আসবে না।

শান্তনু বলল, অবজেকশান।

হাসতে হাসতে শিখা আর কাজল উঠে গেল।

শান্তনু হেঁকে বলল, পনেরো মিনিট সময়। কাগজে লিখে এনো।

ওরা নির্দিষ্ট সময়ে এসে জড়ো হল বসার ঘরে। কে আগে পড়বে। সবাই সবাইকে আগে পড়তে বলে। শেষে ঠিক হল, আগে শান্তনু, তারপর শিখা, তারপব কাজল, সবার শেষে অলক।

শান্তনু বলল, চকিত চমক।

শিখা বলল, রোমাঞ্চ সিরিজ।

কাজল বলল, আমারটা ভীষণ বাজে হয়ে গেছে।

অলক বলল, মৎ ঘাবড়াইয়ে বৌঠান।

কাজল বলল, মরণের ডঙ্কা বাজে।

অলক বলল, অভাবিত মুহূর্ত।

অনেক বিচার বিবেচনার পর অলকের নামটাই গৃহীত হল।

শান্তনু বলল, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

কাজল বলল, একেই বলে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

শিখা অলকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল।

শান্তনু বলল, সত্যি অলক আব শিখা দুজনের নামকরণই তুল্যমূল্য বলা যায়।

কাজল বলল, একশো বার সত্যি।

ওরা চারজনেই বেরল 'ছায়ার মায়া' অফিসে। এগজিবিশান উদ্বোধনের লোক চাই। আনুষ্ঠানিক সভাপতিও একজন দরকার। এ বিষয়ে গোপীনাথদার মতামত নেওয়া দরকার। তিনিই শান্তনুর মাথায় প্রথমে এগজিবিশানের আইডিয়া ঢুকিয়েছেন।

ওদের চারজনকে একসঙ্গে দেখে গোপীনাথবাবু বলে উঠলেন, ধর্মঘটী শ্রমিকের মিছিল বলে মনে হচ্ছে। দাঁড়া, আগে পুলিশে খবরটা দিয়ে রাখি।

শান্তনু বলল, তাব আগেই আপনার টেলিফোনের তার কেটে দেব গোপীনাথদা।

গোপীনাথবাবু হেসে বললেন, তোরা সব পারিস। অকর্ম করতে তোদের জুড়ি কটা আছে বল?

অলক বলল, কি অকর্ম করলাম গোপীনাথদা?

গোপীনাথবাবু বললেন, ঐ যে শান্তনু রাস্কেলটা যে কর্ম করল, তুইও সেই কর্ম করলি। দুটো

ভালমানুষ মেয়েকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে ঘরে এনে এখন দুঃখ দিচ্ছিস।

শান্তনু বলল, দুঃখ দিচ্ছি গোপীনাথদা।

গোপীনাথবাবু বললেন, না, তোদের কাছে এসে ওরা সুখসাগরে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোবা দুটোই ফটোর কারবারী। তার মানে, জলজ্যান্ত মানুষগুলোকে ছবি করাই তোদের কাজ। আসলকে মেরে নকল করার ওস্তাদ তোরা। এ দুটো মেয়ে তোদের হাতে পড়ে কি করে ভাল থাকবে বল।

গোপীনাথদার কথায় সবাই হেসে উঠল।

কাজল বলল, যা বলেছেন দাদা। সারাদিন গাধার খাটুনি খাটিয়ে নিচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাক্ষুসে ক্ষিদের রসদ জোগাতে হচ্ছে। ভাল থাকি কি করে বলুন তো।

শিখা বলল, দাদার চোখে কি কিছু এড়িয়ে যাবার জো আছে।

গোপীনাথবাবু শান্তনুর দিকে চেয়ে বললেন, এখন আবার কি জন্যে জ্বালাতে এসেছিস বলে ফেল চটপট!

শান্তনু বলল, ফটো প্রস্তুত ও নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ, এখন উদ্বোধক আর সভাপতি নির্বাচন বাকী। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে গোপীনাথদা।

গোপীনাথবাবু বললেন, কার কথা ভেবেছিস?

অলক বলল, কোন পত্রিকার এডিটর হলে ভাল হয় না?

গোপীনাথবাবু বললেন, তাহলে তোর ছবির পাবলিসিটির চেয়ে এডিটারের পাবলিসিটি বেশি হবে। তোরাই তো ব্যাপারটা জানিস ভাল করে। এগজিবিশানের উদ্বোধন দিবসের যে সব ছবি ছাপা হয়, তাতে আসল ছবি অস্পষ্ট ঝুলতে থাকে দেওয়ালে, আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবিই মুখ্য হয়ে ওঠে। যেটার আদপেই কোন দরকার নেই।

শান্তনু বলল, সংবাদপত্রে চিত্রকরদের ছবিও তুলে ধরা হয় গোপীনাথদা।

হয় না, আমি বলছি না। তবে অতি বড় কাউকে আনলে আসল বস্তুটি ম্লান হয়ে পড়ে, এই কথাই বলতে চাইছি। তারপর দেখ, যার যা বিষয় নয়, তাকে সেই বিষয় সম্বন্ধে বলতে বলার অর্থ-ই হল, কতকগুলো বাঁধা অসার বুলি বলানো। এতে বড় মানুষদের বক্তৃতা তৈবি যারা কবে দেয়, তাদেব সুবিধে হতে পারে কিন্তু শিল্পীব সত্যিকারের কোন উপকার হয় না।

কাজল বলল, এ বিষয়ে আমি গোপীনাথদার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

গোপীনাথবাবু বললেন, যার যা কাজ, যার যতটুকু সে বিষয়ে ক্ষমতা তার বাইরে যাবার চেষ্টা কেন বাপু। ক্ষমতা হাতে পেলেই তার অপব্যবহার করার জন্যে মানুষগুলো যেন উঠে পড়ে লেগে যায়।

শান্তনু বলল, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি গোপীনাথদা। এখন আপনিই বলুন, অনুষ্ঠানে কাদের আনা যায়।

গোপীনাথদা বললেন, যাঁরা যথার্থ শিল্প-রসিক, ছবির বোদ্ধা, তাঁদের কাছে যা।

কাজল বলল, দাদা ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার ছবির পাবলিসিটি হোক এটা আমরা চাই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে চাই বোদ্ধা রসিক মানুষের দ্বারা তোমার ছবির সমালোচনা হোক।

গোপীনাথবাবু শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে মনঃপুত হল না আমাদের সাজেসান?

শান্তনু বলল, আমি ভাবছি গোপীনাথদা, নজর আপনার কতদিকে। আপনার নির্বাচনের ওপর কলম বসায় কার সাধ্যি।

গোপীনাথবাবু বললেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখ গড্ডলিকা প্রবাহ চলেছে। সংগীতের আসরের উদ্বোধন হবে, নিয়ে এসো অমুককে। চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে, নিয়ে এসো ঐ তালেববকে। যারা হয়ত সুরের বা ছবির গোড়ার কথাটুকুও জানে না। খালি পাবলিসিটির পেছনে ছুটছি আমবা।

অলক বলল, এ যুগটা যে বিজ্ঞাপনের দাদা।

গোপীনাথবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, মরগে তোব বিজ্ঞাপন নিয়ে। ঐ বিজ্ঞাপনের জোবে কত ভূষিমাল চলছে চারদিকে। যে বিষয়ের ওপর যত বেশি ঢক্কানিনাদ কবা হয়, জানবি তা ততটা ফোপবা

ঢেঁকী।

একটু থেমে গোপীনাথবাবু বললেন, আর বকাস নে আমাকে। মাতাল লোক, কখন কি বলে বসব তার ঠিক নেই। কে আবার কোথায় মানহানির মামলা ঠুকে দেবে। কথায় আছে না, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে। আমি একটা সিনেমা মাসিক বের করে কষ্টেসিষ্টে পেট চালাই, তার ওপর তোরা এলি আমার দুটো এঁড়ে গরু। তোদের নিয়ে আমার কাল হল দেখছি।

গোপীনাথবাবুর কথায় সবাই হেসে উঠল।

শান্তনুর বরাতে লেখা ছিল সেই পেশাদার উদ্বোধক। গোপীনাথবাবু ফোন করে যে দুজনকে পেতে চেয়েছিলেন, ওঁদের কেউই হাতের কাছে নেই। বাংলাদেশের বাইরে রয়েছেন।

গোপীনাথবাবু বললেন, যা এখন যুগের হাওয়ায় ভেসে, আখের গুছিয়ে নিতে পারবি।

শান্তনুর তোলা দু-একখানা ফটো সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, এবং আলোকচিত্র শিল্পী সম্বন্ধেও সাধুবাদ বেরিয়েছিল।

গোপীনাথবাবু এগজিবিশান হয়ে যাবার পর শান্তনুকে বলেছিলেন, আমার কথা শুনে কাজ করলে এতখানি পাবলিসিটি তোর হত না।

শান্তনু বলল, তাতে আনন্দের চেয়ে আফশোষই হয়েছে আমার বেশি দাদা।

খবর কাগজগুলো কদিন ধরে খুব গরম খবর ছড়াচ্ছে। ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর জনাব ভুট্টো। বৈঠক হচ্ছে বাংলার ঐতিহাসিক নির্বাচনের নায়ক মুজিবর রহমানের সঙ্গে। সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের হাত থেকে ন্যায় সংগত নির্বাচনে জয়ী পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিরা ক্ষমতা বুঝে নিতে চায়। টালবাহানা চলেছে সেই ডিসেম্বর থেকে। মার্চে ঢাকায় বসেছে বৈঠক। আমাদের খবর কাগজের প্রথম পাতায় বেরোচ্ছে সে সব খবর।

মুজিবর ক্ষমতা হাতে পেলে বন্ধ হবে এ উদ্বাস্তু স্রোত। স্রোত নয় তো, যেন একের পর এক সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ভারতের ওপর।

আলোচনায় একসময় অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। কি হয়, কি হয় ভাব। ভেঙে যাবে নাকি ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে মুজিবরের বৈঠক। এই ভেঙে যায় তো ক্ষীণ একটা সূত্র ধরে আবার আলোচনা চলে।

কদিন টালবাহানার পর ভেস্তে গেল আলোচনা। ইয়াহিয়া আর ভুট্টো ফিরে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। পঁচিশে মার্চের পর মুজিবরের কোন খবর নেই। সারা পূর্ববাংলা জুড়ে মিলিটারীর বর্বর অত্যাচারের খবর হাওয়ায় উড়ে আসতে লাগল। ওদিকে এক সময় খবব এল মুজিবর আত্মগোপন করে আছে। পথে ঘাটে লড়াই করছে বাংলার মানুষেরা। বেইমান পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে চালিয়েছে পুব বাংলার মানুষ শেষ বোঝাপড়া। টিক্কা খাঁর নাম শোনা যাচ্ছে। লোকটা এখন বাংলার সামরিক শাসনকর্তা।

প্রতিদিন এলোমেলো খবরে সংবাদপত্রের পাতা ভর্তি।

উদ্বাস্তুর স্রোত আবার কোটালের বানের মত আছড়ে পড়ছে। তাদের মুখে শোনা যাচ্ছে মিলিটারীর বীভৎস সব অত্যাচারের কাহিনী।

কেউ বলছে, মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে মিলিটারীরা ট্রাক বোঝাই করে মেয়েদের সব নিয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় কেউ জানে না।

আর তারা ফিরে আসেনি হোস্টেলে।

কারো মুখে শোনা যাচ্ছে, ঢাকা ইউনিভারসিটির চারদিকে গোলাগুলি চলেছে। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। যে সব ছাত্রেরা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল তাদের গুলি করে মারা হচ্ছে। সারা পুব বাংলা জুড়ে মিলিটারী শুরু করে দিয়েছে তাণ্ডব।

এদিকে দিনে দিনে খবর আসতে লাগল আওয়ামী লীগের সোনার বাংলার পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে স্বেচ্ছা সৈনিকেরা। তারা মিলিটাবীদের অতর্কিত আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিচ্ছে গোলাবারুদ। গড়ে তুলছে প্রতিরোধ।

বাংলার পুলিশ বাহিনীও যুক্ত হয়েছে স্বাধীন বাংলা বাহিনীর [illegible]।

পশ্চিমবাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভারতের সংবাদপত্র বিপুলভাবে সমর্থন জানাচ্ছে মিলিটারীশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক মানুষের প্রতিরোধকে। সারা দেশ উত্তেজিত। আকাশবাণীতে বাজছে কবিগুরুর গানের সুর,

'ও আমার সোনার বাঙলা
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

মুজিবর এ সংগীতকে বাংলার প্রাণের সংগীতের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। যেখানেই থাকুন, এ সংগীত বাজছে পুব বাংলার আকাশে বাতাসে।

মিলিটারীরা নাকি সন্ধান পেলেই পুড়িয়ে দিচ্ছে স্বাধীন বাংলার পরিকল্পিত পতাকা।

মুক্তি বাহিনী গ্রামে গঞ্জে সে পতাকা তুলে ধরছে মরণ পণ করে। প্রতি রাতে আকাশবাণীর খবরটুকুর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে এপার বাংলার মানুষ।

শান্তনু এসে বলল, জান কাজল, আজ উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে চোখের জল রাখতে পারিনি।

কাজল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন।

কেন, কি দেখলে তুমি?

শান্তনু বলল, একটি পনের বছরের মেয়ে কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদছে।

কি বলল ও বল না?

মিলিটারীরা ওর ঘরে যখন ঢোকে তখন সন্ধ্যা। ও পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। ওর মা আর দিদির প্রাণফাটা চীৎকার শুনে ও ছুটে আসছিল। একটা গাছের আড়াল থেকে ও দেখতে পেল ওর বাবার রক্তাক্ত দেহটাকে মিলিটারীরা উঠোনে টেনে ফেলে দিল। তারপর কি হল ও জানেনা। প্রায় মূর্চ্ছিতের মত ও গাছতলায় পড়েছিল। রাতে একটু সুস্থ হলে ও পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে দেখল কেউ কোথাও নেই। দরজা জানালা খাঁ খাঁ করছে।

সারারাত ধরে মাঠঘাট ভেঙে ও হেঁটে এসে একটা উদ্বাস্তু স্রোতের সঙ্গে মিলে যায়। তারপব এখানে ভারত সীমান্তে উদ্বাস্তু শিবিরে এসে পড়েছে।

আর একটি ছোট মেয়েকে দেখলাম, কি রকম ভয় পাওয়া দৃষ্টি। মা বাবার সন্ধান নেই। নামও বলতে পারছে না বাবার। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। চোখের সামনে যেন কোন বিভীষিকা দেখে আতঙ্কে কেঁদে উঠছে। পথের ধারে বসে কাঁদছিল। দয়া করে একদল উদ্বাস্তু যাত্রী তাকে নিয়ে এসেছে।

কাজল বলল, আহা, কোন সংসার থেকে ছিট্‌কে পড়ল হতভাগ্য মেয়েটা।

শান্তনু বলল, আর একটি পরিবারের সব মানুষগুলোই কাঁদছে।

কাজল বলল, সবাই এসেছে তো এত কাঁদছে কেন?

শান্তনু বলল, ভাষা দিয়ে বোঝান যাবে না তাদের দুঃখ কাজল। মিলিটারীরা গ্রামের দিকে আসছে খবর পেয়েই গ্রামের মেয়ে পুরুষ সকলে আতঙ্কে মাঠ ঘাট ভেঙে দৌড়তে শুরু করে দিল। ঐ পরিবারের মা তার দুটো মেয়েকে নিযে আগে ভাগে মাঠ জঙ্গল ভেঙে দৌড় লাগিয়েছিল। পুরুষটিকে সে চেঁচিয়ে বলেছিল, ঘরে ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে, তাকে যেন নিয়ে আসে কোলে করে।

লোকটি তার স্ত্রীর কথা চারদিকের হৈ হল্লা ত্রাসের ভেতর শুনতে পায়নি। সে গোয়ালের গরুগুলোকে দড়ি খুলে তাড়িয়ে দিযে, ঘরে ভাল করে দু'টো তালা বন্ধ করে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে। বিপুল উদ্বাস্তু স্রোতের ভেতর সে আর খুঁজে পায়নি তার ছেলে মেয়ে বউকে। তার ধাবণা ওরা সকলেই এগিয়ে গেছে। সে বেচারা আমাদের সীমান্ত চৌকি পেরিয়ে এসে তবে মেয়ে বউ-এর খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু ছেলে গেল কোথায়?

হায়, হায় করে মাটিতে আছড়ে পড়ল মা। ফিরে যাওয়া মানেই মরণ। তবু যেতে চেয়েছিল লোকটি। পাগলের মত ছুটেও গিয়েছিল কিছুটা। কিন্তু অন্য উদ্বাস্তুরা তাকে ধরে ফেলেছে। একজন

মরবে, কিন্তু লোকটি গেলে যে আর ফিরে আসতে পারবে না। তখন সারা পরিবারটি যে মারা পড়বে।

হায় হায় করে উঠল কাজল। চোখ দিয়ে তার অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সে রাতে শান্তনুর বারবার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। যতবার সে জেগে উঠল ততবারই দেখল কাজল জেগে রয়েছে।

তুমি ঘুমোওনি কাজল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজল বলল, আমি ঘুমুতে পারছি না। একটু চোখ বুজলেই সে ছেলেটার কান্না শুনতে পাই। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ঘাটমাঠ পেরিয়ে এতদূরেও তার কান্না শোনা যাচ্ছে। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ কি রকম করছে।

শান্তনু কাজলের বুকে হাত রেখে বলল, এ দুঃখের সমুদ্র কাজল। এখানে দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই। দাঁড়াব ভাবলেই অতলে তলিয়ে যেতে হবে। কেবল তীরে দাঁড়িয়ে দেখা আর দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শোক এক রকম নয় কাজল, হাজার রকমের।

কাজল বলল, এমন নিষ্ঠুর পিশাচের মত প্রবৃত্তি হয় মানুষের। ভয় দেখিয়ে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয় মায়ের বুক থেকে।

শান্তনু বলল, ভেবে দেখ, মায়ের সামনে ষোল সতের বছরের মেয়েদের ধরে ধরে যখন পশুর মত ছিঁড়ে খাচ্ছে, তখন মায়ের অবস্থাটা কি! মায়ের কোল থেকে দুধের ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন মাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে মিলিটারী ক্যাম্পে তখন সভ্য জগতের মানুষ তো দিব্যি ঘুমিয়ে আছে।

কাজল বলল, এ অত্যাচারের কাহিনী কি বড় বড় দেশগুলোরকোন মানুষই জানতে পারছে না?

শুধু প্রতিবেশী ভারতই চীৎকার করে যাচ্ছে কাজল। সবাই ভাবছে পাকিস্তান ওর শত্রু, তাই ওর এই মিথ্যে চেঁচামেচি। দু-একটা ছাড়া বড় একটা কোন দেশ আমলই দিচ্ছে না।

কাজল বলল, রাষ্ট্রসঙঘ এ ব্যাপারের কোন একটা ফয়সালা করতে পারে না?

শান্তনু বলল, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙঘ নাক গলায় না কাজল।

উত্তেজিত হয়ে উঠল কাজল, এ রকম নরমেধ যজ্ঞে যারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে আমার মতে তারা শকুনি। মরা মানুষের স্তূপ যত বাড়বে ততই তাদের আনন্দ।

শান্তনু বলল, আমি এতটা অবশ্য বলতে চাই না, তবে পলিটিক্সের যাঁতাকলে পড়ে আছে রাষ্ট্রসঙঘ। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে ধেড়ে ইঁদুরের মত ধড়ফড় করে, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় নেই।

কাজল বলল, পাকিস্তান গোঁসা করবে বলে সব রাষ্ট্র তার মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখবে!

শান্তনু বলল, যখন চারদিক থেকে সাধারণ মানুষের সমালোচনা উঠবে, তখন ঐ সব রাষ্ট্রপ্রধানেরা ক্রমাগত তোতা পাখির মত বলতে থাকবে, সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে পরিস্থিতির ওপর।

একটু থেমে শান্তনু বলল, যা কিছু করতে হবে, তা নিজের কোমরের জোরে দাঁড়িয়েই কাজল। আজ মুক্তি যোদ্ধারা যদি মরণপণ করে লড়তে পারে, তাহলে অনেক দুঃখের শেষে একদিন তারা তাদের ইচ্ছার সার্থক রূপটা হয়ত দেখতে পাবে।

কাজল বলল, তারা সফল হোক্, অন্তরের গভীর থেকে এই কামনা করছি, কিন্তু এ সব দুঃখের কাহিনীগুলো যে আর সহ্য করা যায় না।

শান্তনু কাজলের মাথায় হাত রেখে বলল, প্রার্থনা কর কাজল, মানুষের এ দুঃখের যেন শেষ হয় খুব তাড়াতাড়ি।

কদিন পরে কাজল বলল, দেখ আমি কিছুদিন থেকে কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখছি বলে মনে হচ্ছে।

শান্তনু খুব জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন। থেমে গিয়ে বলল, চোখের ডাক্তারকে একবার তাহলে দেখাতে হবে।

কাজলের আবার নিজের বিষয়ে কোনকিছুকে গুরুত্ব না দেবার একটা জেদ আছে চিরদিন। সে

কেবল শান্তনুর মনের উত্তাপটুকু পরীক্ষা করে দেখবে। সেটুকুর সন্ধান পেলেই আর কোন গুরুত্ব দেবে না নিজের বিষয়ে। এবারও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

শান্তনু কাজ থেকে ফিরে এসে রাতে একবার বলল, তাহলে ডাক্তারের কাছে কবে যাবে বল?

কাজল বলল, ও কিছু নয়, তোমার খালি একটুতেই ডাক্তার ডাক্তার বাই।

শান্তনু বলল, তাহলে হয়ত ভাল করে খাচ্ছ না। অপুষ্টির জন্যে এমন হতে পারে। রোজ একটা করে ডিমের পোচ খেও।

কাজল বলল, সে হবে এখন। খেটে খুটে এসেছ, খেয়ে দেয়ে ঘুমোও দেখি মাতব্বর।

শান্তনু হেসে বলল, মাতব্বরী করে কে শুনি, তুমি না আমি?

কাজল বলল, সংসারের ব্যাপারে মাথা গলাতে এলেই ঠোকাঠুকি লাগবে। তাই তোমাকে সযত্নে সরিয়ে রাখতে চাই।

শান্তনু বলল, স্ত্রীদের কাছে স্বামীদের চিরদিনই নাবালক হয়ে থাকতে হয়।

কাজল বলল, বিয়েটা না করলেই সাবালক হয়ে থাকতে পারতে।

শান্তনু বলল, ভুল করে ফেলেছি কাজল।

কাজল বলল, শুধরোবার উপায় যখন নেই তখন নাবালক হয়েই থাকতে হবে।

শান্তনু বলল, তথাস্তু দেবী।

ওদিকে পত্রিকা অফিসে উত্তেজনার শেষ নেই। সব ব্যাপার চাপা পড়ে গিয়ে সংবাদপত্রের প্রথম পাতাটি জুড়ে বসেছে বাংলাদেশের খবর। প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে নতুন নতুন নির্যাতনের কাহিনী। ওপার বাংলা থেকে যারা চলে আসছে এপারে তাদের মুখ থেকে খবর সংগ্রহ করছে রিপোর্টারের দল।

কিন্তু ছবি পাওয়া যায় কি করে। নারকীয় বীভৎসতার ছবি। খবর যত করুণই হোক, তাকে বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের মনগড়া বলে আখ্যা দিতে পারে, কিন্তু যদি নির্যাতনের যথার্থ ছবি তুলে আনা যায় তাহলে সে সত্যকে একেবারে দৃষ্টিহীন ছাড়া কে মিথ্যে বলবে।

কিন্তু মৃত্যুপুরীতে ঢোকে কার সাধ্য। কদিন ধরে চঞ্চল হয়ে আছে শান্তনুর মন। মনে পড়ছে নিখিলেশের কথা। শান্তনুর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ভিয়েৎনামের নির্যাতনের ছবিগুলো।

রাতে বিছানায় শুয়ে শান্তনুর মনে হল, এই সুযোগ। প্রেস ফটোগ্রাফারের জীবনে এ সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না। প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা কাজের বদলে বাংলাদেশের ছবিগুলো তুলে রাখতে পারলে একটা সত্যিকারের কাজের মত কাজ করা হবে। অনেক বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতে হবে ঠিক, কিন্তু যদি সে সফল হতে পারে তাহলে সারা দুনিয়াকে সে জানাতে পারবে এই নির্যাতনের কাহিনী। বাংলাদেশের সংগ্রামের সত্য ইতিহাস। কিন্তু কাজল! কাজল কি তাকে যেতে দেবে ঐ অশান্ত পুব বাংলায়, যেখানে বুড়ি গঙ্গা, মেঘনা, পদ্মা, ইছামতির বুকে ভেসে চলেছে অগণিত মানুষের লাশ।

শান্তনু ডাক দিল, কাজল, তুমি ঘুমিয়েছ?

একটু তন্দ্রা এসেছিল কাজলের। চমকে উঠে বলল, না। তুমি ঘুমোওনি?

শান্তনু বলল, না কাজল, ঘুম আসছে না। একটা কথা বার বার ফিরে ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে।

কাজল বলল, বল, কি কথা।

শান্তনু বলল, কথার আগে একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে কাজল।

কাজল বলল, ভণিতার কি দরকার, কোন্ কথা তোমার রাখিনি বল?

শান্তনু বলল, আমি পুব বাংলায় যেতে চাই কাজল। কেউ জানবে না আমার এই যাওয়ার কথা। শুধু তুমি আর আমি জানব। অফিস থেকে ছুটি নেব মাস দুয়েকের।

কাজল কতক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কদিন আগে এক জ্যোতিষীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শিখা। ও নিজের হাত দেখাবে বলেই গিয়েছিল। জ্যোতিষী শেষে আমার হাতটাও দেখলেন। দেখে

কিন্তু কিছু বললেন না। অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন।

শিখা ওঁকে কিছু বলতে বলাতে উনি শুধু বললেন, এখন বলার কিছু নেই। সময় হলে বলা যাবে।

কাজল বলল, তুমি জান, আমার মন দুর্বল নয়, তবু কেন যেন সেদিন মনটা আমার কেঁপে উঠেছিল।

শান্তনু বলল, তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি কোথাও যেতে চাই না কাজল।

কাজল শান্তনুর হাতটা অন্ধকারে থেকে তুলে নিল নিজের মাথায়। এমনি কতক্ষণ হাতখানা ধরে রেখে দিল সে। তারপর মুখের ওপর দিয়ে শান্তনুর হাতখানা বুলিয়ে নিয়ে চুম্বন করল।

তুমি যাও, তোমার কাজটা এত মহৎ যে তাকে বাধা দিতে গেলে আমাকে বড় নীচে নেমে যেতে হবে। তবে যাই কর না কেন, শুধু মনে রেখ, এ দুটো চোখ তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

তিন চার দিন পরে শান্তনু হারিয়ে গেল। বন্ধুরা জানল, অফিসের নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে বোম্বেতে। সেখানে জরুরী কাজ নিয়ে গেছে শান্তনু। ওদিকে প্রেসের লোকেরা জানল, শান্তনু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ছুটি নিয়ে চলে গেছে কলকাতার বাইরে। কাজল একাই গুণে চলল তার উদ্বেগ আর বেদনার দিনগুলো।

কাজলের মনে হতে লাগল, প্রতিটি দিন কত দীর্ঘ। রাতটা আরও অসহ্য। ঘুম বিদায় নিল তার চোখ থেকে। একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাগুলো তাকে ঘিরে ফেলে। মাঝে মাঝে সে চীৎকার করে বিছানায় উঠে বসে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শান্ত হয়ে আসতে থাকে তার উত্তেজিত স্নায়ুগুলো। তখন সে রাতের অন্ধকারে কোলের ওপর দুটো হাত জোড় করে প্রার্থনা জানাতে থাকে। সে যাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়, তাঁকে সে চেনে না, জানে না, কোনদিন একটিবারের জন্যেও চোখের দেখা দেখেনি। তবু ঐ অচেনা অজ্ঞাতের কাছে প্রার্থনাটুকু নিবেদন করে সে সাময়িক শান্তি পেতে চায়।

শিখা মাঝে মাঝে এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। সে আজকাল শুধু প্রুফ দেখার কাজই করে না, স্টুডিওতে অলককে সারাক্ষণ সাহায্য করে। তাই বড় একটা সময় বাঁচাতে পারে না সে।

শিখা এলে কাজলের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পায় না। কিছুক্ষণ গল্প করে, শান্তনুর খোঁজখবর নিয়ে শিখা চলে যায়। শিখাকে মিথ্যে বলতে বাধে, তবু শান্তনুর বারণকে কাজল অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

কদিন চোখটা আরও খারাপ মনে হচ্ছে তার। কেমন সব ছায়া ছায়া ছেঁড়া মেঘের মত দেখছে আজকাল। একটা নার্ভটনিক খেলে কিংবা ভাল খাবার খেলে ওসব সেরে যাবে, কিন্তু খাবার কথা ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে কাজলের।

একটা মেয়েকে রেখেছে সে ঘরে। ঠিকের কাজ করত আগে। শান্তনু চলে যাবার পর একা ঘরে থাকার অসুবিধে হতে পারে ভেবে তাকে রেখেছে সারাক্ষণের জন্যে।

আজকাল দিন নেই রাত নেই কেমন এক ধরণের আতঙ্ক উত্তেজনায় ভুগছে কাজল। মেয়েটি বাজার করে, রান্না করে, ঘরদোর গোছগাছের কাজ করে। আগে হলে কাজল একাই একশো। নিজেই সব কাজ করে নিত। কাজ করতে সে ভালই বাসত। কিন্তু কাজে হাত লাগাতে গেলেই ভুল হয়ে যাচ্ছে তার এখন। সে তাই ছেড়ে দিয়েছে কাজের চেষ্টা। সারাক্ষণই প্রায় শুয়ে বসে থাকছে। রাতে ঘুমোয় না, দিনে চোখ জড়িয়ে আসে।

শান্তনু সেই যে একমাস দশ দিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, তার দেখা তো দূরের কথা, কোন খবরই নেই।

একদিন হঠাৎ খবর পেল কাজল, সংবাদপত্রের দুটি রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারকে সীমান্ত থেকে জোর করে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে।

মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। পরে নাম দুটি যখন সে জানতে পারল তখন বুঝল, শান্তনু নেই ওদের ভেতর। কিন্তু কাজলের চোখে তখন ওরা দুজন আর নয়, তিনজন হয়ে

গেছে। শান্তনুর চিন্তা তখন কাজলের মনে তিনজনের চিন্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে কাজলের। একটা অসহ্য যন্ত্রণার ঢেউ তার বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার চেতনা।

এমনি দিনগুলো যখন সে কাটাচ্ছিল, তখন এক ভোরে ঝি এসে তাকে ডাক দিল।

কাজল উঠে বসল বিছানায়। কিন্তু কিছু যে সে আর দেখতে পাচ্ছে না। সামনে একটা পাতলা অন্ধকারের পর্দা কে যেন ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে গেছে। তাকে ভেদ করে যাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের আলো এসে পৌঁছোচ্ছে না সেখানে।

ডাক্তারের কাছে যাবার উৎসাহ বা শক্তি কোনটাই তখন ছিল না তার ভেতর। সে শুধু শুয়ে রইল বিছানায় একটা মানুষের পায়ের ধ্বনি শোনার আশায়।

এমনি করে ঘরের ভেতর কেটে গেল কাজলের আরও পনেরটি দিন।

ওদিকে বয়ড়া সীমান্ত পার হয়ে চলেছে শান্তনু। বিরাট এক প্যাকেট শুকনো খাবার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে সে। মেওয়া, বিস্কুট, চিঁড়ে। রাতে পথ চলে, দিনে পড়ো বাড়ি, পরিত্যক্ত স্কুল অথবা ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে থাকে। সে লোকালয়ে বড় একটা যায় না। কোথায় রাজাকার, কোথায় আওয়ামী লীগের লোকের দেখা পাবে তা সে জানে না।

পথ চলতে চলতে মিলিটারীদের নিষ্ঠুরতার অনেক চিত্র সে তার ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে। খালে বিলে ঝিলে নৃশংস হত্যার চিহ্ন ছড়ানো। ছেলে, বুড়ো, যুবক কেউ বাদ নেই। সৎকারহীন লাশগুলো পড়ে আছে বনে বাদাড়ে, পথে পুকুরে।

একদিন এক রাখাল ছেলের সঙ্গে দেখা। তার কাছ থেকে জানতে পারল, সামনের গ্রাম ফুলশরা। আর এ খবরও পেল যে ও গ্রাম এখন একেবারে পরিত্যক্ত। মিলিটারীরা এসে যুবক ছেলেদের আগে ট্রাকে বোঝাই করে ধরে নিয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়েরা যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে। মিলিটারীরা সোমত্ত মেয়েদের কেবল ধরে ধরে তাদের ওপর অত্যাচার করে শেষে টেনে ফেলে দিয়েছে খানা খন্দতে।

শান্তনু আরও জানতে পারল. মাত্র দুদিন আগে এ ঘটনা ঘটেছে।

শান্তনু বলল, কি নাম তোমার?

ছেলেটা উত্তর করল, মৈনুল।

বছর তের চোদ্দ হবে ছেলেটার বয়েস। মুখখানাতে বাংলা দেশের শ্যামল একটা শ্রী আছে।

শান্তনুর বেশ ভাল লেগে গেল ছেলেটাকে। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে ভাই এখানে গরু চরাচ্ছ, মিলিটারী তো এসে পড়তে পারে।

ছেলেটি বলল, একবার মিলিটারী এখানে এসে গেছে, আর আসবে না। ওরা যেখানে যায় সেখানকার সবাইকে মেরে ধরে শেষ করে দিয়ে যায়।

তুমি থাক কোথায়?

আঙুল তুলে একটা গ্রামকে নির্দেশ করে ছেলেটি বলল, ঐ পাশের গ্রামে।

তোমাদের মিলিটারীকে ভয় করে না?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, না।

শান্তনু আবার প্রশ্ন করল, কেন?

আমাদের গ্রামের মোড়ল, মানে যে বাড়িতে আমি আছি, তাদের মিলিটারী কিছু বলে না।

শান্তনু বলল, কিছু বলে না কেন?

ছেলেটি চুপি চুপি বলল, তুমি কাউকে বল না, মোড়ল মিলিটারীদের কাছে সব খবর দেয়।

শান্তনু বলল, আমি কাউকে বলব না ভাই। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার কাজ করে যাও।

এরপর শান্তনু ফুলশরা গ্রামের দিকেই এগোতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়েই সে জানতে পারল, ছেলেটি তার পেছন পেছন আসছে।

শান্তনুর কেমন যেন সন্দেহ হল। সে ফিরে তাকাল পেছনে।

ছেলেটি তার পেছনে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে।

শান্তনু বলল, তুমি গরু চরাবে না?

ছেলেটি তেমনি মুখ নীচু করে বলল, তুমি ফুলশরা গ্রামে যাচ্ছ তাই না?

শান্তনু বলল, সে রকম ইচ্ছে।

ছেলেটি বলল, আমিও আজ যেতাম ওখানে। তুমি যখন যাচ্ছ, তখন চল তোমার সঙ্গে যাই।

শান্তনু আবার বলল, তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?

একটু রূঢ় গলাতেই সে কথাটা বলল। যদিও ছেলেটার মুখে চোখে একটা করুণ ভাব তবু শান্তনুর সন্দেহ যায়নি মন থেকে।

ছেলেটা মাঠের ওপর দাঁড়িয়েই চোখ মুছতে লাগল।

কি হল তোমার? বলল শান্তনু।

আমার দিদি ওখানে থাকত। তার কি হল একবার দেখে আসব বলে এতদূর গরু চরাতে চরাতে চলে এসেছি।

শান্তনু সান্ত্বনার সুরে এবার বলল, নিশ্চয় তোমার দিদির অনেক বুদ্ধি, সে মিলিটারী আসার আগেই সরে গেছে।

ছেলেটা বলল, আমার মা নেই। বাবা আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করত বলে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। দিদি পালিয়ে যাবে কোথায়, সে তো আমার কাছে একবার আসতো।

শান্তনু বলল, চল যাই।

ওরা দুজনে কিছুক্ষণের ভেতরেই এসে পড়ল ফুলশরা গ্রামে। কয়েকটা কুকুরের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। গ্রামে ঢুকতেই রাস্তার ধারে একটা গাছের ডালে ঝোলান বীভৎস মৃতদেহ দেখতে পেল। তার গায়ের চামডাটা পাঁঠার চামড়ার মত ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। চোখ দুটো উপড়ানো। বুকের দু'পাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্তের স্রোত জমাট বেঁধে গেছে। ঐ দুটো জায়গায় গুলি করেছে মিলিটারীতে।

সম্ভবতঃ লোকটি বিশেষভাবে দেশভক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তাই তাকে এইভাবে মিলিটারীরা পুবস্কৃত করেছে।

অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে গ্রামেব প্রবেশ পথে গাছের ডালে।

শান্তনু স্তব্ধ হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। লোকটি হিন্দু কি মুসলমান বুঝতে পারল না। তার সেই মুহূর্তে মনে হল মানুষের জাত নেই।

সে দুহাত জোড় করে মৃতদেহের আত্মার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল।

ওরা ঘুরতে ঘুবতে একটা ঘরের কাছে এল। ছেলেটিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। এটা মৈনুলের দিদিব বাড়ি।

কেউ কোথাও নেই। দরজা হাট করে খোলা।

মৈনুল শান্তনুকে উঠোনে দাঁড় কবিয়ে রেখে ঘরের ভেতর ঢুকল।

কিছুক্ষণ পবে বেবিয়ে এসে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ির পেছন দিকে ছুটে চলল।

শান্তনুও তাকে অনুসরণ কবে চলল সেখানে।

বাড়ির পেছনে একটা পুকুব। পুকুরেব পাডে নারকেলেব দু'একটা গাছ। সেই গাছের তলায় কুকুরে একটা দেহকে টানাটানি করছে।

শান্তনু ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওব কাছে। মেয়েটি বিশ বাইশের বেশি হবে না। মাথার খোঁপাটা পরিপাটি বিনুনী করে বাঁধা। গায়েব কাপড়খানা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও তখনও জড়ানো। কুকুরে নীচেব দিক থেকে অনেকখানি মাংস তার খেয়ে ফেলেছে।

শান্তনু তাকিয়ে দেখল কুকুরটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওদের লক্ষ্য করছে। চলে গেলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেই মুহূর্তে শান্তনুর মনে হল কুকুরটার মত সৎ পবিত্র জীব আর কেউ নেই। মানুষের মুখোশ পরা যে অন্ধকারের জীবগুলো এই কাজ করে গেছে, তার সমস্ত কলঙ্ক চিহ্নকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য চেষ্টা করছে কুকুরটা। তার মনে হল, এ পাপ যত তাড়াতাড়ি মুছে যায় ততই মঙ্গল।

শান্তনু কয়েকখানা ছবি নিল মেয়েটির। গ্রামে ঢোকার পথে সেই ঝুলন্ত মৃতদেহটির ছবি সে আগেই নিয়েছিল। এখন পায়ে পায়ে সে গ্রাম ছেড়ে মাঠে এসে নামল।

মৈনুল তার সঙ্গ নিয়েছে। শান্তনু বলল, দুঃখ কর না ভাই, মুজিবরের লোকেরা একদিন এই মিলিটারীদের তাড়িয়ে দেবে। যারা তোমার দিদিকে মেরেছে তাদেব রক্ত একদিন এইসব পথে ঘাটে ঝরে পড়বে।

মৈনুল চলতে চলতে বলল, মুজিবরকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

শান্তনু ফিরে দাঁড়াল, তুমি জানলে কি করে?

ছেলেটি বলল, মোড়ল সব জানে, সে বলছিল।

শান্তনু বলল, তুমি এখন তোমাব কাজে যাও ভাই, কোনদিন হয়ত আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

মৈনুল তাকিয়ে রইল শান্তনুর দিকে। সে যেন কিছু একটা বলতে চায়।

শান্তনু বলল, কিছু বলবে ভাই?

মৈনুল বলল, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে দাদা? মোড়ল আমাকে বড্ড মারে। ভাল করে খেতেও দেয় না।

হাসল শান্তনু। বলল, আমার পিঠের ব্যাগে শুধু চিঁড়ে। তাও প্রায় খালি হয়ে এসেছে। তুমি তো এইটুকু খেয়ে থাকতে পাববে না ভাই। তাছাড়া আমার থাকবার কোন আস্তানা নেই, পথে পথে গাছতলায়, পড়ো বাড়িতে থাকি। তুমি কি করে আমার সঙ্গে থাকবে!

মৈনুল বলল, খুব থাকতে পারব আমি তোমার সঙ্গে। তুমি যদি সঙ্গে না নাও, তাহলেও আমি আর ও ব্যাটা মোড়লের বাড়ি ফিরে যাব না।

শান্তনু বলল, তুমি এদিককার সব পথঘাট চেন মৈনুল?

খু উ ব চিনি।

তাহলে চল মৈনুল, যা পাওয়া যায় দুজনে মিলে খাওয়া যাবে, যেখানে জায়গা পাব শুয়ে থাকব।

মৈনুল মহাখুশী। মাঠ জুড়ে চলে বেড়াতে লাগল তার গরুগুলো, মৈনুল চলল শান্তনুর সঙ্গে।

পরিত্যক্ত গ্রাম দেখলেই ওরা ঢুকে পড়ে সে গ্রামে। ফেলে যাওয়া চালডাল রান্না করে খায়। মৈনুল গাছে উঠে ডাব নারকেল পাড়ে। শান্তনু ভাবে এত কষ্টেব ভেতর ঈশ্বর তার কাছে মৈনুলকে পাঠিয়েছেন। ছেলেটি সত্যিই ঈশ্বরের দান বলে তার মনে হয়।

শান্তনু ঘুরে বেড়ায়। সারা বাংলাদেশটা মনে হয় যেন এক মহাশ্মশান। সে নিশি পাওয়া মানুষেব মত কেবল পথে প্রান্তরে ঘুরতে থাকে। ছবির পর ছবি উঠছে। একটা জাতিকে কেমন করে আধুনিক মারণাস্ত্রেব বলে মুছে ফেলা যায় তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। শান্তনুর ফিল্মের বুকে সেই মৃত্যুব ইতিহাস লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পাঁচটি অতি সাধারণ ছেলের মৃতদেহ ফিতে দিয়ে বাঁধা। নদীর ধারে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ফিতের একদিক। অন্যদিকে নদীতে আধডোবা হয়ে জেগে আছে ঐ পাঁচটি ছেলের মুখ।

দেখে মনে হল শান্তনুর, ছেলেগুলো প্রায় সমবয়সী। মাঠের রাখাল, অথবা প্রাইমারী ইস্কুলের পড়ুয়া হবে।

হয়ত খেলা করছিল ঐ গাছের তলায় পাঁচ বন্ধুতে। মিলিটারী এসে তাদের কোন লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা উত্তর দিতে পারেনি, অথবা দেয়নি। তার পরিণতি হয়েছে মৃত্যুতে।

এমনও হতে পারে ঐ ছেলেরা গেরিলাদের গোপন ঘাঁটিতে খবর দেওয়া নেওয়া করত। ধরা পড়ে গেছে মিলিটারীর হাতে। তার ফলে নির্মম মৃত্যু বরণ।

তাদের দিকে তাকিয়ে একবার সাধুবাদ দিতে ইচ্ছে করল ঐ সামরিক লোকগুলিকে। যারা একসঙ্গে

খেলেছে মাঠে ময়দানে শিশুকাল থেকে, একই পাঠশালায় গেছে বই শ্লেট নিয়ে, উচ্চরবে ছুটির আগে নামতা ডেকেছে একই ঘরে বসে সমস্বরে, তারা মৃত্যুতেও একই বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। কি আশ্চর্য অভিন্ন বন্ধুত্বের ছবি।

জাহাঙ্গীর নগর গ্রামের একটা পড়ো বাড়ির আড়ালে ওরা বসেছিল দুপুর থেকে। গ্রামটিতে লোকজন দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হলে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল। মৈনুল বলল, দাদা আজ এই ঘরটার ভেতরেই থাকা যাক্, কি বলেন?

ঘরটার ওপরে কোন আচ্ছাদন ছিল না। কয়েকটা মাটির দেওয়াল শুধু পড়ো বাড়িখানার অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল।

শান্তনু বলল, মৈনুল, এ তো বাদশার বাড়ি। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশের চাঁদোয়া, তারার বুটির ঝিকিমিকি। এর চেয়ে ভাল আস্তানা আমাদের কপালে আর কি জুটতে পারে বল?

ওরা সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর।

কত রাত জানা নেই। বাড়িটার পাশ দিয়ে যে সড়ক চলে গেছে, তার ওপর গর্জন করে উঠল কয়েকখানা মিলিটারী গাড়ি।

মৈনুল শান্তনুকে ঠেলা দিয়ে ওঠাল। চারদিকে মিলিটারী গ্রামখানাকে ঘিরে ফেলেছে। টর্চের আলো, গাড়ির হেড লাইট, সব মিলে যেন আলোর স্রোত বয়ে চলেছে।

সেই সাদা আলোর সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল লাল আলোর শিখা। আগুন লাগান হয়েছে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে। দাউ দাউ করে শুকনো ঘড়ের চাল পুড়ছে। ফটাফট শব্দ করে বাঁশ ফাটছে। সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে উঠছে আর্ত মেয়ে পুরুষের করুণ প্রাণফাটা চীৎকার।

কটি লোক পড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ওরা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখল, তাদের পেছনে একটা তীব্র আলো জ্বলে উঠল। তারপর হাওয়ায় বেজে উঠল গুলির আওয়াজ।

লোকগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলো।

ভোব রাতের দিকে মিলিটারী গাড়িগুলো ফিরে গেল। ওরা সেই পড়ো ঘরের ফাটল দিয়ে দেখতে পেল কতকগুলো বিশাল আকারের কালো কালো জানোয়ার গর্জন করতে করতে চোখে তীব্র আলো জ্বেলে ফিরে চলেছে।

ভোরের সূর্যটাকে বড় বেশি লাল বলে মনে হল আজ শান্তনুর। সারারাতের আতঙ্ক উত্তেজনার পর শান্তনুর অবস্থাটা ঠিক যেন মাতালের মত। সে টলছিল।

মৈনুল বলল, চল দাদা, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি।

ওরা পথে বেরিয়ে দেখতে পেল, এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে কতকগুলো মৃতদেহ। খোলা বুকে যেন জড়ো হয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল।

কেউ কোথাও নেই। ভোরের কাকও ভয়ে রাতের বাসা ছেড়ে পালিয়েছে দূরে। কুকুরগুলোও পলাতক। কেবল একটি ঘরের দাওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক যুবক, হাতে তখনও ধরা আছে তার রাম দা খানা। কাউকে মারতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তার আগেই একটা উড়ন্ত মৃত্যু তার বুকখানাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে। তারই পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মত বসে আছে একটা কুকুর। প্রভুর মৃতদেহকে বুঝি পাহারা দিচ্ছে।

মৈনুল এগিয়ে গেল। কুকুরটা করুণ একটা রব তুলল শুধু। লেজটা নাড়তে লাগল ঘন ঘন।

ঘরটা খোলা। মৈনুল ঘরের ভেতর তাকিয়ে হাত ইসারায় ডাক দিল শান্তনুকে। শান্তনু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একটি আঠারো বিশ বছরের মেয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। সামান্য খানিকটা কাপড় গায়ে, বাকি সবটুকু লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। অতি পরিচ্ছন্ন সম্পন্ন ঘরের বধূ বলে মনে হল তাকে। দেহে প্রাণ নেই। মুখে কেবল অত্যাচারের তীব্র এক যন্ত্রণার ছবি।

শান্তনুর বুক ঠেলে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘশ্বাস। তবু সে শান্তি পেল মনে, মেয়েটি বেঁচে নেই বলে। বেঁচে থাকলে সারাজীবন তাকে ভোগ করতে হত নরখাদকগুলোর বিষাক্ত স্মৃতি।

দীর্ঘ তিনটি মাস অজ্ঞাতবাসের পর শান্তনু এক সন্ধ্যায় ঘরের দরজায় এসে ঘা দিল। একটা জাতির রক্তাক্ত ইতিহাসের বিরাট এক পাণ্ডুলিপি বয়ে এনেছে সে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া চলে গেছে তার পাশ দিয়ে। স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। সে যে নিত্যকালের ঐতিহাসিক। অমরত্বের আদেশপত্র তার হাতে।

শান্তনু নীচের থেকে দেখল, কাজল বসে আছে তার অভ্যেস মত জানালার গরাদ ধরে। তাকিয়ে আছে পথের দিকে।

তাহলে কাজল কি চিনতে পারেনি শান্তনুকে! হতে পারে দীর্ঘ তিনটি মাসের ক্লান্তি শান্তনুকে শীর্ণ করে দিয়ে গেছে। আগাছার জঙ্গলের মত গজিয়ে উঠেছে এক মুখ দাড়ি গোঁফ।

নীচের থেকে শান্তনু ডাকল, কাজল, আমি এসেছি।

সরে গেল কাজলের মূর্তিটা জানালা থেকে। কতক্ষণ পরে সিঁড়িতে পায়ের সাড়া পেল শান্তনু। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দ্রুততর পদধ্বনির যে আশা করেছিল শান্তনু তা বেজে উঠল না কাজলের পায়ে। একি তাহলে কাজলের অভিমান! দারুণ দুশ্চিন্তায় কি ভেঙে গেছে কাজলের মন!

দরজাটা খুলে গেল। নির্বাক কাজল দাঁড়িয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে তাকে বড় শীর্ণ মনে হল শান্তনুর। সে কাজলকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরল।

কাজল, কাজল, আমি এসেছি। তুমি কি রাগ করেছ আমার ওপর। খুব ভাবনায় পড়েছিলে তো? কিন্তু মনি, আমি তো তোমার ইচ্ছেকেই আমার বুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। নিজের ছায়া দেখে, বিশ্বাস কর কাজল প্রতিদিন তুমি আমার কাছে রয়েছ এই কথাই মনে করেছি।

কাজল এবার শান্তনুর বুকের ভেতর তার হাতটা বুলিয়ে নিল। তার মুখের ওপর হাত রেখে দাড়ি ভর্তি মুখখানা অনুভব করল। দুচোখ বেয়ে তার জল নেমে আসছিল। শান্তনু তার রুক্ষ হাতের পাতা দিয়ে তা মুছিয়ে দিল।

কাজল কোন কথা না বলে শান্তনুর হাত ধরে ওপরে নিয়ে চলল। সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল কাজলের। শান্তনু দেখল, কাজল ঠিকমত পা ফেলে চলতে পারছে না। দারুণ উত্তেজনার পর অবসন্নতা এলে মানুষ অনেকসময় নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না।

ওরা এসে ঢুকল ওদের পরিচিত ঘরে। কাজল শান্তনুকে টেনে এনে বিছানায় বসালো। তারপর কতক্ষণ তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আবার জল গড়াল কাজলেব চোখে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে কাজল আছড়ে পড়ল শান্তনুর বুকের ওপর।

আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, আর কোনদিন তোমাকে দেখতে পাব না আমি।

শান্তনুর কানে কাজলের কথাগুলো ঠিক যেন উদ্দাম একটা ঝড়েব হাহাকারেব মত শোনাল।

কাজল, কাজল, পাগলের মত কি বলছ তুমি, এই তো আমি তোমার সামনেই রয়েছি।

কাজল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখনও শান্তনুর বুকের ওপর পড়ে।

আমি হারিয়ে গেছি। আমার চোখের আলো মুছে গেছে চিরদিনের মত। আমি দেখতে পাব না তোমাকে। কি করে আমি থাকব। আমাকে বলে দাও, তোমাকে না দেখলে আমি যে পাগল হয়ে যাব।

শান্তনু কাজলের মুখখানা জোর করে তুলে ধরল তাব চোখের সামনে। ঠিক তেমনি দুটি চোখ। ভাসা ভাসা। কালো ভ্রমর দুটো বসে আছে সাদা পদ্মের দুটি পাপড়ির ওপব। কোন বিকার নেই।

আমি ভাবতে পারছি না কাজল। আমার কাজলেব এমন সুন্দর দুটো চোখেব ওপর কোন ছবি আব ফুটে উঠবে না, এ আমি কেমন করে দেখব।

শান্তনু পাগলের মত কাজলের মুখে মাথায় চুমু দিতে লাগল।

না, না, কাজল, বড় বড় ডাক্তার আমি তোমাকে দেখাব। এ কিছুতেই হতে দেব না। এ হতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে কাজল স্থির হল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি নিজের দোষেই আমাব চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি। কতবার তুমি চোখ দেখাতে বলেছ, আমি কথা কানে

তুলিনি। যখন একেবারে চোখের আলো নিভে গেল, তখনও জানাইনি কাউকে। বিশাখা কাজ করেছে সারাদিন, আমি বিছানায় পড়ে পড়ে কেঁদেছি আর তোমার কথা ভেবেছি।

শান্তনু আফশোসের সুরে বলল, এ তুমি কেন করতে গেলে কাজল। অলক, শিখা, গোপীনাথদা এরা কি কেউ ছিল না? তুমি ওদের নিয়ে যেতে পারলে না ডাক্তারের কাছে?

কাজল বলল, ওদের কারোরই দোষ নেই। সবকিছু আমি লুকিয়েছি ওদের কাছ থেকে। নিজের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জেগেছিল আমার। মনে হয়েছিল, আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি দারুণ এক বিপদের মুখে। আমি যদি তোমাকে পাঠাতে না চাইতাম, কেঁদে কেটে ভাসাতাম, তাহলে তুমি যেতে পারতে না আমাকে ফেলে। প্রতিমুহূর্তে তোমার বিপদের ভাবনা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। তাই নিজের সবকিছু বিপদকে এমন করে উপেক্ষা করতে পারলাম।

শান্তনু বলল, একেবারে কিছু দেখতে পাচ্ছ না কাজল?

কাজল মাথা নেড়ে জানাল, সবকিছু তার কাছে অন্ধকার।

চল, আজই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। এমন অনেকেই দৃষ্টি হারিয়ে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে শুনেছি।

অনেক বর্ষণের শেষে যেমন করুণ একটা হলুদ আলো ফুটে ওঠে চারদিকে, ঠিক তেমনি একটা কোমল করুণ হাসি ফুটে উঠল বৃষ্টি ভেজা মুখখানার ওপর। সে মাথা নেড়ে বলল, আশা নেই চোখের আলো ফিরে পাবার। অলকবাবু আর শিখা গভর্ণমেন্টের ছবির কি কাজ পেয়ে দুএকমাস বড় ব্যস্ত ছিল। মাঝে দু-একবার এলেও আমি তাদের জানতে বা বুঝতে দিইনি, আমার অবস্থা। অন্ধ হয়ে যাবার দিন পনেরো পরে ওরা এসে সব জেনে গেছে। ওদের আগে গোপীনাথদা এসেছিলেন। তাঁর কাছে কোন কিছু লুকোইনি। তোমার বাংলাদেশে যাবার কথাও আমি তাঁকে বলেছি।

আমার অবস্থা দেখে আর তোমার কথা শুনে উনি কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না।

তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু ভেবো না আমি এখুনি আসছি কাজল।

এক সময় গোপীনাথদা ফিরে এসে বললেন, চল কাজল, ডাক্তারের কাছে যাই, আমি গিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি।

ওঁকে না বলতে পারলাম না। গেলাম ওঁর সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার নানা রকম পরীক্ষা আর নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। পরে বললেন, বড় দেরী হয়ে গেছে। এমন অবহেলা কেউ করে বলে আমার তো জানা নেই।

গোপীনাথদাকে বললেন, ইল্‌স্‌ ডিজিজ। আগে ভাগে এলে ভাল হবার সম্ভাবনা ছিল। এখন ইমোশনাল ডিসটারবেন্সের ফলে ইন্টারনেল হেমারেজ হয়ে চোখ দুটো একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধ হয়ে যাবার পরে এলেও চিকিৎসা ছিল। বড় দেরি করে ফেলেছে। তবু চেষ্টা করতে হবে।

এই বলে কিছুদিন ওষুধ আর ইনজেক্সনের ব্যবস্থা করে দিলেন!

কিছু ফল হল না।

শান্তনু বলল, আমি একবার গোপীনাথদার কাছে যাব কাজল।

কাজল বলল, আর কিছুক্ষণের ভেতরেই তিনি এসে পড়বেন। শিখাও আসতে পারে। প্রতিদিন একবার করে ওরা আসছে। তুমি এখন মুখে হাতে জল দিয়ে কিছু খেয়ে নাও।

শান্তনু স্নান করে এল। খাবার কোন প্রবৃত্তিই তার ছিল না। জোর করে কাজল তাকে পাশে বসিয়ে নিজে হাতে তুলে খাওয়াতে লাগল।

খেতে খেতে শান্তনুর চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠছিল। আকাশ পাতাল ভাবছিল সে। এই তিনটি মাস কি নিদারুণ উদ্বেগ আর কষ্টের মধ্যে কেটেছে তার। সব সহ্য করেছিল কেবল এই কথা ভেবে যে, এক প্রেস ফটোগ্রাফারের জীবনে এর চেয়ে মহৎ সঞ্চয় কিছু হতে পারে না। কিন্তু একি অভিশাপ নেমে এল তার জীবনে। সে নিজের ইচ্ছার দিকে তাকাতে গিয়ে তার প্রিয়জনকে অবহেলা করল। অসুখের যখন সূত্রপাত হয়েছিল, কাজলের মুখ থেকে প্রথমে যখন শুনেছিল, তখন কোন কথা না শুনে কাজলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল তার। ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা

করতে পারল না শান্তনু।

গোপীনাথবাবু এলেন। সঙ্গে অলক আর শিখা।

শান্তনুকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর গোপীনাথবাবু বলে উঠলেন, বুড়ো খোকাকে খাওয়ানো হচ্ছে কাজল।

পরিস্থিতিটা লঘু হয়ে গেল। কাজল হাতটা সরিয়ে নিয়ে হেসে তাকাল ওদের দিকে।

শিখা বলল, কখন এলে শান্তনুদা?

শান্তনু বলল, বোধহয় একঘণ্টাও হয়নি।

তারপর খাবারের প্লেটটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, বসুন গোপীনাথদা, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।

গোপীনাথবাবু বললেন, মিঁয়া সাহেবের দাড়িটা তো দেখছি বেশ জব্বর গজিয়েছে। কাজল, তুমি একে প্রথমে চিনতে পেরেছিলে তো?

কাজল বলল, চোখের দৃষ্টিটা না হয় হারিয়েছি দাদা, তাবলে পায়ের সাড়াটা বুঝব না।

গোপীনাথবাবু কথার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, এখন বোম্বে থেকে বউ-এর জন্যে কখানা প্রিন্ট কিনে এনেছিস বল?

শান্তনু হাসতে হাসতে বলল, বোম্বে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু পথে যেতে যেতে ভাবলাম, আপনার বোনের ঢাকাই শাড়িই বেশি পছন্দ, তাই যাত্রা বদল করে বাংলা দেশেই চলে গেলাম।

অলক বলল, তুমি সত্যি অবাক করে দিলে শান্তনুদা। আমরা পরম নিশ্চিন্তে আছি, তুমি বম্বেতে আছ জেনে। এদিকে কাজের চাপে আসতেও পারিনি। তার মাঝখানে এমন একটা অঘটন যে ঘটে যাবে, তা একেবারে ভাবনার বাইরে।

গোপীনাথবাবু বললেন, আমরা ভাবনা করার কে রে। ওপরওয়ালাই সব করাচ্ছে। পুতুল নাচের সুতো তাঁর হাতে। কাউকে কাণা, কাউকে খোঁড়া, কাউকে রোগা, কাউকে মোটা সাজিয়ে স্টেজে খেলাবার ভার তো তাঁরই। খেলে যা, তিনি যেমন নাড়ান সেই মত।

শিখা বলল, কাজল, আজ ইন্‌জেক্সন নেওয়া হয়েছে?

কম্পাউন্ডারবাবু এসে দিয়ে গেছেন, কাজল বলল।

আজ ইনজেক্সনের ইতি গোপীনাথদা। সব নেওয়া হয়ে গেছে।

গোপীনাথবাবু বললেন, এখন আর দরকার হবে না ইনজেক্সনের কি বল কাজল, বড় ডাক্তার এসে গেছে।

কাজল বলল, বিশ্বাস করুন দাদা, ও এসে যাওয়ায় আমার নিজের চোখের কথা আমি ভুলে গেছি। আজ মনে হচ্ছে অনেক বড় সর্বনাশের হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি।

গোপীনাথবাবু শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই আমাদের ঠিক ঠিক বলেছিস তাতেই আমরা খুশী। আর বউটিও পেয়েছিস তেমনি, পেট থেকে কথা বের করে কার সাধ্যি।

কাজল বলল, অন্ধ বোনকে অপবাদ দিচ্ছেন কেন দাদা? আমি কি আপনাকে ওর কথা বলিনি?

বলেছ, বললেন গোপীনাথবাবু, তবে নিজের থেকে নয়, গোপীনাথদার জেরায় পড়ে।

অলক বলল, নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে শান্তনুদার কাছে। আমরা সকলেই রয়েছি অথচ এমন একটা অঘটন ঘটল, যার কোন প্রতিকার করা গেল না।

কাজল বলল, তার জন্যে দোষী কেউ হলে, সে আমি। আমিই তো আপনাদের কাছ থেকে সবকিছু লুকিয়েছি।

গোপীনাথবাবু বললেন, এখন আর দোষগুণের বিচার নয়, যা হবার হয়েছে, আপাততঃ তোমার দাসীটিকে একটু গরম পানীয়ের ব্যবস্থা করতে বল কাজল।

কাজল উঠল। শিখা বলল, তুই বোস, আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি।

কাজল বলল, এখনও এ সংসারের ভার অনেকদিন টানতে হবে শিখা। আজ একদিন কাজ করে দিলে কি সুরাহা হবে আমার বল?

কাজল ধীরে ধীরে হাতটা সামনে এগিয়ে দিয়ে দরজাটা ছুঁয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল।

গোপীনাথবাবু শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজলের মনের জোর আমাকে অবাক করেছে শান্তনু। তার চেয়ে অবাক হয়েছি, তোর ওপর ওর ভালবাসা দেখে। সমস্ত পরিচিত জগতটা তার চোখের ওপর থেকে মুছে গেল, তবু সে শক্ত হয়ে রইল শুধু তোর ছবিটার স্মৃতি নিয়ে।

শান্তনু বলল, গোপীনাথদা, হীরেব খনির অনেক অন্ধকার তলায় নেমে বহু কষ্টে একটা মূল্যবান হীরে থলেয় ভরে এনেছিলাম। ঠিক খনির মুখে উঠে এসে দেখি থলের ফুটো দিয়ে হীরেটা কখন পড়ে গেছে। আমার মত ভাগ্য কার আছে বলুন?

গোপীনাথবাবু বললেন, তোর কিছুই হারায়নি শান্তনু। এখনও যা আছে তোর তা হীরের মধ্যে দামী। কাজল তোর সেরা কোহিনুর।

কাজল ঢুকল ধীরে ধীরে। সঙ্গে সেই কাজের মেয়েটি। কাজলের হাতে চায়ের ট্রে। মেয়েটি কেবল দরজার অবস্থানটা বলে দিচ্ছিল কাজলকে।

কাজলের ট্রে থেকে সবাই হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে নিল।

মেয়েটি ধরল সেই ট্রে। কাজল ঠাওর করে নিজের কাপটি তুলে নিল।

চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

শিখা বলল, আজকের রাতটা শান্তনুদাকে আর বিরক্ত করব না। আজ কেবল কাজলের জন্যেই এ রাত তোলা রইল।

কাজল অমনি চা খেতে খেতে বলল, অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন। শুধু আজকের রাত নয় শিখা, চিররাত্রি এখন থেকে আমার জন্য বরাদ্দ হয়ে রইল।

শিখা বলল, আমি কিন্তু ওকথা বলতে চাইনি কাজল। আমি বলছিলাম, কাল এসে শান্তনুদার কাছ থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারটা শুনে নেব।

অলক বলল, সে হবে এখন। তার আগে শান্তনুদা তোমার রোলগুলো আমাকে দিয়ে দিতে পার। আমি রাত জেগে ডেভেলাপ করে রাখব। কাল সম্ভব হলে, প্রিন্ট করেই নিয়ে আসব।

শান্তনু তাব মেঝেতে পড়ে থাকা ব্যাগটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, যা পারিস্ তোরা কর ভাই। সব উৎসাহ আমার নিভে গেছে। ওতে আর আমার একটুও দরকার নেই।

কাজল বলল, তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। ওগুলো আমার গুপ্তধন। নিয়ে যান ভাই। কাল যতগুলো সম্ভব প্রিন্ট করে আনা চাই কিন্তু, আমি দেখব।

কাজলের শেষের কথাটায় সবাই চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। কেউ কিছু মন্তব্য করল না।

কাজল নিজেই আবার বলল, যেগুলোর জন্য আমি এতটা দুঃখ সইতে পারলাম, সেগুলো যে ভাই নিজের চোখ দিয়েই আমাকে দেখতে হবে।

গোপীনাথবাবু বললেন, কাজল আমার হেলেন কেলার। ওর ভেতরের চোখ দিয়েই ও দেখতে পাবে সবকিছু।

কাজল বলল, আশীর্বাদ করুন দাদা, অন্যের ওপর যেন পুরোপুরি নির্ভর আমাকে না করতে হয়।

গোপীনাথবাবু হেসে বললেন, হাত ধরেছ যার একদিন, দিনে রাতে সব সময়েই যে তারই হাত ধরে তোমাকে চলতে হবে বোন। সেখানে তোমার কোন গ্লানি বা অসম্মান থাকতে পারে না। তবে একথা মানি আত্মনির্ভরশীল হতে পারার মত তৃপ্তি কোথাও নেই।

রাত বাড়ছিল, তাই উঠে পড়ল সবাই। অলক শান্তনুর ব্যাগ থেকে পর্বত প্রমাণ ফিল্ম বের করে একটা কাগজে প্যাক করতে করতে বলল, আজ সারারাত আমার আর শিখার কাটবে স্টুডিওতে। কাল যতটা পারি, কনটাক্ট প্রিন্ট করে এনে তোমাকে দেখিয়ে যাব।

গোপীনাথবাবু বললেন, আমিও তাহলে আসব কাল। দেখে যাব কীর্তিমানের কীর্তিসৌধ।

এবার গোপীনাথবাবুই ব্যবস্থা করলেন শান্তনুর ফটো এগজিবিশানের। বাংলাদেশের ওপর এমন মর্মস্পর্শী এগজিবিশানের কথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি। দর্শকেরা ছবি দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সম্পূর্ণ নির্বাক। কারো কারো চোখে উদগত অশ্রু।

সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। প্রতিদিন অজস্র মানুষ মিছিল করে দেখতে এল। এ কোন উড়ো খবর নয়, উদ্বাস্তুর মুখে শোনা দুঃখের কাহিনী নয়। এ হল একটা দেশের সত্য ইতিহাস। প্রামাণ্য এক দলিল-চিত্র।

বিদেশী দূতাবাস থেকে এল অফিসারেরা। তারা আলাপ করে গেল শান্তনুর সঙ্গে। কেউ কেউ প্রচুর টাকা অফার করল শান্তনুকে, ছবির কপি রাইট একমাত্র তাদের দেবার জন্যে।

শান্তনু বলল, সবচেয়ে বড় কাজ হবে যদি আপনারা দেশে দেশে এসব ছবির প্রচার করেন। আমার কাছে আপনাদের এ ধরণের প্রচেষ্টা হবে টাকার চেয়েও দামী।

. অনেকেই ছবি নিল, বিদেশে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে।

বন্ধুরা শান্তনুকে বলল, বোকামী করে লাভ কি। ওরা মোটা টাকার অঙ্ক অফার করতে চাইছে, নিয়ে নাও। তার বেশ কিছুটা অংশ বাংলাদেশের কাজে তুমি লাগাতে পারবে।

শান্তনু বলল, যে কষ্ট করেছি, তার দাম নেবার অর্থই হল, আমার কষ্টকে লঘু করে দেখা। আর তাছাড়া কপিরাইট দিয়ে দিলে ছবির ওপর আমার কোন অধিকারই থাকবে না। তখন যদি ওরা ওটা বাইবে প্রচার না করে রাজনৈতিক কাবণে বাক্সবন্দী করে দেয়, তাহলে আমার সব পরিশ্রমই মাটি হয়ে যাবে।

কাজলকে বন্ধুদের কথা বলল শান্তনু।

কাজল বলল, বড়লোক হবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি তো টাকার কথা ভেবে তোমাকে বিপদের মাঝখানে পাঠাইনি। আজ সকলে তোমার তোলা ফটো দেখে বাংলাদেশের আসল ছবিটা বুঝতে পারছে। এর চেয়ে বড় পাওয়া তোমার আমার কি হতে পারে বল। তুমি একটা দামী কাজ করতে চেয়েছিলে। তোমার মন যদি ভরে থাকে সে কাজে, তাহলে মিথ্যা লোভের টাকায় আমাদের দরকার কি!

শান্তনু বলল, আমিও টাকা চাইনি কাজল, শুধু জানতে চেয়েছিলাম তোমার মনের কথা।

কাজল ম্লান হেসে বলল, আমার সুখদুঃখের কথা তুমি বুঝবে না। তোমাকে পাঠিয়ে আমার যে উদ্বেগ তার মূল্য টাকায় শোধ হয় না। তার দাম আমি পেয়ে গেছি তোমার ঐ কাজের ভেতর দিয়ে।

এই কাজের কৃতিত্বের জন্য অফিসে শান্তনুর পদোন্নতি ঘটল। কাজল বলল, এ পুরস্কার তোমার পাওনা, তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পার।

শান্তনু বলল, জান কাজল, অলক আর শিখা এই তিন চারশো ফটো ডেভেলাপ আর প্রিন্ট করার জন্যে একটা পয়সাও নেয়নি।

কাজল বিস্মিত, বলল, তাই নাকি!

শান্তনু বলল, আমি যখন অলককে তার স্টুডিওতে বসে বললাম, অলক, ভাই টাকাগুলো তোর একসঙ্গে দিতে পারব না, মাসে মাসে শোধ দেব। তখন ও বলল, তোমার বোন ডার্করুমে তোমার ছবিরই কাজ করছে, তাকে জিজ্ঞেস কর।

বেরিয়ে আসছিল তখন শিখা। সব শুনে ও বলল, তুমি অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়ে সাগর বন্ধনের কাজ করছ, তাতে আমাদের না হয় কাঠবেড়ালীর অবদান রইল। টাকার কথা বললেই কিন্তু সব কাজ তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বললাম, এমনিতেই দুটিতে মিলে রাতদিন ছবির কাজ করছ, তার ওপর আবার দারুণ একটা ক্ষতির বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?

অলক বলল, খালি তুমিই লাভ করে যাবে শান্তনুদা, লাভের ভাগ আর কাউকে দেবে না?

আর কথা না বাড়িয়ে এক গোছা ছবি নিয়ে আমি চলে এসেছি।

কাজল বলল, দেখ, আগে ওদের ওপর কত ভুল ধারণা ছিল আমাদের।

শান্তনু বলল, কাজের ভেতর দিয়েই মানুষকে চেনা যায়। আর একটা জিনিস দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে, ওরা মিলেমিশে কাজ করছে এক সঙ্গে। দুজনেব মুখেই তৃপ্তিব ছোঁয়া লেগে আছে। ওরা স্বামী স্ত্রী হিসেবে বড় সুখী।

কাজল শান্তনুর হাত ধরে বলল, আমি যদি অমনি করে তোমার কাজে সাহায্য করতে পারতাম। তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হ'তে পারলে না, তাই না?

শান্তনু রাগ করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ওদের সুখের কথা বলছি মানেই কি নিজের দুঃখের গান গাইছি।

কাজল শান্তনুর ছাড়িয়ে নেওয়া হাতখানা খুঁজতে লাগল দু'হাত বাড়িয়ে। শান্তনু নিজের হাতখানাকে কাজলের নাগালের বাইরে রেখে দিল।

এক সময় কাজল হাত নামিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কি হল আবার, শান্তনু বলে উঠল।

কিছুই বলে না কাজল। শুধু কাঁদতে থাকে।

শেষে অনেক সাধ্য সাধনা করে শান্ত করতে হল কাজলকে।

কাজল বলল, আমি অন্ধ বলে আজ তুমি আমার নাগালের থেকে হাতখানা সরিয়ে নিতে পারলে।

শান্তনু বলল, একটুতেই আজকাল তোমার বড় অভিমান হয়ে যাচ্ছে কাজল। ছোটখাট কৌতুকগুলোও তোমার রাগের কারণ।

কাজল শান্তনুর হাতখানা মুখের ওপর রেখে একটু চাপ দিয়ে পরে বলল, বেশ করব রাগ করব। আরও বেশি করে রাগ করব।

শান্তনু হেসে ফেলে বলল, তাহলে আমার বিবাদ করার কিছু নেই। তুমি একতরফা ডিক্রি পেয়ে গেলে।

এগজিবিশান হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দুখানা উপন্যাসও বেরিয়ে গেছে শান্তনুর। বিক্রির ঘরে এবার আর শূন্য নয়। এ দুখানা উপন্যাসের ফর্মাগুলো কাটার সুযোগ আর উইপোকাতে পাচ্ছে না। তার আগেই বের হয়ে যাচ্ছে দপ্তরীর ঘর থেকে প্রকাশকের কাউন্টারে।

এক বিশিষ্ট পাবলিশার শান্তনুর এগজিবিশানের ছবি দেখে এসেছিলেন তার কাছে। বলেছিলেন, বাংলা দেশের ওপর একখানা বই লিখে দিন আমি ছাপব। ও বই বিক্রিও হবে প্রচুর।

শান্তনু বলেছিল, মানুষের দুঃখের কাহিনী নিয়ে ব্যবসা করতে পারব না আমি। আমার নাম ডাক হবে, খ্যাতি হবে ঐ মৃত মুখগুলোর বিনিময়ে সেটা ভাবলে আমার কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, একটা দেশের সংগ্রামের ওপরে কি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি? বিখ্যাত লেখকেরা কি তা লেখেননি? আর ঐ বচনা পড়ে কি মানুষের মনে সেই দেশ সম্বন্ধে সাড়া জাগেনি?

শান্তনু বলেছিল, শুধু লেখকের নয়, এ বিষয়ে বিশিষ্ট মহৎ পাবলিশারদেরও কিছু করণীয় আছে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আছে বই কি, সেজন্যেই তো আমি এসেছি আপনার কাছে। একটা দেশ কি করে মার খাচ্ছে, সে সম্বন্ধে সকলেরই জানা দরকার।

শান্তনু অমনি বলে উঠেছিল, তাহলে ছাঁপুন আমার বাছাই করা ছবিগুলো। তার নীচে থাকবে পরিচয়। এ হবে চিত্র-সাহিত্য। একটা মার খাওয়া জাতির সত্য ইতিহাস।

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, ফটো ব্লক করা, আর্ট পেপারে ছাপানো, এসব অনেক খরচের ব্যাপার। আচ্ছা ভেবে দেখব।

শান্তনু বলেছিল, আচ্ছা ভেবে দেখুন।

কাজল কথাগুলো শুনে বলেছিল, ভদ্রলোক দেশের কাজ করতে চেয়েছিলেন, তুমি দিলে তো তাঁর পরিকল্পনাটা মাটি করে!

শান্তনু হেসে বলেছিল, এক পাও বাংলাদেশের ভেতর না বাড়িয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে কত বই-ই লেখা হচ্ছে। হট্ কেকের মত তা বিক্রিও হচ্ছে। খালি সাধারণের মনের উত্তেজনা কিসে বাড়ে সেই বুঝে লেখা চাই। ব্যস আর কিছু দেখতে হবে না।

কাজল বলেছিল, আমি তো সব সময়েই তোমাকে বলে এসেছি, মনের তাগিদে লিখবে। তাতে নাম হোক্ নাই হোক্ কিছু যায় আসে না।

উপমা দিয়ে আবারও বলেছিল, কালবোশেখী ঝড়ের আয়োজনে ঘনঘটা খুব কিন্তু আকাশ থেকে

উড়ে যেতেও তার খুব বেশি একটা সময় লাগে না। তোমার সৃষ্টির ফসল পঙ্গপালের ভোগে লাগুক, এ আমি চাই না। রসিকজনের তৃপ্তিকর হলেই হল।

তাই শান্তনুর সাম্প্রতিক দু'খানা উপন্যাসে বাংলাদেশের কোন নাম গন্ধই ছিল না। সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক এ সৃষ্টি।

বই বিক্রি হচ্ছে শুনে কাজল বলল, দেখলে তো ভাল জিনিসের কদর হয়। ধীরে ধীরে হলেও কাটছে তো বই।

শান্তনু বলল, যে সময় বই-এর বাজারে 'ভাগ্য বিচার' আর 'ভিয়েৎনাম' ছাড়া বই নেই, সে সময় কেমন করে যে আমার বইও দু'দশখানা করে কাটছে তা ভেবে পাই না।

কাজল বলল, যে জিনিস খাবাব জন্যে যত লোভ, সে জিনিসের ওপব তত তাড়াতাড়ি অতৃপ্তি। কড়া টক ঝালের ওপর লোভ মানুষের আগেই জন্মায়, কিন্তু তার ফলটা সুখকর নয় বলে সে যখন জানতে পারে তখন ঐ বস্তুর থেকে মুখ ফেরাতে তাব বেশি সময় লাগে না।

শান্তনু বলল, বন্ধুরা অনেকেই আমার লেখা সম্বন্ধে অভিযোগ তুলে বলে, জীবনকে গভীর করে না দেখলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে না। তাছাড়া বর্তমানের সাহিত্যের যে হাওয়া বদল হয়েছে তার সঙ্গে যোগ রেখে নিরাসক্ত দর্শকের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখতে হবে। এ গুলোর অনেক কিছুই নাকি আমার লেখায় অনুপস্থিত।

কাজল বলল, তাদের দিক থেকে বলতে পারি তারা হয়ত ঠিক সমালোচনাই করেছে, কিন্তু আমার দিক থেকে বলব, তোমাব লেখা পড়ে আমি বড় তৃপ্তি পাই। জীবনকে সহজ করে দেখা আমার মতে অনেক কঠিন, অনেক মধুর।

শান্তনু বলল, তুমি আমার স্ত্রী বলে আমার সবেতেই তুমি সুন্দর দেখ।

মোটেও তা নয় মশাই, কাজল প্রায় ক্ষেপে উঠেই বলল, ভাল লাগাটা যে যার নিজের ব্যাপার। আমি তো মনে করি লেখকদের প্রত্যেকের ভাবনা ও প্রকাশের ভেতর যেমন থাকবে নিজস্ব ছাপ, তেমনি পাঠকদের গ্রহণের ভেতরেও থাকবে একটা নিজস্বতা। লেখার হাত বা দেখার চোখ আলাদা না হলে, সে হবে মুখস্ত করা ফরমুলায় ফেলা অঙ্কের মত।

শান্তনু বলল, অবাক হচ্ছি তোমার বিচারের ধারা দেখে। আজকাল সাহিত্যের দরবারে অনেকেই অনেককে রবীন্দ্রানুসারী বলে গালমন্দ করেন। এটা ঠিক কেমন জান, পুজোয় শাড়ির দোকানে সওদা করতে গিয়ে অনেক মহিলাকে যেমন বলতে শোনা যায়, এ শাড়ি তো গতবছর থেকে চালু। এটা ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছে। নতুন দেখান। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, বাজার চলতি লেখকদের একজনের লেখা পড়লেই তাদের সকলের ভেতর রচনা রীতি আর দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্চর্য মিল দেখতে পাবে। কে যে এই ব্যাপারে কার গুরু তা ধরা মুশকিল। এ রীতির মূল এ দেশে খুঁজলে যতটা না পাবে, বিদেশে তার মূল আর শেকড় সবই পাওয়া যাবে। আমি অবশ্য সবার কথা বলছি না। এ যুগে নিজের পথ কেটে স্বরাট হবার চেষ্টাও করে চলেছে কোন কোন শক্তিমান। আধুনিক রঙীন চশমায় এক রকম ভাবে না দেখে, নিজের মত করে যারা লিখছে তাদের ওপর শ্রদ্ধা আমার অনেক বেশি।

কাজল বলল, দেখ, তোমার আমার মতের মিলটা এত বেশি না হলেই বোধহয় ভাল হত।

শান্তনু হেসে বলল, দ্বন্দ্বের একটা অর্থ ঝগড়া, আবার দ্বন্দ্ব সমাসের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে দুটিতে মিলে মিশে এক হয়ে আছে।

কাজল বলে উঠল, জায়া আর পতির ঝগড়া যেমন সুবিদিত, তেমনি মিলেমিশে নিজেদেব হাবিয়ে তারা আবার দম্পতিও হয়ে আছে।

শান্তনু বলল, কে বলে তুমি অন্ধ কাজল। যে বলে সে নিজেই কাণা।

কাজল বলল, পতিদেবতার দেওয়া সার্টিফিকেটটা বাঁধিয়ে রেখে দেব।

শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমলকির ডালে ডালে নৃত্য করে সে পাতা ঝরাতে শুরু করেছে কিনা তা না দেখলেও গানের সুরে শীতের কাঁপন তুলেছে কাজল।

'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।।'

শান্তনু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দেখল কাজল দাঁড়িয়ে আছে দুটি বাহু হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে। গান গাইছে, রূপ দিচ্ছে তাকে নাচের মুদ্রায়। আপন মনে কতকক্ষণ সে শীতের হাওয়ার আগমনে আমলকি ডালের নাচন আর পাতা ঝরে যাবার খেলা খেলে চলল। শান্তনুর মনে হল, কাজল যেন সত্যিই একটি বৃক্ষ। কারো আসা যাওয়ার দিকে বৃক্ষের মতই কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তার, শুধু আপন মনে ফুলফোটান, পাতা ঝরানোর কাজ।

গান থামল। এবার কাজলের হাতে অনুভবের মুদ্রা। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে ধরল জানালার গরাদ। মুখখানা দুটি গরাদের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

শান্তনু আরও কাছে সরে এল তার। কাজলের চূর্ণ চুলগুলো উত্তুরে হাওয়ায় কপাল জুড়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। কাজল তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে জানালার ফাঁক দিয়ে। এই জানালায় দাঁড়িয়ে চলমান জগতকে দেখবে বলে নিজেই একদিন এ বাসা পছন্দ করে নিয়েছিল সে। আজ চোখের দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে, তবু কাজল ছাড়তে পারেনি তার চিরদিনের অভ্যেস। বেলাশেষেব ঘণ্টা বাজলেই এসে দাঁড়ায় এই জানালাটার ধারে।

কতক্ষণ কাজলকে দেখল শান্তনু। কেমন করে একান্ত আপনার জগতটাকে পলে পলে গড়ে নিচ্ছে তাই জানতে ভারি ইচ্ছে হল তার। কিন্তু এ জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র তো নেই তার হাতে। চোখের দৃষ্টি হারালেই কেবল ঢুকতে পারা যায় ওখানে। শান্তনুর মনে হল, যদি এমন কোন যাদু থাকত তার জানা, যার বলে সে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও কাজলের জগতে প্রবেশ করতে পারত তাহলে ওর একক যাত্রার নিঃসঙ্গতাটুকুকে সে সমস্ত মন দিয়ে ছুঁয়ে আসতে পারত।

বোধহয় কথাগুলো মনে মনে আলোচনা কবতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল শান্তনুর। ঐটুকু হাওয়ার তরঙ্গে চমকে পাশে তাকাল কাজল।

কে ?

আমি শান্তনু।

ও তুমি, আমি কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কখন এসে দাঁড়িয়েছ জানতেই পারিনি। কই, সাড়া দাওনি তো?

তুমি কি দেখছিলে কাজল ঐ জানালার বাইরে? শান্তনু জিজ্ঞেস করল।

কাজল বলল, কত কি। আমাদের উঠোনের ঐ চাঁপাগাছটার পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল একটা হাওয়া। কাজের সময় হুড়মুড়িয়ে একটা দামাল ছেলে এসে পড়ে যেমন কবে মায়ের সব কাজ এলোমেলো করে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি। তারপর উড়ে এসে চাঁপার ডালে বসল দুটো ঘুঘু। দুজন দুজনকে কতক্ষণ ধরে মনের কান্নাগুলো জানাল। একসময় উড়ে গেল তারা। একটির পেছনে আর একটি। তারপর জানালা থেকে শেষ বেলার রোদটুকু সরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার নিশ্বাস আমার কানে এসে বাজল।

শান্তনু বলল, আমার মনে হয় কাজল, বাইরের দৃষ্টি যারা হারায় তারা অনেক বেশি দেখতে পায়। এ কথাগুলো তোমার কানে সান্ত্বনার মত শোনাতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

কাজল বলল, দুটো জীবনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাই বলি, আগের দেখাটা ছিল আমার অনেকখানি ছড়িয়ে, আর এখনকারদেখাটা হল ছোট জায়গার ভেতর সবকিছু কুড়িয়ে। এ যেন ঠিক গাছের তলার অনেকখানি ছড়ান বকুল ফুল কুড়িয়ে এনে ছোট্ট মালায় গেঁথে রাখা। তা'র সবটুকু গন্ধকে ঐ মালায় বেঁধে নেওয়া।

শান্তনু বলল, কাজল, আমি কাজে বেরিয়ে যাই, জানি তোমার খুবই একা একা লাগে। আমিও অফিসে কাজে মন বসাতে পারি না।

কাজল শান্তনুর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, তাই বুঝি এমন করে আগেভাগে পালিয়ে আস? আমি তোমার 'বস' হলে চাকরী থেকে কবেই বরখাস্ত করে দিতাম।

শান্তনু বলল, আমার নিউজ এডিটারের তুলনাই হয় না। উনিই আমাকে আগেভাগে ডেকে বলেন, যাও শান্তনু বাড়ি যাও।

কাজল বলল, দেখ, তুমি আজকাল তাড়াতাড়ি ফিরে আসছ, অথচ নিজের হাতে তোমাকে এক কাপ হরলিক্সও তৈরি করে দিতে পারছি না। রোজ রোজ বাইরের কেনা খাবারই খাওয়াতে হচ্ছে।

শান্তনু বলল, রোজ তো তোমার হাত থেকে নিয়েই খাবার খাই। অকারণে কষ্ট পাও কেন।

কাজল বলল, আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না। বিশাখা যখন ছাইপাঁশ রেঁধে তোমাকে খেতে দিয়ে যায়, তখন একটি কথা না বলে তুমি খেয়ে চলে যাও। তারপর নিজে খেতে বসে যখন রান্না মুখে তুলি, তখন জলে দুচোখ ভেসে যায়। না, নিজের জন্যে নয়, তোমার কথা ভেবে।

শান্তনু বলল, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।

কাজল বলল, খুবই বুঝতে পার। আমার রান্নায় একটুখানি ত্রুটি ঘটলেই তুমি বাড়ি মাথায় করতে। এখন চুপচাপ খেয়ে চলে যাও।

শান্তনু বলল, ওকে বলে কি হবে বল, রান্না করে দিয়ে যাচ্ছে এই যথেষ্ট।

কাজল বলল, দুঃখ তো আমার সেইখানেই। আমি আজ অন্ধ হয়েছি বলে, তোমার মুখও বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি সব কিছু সয়ে যাচ্ছ।

শান্তনু বলল, এখন বুঝতে পারছি রান্নার ব্যাপারে আগে তোমাব ওপর রাগ করা আমার ঠিক হয়নি।

কাজল বলল, কেন একথা বলছ। তুমি শান্ত হয়ে গেলেই আমার কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমি অন্ধ হয়ে গেলাম বলে একটা মানুষের স্বভাব বদলে যাবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারছি না।

শান্তনু হেসে বলল, এবার অফিস থেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই দারুণভাবে বকুনি শুরু করব। সে তুমিই সামনে পড়, বিশাখাই পড়ুক, অথবা তোমার ঐ সাধের বেড়ালটা।

বেড়ালের কথায় কাজল কথান্তরে গেল।

জান, পম্‌পম্‌ আজকাল খুব আবদারে হয়ে গেছে।

শান্তনু বলল, কি রকম?

কাজল বলল, ও ঠিক আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছে না। পাশ দিয়ে চক্কর মেরে চলে গেলেও যখন আমি ডাকি না, তখন দু-একবার ম্যাও ম্যাও করে ক্ষোভটা জানায়। তারপরে একেবারে লাফ দিয়ে কোলের ওপর এসে পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকলে এসে পড়ে পায়ে। কাপড় ধরে টানতে থাকে।

শান্তনু কোনদিনই বেড়াল পছন্দ করত না। এ নিয়ে তার সঙ্গে কাজলের অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক মান অভিমানের পালা হয়ে গেছে।

কাজল বেড়াল নিয়ে শোবে বিছানায়। শান্তনুর ঘোরতর আপত্তি। কাজল পম্‌পম্‌কে অমনি কোলের ভেতর চেপে ধরে পাশ ফিরে শুল।

রাগ করে শান্তনু বলত, হয় আমাকে তোমার বিছানা থেকে বিদেয় কর, নয়তো তোমার ঐ মা ষষ্ঠির বাহনটিকে।

কাজল রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত পম্‌পম্‌কে! অন্ধকার ঘরের কোণায ঘুবে ঘুরে সে অনবরত চেঁচিয়ে যেত।

শান্তনু বলত, দুটি হাত জোড় করছি কাজল, ঘাট হয়ে গেছে আমার, ওকে নিয়ে এসো। বলতো আমিই এনে দিচ্ছি। বাত জেগে মিয়া সাহেবের কালোয়াতি আর শুনতে পাবব না।

কাজল উঠে গিয়ে পম্‌পম্‌কে বাইরে বের কবে দিয়ে দবজা বন্ধ কবে দিযে আসত। কিন্তু দবজা

বন্ধ হলে হবে কি, জানালা খোলা। তারই ভেতর দিয়ে মিস পম্‌পমের পুনঃ প্রবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর গ্রামে সুর সাধনা।

অগত্যা উঠতে হত শান্তনুকেই। ঘাড়ে করে দুজনের মাঝে এনে শোয়াতে হত। ভোরবেলা দেখা যেত পম্‌পম্ যথারীতি কাজল দেবীর কোল আলো করে শুয়ে রয়েছেন।

কাজলের অনুপস্থিতিতে একদিন শান্তনুর খাবারে মুখ দিয়েছিল বলে শান্তনু ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নীচের উঠোনে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছিল, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জনিত আঘাত সকল জীবকে কাবু করতে পারে না। সাময়িকভাবে বিরক্ত হয়ে পম্‌পম্ কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু উঠোনটা এমন অবলীলায় সে পার হয়ে গিয়েছিল যে, শান্তনুর মনে হল, পম্‌পম্ তাকে সম্রাজ্ঞীর মত অবহেলা করে চলে গেল।

আজ কিন্তু কাজলের কথায় পম্‌পম্ সম্বন্ধে শান্তনু কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, খুব স্বাভাবিক কাজল। ও তোমার দৃষ্টি ঠিক মত আকর্ষণ করতে পারছে না। আর তাই ওর ক্ষোভের শেষ নেই।

কাজল বলল, সেদিন পায়ের ওপর এসে এমন আঁচড় দিয়েছিল যে ছড়ে গিয়ে ভীষণ জ্বালা করছিল। ওটাকে মনে করছি, এবার বিদেয় করে দেব। বিশাখাকে বললেই নিয়ে যাবে। ওর খাবার খরচ বাবদ মাসে কয়েকটা করে টাকা দিলেই হবে।

শান্তনু হাঁ-হাঁ করে উঠল, তা হয় নাকি! এতদিন ঘরে আছে, একটা মায়া পড়ে গেছে, ওকে কখনো পরের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

সত্যি আজ চেষ্টা করলেও পম্‌পম্‌কে প্রাণ ধরে সে আর কারো হাতে তুলে দিতে পারবে না। ওর ভেতর যে তার কাজলের সব ভালবাসার স্মৃতিগুলো জড়িয়ে আছে।

কাজলের দৃষ্টি হারানোর পর থেকেই লোক আসার বিরাম নেই। কাজলের বান্ধবীরা, শান্তনুর বন্ধুরা আসা যাওয়া করছে আজকাল যখন তখন।

সেদিন এল গুরুদাস। এসেই বলল, এবার ভাবীজীকে আর পিক্‌নিকে পাওয়া যাবে না। ফি বছর আপনারই ছিল পরিচালিকার ভূমিকা, এবার মিসেস মঞ্জরী সেনকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাজের চেয়ে মঞ্জরী সেনের লীলা বেশী। পরণে, চলনে, দৃষ্টিপাতে মঞ্জরী সেন মনোহারিণী। এক কথায় মক্ষীরাণীর ভূমিকাটিতে ছিল তাঁর সহজাত অধিকার।

একমাত্র সেজন্যেই মঞ্জরী সেন ছিল কাজলের কাছে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। সমস্ত দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে তাকে, অথচ ভোজ সভায় ভোজ্যবস্তুর সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো হবে মিসেস সেনের সরস সমালোচনার বিষয়।

মিসেস সেনের মন্তব্যগুলিও মনোহর।

নারকেল চিংড়ির আকার ছোট হলেই বলেন, এমন স্বাস্থ্যবান চিংড়িগুলো নিশ্চয়ই চিংড়িহাটার অবদান। নারকেলের দুধে না ডুবিয়ে হরিণঘাটার দুধে ডোবালেই জমত ভাল।

সুক্তো একটুখানি বেশি তেতো হলেই বলবেন, কুইনাইনের আবিষ্কারককে ধন্যবাদ, তাঁর কুইনাইন আজ সুগৃহিণীদের রান্না ঘরেও প্রবেশ করেছে। ম্যালেরিয়া তাড়ানোর জন্যে জঙ্গল পানার নির্বাসন দিতে হবে না।

কোন তরকারীতে চিনি কম হলেই বলবেন, অন্ততঃ আমি হলফ করে বলতে পারি ডাইবিটিসের রোগীরা নিরুদ্বেগে এই তরকারীটি চেয়ে খেতে পারেন। সুগার বাড়লে ডাক্তারের ফি জোগাবার দায়িত্ব আমার।

নুন বেশি হলেই বলবেন, ঝোলটা নুনের সাগর হলে রাঁধুনীকে নিশ্চয়ই গুণের সাগর বলতে হয়। কারণ নুন খেলে গুণ গাইবার রীতি আছে প্রবচনে।

এ হেন মিসেস সেনকে কাজলের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। শান্তনুর বন্ধু গুরুদাসের কথা শুনে কাজল তাই বলল, মিসেস সেন যদি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাহলে সরস চাটনী পরিবেশনের জন্যে এবার কাকে নিযুক্ত করছেন আপনারা? নাকি উনি নিজেই আত্মসমালোচনার ভারটাও নেবেন।

হাসল গুরুদাস। বলল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এডিটরের নির্বাচন।

কাজল বলল, এবার তরকারীতে নুন কম হলে নিশ্চয়ই আপনারা লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে নামবেন?

এবার মিসেস সেনকে চিনি নিশ্চয়ই 'চিন্তামনি জোগাবেন?

গুরুদাস বলল, দাঁড়ান ভাবীজী, মিসেস সেনের দৌড়টা একবার দেখা যাক। জাপানী নাইলন. সামলে কি করে রান্নার কাজ সামলান তাই দেখব এবার।

গুরুদাসের কথায় মনে মনে একটু খুশি হল কাজল। তবু অদৃশ্য একটা ব্যথার কাঁটা বার বার তার মনের কোমল জায়গাটায় বিঁধতে লাগল।

আজ সে পরিত্যক্ত। সবার আনন্দভোজে সে অপাঙক্তেয়। বার্ষিক পিক্‌নিকে সে ছিল সবকিছু আয়োজনের মাঝখানে। সারাদিন খাটুনির মাঝে. থেকেও সে যেটুকু তৃপ্তি কুড়িয়ে আনত, তাই ছিল তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

সন্ধ্যায় শান্তনু এল। উঁকি দিয়ে দেখল, কাজলের মুখখানা থমথমে।

বলল, শীতের বনে শ্রাবণের মেঘভার দেখছি।

কাজল ওদিক দিয়ে গেল না। বলল, তোমার খাবার আনব?

শান্তনু বলল, এত কষ্ট করে আবার এ ঘরে আনবে।

কঠিন হল কাজল। বলল, তুমি খাবে কিনা এখন তাই জানতে চেয়েছি। কোথায় খেতে দেব না দেব সে ভাবনাটা দয়া করে না ভাবলেও চলবে।

শান্তনু কাজলের গলার পরিবর্তনে কিছুটা অবাকই হল।

অনুত্তেজিত গলায় সে বলল, দাও, তোমার যেখানে খুশি।

কাজল খাবার নিয়ে এল। আজকাল বিশাখাকে সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে হয না। কাজল স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে।

মেঝেতে খাবার নামিয়ে রেখে সে আসন পেতে দিল শান্তনুকে। ততক্ষণে শান্তনু তার ধড়াচুড়ো বদলে ফেলেছে।

শান্তনু দেখল, গরম গরম পরটা আর আলু মরিচ।

সে একটু অবাক হল, কারণ কাজলের দৃষ্টি হারানোর পর থেকে সন্ধ্যার জলযোগটা তার আসত সামনের দোকান থেকে। আজ একেবারে বাড়ির তৈরি খাবার। ঠিক যেন আগেকার দিনগুলো ফিরে এসেছে। কিন্তু কে বানাল এসব। কাজলের কথা ভাবাই যায় না।

শান্তনু বসে আপন মনে খেয়ে যাচ্ছে, একটু দূরে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে কাজল। দুজনেই নির্বাক। এক সময় শান্তনু বলল, এ তো বিশাখার হাতে তৈরি বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে দুপুরে কি শিখা এসেছিল?

এবার ফেটে পড়ল কাজল, তোমরা কি ভাব বলতে পার? আমি কি একেবারে মরে গেছি। বিশাখা, শিখা এরা না হলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে!

শান্তনু বলল, আমি কি তা বলেছি একবারও।

কাজল বলল, সবাই তাই মনে করে। যারাই আসে তাদের মুখে আহা আহা, শুনতে শুনতে নিজেব ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। আমি কি অবলা জীব যে তোমাদের সকলের করুণার মাঝখানে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

শান্তনুর খাওয়া থেমে গেল। শান্তনু ভাবতে লাগল, কাজলের এ পরিবর্তনের কারণ কি।

উত্তেজনা শেষ হল, এখন চোখের জলের পালা। বসে আছে কাজল, গড়িয়ে পড়ছে চোখেব জল।

শান্তনু বলল, আমি কি তোমাকে কোনকিছু বলে দুঃখ দিয়েছি কাজল?

কাজল তেমনি কান্নাভেজা গলায় বলল, দিয়েছই তো। তুমি আমাকে কেবল আগলে রাখবার চেষ্টা কবছ। তোমার গলার স্বর কত শান্ত আর কোমল হয়ে গেছে। আমি তো তা চাইনি। আমার দুঃখ, আমার অসহায় ভাবটা তখনি বেড়ে ওঠে যখন দেখি তোমরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছ।

তোমরা একটু স্বাভাবিক আচরণ শুরু করলেই আমি নিজের অনেক দুঃখ ভুলতে পারব।

শান্তনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই হবে কাজল। তোমার অশান্ত মনের শান্তি আমি আর অবুঝের মত ভেঙে দেব না।

শান্তনু উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। আবার যখন ফিরে এল তখন কাজল বিছানায় বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে।

শান্তনু ঘরের মাঝখান থেকেই বলল, আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি কাজল।

কাজল হঠাৎ একটু চমকে উঠল। বলল, কোথায় যাবে?

গোপীনাথদার কাছে।

কাজলের গলায় এবার বাজল একটা ভয় মেশান সুর।

রাত হয়েছে। কেউ নেই ঘরে। তুমিও চলে যাবে? খুব দরকার, না গেলেই নয়? আচ্ছা তাহলে এস তাড়াতাড়ি ফিরে।

শান্তনু মনে মনে হাসল। যে কাজল একটু আগে তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ঘিরে রাখতে বারণ করেছিল, সেই কাজলই এখন তার অসহায় হাত দুটো ধরার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

শান্তনু বলল, বড় একটা কিছু তাড়া নেই, এই এমনি একটু আড্ডা মেরে আসব ভাবছিলাম।

কাজল বলল, ও, আমি মনে করলাম, জরুরি কিছু কাজ হয় তো বা তোমার আছে। তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই। চলনাগো আজ একটু কোথাও যাই।

কোথায় যাবে বল এ রাতে?

কাজল বলল, একটু ভিক্টোরিয়ার আশেপাশে কোথাও বসতে ইচ্ছে করছে।

শান্তনু বলল, আমাদের যেতে যেতেই ভিক্টোরিয়ার গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তবে যদি মাঠে কোথাও বসতে চাও তো চল। ঠাণ্ডা পড়েছে কিন্তু।

কাজল উৎসাহে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। বলল, এই শীতের সন্ধ্যায় বড় একটা ভীড় থাকবে না, তাই যেতে চাইছি।

শান্তনু বলল, তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, তোমার তো আবার সাজতে একটি ঘণ্টা।

শেষের কথাটা ইচ্ছে করেই বলল শান্তনু।

কাজল বলল, এই দেখ না, পাঁচমিনিটেই আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

সত্যি, শাড়িখানা বদলে কাজল বেরিয়ে এল খুব তাড়াতাড়ি।

বলল, কি মশাই, কত দেরী হল?

শান্তনু বলল, এত শিগ্‌গির তোমার প্রসাধন হয়ে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি।

কাজল বলল, কেমন চমক লাগিয়ে দিলাম।

শান্তনু বলল, যারা ভীষণ দস্যি হয়, তারাই কেবল সময়ে অসময়ে চমক লাগিয়ে দিতে ভালবাসে। এ বিষয়ে তোমার কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

কাজল বলল, কি রকম?

শান্তনু বলল, আগে ট্যাক্সি ডাকি, তারপর বলব।

কাজল বলল, আমারও একটা কথা তোলা আছে, গাড়ীতে বসেই হবে।

ট্যাক্সি এল। শান্তনুর হাত ধরে উঠোন পেরিয়ে কাজল ট্যাক্সিতে এসে উঠল। শান্তনু বসেই বলল, ভিক্টোরিয়া। গাড়িতে কাজল আর শান্তনু। কতদিন পরে তারা বেরিয়েছে এক সঙ্গে। পরিচয়ের প্রথম দিনগুলোতে দুজনে ট্যাক্সি চড়ে কত বেহিসেবী খরচ করেছে। কলকাতায় টাকা নাকি হাওয়ায় ওড়ে। ধরে নিতে পারলেই হল। ওরা সে সময় টাকা সত্যি সত্যিই কাগজের টুকরোর মত হাওয়ায় উড়িয়েছে। ধরে যদি কেউ নিয়ে থাকে তাহলে সে ট্যাক্সি ড্রাইভার, আর রেস্টুরেন্টের মালিক।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে কাজল বলল, আমার চমক লাগানোর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি বলছিলে বল?

শান্তনু বলল, আগে তোমার কি কথা আছে বল?

না, তুমি আগে বল?

তোমারটাই আগে শুনব।

কাজল বলল, সত্যি ভুলে গেছি। তোমার কথা শুনতে শুনতে যদি মনে পড়ে যায়।

শান্তনু কাজলের হাতটা অন্ধকারে মুঠোর ভেতর নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলল, দারুণ চালাক তুমি। আমার কথাটা শুনে নিয়ে আকাশ পাতাল ফুঁড়ে বলবে, এই যাঃ, মনে পড়ছে না।

সত্যি বলছি, বলার চেষ্টা করব।

শান্তনু বলল, তোমার সব চেয়ে বড় চমকটাতো বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার পরই তুমি আমাকে দিয়েছ। তোমার অন্ধ হয়ে যাওয়াটাই কি আমার কাছে নিদারুণ একটা চমক নয়!

কাজল এবার শান্তনুর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আঙুলে আঙুলে খেলা শুরু করে দিলে।

শান্তনু বলল, এখন তোমার কথাটা বলবে কি?

ও কিছু নয়।

শান্তনু বলল, কিছু হোক্ না হোক্ সে আমি বুঝব। এখন ঝটপট বলে ফেল দেখি।

কাজল বলল, একেবারে ঘরোয়া। কঠিন গদ্য।

শান্তনু অস্থির। বলে উঠল, আবার ভণিতা!

কাজল বলল, তুমি ঘরে এসে পরটা, আলুমরিচ খেলে। কই বললে না তো কেমন লাগল। তাছাড়া আর একখানা চেয়ে নিলে না, রাগ করে উঠে গেলে।

শান্তনু হো হো করে হেসে উঠে পরক্ষণে ড্রাইভারের কথা ভেবে চুপ করে গেল।

আস্তে আস্তে কাজলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, পরটা কি জগতে সব চেয়ে সেরা খাদ্যবস্তু কাজল। তার চেয়ে অনেক মূল্যবান খাবার কি নেই? অনেক ভাল খাবারের জন্য অনেক সাধারণ খাবারকে উপেক্ষা করতে হয়।

কাজল গম্ভীর হয়ে বলল, আমি যে সারা দুপুর কষ্ট করে ওগুলো বানালাম, তার কোন দাম নেই তোমার কাছে?

শান্তনু বলল, তুমি সত্যি কি এতখানি ব্লান্ট হয়ে গেছ কাজল!

কাজলের মাথায় শান্তনুর কৌতুকটা ঝট করে খেলে গেল।

সে বলল, বুঝেছি লোভী। অখাদ্যে তোমার লোভের অন্ত নেই।

গাড়ি এসে গেল ভিক্টোরিযার গেটের সামনে। ওরা নেমে পড়ল। একখানা প্রাইভেট কাব তখনও দাঁডিযেছিল। একটি অবাঙালী পরিবারের কটি ছেলে মেয়ে ঘিবে দাঁড়িয়েছিল এক ভেলপুবীওলাকে।

শান্তনু কাজলের হাত ধরে বলল, তুমি তো কিছু খাওনি, গরম গরম ভেলপুরী খাবে?

কাজল পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার কি খুব ক্ষিদে পেয়েছে?

শান্তনু বলল, এই তো আমি তোমার হাতের তৈরি খাবার খেযে এলাম। এরই ভেতর ক্ষিদে পাবাব কথা তো নয়।

কাজল বলল, তাহলে চল আমরা মাঠেব ভেতর বসি গিয়ে। আচ্ছা রেস কোর্সের ধারে সেই যে মহানিম গাছটার তলায় বসতাম, সেইখানটাতে চলনা গো।

শান্তনু আর কাজল বিয়ের আগে বহু সন্ধ্যায় ঐ মহানিম গাছটার তলায় বসে গল্প করেছে। রেড বোড ধরে যে গাড়িগুলো পি. জি. হাসপাতালের দিকে ছুটে আসত, তাদের ভেতর কোন কোন রসিক ছোকরা ড্রাইভার ওদের ওপর হেড লাইটের কড়া আলো ফেলত। খালিগাড়ির দু'জন পার্টনার এক সঙ্গে থাকলে কখনোবা হাওয়া কাঁপিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে যেত কিছু মজার মন্তব্য।

শান্তনু বলত, এবার এ জায়গাটাকে বদলাতে হচ্ছে।

কাজল বাধা দিয়ে বলত, ওরা যদি আমাদের দেখে কিছু উৎসাহ পায় তো পাক না। ওদের আনন্দ দিলে আমবাও নিশ্চয়ই আনন্দ পাব জীবনে।

তাই বিয়ের আগে আর তারা স্থান বদল করেনি।

আজ কাজলের মনে পড়েছে সেই পুরোনো গাছ তলাটার কথা।

শান্তনু বলল, আকাশের চাঁদ আজ অঝোর আলোর জল ঢেলে দিয়েছে মাঠে। ঘাসের ওপর শিশিরগুলো পর্যন্ত ঝলমল করছে।

শান্তনু আর কাজল ময়দানের ভিজে ভিজে ঘাসে চটি খুলে পা ডুবিয়ে দাঁড়াল।

কাজল নরম ঘাসে পা রেখেই কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। শান্তনু তার হাত ধরেছিল। বলল, কি হল তোমার?

কাজল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে।

শান্তনু উৎসাহিত হয়ে উঠল।

খুব ভাল লাগবে। এ সন্ধ্যা, কবিতারই সন্ধ্যা।

কাজল খুব আস্তে আস্তে অনেক গভীর থেকে বলল, জীবনটা কি অদ্ভুত নাটক তৈরি করে চলেছে, ভাবলে বড় আশ্চর্য লাগে।

শান্তনু বলল, এ কথা কেন কাজল?

কাজল যেন সে মুহূর্তে অন্য জগতের অধিবাসী। সে বলে চলল, ইস্কুলের শেষের ক্লাশে বার্ষিক উৎসবে আমি একটি কবিতা বলে পুরস্কার পেয়েছিলাম। শুনবে সে কবিতা। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা, অন্ধ বধূ। বলেই আবৃত্তি শুরু করল।

পায়েব তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চল্ না ঠাকুর ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইত বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরী ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
—অনেক দেরী? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!
মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

কত লোকেই যায় ত পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ি আসে?
চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ!
পাড়াব মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমাব ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে আসার নাই কোন উদ্দেশ।
—এই যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিবে আসতে হবে ত তার কাছে?

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে—
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বহি আপন মাথায়!
দেখিস তখন, কাণার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর।
তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌ব নাক আর,
শেষের পথে কিসের বল ভয়—
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক—ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়!
শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে।

দীর্ঘ একটি শোক গাথা মনের আবেগ দিয়ে আবৃত্তি করে গেল কাজল। শীতের হাওয়াকে কেমন যেন দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল। চাঁদের মাঠ বিছানো জ্যোৎস্নায় ঘাসের ওপর শিশিরের কান্না মনে হল যেন আক্ষেপে ভরা অন্ধবধূর চোখের জল।

শান্তনু কাজলের হাত ধরে বলল, এ কবিতা আজ তুমি কেন আবৃত্তি করলে কাজল?

কাজল বলল, মনে এল তাই।

শান্তনু বলল, আমি কি তোমার মনে কোন দুঃখ দিয়েছি কাজল, যেজন্যে আজ এই চোখের জলে ভেজা কবিতাটি আমাকে শোনালে?

কাজল শান্তনুর হাতখানা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার মনের মানুষ তো আমার কাছেই রয়েছে। তাকে ছেড়ে আমি কোন্ দীঘির শীতল জলে বুকের জ্বালা জুড়াব। সেই তো আমার সুখ দুঃখের সাগর।

ওরা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ওদের সেই পুরাতন জায়গায়। বেগ পেতে হল শান্তনুকে ঠিক জায়গাটা খুঁজে নিতে। কারণ অনেক চিহ্ন বর্তমান থাকলেও গাছটা ছিল না সেখানে। শুধু কাণ্ডের একটা সামান্য অংশ করাত দিয়ে কাটার পর অবশিষ্ট ছিল। শান্তনু কাজলকে নিয়ে সেইখানেই বসল। সে গাছটার পরিণতির কথা গোপন করে গেল কাজলের কাছ থেকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজনে। বোধহয় সেই মুহূর্তে তারা প্রবেশ করেছিল তাদের ফেলে আসা অতীত জগতটার ভেতর। সেখানে ঊর্ধ্বমুখী গাছটার পাতাগুলো ঝির ঝির শব্দ তুলে বৃক্ষ জগতের কোন গান গাইছিল। সেখানে দুটি প্রেমিক প্রেমিকা মহাকালের লেখা কোন প্রণয়গ্রন্থের পাতা খুলে পাঠ করছিল কটি মধুর-বিধুর অধ্যায়।

শান্তনু বলল, কাজল, মনে পড়ে একদিন এক বৃদ্ধ এসে বসেছিলেন এখানে?

কাজল বলল, আমাদের আসতে দেখে তিনি উঠে গিয়েছিলেন। ঠিক সে মুহূর্তে গঙ্গার ওপারের আকাশ সূর্যাস্তের রঙে লাল হয়ে গিয়েছিল।

শান্তনু বলল, তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে, বেলা শেষের রঙীন আকাশের সঙ্গে ভোরের আকাশের অনেক মিল।

কাজল বলল, তুমি যা বলেছিলে এখনও আমার কানে তা বাজছে। তুমি বলেছিলে, যে বৃদ্ধটি এখানে এইমাত্র বসেছিলেন, তিনি একটি নাটক অভিনয় করে গিয়েছেন এখানে। তাঁর শেষ অভিনয়ের

সময় থেকে কয়েকটা বছর অতীত হয়ে গেছে। এখন আমরা তাঁরই অভিনীত নাটকটি এখানে বসে অভিনয় করছি। এটি অত্যন্ত হৃদয়-স্পর্শী নাটক।

শান্তনু বলল, সেদিন সে মুহূর্তে আমার হাত তোমাব হাতের ভেতর তুলে নিয়েছিলে তুমি। আজও আমি তোমার হাতের সে ছোঁয়াতে রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

রাত বাড়ছিল। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা একেবারে কমে গিয়েছিল। দূরে ট্রাম চলেছিল আলোর চলমান উৎসবের মত। ওরা উঠে দাঁড়াল। এবার ঘরে ফিরতে হবে ওদের।

আবার বসন্ত এসেছে। উঠোনে চাঁপার গাছে দুদিন একটা কোকিল ডেকে গেছে। দুপুরটা অনেক নির্জন। মাঝে মাঝে এক আধটা বাস দূরের রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতে যেতে তীব্র সাইরেণের মত হর্ণ বাজায়। হাওয়াটা ঘরের ভেতর পর্যন্ত এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। খস খস করে কোন কাগজ উড়লেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে কাজল। সারা মেঝে বসে বসে হাত বুলোয়। দুষ্টু ছেলের মত কাগজগুলো ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। এখুনি শব্দ করে নড়ে উঠল, আবার চুপচাপ।

কাগজগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দেয় কাজল।

আজকাল রাত করে ফিরছে শান্তনু। কাজের চাপ বেড়েছে অসম্ভব। বিশাখাকে ঘরে রাখতে বলেছিল শান্তনু, কিন্তু দরকার নেই বলে সরিয়ে দিয়েছে কাজল।

একদিন রাত প্রায় শেষ করে ফিরল শান্তমু। সারারাত ধরে গানের কনফারেন্স ছিল। এডিটর ছিলেন প্রধান অতিথি। ফটো তোলার কাজ হয়ে গিয়েছিল এগারোটার মধ্যে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গানে জমে গেলেন এডিটর। পাশে বসিয়ে রাখলেন শান্তনুকে। শেষ গাইয়েটি ছিলেন ভারত বিখ্যাত। সুতরাং তাঁর ছবিটি অবশ্যই নিতে হবে।

শান্তনু শুকনো একটা কাঠের গুঁড়ির মত ভাবলেশহীন বসেছিল ওখানে। এক একজন গাইয়ের আগমন নির্গমনের সময় করতালি বেজে বেজে উঠছিল। শান্তনুর কানে যেন সে আওয়াজগুলো পৌঁছচ্ছিল না।

ছাড়া পেয়েই সে ছুটেছিল বাড়ির পথে। কাজল ভেবে ভেবে কি যে করছে সে বুঝতে পারছিল না। এক একবার ভীষণ রাগ হচ্ছিল কাজলের ওপর। একা একা থাকার ফল ভাল করে ভোগ করুক এখন কাজল। এত জেদ কিসের তার।

ঘরের কাছাকাছি এসে কিন্তু কাজলকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ল শান্তনু। বেচারা কি সারারাত দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে। শান্তনুর মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকলেই বা কি। যে জন্যে একটির পর একটি বাসা নাকচ করে কাজল এই বাসাটি শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিল তার আজ কিই বা দাম আছে। পথটি আজও জানালার সামনে দিয়ে চলে গেছে, বিশেষ পথিকটির আজও ঐ পথেই যাওয়া আসা, কিন্তু যে দেখবে তার চোখের ওপর থেকে যে সব দৃশ্যপট মুছে গেছে।

শান্তনু কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল কাজল। সারারাত এই দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসেছিল।

শান্তনু বলল, বিছানায় শুয়ে মাথার দিকের জানালাটা খুলে রাখলেই তো আমাকে দেখতে পেতে। সারারাত এখানে ঘুপসি অন্ধকারের ভেতর বসে বসে কাটানর কি মানে হয়।

করুণ বিষণ্ণ একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কাজলের মুখে। শান্তনু মুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। সেও হেসেছিল। বলেছিল, সারারাত কনফারেন্সে বসে মাথার আর ঠিক নেই। কি বলতে যে কি বলে ফেলি।

বিশাখা ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল। শান্তনু জোর করেই বলল, আজ তোমার কিছুতেই রান্না ঘরে ঢোকা চলবে না কাজল। তাহলে এই ধুলো পায়েই আমি ঘর থেকে বিদেয় হয়ে যাব। আমি তো একটা মানুষ। অন্ধ স্ত্রীর কথা না ভেবে নিরুদ্বিগ্ন মনে কাজ করে যাব, এ তো হয় না।

কাজল হেসে বলল, তুমি যদি শান্তি পাও, তাহলে আজই আমি বিশাখাকে পারমানেন্ট

অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি।

শান্তনু দুহাত ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, তোমার এই ওয়াইজ ডিসিসানে আমি দারুণ খুশি কাজল।

এরপর ঘরের পাহারায় নিযুক্ত রইল বিশাখা। ওরা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বেরোতে লাগল এখানে ওখানে। কোথায় কৃষ্ণচূড়া সবুজ ঝিরিঝিরি পাতায় ছাওয়া ডালের মাথায় লাল হলুদ ফুল ফুটিয়েছে, কোন বাগানে অশোক ফুটে আছে মহাসমারোহে, কোথায় জনবিরল পথের ধারে আমের মুকুল থেকে কচি আম উঁকি দিচ্ছে, সব কিছু শান্তনু ঘুরে ঘুরে বুঝিয়ে বলল কাজলকে। এ বসন্ত কাজলের কাছে বড় রমণীয় বলে মনে হল।

একদিন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে ওরা বসেছিল। আম গাছের তলায় আলোছায়াব আলপনা। কাজলের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। সে অমনি শান্তনুকে বলল, তুমি একটা কথার উত্তর দেবে ঠিক ঠিক।

শান্তনু বলল, আবার ভণিতা! সোজা প্রশ্নটা করে ফেল দেখি।

কাজল বলল, তুমি আমাব আগে কাউকে ভাল বেসেছিলে?

এ প্রশ্নের জন্যে সত্যি প্রস্তুত ছিল না শান্তনু।

তবু বলল, ভালবাসিনি বললে মিথ্যে বলা হবে।

কাজল বলল, বলনা গো কাকে ভালবেসেছিলে?

শান্তনু বলল, বল, দুঃখ পাবে না?

কাজল বলল, না।

নিজের বুকখানাতে হাত রেখে বল।

কাজল বলল, বলছি।

সে একটি মেয়ে, গায়েব রঙ তার ধবধবে সাদা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা।

কাজল বলল, কি নাম তার?

শ্যামলী।

কতদূর গড়িয়েছিল বল না?

শুনলে সহ্য করতে পারবে?

কাজল এবার বলল, চেষ্টা কবে দেখব।

এবার চেষ্টা কেন? শোনার কৌতূহল আছে, অথচ সহ্য করার শক্তি নেই।

কাজল শান্তনুর প্রেমের পরিণতির কথাটুকু জানবাব জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

শান্তনু বলল, বেশ কিছুদিন নির্জন একটা ময়দানে আমবা পালিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তারপব একদিন অভিভাবকদের চোখে এক গাছগাছালির জটলাব ভেতব ধবা পড়ে গেলাম। সেই থেকে শ্যামলীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ।

গম্ভীর হয়ে গেল কাজল। একসময় বলল, তুমি তো এসব কথা আমাকে আগে বলনি?

শান্তনু বলল, তাহলে বিয়ে করতে না এই তো?

কাজল বলল, ভেবে দেখতাম।

শান্তনু বলল, এবাব একটা কথা বললে বিশ্বাস কববে?

কাজল তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, বল।

সে আমার কৈশোর প্রেমের প্রিয়তমা।

কাজল বলল, চালাকি রাখ।

শান্তনু বলল, মেয়েরা যেমন সন্দিগ্ধ তেমনি অবিশ্বাসী।

ছেলেরাও কম যায় না।

শান্তনু বলল, শোনই না সব কথাটুকু আমার।

কি বলবে বল।

শান্তনু বলল, মেয়েটি গোজাতীয়া। নাম যথার্থ-ই শ্যামলী। যদিও গায়ের রঙটি সাদা। চোখ দুটিও ভাসা ভাসা। ওকে নিয়ে আমি স্কুল পালিয়ে মাঠে চলে যেতাম। ওকে দারুণ ভালবাসতাম। আমাকে ও যে পছন্দ করত তার প্রমাণ পেয়েছিলাম, ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে দেখলেই একবার করে শিং নাড়ত, কিন্তু আমার বেলা বড় বড় দুটো চোখ মেলে নীরব অভ্যর্থনা জানাত।

কাজলের মুখে হাসি। বলল, তুমি ভীষণ পাজি। অবশ্য তোমার এ কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও করছি।

শান্তনু বলল, পুরোপুরি নয় কেন?

কাজল অমনি বলল, তুমি যে গল্প লেখ। তাই সত্যি হলেও মনে হয়, কিছুটা বানান।

শান্তনু এবার বলল, এখন তোমার প্রেমের কাহিনীটি শোনাও দেখি।

কাজল বলল, তোমার মত আমি আমার প্রেম কোন গো-জাতীয় প্রাণীর ওপর বর্ষণ করিনি।

তবে?

কাজল বলল, একটি মানুষকেই আমি আমার প্রেম নিবেদন করেছিলাম, আর সে মানুষটি হচ্ছ তুমি।

শান্তনু বলল, পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম না।

কেন?

শান্তনু বলল, পুষ্পকরথে এতদিন বিচরণ করলে, সে কি শুধু মেঘের খেলা, রোদের সোনা দেখে দেখে। হলপ করে বলতে পার, কোন হঠাৎ দেখা মানুষ একবারটিও ছুঁয়ে যায়নি বিশ বছরের হৃদয়খানা।

কাজল বলল, তুমি আমার সেই 'হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন'।

শান্তনু বলল, তোমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলাম।

এমন সুমতি!

শান্তনু বলল, মেয়েদের ও ব্যাপারটার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে গেলেই বিপদ। সবকিছু মেনে নিলেই শান্তি। তাই মনের শান্তি, গৃহের শান্তির জন্য তোমার ও কথা মেনে নিলাম।

কাজল মিষ্টি করে হেসে শান্তনুর দিকে তুলল বাংলা পানের মত প্রসারিত একটি চড়। শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে ঐ হাতটি ধরে ফেলে কাজলকে টেনে তুলে বলল, চল কাজল, গঙ্গায় সন্ধ্যা নেমেছে।

সেবার দারুণ গরমে কলকাতা অস্থির। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে আরও বেশি করে রবিঠাকুরের কবিতাটি মনে পড়ছিল, 'ইঁটের পর ইঁট মাঝে মানুষ কীট'। হাওয়া বন্ধ, প্রাণ যায় যায়।

কাজল বলল, এই ভ্যাপসা গরমে কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শান্তনু ফোড়ন কাটল, তোমার সাধের কলকাতা?

কথাটা বলার ভেতর কাজলের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল। অফিসের বোম্বে ব্রাঞ্চে পরিচালক গোষ্ঠী পাঠাতে চেয়েছিল শান্তনুকে, কিন্তু কাজলের জেদেই বাতিল করতে হয়েছিল সে প্রস্তাব।

কাজল বলল, সত্যি কোথাও চলনা গো এবার।

বল, কোথায় যেতে চাও?

চল আমরা কুলু যাই, কাজল বলল।

কাজলের কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে হাসল শান্তনু। কিছু বলল না।

সে হাসি দেখতে পেল না কাজল। সে সমানে জেদ ধরল, কথা বলছ না যে? অনেক দিন তোমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া কি রোগাই না তুমি হয়ে যাচ্ছ দিনে দিনে।

শান্তনু শেষের কথাটায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, একটুও না, যারাই আমাকে দেখছে তারাই ভাল না বলুক অন্ততঃ মন্দ কিছু বলছে না। তার মানেই হল, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি ফেঁপেই চলেছি।

কাজল হাত বাড়িয়ে ধরল শান্তনুকে। তারপর তার বুকের ভেতর হাতটা বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আমাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না, সব হিসেব এই আমার হাতে।

শান্তনু কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, এত জায়গা থাকতে এমন দূর পাল্লার ভ্রমণে সাধ জাগল কেন বল তো?

কাজল বলল, একদিন সেই বিয়ের ঠিক পরে কুলু নিয়ে যাবার কথা দিয়েছিলে তুমি। তাই সে কথা আজ ভুলে গেলেও স্ত্রী হিসেবে আমার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। জানো তো কথা দিয়ে কথা না রাখলে কি হয়?

শান্তনু অমনি বলে উঠল, কালীঘাটের কুকুর।

কাজল বলল, তবে জ্ঞানপাপী। এখন নিজের প্রতিজ্ঞাটিকে রেখে ঐ ভয়াবহ পরিণতিটাকে এড়াবার চেষ্টা কর।

আমি কি ভীষ্মদেব যে আমাকে বিধাতা মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছেন প্রতিজ্ঞা পালন করতে।

কাজল বলল, তুমি ভীষ্মের চেয়েও বড়, তুমি ভীষ্মের বাবা শান্তনু।

হো হো করে হেসে উঠল শান্তনু। সে ছুটির জন্যে দরখাস্ত করল। দরখাস্ত তার মঞ্জুর হল। কাজলের বদলে শান্তনুই সব গোছগাছ করল। তারপর সিমলা হয়ে অন্ধ কাজলকে নিয়ে কুলুর পথে শুরু হল তাদের যাত্রা।

অতিকায় দৈত্যের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাড়াই পাহাড়। দৈত্যটার পায়ের ফাঁক দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে নদীটা। এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে কি তার পালিয়ে যাবার চেষ্টা। যেখান দিয়েই সে বেরোবার চেষ্টা করছে সেখানেই দৈত্যটা আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাণ্ডী থেকে কুলু ভ্যালির পাকদণ্ডী পথে ছুটে চলেছে বাস। এক একটা বিপজ্জনক বাঁক আসছে আর তা দম বন্ধ করা ভয়ের একটা অনুভূতি জাগিয়ে পিছলে সরে যাচ্ছে। নীচে নদীর খরস্রোত, ওপরে ঝুঁকে থাকা পাহাড়ের ভীতি, সব মিলে বাসের কটি প্রাণীকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছে।

একটি সিটে পাশাপাশি বসেছে তিনজন। শান্তনু, কাজল আর স্বাতী গুহরায় নামে এক সহযাত্রিনী।

একাই বেরিয়ে পড়েছে মানালীর পথে স্বাতী। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এখন চলেছে তার দিগ্বিজয়-যাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী মেয়ে স্বাতী, কিন্তু এখনও কাজের মাঝে জড়িয়ে পড়েনি, তাই অখণ্ড অবসর।

বয়স অল্পই বলা চলে, কিন্তু সে তুলনায় দীপ্তি অনেক বেশি। তবে একা একা পথ চলায় যে মানসিক উগ্রতা আছে স্বাতী সেদিক থেকে একেবারে মুক্ত। বুদ্ধির সঙ্গে মানসিক লাবণ্যের একটা আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে স্বাতীর মধ্যে। তাই স্বাতী রুচিবানের চোখে আকর্ষণীয়া।

সিমলায় বাস ছাড়ার পরেই ওদের মধ্যে আলাপ হয়েছে। তিনজনার সিট, তাই পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসতে হয়েছে ওদের। জানালার ধারে শান্তনু, মাঝে কাজল, তার পাশেই স্বাতী। ইতিমধ্যে কাজলের অবস্থা বোঝা হয়ে গেছে স্বাতীর। সে কাজলের সঙ্গে কথা বলে চলেছে, শ্রোতা বা বক্তা হিসাবে কাজলও কম যায় না। আসার আগে শান্তনু তার সঙ্গে কুলু মানালী নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে। কাজল সেই পুঁজি ভাঙিয়ে কুলু ভ্যালির ভৌগোলিক বৃত্তান্ত শুনিয়ে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে স্বাতীকে।

বেশ জমেছে দুজনের! শান্তনু ওদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছে। স্বাতীর সঙ্গে কৌতুক-প্রসন্ন হাসির বিনিময়ও হচ্ছে শান্তনুর। দু-একটা মন্তব্যও করছে সে।

স্বাতীর বড় ভাল লেগেছে এই দম্পতিটিকে। একা একা পথ চলার লাভ হল এই। মাঝে মাঝে খুব একটা মনের মত যোগাযোগ হয়ে যায়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, শান্তনু ওর বছর পাঁচেক আগে একই বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিল। এখন কথা জমল স্বাতী আর শান্তনুতে। পুরোনো মাষ্টারমশায়দের কথা, পড়ানোর ধবনধারনের কথা, আরও কত কি!

স্বাতী বলল, মনে আছে আপনার উমাশঙ্করবাবুকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একই গল্প যিনি মাসের মধ্যে একই ক্লাসে অন্ততঃ বার পাঁচেক করতেন।

স্বাতী হেসে বলল, এখন হিসেব করে বলুন তো অন্ততঃ পঁচিশ বছরে ক্লাশে উনি কতবার একটি গল্প বলেছেন।

শান্তনু হেসে বলল, হিসেবের বাইরে।

তারপর আবার শান্তনু বলল, প্রফেসার ভট্টাচার্য কি এখনও দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢোকেন?

প্রথম দরজা দিয়ে ক্লাসে না ঢুকে অধ্যাপক অসমঞ্জ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় দরজাটি দিয়েই ঢুকতেন। ছেলেরা বলত, অন্ততঃ আরও পাঁচ সেকেণ্ড কালহরণের সুযোগ পেলেন।

স্বাতী বলল, আমাদের পাপের মাত্রা কিন্তু বেড়ে চলেছে।

কেন, গুরু নিন্দে করছি বলে?

স্বাতী ওপর নীচে ঘন ঘন মাথাটা নাড়ল। চোখে মুখে কৌতুক উপচে পড়ছে ওর।

চুপ করে ওদের কথা শুনছিল কাজল। হঠাৎ বলে উঠল সে, আমরা কিন্তু কলেজে কোন কোন প্রফেসারের পড়া শুনব বলে হাঁ করে বসে থাকতাম।

শান্তনু কাজলের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তুমি খুব ভাল মেয়ে ছিলে কাজল। আমাদের কালে আমরা একটু ডানপিটেই ছিলাম।

কাজল অমনি মাথা দুলিয়ে বলল, কী আমার দাদামশায় এসেছেন গো। একেবারে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো।

স্বাতী খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর তার থামেই না। শেষে হাসি যখন থামল তখন চোখ ভিজে ভিজে, মুখে লালের ছোঁয়া।

শান্তনু দেখল, হাসলে স্বাতী নামক সহযাত্রিণীটিকে ভালই দেখায়। মেয়েটির ফটোজিনিক্ ফেস্।

একটা জোর ব্রেক কষে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়তেই স্বাতী খেল কাজলের গায়ে ধাক্কা আবার কাজলের ধাক্কা এসে পড়ল শান্তনুর ওপর।

সামলে নিয়ে ওরা দুজনে তাকাল গাড়ির বাইরে।

একখানা প্রাইভেট কার খাদে গড়িয়ে পড়ে যাবার হাত থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে। রাস্তার ধারে এক খণ্ড সুচলো পাথরের টুকরোয় আটকে আছে একখানা চাকা, বাকী গাড়িখানা মুখ নীচু করে গভীর খাদের দিকে ঝুলে আছে।

সবাই ততক্ষণে হৈ হৈ করে নেমে পড়েছে নীচে। শান্তনু লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। স্বাতীও তার পেছন পেছন। গাড়িতে একা বসে রইল কাজল।

ক্লিক্ ক্লিক্ করে দু তিনটি এ্যাংগেল থেকে ছবি নিল শান্তনু। তবু মনের মত হল না দেখে সে পথের একেবারে ধার ঘেঁষে বসে আর একখানা ছবি নেবার আয়োজন করতে লাগল।

পেছন থেকে স্বাতী তাকে আচমকা ধরে ফেলে বলল, ইশ্ কি করছেন আপনি, আর একটু হলেই যে—।

স্বাতীর চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া।

শান্তনুর ততক্ষণে ছবিটা নেওয়া হয়ে গেছে। সে পিছিয়ে এসে বলল, রিস্ক না নিলে ভাল ছবি পাব কি করে?

তারপর গাড়িতে ফিরে এসে কিছুক্ষণ ঐ কারের আরোহীদের নিরাপদ উত্তরণ সম্বন্ধে আলোচনা চলল। পাহাড়ী লোকেরা নাকি দড়ি ফেলে দিয়েছিল, আর সেই দড়িতে নিজেদের বেঁধে ফেলেছিল তিনজন ঝুলন্ত আরোহী। তারপর দড়ি ধরে পাহাড়ীরা তাদের টেনে তুলেছিল। তাদের ভেতর একটি মেয়ে নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ি চলছিল। নানাজনের নানা মন্তব্য আর আলোচনায় গাড়ির ভেতর তখন বাজারের গুঞ্জন।

একসময় শান্তনু বলল, দেখুন, মেয়েটি যে অজ্ঞান অবস্থায় উঠেছিল, এ ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

চোখে কৌতুকের ইশারা ফুটিয়ে স্বাতী বলল, কি রকম?

শান্তনু গম্ভীর হয়ে বলল, মেয়েরা ভীষণ নার্ভাস।

স্বাতী বলল, মোটেও না। তারা বিপদে অনেক বেশি স্থির।

শান্তনু, ছাড়বার পাত্র নয়। সে অমনি বলল, তাহলে যুক্তি দেখান, মেয়েটি কেন অজ্ঞান হয়ে পড়ল?

স্বাতী বলল, এমনও হতে পারে মেয়েটি ঝাঁকুনিতে আঘাত পেয়েছিল। তার ফলে জ্ঞান হারিয়েছিল।

একটু থেমে গম্ভীর গলা করে বলল, এমনও ত হতে পারে, মেয়েটি হয়ত তার স্বামীর পরিণামের কথা চিন্তা করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

শান্তনু অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠে বলল, আপনার অনুমান সত্যি হলে স্বামীকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হবাব জন্যে খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়েও সুখ।

কাজল শান্তনুর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, থামত বাক্যবাগীশ, যত আজেবাজে সব কথা।

এরাই শুধু কথা বলছিল বাসে, অন্য সব যাত্রীরা প্রায় চুপ করে গেছে। হয়ত সবাই ভাবছিল এই ভয়াবহ পথে যাওয়ার পরিণামের কথা।

একসময় স্বাতী বলল, প্রিন্ট হলে অবশ্যই দেবেন আমাকে ঐ অ্যাকসিডেন্টের একখানা কপি।

শান্তনু বলল, তার চেয়ে বরং আমার বন্ধুর তোলা একখানা অ্যাকসিডেন্টের ছবি আপনাকে প্রেজেন্ট করব।

কি রকম!

শান্তনু বলল, সে ভারী মজার। কি একটা ব্যাপার নিয়ে পুলিশ আর পাবলিকের জমে উঠেছিল দারুণ মারামারির খেলা। আমরা তার ভেতর ঢুকে পটাপট কতকগুলো ছবি নিচ্ছিলাম। একটা পুলিশ খেপে গিয়ে লাঠি তুলল আমার ক্যামেরা লক্ষ্য করে। আরে সর্বনাশ, করে কি। ক্যামেরাখানা বুকে চেপে কাত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে সজোরে এক ঘা এসে পড়ল আমার মাথায়। ক্যামেরাখানা সে যাত্রা রক্ষে পেল। আমি তিনমাস পড়েছিলাম বিছানায়। যেদিন আবার কাজে অফিসে গেলাম, সেদিন আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুটি আমাকে দুটি ছবি উপহার দিলে। একটিতে আমি ক্যামেরা বুকে চেপে মাটিতে পড়ছি, আর অন্যটিতে আমার মাথায় পড়ছে পুলিশের লাঠি।

স্বাতী বলে উঠল, দুটিই দারুণ দৃশ্য। ছবি পেলে খুবই খুশি হবে।

শান্তনু বলল, আমাদের কষ্টের ব্যাপারগুলো যে আপনাদের খুশির কারণ হয়ে ওঠে তা জেনে আমিও আনন্দিত হলাম।

স্বাতী বলল, এই দেখুন তো, আমি কি তাই বলতে চেয়েছি। ছেলেদের সব কিছুই ঘুরিয়ে দেখা স্বভাব।

কাজল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার বলল, কিন্তু নিমকহারামি করো না। এই মেয়েরাই তোমাকে তিনটি মাস রাতদিন ধরে সেবা করেছিল। কত রাতে ঘুম ছিল না চোখে, সে হিসেব কি তখন রেখেছিলে।

শান্তনু বলল, তোমার সেবা পাবার লোভে আমি আবারও পুলিশের লাঠিকে শিরোধার্য করতে পারি।

কাজল চুপ করে গেল। শান্তনুর সাধারণ রসিকতাটুকু সে স্বাভাবিকভাবে আজ নিতে পারল না। সে এখন নিজেই হয়ে পড়েছে শান্তনুর সেবার পাত্রী।

আবার কিছু সময় সব চুপচাপ। গাড়ি নামছে ঢালুর পথে। পাক খেয়ে নেমে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। দু-একটা লম্বা গাছ দাঁড়িয়ে আছে ধারে কাছে। ছোট ছোট ল্যান্ডস্কেপ। মেঘ ভাসছে। জুনের মাঝামাঝি সময়। সিমলায় সবাই বলাবলি করছিল, এবার আর্লি মনসুন। জুলাই-এর প্রত্যাশিত বৃষ্টিটা জুনেই আচমকা এসে গেল। এ যেন নিমন্ত্রিত কোন অতিথির ঘর সাজানোর সুযোগ না দিয়েই আগাম এসে পড়া। মেঘগুলো ভাসছিল। জানালার ভেতর দিয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওদের আসা যাওয়ার ভঙ্গীটা। স্বাতী আর শান্তনু তাকিয়েছিল সেদিকে। কাজল চুপচাপ বসে রয়েছে। চোখে তার একটা গগল্‌স্‌। কি ভাবছে সে আপন মনে বোঝার উপায় নেই। হয়ত শুনছে সে গাড়িটার একটানা গোঁ গোঁ শব্দ। প্রথম প্রথম শব্দটা যত জোর মনে হয়েছিল এখন আর তা হচ্ছে না।

ক্রমাগত শুনতে শুনতে শব্দের ধার এমনি ভোঁতা হয়ে আসে। সবকিছুই বুঝি তেমনি হয়, শুধু বোধশক্তিহীন এই গাড়িখানাই নয়। এই তো কাজলের কথাই ধরা যাক্। সে যখন প্রায় হঠাৎই অন্ধ হয়ে গেল তখন তার মনের সে কি দারুণ অবস্থা। আলো নিভে গেছে। চারিদিকের আত্মীয় জগৎটা মুছে গেছে। এমনকি শান্তনুর মুখখানা। যে মুখখানাকে সে কতদিন বিছানায় শুয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে। শান্তনু ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপিচুপি উঠে বসে চাঁদের আলোয় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে।

সে মুখ হারিয়ে গেল তার চোখের ওপর থেকে চিরদিনের মত। শান্তনুর চোখেরপাশে কাটা দাগটা, ঘন কালো ভুরু, থুত্নির চাপা খাদটুকু দেখার ভেতর যে প্রলোভন ছিল তা আর নেই, একথা ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল কাজল। আর ওদিকে শান্তনু! তার অবস্থা না বলাই ভাল। অফিস কামাই করে কাজলকে পাশে নিয়ে বসে থাকা, তার নতুন দেখা অন্ধকার জগৎটাতে কাজল যাতে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া, আরও কত কি। পথ চলতে যতবারই যে সে সময় পড়েছে শান্তনুর দীর্ঘশ্বাস তার হিসেব ছিল না। কাজলের হাজারো পোজের ফটো তোলা ছিল তার অ্যালবামে, সেগুলো মাঝে মাঝে দেখত শান্তনু। কিন্তু কাজল অন্ধ হবার পরে অ্যালবাম একবারও খোলেনি সে। বোধহয় উজ্জ্বল আনন্দের স্মৃতিগুলোকে সে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল চোখের সামনে থেকে। হয়তো খাওয়াপরার ভাবনা না থাকলে শান্তনু কাজলেব পাশে অন্ধ-গান্ধারীর মত ঘুরে ঘুরেই বেড়াত। কিন্তু তা হয়নি। কাজল ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠল তার নতুন জগতের সঙ্গে। পুরোনোর দুঃখ তাকে ভুলতে হল একদিন। স্বাভাবিক হয়ে এল শান্তনুর মনও। একই জগতের বাসিন্দা দুটি প্রাণী পাশাপাশি থেকেও দুটি ভিন্ন জগতে চলাফেরা করতে লাগল।

এমনিই হয়। মনের ওপর অনুভূতির জলতরঙ্গগুলো হঠাৎ কোন আঘাতে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তারপর আবার স্থির। আবার জলের সেই স্বাভাবিক প্রবাহ। আঘাতেব অনুভূতিগুলো এমনি করে ধীরে ধীরে তার ধার হারায়। জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে।

গাড়িটা থেমে গেল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে বোঁ-বোঁ শব্দে হর্ণ বাজতে লাগল। সামনে পড়েছে একপাল ভেড়া। ভেড়াগুলো ধবধবে সাদা। কতকগুলোর লোম ছাঁটা, আবার কতকগুলো গায়ে যেন উলের বস্তা চাপিয়ে চলেছে। কে যে কবে কথাটা চালু করেছিল, গড্ডালিকা প্রবাহ বলে, তা ভদ্রলোকের চোখ আছে বলতে হবে। তরঙ্গিত ফেনার মত একটিব পর একটি দল একটা ঢালু জমিতে নেমে গেল। শান্তনুর ক্যামেরা দু দুবার সে ছবি ধরে রাখল।

কাজল ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজটা শুনেছিল, সে অমনি বলল, কিসের ছবি নিলে?

ভেড়ার পালের।

কেমন দেখতে গো?

শান্তনু ব্যাখ্যা করে বলল, ঘন দুধের সরের মত।

কাজল অমনি উচ্ছ্বাসে বলল, ভারি সুন্দর তো।

স্বাতী বলল, আপনি পুরীর সমুদ্র দেখেছেন কি?

কাজল বলল, বিয়েব অল্পদিন পরেই গিয়েছিলাম আমরা পুরী কোনারক বেড়াতে।

সমুদ্রের ঢেউগুলো পেঁজা তুলোর মত রাশ রাশ ফেনা তুলে একটার পেছনে একটা যেমন করে এগিয়ে আসে, এদের চলা কতকটা তেমনি।

কাজল কি বুঝল সেই জানে, তবে একটু গম্ভীর হল।

শান্তনুর মনে হল, পেছনের স্মৃতি মনে পড়ায় কাজল চুপ করে গেছে।

এদিকে কাজল হয়ত ভাবছে অন্য কথা। এরা দুজনে দেখছে, শান্তনু আর স্বাতী। একেবারে পাশে বসেও সে এদের জগৎ থেকে রয়েছে কত দূরে। একটা অদৃশ্য ব্যথার কাঁটা কোথায় যেন ফুটল।

স্বাতী লক্ষ্য করেছে কাজলের ভাবান্তর। সে মনে মনে কিছুটা অপ্রস্তুতই হয়ে পড়ল।

শান্তনু হঠাৎ ভেসে আসা লঘু মেঘটাকে কথার দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বলল, বেশ ত আমরা বসে বসে ভেড়ার পাল দেখছি, এদিকে যে ক্ষিদের জ্বালায় পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠল।

একটু থেমে বলল, কিছু খেতে দেবে না কাজল?

কাজল এতক্ষণে নিজের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। সে সোৎসাহে পায়ের কাছে রাখা বেতের ঝুড়িটা হাতড়ে বলল, কি খাবে বল?

অন্য সময় হলে কাজলকে সাহায্য করত শান্তনু, কিন্তু এখন সে চুপচাপ বসে থেকে কাজলকে সবটুকু করবার সুযোগ করে দিলো। শুধু বলল, খানিকটা ডালমুট দিলেই চলবে।

সামনেই ছিল ডালমুটের শিশিটা। কাজল হাত দিয়ে অনুভব করে সেটাকে পাবার চেষ্টা করছিল। স্বাতী ঝুঁকে পড়ে তাকে সাহায্য করতে যেতেই ক্ষিপ্র হাতে তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে মুখে আঙুল রেখে তাকে বারণ করল শান্তনু।

শান্তনুর হাতের ছোঁয়া পেয়ে হঠাৎ চমকে উঠেছিল স্বাতী। তারপর ব্যাপারটা মুহূর্তে অনুমান করে নিয়ে সে হাত গুটিয়ে নিলো। শুধু তাই নয়, শান্তনুর ইশারাকে সে স্বাগত জানাল চোখে মুখে অদ্ভুত এক রকম মুদ্রা ফুটিয়ে।

এইটুকু কৌতুকের খেলা মুহূর্তেই ঘটে গেল, কিন্তু এই সামান্য খেলার পথ ধরেই এগিয়ে এল আরও টুকরো টুকরো অনেক খেলা। শান্তনু আর স্বাতীর চেতন মনের প্রায় অগোচরেই তা একের পর এক ঘটে যেতে লাগল। এমনি করে তারা বুঝতে পারল না কখন একান্ত কাছাকাছি দুজনে সরে এসেছে।

ডালমুট খাওয়া হল। কাজল প্রথমেই স্বাতীকে দিলে ডালমুট। শান্তনু আগে থেকে কাজলের কোলে তার হাতখানা ফেলে রেখেছিল। কাজল হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, যাও, লোভী কোথাকার, সবই তোমার আগে চাই।

তারপর হাতড়ে হাতড়ে স্বাতীর হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে ডালমুট ঢালতে লাগল। স্বাতী যত বলে, আর না, আর না, কাজল ততই তার হাতখানা জোর করে চেপে ধরে ডালমুট ঢালতে থাকে।

শান্তনু হঠাৎ বলে উঠল, এমন পরার্থে উজাড় করে দিলে আত্মরক্ষা হয় কি করে?

স্বাতী ততক্ষণে হাত টেনে নিয়েছে। সে কাজলের পাশ দিয়ে মুঠোভরা হাতখানা বাড়িয়ে দিলে শান্তনুর দিকে। নীরব ভাষায় বলল, এই নিন।

শান্তনু কিছুতেই নেবে না, সে ক্রমাগত মাথা নাড়ছে, আর স্বাতী তার হাতে ডালমুটগুলো ঢেলে দেবার জন্যে মুখে অনুনয়ের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলছে।

স্বাতীকে হাত সরিয়ে নিতে হল, কারণ কাজল এবার শান্তনুর হাত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শান্তনু দুটো হাত ততক্ষণে দুষ্টুমি করে শূন্যে তুলে রেখেছে। কাজলের কানের কাছে মুখ নিয়ে স্বাতী ফিস্‌ফিস্ করে বলল, উনি শ্রীগৌরাঙ্গ হয়েছেন।

কথাটা শুনতে পেয়েছে শান্তনু। সে ভাল ছেলের মত দুটো হাত কাজলের কোলের ওপর পেতে রেখে বলল, কখ্‌খনো না, এই তো তোমার কোলেই আমার হাত সমর্পিত।

খাওয়া শেষ করেই আবার হাত পাতল শান্তনু। হাত পেতেই বলল, উনি হাত রেখেছেন তোমাব কোলে, আর একটু দাও ওঁকে।

স্বাতী বলল, ইশ্‌ কখ্‌খনো না, কিরকম বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি।

কাজল বলল, আজ না হয় চোখের আলো নিভেছে, কিন্তু এত বছর ধরে তো ওকে দেখছি। হাতেব ছোঁয়াতে যদি বুঝতে না পারি, তাহলে এতদিনে একসঙ্গে থাকাটাই যে মিথ্যে হয়ে যায়।

স্বাতী বলল, ছেলেদের অনুভূতি কিছু ভোঁতাই হয়ে থাকে, তাই ওঁরা মেয়েদেরও নিজেদের দলে টানতে চান।

শান্তনু বলল, মানি আপনাদের তৃতীয় নেত্র আছে, কারণ আপনারা হলেন ত্রিনয়নী দুর্গারই তো অংশ। তবে একথা ভুলে যাবেন না, মাথার সংখ্যা ছেলেদেরই বেশি। দশানন তার উদারণ।

স্বাতী অমনি বলে উঠল, এতগুলো মাথা মানেই মোটামাথার লক্ষণ।

শান্তনু প্রতিবাদ জানাল, মোটেই না, দশটা মাথার বুদ্ধি দশদিকে খেলছে।

স্বাতী বলল, তার মানেই হল, একটা মাথাতে সবটুকু বুদ্ধি ধরে রাখার ক্ষমতা ছেলেদের নেই।

শান্তনু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বাতী তাকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই বলল, বিচার করে দিন তো মিসেস চৌধুরী, কার কথাটা ঠিক।

কাজল বলল, স্বামীকে ভালবাসলেও 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস' হতে পারব না আমি। যেহেতু মেয়ে, সেহেতু মেয়েদের পক্ষেই চিরদিন থাকবে আমার পক্ষপাতিত্ব।

হাততালি দিয়ে উঠল স্বাতী। চোখ ছোট করে মাথা দুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে তাকাল সে শান্তনুর দিকে। ভাবটা এইরকম, কেমন, হার হোল তো মশাই।

মশাই কিন্তু ততক্ষণে অন্য পথ ধরেছে। সে বলল, আপনি তো সাংঘাতিক লোক, অতি সাধারণ মানুষ আমি, সুশীলা স্ত্রীটিকে নিয়ে ঘর করি, শেষে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমার কাছ থেকে ওকে সবিয়ে নিচ্ছেন।

কাজল শান্তনুর কথা বলার ধরন দেখে হেসে উঠল।

স্বাতী বলল, মোটেও না, উনি স্বেচ্ছায় আমার দলে এসেছেন।

শান্তনু বলল, সে তো আরও সাংঘাতিক, আমার পক্ষে আর একটুও সান্ত্বনা রইল না। আপনি দলে টানলে দোষের কিছুটা ভাগ অন্ততঃ আপনার ওপর চাপান যেত, কিন্তু উনি স্বেচ্ছায় গেলে পুরোপুরি দোষের ভাগটা ওঁরই। সেখানে আমার সান্ত্বনার ঘরে একেবারে শূন্য।

এবার তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠল।

গাড়ি এখন খাড়াই পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসে সমতল রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। নদী দুই পাহাড়ের খাদ থেকে বেরিয়ে এখন চলেছে প্রায় সমভূমির ওপর দিয়ে। বেশ খানিকটা বিস্তার লাভ করেছে।

কুলু ভ্যালির ভেতর ঢুকে পড়েছে গাড়ি। শুরু হল আপেলের বাগান। হৈ হৈ করে উঠল গাড়ির যাত্রীরা। সবুজ, সবুজ, সবুজ। ডাইনে গাড়ির রাস্তার ধারেই ছুটে চলেছে সবুজ আপেলের বাগান। মাঝারি পেয়ারার মত গাছ ভরে ঝুলে আছে আপেল। এখন কাঁচা অবস্থা, তাই পাতা আর ফল একাকার।

বাগানের ওপারে নদীর নুড়িবিছানো চরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন গাছ। তার ঠিক পরেই বড় বড় নীলচে ছাই রঙের অথবা সাদা রঙের পাথরের চাঁই। সেগুলির পাশ কাটিয়ে ছল্ ছল্ শব্দে ছুটে চলেছে নদী। নীলচে রঙের জলপ্রবাহ যেখানে বাধা পাচ্ছে, সেখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে সাদা ফেনার ফুল। কিন্তু এত শোভার পরেও কুলু ভ্যালি তার সবকিছুই এইখানে উজাড় করে দেয়নি। নদীর ওপারে এক আশ্চর্য জগতের ছবি মেলে দিয়েছে কুলু। শেষ সূর্যের কোমল আলোটুকু সোনার গলিত তবল তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে ওপারে। সেখানে হলুদডোরা বাঘের পিঠের মত পাকা শস্যের ক্ষেত। মাঝে মাঝে রেশমী সবুজ এক এক চিলতে ক্ষেতি। বিস্তৃত প্রান্তরের ওপারে কোথাও বা ধূমল কোথাও বা বাদামী রঙের পাহাড় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কথা নেই। চঞ্চল কথার উৎস মুখটা সহসা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাতী দেখছে একটু নত হয়ে। শান্তনু কাজলের হাত ধরে আছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, কাজল, এ ছবি একা দেখে তৃপ্তি নেই। এই পাহাড়, এই নদী, এই সবুজ ক্ষেত চোখের পথ দিয়ে সমস্ত মনটাকে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তনু আবার বলল, তুমি কেন আমাকে এই রূপের জগতে নিয়ে আসতে চাইলে। আমি তো অনেকদিনই আমার ভ্রমণের সূচী থেকে কুলু মানালীর অধ্যায়টাকে বাদই রেখে দিয়েছিলাম।

কাজল শান্তনুর হাতে পরম নির্ভরতার একটা চাপ দিয়ে বলল, তুমি দেখলেই আমার দেখা হল। দুঃখ করো না, তোমার চোখ দিয়েই তো আমাকে সবকিছু দেখতে হবে।

কথা বলতে বলতে কেমন ভারি হয়ে উঠল কাজলের গলা। হঠাৎ দেখা গেল গভীর আনন্দ অথবা বেদনায় তাব চোখ ছাপিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

স্বাতী শুনছিল ওদের কথা, যদিও ধীরে ধীরে ওরা কথা বলছিল। এখন স্বাতী তার শাড়ির

আঁচলখানা দিয়ে মুছিয়ে দিলে কাজলের চোখ। শান্তনুর হাত ছেড়ে কাজল স্বাতীর হাতখানা ধরে রইল কতক্ষণ।

গাড়ি এসে থামল কুলুর বাস স্টপে। এখানে কুলুর যাত্রীরা নেমে যাবে। বাকি যাত্রীদের নিয়ে গাড়ি চলবে মানালীর পথে।

এখানে নেমে যাবে স্বাতী। শান্তনুদের টিকিট কাটা আছে মানালী পর্যন্ত।

স্বাতী নামবার আয়োজন করছিল। কাজল তার হাতটা ধরে বলল, চলুন না ভাই আমাদের সঙ্গে। মানালীর স্নো-ভিউ হোটেলে এ্যাডভান্স টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। এক রকম করে তিনটি প্রাণীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

স্বাতী বলল, বেশ, কথা দিলাম, আপনাদের সঙ্গেই থাকব ওখানে, কিন্তু তার আগে আপনাদের এখানে নামতে হবে।

শান্তনু বলল, কুলুতে চিঠি লিখেও আমরা কোনও অ্যাকোমোডেশান পাইনি।

আমি তো পেয়েছি। ওতেই হবে। অবশ্য আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে।

শান্তনু অমনি বলল, কাজল কি বল?

স্বাতী ওদের একখানা ব্যাগ এক হাতে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ধরল কাজলের হাত।

বলল, নামুন নামুন, গাড়ি ছেড়ে দেবে। বাসায় পৌঁছে তখন পরস্পরের মতামত নেবেন।

ওরা হুড়মুড়িয়ে নামল। সুটকেশ বেডিংপত্র নামিয়ে ওরা চলল স্বাতীর নির্দিষ্ট আস্তানার দিকে।

ছবির মত বাড়ি। গভর্ণমেন্ট টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করল স্বাতী একখানা চিঠি নিয়ে। ঐ চিঠিতেই কাজ হল। ওরা পাশাপাশি দু'খানা রুমে থাকার জায়গা পেল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের আসরে বসেই শান্তনু বলল, কি করে আপনি এরকম একখানা আস্তানা পেলেন বলুন তো?

স্বাতী হেসে বলল, কেবল ফটো তুলে বেড়ালে হয় না, কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানতে হয়!

শান্তনু বলল, জান কাজল, এমন সুন্দর একখানা আস্তানার কথা ভাবাই যায় না।

কাজল বলল, বসে বসে তো দশ মাথার বুদ্ধির খুব বড়াই করছিলে। এখন স্বীকার করছ তো, একটি মাথাতেই কাজ হয়।

স্বাতী বলল, না না মিসেস চৌধুরী, বলুন মেয়েদের মাথাতেই কাজ হয়।

শান্তনু বলল, সত্যি আমার হার হয়েছে, এখন বলুন তো আপনার এরকম বাড়ি পাবার আসল সিক্রেটটা।

একটু থেমে আবার বলল, বার বার চিঠি লিখেও আমি কিন্তু কুলুর ট্যুরিস্ট অফিসারের মন ভেজাতে পারিনি।

স্বাতী চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সত্যি কথাটা তাহলে বলি। আমিও আপনাদেব মত চিঠি লিখে নিরাশ হয়েছিলাম। অবশ্য একটা উত্তর পেয়েছিলাম, তাতে কোন আশ্বাস ছিল না। ভদ্র ভাষায় দুঃখিত বলে জানিয়েছিলেন কুলুর অফিসার। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। সিমলায় পৌঁছে গিয়েছিলাম ট্যুরিস্ট অফিসে। সেখানে দুচারদিন হাঁটাহাঁটির পর ওপর-ওয়ালার একখানা চিঠি যোগাড় করি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাদের বাস থেকে টেনে নামাবার সময় আমার বুক কাঁপছিল। একখানা চিঠি মাত্র ভরসা। যদি না পাই, তাহলে কি করে মুখ দেখাব আপনাদের কাছে। তাছাড়া বিশেষ করে মিসেস চৌধুরী পড়বেন দারুণ অসুবিধেয়, সেখানে নিজের কাছে কি কৈফিয়ত দেব আমি।

কাজল বলল, আমি গাছতলাতেও কাটাতে পারি। অতিরিক্ত সুবিধে আমি কখনো চাই না।

স্বাতী বলল, আপনি না চাইলেও আমি যখন জোর করে আপনাদের টেনে এনেছি, তখন পুরো দায়িত্ব আমারই।

শান্তনু বলল, এখন স্বীকার করতে হচ্ছে সত্যিই আপনি লাকি। লটাবীর টিকিট কিনে পবীক্ষা কবে দেখতে পারেন।

স্বাতী হেসে বলল, ঐ লিগ্যাল জুয়া খেলায় আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

শান্তনু বলল, ও কি কথা বলছেন, আমি তো বলি সাম্যবাদ যদি কোন কিছুর ভেতর দিয়ে আসে তাহলে ঐ লটারীর ভেতর দিয়েই আসবে।

কি রকম?

শান্তনু বলল, দেখছেন না, লটারীতে হিন্দু মুসলমান, ধনী দরিদ্র কোন কিছুরই বিচার নেই। আমীর খাঁও পাচ্ছে, কাঙালীচরণও পাচ্ছে।

শান্তনুর কথার ধরনে হেসে উঠল স্বাতী।

কাজল বলল, ওর কথা আর বল না। একখানা টিকিট কিনে এনে এমন ভাব দেখাবে, যেন টাকাটা গিয়ে আনতে যা বাকী। আমার গয়নার ডিজাইন আঁকতে বসবে। কত রকম মাথা ঘামিয়ে নতুন বাড়ির প্ল্যান আঁকবে।

শান্তনু স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই বলুন, পাই না পাই, কটা দিন বাদশাহী মেজাজে চলার প্রেরণা এই দু'এক টাকা খুইয়ে আর কোথায় পাওয়া যায় বলুন।

স্বাতী বলল, যাদৃশী ভাবনা যস্য—

কাজল অমনি বলল, সিদ্ধি আর হচ্ছে কোথায় বলুন।

শান্তনু বলল, সন্ধান করলে দেখবে সিদ্ধি ঐখানেই আছে। একেবারে নেশা ধরিয়ে দেয় এমন সিদ্ধি।

কাজল বলল, এখন কথা রেখে রাতের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হয় তাই দেখ।

স্বাতী বলল, একেবারে কথা নয়, এখানে আপনারা আমার অতিথি। সব ব্যবস্থার ভার আমার। মানালীতে গেলে যত খুশি আপনারা করবেন। আমি একেবারে পুতুল হয়ে থাকব।

একটু থেমে বলল, ভাবনা নেই, চাপরাসীকে বলে রেখেছি। পাঞ্জাবী হোটেলে আজ ট্রাউট মাছ এসেছে। ও বলেছে, ওখান থেকে ট্রাউটের কারি আর চাউল, চাপাটি আনাবে।

শান্তনু বলল, অতিথি সৎকারের এমন আয়োজন সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্ত হতে অনেক দেরি হয়। কলকাতায় যখন আকাশবাণী সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার খবর বলতে থাকে, আর অন্ধকারের সঙ্গে বিজলী আলোর হারজিতের লড়াই শুরু হয়ে যায়, তখন কুলু ভ্যালি দিন শেষের আলোয় উজ্জ্বল। চা-পর্ব শেষ করে তাই ওরা তিনজনে বেরল। বেড়াতে এসে বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকতে কারই-বা ইচ্ছে করে।

শান্তনু কাজলের হাত ধরে চলেছিল। ওদের আস্তানা থেকে নদীব কিনারা পর্যন্ত পথটুকু উঁচু-নীচু নয়। একটুখানি পথের ওপর দিয়ে আসতে হয়, তারপর সামান্য ঢালু সবুজ লন। পায়ের পাতা ডুবে যায় সবুজ ঘাসের ভেতর।

শান্তনু একটুখানি পথ চলেই বলল, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

কাজল বলল, একটুও না।

ওরা ধীরে ধীরে হাঁটল। দূর থেকে পাহাড় প্রান্তর নদী আর সবুজ পাইনের ছবি দেখল। শান্তনু প্রতিটি দৃশ্যের কথাচিত্র এঁকে বোঝাতে লাগল কাজলকে।

কাজল যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সে হঠাৎ উচ্ছ্বাসে তার গগল্‌স্‌টা খুলে ফেলে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। মুখে তার বেজে উঠল একটি কথা, কি সুন্দর, কি সুন্দর!

স্বাতী একটু এগিয়ে গিয়েছিল। থেমে গেল সে। বিস্মিত হয়ে পিছিয়ে এল কাজলের কাছে। কাজল দাঁড়িয়ে আছে শান্তনুর হাত ধরে। মনে হল সে খুব জোর করেই হাতখানা চেপে ধরেছে। তার মনের উচ্ছ্বাসটুকু এমনি করে বুঝি সে প্রকাশ করতে চাইছে শান্তনুর কাছে।

স্বাতী দেখল, না, বাইরের চোখ দিয়ে কোনদিনই আর কাজল দেখতে পাবে না। এ শুধু মনের চোখ দিয়ে দেখা। তারই প্রকাশ ঘটেছে তার কথায়।

ওরা তিনজনে এসে পৌঁছল নদীর ধারে। কাজলকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে বসল ওরা। নদীর খল্‌খল্‌, ছল্‌ছল্‌ শব্দ ভেসে আসছিল। তার সঙ্গে জলছোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়া একটা আমেজ এনে দিয়েছিল।

স্বাতী একসময় উঠে গেল ওদের কাছ থেকে। শান্তনু আর কাজলের একান্ত কোন কথা থাকতে পারে। স্বাতীর উপস্থিতিতে যা হতে পারবে না। শান্তনু একবার তাকাল ওর দিকে। কিছু বলল না। অন্ধ কাজলের মন্থর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলুক স্বাতী, এ কথা ভাবাই যে অন্যায়। ও এখন দেহে মনে তরুণী। উচ্ছল আনন্দে ঘুরে বেড়াক, নদীর ছল্‌ছল্‌ শব্দের সঙ্গে ওর হাসির তরঙ্গ মিশে যাক্‌। খুশির ছোঁয়া লাগলে ও কেমন করে নিজেকে প্রকাশ করে তাই দেখতে চাইল শান্তনু।

কি আশ্চর্য দস্যিপনা লুকিয়েছিল মেয়েটির ভেতর। ছাড়া পেয়েই সে বাঁধল কোমর। তারপর অবলীলায় নদীর প্রায় মাঝ বরাবর চলে গেল বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে। এবার ও ফিরে তাকিয়েছে। কি অনায়াস নাচের মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে ও। মুখের হাসি ঝলকে উঠছে শেষ সূর্যের সোনায়।

শান্তমুর ভেতর শিল্পী মানুষটা জেগে উঠেছে। সে তার ক্যামেরা নিয়ে উঠে পড়ল। ক্লিক্‌ ক্লিক্‌ ছবি নিল সে। ততক্ষণে সচেতন হয়ে গেছে স্বাতী। সে চুপচাপ হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে বসে পড়েছে। ভাবটা, কেমন জব্দ এখন ফটো নাও।

এগিয়ে গেল শান্তনু। সেও পাথর ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ল স্বাতীর প্রায় কাছাকাছি। এখন অনুনয়ের পালা। উঠে দাঁড়াতে হবে না, কেবল মুখখানা একটা পাশে ফেরাতে হবে।

স্বাতী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শান্তনু মুখে আঙুল রেখে বাবণ করল। শুধু অনুনয়। হাতের ইশারায় মুখের স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ।

স্বাতী প্রথমে মুখ ঘুরিয়ে জিভ কাটল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুর ক্যামেরা ক্লিক্‌ করে তা ধরে রাখল।

উঠে দাঁড়িযেছে স্বাতী। কিছুতেই সে আর ছবি তুলবে না। তার বিচ্ছিরি মুখের ছবিখানা উঠে গেছে। ইশ্‌ কি লজ্জার কথা। ভেংচি কাটছে একজন ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্রী। এ কলঙ্ক যে তার রেকর্ড হয়ে রইল। না, এ ভদ্রলোককে আর ছবি তোলার সুযোগ দেবার মানেই হল এক রাশ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া। এই মুহূর্তে স্বাতীর মনে হল, ফটোগ্রাফার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়।

আবার অনুনয়। আরও কাছে এসে গেছে শান্তনু। দয়া করে বসে একটু মুখ ঘুবিযে তাকান। বিস্ময়, বেদনা, খুশি যা কিছু ফুটিয়ে তুলুন, ও মুখে সবই মানাবে। শান্তনুর ভাবটা এই।

না।

এত জোরে 'না' শব্দটা উচ্চারণ করল স্বাতী যে শান্তনু ভয় পেয়ে চমকে উঠল। ওদিকে কাজল উঠে দাঁড়িয়েছে। সে কেমন যেন বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক মুখ ফেরাতে লাগল।

তুমি কোথায়—?

একবার ডাকল কাজল। ঐ 'না' শব্দ আর শান্তনু কি যেন একটা যোগসূত্রে মিশে গেছে বলে মনে হল কাজলের।

মেয়েদের সত্যিই কি তৃতীয় নয়ন আছে, যা দিয়ে ওরা অনেক অদৃশ্য বস্তুকেও দেখতে পায়, ধরতে পারে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে শান্তনু। সে দু-একখানা পাথরের টুকরো লাফিযে পার হয়ে এল। চেঁচিযে বলল, এই যে আমি। পাহাড় আর নদীর কয়েকটা সট নিচ্ছি।

কাজল আশ্বস্ত হয়েছে। সে আবার বসে পড়েছে তার নির্দিষ্ট জাযগায়। শান্তনুর দৃষ্টিব আওতায় সে রয়েছে, এইটুকু জানতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত।

শান্তনু ফিরে যাচ্ছিল কাজলের কাছে, স্বাতীর চাপা গলার আওয়াজ পেছন থেকে ভেসে আসতেই সে ফিরে দাঁড়াল।

এই যে শুনুন।

শান্তনু তাকিয়ে দেখে স্বাতী বাধ্য মেয়ের মত ইতিমধ্যেই বসে পড়েছে। তাকিযে আছে তার দিকে। বেলাশেষের আলোয় মনে হচ্ছে, সে যেন বলছে,

'চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিও ক্ষমা'।

শান্তনু শেষবারের মত ক্যামেরা তুলল। বড় বড় চোখ মেলে মুখখানা করুণ করে তাকিয়ে আছে

স্বাতী।

ফটো নিয়েই আর একদণ্ড সেখানে অপেক্ষা করল না শান্তনু। লাফাতে লাফাতে একেবারে চলে এল কাজলের পাশটিতে।

পাশে বসেই সে কাজলের হাতে হাত রাখল। কাজল তার হাতটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, জানো, হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, আর আমার বুকখানা কেমন কেঁপে উঠল।

শান্তনু আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কাজলের কাছে। বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার।

কাজল বলল, স্বাতী কোথায়?

শান্তনু বলল, ঐ যে অনেক দূরে নদীর ওপর পাথরের চাঁই, তার ওপর বসে জলে পা ডোবাচ্ছে।

আমি জলে পা ডোবাতে পারব না?

শান্তনু বলল, বড় ভয় করে আমার; আচ্ছা এসো, খুব সাবধান, আমাকে জোর করে ধরে থাক।

কাছেই একটা পাথরের চাঁই। বেশ বড় আকারের আর মসৃণ।

শান্তনু বলল, কোন ভয় নেই কাজল, আমার হাত ধরে সামান্য একটু লাফ দিয়ে এসো।

কাজল তাই করল। ওরা দুজনেই বসল সেই পাথরের ওপর। কাজল শান্তনুকে ভাল করে ধরে পা ঝুলিয়ে বসল, আর অমনি ওর পায়ের ছোঁয়ায় স্রোতের জল খল্‌খল্ করে উঠল। কি খুশি কাজলের। সে একবার পা তুলে নেয় আবার পা দিয়ে জল ছোঁয়।

শান্তনু তাকিয়ে দেখল স্বাতী এখনও তেমনি হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে আছে। নির্দিষ্ট কোন কিছুর দিকে না তাকিয়েও তাকিয়ে আছে স্বাতী। কি ভাবছে ও কে জানে।

একসময় মুখ তুলে স্বাতী দেখতে পেল ওদের। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সেই একই রকমে পার হয়ে এল কয়েকটা শিলা। এসেই বসল ওদের পাশে। শান্তনু দেখল স্বাতীর মুখ চোখ ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

গান ধরেছে কাজল। সে বুঝতেই পারেনি স্বাতীর উপস্থিতি।

'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই,
প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোনাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।'

গান থামল। সমস্ত প্রকৃতিতে শেষ আলোটুকু মুছে যাবার আয়োজন। সবাই কিছু সময় নির্বাক হয়ে রইল।

স্বাতী নীরবতা ভাঙল, এত ভাল গান করেন আপনি! সত্যি টেপ রেকর্ডারটা কাছে থাকলে এখুনি আপনার গলার এই সুরটুকু আমি একেবারে ছিনিয়ে নিয়ে নিতাম।

কাজল হেসে বলল, নিয়ে আর কি করতেন বলুন।

কি করতাম! আমার অবসর সময়গুলো ভরিয়ে তুলতাম আপনার গান দিয়ে। শুধু তাই নয়, আপনার আজকের গান কুলুর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখত।

কাজল বলল, অনেক অনেক বেশি করে বলছেন আপনি। এবার ওঠা যাক। বেশি প্রশংসা শুনলে অন্ধ মানুষ পথ চলতে পারব না আবার।

পরের দিন ভোর হল। ওরা একসঙ্গে চায়ের আসরে মিলল।

স্বাতী বলল, কিছু যদি মনে না করেন, আমি একা একটুখানি ঘুরে আসব।

কাজল বলল, ওমা তাতে কি। অবশ্যই যাবেন। এতে মনে করার কি আছে। আর দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, অন্ধের কাছে আপনি বড্ড বেশি আটকা পড়ে গেলেন। এ কি কারো ভাল লাগে ভাই।

স্বাতী বলল, তাহলে কিন্তু যাওয়া বন্ধ হল আমার।
শান্তনু বলল, না না, আপনি যান। কাজল শুধু আপনাকে নয় আমাকেও ওসব কথা বলে।
কাজল বলল, রাগ করলেন ভাই?
হেসে ফেলল স্বাতী, আপনার ওপর রাগ করব, সে রাস্তা কি আপনি রেখেছেন। রাগ করতে গিয়েও ভালবাসতে ইচ্ছে করে আপনাকে।
চা খাওয়ার শেষে স্বাতী চলে গেল। শান্তনু আর কাজল কিছুক্ষণ বসল লনের ওপর একটি পাইন গাছের তলায়। শান্তনু খাতা খুলে তার নতুন শুরু করা উপন্যাসের কিছু অংশ শোনাতে লাগল। সিমলায় বসে সে শুরু করেছিল, কিন্তু শোনান হয়নি কাজলকে। কাজল তার সব লেখার প্রথম শ্রোতা। তার কাছে পাস না করে কোন পত্রিকাতে লেখা পত্রস্থ করার উপায় নেই। দু'জনে পা ছড়িয়ে গাছের তলায় বসে ভোরের রোদটুকু উপভোগ করতে করতে পড়াশোনার কাজ চালাতে লাগল।
উপন্যাসের একটি অধ্যায় শেষ করে ওরা উঠল। এদিক ওদিক কিছুটা পথ বেড়িয়ে বেড়াল। পাহাড়, বন, নদী, প্রান্তরের রূপ রঙ রেখার পরিচয় শান্তনুর কাছ থেকে কাজল কতকটা পেল। তাতেই সে বিস্মিত।
কাজল বলল, সত্যি এত রূপও আছে জগতে!
শান্তনু বলল, তোমার কালকের গানের ভাষাতেই বলি, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'।
ওরা ঘুরে ফিরে এল রেস্ট হাউসে। স্নান সেরে বিশ্রাম করতে লাগল। বেলা বাড়ছে তবু স্বাতীর দেখা নেই। আরও বেলা বাড়ল। ওদের প্রতীক্ষা উদ্বেগের আকার নিল।
কাজল বলল, দেখনা একটু বাইরে গিয়ে।
শান্তনু আধ ঘণ্টা ঘুরে ফিরে এল এদিক ওদিক।
পায়ের সাড়া পেয়ে কাজল বলল, কি গো কিছু খবর পেলে?
শান্তনু বলল, আশ্চর্য, মেয়েটি কি মিলিয়ে গেল নাকি।
কাজলের গলায় দ্বিগুণ উদ্বেগ, আমার তো কেমন ভাল মনে হচ্ছে না।
শান্তনু বলল, মন্দ আর কি হতে পারে বল। একা একা ঘুরে বেড়ানর অভ্যেস আছে। ও মেয়ে পথ হারাবে না।
একটু থেমে বলল, সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, বিয়ে থা হয়নি এখনো, তাই আমাদের মত সংসারের নিয়ম মেনে চলা ওদের ধাতে সইবে কেন।
বেয়ারা এসে বলল, খাবার দেব কি?
শান্তনু বলল, মেমসাব এখনও আসেন নি।
কাজল বলল, ওদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি। তার চেয়ে খাবারটা ঘরে আনিয়ে নাও।
তাই হল। খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা হল। ওরা বসে রইল স্বাতীর পথ চেয়ে।
স্বাতী এল। তখন ঘড়িতে একটা বাজে।
কাজল বলল, ভাবনায় মরে গেলাম ভাই। বড় কষ্ট দিলেন আজ আপনি।
স্বাতী বলল, সত্যি আপনাদের কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই। এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে যেতে হয়েছিল আমাকে। অনেক খুঁজে তবে পেতে হয়েছে ঠিকানা। সে কথা এখন থাক্, দেখছি আপনারা এখনও খাননি, ভারী অন্যায় আপনাদের। আমাকে একেবারে লজ্জায় ফেললেন। এখন কথা না বলে আসুন খেতে বসা যাক্।
খেতে খেতে স্বাতী তাব সকালের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে লাগল। শান্তনু আর কাজল রইল আগ্রহী শ্রোতার ভূমিকায়।
স্বাতী বলল, ঘটনাটা শুরু হয়েছিল আমার জন্মেরও আগে। বাবার মুখে জ্ঞান হবার পর শুনেছিলাম কথাটা। কিছু নয়, অতি সামান্য একটুখানি কথা। কুলু ভ্যালিতে এক সাহেবের আপেল বাগিচা ছিল। প্রতি বছর তিনি আপেল পাঠাতেন কলকাতায় বিক্রির জন্যে। সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাবাও কিনতেন সেই সাহেবের পাঠান আপেল। একদিন এক বাক্স আপেল এল বাবার

নামে। সঙ্গে একখানা চিঠিও রয়েছে। সাহেব লিখেছেন, তাঁর একটি ছেলে হয়েছে, যার মা এদেশীয় মেয়ে। সেই আনন্দের খবরের সঙ্গে ঐ আপেলের বাক্স বাবা যেন উপহার স্বরূপ গ্রহণ করেন।

বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি নবজাতক ছেলের জন্যে একটি সোনা আর রূপোয় কাজ করা চামচ পাঠিয়ে দেন।

এর দুবছর পরে আমি যখন জন্মালাম, তখন বাবাও সাহেবকে তাঁর আনন্দের খবরটা পাঠালেন।

সাহেব একটি সোনার হার পাঠান আমার জন্যে। সে হারের লকেটে অদ্ভুত সুন্দর তিব্বতী কাজ করা ছিল।

এর কিছুকাল পরে সাহেব নিজের দেশে চলে যান। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ আর রইল না সেই থেকে।

কুলু আসবার প্ল্যান যখন করি তখন আমার মনে হয়েছিল একবার খোঁজ করে দেখব সাহেবের আগের ঠিকানায়। তাই গিয়েছিলাম সকালে ওদের খোঁজে।

কাজল বলল, চমৎকার একটি ঘটনা বলতে হয়।

শান্তনু বলল, ঘটনার শেষ অধ্যায়টা শোনার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

স্বাতী হেসে বলল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রামের জায়গায় চলুন, বসে বসে বলা যাবে।

ওরা খাবার টেবিল থেকে উঠল। তারপর কাজলদের ঢালা বিছানায় তিনজনে গোল হয়ে বসল।

স্বাতী বলল, দেখা হল সাহেবের এদেশীয় স্ত্রীর সঙ্গে। উনি ভীষণ খুশি হলেন। আমাকে, অতি যত্নে রাখা, বাবার দেওয়া সেই চামচটি দেখালেন। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কথায় কথায় জানলাম, ছেলেটি বছর দশেকের হয়েছিল, তারপর মারা যায়। এখন আমারই বয়েসী একটি ভারী সুন্দর মেয়েকে দেখলাম। ভদ্রমহিলার ঐ মেয়েটিই সম্বল।

কাজল বলল, সাহেব কোথায় গেলেন?

স্বাতী বলল, তিনি অনেক আগেই দেশে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কাছে চলে যান।

শান্তনু বলল, সে কি রকম! এ দেশে বিয়ে করে বৌ-এর প্রতি কোন কর্তব্যই করলেন না?

স্বাতী বলল, ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সবকিছুই জানতে পারলাম। উনি যখন তরুণী তখন ওঁর বাবার সঙ্গে সাহেবের ফলের বাগিচায় কাজ করতে আসতেন। একসময় বিয়ের ঠিকঠাক হল। একটি পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। বিয়ের দিন সাহেব অনেক উপহার নিয়ে হাজির।

কেমন করে যেন কথা উঠল, মেয়েটি সাহেবের বাগিচায় কাজ করত আর যাওয়া আসা ছিল ওঁর কোয়ার্টারে। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে হৈ রৈ কাণ্ড, বিয়ে ভণ্ডুল।

কাজল বিস্মিত গলায় বলল, তারপর!

স্বাতী বলল, সাহেব তো সব দেখে শুনে তাজ্জব। শেষে বললেন, কুছ পরোয়া নেহি, আমিই ওকে বিয়ে করব।

বাস্ হয়ে গেল বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পর বেশিদিন এ দেশে রইলেন না সাহেব। একটি ছেলে আব একটি মেয়ে হবার পরই তিনি সেই যে দেশে গেলেন আর ফিরলেন না। অবশ্য যাবার আগে তিনি তাঁর এদেশীয় স্ত্রীটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজের দেশের মায়া ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে যেতে চাননি।

শান্তনু অমনি বলল, হয়ত সেই অভিমানে সাহেব আর এ দেশে ফেরেননি।

স্বাতী বিচিত্র মুখভঙ্গী করে বলল, ইস্, এমন স্বজাতিপ্রীতি। ভদ্রমহিলার দিকে একবারটিও না তাকিয়ে সাহেবেব পক্ষ নিলেন।

কাজল শান্তনুকে ঠেলা দিয়ে বলল, যত সব আজেবাজে কথা। আসল কথায় এমনি করে ছেদ টেনে দেওযাই তোমার স্বভাব।

শান্তনু চুপ কবে বসে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

স্বাতী বলল, ঘটনাব বাকী আর কিছু নেই। সাহেবের দেহান্তর ঘটেছে। অতি নিষ্ঠায় ভদ্রমহিলা

সাহেবের একখানা ফটো প্রতিদিন ফুলের মালায় সাজিয়ে রাখেন। মেয়েটি বাপের মত পেয়েছে নীল চোখ, আর লালচে চুল। গায়ের রঙটি কতক মায়ের কতক বাবার। প্রায় কাঁচা সোনার রঙ। দেখার মত রূপ বলতে হয়।

আমি আমার গলার হারটা খুলে ভদ্রমহিলার হাতে দিতেই তিনি চিনতে পারলেন। অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—।

স্বাতী কথার মাঝেই চুপ করে রইল দেখে শান্তনু বলল, কি চুপ করে গেলেন যে, এবার কিন্তু আমি বাধা দেবার অপরাধে অপরাধী নই।

স্বাতী বলল, সব কথা কি আব সবার সামনে বলা যায়। সে আমি মিসেস চৌধুরীকে বলব এখন।

কাজল হাত দিয়ে শান্তনুকে ধাক্কা মেরে বলল, এই, লক্ষ্মী ছেলের মত একটু বাইরের বারান্দায় পায়চারি করে এসো তো দেখি।

শান্তনু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠতেই স্বাতী চোখে মুখে অনুনয়ের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তাকে বসতে বলল।

তারপর হেসে বলল, মিসেস চৌধুরী, কারো আসর ছেড়ে চলে যাবাব দবকার নেই। কেবল আমাদের কথায় কান না দিলেই হল।

স্বাতী নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে কারো হাত ধরে টেনে বসাবাব ইঙ্গিত করল।

কাজলের পাশে মুচকি হেসে বসল শান্তনু।

স্বাতী বলল, ভদ্রমহিলা হারখানা হাতে নিয়ে বললেন, এই হাবখানা উনি গড়িয়েছিলেন ওঁর ছেলের বৌকে দেবেন বলে।

আমি বললাম, সে কি এতটুকু ছেলের বৌ-এর কথা তিনি ভেবেছিলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, হাঁ, দু'বছবেব ছেলে তখন বেশ বড়োসড়ো হয়েছিল। উনি দেশে একবার গিয়েছিলেন। ওখান থেকে একটি মেয়ে পুতুল এনেছিলেন। কে শিখিয়েছিল কে জানে, ছেলেকে কিছু বললেই সে পুতুলের দিকে আঙুল তুলে বলত, ঐ আমার বৌ।

সাহেব তাই পুতুল বৌ-এর জন্যে গয়না গড়িয়েছিলেন। তারপর তোমার জন্মের খবর পেয়েই উনি পাঠিয়ে দেন ঐ হাব।

স্বাতী বলল, ভদ্রমহিলা হারখানা হাতে নিয়ে আবার কাঁদলেন। আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। ওঁর দশবছরের ছেলের ফটোখানা ছিল স্বামীব ফটোর কাছে, তাকে দেখিয়ে দিলেন। ছেলেটি দারুণ একখানা মিষ্টি হাসি হাসছে।

চলে এলাম ওখান থেকে। ভদ্রমহিলার মেয়েটিব এখনও বিয়ে হযনি। সিমলায় থেকে পড়াশোনা কবে। দেখতে যেমন স্বভাবটিও তেমনি। আমাকে ছাড়তেই চায় না। শেষে বন্ধুত্ব আর চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবেই ছেড়েছে।

শান্তনু বলল, সত্যি এ যে একেবারে লেখার মত একটি কাহিনী।

কাজল বলল, নতুন হাত দেওয়া উপন্যাসখানা শেষ করে তুমি এ কাহিনীটা ধবতে পাব।

স্বাতী তো অবাক, ও তাই নাকি, আপনি লেখেন। এত গুণ চাপা রেখেছেন!

শান্তনু হেসে বলল, বাংলাদেশে লেখকেব অভাব আছে? আমিও নিতান্ত ঐ দলে ভিড়ে গেছি। বোঝার ওপর শাকের আঁটি আর কি।

স্বাতী বলল, উপন্যাস, কাব্য, ছোটগল্প, কোন্ জগৎটা আপনার?

শান্তনু বলল, মোটে তো এক পয়সার তৈল, তাও আবাব কিসে [illegible] হৈল! মগজটা এইটুকু। লিখি যা তা মুঠোয় ধরা যায়। তার আবার হিসেব দাখিল।

কাজল বলল, উনি ছদ্মবেশী, নিজের আসল নামে লেখেন না।

স্বাতী বলল, ওঁর নকল নামটা দয়া করে বলবেন কি ?

শান্তনু বলল, তাহলে আসল নামটা পছন্দ হবে না।

স্বাতী বলল, সে বিবেচনা শ্রোতাব, আগে শোনা যাক্।

কাজল বলল, অতনু চৌধুরী।

স্বাতী অবাক হয়ে তাকাল শান্তনুর দিকে।

আপনি অতনু চৌধুরী নামে লেখেন!

শান্তনু বলল, দেখেছেন তো কেমন নামের বাহার, দেহ পাত করে লিখছি। অতনু একেবারে তনুকে উৎসর্গ করে।

স্বাতী শান্তনুব কথায় হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু হাসতে পাবল না। তখন স্বাতীর মন জুড়ে একটা প্রশ্ন উদ্যত হয়েছে, এই সেই লেখক অতনু চৌধুরী, যার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসখানা নিয়ে ওর বন্ধু মহলে তোলপাড় হয়ে গেছে।

স্বাতী বলল, আপনার 'আঁধারের উৎস' বইখানা সিমলা আসার আগেই শেষ করে এসেছি। আপনার আগের বইগুলোও আমার পড়া।

শান্তনু বলল, অন্ততঃ একজন বিদুষী মহিলাকে আমার পাঠিকা রূপে পেয়ে ধন্য হলাম।

স্বাতী বলল, আমি যতটুকু খোঁজ রাখি তাতে আপনার লেখা বই-এর সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু আপনাব প্রত্যেকটি বই-এর বিষয়বস্তু একেবারে নতুন ধবনের।

শান্তনু বলল, আরও কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে। শুধু কমপ্লিমেন্ট নয়।

স্বাতী বলল, আপনার 'আঁধারের উৎস' নিয়ে আমরা কয়েক বন্ধু বেশ কিছুদিন আলোচনায় মেতে ছিলাম।

শান্তনু বলল, আপনাব এ হেন বাক্য শুনে আমার অবস্থাটা কি রকম হয়েছে জানেন, রবি ঠাকুরের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকের তিনকড়ির মত। তিনকড়ি কেদারকে বলছে, 'এই তিনকড়ের ভেতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখবার জন্যে মেডিক্যাল কলেজের ছোকরাগুলো সব ছুরি উঁচিয়ে বসে ছিল— দেখে আমার অহঙ্কার হত।'

স্বাতী হেসে বলল, বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে কযেক ঘণ্টামাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি এখন ভাবতেই পারছি না যে আপনি এমন গভীর বিতর্কিত উপন্যাসের লেখক।

শান্তনু বলল, ভাবছেন, এমন একজন হালকা মেজাজের মানুষ কি করে এতখানি গুরুগম্ভীর কথা লেখে।

স্বাতী বলল, সত্যি মানুষের ভেতর বাইরে কত তফাত। আমরা যখন বাইরে হাসি তখন ভেতরে আর একটা মন চুপচাপ চোখের জল ঝরায়।

শান্তনু বলল, আপনি কিন্তু সিরিয়াস হচ্ছেন। ছদ্মনাম নেবার মানেই হল ভেতর-বার দুটোকে আলাদা করে ফেলা।

কাজল এতক্ষণ পরে কথা বলল, দেখুন ভাই, লেখা ও শুরু করেছে খুব বেশি দিন নয়। প্রথম লেখাটি লিখে আমাকে কিন্তু কোন কথা বলেনি। বই ছাপা হল, আমি কিছুই জানি না। একদিন হাতে করে একখানা উপন্যাস নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ তো। দেখি বইখানাতে আবার ওদের অফিস-ক্লাবের ছাপ মারা। মানে, ভেবে দেখুন, আমি যাতে একটুও কিছু না সন্দেহ করি তাব নিখুঁত ব্যবস্থা করে রেখেছে। বইখানা পড়লাম। কোন এক মসলিন-কন্যার কাহিনী নিয়ে লেখা। পড়তে পড়তে আমি অতীতের সেই মসলিন তৈরীর যুগে চলে গেলাম। ভালবেসে ফেললাম ভোগবতী মেয়েটিকে।

জিজ্ঞেস করল একসময়, কেমন লাগল?

চমৎকার।

ও বলল, আমার চেয়েও?

বলুন তো এ রসিকতার আমি কি জবাব দেব। বললাম, সত্যি ভারী সুন্দর লেখা।

ও বলল, উৎসর্গের পাতাখানা দেখেছ?

উল্টে দেখলাম। লেখা আছে, 'যাব চক্ষে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

বললাম, মজার তো।

ও বলল, কি মনে হয়, মেয়েটিকে ভদ্রলোক ভালবাসেন?

হেসে বললাম, ভালবাসা কি বলছ! ভদ্রলোককে, মানে লেখককে তার ভালবাসার পাত্রীটি একেবারে ঘায়েল করে ফেলেছে।

ও অমনি বলল, যেমন তুমি আমাকে করেছ, কি বল?

আমি বললাম, তা হলে তো আমার গর্বের শেষ থাকত না।

ও বলে উঠল, হে গরবিনী, সে শবরী হলে তুমি, আর এই গ্রন্থের লেখকই সেই হতভাগ্য মৃগ। যে তোমার দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হয়েছে।

কাজল বলল, আমার কথাটা বিশ্বাস করতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছিল। অবশ্য পরে ও কথা দিয়েছিল, ওর সব লেখাই আমাকে পড়িয়ে তবে প্রেসে দেবে।

শান্তনু বলল, হার হাইনেসের কোন নির্দেশই আজ পর্যন্ত অবহেলিত হয়নি।

ইচ্ছে ছিল স্বাতীর, শান্তনুর সঙ্গে ওর বই-এর গভীর কোন দিক নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু মানুষটি একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কখনো যেন সিরিয়াস হতে জানে না। একটা লঘু মেঘের মত হাওয়ার ঠেলায় ভেসে ভেসে চলে। অবশ্য লেখার জগতে ও একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ।

ঠিক দুদিন পরে কুলু থেকে ওদের ডেরা উঠল মানালীতে। এ দুদিনের সব খরচ স্বাতীই দিয়ে দিল। রেস্ট হাউসের ভাড়াটা যখন স্বাতী দেবার জন্য অফিসের দিকে যাচ্ছিল তখন করিডোরে স্বাতীব পেছন থেকে হাতটা চেপে ধরে শান্তনু বলল, গুস্তাকি মাপ করবেন শাহজাদী, এ টাকাটুকু এই অকিঞ্চনকেই দিতে দিন।

স্বাতী বলল, একে হাত ধরার অপরাধ, তার ওপর টাকা দেবার বেয়াদবি শাহরাজাদী সহ্য করে না।

কথা বলতে বলতে স্বাতী ঢুকে গিয়েছিল অফিসে। সুন্দর সিঁদুরে-লাল ব্যাগখানা খুলে সে ঝকঝকে কখানা নোট গুণে দিল, পাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটু হাসল শান্তনু।

ফিরে আসার পথে করিডোরে স্বাতী চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেল। শান্তনুর দিকে ফিরে বলল, এবার আপনার পালা। মানালীতে আমি মহারাজ শান্তনুর অতিথি।

শান্তনু বলল, চলুন তো আগে, তারপর দেখা যাবে অতিথি সৎকারটা কিভাবে করা যায়।

ওরা মানালীতে এসে পৌঁছল। তখন বেলাশেষেব ছবিতে রঙ লেগেছে। স্নো-ভিউ হোটেলে জায়গা পেতে অসুবিধে হল না। দোতলার ওপরে দুখানা রুম। নেপালী বয় · বাদুর সব সময়ে হাজির। ডাক দিলেই—জী। এমন বশংবদ পাওয়া দুর্লভ ভাগ্য বলতে হয়।

ঘরদোর ঠিকঠাক হল। নতুন পর্দা এল। দুখানা ঘরের মাঝের দরজায় ঝুলল সুদৃশ্য পর্দা।

শান্তনু স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলল, এখন ঘর নির্বাচন করুন, কারণ এখানে আপনি আমাদের অতিথি। প্রথম পছন্দ আপনার।

কাজল বলল, অবশ্যই।

স্বাতী বলল, অতিথি অতিথি সুরটা বড় বেশি বাজছে। দয়া করে একটু ঘরোয়া হতে দিন। আমাকে একান্তে ঐ ছোট ড্রইং-রুমখানায় ফেলে দিন, তাতেই আমি খুশী।

কাজল বলল, আমার কাছে তো সবই সমান। এখন আপনারা দুজনে ফয়সালা করে নিন।

স্বাতী বলল, নির্বাচনের সুযোগ যখন প্রথমেই দিয়েছেন তখন আমি যা বেছেছি তাই ফাইনাল।

শান্তনু একটু হেসে বলল, আমাদের দিকে রইল পাইন অরণ্য আর মানাংসু নদী, আপনাব দিকে রইল আকাশে হেলান দেয়া পাহাড় আর তার অবাক ঐশ্বর্য তবে অবাধ আমন্ত্রণ থাকবে কিন্তু দুপক্ষের। কান পেতে নদীর কলধ্বনি আর পাইনের শন্ শন্ গান শুনতে চাইলে আসবেন আমাদের ঘরের বাতায়নে। আর স্তব্ধ হয়ে পাহাড়ের ওপর তুষারের ছবি দেখতে মন চাইলে যাব আপনার খোলা জানালার ধারে।

স্বাতী হেসে বলল, স্বীকার করলাম, এই মাঝের পর্দা আমাদের কোন বাধাই নয়।

কাজল হেসে বলল, একশোবার নয়, নয়, নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা আর বেরল না। ভোরের আলোয় মানালীকে দেখবে ওরা, সেই কথাই রইল।

এঘর থেকে হেঁকে বলল শান্তনু, খোলা জানালা বন্ধ করে দিন, কাল ভোরের আলোয় শুভদৃষ্টি হবে।

ওঘর থেকে হাসির তরঙ্গের সঙ্গে কথা ভেসে এল, তাহলে পাইন বনেরও গান শোনা চলবে না—চলবে না।

তথাস্তু।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা শয্যা নিল।

রাতের বিছানায় কাজল বলল, শোন, মেয়েটি বেশ, না?

শান্তনু বলল, চেনার ব্যাপারটা মেয়েদেরই একচেটিয়া বলে জানি।

কাজল বলল, তোমার সবেতেই রসিকতা।

শান্তনু বলল, এখন আর ভালমন্দ বিচার করে কি করব বল। ওকে আমাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছি, বাস্।

আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে। একটুখানি সাহায্য করতে এগিয়ে এলেই আমি বুঝতে পারি ও কতখানি আন্তরিক।

শান্তনু বলল, তুমি ওর ওপর খুশি থাকলেই আমি খুশি। তোমার বিরাগের কারণ ঘটলেই আমার রাগ।

ওমা, রাগ করতে যাবে কেন?

শান্তনু পাশ ফিরে হাই তুলে বলল, তবে অনুরাগে ডুবিয়ে দিতে হবে।

কাজল বলল, ভীষণ কুঁড়ে আর ঘুমকাতুরে তুমি।

শান্তনু কথা না বলে অমনি কাজলের একখানা হাত নিজের বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হবার আগেই জেগেছে স্বাতী। সে খুলে দিয়েছে তার জানালা। চুপচাপ বসে দেখছে পাহাড়ের ছবি। মানালী, মানালী। তার সঙ্গে আর কারো তুলনাই চলে না। জানালা ছেড়ে একসময় স্বাতী এসে দাঁড়াল বারান্দায়। এখান থেকে মানালীর প্রায় সবটুকু ছবিই দেখা যায়। নীচে ছোট্ট টাউনটির চারদিক ঘিরে পাহাড়। ঠিক যেন একটি বিরাট আকারের ফুলের টব নীচে থেকে গোল হয়ে ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে কে যেন থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে পাইনের গাছ। নীচের পাইনগুলি অনেক বড়। ক্রমে স্তরে স্তরে সেই পাইনের সারি চারিদিকের পাহাড়কে বেষ্টন করে বড় থেকে ছোট হতে হতে উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়া অবধি। মনে হচ্ছে যেন বাদামী নীল পাহাড়ের বুকে সবুজের বন্যা নেমেছে। আকাশের নীল ছুঁয়ে আছে সেই সবুজের তরঙ্গ।

সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও ঝিলিক দিয়ে ওঠা ধবলগিরির তুষারলেখা। এত রূপ! দুটিমাত্র চোখে যেন ধরে রাখা যায় না। উপচে পড়তে চায়।

স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। রঙ লেগেছে দূর তুষারের স্তূপে। সাদা আর হাল্কা লালে মাখামাখি। একটু পরেই বদলে গেল রঙ। সোনা রূপোয় তৈরি হচ্ছে শৈলরাজের তুষারমুকুটখানা।

ঐ তো শান্তনু! কখন শান্তনু উঠে গেছে ঘর থেকে নিঃশব্দে। নীচে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছবির পর ছবি তুলে চলেছে।

একবার শান্তনু স্বাতীর দিকে চোখ তুলে হাসল। হাসিটা দুষ্টুমির। ভাবটা, কেমন জব্দ, তোমার আগেই মানালীকে অভিনন্দন জানিয়েছি।

স্বাতী কপালের ওপর উড়ে পড়া চূর্ণ চুলগুলোকে দুহাত তুলে সরিয়ে দিতে দিতে ঘাড় কাৎ করে মুখে একরকম ভাব ফোটাল। এটা শান্তনুর হাসির জবাব।

শান্তনু কিছু পরেই ছবি তুলতে তুলতে ওপরের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল স্বাতীকে।

স্বাতীর কেন জানি না মনে হল, আকর্ষণটা অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু নামতে গিয়েও তার নামা হল না। মনে পড়ে গেল কাজলের কথা। এমন করে তাকে একা ফেলে চলে যাওয়া খুবই দৃষ্টিকটু।

স্বাতী হাত তুলে কাজলের ঘরের দিকে দেখাল।

শান্তনুর তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। বার বার নিঃশব্দ অনুরোধ আসতে লাগল নীচে থেকে ওপরে। স্বাতী দেখল ছবি তোলার ব্যাপারে মানুষটা একেবারে পাগল। তখন স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিগুলোও যেন হারিয়ে ফেলে শান্তনু।

পা টিপে টিপে কাজলের ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল স্বাতী। ওর মনে হল কাজল তখনও ঘুমুচ্ছে।

নীচে নেমে গিয়ে ও দাঁড়াল শান্তনুর মুখোমুখি।

বেশ মানুষ তো আপনি, মিসেস চৌধুরীকে ডাকলেন না?

একটু বেলা করে ওঠাই ওর অভ্যেস।

তা হোক, কিন্তু উনি উঠে যদি দেখেন আপনি কিম্বা আমি কেউ নেই পাশে, তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ লাগবে আমার।

কাজল আপনাকে খুব ভালবাসে। আর তাছাড়া কাজল কোনকিছু উল্টো ভাবনা ভাবার মেয়েই নয়।

স্বাতী বলল, মরে যাই, মেয়েদের মনের একেবারে ডুবুরী হয়ে বসে আছেন দেখছি। আচ্ছা সে কথা যাক্, এখন বলুন তো কি করতে হবে আমাকে।

শান্তনু বলল, মনে হচ্ছে আপনি রাগ করেছেন আমার ওপর। কিন্তু জানেন, রাগ করলেও আপনার মুখের এক্সপ্রেশান ভারী সুন্দর।

ফিক্ করে হেসে ফেলল স্বাতী, আর ক্লিক্ করে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি তুলে নিল শান্তনু।

শান্তনু বলল, এবার আপনি যেতে পারেন আপনার বান্ধবীর কাছে। আমার কাজ হয়ে গেছে।

স্বাতী ফিরে যাচ্ছিল, আর শান্তনু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরের নাম্বারটা আনছিল ক্যামেরায়। টুক্ করে শব্দ হতেই সে তাকিয়ে দেখল, শেষ নাম্বারটি এসেছে।

এই যে, চাপা আওয়াজ ছুঁড়ে দিল শান্তনু বাতাসে।

ফিরে দাঁড়াল স্বাতী।

শান্তনু বলল, শেষ নাম্বার, প্লিজ, রোলটা শেষ করতে দিন।

ভিউ-ফাইণ্ডারে চোখ রেখে তাকাল শান্তনু।

একটা ঘুষি ছুঁড়ল স্বাতী শূন্যে।

তাই সই, শান্তনু ধরে ফেলল ছবিখানা তার ক্যামেরায়।

ছবি তুলে রোলখানা গুটিয়ে নিতে নিতে শান্তনু বলল, সব রেকর্ড হয়ে রইল কিন্তু। আজই দিচ্ছি ওয়াশ করতে। কন্টাক্ট প্রিন্ট সন্ধ্যেতেই পাওয়া যাবে, তখন নিজের ছবি নিজের আয়নাতেই দেখবেন।

স্বাতী বলল, ভীষণ অসভ্য আমি, তাই না?

শান্তনু বলল, আমি বলব কেন, আপনার ছবি কি বলে দেখুন।

স্বাতী এক দৌড়ে সেখান থেকে পালাল। শান্তনু ওপরে তাকিয়ে দেখল, কাজল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তনু বাজার ঘুরে ফিল্ম্গুলো ওয়াশ করতে দিয়ে যখন ফিরল হোটেলে তখন ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে বসে বসে গল্প করছে স্বাতী আর কাজল।

শান্তনু দাঁড়িয়ে গেল দরজার সামনে।

কাজল বলছে, একটা আস্ত পাগল। কলকাতার হানাহানির ভেতর সেই বাড়ি ফিরছে কোনোদিন বারটা, কোনোদিন বা রাত একটায়। বলুন তো ভাই চিন্তা হয় না। এসেই বলবে, ঘুমোওনি এখনও, জেগে বসে আছ।

কান্নাকাটি করলে বলবে, তোমার পতিভক্তিতে আমি প্রীত হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।

আচ্ছা বলুন তো ভাই, এমন একটা দুঃখের আবহাওয়ার ভেতর ঐ ধরনের কথা বললে কার না হাসি পায়।।

শান্তনু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এত হাসি পায় যে তার উচ্ছ্বাসে এক ডজন কিল অধমকে হজম করতে হয়।

স্বাতী বলল, উত্তম পুরস্কার।

শান্তনু বলল, এই জন্যেই স্বার্থপর বলে মেয়েদের অপবাদ আছে। সব সময় স্বজাতীর পক্ষ নিয়ে কথা বলবেই।

ওরা কদিন ঘুরে বেড়াল মানাংসু নদীর তীরে, শব্দিত পাইন বনের ভেতর। দেখল তিব্বতী রিফিউজীদের তাঁবুর আস্তানা। তাদের কাছে খুঁজল একটু অসাধারণ কোনো রঙের পাথর, অথবা অদ্ভুত আকারের কোনো কিউরিও। কিনল কুলু ভ্যালির তৈরি কতকগুলো শাল। স্বাতী একখানা শাল কিনে কাজলের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমায় খুব ভাল মানাচ্ছে।

কাজল বলল, ভারী দুষ্টু মেয়ে হয়েছ তুমি, দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

শান্তনুকে একান্তে ডেকে তারই ভেতর একখানা সুন্দর দামী শাল পছন্দ করে দিতে বলল কাজল।

স্বাতী হেঁকে বলল, তোমার সব কৌশল ধরা পড়ে গেছে, আমি ওতে নেই।

কাজল বলল, ছি ভাই, গরীব বলে কি আমাদের এমন করে রেহাই দিচ্ছেন।

পাশে পড়ে থাকা কতকগুলো শাল এক জায়গায় জড়ো করে কাজলের হাত ধরে টেনে আনল াতী।

নিন, এবার পছন্দ করুন। স্বামী রত্নটিকে সঙ্গে টানবেন না। আপনার হাতে যেটি উঠবে সেটিই হবে আমার সবচেয়ে প্রিয়।

কাজল এটা ওটা নেড়ে চেড়ে একটি তুলল।

স্বাতী আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, দেখে যান লেখক মশাই, পছন্দ কাকে বলে। সাদা রঙের শাল, তার আঁচলায় কালো সবুজ লালের কি সুন্দর কাজ। এত সুদিং কালার আর এমন আর্টিস্টিক ডিজাইন, সত্যি গায়ে দিলে বন্ধুদের চোখে জ্বালা ধরে যাবে।

হাসল শান্তনু। দোকান ছেড়ে এক সময় বেরিয়ে এল ওরা। নদীর ধারে চলতে চলতে একটি সুন্দর নির্জন জায়গায় বসতে যাবে, এমন সময় পেছনের পাইন বন থেকে গানের সুর ভেসে এল। হিন্দী সিনেমার গান।

ওরা পেছন ফিরে দেখল, সুটিং চলেছে। একটি মেয়ে আর একটি ছেলে গাছের পর গাছে গান গেয়ে পাক খেয়ে চলেছে। ছেলেটি ধরতে চাইছে মেয়েটিকে, কিন্তু গানের সুরে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েটি সরে যাচ্ছে।

অধরাকে ধরার সেই চিরপরিচিত প্রচেষ্টা।

শান্তনু বলল, এই দিনটা সম্বন্ধে একটা তোফা মন্তব্য করেছিল আমার বন্ধু।

স্বাতী কৌতূহল প্রকাশ করল, কি রকম?

শান্তনু বলল, সে যখন খুব ছোট তখন একবার সিনেমা দেখতে গিয়ে পর্দায় নায়ক-নায়িকার এমনি দৌড়োদৌড়ির ছবি দেখেছিল। তখন তার মনে হয়েছিল যে ছবির হিরোটা কিছু নয়, এত কাছের একটা মেয়েকে ধরতে পারছে না। তাকে বললে, সে এক দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলবে মেয়েটাকে।

কিন্তু হায়, বড় হয়ে সে নাকি জেনেছিল, কাছে থাকলেই সব সময় ধরা যায় না।

স্বাতী মুখ নীচু করে হাসল।

কাজল বলল, তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই একটি আহত বিহঙ্গ।

শান্তনু বলল, আমার বন্ধুর সখারও তো একই অবস্থা হয়েছিল, নয় কি?

স্বাতী খিল খিল করে হেসে উঠতে গিয়ে সুটিং-এর কথা ভেবে মুখে আঁচল চাপা দিয়েই হাসতে লাগল।

কাজল বলল, সে কথা তুমিই ভাল জান।

ওরা ফিরছিল বাস স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে, শান্তনু খোঁজ নিয়ে জানল, একখানা বাস রোটাং গিরিপাশ অবধি যাবে। আর যাবে আগামীকাল ভোরেই। সামান্য দুচারখানা টিকিট এখনও আছে বিক্রির অপেক্ষায়।

খবরটা পেয়েই লাফিয়ে উঠল শান্তনু। ছবি তোলার এমন সুযোগ আর মিলবে না।

কথাটা ওদের কাছে বলতেই স্বাতীও হৈ হৈ করে উঠল।

কিন্তু গোল বাধাল কাজল, কতদূর পথ?

শান্তনু বলল, সকাল সাতটায় বেরব, খাবার থাকবে সঙ্গে, ফিরব রাত আটটায়।

কাজল বলল, অসম্ভব, একে তো পাক খেতে খেতে গা গুলিয়ে উঠবে, তার ওপর এতক্ষণ বাইরে থাকা। আমার বড় কষ্ট হবে।

শান্তনু বলল, তাহলে থাক্ আর যাব না।

তারপর স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলল, অনেকেই যাচ্ছে, আপনি চলে যান ওদের সঙ্গে। একেবারে বরফের রাজ্য, খুব এন্‌জয় করবেন।

স্বাতী বলল, আমার শুধু চোখে দেখার আনন্দ আর আপনার ছবি তোলার আনন্দ। আমি দেখলে কেবল আমার লাভ কিন্তু আপনার ছবি দেখে দশজনের লাভ। সুতরাং আমি রইলাম শ্রীমতী কাজল চৌধুরীর দরবারে। আপনি রোটাং থেকে কিছু অমূল্য বস্তু এনে আমাদের উপহার দিন।

কাজল বলল, আমাকে কি এতই অসহায় ভাববে তোমরা। মামলা তো বার কি তেরটা ঘণ্টার। দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব আমি। বাহাদুর ছেলেটাও কাজের আর বিশ্বাসী। তোমরা দুজনেই দেখে এসো।

শান্তনুর গলাটা ধরে উঠল, বড় কষ্ট লাগছে কাজল, তোমাকে ফেলে যেতে মন চাইছে না।

আবার দুষ্টুমি,—ধমকে উঠল কাজল।

আমার কিছু হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে যাও। তুমি না গেলেই বরং আমি কষ্ট পাব বেশি।

তারপর স্বাতীর দিকে ফিরে বলল, এই আনাড়ীকে সামলাবার ভার কিন্তু ভাই আপনার।

কাজল জোর করেই শান্তনুকে দিয়ে দুখানা টিকিট কাটাল।

পরদিন ভোরবেলা গোছগাছ করে বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে বেরল স্বাতী আর শান্তনু। দুচার পা গিয়েই কাজলের কাছে ফিরে এল শান্তনু।

সাবধানে থেকো লক্ষ্মীটি। আমি ওখানে থাকব, মন কিন্তু পড়ে থাকবে আমার তোমার কাছটিতে।

কাজল বলল, আচ্ছা, এমন পাগল কেন বলত তুমি। আমার জন্যে যদি ভেবেই সারা হবে তাহলে আনন্দের যে তোমার পুরোটাই মাটি। কিচ্ছু ভেবো না, আমি একা খুব থাকতে পারব। একটুও আমার মন কেমন করবে না।

কাজলের মাথার চুলগুলোকে দুষ্টুমি করে এলোমেলো করে দিয়ে দৌড়ে পথে নেমে গেল শান্তনু। অন্ধ চোখ মেলে শান্তনুর পায়ের আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে রইল কাজল। কখন হারিয়ে গেল ওদের পায়ের সাড়া। হঠাৎ কেমন যেন কান্না পেল কাজলের। ঘরের ভেতর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কেন এই কান্না, সে নিজেই বুঝল না। তবু বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে একটা কান্নার ঢেউ অন্ধ চোখের বাঁধ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

ওদিকে বাস চলেছে রোটাং-এর পথে। পাশাপাশি বসেছে দুজন-স্বাতী আর শান্তনু। স্বাতীকে জানালার পাশে বসতে দিয়েছে শান্তনু। সে বসেছে তার পাশটিতে।

বাসে ওঠা অবধি কেমন যেন চুপ হয়ে গেছে স্বাতী। শান্তনুও তাকে কোন কথা বলাবার চেষ্টা কবছে না।

অনেক দূরের পথ পেরিয়ে এল ওরা। দুচারটে টুকরো কথা হল। স্বাতী ফল কেটে মিষ্টি বের কবে খেতে দিল শান্তনুকে। বাসের টালের সঙ্গে দেহের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে কয়েকবার পড়ল শান্তনুর গাযেব ওপর। সলজ্জ হাসি হেসে আবার সরে বসার চেষ্টা করল।

একসময় ওদের অবাক করে দিয়ে বাস পৌঁছে গেল রোটাং-এ। তুষার, তুষার, কেবল তুষার। সূর্যের ঝকঝকে আলোয় চোখের ওপর ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। সবাই নেমে পড়েছে। শান্তনু আর স্বাতী পাশাপাশি চলল সেই তুষারের রাজ্যে।

শান্তনু বলল, এখনও কি আপনার ছবি তুলতে অনুমতি নিতে হবে।

স্বাতী মুখ টিপে হাসল। বলল, ভদ্রমহিলাদের ছবি নিতে সব সময়েই অনুমতির প্রয়োজন।

শান্তনু হেসে ক্যামেরা তুলল।

স্বাতী দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

শান্তনু বলল, প্রথম ছবি, তাক্ যখন করেছি তুলবই। ক্লিক্ করে ছবি উঠল।

স্বাতী অমনি বলল, না, না, কি বিচ্ছিরি।

শান্তনু আবার স্বাতীর ছবি নিল।

স্বাতী বলল, একটুও আপনি সজাগ হবার সুযোগ দেন না। আপনার সঙ্গে আড়ি আড়ি।

স্বাতী আড়ির ভঙ্গীতে ঠোঁটের ওপর আঙুলখানা তুলতেই আবার ক্লিক্।

এবার আদ্ধেক ফিরে ঘাড়ের ওপর মুখটি কাৎ করে রাগের ভঙ্গীতে তাকাল স্বাতী। তাই চেয়েছিল শান্তনু, আবার ছবি উঠল।

স্বাতী বলল, আপনি সাংঘাতিক।

শান্তনু বলল, আপনি অসাধারণ।

এরপর তুষার পাহাড়েব ছবি উঠতে লাগল শান্তনুর ক্যামেরায়।

একসময় স্বাতী বলল, আমাকে একখানা ফটো নিতে দেবেন?

অবশ্যই।

এরপর বরফের ওপর বসে স্বাতীকে ফটো তোলার পাঠ দেওয়া হল।

স্বাতী ক্যামেরা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শান্তনু বলল, তুলুন ঐ তুষারচূড়োব ছবি।

স্বাতী তুষার পাহাড়কে পেছন করে শান্তনুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, প্রথমে গুরুকে দিয়েই শুরু হোক।

ক্লিক্ করে উঠল স্বাতীর ক্যামেবা।

ছবি তুলে স্বাতী বলল, কেমন জব্দ, মনে করেছিলেন নিজেকে আড়ালে রেখে আমাদের সবাইকে বন্দী করবেন আপনার ক্যামেরায়, এখন নিজেও বাঁধা পড়লেন।

শান্তনু বলল, আমি কিন্তু আমার ছবির মানুষগুলোকে কেবল বন্দী করেই রাখি না, মাঝে মাঝে মনের নিরালা প্রান্তরে মুক্তি দিই।

স্বাতী অমনি বলল, দূর থেকে দেখছি, সে প্রান্তরটি বেশ বন্ধুব। পায়ে পায়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা।

শান্তনু হেসে বলল, দূরের ভয়টা অনেক সময় কাছে এলে দূর হয়ে যায়।

ওরা ছবির পর ছবি তুলল তুষার পাহাড়ের,—দুজন দুজনের।

এবার ফেরার পালা। গাড়ি চলল মানালীর দিকে উতরাই-এর পথ ধরে।

কিছু পথ এগিয়েই কিন্তু প্রচণ্ড একটা ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়ল গাড়ি। কোথা থেকে আকাশপথে তাল তাল মেঘ ভেসে আসতে লাগল। মুছে দিল দিনের আলো। তারই ভেতর অসীম ধৈর্যে গাড়িকে বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার। সকলের মুখেই আতঙ্ক। মেঘসজ্জা যতক্ষণ চলল ততক্ষণ গাড়ি ছুটে চলল পাহাড়ী পথে। মাইলের অঙ্কগুলো কমে আসতে লাগল। কয়েক হাজার ফুট নেমে গাড়ি যখন প্রায় মানালীর কাছাকাছি দু তিন মাইলের ভেতর এসে পড়েছে, তখন ঘটল অঘটন। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিহাওয়া পথেব ওপর প্রকাণ্ড একটা গাছের ডাল ভেঙে ফেলে দিয়ে গেল। সজোরে ব্রেক কষল গাড়ি। একটুব জন্যে গভীব খাদ আর ভেঙে-পড়া গাছের হাত থেকে বেঁচে গেল গাড়িখানা।

গাড়ি আর চলবে না। সারাবাত এই পথের ওপর গাড়িতে বসে থাকতে হবে যাত্রীদের। ড্রাইভাব

বলল, সে গাড়িতেই কাটাবে। একটু পেছনে যে পাহাড়ী পল্লীর পাশ কাটিয়ে এসেছে গাড়ি, সেখানে যাত্রীরা চেষ্টা করলে রাতের আশ্রয় পেতে পারে।

অনেকে বাস থেকে নেমে দৌড়ল আলো-আঁধারি রাস্তা ধরে পাহাড়ী গাঁয়ের সন্ধানে। কেউবা রয়ে গেল ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়িতে।

বাস থেকে নেমে এল শান্তনু। স্বাতী ভয়ে নির্বাক।

স্বাতী প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে, সে শান্তনুর হাত ধরে বলল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না, তুমি আমাকে নিয়ে চল।

শান্তনু শক্ত করে স্বাতীর হাতখানা ধরে বলল, আমাদের পেছনেও হটা চলবে না, বাসে বসে রাত কাটানোও যাবে না, মাথার ওপর দুর্যোগ নিয়েই মানালীর পথে এগিয়ে যেতে হবে।

শান্তনুর হাত ধরে আবছা আলোয় বিরাট গাছের ডালটাকে ডিঙিয়ে স্বাতী এপারের বাঁধান পথে এসে পড়ল।

চলেছে দুজনে। সম্পূর্ণ অপরিচিত অস্পষ্ট পথ-রেখা। দুজনেই নির্বাক। শুধু জুতোর ঠক্ ঠক্ একটা শব্দ পাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাত ধরে চলেছে স্বাতী। একটা কিছু ভয়ানক দুর্যোগের আশঙ্কায় সে ভয়ে প্রায় পাথর হয়ে গেছে।

কিছু পথ চলার পরেই ঝড় এল, সঙ্গে নিয়ে প্রবল বর্ষণ। শিলা পড়ছে, সাদা টুকরো পাথরের যেন বৃষ্টি চলেছে। হু হু করে পাশের উপত্যকা থেকে ছুটে আসছে দমকা হাওয়া। ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডালপালা পাতাপত্র। মুহূর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে ভীষণ শব্দে।

ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল স্বাতী, শান্তনু তাকে অন্ধকারে জড়িয়ে ধরল। বৃষ্টিতে ভিজে তখন দুজনেই কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো। শান্তনুর চোখে এ কি পড়ল! কয়েক গজ দূবে পথের পাশেই একটা ছোট্ট কাঠের চালা। সে প্রায় সংজ্ঞাহীন, একেবারে জলে সিক্ত স্বাতীকে টানতে টানতে নিয়ে চলল সেদিকে। দুচার পা গিয়ে আবার দাঁড়াতে হল তাকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব। আবার বিদ্যুতের চমক। এবাব শান্তনু তাব নিশানা ঠিক করে নিয়েছে। সে গিয়ে উঠল সেই ঘরের দাওয়ার ওপর।

বিদ্যুতেব আলোয় সে দেখতে পেল, এটি একটি পথের পাশেব দোকানঘর। দোকানী দরজায় তালা বন্ধ করে ঘরে ফিরে গেছে। তবে সৌভাগ্য, ঐ দাওযার একপাশে পান সিগারেট বিক্রির জন্য একটি স্থায়ী মাচান বাঁধা রয়েছে।

শান্তনু তারই ওপর শুইয়ে দিল স্বাতীকে। মনে পড়ল তার, ব্যাগের ভেতর দুটো কোটের কথা। গরম বলে দিনেরবেলা দুজনে কোট দুটো ঢুকিয়ে রেখেছিল তার মধ্যে। শান্তনু ব্যাগের চেন টেনে কোট দুটো বের করল। একখানা কোট জড়িয়ে দিল স্বাতীর গায়ে। থবথর করে কাঁপছে স্বাতী। নিজে কোটখানা পরে মাচানের ওপর উঠে স্বাতীকে বুকের মাঝে চেপে বসে রইল শান্তনু। একটু বেশী উত্তাপ হযত স্বাতী পাবে এতে।

কি আশ্চর্য, স্বাতীর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন গোনা যাচ্ছে। শান্তনুর অবচেতন মন থেকে অতি ধীরে উঠে আসছে একটা তরল ধোঁযার মত অন্ধকার। সে তবল অন্ধকারেব স্রোত শান্তনুর দেহের সহস্র শিরা-উপশিরার পথ বেয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে রক্তে, স্নায়ুতে, বুদ্ধি-চেতনার কোষে কোষে।

সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার। কতক্ষণ এমনি একটা চেতনার মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল শান্তনু। বাইরে ঝড় ধীরে ধীরে থেমে এসেছে। কেবল দূর দিগন্তে পাহাড়ের চূড়োর ওপারে এক একবার নিষ্ফল বিদ্যুৎ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এদিকে চাঁদ উঠেছে কখন ঝড়ের মেঘের আড়ালে। এখন মেঘ সরে গেলেই ছড়িয়ে পড়ছে তার আলো। স্বাতীর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু শান্তনু বুঝতে পারল স্বাতী তার সবটুকু শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধবে আছে শান্তনুকে। এখন শান্তনুব হাতের বাঁধন শিথিল হলেই সম্ভাবনা নেই স্বাতীর পড়ে যাবার।

শান্তনু তাকিয়ে আছে স্বাতীর মুখের দিকে। মনের গোপন উৎস থেকে উঠে আসছিল যে অন্ধকার,

সে হঠাৎ অধিকার করল শান্তনুর হৃদয়। শান্তনু দেখল তার বুকে মাথা রেখে যে মেয়েটি শুয়ে আছে সে কি জাদুতে যেন সহসা কাজল হয়ে গেছে। শান্তনু নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ঘুম ভেঙেছে কাজলের। এ তো কাজল নয়, স্বাতী! অবাক চোখ মেলে স্বাতী তাকাল শান্তনুর মুখের দিকে।

শান্তনুর সমস্ত চৈতন্য কেমন যেন আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এখন শান্তনুর কাছে ঐ মুখ ঐ দেহ আর স্বাতীর নয়, কাজলেরও নয়। সে দেখতে পেল একটি পুরুষ ধরে আছে একটি নারীকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘের শেষ ছায়াটি সরে যেতেই আকাশের বুক থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একনদী আলো।

এখন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল সব কিছু। অন্ধকার আবছায়াগুলো সরে গিয়ে আশ্রয় নিল গোপন গিরিগুহায়। পাশের পাইন গাছটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা হাওয়া বয়ে গেল।

শান্তনু সেদিকে তাকাতেই তার মনে হল, কাজল যেন এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে অন্ধচোখ মেলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। শান্তনুর মনের অনেক গভীরে কাজলের চোখের আলো এসে পড়েছে।

শান্তনু মনের ভেতর খুঁজতে লাগল একটুখানি অন্ধকার কোণ, যেখানে সে লুকোতে পারে। কিন্তু কাজলের চোখের উজ্জ্বল আলোটা তাকে লুকোবার কোন সুযোগই দিল না।

স্বাতী উঠে দাঁড়াল। বিস্রস্ত বেশবাস সামলে নিয়ে শান্তনুর দিকে তাকাতেই দূরাগত ধ্বনির মত তার কানে একটি কথা বাজতে লাগল, 'এই আনাড়ীকে সামলাবার ভার কিন্তু ভাই আপনার।' কথাগুলো এই নির্জন প্রহরে স্বাতীর কাছে একটি পবিত্র মন্ত্র বলে মনে হল।

সে শান্তনুর হাত ধরে বলল, চলুন, আমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাই। অন্ধকার আমাদের ভয় দেখানোর খেলায় মেতেছিল। এখন আমরা আলোয় আলোয় পথ চিনে চলতে পারব।

ওরা পথে নেমে পড়ল। কাকজ্যোৎস্নায় বড় বড় পাইনের গাছগুলো পথের ওপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এখন আর একটুও শন্ শন্ শব্দ তুলছে না। মনে হচ্ছে পাহাড়, বন, আকাশ সবাই মিলে ওদের চলে যাবার শব্দই শুনছে। ওরা এখন আর দুটি পুরুষ আর নারী নয়, ওরা সেই সকালের স্বাতী আর শান্তনু, যাদের মাঝে অদৃশ্যে থেকে আর একটি মেয়েও হেঁটে চলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে মানালীর আলো, ওরা দ্রুত পা চালিয়ে সেদিকে চলতে লাগল।

ঢং ঢং শব্দে ওয়ালক্লকে দশটা বাজতেই বিছানা ছেড়ে চমকে উঠে দাঁড়াল কাজল। টিপয়ের ওপর রাখা বেলটা হাত দিয়ে অনুভব করে নিয়ে সে বাজাতে লাগল।

ঘরে এসে ঢুকল বাহাদুর।

কাজল দারুণ উদ্বেগে কথা বলতে পারছিল না। নিজেকে সামলে নিতে তার বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ওরা এখনও ফিরছে না কেন বাহাদুর?

কাজলের গলার স্বর কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

বাহাদুর যা বলল, তাতে কাজলের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। সে দুটো হাত কপালে চেপে বসে পড়ল বিছানার ওপর।

পাহাড়ী ঝড়ের মুখে গাড়ী পড়েছে। খাদে গড়িয়ে পড়া নাকি একটুও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ঝড় থেমেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। বিশেষ অঘটন না ঘটলে, এর অনেক আগেই নাকি গাড়ি এসে পৌঁছত স্ট্যান্ডে।

বাহাদুর এ কথাও জানিয়ে গেল যে বাস স্ট্যান্ডে বহু লোক জড়ো হয়েছে খবর জানার জন্যে।

আরও একটা ঘন্টা যে কি করে কাটল কাজলের তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। কেবল ঢং ঢং ঢং করে বারান্দার ঘড়িটা এগারো বার কাজলের মাথার ভেতর একটা লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গেল।

কাজল হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে এল হোটেলের বাইরে। গভীর রাতে কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। উদ্বেগ উত্তেজনায় কাঁপছিল সে। প্রতি দিনের চেনা পথ ধরে সে অনেক কষ্টে এসে দাঁড়াল পাইন

বনের ভেতর।

পাইনের গাছগুলো চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। ও তারই ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল মানাংসু নদীর দিকে। পাথরে আছাড় খেল, গাছের কাণ্ডে ধাক্কা লাগল।

ঐ তো মানাংসুর কলকল খলখল ছুটে চলার শব্দ। ওরই কূলে কূলে পাহাড়ী পথ ধরে গাড়ি ছুটে আসবে। প্রতি সন্ধ্যায় যখন ওরা এসে বসে থাকে মানাংসুর কূলে কোন পাইন বনের তলায় তখন রোটাং থেকে গাড়ি ফেরার শব্দ শুনতে পায়।

কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল কাজল। রাতের জগতের কত মিশ্রিত ধ্বনি প্রতারণা করল কাজলের সঙ্গে। থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সারা দেহ। প্রাণপণ শক্তিতে সে তার পায়ের ওপর ভর রাখার চেষ্টা করে চলেছে। কাজলের সমস্ত ইন্দ্রিয় আজ শুধুমাত্র একটি শব্দকে ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে, কাজল! কাজল! শব্দ উঠল। পাইন অরণ্য, মানাংসু নদী পেরিয়ে সে ডাক পৌঁছল ওপারের পাহাড়ে দ্বিগুণ প্রতিধ্বনি তুলে। কিন্তু কোন উত্তর ফিরে এল না শান্তনু আর স্বাতীর উদ্বেগ আকুল মুহূর্তগুলোকে ভরে দিতে।

শান্তনুর শেষের ডাকগুলো করুণ আর্তনাদের মত শোনাল।

কাজল কি তখন তার ক্ষীণ দুটো হাত দিয়ে আঁধার সরিয়ে অনন্ত কোন আলোর ধ্বনির সন্ধানে চলেছিল?

মণিমুকুট

দেয়ার চোখে পলক পড়ছে না। এইমাত্র যে মহিলা বুক-শপের পেছনের বন্ধ দরজাটা হঠাৎ খুলে কাউন্টারের ওপারে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দিকে চেয়ে দেয়ার বিস্ময় যেন উপচে পড়তে চাইছে। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। শ্যাম্পু করা চুলগুলোকে আঁচড়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে তেলহীন রুক্ষতার একটা আলাদা সৌন্দর্য ফুটে আছে। গায়ে জড়ান সাদা সিফনের শাড়ি। গলায় কালো পাথরের মালা। বুকের ওপর ছোট্ট দুটি সোনার বলের সঙ্গে গাঁথা একটি চৌকো সোনার চাকতি। আশ্চর্য একটি শ্বেতপাথরের প্রতিমা। কপালে অথবা সিঁথিতে সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই। ঠিক ঐখানেই দেয়ার চোখ দুটো আটকে আছে। তার চোখের ওপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আর একটি ছবি। প্রায় এক যুগ আগে অবিকল এই মুখখানাকে সে দেখেছে এক বিয়ের আসরে। কনের আসনে তখন বসেছিলেন অনন্যার ভঙ্গীতে। চন্দনে, মুকুটে, বেনারসীতে সে এক উজ্জ্বল সমারোহ। দেয়া সেদিনও চেয়েছিল এই মূর্তির দিকে। পলক পড়ে নি তার চোখে কতক্ষণ। বাবার হাত ধরে সে দাঁড়িয়েছিল। সাত আট বছরের মেয়ে। মালিকের মেয়ের বিয়েতে বাবার সঙ্গে তারও নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন।

হঠাৎ তার বাবাকে দেখে সবার সামনে আসন ছেড়ে উঠে এল কনে। একমুখ হাসি ফুটে উঠল শরতের শিউলির মত।

ভারী সুন্দর হয়েছে আপনার সেটিং-এর গয়নাগুলো। বিশেষ করে মুকুটখানা। সবাই দারুণ প্রশংসা করছে।

তোমার ভাল লেগেছে তো মা?

লাগবে না! আপনি কত যত্ন করে রাতদিন কারখানায় বসে বসে তৈরি করলেন। ভাল লাগবে না আমার।

দেয়ার বেশ মনে আছে, একটি সুন্দরী অবিবাহিতা মেয়ে এগিয়ে এসেছিল। কনের কোন বান্ধবী হবে বুঝি। বলেছিল, আমাকেও রুমার মত ঠিক এমনি একসেট তৈরি করে দিতে হবে কিন্তু।

কনে মাথা দুলিয়ে বলেছিল, একেবারেই না। আমার সেটিং-এর দ্বিতীয় কোন জোড়া থাকবে না। সে হবে অদ্বিতীয় অলঙ্কার।

ভারী স্বার্থপর তুই!

তা বলতে পারিস সুমি। তোর আর আমার মুখ ভগবান যেমন এক ছাঁচে গড়েন নি, তেমনি আমাদের গয়নাগুলোও এক ছাঁচের হবে না। তোর সেটিংগুলো আমার চেয়ে আরও অনেক সুন্দর হতে পারে কিন্তু আমার ডুপ্লিকেট কখনই না।

বাবা সেদিন হেসে বলেছিল, তোমাকেও তোমার মনের মত তৈরি করে দেব। সেটাও হবে আর এক রকমের সুন্দর।

কত দিনের এসব কথা। কতটুকু বা তখন তার বয়স। তবু সেদিনের একটি কথাও সে ভোলে নি। অনেকে অবাক হয়ে যায় তার স্মৃতির শক্তি দেখে। সে কিন্তু কোন কথাই মনে রাখার জন্য দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করে না। যেটা মনে থাকবার তা ঐ সেটিং-এর গয়নার মতই স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়।

সেদিন বিয়ে-বাড়ি থেকে ফিরে এসে সে বাবার গলা জড়িয়ে শুয়ে বায়না ধরেছিল, আমাকে ঐ কনের গয়নার মত গয়না গড়ে দিতে হবে বাবা।

বাবা প্রথম বারে কোন উত্তরই দেয় নি। দ্বিতীয় বার ঐ একই বায়না একই সুরে জানিয়েছিল দেয়া।

বাবা এবার আর চুপ করে না থেকে উত্তর দিয়েছিল, কোথায় পাব মা আমি সেটিং-এর গয়না?

কেন, তুমি তো কত গয়না তৈরি করছ বাবা।

হাসির একটা শব্দ উঠেছিল অন্ধকারে। বিষণ্ণ করুণ সে হাসি। হাসি থামলে বাবা আপন মনে বলেছিল, তৈরি করলেই কি ভোগ করা যায় রে পাগলী।

বাবার কথার অর্থ সেদিন সে বোঝে নি ঠিক তবে কথাগুলো কানে বেজে উঠেছিল বলে আজও স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে তার। সেদিন সে বাবাকে আর পীড়াপীড়ি করে নি। তার বালিকা হৃদয়ে সে এইটুকু অনুভব করেছিল, তার বাবা গয়না তৈরি করলেও ইচ্ছামত সেগুলো বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই।

অনেকক্ষণ বুঝি দেয়া ভদ্রমহিলার মুখের ওপর চোখ রেখে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল। হঠাৎ কাউন্টারের ওপার থেকে কোমল গলার আওয়াজ ভেসে এল।

বই কিনতে এসেছ? কি নাম ভাই তোমার?

সেই মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দেয়া। তবু জোর করে সলজ্জ একটুকরো হাসি মুখে টেনে এনে বলল, আমার নাম দেয়া।

ভারি মিষ্টি নাম তো।

দেয়া এবার খিলখিল করে হাসি ঝরিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, একটুও না।

ওপারে ভদ্রমহিলার মুখে হাসি, কেন ভাই, নামটি তো বেশ। ছোট্ট, সুন্দর।

দেয়া অমনি বলল, জানেন, এই নাম নিয়ে আমার কলেজের বন্ধুরা দারুণ ক্ষ্যাপায়।

সে কি?

দেয়া বলল, নামের সঙ্গে আমার গায়ের রঙের মিলটা তো চোখ এড়িয়ে যাবার নয়।

ভদ্রমহিলা এবার প্রতিবাদের সুরে বললেন, তুমি বলতে চাও মেঘের মত তোমার রঙ? মোটেও তুমি কালো নও। উজ্জ্বল মাজা রঙ তোমার। ভারী মিষ্টি। হাঁ, বলতে পার মেঘের মত শ্যামল সুন্দর।

আপনি তো রবীন্দ্রনাথের গানের কথা দিয়ে আমার গায়ের রঙের ব্যাখ্যা করলেন, কিন্তু বন্ধুরা কি অতশত বোঝে? তারা তাল ঠুকতেই ওস্তাদ।

কি রকম?

এই ধরুন ক্লাসে ঢুকছি, অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল, দেয়ার উদয়। আবার একটু জোরে কথা বলতে গেলেই বলবে, দেয়া গরজন। কাউকে ডাক দিলেই বলবে, দেয়া ডাকে।

তোমার রাগ হয় না?

রাগ হবে কেন, সবাই তো বন্ধু। ওরা নামটা নিয়ে একটু আনন্দ করে বই তো নয়।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার মনটাকে বিধাতা যখন তৈরি করেন তখন একটা জিনিস দিতে ভুলে গেছেন।

কি জিনিস?

তুমিই বল।

দেয়া একটুখানি ভাবনার ভঙ্গি করে বলল, নুন।

নুন কেন?

এক ফোঁটা গুণ নেই কোথাও।

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, না না তা হবে কেন, বিধাতা গড়ার সময়ে তোমার ভেতর রাগ বলে কোন পদার্থই দেন নি।

ইন্দ্র এতক্ষণ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দুই নারীর পরিচয় পর্বটা নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। সে তার বৌরানীকে ভাল করেই চেনে। অপরিচিত জনের সঙ্গে মুহূর্তে আলাপ জমিয়ে নিতে ওস্তাদ। তাদের এই পিতৃপুরুষের বিশাল বাড়িখানাতে যে শোক-দুঃখ ইট-কাঠ-পাথরের মত ভারী হয়ে আছে তা তার বৌরানীর বুকখানাকে ভেঙে দিয়ে গেলেও মুখের হাসিতে তার কোন চিহ্নই মেলে না। দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পরে যখন চারদিকে বুক খাঁ খাঁ করা এক শূন্যতা তখন বৌরানী তার বাইরের শোক

ঝেড়ে ফেলে দিযে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, আমার বলতে তুমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই ইন্দ্র। তুমি অবুঝ হয়ো না। অনেক দিন ইউনিভারসিটি যাওয়া বন্ধ করেছ, আর নয়। তুমি তো পড়েছ কাশ্মীর থেকে লেখা দাদার শেষ চিঠি। আদ্ধেকখানা জুড়ে কেবল তোমারই কথা। কেমন পড়ছ, শরীর ভাল যাচ্ছে কিনা, এমনি হাজারটা প্রশ্নে ভরা। তাঁর আত্মাকে সুখী কর ইন্দ্র। আজ থেকে আমার শোকে তুমিই সান্ত্বনা।

ইন্দ্রের চোখও সেদিন শুকনো ছিল না। সে বৌরানীর একখানা হাত চেপে ধরে রেখেছিল। কোন কথা বলে তার বুকের ব্যথাটাকে লঘু করতে পারে নি। সেদিন রাতের বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে নি তাব চোখে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বার বার, দাদা আর বৌরানীর ইচ্ছা সে পূর্ণ করবে। সে পড়াশোনায় খাবাপ নয় কোনদিনই, তাই খুব ভাল একটা রেজাল্ট করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

যেদিন ইংরাজীতে সে একটা ফার্স্ট ক্লাস পেল সেদিনকাব স্মৃতি আজও ইন্দ্রের মনে উজ্জ্বল। বৌরানী ওর মুখে খবরটা পেয়েই ওর হাত ধরে দাদার ফটোর কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আশীর্বাদ চেয়ে নাও ইন্দ্র। আজ ওঁর আত্মা সবচেয়ে খুশি হবে।

ইন্দ্র দাদার ফটোতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর বৌরানীর পায়ের ধুলো নিতে যেতেই বৌবানী দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেদিন বেশ কিছু সময় আবেগে দুজন কথা বলতে পারে নি।

এক সময় বৌরানী তাকে ঘরে বসিয়ে রেখে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে এল। পাশে বসিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, এত ভাল রেজাল্ট করলে, আমাকে তুমি কি দেবে ইন্দ্র?

হঠাৎ ইন্দ্রের মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। সে অমনি বলল, তোমাকে আমি কাশ্মীরে নিয়ে যাব বৌবানী। দাদা যেখানে তার শেষ দিনগুলো ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে সেখানে আমরা ঘুরে বেড়াব। দাদার চোখ দিয়ে সব কিছু দেখার চেষ্টা কবব।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বৌরানী বলেছিল, তাই হবে ভাই।

এবাব ইন্দ্রের পালা। ইন্দ্র বলল, আমার পাওনাটা বাকি।

বৌবানী সাগ্রহে বলেছিল, বল কি চাই? আজ তোমারই তো পাওনার দিন।

আমি কোন চাকরিতে যাব না বৌরানী।

হেসে বলেছিল বৌরানী, তোমাকে চাকরিতে যাবার জন্যে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে।

আর একটি প্রার্থনা।

বল?

পেছনের হলঘরে দাদার নামে কলেজের ছেলেদের জন্যে একটা ফ্রি রিডিং রুম করতে চাই।

খুব খুশি হলাম।

আমার তৃতীয় আর শেষ প্রার্থনা মঞ্জুর হোক।

বল?

আমি নিজে আমাদের এই বাড়ির নিচেব তলাতেই একটা বইয়ের দোকান চালাতে চাই। ইংরাজী, বাংলা সব রকম ভাল বই স্টক করে বিক্রি করব আর অবসর সময়ে ঐ বই পড়ে পড়ে সময় কাটাব।

বৌবানী মুখের হাসি ঠোঁটে চেপে রেখে বলল, আমাব কোন আপত্তি নেই ভাই, কিন্তু মেয়ের বাবা আপত্তি করবে।

তাব মানে?

মানেটা খুব সোজা। শুধু কাউন্টারে বই বিক্রি করে রায়বাহাদুর হরবল্লভের নাতি, এ কথা জানার পর স্বনামধন্য শ্বশুরমশায়রা সবে পড়বেন।

ভারী বয়ে গেছে। বিয়ের জন্যে আমি তো মরে যাচ্ছি। ওসব কথা বাদ দাও, এখন দয়া করে বল, তুমি মন খুলে আমায় অনুমতি দিচ্ছ কিনা?

একটু সময় ভেবে নিয়ে বৌরানী বলেছিল, বেশ তাই হবে। কিন্তু পথের ধারে হলেও পথটা গলি। কাছেপিঠে আর কোন বই-এর দোকান নেই। খদ্দের জুটবে তো?

ভাল ভাল ইংরাজী বাংলা বই রাখব বৌরানী। এদিকে পড়ুয়া লোকেদের বাস। দু'চারটে কলেজ আছে। একটু দূরেই যাদবপুব ইউনিভাবসিটি।

তবে স্টার্ট করে দাও। খদ্দের না জুটুক, নিজেব চর্চাটা তো হবে।

ভাবনা নেই বৌরানী। তোমার মনের মত বই পড়াব।

সেই থেকে সাবা দুপুর আব সন্ধ্যে সাতটা অব্দি ইন্দ্র তার ছিমছাম সুন্দর ছোট্ট দোকানটিতে হাজিরা দেয়। বাইবের শো-কেসটিকে সে মনের মত বই দিয়ে সাজিয়ে রাখে। বিশিষ্ট ক্রেতারা সন্ধ্যের দিকে আসে ইন্দ্রের দোকানে বই কিনতে। তাবা ইতিমধ্যেই ছোট্ট দোকানটির ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দ্র দুপুরের অবকাশটিতেই খুশি হয়ে ওঠে। এ সময়ে গলির ভেতর বড় একটা কেউ হাঁটাহাঁটি করে না। দু'চারটে ফিরিওলা বিচিত্র ডাক ডেকে যায়। ডান দিকেব বড় রাস্তায় মাঝে মাঝে গাড়ির গর্জন শোনা যায়। কিন্তু শুনতে শুনতে শব্দেব ধার এখন অনেক ভোঁতা হয়ে এসেছে। একটা মনের মত বই হাতে তুলে নিলে কোন শব্দই আর তখন ইন্দ্রের কানে এসে বাজে না।

এমন এক দুপুরে দেয়াকে সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল। চাই জাম, জামরুল। গলির ভেতর হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছিল ফেরিওয়ালা। জামেব ওপর এক ধরনের অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে ইন্দ্রের। বই পড়াব সময় সব রকম আওয়াজকেই তাব কান রুখে দেয় কিন্তু ঐ 'জাম' শব্দটির অবাধ অধিকাব আছে অন্তঃপুরে প্রবেশের। ইন্দ্র ঠিক শুনতে পায় আর অমনি জাম কেনার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেদিনও গ্রীষ্মের ভরদুপুরে ডাকটা শুনে সে কাউন্টারে বইটা রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু জাম কেনা তার আর হল না। চোখ গিয়ে পড়ল গলির দিকে ঝুঁকে-থাকা শো-কেসটার ওপর। একটি শ্যামলা মেয়ে নিবিষ্ট হযে শো-কেসের বইগুলো দেখছিল। তার নিজের হাতের ভেতরেও ছিল দু'চারখানা বই আব খাতা। ভারি মিষ্টি মুখখানা। এক দৃষ্টিতেই চোখে পড়ার মত। হঠাৎ ইন্দ্রের সঙ্গে চোখাচুখি হতেই মেয়েটি কেমন যেন অপ্রতিভ হযে পড়ল। কিন্তু কিছু সময়ের ভেতবে নিজেকে সামলে নিয়ে কাউন্টারের সামনে উঠে এল।

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' বইখানা একটু দেখাবেন?

ইন্দ্র কোন কথা না বলে সেলফ্ থেকে বইটা পেড়ে এনে কাউন্টাবে মেয়েটির সামনে রেখে দিল তরুণী সঙ্গে সঙ্গে পাতা ওলটাতে লেগে গেল।

কি কাবণে সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হযে গিয়েছিল। তাই ফেরাব পথে দুপুবেই দু'দশজন খদ্দেব এসে ভিড় জমাল। তাদের অ্যাটেণ্ড কবতে গিযে সাময়িকভাবে মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিল ইন্দ্র। আবার কাউন্টার ফাঁকা হযে যেতেই মনে পড়ল তার মেয়েটির কথা। ইন্দ্র দেখল মেয়েটি এখন কাউন্টারের এক কোণে সবে গিযে দাঁড়িযেছে। হুঁশ নেই তার। বইযের পাতায় চোখ দুটো জড়িয়ে আছে আঠার মত।

এক সময় মেয়েটি চোখ তুলল। বড় বড় চোখ দুটোতে কেমন যেন বাদলছাযা ঘনিয়ে উঠেছে পবক্ষণেই লজ্জায় নত হল চোখ দুটো। এতক্ষণ কাউন্টাবে দাঁড়িয়ে নির্বিষ্ট হয়ে বই পড়া তার ঠিক হয় নি।

ইন্দ্র কিছু না বলে এগিয়ে গিয়ে বলল, দেব বইটা?

মনে হল দারুণ বকম সঙ্কুচিত হযেছে মেয়েটি। সে অসহাযেব মত ইন্দ্রের দিকে চেয়ে সলজ্জ এক টুকরো হাসি ফুটিযে মাথা নাড়ল। এই মুহূর্তে বই নেবাব সাধ থাকলেও সাধ্য নেই তার।

আপনি কিছু মনে করবেন না, এখুনি বইটা নিতে পারছি না।

মেয়েটি যে বই ভালবাসে তা বুঝতে পেরেছিল ইন্দ্র। না হলে কেউ এত সময় চারদিকের পরিবেশ ভুলে বইতে ডুবে থাকতে পারে না। ইন্দ্র মেয়েটির কথার পিঠে কথা রেখে বলল, না না, মনে করার কি আছে, সব বই কিনতে হবে এমন কোন কথা নেই। তা বলে পড়ে দেখতে দোষ কি।

আচ্ছা নমস্কার। আবার একদিন আসব।

সেদিন দেরা আর দাঁড়ায় নি। বোধ হয় নিজেব সঙ্কোচটুকুব ভাব সে আব বইতে পারছিল না।

কয়েকদিন পরে আবার এসেছিল দেয়া ইন্দ্রের কাউন্টারে। সেদিন তার মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল চাপা এক ধরনের তৃপ্তি আর উত্তেজনায়।

ঐ ইছামতী বইখানা দিন তো।

ইন্দ্র জানে বইটা কোথায় আছে। তবু একটা দুষ্টুমি তার মাথায় খেলে গেল।

ইস, বইটা তো এক ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গেলেন কাল। আপনি যদি সেদিন বলে যেতেন তাহলে আমি বইটা আপনার জন্যে তুলে রাখতাম।

সত্যি আমি বলে যেতে ভুলে গেছি। আপনি কি আর একখানা আনিয়ে রাখতে পারবেন? আমি আজ টাকা রেখে যাচ্ছি।

না, তার আর দরকার হবে না। আপনি কাল পরশু যেদিন আসবেন পেয়ে যাবেন।

দেয়া ঘাড়খানা ঈষৎ কাৎ করে বলল, ঠিক তো?

হেসে ফেলল ইন্দ্র, খদ্দের আমাদের লক্ষ্মী, তাঁকে তুষ্ট করতে না পারলে ব্যবসাই অচল।

দেয়া ইন্দ্রের কথা বলার ঢঙ দেখে হাসি চাপতে পারল না। সেও বলল, সরস্বতীর ঘরে লক্ষ্মীর এত একটা যাতায়াত আছে বলে তো শুনি নি।

কেন বলুন তো?

দু'বোনে শুনেছি বড় একটা ভাব সাব নেই।

কথাটা ঠিক। তবে একটা জায়গাতে কি জানি কেন দুটো বোনে হাত ধরাধরি করে বসেন।

দেয়া অমনি বলল, এখানে বোধহয় দু'জনের খেলাধুলোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

সেদিন আর দাড়ায় নি দেয়া। কথার পিঠে কথা অনেকদূর এগিয়েছে। ওর স্বাভাবিক সংকোচ আর সম্ভ্রম ওকে প্রগলভ হতে বাধা দিয়েছে। কেবল যাবার সময় বলেছে টাকাটা খরচ হয়ে যাবার আগে যেন বইটা পাই।

ইন্দ্র হাতটা তুলে বলেছিল, নির্ঘাৎ পেয়ে যাবেন।

ঠিক পরের দিন কিংবা তার পরের দিনটিতেও আসে নি দেয়া। নিজেকে ক'টা দিন একটু সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অদম্য একটা ইচ্ছা তাকে তাড়া করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ঐ ছোট্ট সুন্দর কাউন্টারটার সামনে কিন্তু নিজের ইচ্ছাটাকে শাসন করে সে সংযত করে রেখেছিল। কি ভাববে ছেলটি? এত তাড়াতাড়ি গেলে যদি ভেবে বসে, তার সুঠাম সুন্দর চেহারাখানার অতিরিক্ত আকর্ষণে সে গিয়ে পড়েছে। বই কেনা একটা ছলনা। তাহলে সত্যি লজ্জা ঢাকবার জায়গা থাকবে না তার।

তৃতীয় দিনে সে দুপুরের দিকে না গিয়ে একটু দেরি করেই গেল। ঠিক সন্ধ্যে নামে নি তবে গলিতে কর্পোরেশনের আলো সবেমাত্র জ্বেলে দিয়ে গেছে বাতিওলা। দু'চারজন খদ্দের দাঁড়িয়ে ছিল কাউন্টারে। দেয়া গিয়ে দোকানের এক কোণে দাঁড়াল। খদ্দেরকে বই দেবার ফাঁকে দেয়াকে আড়চোখে একবার দেখে নিল ইন্দ্র। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে আগেভাগে তাকে অ্যাটেন্ড করল না। তিন তিনটে দুপুর প্রতীক্ষায় কাটানোর পর যে এল অসময়ে তাকে সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। থাক একটু দাঁড়িয়ে। কাটুক না এই ভিড়ের পর্বটা।

কিন্তু আরও একদল ক্রেতা এসে গেল। রীতিমত রাগ হচ্ছিল ইন্দ্রের মেয়েটার ওপর। কেন বাপু, দুপুরে এলে ক্ষতিটা কি ছিল? তখন তো হাত পা গুটিয়ে বসেছিলাম।

একবার ইন্দ্র কাউন্টারের কোণায় গিয়ে চাপা গলায় দেয়াকে বলল, খুব তাড়া?

একটু হেসে মাথা নাড়ল দেয়া। এমন কিছু তাড়া নেই তার।

আরও কয়েকজন এসে পড়ল। ইন্দ্র তার ছোট্ট কাউন্টারে একা। হিমশিম খাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, সারা দেশটা একদিনেই দেখছি অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে ফেলবে। আবার মনকে শাসন করছে পরক্ষণে, ছি ছি একি ভাবছি আমি। খদ্দের ব্যবসায়ীর লক্ষ্মী। তাদের সম্বন্ধে আজেবাজে ভাবতে আছে? তাছাড়া দোকান যখন করেছি তখন নিষ্ঠার সঙ্গে দোকানের কাজ চালাতে হবে বই কি।

এক সময় খদ্দের অ্যাটেন্ড করার ফাঁকে ইন্দ্রের মনে হল মেয়েটি সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে, ওর জন্যে একটা কিছু করা দরকার। অমনি ইন্দ্র ইংরাজী কোটেশানের একটা ছোট্ট সচিত্র বই সেলফ্

থেকে টেনে নিল। 'Springs of Love' নিয়ে দেয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, সত্যি আপনার অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি, ভারি খারাপ লাগছে। আর একটুখানি কষ্ট করুন।

ইন্দ্র ছোট্ট বইখানা ওর সামনে ফেলে দিয়ে বলল, ততক্ষণ চোখ বোলান।

দেয়ার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ছুটল ক্রেতাদের কাছে। দেয়া যেন ইন্দ্রের কাছে কোন ক্রেতাই নয়।

এক সময় ফাঁকা হয়ে এল কাউন্টার। ইন্দ্র আড়চোখে দেখল, দেয়া বিদেশী প্রেমের কবিতার বইটাতে ডুব দিয়েছে। মেয়েটি সত্যিকারের পড়ুয়া। বই পেলেই হল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ডুব দেবে তার ভেতর।

ইন্দ্র দেয়াকে ডিসটার্ব না করে একখানা এক্সারসাইজ বুকে হিজিবিজি কাটতে কাটতে ওকে দেখতে লাগল। মুখখানা সত্যিই মিষ্টি। পাতলা ঠোঁট, ভাঙা চিবুক, সুন্দর নাক। শ্যামলা রঙে উগ্রতা নেই, এক ধরনের স্নিগ্ধ লাবণ্য মাখান আছে।

বড় অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। একটি তরুণীকে কিছু সময় কাছে পাবার লোভে আটকে রাখার ভেতব আর যাই থাক, খুব একটা রুচির প্রকাশ নেই। ইন্দ্রের মনে কথাটা জাগামাত্রই সে 'ইছামতী' বইখানা নিয়ে দেয়ার কাছে গিয়ে বলল, এতক্ষণ সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। নিন আপনার বই। ক্যাশমেমো সে কেটেই রেখেছিল। সেটাও হাতে ধরিয়ে দিল।

দেয়া ব্যাগ খুলে টাকাটা বের করে দিতে দিতে বলল, আপনার এই ছোট্ট বইখানা কিন্তু খুব লোভনীয়।

দেব ওটা এইসঙ্গে?

না না,—হেসে উঠল দেয়া। সব লোভনীয় জিনিস কেনার ক্ষমতা সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথেরও কি আছে?

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক। আর কি দাম করেছে দেখুন না। পাঁচ বাই সাড়ে তিন ইঞ্চি সাইজের চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার বইখানার দাম রেখেছে পনের শিলিং।

দেয়া বলল, বাঃ, এ কি কথা বলছেন! কেবল পাতা বেশি থাকলেই কি দামটা বেড়ে যাবে? তাহলে তো পঞ্জিকা অথবা ঢাউস একখানা নোট বইয়ের দাম সব চেয়ে বেশি হবার কথা।

ইন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে সারেণ্ডার করল, কথাটা ঠিক। তবে আমাদের দেশে এত অল্প পাতার বই এত বেশি দামে কেনার খদ্দের বড় কম।

দেয়া অমনি বলল, যে বইয়ের খদ্দের নেই তেমন বই রেখেছেন কেন? এতে তো আপনার ব্যবসার ক্ষতি।

লাভলোকসানের হিসেব খতিয়ে কি সব সময় ব্যবসা করা যায়?—মুখে মিষ্টি হাসি টেনেই বলল ইন্দ্র।

দেয়া বলল, ব্যবসায়ী নই আমি, এসব আলোচনা আমার মানায় না।

ইন্দ্র বলল, এ কথা থাক, এখন বলুন কবিতার সংকলনটা কেমন করেছে?

দু'চারটে উলটে পালটে দেখেছি, সব নয়। এটুকু বলতে পারি, দারুণ পরিকল্পনা।

ইন্দ্র বলল, না কেনেন ক্ষতি নেই। প্যাক করে দিচ্ছি নিয়ে যান বইখানা। এক সময় এসে ফেরত দিয়ে গেলেই চলবে। তবে ভাল করে পড়ে মন্তব্য করে যাবেন।

হেসে ফেলল দেয়া। বলল, এতে কি আপনার বই বিক্রি বাড়বে?

অন্ততঃ সান্ত্বনা পাব, কিনে একেবারে ঠকে যাই নি। দু'চারজনকে পড়াতে পেরেছি।

আপনি পাকা ব্যবসায়ী কখনও হতে পারবেন না।

মানছি আপনার কথা। আমি লাভ চাই না, লোকসানটা না হলেই ব্যবসা চালাতে পারব।

দারুণ এক ঝলক হাসিকে খুব জোর চেপে গিয়ে দেয়া বলল, তা হলে ব্যবসা করে লাভ? সামান্য লাভেরও যদি একটা আশা না থাকে তাহলে দোকান খুলে বসার অর্থ?

মনে মনে বলল ইন্দ্র, আপনাদের মত দু'চারজন বুক-লাভারের পায়ের ধুলো পড়বে বলে। মুখে

বলল, ক্ষতি না হলেই আমি বাঁচি। কথাটা কি জানেন, চাকরি বাকরি নেই কোথাও, তাই একটা কিছুতে নিযুক্ত থাকা। বসে বসে বই পড়েও তো সময়টা কাটবে।

দেয়া বলল, বই কিনতে এসে কিন্তু আমার অনেক অভিজ্ঞতা হল।

কি রকম?

নতুন ধরনের বুক সেলারকে দেখলাম।

সেদিন দেয়া আর দাঁড়ায় নি। একজন নতুন ক্রেতা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে পরে একদিন বইটা ফেরত দিয়ে যাবে বলে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েকদিন পরে ঠিক দুপুরে কলেজ থেকে এক ফাঁকে বেরিয়ে ইন্দ্রের দোকানে চলে এসেছিল সে।

পথ থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে সে দেখল, বুকসেলারের খদ্দেরের দিকে চোখ নেই। নিবিষ্ট হয়ে কি যেন একখানা ঢাউস ইংরাজী কিতাব পড়ছে।

দেয়া দেখল ছেলেটির শুধু স্বাস্থ্যের সম্পদই নয়, চোখে মুখে শিক্ষারও একটা শ্রী আছে। এই মুহূর্তে ইন্দ্রের মগ্নতাটুকু ভারি ভাল লাগল তার।

গলির ভেতর দিয়ে কর্পোরেশনের কি একটা গাড়ি ঘড়ঘড়িয়ে চলে যেতেই ইন্দ্রের নিবিষ্টতা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ল দেয়ার ওপর।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কখন এলেন?

দেয়া বলল, যতক্ষণ এসেছি, সারা দোকানের বইগুলো ততক্ষণে হাত-সাফাই করে নিয়ে যেতে পারতাম।

ইন্দ্র হেসে বলল, আমার সব সিলেক্টেড খদ্দের। তাই নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে বসে থাকি।

হাতে কি বই?

ও, এটার কথা বলছেন? হাওযার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস'। পড়েছেন?

বাংলা অনুবাদটা পড়েছি।

ইন্দ্র বলল, বইখানা সত্যি অসাধারণ। অত্যাচারিত মানুষের হাতে যেন একখানা ঝকঝকে হাতিয়ার।

দেয়া যোগ করল, জানেন, বইখানা পড়ার পর কয়েকটা রাত আমি ভাল করে ঘুমুতে পারি নি। কেবল যুদ্ধের ছবি দেখেছি। এক রাতে ক্রুশবিদ্ধ মানুষগুলোর সারি সারি মূর্তি স্বপ্নে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলাম। বাবার জোর নাড়া খেয়ে ধাতস্থ হই।

ইন্দ্র হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলল, আপনার মা বাবা দু'জনেই আছেন?

না, পাঁচ বছর বয়েসে মাকে হারিয়েছি। সেই থেকে দুটো ভূমিকাই বাবার।

কিছু যদি মনে না করেন, আপনার বাবার চাকরি না ব্যবসা?

দুটোর প্রায় কোনটাই না।

তবে?

আমার বাবা গরিতকার। আর সেটারও বটে।

ইন্দ্র বলল, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন, কিছু বুঝলাম না।

আমার বাবা সোনার ফ্রেম তৈরি করে তার ওপর সেটিং-এর কাজ করেন।

তাহলে ব্যবসায়ী বলুন?

না। সোনার দোকানের মালিক হলেন ব্যবসায়ী। আবার বাবা তাঁদের গয়না তৈরির প্রধান কাজটা করে দেন। বিনিময়ে কিছু পান।

শেষের কথাটা বলার সময় দেয়ার গলাটা যেন চাপা একটা বেদনায় বুজে এসেছিল।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, এখন বলুন, Springs of Love-এর কোটেশানগুলো কেমন লাগল?

নির্বাচনটা খুব ভাল হয়েছে।

ইন্দ্র বলল, দুপুরে প্রায় কোন ক্রেতাই থাকে না। আমি চুপচাপ বসে বই পড়ি নয়ত এই ছোট ছোট ইংরাজী কবিতাগুলোর বাংলা তর্জমা করি।

আপনি কবিতা লেখেন?— বেশ খানিকটা বিস্ময়ের সুর দেয়ার গলায়।

আরে না, না, ওসব একেবারেই নয়। দু'চার ছত্র অনুবাদ করেছি কখনো-সখনো।

দেয়া অমনি বলল, এ বইটা থেকে করেছেন?

তিন চার দিন আগে একটুখানি চেষ্টা চালিয়েছিলাম। বোধহয় হাস্যকর।

আপত্তি না থাকলে একটু শোনাবেন?

ইন্দ্র ড্রয়ার টেনে একটা খাতা বের করে এগিয়ে দিল দেয়ার দিকে। বলল, একটা শর্তে পড়তে দিতে পারি।

দেয়া কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে রইল।

ইন্দ্র বলল, আপনি পড়বেন, কিন্তু হাসবেন না। অবশ্য মনে মনে যত খুশি হাসতে পারেন, বাধা নেই।

দেয়া ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, আগে হেসে নিলাম, দোষ ধরবেন না যেন।

এখন খাতার পাতায় চোখ রাখল দেয়া। একবার মূল ইংরাজী ছত্রগুলো মনে মনে পড়ে নিল, তারপর খাতার পাতায় চোখ চালিয়ে গেল।

এক সময় ইন্দ্রের দিকে চোখ তুলে বলল, কি দারুণ অনুবাদ করেছেন আপনি। সত্যি কবি না হলে এমন কাজ করা সম্ভব নয়। এই যে এই কবিতাটা।

ভালবাসা এক সুন্দর পানপাত্র,
পিপাসার পানীয় ততটুকুই পান কবতে পাবব
যতটুকু আমরা তার ভেতরে ঢেলে রাখব।
ঐ জলপাত্রে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পড়েছে তাবাদেব;
না, না, ও তো তারা নয়,
ও যে আমাদেরই মুগ্ধ চোখের চাওয়া।

আর এটা দেখুন, কি ভাল, কি ভাল—

ভালবাসার যন্ত্রণা
কি আশ্চর্য অনুভূতি,
যা ছাড়িয়ে যায়
পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকে।

এই হল পরিচয়ের সূত্রপাত। সাধারণ ঘরের মেয়ে দেয়া, কিন্তু দারিদ্র্য হরণ করতে পারে নি তার মনেব ঐশ্বর্যকে। কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস আছে তার মনের মধ্যে যা অভাবী সংসারের গ্লানিগুলোকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়।

দেয়ার বই কেনার সামর্থ্য যত কম, ওর পড়ার আগ্রহ তত বেশি। এই কিছু দিনের যাওয়া আসার ভেতর এ সত্যটুকু জেনে ফেলেছে ইন্দ্র। তাই সে বিনি পয়সায় বই পডার একটা সুযোগ করে দিয়েছে দেযাকে। অবশ্য দেয়ার আত্মসম্মানে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে ষোল আনা লক্ষ্য রেখেছে ইন্দ্র। দু'চার দিন অন্তর অন্তর দুপুরে বসে তাদের আলোচনা-চক্র। উভয়ের পড়া যে কোন একখানা বই নিয়েই চলে তাদের আলোচনা। কখনো একমত, কখনো আবার ভিন্ন মত। তাতে কি এসে যায়। একটা উজ্জ্বল উত্তেজনার আলো দু'জনের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দেয়ার চলে যাবার সময় দু'জনেই খুশি হয়ে ওঠে। আবার আলোচনা-চক্রে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হয় দেয়াকে। এমনি করে দেয়া আর ইন্দ্রের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অলিখিত বন্ধন। কিন্তু দু'জনের ভাললাগাকে তারা আজও কোন কথার বাঁধনে বাঁধতে পারে নি।

সেদিন এমনি এক দুপুরে ইন্দ্রের বইয়েব দোকানে এসেছিল দেয়া। এসেই তাকে কিছুক্ষণের ভেতর আকস্মিকভাবে মুখোমুখি হতে হল ইন্দ্রের বৌরানীর সঙ্গে। কাউন্টারের পেছনের ভেজান দরজাটা খুলে হঠাৎ তিনি এসে দাঁড়ালেন। বিস্মিত দেয়া, অপ্রস্তুত ইন্দ্রও। কিন্তু ভদ্রমহিলা মিষ্টি গলায় কথা বলতে

লাগলেন দেয়ার সঙ্গে। কেটে গেল দেয়ার আড়ষ্টতা। সেও সহজ ভঙ্গীতে টুকরো টুকরো উত্তরপ্রত্যুত্তরে মেতে উঠল।

ইন্দ্র কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠল। দেয়া এখন দোকান ছেড়ে চলে গেলেই যেন সে বাঁচে। কি কথায় কি কথা আবার বেরিয়ে পড়বে, কে জানে। বৌরানী যে রকম বুদ্ধিমতী 'ফু' বললেই 'ফুলশয্যা'র গন্ধটি পেয়ে যান।

এক সময় দেয়া আর বৌরানীর কথার ভেতব এগিয়ে এল ইন্দ্র। খামোকা দেয়ার হাতে ধরে থাকা বইখানাব দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নেবেন নাকি বইটা?

হকচকিয়ে গেল দেয়া। বেচারা ফেরত দিতে এসেছিল বইখানা। ইন্দ্রের কথার একটা জবাব দিতে হয়, তাই সে বলল, দু'দিন রাখতে পারবেন বইটা। আমি তরশু যে কোন এক সময়ে এসে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র মুখে কপট গাম্ভীর্য টেনে এনে বলল, চেষ্টা করব তবে কথা দিতে পারছি না। যদি কাস্টমার খোঁজ করে তাহলে ফিরিয়ে দিতে পারব না। অবশ্য দু'চার দিন পরে আবার পেয়ে যাবেন।

দেয়া এবাব পরিষ্কার বুঝতে পারল, ইন্দ্র তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে। সে বৌরানীর দিকে মিষ্টি চোখে চেয়ে দু'হাত তুলে নমস্কার কবল।

বৌরানী বললেন, তোমার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়ে খুব ভাল লাগল ভাই। থাক কোথায় তুমি?

২৫/১২ বি, ডোভার লেন,

প্রায় কাছেই।

হ্যাঁ। এই পাঁচ মিনিটের পথ।

দেয়া কাউন্টাব ছেড়ে গলিতে নেমে ধীবে ধীরে হেঁটে চলে গেল।

অনেক রাতে বাসায় ফেবেন বিপ্রদাস সামন্ত। বিয়ের মরশুমে কাজের চাপে থাকলে সেটিং-এব গযনা বানাতে গিয়ে রাত ভোর হয়ে যায়। উপায় নেই, যথা সময়ে কাজ তুলে দিতে হবে। বিয়ের গযনা ঠিক লগ্নে গায়ে তুলে দিতে হবে মেয়ের। অসম্ভব চাপ কাজের। এক একটা সেটিং-এর নেকলেস তৈবি করতে কোন্ না মাস দেড়েকের মেহনত। হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। কাজে মন বসেছে কি ঝুপ করে নিভে গেল আলো। ঠায় বসে থাক অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক গলদঘর্ম হয়ে। এ সময়টায় কাবখানা ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে কিন্তু বিপ্রদাস নিতান্ত দরকার না পড়লে বেরোন না। প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছবেব কর্মী তিনি। উনিশশো চল্লিশ সনে এই 'ভদ্র জুয়েলার্স'-এ তিনি ফুড়নে একটি কাজ করে দেন। তখন মালিক ছিলেন বড়বাবু রত্নেশ্বর ভদ্র। কাজটা দেখে জহুরী বড়বাবু জহর চিনেছিলেন। এ শিল্পীকে পাঁচ জায়গায় কাজ করতে দেওয়া চলবে না। তিনি তরুণ বিপ্রদাসকে নিজের কারখানায় নিযুক্ত করেছিলেন মাস মাহিনায়। সেই থেকে আজ অবধি একই কারখানার বাঁধা কর্মী তিনি। মাহিনা বেড়েছে যত, কাজের চাপ বেড়েছে তার দ্বিগুণ। নতুন কর্মচারীরা কাজ-ফাঁকির ফাঁক-ফোকর সম্বন্ধে একেবারে বপ্ত। কিন্তু পুরোনো দিনের কাজপাগল মানুষ বিপ্রদাসবাবু দম ফেলার ফুরসতই পান না। মনে আছে, ছোটকর্তা পান্নালাল ভদ্র ওরফে পানুবাবুর বড় মেয়ের মুখেভাত। বড়কর্তা রত্নেশ্বরবাবু ভাইঝির জন্যে মুকুট তৈরি করতে দিলেন। পনের দিন খেটে যে মুকুট তিনি তৈরি করে দিলেন তার জুড়ি মেলা ভার। ভদ্র পরিবারের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন হই হই করে উঠলেন মুকুট পরা মেয়েকে দেখে। শতমুখে তারিফ করলেন মুকুটের। কয়েকদিন পরে ভদ্রদের ড্রাইভার কুবের চুপি চুপি বলল, আপনার দুটো ইনক্রিমেন্ট হবার কথা ছিল, কিন্তু আপনাকে দিতে গেলে অন্য কর্মচারীদের ভেতর গোলমাল পাকিয়ে উঠবে তাই কথাটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। অবশ্য মুকুট তৈরির কৃতিত্বের জন্যে বকশিশ মিলেছিল তাঁর।

কত দিনের সব কথা। বড়কর্তা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ট্রোকে মারা গেলেন। ছোটকর্তা পানুবাবু হলেন মালিক। পানুবাবুর সেই ছোট্ট মেয়েটির একদিন বিয়ে হল। মেয়ের বিশেষ বায়না, বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আব কারুর তৈরি গয়না সে অঙ্গে তুলবে না। আর সে গয়নার ডিজাইন থেকে শুরু করে সব কাজ করতে হবে তাঁকে নিজের হাতে। তাই করেছিলেন তিনি।

বিয়ের আট বছর পরে দেয়ার জন্ম। তার তিন বছর পরে কঠিন রোগে ভুগে ভুগে স্ত্রী নিরুপমা মারা গেলেন। তারপর থেকে সেই তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন বিপ্রদাসবাবু। মেয়ের কষ্ট হবে তাই দ্বিতীয় বার সংসারী হন নি তিনি। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীরা অনেক বুঝিয়েছে নতুন করে সংসার পাততে কিন্তু কানে তোলেন নি সে সব কথা। যাঁকে এনেছিলেন তাঁর প্রতি কতটুকু কর্তব্য করতে পেরেছেন তিনি? গভীর রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ডাকা আর মাসের শেষে স্ত্রীর হাতে সংসার খরচের কতকগুলো টাকা তুলে দেওয়া ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে আর কতটুকু সম্পর্ক তিনি রাখতে পেরেছিলেন? মৃত্যুর দিনটিতেও দেরি করে ঘরে ফিরেছিলেন তিনি। সে আফশোসে ভারি হয়ে আছে তাঁর অন্তর।

জীবনে কত প্রলোভন এসেছে। কত বেশি মাইনের অফার এসেছে তাঁর কাছে, কিন্তু এক জায়গায় তিনি অচল। যাঁর কাছে প্রথম জীবনে কাজ শিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, শিল্পীর চঞ্চল হতে নেই। চারদিকে নজর রাখতে গেলে নিষ্ঠা হারাতে হবে, তখন আর সাধারণ কারিগরের ওপরে ওঠা যাবে না।

গুরুর কথা আজ এতখানি বয়েসেও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন বিপ্রদাসবাবু।

বড় ভালবাসতেন তিনি ছোটকর্তার বড় মেয়ে রুমাকে। ছোট্ট মেয়েটি চড়ুই পাখির মত ফুটফুট করে ঢুকে পড়ত তাঁর ঘরে। বড় বড় চোখে ডল পুতুলের সুন্দর গড়ন মেয়েটি তাঁর হাতের তৈরি গয়নাগুলোর দিকে চেয়ে থাকত। এক এক সময় প্রতিমার গড়নের মত সুন্দর নিটোল আঙুল তুলে বলত, লাল টুকটুকে ওটা কি কাকু?

চুনি মা।

আমার হাতে একটু দেবে কাকু?

বড় শান্ত মেয়ে। তাই বড় সাইজের চুনিটা রুমার হাতে তুলে দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে, তারপর ঠিক ফিরিয়ে দেবে হাতে। কোন কোন দিন রুমা বায়নার সুরে বলত, আমাকে ঐ বালাটা দাও না কাকু, আমি পরব।

হেসে বিপ্রদাস কচি কচি দুটো হাতে বড় বড় সেটিং-এর বালা পরিয়ে দিতেন। ছোট হাতে বড় ফাঁদির বালা থাকতে চাইত না। গড়িয়ে পড়ে যেত। বিপ্রদাস আবার পরিয়ে দিতেন। রুমা এবার বালা পরা ছোট ছোট দুটো হাত ওপর দিকে তুলে রাখত। বালা গিয়ে ঠেকত একেবারে ওপরের হাতে।

বিপ্রদাসবাবু হেসে বলতেন, এ অনেক বড় বালা মা, তোমার হাতে থাকবে না।

রুমা হাত দুটোকে আরও উঁচু করে বলত, এই তো দেখ না, একটুও পড়ছে না নিচে।

ছোট মিষ্টি মেয়েটাকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন তিনি, এ বিচ্ছিরি বালা, তোমাকে বিয়ের সময়ে যা তৈরি করে দেব না, দেখে সবার তাক লেগে যাবে।

বিশ্বাস করত রুমা বিপ্রদাসবাবুর কথা। সে বালা ফেরত দিয়ে বলত, ঠিক তো?

হ্যাঁ, মামণি, তুমি দেখে নিও।

সেই রুমার বিয়েতে ক'মাস ধরে তিনি মুকুট, নেকলেস, কানবালা, মানতাসা, আংটি, সব তৈরি করে দিলেন। একেবারে নতুন পরিকল্পনা, নতুন ডিজাইন। শেষের ক'রাত ঘুম ছিল না তাঁর চোখে। নিজের মেয়ে পড়ে রইল পড়শীর হেফাজতে। ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। অনেক ছোট্ট রুমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি, নিজের হাতে তার বিয়ের গয়না তৈরি করে দেবেন। সে কথা তিনি রাখতে পেরেছেন, এতে তৃপ্তিতে ভরে গেছে তাঁর মন। ছোটকর্তা হাজার টাকা টেবিলের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দিনকাল খারাপ, চারদিকে সব মুখিয়ে বসে আছে, মাইনে বাড়াতে পারব না, এ টাকাটা রুমার দিক থেকে আপনার কাজের পুরস্কার।

বিপ্রদাসবাবু চমকে হাত দুটো ঈষৎ তুলে বলেছিলেন, ছি ছি ছোটকর্তা, রুমা মায়ের কাজ করে দিয়েছি তার জন্যে পুরস্কার নেব আমি! ও টাকা আমি ছুঁতে পারব না।

ঠিক সে সময় একটা বাসা বদলের কথা চলছিল। পুরোনো বাসাটা একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বাড়িওলা সাবাইয়ের অজুহাতে ভাড়াটে তোলার ধান্দায় ছিল। সব ভাড়াটে এককাট্টা হয়ে

প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। বিপ্রদাসবাবুও তাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল সবাই ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, কেবল তিনিই পড়ে রইলেন একা। বাড়িওলা বিলক্ষণ চেনে বিপ্রদাসবাবুকে। নির্বিরোধী মানুষ তিনি। হাঙ্গামায় যাবার মত শক্তি বা মানসিকতা কোনটাই তাঁর নেই। তাই আর সব ভাড়াটের হাতে টাকা গুঁজে তিনি যেমন ঘরছাড়া করেছেন, বিপ্রদাসবাবুর ক্ষেত্রে তা করলেন না। এই দুর্বল মানুষটির হাতে টাকা গুঁজে দেবার অর্থই হল সমূহ লোকসান। তাই বিপ্রদাসবাবুর আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে অন্যের ক্ষেত্রে যা হয় নি, তাঁকে আরও তিন মাস উঠে যাবার জন্যে সময় দেওয়া হল। কাজের ভেতর মুখ গুঁজে থাকা যাঁর স্বভাব, বাসার সন্ধানে দিনরাত ঘুরে বেড়ানো তাঁর কাছে বিড়ম্বনা। যেখানেই যান সেখানেই সেলামির প্রস্তাব। দালালদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ হল, নাকাল হলেন, সামর্থ্যের মধ্যে বাড়ি পেলেন না। শেষে কাছেপিটে একখানা ঘর আর এক চিলতে উঠোনের সন্ধান পেলেন। সেলামি দু'হাজার। অনেক কষ্টে জমানো হাজার তিনেক টাকার দু'হাজার তুলে নতুন বাসার মালিককে দিয়ে ঘরটা বুক করলেন। এই টাকাটুকু ভাঙতে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন খুব। কিন্তু ছোটকর্তা যখন রুমার গয়না গড়ার পুরস্কার বলে এক হাজার টাকা দিতে গেলেন, তখন অভাবী বিপ্রদাসবাবু তা ছুঁতে পারলেন না। সেই চড়ুই পাখির মত ছোট্ট রুমার আচরণ, বড় লাল রঙের চুনী দেখে তাকে একবার হাতে তুলে নেবার লোভ, সেই হাত দুটো ওপরে তুলে বালা দুটোকে আটকে রাখার চেষ্টা, বিপ্রদাসবাবুর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। নিজের মেয়ের গয়না গড়িয়ে দিয়ে কি পুরস্কারের টাকা নিতে পারতেন তিনি? অবশ্য নিজের মেয়েকে সেটিং-এর গয়না পরিয়ে পাত্রস্থ করার সামর্থ্য তাঁর নেই।

বিপ্রদাসবাবু যেদিন শুনলেন, রুমা বিধবা হয়েছে সেদিন চোখের জল তাঁর বাধা মানে নি। দোকান বন্ধ ছিল একদিন। বিয়ের মরশুম। শোকের সময় কোথা? তাই পরের দিন থেকেই পুরোদমে চলতে লাগল কাজ। নিরলস বিপ্রদাসবাবুর মনে হল, একদিনে সত্যিই তিনি বুড়ো হয়েছেন। কাতুরি চালিয়ে সোনার পাত কাটতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে। কোলেটের ওপর গুলি দিয়ে ঠিকমত সেটিং-এর খোচ তৈরি করতে পারছেন না। একি হল তাঁর! চোখের জলে সব যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট করে যার জন্যে গয়না গড়ে দিলেন তার এই দশা!

ছোটকর্তা ঘোরতর সংসারী মানুষ। তিনি বিপ্রদাসবাবুর ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলে পাশে সে দাঁড়ালেন। প্রথমে সান্ত্বনা দিয়ে পরে বললেন, আমরা সকলে তাঁর সংসারে কাজ করতে এসেছি বিপ্রদাসবাবু। যার যা ভবিতব্য তা ফলবেই। কোন রত্ন, কোন মাদুলী বেঁধে তাকে ঠেকান যাবে না। এই যে আমার দোকানে গ্রহরত্ন দেবার জন্যে জ্যোতিষী রেখেছি, তাঁরা রুমার ভাগ্যবিচার বহুবার করেছেন। একই ফল, সৌভাগ্যবতী হবে। সৌভাগ্যের নমুনা তো দেখতে পেলেন। তুলে দেব সব। সার বুঝেছি, ভাগ্যকে এড়াতে পারবে না মানুষ। যা হবার তা হোক, সংসারে যখন এসেছি তখন কাজ করে যেতে হবে, থামলে চলবে না। আপনি কাতর হয়ে কাজ ছেড়ে দেবেন না। বাপ হয়ে আমি যদি মনটাকে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে আপনিও নিশ্চয়ই পারবেন।

ছোটকর্তা চলে যাবার পর ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আবার নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন বিপ্রদাসবাবু। কিন্তু মনের ক্ষতটা তিনি কোন রকমেই মুছে ফেলতে পারেন নি।

বিপ্রদাসবাবুর স্মৃতিতে কত ছবি আঁকা হয়ে আছে। সে সব কি ভোলা যায়। জুয়েলারী হাউসের ওপরতলায় তিনি বসে বসে কাজ করেন। ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি আছে তাঁর পার্টিসান করা চৌখুপী ঘরের ভেতর। তাই দিয়ে তিনি দেখতে পান ডান দিকে ছোটকর্তার ঘর আর বাঁ দিকে বেলজিয়াম গ্লাশের পুরো সাইজ আয়নাখানা।

কাস্টমারের সঙ্গে ছোটকর্তা কথা বলেন। ভাল কথা বলতে পারেন তিনি। কাজের ফাঁকে কানে ভেসে আসে টুকরো টুকরো কথা।

বিশ্বাস, খালি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এত বড় দোকানখানা। আপনি একটু আগেই বললেন, আপনাদেব বহু আত্মীয়বন্ধু 'ভদ্র জুয়েলার্স' থেকে বিয়ের গয়না গড়িয়েছেন। আপনি সেই শুনেই এসেছেন আমার দোকানে গয়না গড়াতে। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল 'ভদ্র জুয়েলার্সে'র ওপর মানুষেব

বিশ্বাসের জন্য। ঐ দেখুন, কাউন্টারের ওপরে আমাদের নিক্তি। গয়না হলে আমরা আপনাদের ওজন করে দিচ্ছি। বলুন, ক'জন আপনারা ওজন বোঝেন? প্রায় কাস্টমারই বোঝেন না। কেউ চেয়ে থাকেন না বুঝে, কেউ চেয়েও দেখেন না। আমরা যা বলি তাই মেনে নেন মাথা দুলিয়ে। কেন এ কাজ করেন? 'ভদ্র জুয়েলার্সে'র ওপর বহু দিনের বিশ্বাস। আপনি হয়ত বলবেন, আমাদের দেওয়া ক্যাশমেমোটাই গ্যারেন্টি। ঐটা দেখিয়ে গয়না ফেরত দিলে আমরা টাকা দিয়ে গয়না ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। ঠিক কথা। কিন্তু বলুন তো মশাই, যাঁরা গয়না গড়ান তাঁরা কি গয়না ফেরত দেবার জন্য গড়ান? লাখে একজনও ফেরত দিতে আসে না মশাই। বিয়ের পর সব গয়না লকারের আঁধার কুঠি আলো করে থাকে। দু'দশটা বিয়েবাড়িতে কেবল তাদের বেরুতে দেখা যায়। সারাক্ষণ হালকা দু'একটা গয়নাই অঙ্গে শোভা পায়। এখন বলুন, আমি যদি ওজনে কম দিয়ে ক্যাশমেমোতে কিছু বেশি লিখে দামটা বেশি নিই তাহলে আপনার জানার উপায় কি? ওসব ঝামেলায় কেউ যেতে চান না। টাকা হিসেব করে দেন, লেশমাত্র সন্দেহ মনের মধ্যে না রেখে গয়না নিয়ে চলে যান। এটা সম্ভব হয়েছে কেন? আমাদের ওপর কাস্টমারের অগাধ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস একদিনে আমরা অর্জন করি নি, প্রতিদিন একটু একটু করে অর্জন করেছি।

কথার ফাঁকে গরমের দিনে আসে কোল্ড ড্রিংকস্, শীতে কোন কোন সময় চা। আবার কখনো বা আসে কৌটো ভরা মিঠে পানের খিলি। ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে ছোটকর্তা গুঁজে দেন টফি। কখনো বা উৎসবের দিন থাকলে বেলুন। সারাদিন অসুরের মত কাজ করেন। কিন্তু সারাক্ষণ মুখে হাসি ফুটিয়ে কাস্টমারেব সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। এইমাত্র কোন কর্মচারীর গাফিলতির জন্যে আগুন হয়ে ধমকাচ্ছেন, পরক্ষণে ফোন বেজে উঠলে মিষ্টি গলায় বলছেন,—নমস্কার, ভদ্র জুয়েলার্স।

বিপ্রদাসবাবু ভাবেন, দোকান চালান কি চাট্টিখানি কর্ম! ব্যবসায়ী বুদ্ধি, পরিশ্রম, কথা বলার কায়দা রপ্ত করলে তবে না এত বড় একখানা দোকান চালানো যায়।

হঠাৎ কোন কোন দিন চোখ গিয়ে পড়ে সামনের আয়নাখানার ওপর। তাঁর তৈরি জড়োয়ার গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী মেয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মা অথবা আর কেউ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েটি নিজেকে দেখছে। কখনো মুখে ফুটে উঠছে একটুখানি হাসি, কখনো অবাক্ হওয়া একটা চাহনি। কখনো বা গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে ভুবনজয়ী ভঙ্গী। পছন্দ হলে ছোটকর্তার কাছে এসে মাথা নেড়ে খুশীর খবর জানাচ্ছে।

এই মুহূর্তগুলোতে বিপ্রদাসবাবু অনেক কিছু পেয়ে যান। তাঁর এত পরিশ্রম, এত ক্লান্তি নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়। নতুন জীবনে প্রবেশ করবে এই অল্পবয়সী মেয়েটি। কত সাধ, কত শখ, কত উত্তেজনা! নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে সবার সামনে তুলে ধরার কত আগ্রহ। বিপ্রদাসবাবু হাতের কাজ সরিয়ে রেখে প্রার্থনা করেন—ঠাকুর, মেয়েটি যেন সুখী হয়। নতুন সংসারে সবার মনোরঞ্জন যেন করতে পারে। আশীর্বাদ কর ঠাকুর, সবার মঙ্গল কর ঠাকুর।

সেদিন ছোটকর্তার ডাকে চৌখুপী ছেড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দোতলার হলের সামনে। একটি বছর চল্লিশের মহিলা আর তাঁর মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। অবাক্ হয়ে বেশ কিছু সময় চেয়ে রইলেন তিনি।

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, চিনতে পারছেন?

বিপ্রদাসবাবু বললেন, তোমাকে চিনতে পারব না মা? মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা। মায়ের সঙ্গে এসে বিয়ের গয়নার অর্ডার দিয়ে গেলে। কোথায় কোন্ পাথরটা বসবে, কার কানে কি দেখেছ, তাই চাই। কত বায়না তোমার। তারপর গয়না পরে একদিন ঐ আয়নায় মুখ দেখলে। হাসি ফুটল তোমার মুখে। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাব্বা, যে শাসান শাসিয়ে ছিলে গয়না গড়ার আগে।

এবার আমার মেয়ের গয়না গড়ে দিন? ওদের আবার আজকালকার পছন্দ। তবে আপনার হাতে ছাড়া কোথাও গড়াব না গয়না।

বিপ্রদাসবাবু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। একেবারে মায়ের আদল। ঠিক যেন বছর বিশেক আগে এই মেয়েটিই এসে দাঁড়িয়েছিল ঐ আয়নার সামনে!

বিপ্রদাসবাবুর চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এক একটি করে গলায়,

কানে, হাতে ফুটে ওঠছে গয়না। ঝলমল করছে সারা অঙ্গ। মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল হাসি। আহা, এই হাসিটুকুই তো বিপ্রদাসবাবুর পুরস্কার!

যে কোন মেয়ে গয়নার জন্যে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেই তিনি তার গযনা পরা ছবিখানা আগেভাগেই দেখতে পান। কোন্ গলায় কি হার মানাবে, কোন্ কানে কি অলঙ্কার দুলবে, কোন হাতে কি বালা শোভা পাবে—সবই তাঁর নখদর্পণে। এ ক্ষমতা একদিনে হয় নি। দিনে দিনে সাধনার ভেতর দিয়ে তিনি তা অর্জন করেছেন। শিল্পকে ভালবাসতে হয়, কাজকে ভালবাসতে হয়, জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তবেই ঈশ্বর তৃতীয় চোখটির দৃষ্টি খুলে দেন।

সেদিন রাত হয়েছিল বাসায় ফিরতে। এমনি রাত বিয়ের মরশুমে অনেকদিনই হয়। দেয়া এতখানি রাত জেগে থাকতে পারে না, ঘুমিয়ে পড়ে। বিপ্রদাসবাবু দরজায় মৃদু টোকা দেন, তাতেই ঘুম ভেঙে যায় দেয়ার। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। তিনি ঘরে ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসেন। বাবার পাশে ঘুম জড়ানো চোখে বসে থাকে দেয়া। কতবার বিপ্রদাসবাবু বারণ করেছেন মেয়েকে এমন করে বসে থাকতে, কিন্তু দেয়া শোনে নি সে কথা। উলটে দেয়াই স্নেহের শাসন করে।

দিনদিন দেখেছ চেহারাখানা তোমার কি হচ্ছে?

বুড়ো তো একদিন হতেই হবে মা।

না বাবা, কথাটা তা নয়, এত খাটলে শরীর থাকে কি করে?

কাজ আমি ভালবাসি মা। কাজ করতে করতে শরীর চলে গেলে আমি খুব তৃপ্তি পাব।

তোমার সংসারী মানুষ হওয়া ঠিক হয়নি বাবা।

মাথা নাড়েন বিপ্রদাসবাবু। কথাটা ঠিক। স্ত্রী নিরুপমা স্বামীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য না পেয়েই সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। একমাত্র মেয়ে, তার দিকেও তিনি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারেন নি। কেবল কাজ আর কাজ। ভালবাসা, কর্তব্য সব যেন ঢেলে দিয়েছেন ঐ কাজের মধ্যে।

সেদিন অনেক রাতে বাসায় ফিরে বিপ্রদাসবাবু দেখলেন আলো জ্বলছে ঘরের ভেতর। উঠোন থেকে উঁকি দিলেন তিনি। দেয়া নিবিষ্ট হয়ে কি যেন একখানা বই পড়ছে। এত রাত তো দেয়া কোন দিন জেগে থাকে না? ভাবলেন, হয়ত কলেজের পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু এগিয়ে এসেছে, তাই রাত জেগে পড়াশোনা। তিনি চুপিচুপি এসে জানালার পাশটিতে দাঁড়ালেন। দু'চোখ মেলে দেখতে লাগলেন মেয়েকে। সেই সকাল ন'টার ভেতর নাকেমুখে কিছু গুঁজে বেরিয়ে পড়েন, তারপর ফেরেন গভীর রাতে। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখবার সময় কই তাঁর? কিন্তু আজ তাঁর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল মেয়ের ছবিটি। এত বড়টি হয়ে গেছে দেয়া! সেই ছোটবেলা থেকে সে বাবার বড় ভক্ত। নিশুতি রাতে বিপ্রদাসবাবু বাড়ি ফিরলে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে বালিকা দেয়াও জেগে উঠত। বাবার কাছে সে ঠায় বসে থাকত। মায়ের বারণ শুনত না। শেষে বাবার আদর খেয়ে মেয়ে বিছানায় ঘুমুতে যেত। সেই ছোট্ট দেয়া আজ নতুন সংসারে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। নিজের মেয়েকে বুঝি সব বাপই সুন্দর দেখে, বিপ্রদাসবাবুও তাই দেখলেন। এই মুহূর্তে তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই ছবি, যা তিনি বিবাহযোগ্যা কোন কন্যার গযনা গড়াতে এলেই দেখতে পান। তিনি দেখলেন, দেয়া বসে আছে একটি হলুদ বেনারসী পরে। শ্যামলা রঙটা হলুদ শাড়িতে বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গলায় জড়োয়ার নেকলেস, হাতে বিসলেট, কানে ঝুমকো দুল, অনামিকায় আংটি। আর, হ্যাঁ মাথায় মোহন মুকুট। মল্লিকবাবুদের রাধারানীর মাথায় যে মুকুট তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন, অবিকল সেই রকম। মুগ্ধ হয়ে নিজের মেয়েকে দেখতে লাগলেন বিপ্রদাসবাবু। দেখতে দেখতে চোখ দুটো তাঁর ঝাপসা হয়ে এল। অস্ফুটে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ক্ষীণ আবেগকম্পিত একটা আওয়াজ, মামণি, মা আমার।

ঐটুকু শব্দই দেয়ার কাছে ছিল যথেষ্ট। দরজা খুলে দিয়েছে দেয়া। সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘরে ঢুকলেন বিপ্রদাসবাবু। উদ্ভ্রান্তের মত মেয়ের দিকে তাকালেন। প্রায় নিরাভরণা। কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে তাঁর নিজের হাতে গড়া অলঙ্কারগুলি। বুক ঠেলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সেদিন যাঁর সঙ্গে কথা বললাম তিনি কে?—কৌতূহলী দেয়া ইন্দ্রকে প্রশ্ন করে।

এ বাড়ির বৌরানী।

একটা প্রশ্ন করব?

বলুন না কি জানতে চান।

এ বাড়ির মালিক কে?

বৌরানী।

এ বুক শপও তাঁর?

হ্যাঁ।

আপনাকে চালাবার ভার দিয়েছেন নিশ্চয়?

ইন্দ্র হাসিটা ভেতরে চেপে রেখে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

দেয়া এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আপনার ভাগ্য ভাল এমন মালিক পেয়েছেন।

কেন?

কেন আবার কি, এমন সুন্দর ব্যবহার পাবেন কোথা? তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

কর্মচারীকে বই পড়ার, তর্ক করার সুযোগ দিচ্ছেন।

ইন্দ্র হেসে বলল, উনি মহীয়সী।

আরও একটি প্রশ্ন।

একটি কেন, যত খুশি করতে পারেন।

উনি কি ভদ্র জুয়েলার্স-এর মালিকের মেয়ে?

চমকে উঠল ইন্দ্র, আপনি তো অনেক কিছু জানেন দেখছি!

আমার বাবা ওখানকার অনেকদিনের পুরোনো ওয়ার্কার।

ইন্দ্র বলল, সেদিন বৌরানীর সঙ্গে পরিচয়ের সময় তো মনে হল না আপনারা পূর্ব পরিচিত।

না, ওঁর আমাকে চিনে রাখার কথা নয় তবে আমি ঠিক চিনতে পেরেছিলাম।

সে কথা বললেন না কেন?

বলতে পারলাম না বলে।

সেকি, আপনি নিজেই প্রশংসা করলেন ওঁর ব্যবহারের আর পরিচয়ের কথাটা প্রকাশ করতে এত সঙ্কোচ!

আপনি ঠিক বুঝবেন না। আমি ওঁকে প্রথম দেখি ওঁর বিয়ের আসরে। নিমন্ত্রিত হয়ে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেদিনের সেই দেখার সঙ্গে আজকের দেখার অনেক তফাৎ। শুনেছিলাম, ছোটকর্তার জামাই অ্যাক্সিডেন্ট-এ মারা গেছেন, কিন্তু সামনাসামনি ওঁকে এই চেহারায় দেখব ভাবতে পারি নি। আর উনি তো আমাকে চেনেনই না। তবে আমার বাবাকে চিনতে পারেন।

আপনার বাবার নামটা আমার জানা হয় নি।

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস সামন্ত।

আপনাদের দেশ মেদিনীপুর?

কি করে অনুমানটা করলেন?

আমাদের কলেজের এক বন্ধুও সামন্ত ছিল আর তার বাড়ি ছিল মেদিনীপুর।

অনুমানটা আপনার খুব লজিক্যাল নয়, তা হলেও ঢিলটা ঠিক জায়গায় লেগেছে। আপনি কোন্ কলেজের ছাত্র ছিলেন?

প্রেসিডেন্সী।

উরে ব্বাস!—দেয়া মুখে হাওয়া টেনে একটা শব্দ করল।

কি হল, এমন করছেন কেন?

কলেজটার দারুণ নামডাক বলে।

আপনার মত অনেকের এ রকম একটা মোহ আছে। আমার কিন্তু আদপেই নেই। অনেক নামী দামী মানুষ সব কলেজ থেকেই বেরিয়েছেন।

তাহলে আপনি পড়তে ঢুকেছিলেন কেন?

দাদা ছিলেন মাথার ওপর, তাঁর ইচ্ছার বাইরে যাবার শক্তি ছিল না।

তিনি ঠিকই করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী—প্রেসিডেন্সী।

দাদা বেঁচে থাকলে আপনার এই গুণগ্রাহিতার জন্যে একটা কিছু পুরস্কার দিতেন।

দেয়া বলল, পুরস্কার আমি ঠিকই পাচ্ছি, তবে দাদার বদলে তাঁর ভায়ের কাছ থেকে।

কি রকম?

এই যে বিনি পয়সায় কত বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছি।

ইন্দ্র বলল, আমি ব্যবসাদার। বই পড়তে দি আমার নিজের স্বার্থে। পাঠকদের ভাল লাগা, মন্দ লাগাটা আমি বুঝে নি।

দেয়া বলল, আমার মত সমঝদারকে দিয়ে বই যাচাই করলে দুপুরে এমনি করে বসে মাছি তাড়াতে হবে।

ভাবছেন কেন, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় দোকানের ব্রাঞ্চ খোলা হল বলে।

দু'জনে এই রসিকতার সূত্র ধরে খুব একচোট হেসে নিলে।

হাসি থামলে দেয়া বলল, আজ কি বই নিয়ে যাব?

যা খুশি আপনার। বামে বঙ্গরানী আর দক্ষিণে বিদেশিনী।

একখানা ইংরাজী বই-ই নিয়ে যাই। নভেল পড়ার নেশায় ইংরাজীটা কিছু সড়গড় হবে।

এখন তো ইংরাজী, বাংলা কম্পালসারি নয়। কলেজ থেকে সাহিত্য পাঠ তুলে দিয়েছে।

দেয়া হেসে বলল, মরুক গে, পাসটা করলেই বাঁচি। আর যতদিন আপনার এই 'মাই বুক শপ' দোকানটা আছে ততদিন সাহিত্যের স্বাদটা পাওয়া যাবে। সত্যি নতুন কোন একখানা বই পড়া দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার।

আজ আর ক্লাস নেই আপনার?

একখানা আঙুল ওপরে তুলে দেয়া বলল, দু'পিরিয়েড বসে থাকার পর একটি ক্লাস। তাই শূন্য স্থান পূরণের জন্যে চলে এলাম।

ইন্দ্র কথা ঘোরাল, ভ্রমণের বই নেবেন?

ভীষণ ভাল লাগে। পড়তে পড়তে মনে হয় কলকাতায় আর নেই।

ইন্দ্র উমাপ্রসাদের 'গঙ্গাবতরণ' বইখানা সেল্‌ফ থেকে পেড়ে এনে দেযাব দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিয়ে যান, দুদিনের খোরাক।

দেয়া ছোট্ট বইখানা হাতে নিয়ে বলল, দু'দিন কি বলছেন, গঙ্গা অবতবণ কবতে না করতেই এক গণ্ডুষে পান হয়ে যাবে।

ইন্দ্র বলল, আপনি যে দেখছি একালের জহ্নুমুনি।

সুযোগ পেলে অগস্তের ভূমিকায়ও দেখতে পাবেন। সারা রাত জেগে ঢাউস ঢাউস বই পড়ে সমুদ্র শোষণও করতে পারি।

বাত জাগলে বকুনি খেতে হয় না?

একটুও না। বাবা ফেরেন অনেক রাতে। বিশেষ করে বিয়ের মরশুম গুলোতে। আমি কোন কোন দিন ঘুমিয়ে পড়ি, কোন দিন বা বই পড়ে রাত কাটাই।

হঠাৎ ইন্দ্রের মাথায় কি দুর্বুদ্ধি চাপল। সে ফস্ করে বলে বসল, আপনি কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছেন?

দেয়া মজা করে বলল, অনেক জায়গায়, তবে লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে।

বলুন না ঠিক করে?

বিশ্বাস করুন কলকাতার বাইরে কোথাও যাবার সুযোগ পাই নি।

একদিনের ট্যুরে কাছে পিঠে কোথাও যাবেন? এই সকাল আটটা নটায় বেরিয়ে রাত্তির নটাব ভেতব ফিবে আসা।

কথাটা বলে ফেলেই বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল ইন্দ্রের। না জানি হঠাৎ কি খারাপ ধারণা নিয়ে বসে মেয়েটি।

কিছুসময় চুপ করে রইল দেয়া। একসময় ইন্দ্রের দিকে চোখ তুলে বলল, বেশ, কবে যেতে চান বলুন?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ইন্দ্রের। সে বলল, সামনের শুক্কুর বারে।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল দেয়া।

কোথায় যাব জানতে চাইলেন না?

স্থান নির্বাচনের ভার আপনার ওপর রইল।

পথে নেমে গেল দেয়া। ফিরে বলল, শুক্রবার নটায় গড়িয়াহাট মোড়ে দেখা হবে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ইন্দ্র।

চারদিকে তাকাচ্ছিল দেয়া। অফিস টাইম শুরু হয়ে গেছে। গাদাগুচ্ছের বাস, ট্রাম, মিনি, ট্যাক্সি মানুষ বোঝাই নিয়ে কর্মক্ষেত্রের দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ির গর্জন, ঘন ঘন হর্নের তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ, দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের হঠাৎ ছোটাছুটি, সব মিলে সে এক বিপুল দক্ষযজ্ঞের আয়োজন। হরেক রকমের হাজারটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। চোখ পেতে রাখলে পড়ে শেষ করা যাবে না। দেয়া দাঁড়িয়ে আছে একটা পিলারের ছায়ার আড়ালে। ব্যাগের ভেতর সামান্য কিছু খাবার তৈরি করে ভরে নিয়েছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারা মন। কদিনের বা পরিচয়, হঠাৎ করে একটি ছেলের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে! হোক্ না মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রোগ্রাম। আবার ইন্দ্রের মুখখানা মনে পড়লেই শান্ত হয়ে আসে মন। কত কথা তারা বলেছে, বই-এর চরিত্র আর ঘটনা নিয়ে কত নিস্তব্ধ, নির্জন দুপুর আলোচনায়, তর্কে কেটেছে তাদের, কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যেও কোন অশোভন আচরণ সে দেখে নি ইন্দ্রের মধ্যে। হতে পারে বই-এর দোকানের কর্মচারী ইন্দ্র, কিন্তু তার মার্জিত ব্যবহার, কথাবার্তা, আলোচনা, যে কোন মানুষকে আকর্ষণ করে রাখবার মত। কোথায় থাকে ইন্দ্র তা এতদিন জানা হয় নি। হয়ত ছোটকর্তার মেয়ে রুমাদেবীরই আশ্রয়ে। ও বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া, থাকাটাকার সব ব্যবস্থাই হয়ত আছে ওর। আচ্ছা, এত দেরি করছে কেন ইন্দ্র। কোথায় যাবার প্ল্যান করেছে ও। ট্রেনে না বাসে যেতে হবে ওদের। ও একবার ছায়ার আড়াল থেকে সরে এসে পথের ধারে নেমে দাঁড়াল। ইন্দ্র হয়ত তারই মত একটু আড়ালে থেকে সে এসেছে কিনা দেখছে। তাই হয়ত দুজনের কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে দেয়ার কাছ ঘেঁষে একটা ঝকঝকে ফিয়েট এসে ব্রেক কষল। দেয়া একটু চমকে ওপরে উঠে দাঁড়াল। এমন আকস্মিক ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে গাড়িগুলো।

ও হরি, গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ও কে! ইন্দ্র! হ্যাঁ ইন্দ্রই তো তাকে ডাকছে। অসম্ভব রকম বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে তখন দেয়া। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গাড়ির সামনে। ইন্দ্র দরজা খুলে দিয়েছে ততক্ষণে।

চলে আসুন ভেতরে।

দেয়া গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। কলেজের বান্ধবীরা কেউ দেখে ফেলে নি তো!

গাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে ঘুরল গোল পার্কের দিকে। তারপর সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে ছুটল নিউ আলিপুরের পথে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি দেয়া। উত্তেজনার পর উত্তেজনা তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে রেখেছিল।

প্রথমে ইন্দ্রই কথা বলল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন তো?

ঘোর ভাঙল দেয়ার, না বেশিক্ষণ নয়। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আপনি এসে পড়লেন।

ইন্দ্র অভয় দিয়ে বলল, হাতে স্টিয়ারিং, সময়ের জন্যে ভাবনা করবেন না। ঠিক সময়ে বাড়ি পৌঁছে যাবেন।

দেয়া বলল, আমি এখন বাড়ির কথা ভাবছি না।

তবে কি ভাবছেন?

কিছুই না।

ইন্দ্র নিউ আলিপুরের বাঁক ঘুরে ডায়মণ্ডহারবার রোডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, কিছুই না, একি একটা কথা হল। না ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে একমাত্র পুতুল।

দেয়া মৃদু হেসে বলল, তাই ভাবুন না কেন।

তাহলে কিন্তু পুতুলটি বড় দামিই বলতে হবে।

দেয়া অন্য কথা পাড়ল, এখন বলবেন, আমরা কোথায় চলেছি?

ডায়মণ্ডহারবার যদি পেরিয়ে যাই?

দারুণ।

আমরা ডায়মণ্ডহারবারপেরিয়ে কাকদ্বীপ পেরিয়ে আরও অনেক দূর চলে যাব।

দেয়া বলল, আজ তাহলে আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন।

গাড়ি এখন মহানগরীর জট ছাড়িয়ে এসে চওড়া প্রশস্ত পথের ওপর পড়ে হু হু করে ছুটে চলেছে। বড বড় গাছ পিছলে যাচ্ছে। দুদিকেই মাঠ। মাঝে মাঝে নারিকেলকুঞ্জ। মাঠের মাঝে বসতি।

কথা বলল দেয়া, আচ্ছা, একটা কথা জানতে চাইলে বলবেন?

আগে বলুন, আজ এমনি করে সংকোচের সঙ্গে কেউ কাউকে আমরা প্রশ্ন করব না।

দেয়া হেসে বলল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে। বলুন দেখি এখন গাড়িখানা কোথায় পেলেন?

ইন্দ্র বলল, পাব আর কোথায়, যিনি আমাকে বই-এর দোকানের চাকরিতে বহাল করেছেন এ গাড়ি তাঁরই।

বৌরানীর?

ঠিক অনুমান করেছেন।

আপনি কি ওঁকে আমাদের এই বেড়ানোর কথা বলে গাড়ি চেয়েছেন নাকি?

পাগল! তাহলে হাত পা বেঁধে হয়ত দোকানেই ফেলে রেখে দিতেন।

তবে কি গাড়ি চুরি করে আনলেন?

বৌরানী সাধারণত বাইরে বেরোন না। বেরুলে আমিই ড্রাইভারের কাজটা করি। আমাকে ছাড়া বৌরানীর আর কোন ড্রাইভারে ভরসা নেই। আজ ছুটি নিয়েছি, গাড়িখানাও সঙ্গে রেখেছি।

বৌরানী কোন প্রশ্ন করেন নি?

না। তিনি জানেন, কোন মেরামতির কাজটাজ হতে পারে।

দেয়া বলল, আমার খারাপ লাগছে।

কেন?

বৌরানীকে আপনি এক রকমের ফাঁকি দিয়ে গাড়িখানা বের করে আনলেন।

ইন্দ্র একখানা গাড়িকে ওভারটেক করে বলল, বেড়াতে এসে অতশত ভাববেন না তো। এর ভেতর কোন অন্যায় বা সংকোচ থাকলে আমি নিতাম না। ড্রাইভাবেব কাজটা করে দিলেও বৌরানীব কাছ থেকে আমি তো একটা পয়সা নিই না।

তাই বুঝি?

শুধু আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা বলতে পারব না বলে একটুখানি কারচুপি করেছি।

ঘণ্টা খানেকের ভেতর ওরা ডায়মন্ডহারবার পেরিয়ে এল।

কি বিরাট নদী। সূর্যের আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। দেয়া দুচোখ ভরে দেখছে। দুটো নৌকো পাল তুলে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। ওপার যেন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখা একটা স্বপ্ন-জগৎ।

ইন্দ্র বলল, ওপারে কোন্ জেলা বলুন তো?

দেযা বলল, আমি চিরদিন ভূগোলে কাঁচা।

আপনাদের দেশ।

মেদিনীপুর?

গাড়ি চালাতে চালাতে ইন্দ্র মাথা নাড়ল।

আমি কোনদিন মেদিনীপুরে যাই নি। আমার বাবাও সেই যে ছোটবেলা কাজের খোঁজে কলকাতা চলে এসেছিলেন, আর কোনদিন দেশে ফেরেন নি।

ইন্দ্র বলল, দেশের বাড়িঘরের কি হল?

বাবার কাছে গল্প শুনেছিলাম, আমার ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাবার খুব ছোট বেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। আমার বড় জেঠামশাই বাবার দেখাশোনা করতেন। তিনি বাবার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন।

আপনার বাবা দেশের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক চুকিয়ে এলেন কেন?

দেয়া বলল, বাবা রাগ করেই চলে এসেছিলেন।

একটু থেমে দেয়া বলল, শুনতে যদি আপনার ধৈর্য থাকে তাহলে বাবার অভিমানের কারণটাও বলতে পারি। এসব আমার বাবার মুখেই শোনা।

ইন্দ্র বলল, সামনে ডানদিকে একটা ডাঙা জায়গা। বটগাছের তলায় গাড়িটা রেখে চলুন আপনার বাবার গল্প শোনা যাক্।

গাছের পাতার শব্দগুলো ভারি মিষ্টি লাগছে কানে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে দুব্বো ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল। বাইরে এরই ভেতর রোদ্দুরের তাতে হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু বটগাছের তলার হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা। ছায়া আলো, ছায়া আলো। ওপরে পাতা কাঁপে, মাটিতে আলোছায়া ঝিলমিলায়।

বড় গরিব ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। ভিটেটুকু ছাড়া প্রায় কিছুই ছিল না। একটু লেখাপড়া হিসেবপত্র জানতেন, আর মানুষ হিসেবে খুব নাকি সৎ ছিলেন। তাই কোন্ সূত্রে যেন গ্রামের জমিদারী সেরেস্তার কাজ পেয়ে যান। তাঁর দুই বিয়ে ছিল। আমার বাবা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র ছেলে। ঠাকুর্দা মারা যাবার পর আমার বড় জেঠামশায় জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তার কাজটা পেয়ে যান। তিনি নাকি খুব করিৎকর্মা লোক ছিলেন। অল্পদিনের ভেতর জমিজমা কিনতে শুরু করেন।

আমার বাবা গাঁয়ের ইস্কুলে পড়তেন। মা নেই, সৎ ভাইবোনেরা বড় একটা তাকায় না। কেবল মাথা গোঁজা আর খাওয়ার একটা ব্যবস্থা। জমিদার বাড়ির স্কুলে কর্মচারীর পরিবারের লোক বলে ফ্রিতে পড়ার একটা সুযোগ ছিল, তাই বাবা পড়তে যেতেন। কিন্তু বাবা ছিলেন জাতশিল্পী। আমি বাবার মুখে গল্প শুনেছি সবুজ ধানগাছের ওপর যখন শিশির পড়ত আর তার ওপর সূর্যের রঙ ঝলকাতো তখন বাবা নাওয়া খাওয়া ভুলে ধানক্ষেতের আলে ঘুরে ঘুরে শিশিরের এই শোভা দেখতেন।

ইন্দ্র বলল, এ যে সত্যিকারের জাতশিল্পীর মন।

শুধু তাই নয়, দেয়া বলতে লাগল, বাবা বর্ষা আর শিশির পাতের সময় গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে বেড়াতেন মাকড়সার জাল। ঐ সুন্দর জালের সুতোয় ছোটবড় জলকণা পড়ে অদ্ভুত সেটিং-এর কাজের মত মনে হত।

ইন্দ্র বলল, ছোটবেলা থেকেই শ্রেষ্ঠ মণিকার করে গড়ে তোলার জন্যে ঈশ্বরই ওঁর চোখের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন।

জানেন, ছোটবেলায় কোথা থেকে বাবা বড় পাকা একটা ডালিম পেয়েছিলেন, সেটাকে ভেঙে আর তিনি খেতে পারেন নি। চুনির দানার মত দানাগুলোকে থরে থরে সাজান দেখে তিনি ফাঁকা মাঠে গাছতলায় বসে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন।

একটুখানি থামল দেয়া। ইন্দ্র দেখল, করুণ হয়ে উঠল তার মুখখানা।

এবার বাবার ঘরছাড়ার গল্পটা শুনুন। বাবা চোর সাব্যস্ত হলেন।

কি রকম!

জমিদারবাড়ির পূজোমণ্ডপে কদিন দারুণ ধুমধাম চলছিল। কলকাতা থেকে বাবুদের আত্মীয়স্বজনরা সব এসেছিলেন। বাবাও প্রতিমার সাজসজ্জা দেখে বেড়াচ্ছিলেন। ছেলেরা যেখানে খেলা করছিল বাবা সেখানে ছিলেন না। তিনি দেখছিলেন প্রতিমার গায়ে ডাকের সাজসজ্জা। এমন সময় একটি মহিলাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। প্রতিমার মত সুন্দরী। তাঁর গলায় উৎসব দিনের জড়োয়ার নেকলেস।

বাবা নাকি মোহগ্রস্তের মত ঐ ভদ্রমহিলার পেছন পেছন আশ্চর্য মণিহারখানা দেখার লোভে ঘুরছিলেন।

বাবাকে এমনি করে ঘুরতে দেখে নায়েবমশায় দু'একবার ধমক লাগিয়েছিলেন কিন্তু বাবা তখন বেপরোয়া। ইচ্ছে করলেও চোখ ফেরাতে পারছেন না সেই গয়নার ওপর থেকে। তিনি নায়েবমশায়কে এড়িয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে গয়না দেখতে লাগলেন। আর হবি ত হ, বিজয়ার দিনটিতে ঐ ভদ্রমহিলার সেটিং-এর একটা আংটি খোয়া গেল।

চারদিকে হৈ হৈ পড়ল চোরের তল্লাসে। নায়েবমশায় আমার গোমস্তা জেঠামশাইকে তলব করলেন। জেঠামশাই সব শুনে বাবাকে মারতে মারতে নিয়ে গেলেন কাছারীবাড়ির সামনে। সেখানেও বাবা সবার হাতে মার খেলেন। কিন্তু যা তিনি নেন নি তা বের করবেন কি করে। জেঠামশায় বাবাকে ঘরে নিয়ে এসে অমানুষের মত মারলেন। শেষে কথা আদায় করতে না পেরে একটা ঘরের ভেতরে তালা বন্ধ করে রাখলেন।

দুদিন পরে মৃতপ্রায় অভুক্ত অবস্থায় বাবাকে ঘর থেকে বের করা হল। তিনি জানতে পারলেন, আংটি পাওয়া গেছে। আংটিতে কিছু লেগে যাবার জন্যে ভদ্রমহিলা স্নানের জায়গায় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ঠাকুরপূজোর ব্যাপারে কি জরুরি ডাক পড়তে তিনি সোপকেসের ভেতরে আংটিটা ভরে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসেছিলেন। তারপর কাজের হুড়োহুড়িতে আর কিছু মনে নেই। এর পর আংটির খোঁজ, বাবার খোঁজ, আর নিরপরাধের নির্যাতন।

জানেন, আংটি পাবার খবরটুকু শোনার পর বাবা আর দেশে রইলেন না। সেই যে ক্ষোভে অভিমানে দেশ ছাড়লেন আর দেশে ফিরলেন না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল দেয়ার। সে মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার মনের আবেগটুকু দমন করার চেষ্টা করতে লাগল।

ইন্দ্র আলতো করে দেয়ার পড়ে থাকা হাতখানা ছুঁয়ে দিয়ে বলল, আপনার বাবা কেন অসাধারণ জানেন? তিনি এত দুঃখেও তাঁর শিল্পীসত্তাকে হারান নি। অন্য সব ছেড়ে জীবনে মণিকারের পথই তিনি বেছে নিয়েছেন।

দেয়া নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দ্র তার হাতটা সরিয়ে নিয়েছে কিন্তু দেয়ার মনে হচ্ছে এখনও তার বাম হাতখানার ওপর ইন্দ্রের আঙুল স্পর্শ করে আছে।

একসময় দেয়া চঞ্চল হয়ে উঠল, এ্যায় কিছু খেলে হয় না?

ইন্দ্র বলল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসার সময়ে খাবার কেনার কথা মনে নেই। ডায়মন্ডহারবার পেরিয়ে এলাম, তাও মনে পড়ল না।

দেয়া বলল, খুব হয়েছে, আর খাবার তদারকী করতে হবে না।

ব্যাগ থেকে একটি একটি করে সে বের করল জলের বোতল, দুটো প্লাস্টিকের প্লেট আর এক প্যাকেট খাবার।

ইন্দ্র হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ, দারুণ। জাত-মহিলার সব রকমের গুণ রয়েছে আপনার ভেতর।

দেয়া জলের বোতলখানা ইন্দ্রের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চুপ, কথা না বলে চটপট হাত ধুয়ে নিন। তা বলে হাত ধুতেই সব জলটুকু শেষ করবেন না যেন।

ইন্দ্র বলল, এই দেখুন, পুরুত মশাই-এর মত কোশা থেকে দু'ফোটা জল তুলে হাতে মাখিয়ে নিলাম।

দেয়া হেসে ইন্দ্রের হাতে প্ল্যাস্টিকের প্লেটখানা ধরিয়ে দিয়ে বলল, সামান্য একটুখানি খাবার। মুখে ফেলতে না ফেলতেই মিলিয়ে যাবে।

কয়েকখানা মাঝের ডিমের বড়া আর আলুভাজাসহ দুটো পরটা ইন্দ্রের প্লেটে দিয়ে দেয়া বলল, হাত চালান, আরও আছে দেব।

ইন্দ্র বাঁ হাতে প্লেটখানা ধরে ডান হাত মুঠো করে ওপরে তুলে বলল, একসঙ্গে খাব। আগে

আপনার প্লেটে তুলুন দেখি।

দেয়া নিজের প্লেটে খাবার তুলল।

ইন্দ্র একটা মাছের ডিমের বড়া মুখে তুলতে গিয়ে বলল, এবার খাব।

দেয়া অমনি বলল, আমার কাছে এমন জিনিস আছে যা পেলে আপনি আবার খেতে চাইবেন।

সে কি! বলুন না কি জিনিস?

হুঁ হুঁ সব রহস্য একসঙ্গে ভেদ হবে না আগে যা দিয়েছি খান।

ইন্দ্র ডিমের বড়াটা চিবুতে চিবুতে বলল, সত্যি কি অমৃতই না এনেছেন। আপনি অনন্যা। এমন হাত প্ল্যাটিনাম দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।

দোহাই আপনার, দয়া করে ও কাজটি আর করবেন না। পরীক্ষা সামনে। হাত না চালাতে পারলে পরীক্ষার খাতায় লাড্ডু মিলবে।

ইন্দ্রকে আর একখানা পরটা দেবার জন্যে এঁটো হাতখানা ধোবার চেষ্টা করতেই ইন্দ্র বোতলটা কেড়ে নিয়ে বলল, খবরদার গরমের দিনে এক ফোঁটা জল নষ্ট করা চলবে না। বাইরে কোন নিয়ম নেই। দিতে চান ঐ হাতেই দিন, না হলে নেব না।

হাতটা মুছে আঙুলের ডগা দিয়ে একখানা পরটা তুলে ইন্দ্রের প্লেটে ফেলল দেয়া। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টিও।

আপনি যে দেখছি আইবুড়ো ভাতের আয়োজন করে বসে আছেন।

হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি দেয়া!

খেতে তো হবে একদিন। আগেভাগে আমিই না হয় খাইয়ে দিলাম।

দারুণ মিষ্টি তো এটা।

বলেছি তো আবার খেতে চাইবেন। ওটা যাদবের দোকান থেকে এনেছি। 'আবার খাব' সন্দেশ।

আবার খেতে চাইলে দিতে পারবেন?

এখুনি।

নিজের ভাগেরটি তো?

এত খোঁজে আপনার দরকার কি। যা দিই লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নিন।

নিজের মিষ্টিটা তুলে নিয়ে দিয়ে দিল ইন্দ্রের প্লেটে।

আপনার কই? দেখান।

আপনি খান তো।

সত্যি আর নেই? আমি তাহলে খাবও না, এঁটো প্লেট থেকে তুলেও দেব না। বটগাছের ওপরে যে দুটো শালিক বসে আছে, ওদের জন্যে রেখে দিয়ে যাব।

দেয়া অমনি ইন্দ্রের প্লেট থেকে মিষ্টির আধখানা ভেঙে নিয়ে বলল, শালিককে বিলোবার জন্যেই তো কষ্ট করে মিষ্টিটা বয়ে এনেছি। নিন খান। আধা আধি ভাগ করে নিলাম।

ইন্দ্র কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে তারিয়ে তারিয়ে মিষ্টিটা খেতে লাগল।

কাকদ্বীপ পেরিয়ে ওরা এল নামখানায়। সামনেই একটি নদী। নদীর পরিসর এখানে বড় নয়। এপারে ওপারে কয়েকখানা চালা ঘর. গাড়ি এপারে রেখে যেতে হবে। ওপার থেকে বারটা নাগাদ বাস ছাড়বে। বকখালি পৌঁছবে একঘণ্টা সোয়াঘণ্টার ভেতর।

ইতিমধ্যে দেয়ার গন্তব্যস্থানের নাম জানা হয়ে গেছে। সে এখন মনে মনে উত্তেজনায় ফুটছে।

একটা দোকানের সামনে গাড়িখানা রেখে দোকানীকে ইন্দ্র অনুরোধ করল গাড়িখানা লক্ষ্য রাখার জন্যে। বেঞ্চে দুটো ছেলে বসেছিল, তারা বলল, ফিরে আসুন, গাড়ি ঠিক থাকবে, আমরা দেখব।

ইন্দ্র নদীর ঢালু পাড়ে, দেয়াকে হাত ধরে ধীরে ধীরে নামাল। সাবধানে ওরা খেয়া নৌকোয় উঠল।

ওপারে একটা চালাঘরের তলায় বসল ওরা। সামনে লজেন্স, বিস্কুট, ছোলাভাজা পানবিড়ি নিয়ে একটা লোক বসে। তার পেছনে দু-তিনখানা বেঞ্চে ভাত খেতে বসেছে যাত্রীরা। গাড়ি ছাড়ার আগে খেয়ে নিতে হবে। কে যেন বলে উঠল, কন্ডাক্টারবাবুকে আর একটু ডাল দাও।

কথাটা কানে যেতেই ইন্দ্র সেদিকে তাকাল। হ্যাঁ, কন্ডাক্টারবাবুই তো খাচ্ছেন। টাকা পয়সার ব্যাগটা সামনে রাখা।

দেয়া ইন্দ্রের কানের কাছে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, একটা কিছু নিতে হয়, শুধু শুধু বেঞ্চ দখল করে বসে থাকলে খারাপ দেখায়।

ইন্দ্র ঠিক তেমনি আস্তে দেয়াকে বলল, ভাববেন না, ও একটা কিছু কেনা যাবে।

দেয়া বলল, আমি কিনব।

ইন্দ্র বলল, আমি কিনব।

দুজনেই বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পানবিড়ির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইন্দ্র বলল, কি কিনবেন?

দেয়া বলল, আপনি আপনার মত, আমি আমার মত।

ইন্দ্র কিনল খয়ের ছাড়া চমনবাহার দেওয়া দুখিলি সাদা পান আর দেয়া কিনল টকমিষ্টি আধ ডজন লজেন্স।

ওতেই ওরা খুশী; লজেন্সগুলো আপাতত সঞ্চয়ে রইল। পান দুটো মুখে পুরল দুজনে।

দেয়া হঠাৎ মুখে একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। এখুনি ভুলে যাচ্ছিলাম আর কি।

কি হল,—উদ্বিগ্ন ইন্দ্রের মুখ।

কিছু না, বোতলে ঠাণ্ডা জল ভরে নিতে হবে।

আমাকে দিন।

থামুন তো, আপনি কি ভাবছেন, আমি কিছুই পারি না।

ইন্দ্র বলল, কে বলেছে সে কথা। এত সব ভাল খাবার আপনিই তো খাওয়ালেন।

দেযা অমনি বলল, এত ভাল গাড়ি চালিয়ে আপনিই তো আনলেন।

ইন্দ্র বলল, তাহলে দুজনে যাই চলুন।

বেশ, তাই চলুন।

দোকানীকে জিজ্ঞেস করে টিউবওয়েলের সন্ধানে বেরুল দুজনে।

পাম্প করল ইন্দ্র, জল ভরে নিল দেয়া।

ফেরার পথে বাসের ভেতর একবার ঢুকে দেখল ইন্দ্র। আবে সর্বনাশ। জানালাব ধারে ধারে গামছা, থলে রেখে সিট দখল করে গেছে যাত্রীরা। মনের আনন্দে তাই ভাত ডাল চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে।

খুব দুঃখীর মত বাসের ভেতর তাকাতে লাগল। হ্যাঁ ঐ তো ডান দিকে একটা জোড়া সীট খালি। প্রায় লাফ দিয়ে ইন্দ্র সেখানে পৌঁছে স্থানটা অধিকার করল। জানালা দিযে মুখ গলিয়ে দেয়াকে ডেকে বলল, চটপট চলে আসুন।

দেয়া পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রের ডাকে ব্যাগট্যাগ নিয়ে উঠে এল গাড়ির ভেতর।

ইন্দ্র হাত নেড়ে বলল, আর একটু দেরি হলে কি দশাটাই না হত।

দেযা সিটগুলোর অবস্থা দেখতে দেখতে ইন্দ্রের দিকে এগিযে গেল। ইন্দ্র সিট থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আপনি জানালার ধারে যান।

কেন, আপনি তো বেশ ধারে বসেছিলেন, উঠলেন কেন?

আপনি বসুন না; তরুণীদেব অগ্রাধিকার।

কেন, অবলা বলে?

ইন্দ্র বলল, মোটেও না, বরং তরুণীরা আজকাল তরুণদের চেয়ে সবলা।

দেযা ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে বলল, আর প্রশংসা শুনে কাজ নেই, বসছি সাইডে।

ইন্দ্র বলল, কোনদিকে মোড় নেবে ঠিক নেই। তবে আমাদের দিকে রোদ পড়লে সাইডটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেন?

রোদ্দুর আমার খুব ভাল লাগে।

আহা মবে যাই। মিছে কথা বলার আর জায়গা পেলেন না। ও ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক জানালার ধার আমি আর ছাড়ছি না।

বকখালি! বকখালি!

বাস থেকে নেমে ঠা ঠা রোদ্দুর। হাওয়া আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। ওদের গায়ে যেন রোদের তাত লাগছে না। ট্যুরিস্ট বাংলোর পথে চলেছে ওরা। বাঁদিকে পুকুর, ঘরবাড়ি। পুকুরে জল নেই, চালের খড়গুলো চিকণি না দেওয়া খোঁচা খোঁচা চুলের মত উড়ছে। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই নারকেল গাছের সমারোহ চোখে পড়ল। দু'চারখানা সম্পন্ন কৃষকের কুটীর। পুকুরে হাঁস চরছে। ন্যাংটো দু'একটা ছেলে ছাকনি জাল নিয়ে মাছ ধরায় মত্ত।

সবুজ রঙের প্রলেপ মাখানো মরাই-এর মত গোল ডাকবাংলোটা একটুখানি দূর থেকে চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে অবাক্ বিস্ময়। এক মুহূর্তে পরিবেশের একি পরিবর্তন। সারি সারি ঝাউ। হাওয়ায় শন্ শন্ শব্দ। সাদা-সোনালীতে মেশা বালুর জমিন। সামান্য ঢেউ খেলানো উঁচু নীচু। লম্বা কালো কালো ছাযা পড়ে আছে। ঝিবি ঝিবি পাতাব ধূসব ছায়াগুলো কাঁপছে। বালিয়াড়ি পেরিয়ে ঝাউবনের ভেতব দিয়ে কাবা যেন আসছে। একদল যুবক যুবতী। ছেলেদের খালি গা। কারুবা ভেজা তোয়ালে গাযে জড়ানো। মেয়েরা হেমেন মজুমদারের ছবির মত ভেজা কাপড়ে গা ঢেকে আসছে। তীরের ওপব ছোট ছোট পলির ঢেউ-এর মত ভেজা কাপড়ের জায়গায় জায়গায ভাঁজ পড়েছে। কি একটা রসিকতায় জোয়ারের জলের মত খলখল আওয়াজে হাসির ঢেউ তুলল। ওবা তাজা, উচ্ছল কটি প্রাণ। ঢুকে গেল ট্যুরিস্ট লজে।

দেয়া বলল, সামনে একটা খড়ের চালের হোটেল বলে মনে হচ্ছে। চলুন দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।

এবার আমি কিন্তু খাওয়াব।

দেয়া চলতে চলতে বলল, না পাওয়া গেলেও খাওযাবেন?

দেখা যাক্, চলুন না। হোটেলে একটা বন্দোবস্ত ঠিক করে নেওয়া যাবে।

ভাত, তরকারী, ডাল, মাছ সবই পাওয়া গেল। বোলতাব টিপের মত ভাত। ফ্যান মেশান ডাল মেখে তাই অমৃত। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ইন্দ্র কোন কথা শোনে নি। সে খাবার দাম দিযে দিযেছে। এই নিয়ে রাস্তায় নেমে দেয়া ক্রমাগত বলে চলেছে, এই সামান্য কটা টাকাও আমাকে দিতে দিলেন না। এটা ঠিক হল না। খুব অন্যায় করলেন। আব কখনো আপনার দোকান থেকে এমনি বই এনে পড়ব না।

ইন্দ্র বলল, আব যে শাস্তি দিন মাথা পেতে নেব, ওটুকু শাস্তি দেবেন না। আপনি আমার দোকানেব শুভলক্ষ্মী।

দেয়া আর ইন্দ্র এখন আব কথা বলছে না। তারা ঝাউগাছেব গান শুনতে শুনতে ছায়া মাড়িযে চলেছে। একটা অতি সংকীর্ণ জলধারা পথেব বালি ভিজিয়ে তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে। দেয়া পা ডুবিযে দাঁড়াল। ইন্দ্রের হাত ধরে কাছে টেনে এনে বলল, দেখুন দেখুন কি ঠাণ্ডা! এত গরমের ভেতব সাবা শরীরটাকে শিউরে দিয়ে গেল।

ওবা ঐ সক স্রোতের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ঝাউ-এর আলোছায়ার ডিজাইন গায়ে এঁকে উঠে এল একটা বালিযাড়ির ওপরে। বিরাট বিরাট সবুজ লতা বড় বড় পাতায় ছেয়ে ফেলেছে সোনালী-ধূসর বালি। যেখানে বালি সেখানে পা রাখে কার সাধ্যি। তেতে একেবারে আগুন। ইন্দ্র সবুজ পাতায় পা রাখতে যাচ্ছিল, তার হাত ধরে কাছে টেনে নিল দেয়া। প্লীজ, ওদের ওপর পা বাখবেন না।

বলতে বলতেই দুজনে হাত ধবাধরি করে ছুটে অগ্নিকুণ্ড পেবিয়ে গেল। সামনে সমুদ্র। অস্বচ্ছ জল তবু সীমাহীন। মাথায় আগুন ঝরছে, পায়ের তলায় উষ্ণতা, সবই ভুলে গেল ওরা। ইন্দ্রের হাত শক্ত মুঠোয় ধবে দুচোখ ভরে সমুদ্র দেখতে লাগল দেয়া।

একটু দূবে বালিব জমিনে কালো কালো দুটো নৌকো পাশাপাশি শুয়ে আছে। কটা গাংচিল বসেছিল

নৌকোগুলোর আড়ালে। দূর থেকে জাল কাঁধে দুটো জেলেকে আসতে দেখে সাদা ডানা মেলে উড়ল আকাশে। তারপর হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলে গেল সমুদ্রের ওপর।

ইন্দ্র বলল, ডানদিকে বেশ কয়েকটা বালির স্তূপ। গাছ, ঝোপঝাড়ে ঢিবিগুলোর বেশ কিছু অংশ ছায়া ছায়া। চলুন আমরা ওখানে গিয়ে বসি।

ওরা এসে বসল দুটো উঁচু ঢিবির মাঝখানের খাতে। যেন একটা খালের ওপর দিয়ে ছায়ার স্রোত গড়িয়ে চলেছে। চারদিকে চোখ ঝলসানো রোদ্দুর, মাঝখানে শীতল প্রবাহ। সমুদ্র থেকে দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন ভেসে আসছে।

ওরা ছায়ার জমিনে আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে রইল।

দেয়া বলল, দেখুন, ঐ ঢিবিটার ওপরে কতগুলো ঝোপেব মাথায় কি সুন্দর লতা। লালহলুদে মেশা ফুল ফুটে আছে। এত রুক্ষ্ম বালিতেও এত সুন্দর ফুল ফোটে।

ততক্ষণে ইন্দ্র বালি ভেঙে ছুটেছে ফুল পাড়তে। দেয়া চেঁচাতে শুরু করেছে, এত গরম, বালি ভেঙে যাবেন না, প্লিজ, নেমে আসুন, প্লিজ।

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে পায়ে ফোস্‌কা নিয়ে ইন্দ্র ফুলের কাছে পৌঁছে গেছে। একটি ফুল নিয়ে অমনি বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছায়ার উপত্যকায় নেমে এল। দেয়ার দিকে ফুলটা তুলে ধরে বলল, সত্যি, উপহার দেবার মত এর চেয়ে সুন্দর বস্তু বুঝি আর কিছু নেই।

দেয়া ফুল নিলে না, কথাও বলল না, কেবল ফুলটার দিকে চেয়ে রইল।

ইন্দ্র অনেক কাছে সরে এল দেয়ার, রাগ করেছেন? কথা শুনে ফিরে আসি নি বলে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন? কিন্তু এ ফুলটা দিতে পারলে আমি যে কত খুশি হব তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

দেয়া কথা না বলে হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিল। পাপড়ি বেশ শক্ত। রঙ আর গড়ন ভারি সুন্দর। কতবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলটা দেখল ও। তারপর কানের ওপর মাথার চুলে গেঁথে নিল। মাথাটা ঈষৎ কাত করে দুটো হাত তুলে আন্দাজে ও যখন ফুলটা চুলের সঙ্গে গেঁথে নিচ্ছিল, তখন ওর হাসি হাসি মুখ আর দুষ্টুমি ভরা চোখ স্থির হয়েছিল ইন্দ্রের মুখের ওপর।

একটা বছর দশেকের নুলিয়া মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। গায়ে খড়ি উড়ছে। তেলবিহীন চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো উড়ছে, কিছু বা ঘামের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে গালে আর কপালে। এক চিলতে মাটি-রঙের কাপড় কোমরে জড়ান। সে মাথায় খরা আর পায়ে তপ্ত বালির গরম নিয়ে তার সামান্য সম্ভার এনেছে ট্যুরিস্ট বাবুদের কাছে।

বড় ছোট চিত্রিত কয়েকটা ঝিনুক। সমুদ্র তাকে সারা সকালের পরিশ্রমে দান করেছে এই ক'টি রত্ন মাত্র। তারপর সে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছে ট্যুরিস্ট বাবুদের সন্ধানে।

কত দেব রে?—দেয়া জানতে চায়।

মেয়েটি কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'যা ভাগ্' না বলে দশটা পয়সা দিলেও সে খুশী।

দেয়া এবাব তাব ব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের কবে মেয়েটার হাতে দিয়ে ঝিনুকগুলো নিল। মেয়েটাব চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে চক্ চক্ করে উঠল। সে আর একটুও দাঁড়াল না। যেমন এসেছিল তেমনি একমাথা রোদ নিয়ে চলে গেল।

দেয়া আর ইন্দ্র এখন বালির ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। তারা সবার দৃষ্টির আড়ালে।

আপনি গান জানেন?

সামান্য কিছু জানি, কিন্তু গাইতে ইচ্ছে করছে না।

আবৃত্তি করতে পারেন?

মোটামুটি পারি।

ইন্দ্র বলল, শোনাতে বলব না, তবে ইচ্ছে হলে শোনাতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কয়েক ছত্র মনে আসছে। না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনাতে পারি।

খুব ভাল।

দেয়া মাথা নিচু করে কি ভাবল। তারপর অবাক হয়ে ইন্দ্রের মুখের দিকে চাইল কতক্ষণ। পরে ওর দৃষ্টিটা নেমে গেল নিজের ভেতরে।

'বড় বিস্ময় লাগে
হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি
হৃদি মাঝারে॥
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালবাসি।
কেন গো নীরবে ভাসি
অশ্রুধারে॥'

আবৃত্তি শেষ হলে ও পুরো গানটা গেয়ে গেল। গান থামলে দুজনেই চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ

এক সময় দেয়াই নীরবতা ভাঙল, ঐ দেখুন, চিলটা মাথার ওপর আকাশে কি সুন্দর চক্কর দিচ্ছে ঠিক যেন বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, ভাল করে দেখুন, ডানার তলায় সূর্যের আলো লাগলেই কেমন সোনালী ঝিলিক দিচ্ছে

দেয়া একবার দেখে ফেলেই চেঁচাল, ঐ যে ঐ।

তারপর ওরা একটা খেলায় মাতল। সূর্যের উজ্জ্বল আলো ওদের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে ছায়া-চিলের চক্কর শুরু হয়েছে। ওদের হাতের নাগালের ভেতরে এসে পড়লেই ওরা হুটোপুটি করে তাকে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। কে আগে ছুঁতে পাবে, কার নিশানা কত নিখুঁত, তারই পরীক্ষা চলল দমকা হাসির ঢেউ তুলে তুলে। ছায়া ছুঁতে গিয়ে দুজনের হাতই বারবার এক জায়গায় এসে মিলছে। হেসে সেই মুহূর্তে দুজনে দুজনকে দেখছে। এ খেলা অনন্ত কাল চললেও যেন ওদের ক্লান্তি ছিল না।

চিলটা হঠাৎ স্থান পালটাল। কাত হয়ে একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে চলে গেল ওদের খেলা ভেঙে দিয়ে।

এখন নতুন একটা খেলা ঢুকেছে ইন্দ্রের মাথায়। সে বলল, এই বালির ওপর আঙুল দিয়ে একটা কিছু আমি লিখব, আপনি তার মিল দেবেন।

উরে ব্বাস, আমি কি কবি নাকি ?

ইন্দ্র বলল, সকলেই কবি, আবার কেউ কবি নয়। ঘষে মেজে কবি হওয়া যায় না, হঠাৎ কবে কবিতা আসে মনে। বাল্মীকি কবিতার 'ক'ও জানতেন না, হঠাৎ একটা পরিবেশ তাঁকে কবি করে দিয়ে গেল। আমাদের চারদিকে এমন পরিবেশ।

চেষ্টা করতে পারি, এইমাত্র।

দেয়া কলেজ ম্যাগাজিনে দু বছরে দুটো কবিতা লিখেছিল, এই ভরসা।

ইন্দ্র একটি করে লাইন লিখে দেয় আর তার পাদপূরণ করে দেয়া।

ইন্দ্র : সোনালী বালি আকাশ নীল।

দেয়া : মেলেছে ডানা সোনালী চিল॥

ইন্দ্র : সাগর ভাঙে খুশীর ঢেউ।

দেয়া : আমরা দু'জন নেইকো কেউ॥

ইন্দ্র : স্তব্ধ দুপুর কি নির্জন।

দেয়া : হঠাৎ হাওয়ায় কাঁপছে মন॥

ইন্দ্র চেঁচিয়ে উঠল, দারুণ দারুণ।

আমার চেয়ে অনেক ভাল আপনার হাত। একেবারে জাত-কবি, কণ্ঠে বাণীর বসতি।

থামুন, থামুন, আর প্রশংসা করতে হবে না, মাথাটা ঘুরে যাবে।

ইন্দ্র হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তাবপর দেয়ার দিকে চেয়ে বলল, কি যেন লাইনগুলো হল বলুন তো, সব মুছে গেছে। আমি আবার একটুও মনে রাখতে পারি না।

দেয়া বলল, মনে না রাখাই তো ভাল। বালির লেখা বালিতেই হারিয়ে গেল, এই তো ভাল।

ওরা কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ঐ নীল-নির্জনে। টুকরো টুকরো কত কথার জাল বুনল। তারপর এক সময় কমে এল সূর্যের তেজ। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় বালি উড়তেই ওরা উঠে দাঁড়াল। আকাশের এক কোণে কালবৈশাখীর কালো মেঘ জমেছে। ঘড়ি দেখল ইন্দ্র। কখন সোয়া তিনটের ঘরে কাঁটা চলে গেছে। বাস স্ট্যান্ড বেশ খানিক দূর। ওরা হাত ধরাধরি করে ছুটতে লাগল। এখন ওরা দিক বদলেছে। ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে না গিয়ে ডান দিকের শর্ট-কাট পথটা ধরল। সমুদ্রের একদিকে ছায়া ঘনিয়েছে। ওবা ছুটছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। মেঘটা ডানা ছড়িয়ে অতিকায় পৌরাণিক পাখির মত ওদেব ধাওয়া করছে। এতক্ষণ সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ছুটছিল ওরা, এখন কাঁচা মাটির পথ ধরে ছুটছে। পেছনে সমুদ্র। পাখিটা বিপুল গতিতে উড়ে আসছে। ওর ডানার ঝাপটে পথ ঠিক রাখতে পারছে না ওরা। দেয়া বাব বার পড়ে যেতে যেতে ইন্দ্রের হাত ধরে টাল সামলাচ্ছে। ঐ তো চারটের বাস দাঁড়িয়ে আছে। হাঁপাচ্ছে দেয়া। এখন ইন্দ্রের হাতের ওপর সম্পূর্ণ ভর রেখে চলেছে ও। মাটির পথ থেকে পীচ রোডের ওপর এসে পড়তে না পড়তেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল। মুক্তোর অজস্র দানা ছড়িয়ে পড়ছে সারা গায়ে। আঃ কি আরাম। মুখে, মাথায়, হাতে বৃষ্টির জল মাখতে লাগল দেয়া আর ইন্দ্র। ওরা অনেকখানি ভিজে গিয়ে তবে উঠল গাড়িতে। যাত্রীবা তখনও ওঠে নি। খড়ের চালার ভেতর বসে চা খাচ্ছে। ওরা দুজন ঘন হয়ে বসল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট তোয়ালেখানা বের করল দেয়া। ইন্দ্রের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, মুছে নিন মাথাটা। এত গরমের পর জল বসে থাকলে অসুখ করতে পারে।

হাসল ইন্দ্র। অসুখের ভয়ে নয়, কিন্তু দেয়ার মিষ্টি অনুরোধটুকু সে এড়াতে পারল না বলেই তোয়ালেটা নিয়ে মাথা মুছতে লাগল। ইন্দ্রের পর ঐ তোয়ালেতে আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে মাথা মুঝল দেয়া। একটা হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধ দেয়ার ভেজা চুলের থেকে উঠে আসছিল। সাতসকালে কোন একটা সুগন্ধ স্যাম্পু মেখে চান করেছিল ও। জলে ভিজে সেই স্যাম্পুর করুণ গন্ধটুকু হয়ত শেষবারের মত ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দ্র সেই গন্ধ ধীরে ধীরে বুক ভরে টেনে নিল।

ব্যাগ টুঁড়ে চিরুনি পেল না দেয়া। নিশ্চয়ই আনতে ভুলে গেছে। ইন্দ্র তার ছোট্ট চিরুনিটা দেয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই এক চিলতে চিরুনিতে আপনার ঐ কালবোশেখীর মত চুল সামলাতে পারেন কিনা দেখুন।

দেয়া কতক্ষণ চিরুনি চালিযে চুলগুলো ঠিক করল। সামান্য চিরুনি, কি অসামান্য স্পর্শ। দুটো দেহের ভেতর ও যেন স্পর্শের একটা সেতু গড়ে তুলছিল।

একটু পরে ইন্দ্র বলল, জলের বোতলে অবশিষ্ট কিছু আছে?

দেয়া ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিল। কেন জানি না, সে কোন কথা বলতে পারছিল না। বাইরের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, কিন্তু ধীরে ধীরে ভারী হয়ে উঠছে দেয়ার মন।

জলের বোতলটা ইন্দ্রের হাত থেকে ফিরিয়ে নিল দেয়া। নদীর ধারের দোকান থেকে কেনা লজেন্স থেকে তিনটে দিল ইন্দ্রের হাতে, বাকী তিনটে ঠোঙাতেই রাখল।

ইন্দ্র ম্লান হেসে বলল, আমি কি আপনার শত্রু যে তিনটে দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন?

শত্রুই তো—উদ্‌গত একটা অশ্রুকে জানালার বাইরে আব শে লুকোলো দেয়া।

এক সময় কন্ডাক্টার গাড়িতে উঠে হর্ন বাজাতে লাগল। অমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। যাত্রীরা খড়ের চালার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

দেয়া কান্নাভেজা গলায় বলল, আর কোনদিনও আমরা দুজন এখানে আসতে পারব না, কোনদিনও না।

ইন্দ্র তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার হাতখানা ধরল। এই মুহূর্তে সে সকল সান্ত্বনার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

বিপ্রদাসবাবু মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, হঠাৎ কোথা থেকে রোদ লাগিয়ে জ্বর বাধালি মা, এদিকে আমার যে নাভিশ্বাস উঠেছে। তোকে দেখি না কাজ দেখি, বল তো মা?

দেয়া জ্বরতপ্ত হাতে বাবার হাতখানা মুঠো করে ধরে রইল কতক্ষণ। এক সময় বলল, খালি তোমার কাজ আর কাজ। এই জ্বরে পড়লাম বলেই তো তোমাকে একটু কাছে পেলাম।

বিপ্রদাসবাবু বললেন, বুড়ো হচ্ছি, আমার কি আর কাজ করতে ভাল লাগে রে।

দেয়া ক্লান্ত গলায় হেসে বলল, খুব ভাল লাগে। কাজ ছাড়া তুমি থাকতেই পারবে না।

ঘাড়ের ওপর কাজ এসে পড়লে আমি কি করি বল তো। এই তো ক'দিন পরে 'নগর সুন্দরী' প্রতিযোগিতা হবে, আমাদের 'ভদ্র জুয়েলার্স' বিজয়ীর মুকুট তৈরি করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। বুঝতেই পারছিস আমার খাটুনিটা কি রকম চলছে।

দেয়া উৎসাহে ফেটে পড়ল, ও, 'মিস ক্যালকাটা' প্রতিযোগিতা? বন্ধুরা বলছিল পার্ক হোটেলে হচ্ছে সাতাশে মে। তুমিই সে মুকুটখানা তৈরি করছ বাবা?

হ্যাঁ মা, এই বুড়োর ওপর দায়িত্বটা এসে পড়েছে।

কি রকম তৈরি করছ বাবা একটু শোনাও না।

ফোরটিন ক্যারেটের ওপর কাজটা হচ্ছে। মাঝে এত বড় পিজিয়ান ব্লাড কালারের চুনিটা জ্বলজ্বল করবে। তার চারদিকে পোখরাজ আর পান্নার সেটিং। পাশেও ছোট আকারের এমনি সব কাজ থাকবে।

দারুণ দেখতে হবে বাবা, তাই না?

কি জানি মা লোকে ভাল বললেই ভাল। তবে কাজটা করতে গিয়ে তেমন প্রেরণা পাচ্ছি না মা।

কেন বাবা?

এটা তো ছোটবাবু 'ভদ্র জুয়েলার্স'-এর পক্ষ থেকে বিজয়িনীকে দেবেন।

এ তো ভাল কথা। নাম ছড়াবে তোমাদের দোকানের।

না, সেদিক থেকে কথাটা আমি বলছি না। ছোটবাবুর অর্ডার হয়েছে, তাঁর মেয়ে রুমাকে বিয়ের সময় আমি যে রকম মুকুট তৈরি করে দিয়েছিলাম ঠিক তেমন সুন্দরটি করে দিতে হবে। আমি মন থেকে তাই সাড়া পাচ্ছি না মা। রুমা বলেছিল, কাকু আমার মুকুটের মত দ্বিতীয় আর একখানা মুকুট যেন না হয়। সে বেচারা বেশিদিন ভোগ করতেও পারল না। আমি ডিজাইনটা তৈরি করছি আর চোখের জলে ভাসছি।

হঠাৎ দেয়া বলল, আমি রুমাদিদিকে দেখেছি বাবা। তুমি তো বল নি রুমাদিদির স্বামী মারা গেছেন, কিন্তু সেই কবে বিয়ে বাড়িতে ওঁকে দেখেছিলাম, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। উনি অবশ্য আমাকে চিনতে পারেন নি।

কোথায় দেখলি?

তার আগে তুমি বল, রুমাদির স্বামী কি করে মারা গেলেন?

উনি সারা ভারত ঘুরে ঘুরে ডকুমেন্টারী ফিল্ম তুলতেন। কাশ্মীরের 'নৌ-জীবনের' ওপর ফিল্ম তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ের ওপর উঠে ডালহ্রদের জলে নৌ-মিছিলের একটা ছবি তুলতে গিয়ে নিচে পড়ে যান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। রুমার মুখখানা ভুলতে পারি নি মা।

দেয়া বলল, আমি রুমাদিকে ও'র বাড়িতেই দেখেছি। বিরাট বাড়ি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, রায়বাহাদুর হরবল্লভ চৌধুরীর বাড়ি, সেখানে কি করতে গিয়েছিলি তুই?

ঐ বাড়ির নিচে একটা বই-এর দোকান আছে, সেখানে বই কিনতে গিয়ে ওঁকে দেখেছি।

ওটা তো রুমার ছোট দ্যাওর ইন্দ্রকান্তের দোকান। ইউনিভারসিটির ব্রিলিয়েন্ট ছেলে, কিন্তু চাকরি-বাকরি না করে বই-এর দোকান করেছে।

তুমি ভুল করছ বাবা। দোকানটা রুমাদিদিদের। ঐ ইন্দ্র ছেলেটি ওখানকার কর্মচারী।

হো-হো করে হেসে উঠলেন বিপ্রদাসবাবু, দূর পাগলী। হরবল্লভের যেখানে যত প্রপার্টি তার একমাত্র মালিক ও। শুনেছি রুমা ওকে খুব ভালবাসে। এই তো সেদিন সুমনঘাটের দত্তবাড়ির লোক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, ছোটবাবু লোকটিকে সিধে রুমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

চুপ করে গেল দেয়া। জ্বরের চেয়েও একটা গভীর কষ্ট এই মুহূর্তে তার বুকখানাকে চেপে ধরল।

বিপ্রদাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক সময়ে ট্যাবলেটগুলো খেয়ে নিস মা। আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব।

বেরিয়ে গেলেন বিপ্রদাসবাবু। বিছানায় শুয়ে কি এক অব্যক্ত অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল দেয়া।

ইন্দ্র তার কাছে পরিচয় গোপন করেছে। কিন্তু কেন? সে গরিব বলে তার পর্যায়ে নেমে এসে তাকে করুণা করতে চেয়েছে ইন্দ্র। কিন্তু সে তো নিজের পরিচয় গোপন করে নি। যাকে তার ভাল লেগেছে তার কাছে সম্পূর্ণ মনটাকে মেলে ধরতে তার তো কোন দ্বিধা ছিল না। নিজের বাড়ির গাড়িতে ইন্দ্র বেড়াতে গেছে, তবু সে নিজেকে অক্লেশে ড্রাইভার বলে চালিয়ে দিলে। ও কি ভেবেছিল, বড়বাড়ির ছেলের নিজস্ব গাড়ি বললে দেয়া তাতে নাও উঠতে পারে। নাই বা উঠল। বাসে বাসেই দু'জনে যেত সারা পথ। ও না হয় কষ্ট করেই যেত তার সঙ্গে। তবু কেউ কারুর সঙ্গে ছলনা করেনি, এর চেয়ে গভীর সান্ত্বনার আর কিছু ছিল না।

দেয়া অদৃশ্য কোন দেবতাকে যেন সামনে রেখে বলতে লাগল, আমি তো আর কিছু চাই নি তার কাছে শুধু ভাললাগাটুকু ছাড়া। মাঝে মাঝে কলেজ পালিয়ে নতুন নতুন বই নিয়ে আলোচনাতে গভীর আনন্দ পেয়েছি দু'জনে। সে উত্তেজনায়, সে আনন্দে তো কোন খাদ ছিল না। ইন্দ্র অভিজাত বাড়ির ছেলে। সে তার উঁচু সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশে সুখী হোক, আমি আমার মত হয়ে থাকি এর চেয়ে অন্তরের প্রার্থনা আমার আর কিছু নেই।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দেয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সেই জলে দেয়া ইন্দ্রের বিরুদ্ধে জমে ওঠা সকল ক্ষোভ আর অভিযোগ ধুয়ে মুছে ফেলল।

বিপ্রদাসবাবু তাঁর ছোট্ট কুঠরির ভেতর বসে মণিমুকুট তৈরি করছেন। কিন্তু কাজে একটুও মন বসাতে পারছেন না তিনি। বার বার মনটা তাঁর চলে যাচ্ছে অসুস্থ মেয়েটার কাছে। আহা, সেই ছোটবেলায় বিয়েবাড়িতে গিয়ে রুমার গয়না দেখে বায়না ধরেছিল গয়না নেবার। কিন্তু ঐ জড়োয়ার গয়না দেবার সামর্থ কই তাঁর? কিন্তু কি করলেন তিনি সারা জীবন এই ছোট্ট ঘরটুকুর ভেতর বসে বসে। শুধু গয়না গড়ে গেলেন। এক রকমের আত্মতুষ্টি নিয়ে কাটিয়ে দিলেন সারা জীবন। স্ত্রীর দিকে তাকালেন না, একটিমাত্র মেয়ে, তার দিকেও না। কি পেয়েছেন তিনি জীবনে? সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু যাদের তিনি সংসারে আনলেন তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যে কি করেছেন তিনি? কিছুই না। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্যটুকুও না পেয়ে অকালে চলে গেলেন তাঁর স্ত্রী। মেয়েটি নিঃসঙ্গ বড় হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিবেশীর স্নেহযত্নে মেয়ে তাঁর বড় হল, কিন্তু জন্মদাতার কি কর্তব্য করলেন তিনি? নিজের ঘরে আনন্দের একটি দীপ জ্বালাতে পারলেন না, ঘরে ঘরে উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

এই মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন বিপ্রদাসবাবু। অসুস্থ মেয়ের কাছে তিনি ফিরে যাবেন। পড়ে থাক কাজ। পরমাসুন্দরীর মাথার মুকুট তৈরি করতে গিয়ে তিনি হারাতে পারবেন না তাঁর জীবনের প্রিয় পরম ধনকে।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে নামছিলেন, ছোটবাবু তাঁর ঘর থেকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন, সামন্তবাবু, একটু শুনে যাবেন।

ছোটকর্তার মোলায়েম গলার স্বর শুনে মুহূর্তে গলে গেলেন বিপ্রদাসবাবু। ভদ্রবাবুরা সমঝদার, গুণগ্রাহী। তাঁর প্রতি সব সময় সম্ভ্রম রক্ষা করে কথা বলেন।

সিঁড়ি ভেঙে আবার তিনি উঠে এলেন ওপরে। ছোটকর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আপনি আজ এসেই চলে যাচ্ছেন, তাই চিন্তিত হলাম। শরীর-টরীর খারাপ নয় ত ?

বিপ্রদাসবাবু যদ্দুর সম্ভব ধীর গলায় একটুখানি উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, আমার কিছু হয় নি কিন্তু মেয়েটা জ্বরে পড়েছে। বাড়িতে কেউ নেই, একা ফেলে রেখে এসেছি।

ছোটকর্তা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বের করে বিপ্রদাসবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এখুনি যান, ডাক্তার পথ্যের সব ব্যবস্থা করুন গিয়ে। টাকার জন্যে ভাববেন না। দরকার মনে হলে বলবেন, আমার বাড়ির কোন ঝিকে দেখাশোনা করার জন্যে পাঠিয়ে দেব।

বিপ্রদাসবাবু আবার বিগলিত হলেন। এমন সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে কাজ করতে পারার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। তিনি বললেন, না, না, ভাবনার কিছু নেই, এই রোদ-টোদ লাগিয়ে একটুখানি জ্বরে পড়েছে আর কি। আমি যাব আর আসব।

ছোটকর্তা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আপনার কাজ আপনি বুঝবেন। আপনি আসেন না আসেন তাতে আমার ভাবনার কিছু নেই। শুধু যথাসময়ে মুকুটটা যেন হাতে পাই। এটা আমাদের দোকানের প্রেসটিজ। আর সেদিন আপনাকেও পার্ক হোটেলে হাজির থাকতে হবে।

থতমত খেলেন বিপ্রদাসবাবু, আমাকে!

নিশ্চয়ই। আপনি মণিমুকুটের স্রষ্টা। আপনার সঙ্গে সবাই পরিচিত হতে চাইবেন বই কি?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরেব বাইরে বেরিয়ে এলেন বিপ্রদাসবাবু।

ক'দিন ভুগে ভুগে বাড়ির ঠিকে ঝিয়ের হাতে ওষুধ পথ্য খেয়ে একদিন বিছানায় উঠে বসল দেয়া। কিন্তু শরীর আর মন দুটোই ভেঙে গেছে তার।

'মিস ক্যালকাটা' প্রতিযোগিতার দিনে বিপ্রদাসবাবু দেয়ার পাশটিতে বিছানায় এসে বসলেন।

এখন কেমন বোধ করছ মা?

একটু ভাল বাবা।

সোজাসুজি এবার বিপ্রদাসবাবু কথাটা পাড়লেন, আমাকে আজ একটুখানি যে বেরুতে হবে মা।

রোজই তো তুমি দোকানে বেরিয়ে যাও বাবা।

আজ আমি আর দোকানে যাব না রে, ছোটকর্তার খেয়াল হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাকে পার্ক হোটেলে যেতে হবে। মুকুট তৈরির শিল্পীকে সবাই নাকি দেখতে চাইবেন।

দেয়া কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে বলল, যাও বাবা।

বিপ্রদাসবাবুর এমনিতেই দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের কাছ থেকে ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলেন।

বাবা চলে গেলে নতুন করে একটা ক্ষতমুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল দেয়ার। আজ সেই প্রতিযোগিতার দিন। দেশের সব সুন্দরী মেয়েরা জড়ো হবে পার্ক হোটেলে। তারা সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় নামবে। নিশ্চয়ই দর্শকদের আসনে উপস্থিত থাকবেন রুমাদি। তাঁর বাবা যখন মুকুট দিচ্ছেন তখন তিনি অবশ্যই বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। আর, আর একজনও কি তাঁর সঙ্গে থাকবে না? রায়বাহাদুরের একমাত্র জীবিত বংশধর?

ভাবতে ভাবতে বড় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল দেয়া। কিছুক্ষণ আগেই মধ্যাহ্নের আহার তাঁর শেষ হয়েছে। অবসন্ন দেহে ঘুম আসতে একটুও দেরি হল না। ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক স্বপ্নের জগতে সে প্রবেশ করল।

বিরাট হলঘর। বেল ফুলেব লম্বা লম্বা মালা দিয়ে বাসর ঘরের মত সাজান। সারি সারি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। একদিকে স্টেজ। স্টেজে বসে আছেন পাঁচজন বিচারক। স্টেজের নিচে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের আসন কাণায় কাণায় পূর্ণ। উইংসের ভেতরে দশখানা চেয়ার আলো করে বসে আছে প্রতিযোগীরা। এইমাত্র তাদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এখন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তারা প্রতীক্ষা করে আছে চেয়ারম্যানের ঘোষণার জন্য। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে।

একি! কানে সে ঠিক শুনছে তো! প্রথম পুরস্কার তার নামেই ঘোষিত হল এইমাত্র। দর্শক আসন থেকে করতালি ধ্বনি যেন আর থামতেই চায় না।

আনন্দ উত্তেজনায় সারা দেহ তাঁর থরথর করে কাঁপছে। প্রতিটি প্রতিযোগী আসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যাচ্ছে।

বিচারকেরা তাকিয়ে আছেন উইংসের দিকে। এখুনি তাকে পুরস্কার নেবার জন্যে স্টেজে প্রবেশ করতে হবে।

ঢুকল সে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল পুরস্কারদাতার দিকে। সেই মুকুট। তার বাবার হাতে তৈরি রত্নখচিত মুকুট। পুরস্কারদাতা বিজয়িনীর মাথায় মুকুটটি পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত হলঘর করতালি ধ্বনিতে যেন ফেটে পড়ল।

সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করতে গিয়ে দেখল, সামনের আসনে বসে তার দিকে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছেন রুমাদি। ঐ তো তাঁর পাশে বসে একদৃষ্টে তাকে দেখছে ইন্দ্র। বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

ঐ তো সবার পেছনে হলঘরের একটি কোণে বসে রয়েছে তাব বাবা। বাবা কি কাঁদছে! এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও সে অনুমান করছে, তার বাবার চোখে জল। সে চিৎকার করে বলবার চেষ্টা করছে, বাবা, তোমার তৈরি মুকুট আর কেউ আমার মাথা থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল তার। কে যেন মাথায় হাত রেখেছে। দেযা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল। কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে গেলে যেমন ভোরের আলোয় সব কিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, তেমনি দেয়ার চোখের ওপর ফুটে উঠল ছবি। এ কাকে দেখছে সে! তার কপাল স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে কে এই মমতাময়ী! বৌরানী! বৌরানী। রুমাদি!

বিছানার ওপর ধড়ফড়িয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল দেয়া, কিন্তু দুর্বল শরীরে আবার ভেঙে পড়ল বিছানায়। বৌরানী ততক্ষণে তার পাশটিতে বসে পড়েছেন। দেয়া হাঁপাচ্ছিল উত্তেজনায়। বৌরানী তার কপালে হাত রাখলেন, ইস্, ঘামে একেবারে যে নেয়ে উঠেছে!

আঁচল দিয়ে কপালটা ভাল করে মুছে নিলেন বৌরানী। বড় বড় দুটো চোখ মেলে অবাক্ বিস্ময়ে তাঁকে দেখতে লাগল দেয়া। এ আবির্ভাব যে অভাবনীয়!

বৌরানী এবার বললেন, তোরা দুটিতে কি ভেবেছিস বল তো? আমাকে কি পাগল করে ছাড়বি? এদিকে তুই জ্বর বাধিয়ে পড়ে আছিস, একটা খবর পাই না, ওদিকে সে হতভাগাটা আজ এক হপ্তা মন মরা হয়ে ঘুরছে। নাওয়া-খাওয়া সিকেয় তুলেছে। ধমক দিতেই তো সব বেরিয়ে পড়ল। আমাকে লুকিয়ে বকখালি অবধি ঘুরে আসা হয়েছে। তা বেশ করেছিস বেড়িয়ে এসেছিস, কিন্তু একটা মেয়েকে নিয়ে খালি চুরি করে বেড়িয়ে বেড়ালেই তো চলবে না, তাকে তার প্রাপ্যটুকু দিতে হবে তো?

ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে তোকে ভালবাসে? বললে কি হতভাগা, ঠিক জানি না।

বললাম, একটা মেয়েকে সঙ্গী করে বেড়াতে জান আর তার মন বোঝ না? এই তোমাদের ভাল লাগা?

ও বললে কি, আমরা কোন অন্যায় করি নি বৌরানী। ও কেন যে আসা বন্ধ করল তা বুঝতে পারছি না। যদি আমার কোন ত্রুটি তার চোখে পড়ে থাকে তা হলে সে ভুলের জন্যে আমি তার কাছে মাপ চেয়ে নেব।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দেয়ার চোখের কোণ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। বৌরানী আবার তা আঁচল দিয়ে মুছে নিতে নিতে বললেন, একটা খবর তো পাঠাবি? তুই না যেতে পারিস, একটা কাকপক্ষীকেও দিয়ে তো খবরটা পাঠাতে পারতিস? ওদিকে কি উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে ছেলেটার!

একটুখানি থেমে থেকে আবার বললেন, আমি আর একটি দিনও তোকে এখানে ফেলে রাখতে পারব না। তোরা দুটিতে আজ থেকে আমার চোখের সামনে থাকবি, হেসে খেলে বেড়াবি। আমি এই ভাঙা বুকে একটু শান্তি পাব। আসুন কাকাবাবু, তাঁর অনুমতিটুকু তো চেয়ে নিতে হবে।

হু-হু করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে দেয়াব। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, যে হাতখানা তার কপালের ওপর রয়েছে, সে হাতখানাই তার পরম আশ্রয়, একান্ত নির্ভব।

নির্জনে খেলা
প্রথম পর্ব

ডিসেম্বরের গোড়াতেই নরসিংলালজীর সঙ্গে মানালী থেকে নেমে এলাম কুলুতে। চাচাজীর কোঠীতে এই আমার প্রথম আসা। সারা পথ উত্তুরে হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক মারছিল। সিডার আর পাইনের বন পেরিয়ে আসার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম একটানা কান্নার আওয়াজ; বিপাশার তীর ঘেঁষে গাড়ি চলছিল। দুরন্ত পাহাড়ী মেয়েটা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেছে। নীল শাড়িখানা জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে।

সন্ধ্যার একটু আগেই চাচাজীর ডেরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। শেষবেলার হলুদ আলোয় প্রথম চোখাচোখি ঝিন্নির সঙ্গে। আপেল বাগিচার বেড়ার ধারে সে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর চাচাজীর হাত থেকে সব্জীর টোকরীটা নিয়ে কোঠীর দিকে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

শীতের শান্ত সন্ধ্যা। পেছনের উঁচু পাহাড়টার ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। কয়েকটা আপেল আব পাইন গাছের পাশ কাটিয়ে চাচাজীর পেছন পেছন এসে দাঁড়ালাম কোঠীর দাওয়ায়।

চাচা নরসিংলালজী খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ঘরের ভেতর মহলে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, এ কোঠী তোমারা বাবুজী। এ বাগিচা ভি তোমারা। মুখার্জী সাব মেহেরবানী করে আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। তিনি আজ নেই, তা বলে চাচা তো ভাতিজার সঙ্গে বেইমানী কবতে পারবে না।

বললাম, চাচাজী এ কোঠি কার সে নিয়ে ফয়সালা পরে হবে। এখন চাচার কাছে এসেছি ব্যস। সব ভাবনা এখন চাচাজীর।

নরসিংলালজী আমাকে নিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন।

চাচাজী এবার বললেন, এই তোমার কামরা। কুর্শি টেবিল সব আছে। খাটিয়া পর বিস্তারাভি পাতা আছে। খুশিসে আরাম করো, কোই তকলিফ হোনে সে বোলো।

নরসিংলালজী বেরিয়ে গেলেন। কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠলো।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় গায়ের কোট খোলার প্রশ্নই ওঠে না। নেয়ারের চারপায়ার ওপর দেহটাকে ঢেলে দিলাম।

তখনও ঘরের ভেতর আধময়লা কাপড়ের মত একটুখানি আলো ছিল। দেখলাম আমার খাটিয়াব পাশের টিপয়ে পোর্সিলেনের ফুলদানিতে ফুল রাখা আছে। সামনের জানালা বন্ধ ছিল। তার কাচের ভেতব দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বন পাহাড় আর বিপাশাব ছবি। সন্ধ্যার আবছায়ায় আমি খাটিয়ার ওপব বুক চেপে শুয়ে সেই অস্পষ্ট হয়ে আসা দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

ব তক্ষণ পরে সিঁড়িতে আবার পায়ের সাড়া জাগল। এবার শব্দটা মৃদু। মনে হল চাচাজী নয় অন্য কেউ আসছে। খাটিয়ার ওপর চুপি চুপি উঠে বসতে গেলাম কিন্তু সারা ঘরে চারপায়াব একটা করুণ আর্তনাদ বেজে উঠলো।

ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে ঝিন্নি। হাতে থালার ওপর বাখা চায়ের কাপ। প্লেটে কিছু খাবার।

সে এবার টিপয়ের ওপর থালাটা বসিয়ে বেখে পাশের দেয়ালে হাত বাড়াল। চকিতে একটা সোনার ঈগল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘবের ভেতর।

আলোয় দেখলাম ঝিন্নিকে। টিপিক্যাল কুলুর তরুণী। লালে সাদায় মেশা রং, ঠোঁটে গোলাপী আভা, বাদামী চুলের রাশ বিনুনী আর টাসেলে বাঁধা, ঝকঝক করছে চোখ দুটো।

ও-ই কথা বলল, চাচাজী আসছেন, আপনি হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। পাশে বাথরুম দেখিয়ে বলল, গরম জল রাখা আছে ওখানে।

চমকে উঠলাম। এমন নিখুঁত উচ্চারণে হিমাচল প্রদেশের একটি মেয়েকে বাংলা বলতে শুনে সত্যি থ বনে গেলাম।

ও চলে যাচ্ছিল দেখে ওকে ডাকলাম। আমার মুখের ওপর চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল ও।

এমন বাংলা শিখলে কোত্থেকে ?

ঝিন্নি বলল, পিতাজীর কাছে।

সংশয় জানিয়ে বললাম, তোমার পিতাজী তো এমন সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলতে পারেন না।

ঝিন্নির চোখেমুখে হাসি উপছে পড়ল। সে বলল, আপনার পিতাজী আমাকে শিখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে শিখেছি ওঁর কাছে। ওঁকে আমি পিতাজী বলে ডাকতাম, আর আমার পিতাজীকে আপনার মত আমিও চাচাজী বলে ডাকি।

আমি আর কোন কথা তোলার আগেই ঝিন্নি পাক খেয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে তাকাল। ওর কানবালার ঝুরিগুলো টুলটুল করে নড়ে উঠল। বিনুনীতে বাঁধা লাল টাসেল দোল খেয়ে থেমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন নরসিংলালজী। বললেন, বহুৎ ঠাণ্ডা পড়া হ্যায় বাবুজী। গরম গরম চা পিও।

চাচাজী কুর্শিতে বসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন। ঝিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, ঝিন্নি তোমার ভাষা আমার থেকে ভাল বলতে পারে বাবুজী। ওকে মুখার্জী সাব শিখলায়েছেন।

হেসে বললাম, একটু আগে ও কথা বলে আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

ঝিন্নি আর দাঁড়াল না। সে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হল। শুধু তার দ্রুত পায়ের সাড়া সিঁড়িতে তবলার বোলের মত বেজে উঠল।

নরসিংলালজী বললেন, তোমার পিতাজী ঝিন্নিকে বহুৎ প্যার করতেন। ঝিন্নির মা যত রোজ জিন্দা ছিল মুখার্জী সাবকো জিজাজী বলে ডাকত। মুখার্জী সাব বলতেন—বহিনজী। ঝিন্নির মা মারা যাবার দু বরষও পার হল নাই মুখার্জী সাব চলিয়ে গেলেন। দোসরা জনমে সাগা ভাই বহিন ছিল বাবুজী।

বোধহয় চাচাজী অদূর অতীতের দিকে চোখ ফেরালেন। হাতে ধরা রইল চায়ের কাপ।

আমি কোন কথা বললাম না। স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রৌঢ় একসময় হাতের কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, বাবুজী আপনা কোঠীতে আরাম করো,—বলেই নীচে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন।

একটু পরে ঝিন্নি এসে ঘরে ঢুকল। সে আর আমার দিকে চেয়ে দেখল না। টিপয়ের ওপর থেকে কাপ প্লেটগুলো নিয়ে থালায় সাজিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ও চলে যাচ্ছিল। বললাম, আলোটা নিভিয়ে দেবে?

দেয়ালের যেখানে সুইচ আছে সেদিকে ও এগিয়ে গেল, হাত বাড়াল কিন্তু নেভাল না। কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।

বললাম, তোমার হাতের রান্না খাবার লোভে আমার ঘুম আসবে না ঝিন্নি।

আমার কথা ঝিন্নির মুখে কি ছবি ফোটাল তা দেখার আগেই টুক করে একটা শব্দ হলো আর সারা ঘরখানা অন্ধকারে ভরে গেল। সিঁড়িতে অভ্যস্ত পা ফেলে ঝিন্নি অন্ধকারেই দ্রুত লয়ে নেমে গেল।

গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিলাম কিন্তু চোখ চেয়ে রইলাম। ঘরে অন্ধকার বাইরে অন্ধকার। হাওয়ার শব্দ একটানা কান্নার মত বেজে চলেছে। জানালার শার্সিতে চোখ পাতলাম। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে জোনাকীর মত আলোগুলো ঝিকমিক করে জ্বলছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আলোগুলোকে অনেক উজ্জ্বল দেখায়। ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখে ঘুম নেমে এল জানি না।

ভোরবেলা জেগে উঠে আমার প্রথম অনুভূতি হল, তিন-চারখানা কম্বলের তলায় আমি আরামে শুয়ে আছি। মুখ বের করে দেখলাম এক চিলতে রোদ আমার মাথার দিকের বন্ধ জানালা ফুঁড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মেঝেতে পড়ে আছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে রাতের কথাগুলো কানে বেজে উঠলো। ঝিন্নির গলা, 'আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে, তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।'

উত্তর একটা তখন দিয়েছিলাম কিন্তু ঝিন্নির কাছে হেরে গেলাম। রাতে ওরা যে আমাকে নানা কৌশলে জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে এটা আমার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। ছোটবেলা থেকে রাতে একবার বিছানা নিলে আমাকে ঠেলে ওঠানো দায়। বড় হয়ে এই বদভ্যাস তাড়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু স্বভাব নাকি মলেও যায় না এই প্রবাদের পাক্কা উদাহরণ হয়ে বসে আছি।

মনে মনে খুশি হলাম। ঝিন্নির কাছে হেরে গেছি বলে খুশি হলাম! অনেক সময় মানুষ মনে মনে হার মেনে সুখী হয়। আজ এই রোদে ভরা সকাল আমাব কপালে হারের একটা তিলক পরিয়ে দিয়ে আমাকে খুশি করে তুলল। বোদ্দুবের এক বিন্দু টিপ জানালার ফুটো দিয়ে আমার কপালের ওপর এসে পড়েছে। টিপটা আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে ছুঁয়ে আছে।

জানালাটা খুলতেই এক ঝলক কনকনে শীতের হাওয়া প্রথমেই আমাকে কাবু করে ফেলল। বেশ খানিকটা রোদ্দুর অবশ্য ঢুকে এলো খোলা জানালা দিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের কোলে আপেল বাগিচার একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝিন্নি। চোখ দুটো ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে আধবোজা, রোদের জলে যেন ভোর বেলাকার স্নান সেরে নিচ্ছে সে।

পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কোন মানুষেব সাড়া নেই। চাচাজী কোথাও বেরিয়ে থাকবেন হয়ত। আমি ঝিন্নির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে পেছন থেকেই বললাম, এখুনি চলে যাচ্ছি কিন্তু।

চমকে ও পেছন ফিরে চাইল। ঝিন্নির অবাকলাগা খোলা ঝিনুকেব মত চকচকে দুখানা চোখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

ঝিন্নির কথা চাচা নরসিংলালজীর মুখ থেকে কত প্রসঙ্গেই না শুনেছিলাম কিন্তু ওর মুখচোখেব টুকরো টুকরো অভিব্যক্তিগুলো যে এত নিটোল সুন্দর তা জানতাম না।

ও বলল, চাচাজী বাইরে গেছেন। এসে যদি শোনেন আপনি চলে গেছেন তাহলে বড় গুস্সা কববেন।

বললাম, ঝিন্নি, না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায় বল?

ও আমার মুখে কৌতুকের পাঠটা পড়তে পারল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরের দিকে চলতে লাগল। যেতে যেতে বলল, আপনি আসুন, আমি পাঁচ মিনিটে নাস্তার জোগাড় করে ফেলছি।

বললাম, যেও না, দাঁড়াও।

ও বাগানের শেষপ্রান্ত থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সব কথাকে এমন সিরিয়াসলি নাও কেন ঝিন্নি? তুমি কি মনে কর, এই ডিসেম্বরেব শীতে একহাঁটু বরফ ভেঙে নোবার আমি মানালীর বাংলোতে গিয়ে উঠব? আমাকে একবেলা খেতে দিলেও আমি অন্তত মাস দুয়েকের আগে এখান থেকে নড়ছিনে।

এবার ও হেসে ফেলল! দেখলাম, ঝিন্নির দাঁতগুলো নিখুঁত সাজান নয়। কিন্তু এমনি উঁচু-নিচু দাঁতে ওব হাসিটা আশ্চর্যভাবে মুখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

ও সরাসরি বলল, কাল রাতে কিন্তু অনেকবার খাবার জন্যে আমি আর চাচাজী আপনাকে সেধেছি। ঘুম ভাঙাতে পারিনি। এমন ঘুমকাতুরে আপনি!

বললাম, ধাক্কাধাক্কি করেছিলে?

ঝিন্নি সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে হাসল। হাসি থামলে বলল, এখন মনে হচ্ছে তাই করলে ঠিক হত।

আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে বললাম, তাতেও যদি ঘুম না ভাঙত, তাহলে এক মুঠো বরফ মুখেব ওপর চাপিয়ে দেখতে পারতে।

ঝিন্নি আবার তেমনি করে ঢেউ তুলে হাসল।

ঝিন্নির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচাজীর কাছে তোমার অনেক কথা শুনেছি কিন্তু তুমি যে কথায় কথায় এমন হাসি ঝবাতে পার তা জানতাম না।

আশা করেছিলাম, আমার কথাব জবাব ঝিন্নি হাসিতেই দেবে। কিন্তু এবার ও হাসল না। বলল, চাচাজী আপনার গল্পও অনেক করেছেন কিন্তু আপনি যে রাগ দেখাতে পারেন তা একটিবারও বলেননি।

এবার হেসে বললাম, দু-দুটো মাস রইলে তোমাদের কাছে, অনেক বদভ্যাসের খবরই এক এক করে পাবে। তখন হয়ত ভাববে, দুটো মাস যে আর ফুরোতেই চায় না।

ঝিন্নি মাথাটা একটু নাড়ল, তারপর কোন কথা না বলে পায়ে প'য়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সকালের জলযোগ পর্ব শেষ করে বাগানের ভেতর বেড়িযে বেড়ালাম। অনেকটা সময় ঘুরলাম কিন্তু কাক আর কাঠবেড়ালী ছাড়া মনুষ্যেতব অন্য কোন তৃতীয় প্রাণীর দেখা পেলাম না।

স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে আমার পরলোকগত পিতৃদেবকে মনে মনে কতবার যে তারিফ করেছি, তার হিসেব নেই।

জায়গাটা বেশ শান্ত নির্জন। দোকানপাট বেশ খানিকটা দূরে। কাছেপিঠে বসতির চিহ্ন নেই। নিতান্ত দরকার ছাড়া এ তল্লাটে কারো আসারও কথা নয়। যদি কেউ প্রকৃতি বা নিজের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে এ বাংলো বাড়ি সত্যিকার একটি আদর্শ স্থান।

এখানে আপেলের বাগান আছে, পাহাড় আছে, আর যা আছে তা আমাকে দেখাল ঝিন্নি। বাগান পেরিয়ে পাহাড় ঘুরিয়ে ও আমাকে নিয়ে এল নদীব ধারে। বলল, বিপাশা যে এত কাছে, তা আপনি ভাবতে পেরেছিলেন?

বললাম, না। আমাকে একেবারে অবাক করে দিলে!

আরও বললাম, ঘর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাহাড় ঘুরে একবার এখানে পৌঁছলে মনে হয়, একটা নতুন জগৎ আবিষ্কাব কবে ফেললাম। ঘরে বসে সারাদিন নদীর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল।

ঝিন্নি বললো, আমাবও ঠিক ঐ একই কথা।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে সামনেব দুটো মাস ভালোই কাটবে। অন্তত তোমার সঙ্গে গরমিলেব আশঙ্কাটা কম।

ঝিন্নি হাসল। পানপাতার মত সুন্দর মুখখানা একটুখানি কাৎ করে ভুরুর দিকে চাহনি হেনে হাসল।

পরক্ষণে হাসি থামিযে নদীর দিকে চেয়ে বলল, এখনও বিপাশার কলকলানি ছলছলানি আছে, কদিন পরে দেখবেন ধবধবে সাদা র‍্যাপারে গা ঢেকে চুপচাপ শুয়ে আছে।

নদীটা বেশখানিক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওপারে পাহাড়। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ে বরফ ঝকঝক করছে। নীল জলের একটানা স্রোত। কোথাও পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার তুলো ধুনছে।

বললাম, তোমার দেশের তুলনা নেই ঝিন্নি।

ও বলল, আমার দেশ বলছেন কেন? এ দেশ কি আপনারও নয়?

বললাম, তা ঠিক। এখানে নতুন যা কিছু দেখছি সবই ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কুলু ভ্যালি ছেড়ে যেদিন চলে যাব, সেদিন সত্যি কষ্ট হবে।

ঝিন্নি আমাব মুখের ওপব খানিকটা বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বলল, চাচাজী তবে কেন বললেন যে আপনি মানালীতেই প্র্যাকটিশ কববেন।

হেসে বললাম, আমাব ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামগুলো তাহলে তোমাব জানা হয়ে গেছে দেখছি। কথাটা হযত ঠিক বলেছেন চাচাজী, তবু বলা তো যায না। মন যতদিন চাইবে থাকার মেয়াদ ততদিন।

ঝিন্নি আর কিছু বলল না। অন্যমনে সে কি যেন ভাবতে লাগল। সকালের আলোটুকু ঝিন্নির গোল্ডেন অ্যাপেল রঙের মুখখানাকে বড় লোভনীয় করে তুলেছে। আমি আমার সামনের বন পাহাড় আর নদীর ছবি দেখব, না ঝিন্নিকে দেখব ভেবে পেলাম না।

ঝিন্নি বলল, আপনি কি এখন এখানে থাকবেন না কোঠীতে যাবেন?

বললাম, তুমি যাও ঝিন্নি, হয়ত চাচাজী এসে গেছেন। আমি খানিক বাদে আসছি।

ঝিন্নি বলল, চাচাজীর হুকুম নেই। কাল রাতে বলে দিয়েছেন, আপনাকে আগলে বেড়াতে।

বললাম, আমি কি ছোট একটা বাচ্চা যে আমাকে তুমি আগলে বেড়াবে?

ও আবার বলল, জানি না, হুকুম নেই একা ছেড়ে দেবার।

রাগ করে বললাম, সারাদিন যদি এখানে বসে থাকি, তাহলে তুমিও কি আমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকবে নাকি?

ঝিন্নি কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝলাম, ঝিন্নি দারুণ রকম পিতৃভক্ত। ও আমাকে নির্জনে রেখে এক পাও নড়বে না।

বাংলোর পথে পা বাড়িয়ে বললাম, চল তাহলে বাংলোতেই ফেবা যাক। এখানে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে জানলে কে নামত মানালী থেকে কুলুতে।

ঝিন্নি কোন উত্তর করল না। অপরাধীর মত মুখ নিচু করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আড়চোখে দেখলাম, ঝিন্নির মুখে একটা বিষাদের ভাব ছায়া ফেলেছে। চলতে চলতেই বললাম, তবে একটা লাভ, নিজের ইচ্ছেমত চলা ফেরার শক্তি হারালেও আর একজনের সঙ্গ পাওয়া যাবে।

ঝিন্নি এবারও কিছু বলল না। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরে এল।

মধ্যাহ্নভোজের খানিক আগে ফিরলেন নরসিংলালজী। মুখোমুখি হতেই বললেন, আখরা বাজারসে মাসকাবারী সওদা করে আনলাম। তোমার খানাপিনা হয়েছে তো?

বললাম, সকালে ঝিন্নি কাল রাতেব খাবারটা খাইয়ে দিয়েছে, তাই এত বেলাতেও ক্ষিদে নেই।

নরসিংলালজী দবাজ গলায় হেসে বললেন, বেটী খাওয়াতে পারলেই খুশি। একটু থেমে বললেন, বাবুজী, ওর মায়ের দিলটা বিলকুল এমনি ছিল। তোমার পিতাজী এ বাংলোতে ঠিক এই টাইমে এসে থাকতেন। আর ঝিন্নির মা দু-তিন মাহিনা ওঁকে বহুৎ যত্ন করে খাওয়াতো।

প্রৌঢ় নরসিংলালজী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ঝিন্নির মায়ের কথা বোধহয় ভাবতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, চাচা নরসিংলালজী আবেগপ্রবণ মানুষ। পারিপার্শ্বিক ভুলে তিনি নিজের ভেতর ঘুরতে লাগলেন। দেখলাম, ফেলে আসা জীবনের ব্যথাটুকু তিরতির করে কাঁপছে তাঁর চোখের তারায়।

যে অতীতকে আমরা কোনদিনও ফিরে পাব না তার জন্যে মনের ভেতর গভীর এক মমতা থাকে। বাইরের হাওয়ায় যখন অতীতের জানালাটা খুলে যায়, তখন ঐ কোমল মমতার গায়ে ছোঁয়া লাগে। আব অমনি ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে ব্যথার নদীটা।

ঝিন্নি এসে সামনে দাঁড়াল। নির্বাক দুটো মানুষেব দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, খানা রেডি, এখন চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।

পরিস্থিতিকে হালকা করাব জন্যেই বললাম, চাচাজী, আপনি বেশ লোকের জিম্মায় আমাকে ফেলে গেছেন যা হোক। ঘুমুলে পাহারা, হাঁটলে পাহারা, বসতে খেতে সব সময় পাহারা। ওর গার্জেনীব জ্বালায় সকাল থেকে জ্বলছি।

নরসিংলালজীর ধ্যান ভাঙল। তিনি হেসে বললেন, খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি? একা আমার ওপব খবরদারী করত, এখন আর একজন মানুষ পেয়েছে।

বললাম, একা একা কোথাও ঘুরে বেড়াই এটা বোধহয় ঝিন্নির পছন্দ নয়।

নবসিংলালজী বললেন, ওটা ওর দোষ নয় বাবুজী। তোমাকে একটু সামলে রাখতে আমিই বলেছিলাম।

কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম, কেন চাচাজী?

সে অনেক কথা, বললেন নরসিংলালজী, এখানে বনে বনে পাহাড়ের খাঁচ খোঁচে যোগ্নীবা থাকে।

ওরা বাবুজী কারো খারাপ ছাড়া ভাল করে না।

অবাক হয়ে বললাম, যোগ্‌নী কি, চাচাজী?

নরসিংলালজী বললেন, ওরা হল ইভল স্পিরিট। মারা যাবার পরেও এই দুনিয়ার মায়া কাটাতে পারে না। ঝোপঝাড়ের আঁধারে-আঁধারে, নিরালা পাহাড়ের কোণে কোণে ঘুপটি মেরে বসে থাকে। জান পহচানে আদমীকে বাগে পেলে ছোড়বে না। আর অচেনা মানুষ দেখলে ওরা তার পিছু আলবাৎ ঘুরবে। তার জান নিকলে ছাড়বে।

নরসিংলালজী প্রবীণ মানুষ। তাঁর এতদিনের সংস্কারে আঘাত দিয়ে লাভ হবে না জেনে চুপ করে রইলাম।

ঝিন্নির মুখের দিকে চাইলাম। বাবার বিশ্বাস তার মুখে কি ছায়া ফেলেছে তাই দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঝিন্নির মুখে কিছুই পড়া গেল না।

আবার বেলা পড়ে এলে ঝিন্নির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। চাচাজী সারা বছরের হিসেবের খাতা খুলে বসেছেন, তাই আমাকে সঙ্গ দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত হলেন। কিন্তু ঝিন্নিকে সঙ্গে দিতে ভুললেন না।

বাগান পেরিয়ে ঝিন্নি বলল, কোন দিকে যাবেন?

বললাম, যেদিকে যোগ্‌নী আছে।

ও একবার থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস হয়নি বুঝি চাচাজীর কথা? আপনার কপালে সত্যি দুঃখ আছে।

বললাম, দুঃখ যদি কপালে বিধাতাপুরুষ লিখেই থাকেন তাহলে তাকে খণ্ডাবে কে বল? ঝিন্নি শক্ত করে আমার হাতখানা টেনে রাখলেও কি আর যোগ্‌নীর হাতের টান থেকে আটকাতে পারবে?

ঝিন্নি চলতে চলতে বলল, আপনি ভীষণ অবিশ্বাসী।

বললাম, অবিশ্বাসী বোলো না। উদ্ভট কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই। সবকিছু যাচাই করে তবে বিশ্বাস করতে চাই।

আমরা এখন নদীর দিকের পাহাড়টাকে ডাইনে রেখে চলেছি। ঝিন্নি একটু পরেই বাঁদিকে বেঁকে একটা অতি সংকীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগল। পথটা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড়ের কোল জুড়ে ক্ষেতি। এখন কোন ফসল নেই। সব ফসলই ঘরে তোলা হয়ে গেছে। দূর থেকে ভারী সুন্দর লাগে ক্ষেতগুলো দেখতে। সমুদ্রের কয়েকটা আছড়ে পড়া ঢেউ যেন বেলাভূমিতে সীমাচিহ্ন আঁকতে আঁকতে সরে গেছে।

আমরা ক্ষেতি পেরিয়ে আসার সময় কাটা ফসলের পরিত্যক্ত অংশগুলো পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নামতে লাগলাম। অনেকখানি নিচে নেমে কয়েকটা দেওদারের জটলার ভেতর এসে পড়লাম। একটু পথ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামতে গিয়ে এই ডিসেম্বরেও আমার শরীরে তেমন কোন শীত বোধ হচ্ছিল না। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিঠে আওয়াজ কানে এসে বাজল।

ঝিন্নি এতক্ষণ একটি সোনার হরিণের মত শেষ বেলার রোদ্দুর গায়ে মেখে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল আর আমি সেই রবিঠাকুরের গানের মনোহরণ চপলচরণ হরিণটিকে অনুসরণ করে চলছিলাম। এখন ঝিন্নি থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলায় আমন্ত্রণের সুর তুলে বলল, এটা একেবারে আমার নিজস্ব জায়গা। আসুন বসা যাক।

বলতে বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে দেওদারের জটলার ভেতর ঢুকল ঝিন্নি। আমিও ওর পেছন পেছন বনের ভেতর ঢুকলাম। একটুখানি ভেতরে গিয়েই ঝর্ণাটার দেখা পেলাম। দুটো দেওদারের পাশ কাটিয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আধখানা বেড় দিয়ে জলের ধারা নেমে গেছে। ঝিন্নি বলল, জায়গাটা সুন্দর না? বসা যাক এখানে।

বসলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল। ঝিন্নি আমার একটু তফাতে ঐ পাথরের চাঁইটার নিচের ধাপে পা ঝুলিয়ে বসল। ও ইচ্ছে করলে পা ডুবিয়ে ঐ ঝর্ণার জল ছুঁয়ে খেলা করতে পারে।

বললাম, আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। মনে হচ্ছে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেন পালিয়ে এসে

লুকিয়ে আছে এখানে।

দেখলাম, আমার কথাটা শুনেই কেমন যেন চমক লাগলো ঝিন্নির দেহে। সে কিন্তু আমার দিকে চাইল না। মুখটা একবার তুলেই ঝর্ণার দিকে চোখ নামাল।

ঝিন্নি গাঢ় মেরুন রঙের একটা পোশাক পরেছে। কুলুর মেয়েদের পোশাক পরার বিশেষ ধরন আছে একটা। মনে হয় ওদের কাপড়ের ঘূর্ণিটা শুরু হয় বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর কাপড়খানাকে ডান কাঁধের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে বুক ঢেকে বাঁ কাঁধের তলা দিয়ে পিঠ বেষ্টন করে ডান কাঁধে ফেলে দেয়। পিন দিয়ে সুন্দর করে আটকে নেয় কাপড়টা। কোমর থেকে হাঁটু অবধি জড়িয়ে নেয় পছন্দমত রঙের ব্ল্যাঙ্কেট। শীতে ওরা উলেন ট্রাউজার পরে। গরমে প্রায় মেয়েরাই ট্রাউজার পরে না। নিটোল অনাবৃত পায়ের অনেকখানি অংশই তখন নজরে আসে।

গাঢ় নীল রঙের একটা ব্ল্যাঙ্কেট ঝিন্নির কোমর জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর পড়ে আছে হারখানা। লাপিস লাজুলি পাথর সেট করা পেন্ডেন্টটা ওর বুকের ওপর জেগে ওঠা দুটি নিটোল স্তূপের মাঝখানের উপত্যকায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

এই মাত্র শেষ বেলার কয়েক টুকরো রোদ ডালপালার ফাঁকে এসে পড়ল ঝর্ণা আর ঝিন্নির ওপর। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ঝিন্নি অসাধারণ। ওর তারুণ্য বেলা শেষের রোদ মেখে ঝর্ণার জলে যেন সোনার বিন্দুর মত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনে নেই ওকে দেখার মোহে কতগুলো মুহূর্ত আমার পার হয়ে গিয়েছিল। এক সময় ঝিন্নিই কথা বলতে শুরু করল, আমি কোঠীতে এলে রোজ বিকেলে এখানে চলে আসি। আমার খুউব ভালো লাগে এখানে একা একা বসে থাকতে।

বললাম, তোমার জমিদারীতে এমন অবাক করে দেবার মত জায়গা আরও কটি আছে ঝিন্নি?

ও আমার দিকে তাকাল। মুখে মিষ্টি হাসি। বলল, আমার জমিদারী বলছেন কেন, এ তো আপনারই জমিদারী। আমাদের দয়া করে দেখা শোনার ভার দিয়েছেন।

কথাটা সোজা আমার মনের ওপর এসে ধাক্কা দিল। কথা সত্যি হলেও অনেক সময় তার সূক্ষ্ম আঘাত দেবার একটা ক্ষমতা থাকে। ঝিন্নির কথায় সেই আঘাতটা বুকে এসে বাজল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে এক সময় বললাম, দয়ার কথা এল কেন ঝিন্নি। আমার বাবার সঙ্গে কি তোমাদের দয়ার সম্পর্ক ছিল?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগে প্রতিবাদ করে উঠলো, না-না কখনো না।

হেসে বললাম, তাহলে? বাবার পরে আমার ওপর তোমাদের ভরসাটা নিশ্চয়ই কমে গেছে।

ঝিন্নি বলল, রাগ করবেন জানলে কথাটা বলতাম না। এখন ক্ষমা করা আর না করা আপনার দয়া।

বললাম, ক্ষমা কেবল একটি শর্তেই করা যেতে পারে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর চোখ রেখে তাকাল।

বললাম, দয়া কথাটাকে আজ থেকে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। অন্তত আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঐ শব্দটি কোন রকমেই তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না, এ প্রতিশ্রুতি চাই।

ঝিন্নির মুখে চোখে হাসি উপছে পড়ল। সে চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, আমার কথা সে মেনে চলবে।

বললাম, ঝিন্নি তুমি ভাল করেই জানো, মা মারা যাবার পরে আর বাবাকে কাছে পাইনি। দশ বছরের ছেলে, থেকেছি মাসির বাড়ি। তারপর আরও পনেরটা বছর কেটে গেছে কলকাতায়। শুধু মাসের প্রথমে মানিঅর্ডারের পাতায় ছিল বাবা আর ছেলের যোগাযোগ। সেদিক থেকে বরং বলব তোমরা তাঁর অনেক কাছের মানুষ। অনেক আপনার জন। তাই তাঁর এই কুলু ভ্যালির দু'দুটো সম্পত্তির ওপর তোমাদের দাবীটা আমার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং অনেক বেশি বলেই মনে হয় আমার।

হঠাৎ কি হলো ঝিন্নির, চোখ দুটো তার ছলছলিয়ে উঠল। দুটো হাতের পাতায় সে মুখ ঢেকে ফেলল।

বললাম, কি হল ঝিন্নি, অমন করছ কেন?

ও আমার কথায় আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

এই প্রথম আমি ঝিন্নির মাথায় হাত রেখে নাড়া দিয়ে বললাম, কান্নার কি হল ঝিন্নি, আমি তো তোমাকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলি নি।

কিছু পরে ঝিন্নি চোখের জল মুছে স্থির হয়ে বসল। তারপরেও অনেকক্ষণ তার পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব হল না।

আমি এক সময় বললাম, তোমাকে যদি কোন কারণে দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে তুমি ছোট হলেও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ও আমার নিচের ধাপে বসেছিল। হঠাৎ হাতখানা আমার হাঁটুর কাছে ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। বলল, ক্ষমার কথাই উঠছে না। মনের খুশি ধরে রাখতে পারলাম না তাই আঁসু হয়ে গড়িয়ে এল।

বললাম, কিসে এমন খুশি হয়ে উঠলে ঝিন্নি?

আপনার কথায় বাবুজী।

ব্যাপারটা ধরতে না পেরে ওর মুখেব দিকে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, আজ এখুনি আমি যে কত খুশি তা আপনাকে কেমন করে বোঝাব বলুন।

কথা থামিয়ে ঝিন্নি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির চাহনি মেলে বসে রইল। তার মুখে তখন আশ্চর্য এক সুখ খেলা করছিল। খুশির সূক্ষ্ম আলোর ঢেউগুলো যেন উপচে পড়ছিল তার চোখেব তারা থেকে।

ঝিন্নি বলল, আপনার পিতাজী মারা যাবার মাস খানেক আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যাবার সময় এগিয়ে আসছে। তিনি আমার বাবাকে ডেকে বললেন, সব সম্পত্তি তোমার নামে আমি লিখে দিতে চাই। আমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে, তার পথ সে দেখে নিতে পারবে।

চাচাজী অমনি বললেন, তা হয় না দাদাজী। ভাতিজার সঙ্গে আমি বেইমানী করতে পারবো না। দোহাই আপনার এমন অনুরোধ আপনি করবেন না।

পিতাজী অমনি রাগ করে বললেন, চিরকালটা গোঁয়ার রয়ে গেলে নরসিংলাল। শেষে হয়ত পস্তাতে হবে।

চাচাজী কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন, দাদাজী, তোমার ছেলের কথাটা ভেবে দেখ একবার। আমরা পেলাম তোমার পুরা ভালবাসা আর ও বেচারা পাবে তোমার শুকনা পাত্থর আর মাটি। আমি এও জানি দাদাজী, তোমার লেড়কা বাপকা বেটাই হবে। তোমার দিল ও জরুর পাবে।

একটু থেমে আবার বলল, ঝিন্নি, তাই কাঁদছিলাম। আপনার ভেতর আপনার পিতাজীর দিল দেখে কাঁদছিলাম।

আমি এবার বললাম, তোমার ধারণাটা একদিন যদি ভুল হয়ে যায় ঝিন্নি? হয়ত দেখবে কুলুর দু'দুটো আপেল বাগিচার মালিক হয়ে আমি তোমাদের বেমালুম ভুলে গেছি।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। বলল, ঝিন্নির আন্দাজ কখনো ভুল হয় না বাবুজী।

বললাম, নিজের ধারণার ওপর এতটা ভরসা নাইবা রাখলে। পরে কোনদিন আঘাত এলে সহজে সামলাতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে দুজনে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলম যে ঝর্ণার জল থেকে রোদের সোনালী উত্তরীয়খানা কখন গাছের ডালে পাতায় দুলতে দুলতে পাহাড়ের আড়ালে উড়ে চলে গেছে তা জানতে পারিনি। কথা বলার ভেতর দিয়ে একটা ভাল লাগা আমাদের দু'জনের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন কথার টানাপোড়েনে একটা নকসী পাড় বোনা চলছিল এতক্ষণ। কথাগুলোর হয়ত বিশেষ কোন ব্যবহারিক অর্থ ছিল না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সেই টুকরো টুকরো কথার।

খেয়াল হলো হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসায়।

ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার জন্যে কান পাতল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

ঝিন্নি অসংকোচে আমার হাতখানা ধরলো। বনের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ঝড় উঠেছে একদম খেয়াল হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ওপরে।

আমি ঝিন্নির হাত ধরে ঐ সরু ভাঙা পথে ওপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ে আন্দাজ করে পথ চলা বড় কঠিন। সন্ধ্যার মুখে যে অস্পষ্ট আলোটুকু পথ দেখায়, কয়েকটা মেঘের তাল আজ তা শুষে নিয়েছিল।

থেকে থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠছিল। ওর নির্দেশেই আমি প্রায় অন্ধের মত পা ফেলে ফেলে চলছিলাম। কোন কোন জায়গায় ও আমাকে নিচ থেকে টেনে ওপরে তুলছিল। ওর শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

বাগানের খানিক নিচে থেকেই শুনতে পেলাম চাচাজীর গলা। তিনি ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঝিন্নি আর আমার নাম ধরে ডাকছিলেন।

ঝিন্নি মুখের ওপর হাত দুটো বিশেষ ভঙ্গীতে জড়ো করে এক ধরনের শব্দ করল। অমনি চাচাজীর ডাক থেমে গেল। মনে হল আমাদের অবস্থান জানতে পেরে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী আমাদের খোঁজে নদীর দিকে গিয়েছিলেন।

বললাম, বুঝলে কি করে?

ও বলল, ওঁর ডাকগুলো আসছিল নদীর দিকের পাহাড়টার কোল থেকে।

তারপর আবার বলল, আমরা যে এত নিচে ঐ দেওদার বনের কাছে চলে গেছি তা চাচাজী ভাবতে পারেন নি।

বললাম, সত্যি এতটা পথ গিয়ে আমরা বোধহয় ভাল করিনি। চাচাজী আবার না রাগ করে বসেন।

ঝিন্নি বলল, এতক্ষণ তো গল্প করলেন, এখন না হয় একটু বকুনিই খেলেন। বকুনি খাবার অভ্যেস বুঝি নেই আপনার?

আমরা ততক্ষণে আপেল বাগিচা পেরিয়ে বাংলোর চাতালে এসে পড়েছি। ঝিন্নি আচমকা আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

বললাম, এখনও আমি অন্ধ হয়ে আছি ঝিন্নি, কিছু ঠাওর করতে পারছি না।

ভেতর থেকে কোন আওয়াজ এলো না, হঠাৎ সারা উঠোন বিজলী আলোর তরঙ্গে ভেসে গেলে।

বাংলোর ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আশ্চর্য এক অনুভূতি হল। ঝিন্নির খুশি যেন একঝলক আলো হয়ে আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে!

সন্ধ্যে থেকে হেঁকে হেঁকে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আমরা তিনজনে একই সঙ্গে বসে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ হলে নরসিংলালজী কয়েক মিনিট ব্যবসা-বাণিজ্যের মামুলি দু'একটা কথা তুললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়া না পেয়ে বললেন, বাবুজী, নিদ যাও।

বলেই তিনি বাইরের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

এই বাংলোবাড়ি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বাগানের অপর প্রান্তে আর একখানা আউট হাউস তৈরি করেছিলেন। দিল্লী কলকাতার মত দূর দূর সিটি থেকে যেসব ক্রেতারা ফল আর পশমিনার ‒ ন্য আসত, তাদের থাকতে দেওয়া হত ঐ আউট হাউসে।

আমি আসার পর ওপরের ঘরখানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে নরসিংলালজী আউট হাউসে আস্তানা পেতেছেন। আমি বাধা দিয়েছিলাম এ ব্যবস্থায় কিন্তু ফল হয় নি। আমার বাবা নাকি এই ঘরটি ব্যবহার করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাকেও তাই করতে হবে।

রাতে নরসিংলালজী বাগান পেরিয়ে শুতে চলে গেলে আমিও ওপরে উঠে এলাম। সন্ধ্যে থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আজ লেপের তলায় নিজেকে সঁপে দিয়েও শীতের হাওয়ার কনকনে কামড়

থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমার শীতবোধ একটু মাত্রা ছাড়ানো। তাই এখানকার শীত আমাকে একেবারে যেন পেড়ে ফেলল। পায়ের তলায় একস্ট্রা কম্বলখানা লেপের ওপর চড়াতে গেলাম। তার ফাঁকযোকরে শীতের হাওয়া ঢুকে আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে! একপাশ হয়ে পড়ে থাকলে তবু একবকম। পাশ ফিরলেই বরফের একখানা তলোয়ার সিধে হাড় অব্দি গেঁথে যায়।

তখন রাত কত খেয়াল নেই, ঘরের ভেতর অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতে ঘুমুলে আমাকে জাগিয়ে তোলা রীতিমত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের সামিল, কিন্তু জবরদস্ত শীতের দৌরাত্মে ঘুমটা হেমন্তের হিমের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাই সামান্য শব্দটুকুও কানে বাজল। চেয়ে দেখি অন্ধকার ঘরের কোণে কি যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার চলছে। দগদগে লাল ডুবুডুবু সূর্যের মত কি একটা বস্তু দপদপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ওর পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আমি শীতের ভয় ছেড়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারপাইয়ের করুণ কান্না ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

কে ?

নিজের গলার স্বর নিজের কানেই কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল। দরজার পাশে তখন সেই ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঝিন্নি।

বললাম, এত রাতে ! ঘুমোও নি?

মনে হল ও খুবই সংকুচিত হয়েছে গভীর রাতে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ায়। বেশ কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আপনার খুব শীত করতে পারে মনে হল, তাই রুম-হিটারটা জ্বালিয়ে দিতে এসেছিলাম।

ও আর কোন কথা বলল না। চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আমি বললাম, তুমি হয়ত ভেবেছ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু ঘুম আসে নি আমাব। কেমন যেন শীত শীত করছে। লেপে কম্বলে শীতটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না।

ও ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আজ হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই আপনার তকলিফ হতে পাবে ভেবে পিতাজীর পুরনো হিটারটা জ্বালিয়ে দিলাম।

সাগ্রহে জানতে চাইলাম, আমার বাবা বুঝি আমার মত শীতকাতুরে ছিলেন ঝিন্নি?

ও বলল, নভেম্বরের শেষ থেকেই প্রতি রাতে ওঁর ঘরে হিটার জ্বালানো চাই। আমার ওপর পিতাজী এটুকু কাজের ভার দিয়েছিলেন।

বললাম, তোমার ঘুমটা নষ্ট হলো ঝিন্নি। এত রাতে আমার কষ্টের কথা ভেবে এসেছ, ভারী খারাপ লাগছে তাই। শীতের রাতে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হল।

ও বলল, আপনি এসব কথা মনে করছেন কেন? আমার হঠাৎ মনে হল তাই ওপরে চলে এলাম। কেন জানি না বিছানায় শুয়ে পিতাজীর কথা মনে এল। ভাবলাম ওঁর স্বভাবের সঙ্গে আপনার মিল থাকা তো স্বাভাবিক। হয়তো শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন।

বাবার কথা উঠলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অভিমান হয় কেন তিনি আমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন। মায়ের মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু যাকে এ পৃথিবীতে আনলেন তার ওপর কেন তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করলেন না। বাবা আর ছেলের সম্পর্ক কি শুধু কর্তব্যের?

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। রুম-হিটারের লাল আগুনের হাল্কা একটা আভা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে প্রথম বসন্তের হাওয়ার মত একটা উপভোগ্য উত্তাপ আমার শরীরটাকে ছুঁয়ে ভারী সুখকর এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি করেছে।

বললাম, ঝিন্নি, বড় কষ্ট হয় বাবার কথা ভেবে। যখন বাবাকে কাছে পেয়েছিলাম তখন বাবার জন্যে তেমন কোন মনের টান ছিল না। যখন বাবাকে দেখার জন্যে মন অস্থির তখন আমার চোখের

আড়ালে সরে গেলেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কিন্তু আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য পিতাজীকে বারবার বলতেন। পিতাজীর ঐ এক কথা—নরসিংলাল আমার ছেলের মুখখানাতে যদি তার মায়ের মুখের ছাপ না থাকত তাহলে হয়ত কুলুতে আসার আগেই আমি দেশে ফিরে যেতাম। ওকে দেখলে আমি অস্থির হয়ে পড়ব।

এতদিন বাবার পালিয়ে বেড়ানোর ভেতর যে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছিল তার ওপর নতুন একটা আলো এসে পড়ল। বাবা তাহলে তাঁর ছেলেকে ভোলেন নি। মায়ের সঙ্গে অভিন্ন আকর্ষণে আমিও তাহলে জড়িয়েছিলাম তাঁর মনের মধ্যে।

ঝিন্নি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, বড় খারাপ লাগছে, তুমি দাঁড়িয়ে আছ এমনি করে। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়। কোন চিন্তা নেই, ঘর কিছুটা গরম হয়ে উঠলেই সুইচটা আমি অফ করে দেব।

ও বলল, আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আমিই অফ করে দিয়ে চলে যাব। বিছানায় না বসে থেকে শুয়ে পড়ুন তো দেখি।

হেসে বললাম, একজন আমার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একথা ভাবলেই আমার ঘুম আসবে না। তার চেয়ে ইচ্ছে হলে আমার বিছানায় বসে গল্প করতে পার। আমার এখন ঘুম আসবে না।

ঝিন্নি বললো, ভারী অদ্ভুত স্বভাব তো আপনার। ঘুমের ব্যাপারে যেমন ওস্তাদ জেগে থাকার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

বললাম, পরীক্ষার সময় অনেকগুলো রাত একনাগাড়ে বই নিয়ে জেগে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে পড়ি নি। আবার দু'এক ঘণ্টা বাদ দিয়ে দিনে-রাতে শুধু পড়ে পড়ে একটানা পাঁচ-সাতদিন ঘুমিয়েছি, এ নজীরও আছে।

ঝিন্নি আমার বিছানার কোণায় এসে বসল।

একটা কম্বল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এটা মুড়ি দিয়ে বস। শুধু একখানা গরম জামায় আর যা হোক ডিসেম্বরের শীত তাড়ানো যায় না।

ও কিছু না বলে কম্বলখানা গায়ে ঢেকে নিল।

বললাম, এখন অনেকটা আরাম হচ্ছে তো?

ও বলল, আমার সবেতেই অভ্যেস আছে। নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর কোয়ার্টারে আমি ভোর চারটেতে উঠি। একখানা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোর হতে দেখি।

বললাম, বরফের পাহাড় আর বিপাশার দেশে থেকে দেখছি তোমার শীতবোধটা একেবারেই চলে গেছে।

ঝিন্নি কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, একটু আগে আপনি আপনার ঘুমোনো আর জেগে থাকার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন না? আমি কিন্তু তখন আপনার ঐ অদ্ভুত স্বভাবের সঙ্গে আপনার পিতাজীর অনেক মিল দেখতে পাচ্ছিলাম।

বাবার প্রসঙ্গে কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম, যেমন?

ঝিন্নি বলল, পিতাজী তাঁর জীবনের অনেক গল্প আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অদ্ভুত কতকগুলো স্বভাবের কথা জানতে পেরেছিলাম।

ও চুপ করে গেল দেখে বললাম, বাবার কথা আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে ঝিন্নি।

ঝিন্নি বলল, আপনি হয়তো জানেন না পিতাজী একসময় দেশছাড়া হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বার পেরিয়ে সপ্তধারায় যান। সেখানে সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরের মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি শোনেন। দূরের নীল পাহাড়, গঙ্গার নীল জল, নীল আকাশ, পবিত্র তপোবন, সব যেন তাঁকে টানতে থাকে। সেখানে একটি মন্দিরে তিনি অনেকগুলি দিন কাটিয়ে দেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘণ্টা বাজানোর কাজ ছিল তাঁর। ছোট-বড় অনেকগুলো ঘণ্টা বিভিন্ন আওয়াজ তুলে বাজত! নির্জন প্রকৃতির বুকে সে সব শব্দ আশ্চর্য সুর তুলে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি কান পেতে তাই শুনতেন।

বেশ বিভোর হয়ে ছিলেন গঙ্গাতীরের মন্দিরে। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, আমি স্বার্থপরের মত এখানে শান্তিতে বসে আছি আর আমার ছেলে হয়ত কষ্ট পাচ্ছে টাকার অভাবে। অমনি ব্যবসার ঝোঁক চাপল। পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে গরম পুলওভার বোনালেন। সেগুলো নিয়ে সমতলের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ে দিলেন।

এমনি যখন অনেক টাকা হল তখন আপনাব কাছে কিছু পাঠিয়ে দিলেন আর বাকী টাকা তীর্থেব পথে পথে কয়েকটা চটি বানানোর জন্যে খরচ করে দিলেন।

বললাম, অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন দেখছি।

ঝিন্নি বলল, এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলেন কুলুতে। ভারী ভাল লেগে গেল জায়গাটা। অতি সামান্য টাকা তখন হাতে। কিন্তু সম্বল ছিল ওঁব বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়েই আবার ব্যবসা শুরু হলো। ফুলে ফেঁপে উঠল পশমিনার কারবার। তারপর ধীরে ধীরে মানালী আর কুলু দু-জায়গাতেই বাংলো তুললেন। কিনলেন দু-দুটো ফলের বাগান।

বললাম, চাচাজীর সঙ্গে আলাপ হল কখন?

কুলুতে আসাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাচাজীর সঙ্গে আলাপ। সেই থেকে চাচাজী আপনাদেব ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন!

বললাম, এখনও কিন্তু তুমি তোমার পিতাজীকে নিজের বলে ভাবতে পারনি ঝিন্নি!

ঝিন্নি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, কি কবে একথা বলছেন আপনি? যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁকে ডাকছি চাচাজী বলে, আর আপনার বাবাকেই ডেকেছি পিতাজী বলে, তাতেও কী বোঝা যায় না আমি ওঁকে কতটা ভালবাসতাম।

বললাম, তাহলে তুমি তোমার পিতাজীর ব্যবসাটাকে নিজের বলে ভাবতে পারছ না কেন? বারবাব ওটা আমাদেব সম্পত্তি বলেই বা উল্লেখ করছ কেন?

ঝিন্নি চুপচাপ বসে রইল। বলল, আপনার বাবা কোনদিন খাতার হিসেব দেখতেন না। আমাব বাবা যেখানে বলতেন সেখানেই তিনি না দেখে সই করে দিতেন, কিন্তু আপনি নতুন এসেছেন।

বললাম, আমাব মেজাজ মর্জি কেমন হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না তাই না ঝিন্নি?

ঝিন্নি আর কিছু বলল না।

আমি বললাম, বিষয়ের টান কোনদিন আমাকে কুলুতে টেনে আনতে পারত না ঝিন্নি। বাবাব সম্পর্কে কৌতূহল মেটাবাব ইচ্ছাই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। যে মিষ্টিরিযাস মানুষটি জীবিত থাকতে ছেলের দিকে তাকালেন না সে মানুষটি কি ধাতুতে গড়া তাই জানবার জন্যে তোমাদের কাছে আসা। হিসেবী মানুষ আমিও কোনদিন নই তবে কাজ ভালবাসি বাবার মত।

ঝিন্নি বলল, আমার কথায় গুস্‌সা করবেন না। ভুলত্রুটি হলে মাপ করে নেবেন।

বললাম, ঝিন্নি, কুলুতে এসে এমন বাঁধা পড়ে গেলাম, মনে হচ্ছে হঠাৎ করে দেশে ফেরা বুঝি সম্ভব হবে না।

হেসে আবার বললাম, চারদিকে এমন সব ছবি সাজিয়ে রেখেছ তোমরা যে তাই দেখতে দেখতে জীবনটা ফুরিয়ে যাবে তবু ছবি দেখা শেষ হবে না।

ঝিন্নি বলল, এ আপনার কৃপা।

হঠাৎ বলে ফেললাম, ঝিন্নি, আমার সম্বন্ধে চাচাজী কি বলেন একটু জানতে ইচ্ছে করে। মানালীতে তো কাটালাম কমাস একই সঙ্গে।

ঝিন্নি হাসল। হাসি থামলে বলল, সে শুনতে নেই।

বললাম, কেন?

ও বলল, শুনলে বহুৎ গুস্‌সা হবে আপনার।

তবু বল। শুনতে ইচ্ছে করছে।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী বলেন আপনি বিলকুল বাচ্চা, কিছু বোঝেন না, বুঝতেও চান না।

বললাম, কি হবে ওসব বুঝে বল? এতকাল চাচাজী একাই বুঝে এসেছেন, দরকার কি আমার মাথা ঘামিয়ে। আমি বরং একটা প্রস্তাব করেছি চাচাজীর কাছে।

ও বলল, তাও শুনেছি।

কি শুনেছ বল?

ঝিন্নি বলল, আপনি মানালীতে একটা দাওয়াইখানা খুলে প্র্যাকটিশ চালাতে চান।

বললাম, চাচাজীর কি মত বুঝলে?

ঝিন্নি বলল, উনি আর কি বলবেন, আপনার ইচ্ছে মতই কাজ হবে। শুধু বললেন, বেটা বিলকুল দাদাজীর মত হয়েছে। বুড়ো বয়স অবধি এই ব্যবসার কাজে আমাকে খাটিয়ে ছাড়বে।

হেসে বললাম, যার কাজ তারই সাজে ঝিন্নি। ওসবে নাক গলাতে যাবার কোন মানেই হয় না।

ঝিন্নি বলল, সত্যি এখন মনে হচ্ছে আপনার আর পিতাজীর ভেতর কোন ফারাক নেই।

ঘরটা অনেকখানি গরম হয়ে উঠেছে। ঝিন্নি তার গায়ের থেকে কম্বলটা সরিয়ে রাখতেই বললাম, উঠছ বলে মনে হচ্ছে?

কতক্ষণ আর আপনার ঘুম নষ্ট করব বলুন।

তুমি ঘুমুতে চলে গেলেও আজ রাতটা আমার জেগে জেগেই কাটবে ঝিন্নি।

ও বলল, তা কেন হবে, এখনও অনেক রাত বাকি। একটু চেষ্টা করলেই ঘুম এসে যাবে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো দেখি, আমি মাথাটা ম্যাসাজ করে দিচ্ছি। আপনার নিদ আলবৎ এসে যাবে।

হেসে বললাম, তাহলে তো এখুনি শুয়ে পড়তে হয় ঝিন্নি। কিন্তু মাথা ম্যাসাজের ব্যাপারটা শিখলে কোত্থেকে ?

পিতাজী শিখিয়ে দিয়েছেন, বলল ঝিন্নি।

আমি আর কোন কথা না বলে লেপখানা গায়ে টেনে নিয়ে বললাম, দেখি তোমার হাতের ম্যাজিক। ওতেই হয়ত ঘুমটা এসে যাবে, আর তাহলে তুমিও রাত জাগার হাত থেকে রেহাই পাবে।

ঝিন্নি আমার চুলের ভেতর হাত চালিয়ে বিলি কাটতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে কোন একটা সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

মনে হলো কলকাতার এক আবর্জনা ভরা গলি থেকে অ্যারেবিয়ান নাইটস-এর কোন এক জিন আমাকে তুলে এনে কুলুর এই নির্জন সীমাহীন সৌন্দর্যের জগতে শুইয়ে রেখে দিয়ে গেছে। আমি এইমাত্র এক হুরীকে আমার মাথার পাশে বসে পালকের মত নরম আঙুলে আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে দেখছি।

আমি এবার চোখ বন্ধ করলাম। জানি, চেয়ে থাকলেই ঝিন্নির হাত চলবে আর ও জেগে থাকবে সমানে। ওকে বেশি সময় কষ্ট দিতে সংকোচ হচ্ছিল, কিন্তু ও চলে যাক এটা মন কোন রকমে মেনে নিতে চাইছিল না। অনেক সময় ও আমার চুলে বিলি কাটল। আমি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছি দেখে ও একবার আমার মাথা থেকে হাত তুলে নিল। তারপর আবার কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে হাত চালাতে লাগল চুলের ভেতর। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ভাবছে ঝিন্নি। কারণ ওর হাতটা একবার থামছে আবার চলছে। ভাবনার ভেতরে থেকে যেমন কাজটা হতে থাকে এলোমেলো।

এবার ও হাতের কাজ থামিয়ে মনে হলো আমার চোখের ওপর সিধে ওর মুখখানা নামিয়ে এনেছে। উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেলাম আমি। সে নিঃশ্বাস ঢেউয়ের মত আমার সারা শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় ও অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর চারপায়ার শব্দ বেজে উঠল না। আমি চোখ চেয়ে দেখলাম ঝিন্নি মাথার কাছের জানালাটা টেনেটুনে ভাল করে বন্ধ করে দিল। সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে হিটারের সুইচটা অফ করল।

এখন ঝিন্নি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল। যতক্ষণ হিটারটা সামান্য এক আধটু আলো ছড়াল, ততক্ষণ ওর শরীরটার উপস্থিতি অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। হিটারটা একেবারে নিভে গেলে ঝিন্নিও অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি এখন ওর পায়ের মৃদু সাড়া পাচ্ছিলাম। ও আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। অনুভবে বুঝলাম, লেপের ওপর ধীরে ধীরে কম্বলখানা টেনে দিল। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অতি সন্তর্পণে ওর হাতের একটা মৃদু ছোঁয়া লাগল মাথায়। তারপর হাতখানা তুলে নিল ও। শেষ স্পর্শ রেখে ও চলে যেতে চায়। হয়ত বা আমার ঘুমের নিবিড়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যেতে চায়।

ও ফিরে দাঁড়াতেই অন্ধকারে অনুমানে ওর হাতখানা ধরে ফেললাম।

চমকে ও ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু জোর করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না। আমার বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে অস্পষ্ট গলায় বলল, আপনি ঘুমোন নি!

বললাম, কষ্টই যখন পেলে তখন পুরোপুরি কষ্টটা ভোগ করে যাও। এসো আজ রাতটা গল্প করেই কাটিয়ে দিই। কপালে আজ আর ঘুম নেই।

ঝিন্নি বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টু তো, কেমন ঘুমের ভান করে এতক্ষণ পড়েছিলেন।

ওর হাতটা আমার হাতে ধরা রইল।

বললাম, তুমি তো আমার বন্ধ চোখের ওপর চেয়ে চেয়ে অনেক পরীক্ষা করলে, কই ধরতে পারলে কিছু?

ও বলল, ছল করে পড়ে থাকলে কি ধরা যায়।

আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। আমার গায়েব থেকে কম্বল আর লেপ খসে পড়ে যেতেই ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে ওগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে বলল, এমন করে খোলা গায়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। তখন আপনার আর কি, শাস্তি পাবে অন্যে।

কথাগুলো শেষ করে ও সুইচ বোর্ডের কাছে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাধা দিয়ে বললাম, দোহাই তোমার ঝিন্নি, আলোটা আর জ্বেলো না।

ততক্ষণে ও টুক করে সুইচটা অন করে দিয়েছে। আমিও আলোর ঝলক থেকে চোখ বাঁচাব বলে দুটো হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছি।

কিন্তু আলো কই! অন্ধকার তেমনি নিশ্ছিদ্র। চোখ চেয়ে দেখি হিটারটা ঘরের কোণে ধীরে ধীরে আবার রাঙা হয়ে উঠছে। আর তারই আভায় ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে ঝিন্নি।

বললাম, গায়ের ঢাকাগুলো খুলে ফেলতে বড় ইচ্ছে করছে ঝিন্নি।

ও চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেন এমন করছেন?

বললাম, তোমাকে শাস্তি দেব বলে। আমি অসুখে পড়লে তোমারই তো শাস্তি।

ও হেসে বলল, কখন কি বলেছি, তাই অমনি মনে করে রেখে দিয়েছেন।

বললাম, আমার মেমারি খুব সার্প ঝিন্নি। সহজে কোন কিছু ভুলি না। অন্ধকার, হিটারের হালকা রাঙা আভায় তরল হয়েছে, কিন্তু মুছে যায় নি।

ঝিন্নি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, সে আর এগিয়ে এল না। রাতে তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ঝিন্নিকে আর ওতেই ও কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে!

ঝিন্নি বলল, কাল ভোরবেলা আর নাস্তা খেতে পাবেন না। রাত শেষে বিছানায় গেলে বেলা হবে বিছানা ছাড়তে।

বললাম, নাস্তা রোজ সকালেই তোমার হাতে খেতে পাবো, কিন্তু রোজ রাতে তো আর গল্পের জন্যে ঝিন্নিকে পাব না।

ঝিন্নি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটা কুর্শি আমার চারপায়ার কাছে তুলে এনে বসল।

বললাম, কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বস। তুমি আবার শাস্তি দিতে চাও নাকি কাউকে?

ঝিন্নি মাথা দোলাতে দোলাতে সেতারের মিষ্টি বাজনার মত হাসি ছড়িয়ে বলল, আপনাকে ডাক্তারী করার একটা সুযোগ দিতে চাই। ডাক্তারের হাতযশের পরীক্ষাটা আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক।

বললাম, আমি তেমন ডাক্তার নই। রোগ হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখলেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে দি। তাই রোগে পড়ার সুযোগই কেউ পায় না।

ঝিন্নি আবার হেসে উঠল।

বললাম, চাচাজী যদি তোমার হাসি শুনতে পান তাহলে এক্ষুনি কিন্তু এখানে এসে হাজির হবেন।

ঝিন্নি বলল, সারাদিন কাজের ভেতর ঘুরে বেড়ান তাই বিছানা নিলে আর ওঁর জ্ঞান থাকে না।

অন্য প্রসঙ্গে এলাম।

আচ্ছা ঝিন্নি, নাগ্‌গরে একা একা থাকতে বোর ফিল কর না?

নাগ্‌গরের কথায় ঝিন্নি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, একটুও না। আমি ছবি খুব ভালবাসি। তাই আর্ট গ্যালারীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি দেখে কাটাতে আমার একটুও খারাপ লাগে না।

একটুখানি থেমে ঝিন্নি আবার বলল, ছবির গ্যালারী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেও চারদিকে ছবি দেখতে পাই। যে ছবি এক সময় শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ দেখতেন।

হঠাৎ মনে এল, তাই বললাম, তুমি ছবি আঁকতে পার ঝিন্নি?

ও বলল, সিমলাতে থেকে পড়াশোনা আর ছবি আঁকার কাজই তো করেছি।

একটু অবাকই হলাম। বললাম, এত দূরে থেকে এই সব করতে তুমি?

ঝিন্নি বলল, পিতাজী চেয়েছিলেন তাই ওখানে যেতে হয়েছিল। তিনি নিজে গিয়ে রেখে এসেছিলেন। পিতাজী যা ভাল মনে করতেন তাই করতেন, ঘরের আর সবাই তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিত। তাঁর ওপর কারো কোন কথা চলত না।

বললাম, নাগ্‌গরের আর্ট গ্যালারীর কেয়ারটেকারের চাকরিটা কি পিতাজীই করে দিয়েছিলেন নাকি ?

ঝিন্নি বলল, না। এক সময় দিল্লীর একটা আর্ট কম্পিটিশানে ছবি পাঠিয়ে প্রাইজ পাই। তাতেই সরকারী কর্তৃপক্ষের কারো নজরে পড়ে যাই। আমি কুলুতে থাকি জানতে পেরে ওঁরা রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর ঐ চাকরীটা অফার করে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে পিতাজীর সম্মতি মিলল আর আমি রাজি হয়ে গেলাম।

মনের মত চাকরী কিন্তু।

ও বলল, এমন করে বলবেন না, চাকরীটা না জানি হাতছাড়া হয়ে যায় কখন।

কি কাজ করতে হয় ওখানে?

ঝিন্নি বলল, ভিজিটার এলে ছবির বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। তাছাড়া নিকোলাস রোয়েরিখের লাইফ সম্বন্ধেও অনেকে জানতে চান।

বললাম, নাগ্‌গরে যাওয়াই হয়নি, একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে তোমার রাজ্যটা।

ঝিন্নি উৎসাহে তুবড়ীর মত ফুটে উঠল।

সত্যি যাবেন আপনি! কি ভাল যে লাগবে। আমি সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।

উত্তেজনায় ঝিন্নি কুর্শি ছেড়ে আমার বিছনার একটা কোণ আবার দখল করে বসল। বসেই বলল, এত ভাল লাগবে না, আপনি ওখান থেকে আর নড়তেই চাইবেন না।

বললাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওখান থেকে যদি না নড়ি তাহলে থাকা খাবার ব্যবস্থাটা কি কেয়ারটেকারের কোয়ার্টারেই হবে নাকি ?

ঝিন্নি বলল, কি আছে, চাচাজী আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো ওখানেই ওঠেন।

বললাম, জানা রইল, সময়মত কাজে লাগানো যাবে।

ঝিন্নি হঠাৎ অবিশ্বাসের সুরে বলল, আপনি আর গেছেন।

বললাম, এই তো সবে এলাম তোমার দেশে। বলতে পার দেখার সবকিছুই বাকি। এক এক করে তাগিয়ে সব দেখব।

ঝিন্নি বলল. মানালীতে ডিসপেনসারী স্টার্ট করলে কি আর ঘুরে বেড়াতে পারবেন, না—ঘুরে বেড়ানোর মন থাকবে।

বললাম, খুব থাকবে। কাজের ভেতর থেকে পালিয়ে বেড়ানোতেই তো আনন্দ। দেখো, ঠিক একদিন না জানিয়ে নাগ্‌গরে গিয়ে তোমাকে চমকে দেব।

ঝিন্নি মনে হল অন্যমনস্ক হয়েছে। কোন কথা আর বলল না। মুখখানাও ধীরে ধীরে একপাশে

ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। দেখলাম, ঝিন্নি পরিবেশ ভুলে মুহূর্তে নিজের ভাবনার ভেতর ডুব দিতে পারে।

হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ লক্ষ্মীছেলের মত শেষরাতটা ঘুমোবারচেষ্টা করুন, ক'দিনের ভেতরেই আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

বললাম, ঘুম না আসারই কথা, তবে দেখি তোমার সারপ্রাইজের লোভে যদি এসে যায়।

শুয়ে পড়লাম। ওকে আর বসিয়ে রেখে কষ্ট দিতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছুই চাওয়া যায় কিন্তু চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি সবকিছুই পাওয়া যায়? আর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই তো পাওয়ার জন্যে রাজ্যের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি।

ঝিন্নি সুইচটা এবার অফ করে দিয়ে বলল, ঘুমোন।

বলেই ও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। এমন সন্তর্পণে নামল যে পায়ের সাড়া প্রায় পাওয়াই গেল না।

এলোমেলো কত কি কথা আর ছবি মনে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন ঘুম এসে গেল জানতে পারলাম না।

ঘুম ভাঙল ঝিন্নির হাতের ঠেলায়। ও আমাকে নাড়া দিয়ে তুলল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, রোদ্দুরে পথ পাহাড় বাগান সব ভেসে গেল আর আপনি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন! উঠুন। এদিকে চাচাজী দু'দুবার আপনার খোঁজ করেছেন! আপনার জন্যে তাঁরও নাস্তা খাওয়া হয়নি।

বললাম, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি একটু আগেও তো ডেকে দিতে পারতে আমাকে।

ও বলল, ডাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাচাজী বারণ করলেন। এখন উনি বাগানের ওপারে গেছেন তাই চুপি চুপি আপনাকে জাগিয়ে দিতে এলাম।

আমি ঝিন্নির হাতখানা খপ করে ধরে ফেলে বললাম, চোর ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ছিনে। চাচাজী এসে দেখুন তাঁর বারণ না শুনে তুমি আমার ঘরে কেমন করে চুরি করে ঢুকেছ।

ঝিন্নি অনুনয় করে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, ছেড়ে দিন দয়া করে। চাচাজী এখুনি এসে পড়বেন।

ছাড়তে পারি একটি শর্তে।

ঝিন্নি করুণ চোখ করে তাকাল।

বললাম, শর্তটা মেনে নেবে কথা দাও।

ঝিন্নি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বললাম, আমি যখন মানালীতে থাকব তখন মাঝে মাঝে তুমি ওখানে যাবে।

ও বলল, চাচাজী আপনার ওখানে থাকলে বিনি কারণে কেমন করে যাই বলুন। তাছাড়া আমার চাকরী আছে। শীতের এই দুটো মাস ছুটি। এখন বরফ পড়বে নাগ্‌গরে। তারপর ছুটি ফুরোলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজের জায়গাতে থাকতে হবে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, তাহলে আর হল না। ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার শর্ত।

ও হঠাৎ করে আমার ছেড়ে দেওয়া হাতখানা ধরে ফেলে বলল, যেতে খুব ইচ্ছে করবে আমার। আচ্ছা কথা দিচ্ছি খু-উ-ব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু আপনি তো বোঝেন, একবার কথা না দিয়ে রাখতে পারলে আপনার চেয়ে আমারই কষ্ট হবে বেশি।

বললাম, তোমার কাছে আমার আর কোন শর্ত নেই ঝিন্নি। আমার ডাকের অপেক্ষা না করেই জানি তুমি মানালীতে কোনদিন এসে পৌঁছবে।

এবার ও অতি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না। খুব তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসুন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রায় রোজই মেঘ জমছে উত্তরের পাহাড়ে। মেঘ সরে গেলে দেখা যাচ্ছে, বরফ ঘন হয়ে ঢেকে ফেলছে পাহাড়ের চূড়োগুলো। দিনে দিনে পাহাড়ের অনেকখানি নীচ অবধি বরফ তার এক্তিয়ার বাড়িয়ে চলেছে। এখন ভোরে বিছানা থেকে উঠে জানালা খুললেই চোখ চলে যায় সোজা বরফের সীমানায়।

এপারের পাহাড়গুলো এখনও তাদের বাদামী আর পাংশুটে গা-গুলো খুলে নাঙ্গা সন্ন্যেসীর মত বসে আছে। তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন গাছ। ঝিন্নি বলে, জানুয়ারির মাঝামাঝি ওদের খোলা গাগুলোও সাদা আলোয়ানে ঢাকা পড়ে যাবে।

এখন একটি ছবি আমাকে অবাক করে দেয়। এই প্রায় ন্যাড়া পাহাড়গুলোর ফাঁক দিয়ে বহুদূরে আর একটা পাহাড় দেখা যায়। দূর বলে কুয়াশার একটা আবছাযাতে সে সব সময় ঢাকা থাকে। দু'তিন সারি কুচকাওয়াজরত সৈন্যের মত কতকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে। কেউ যেন হল্ট বলে ওদের কুইক মার্চটাকে রুখে দিয়েছে।

সেদিন বৃষ্টি এল। বেশ ঝমঝমিয়েই নামল। ওপারের ঐ পাহাড় আর পাইনগাছগুলো সূর্যাস্তের সোনার ছোঁয়ায় ক্যানভাসে আঁকা ছবি হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কে যেন জল ছিটিয়ে মুছে দিল সব রঙ। জাঁকিয়ে নামল ডিসেম্বরের বর্ষা। সন্ধ্যা থেকে সেই যে বর্ষার শুরু হল সপাসপ আওয়াজ চলল গভীর রাত অব্দি।

খেতে বসে চাচাজী বললো, ডিসেম্বরের এ বর্ষায় গমের চারা বহুৎ জোর পাবে।

বললাম, ক্ষতি হবে না এই অকাল বৃষ্টিতে?

চাচাজী বললেন, ক'দিন একটানা বরসাত চলতে থাকলে ক্ষতি হবে ঠিক তবে জলের ব্যবস্থা তো নেই, তাই আশমানকী বরসাতকা হি ভরসা।

মাঝে মাঝে চাচাজী তাঁর শেখা বাংলা শব্দের সঙ্গে কিছু হিন্দির মিশ্রণ ঘটিয়ে দেন। শুনতে ভালই লাগে। এদিকে ঝিন্নির আলাপের ধরনই আলাদা। বাংলা শব্দ নির্বাচন থেকে উচ্চারণ পর্যন্ত এমন নিখুঁত যে তার কুলুর ঐ পোশাকখানা বদলে শাড়ি পরিয়ে দিলে অবাঙালী ভাববার কোন উপায় নেই।

রাতের বৃষ্টিতে আমি চাচাজীকে বাগান পেরিয়ে আউটহাউসে শুতে যেতে বারণ করলাম। চাচাজী বললেন, নিদ আসবে না বাবুজী। অভ্যেস বিলকুল খারাপ হো গিয়া।

হাসতে হাসতে চাচাজী চলে গেলেন।

ঝিন্নিকে বললাম, আজ রাতে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভাল লাগবে।।

ঝিন্নি বলল, জেগে থাকলে কত রকম কথা মনে আসে, তাই না?

হেসে বললাম, তাই বুঝি?

ঝিন্নির মুখে একটা লাজুক লতার ছায়া পড়ল।

মুহূর্তে সে-ভাব কাটিয়ে মুখখানা তুলে বলল, আপনার মনে আসে না বুঝি? সত্যি করে বলুন তো?

বললাম, তোমার দিকে চেয়ে অন্তত মিথ্যেটা বলি কি করে বল। সব মানুষ জেগে থাকলেই স্বপ্ন দেখে। আর সে স্বপ্নটাই আসল স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নগুলো সব ভুয়ো।

ঝিন্নি বলল, যান এখন চারপাইয়ের ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রাত জাগুন গে।

মনে মনে বললাম, চলই না আমার সঙ্গে। ওপরে বসে রাতভোর বৃষ্টির বাজনা শুনি দু'জনে।

কোথায় যেন বাধল, কথাটা বলা গেল না। কেউ যদি আপনি আসে তাহলে তো সেটা আবির্ভাব, টেনে নিয়ে আসা মানেই তো আসামীকে হাজির করার সামিল।

একটু হেসে বিদায় নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, পেছন থেকে ঝিন্নির ডাক এল, আপনি উঠে যান, আমি আসছি। কথা আছে।

কিছু না বলে উঠে এলাম ওপরে। শীতের আগুনের মত একটা মিঠে তাপ আমার দেহে মনে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি ওকে নিজের থেকে কিছু বলতে দিতে চাই। আমি শুধু শুনব। ওর সব কথা যেন এক মুহূর্তে ফুরিয়ে না যায়। অনেক সময় ধরে অনেক কথা যেন ও আমাকে বলে যায়। এমনি একটা ইচ্ছা আমার ভেতর থেকে উঠে হেমন্তের হিমের মত চারদিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঝিন্নি কাজের লোকটির সঙ্গে কি যেন কথা বলছিল। আমি বিছানার ওপর বসে আওয়াজটুকু পাচ্ছিলাম, কিন্তু অর্থবোধ হচ্ছিল না। কুলুহী ভাষায় ওরা টুকরো টুকরো কথা বলছিল।

একসময় আমার মনে হল, প্রয়োজনের ভাষাগুলো মানুষের কত দীর্ঘ। সারাদিন ঐ ভাষাগুলো সংসারের আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে। অভিধান থেকে ওদের একটু ছাঁটাই করে দিলে ক্ষতি কি। অকাজের ভাষাগুলো না হয় কিছু দীর্ঘই হল।

ঝিন্নি এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল ও। যেন বিপাশায় জলতরঙ্গ বাজিয়ে সাঁতরে আসছে।

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতেই বলল, বাব্বাঃ কি মানুষ, দরজাটা ভেজিয়ে দিতেও ভুলে গেছেন।

দরজা ভেজিয়ে ও আস্তে অস্তে পা ফেলে এসে বসল আমার বিছানায়। পা তুলল না কিন্তু। ওর পায়ে চোখ ফেলতেই ও চাবপাইয়ের তলায় পা দুটো ঢেকে রাখার চেষ্টা করল।

বললাম, মূল্যবান কিছু একটা লুকোচ্ছো বলে মনে হচ্ছে।

ঝিন্নি পায়ের ওপর পোশাক ঝেঁপে বলল, ও কিছু না।

বললাম, রূপোর ঝলকানি চোখে পড়ল যে।

ঝিন্নি বলল, ওঃ সবতাতেই চোখ। ছেলেদের সবকিছুতে অমন চোখ দিতে নেই।

বলতে বলতে কিন্তু পা দুটো জড়ো করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখুন, সোনাদানা নয় সামান্য রূপোর ঝাঞ্জর।

বললাম, আওয়াজ এসেছিল কানে। তবে ঘরে ঢুকেই দরজা হাট হয়ে আছে বলে অভিযোগ তুললে তাই মিষ্টি শব্দটার কথা ভুলেই গেলাম।

ও তেমনি বসে আছে দেখে আবার বললাম, কই তোমার পায়ে আগে তো দেখিনি।

ঝিন্নি বলল, ছিল, তবে সামান্য টুটে গিয়েছিল তাই সারাতে দিয়েছিলাম। আজ আখরা বাজার থেকে চাচাজী নিয়ে এসেছে। আপনি এই প্রথম দেখলেন।

খুব সুন্দর মানিয়েছে ঘুঙুর জোড়াটি ওর পায়ে।

বললাম, দারুণ দেখতে হয়েছে কিন্তু।

আমার উৎসাহে ও পা দুটো আবার ঢেকে ফেলল। বলল, ধ্যেৎ, ভাল দেখাচ্ছে না ছাই।

বললাম, ভাল লাগা তো সকলের সমান নয় ঝিন্নি। কারো হীরে পছন্দ কারো বা সোনাদানা, আমি কিন্তু রূপোর সমজদার।

সত্যি?

শুধু একটা সত্যি নয়, তিন সত্যি।

ও হাসল।

আমি বললাম, ঐ যে কদিন আগে তুমি একটা সারপ্রাইজ দেবে বলেছিলে, নিশ্চয়ই সেটা তোমার আজকের এই ঝাঞ্জর।

ঝিন্নি বলল, কি সব যে ভুলভাল আঁচ করে বসে থাকেন তার ঠিক নেই, আমি আপনাকে ঝাঞ্জর দেখাতে এলাম নাকি!

বললাম, তাহলে বল তোমার কথা। ঝাঞ্জরের আওয়াজটা আমার উপরি লাভ।

ঝিন্নি আলোর দিকে একবার তাকাল। চারপাই থেকে উঠে চলে গেল সুইচ বোর্ডের দিকে। টুক করে রুম-হিটারের সুইচটা অন করল। ঠিক পর-মুহূর্তে আলোর সুইচে হাত দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, অফ্ করে দিলে অসুবিধে হবে?

হেসে মাথা নাড়তেই ও আলোটা নিভিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নি ছায়া হয়ে গেল।

ঘরের কোণে হিটারটা প্রথম সূর্যের মত লাল হয়ে উঠছে। তাপ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। একটা ঘুঙুরের আওয়াজ এগিয়ে চলেছে জানালার দিকে। ভারি মিষ্টি লাগছে কানে। আবার ফিরতে লাগল সে শব্দ। মনে হচ্ছে, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের সেই তরুণী ইরাণীর মত রহস্যময়ী ঝিন্নি ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

ও কাছে এসে আমার বিছানায় বসল। বসেই বলল, আর ক'দিন বাদেই কোলি-বি-দেওয়ালি। সারা কুলু জুড়ে উৎসব চলবে। নাগ্গরে মেলা বসবে। যাবেন সেখানে?

বললাম, দেওয়ালি তো পার হয়ে গেছে, এখন ডিসেম্বর শেষ হতে চলল, আবার দেওয়ালি কি?

ঝিন্নি বলল, এটা কুলুর একটা বিশেষ উৎসব। ডিসেম্বর মাসেই হয়। সে যা হোক, এখন যা বলি চুপচাপ বসে শুনে যান তো।

মেয়েরা চিরদিনই শাসনের অধিকার নিয়ে জন্মায়। বললাম, বলো।

ঝিন্নি বলল, নাগ্‌গরে এ সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। চাচাজীর পারমিশান ছাড়া যাওয়া যাবে না আর সে পাবমিশান আদায় করার ভার আপনার।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ও হুড়োহুড়ি করে ভুলিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু খবরদার, আমার নামটি ভুলেও যেন উচ্চারণ করবেন না।

বললাম, উনি যদি জানতে চান, আমি দেওয়ালি ফেস্টিভ্যালের কথা কি করে জানলাম?

ঝিন্নি কপালে চাপড় মেরে বলল, তামাম কুলু মাতবে কোলি-রি-দেওয়ালিতে, দীপ জ্বলবে, বাজী পুড়বে, আকাশ জুড়ে রোশনাই, আর আপনি সে খবর আগে থেকে জানবেন না!

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু চাচাজী যদি বলেন, চল আমি তোমাকে দেখিয়ে আনি, তখন কি হবে?

ঝিন্নির গলায় বিচিত্র সুর বাজল, যাবেন।

এত শীতে আবার নাগ্‌গরে যাওয়া!

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কাজ ফেলে যাবেন না নাগ্‌গরে। এক আধ দিনের ব্যাপার তো নয়, তিন-চারদিনের হৈ-হল্লোড়। ও সবের ভেতর নেই চাচাজী! আপনি বলেই দেখুন না। আর এত শীতকাতুরে কেন আপনি?

বললাম, তুমি যাবে কি করে?

দেখা যাবে, আগে তো পারমিশানটা মিলুক।

বললাম, তখন আমাকে আবার বরফের রাজ্যে একা ঠেলে দেবে না তো?

ঝিন্নি আবার হাসিতে সেতার বাজাল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, তাই না হয় দিলাম। আচ্ছা, আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

বললাম, যাক্ গে, যথাসময়ে দেখা যাবে। এখন চাচাজীর পারমিশানটা পেলে হয়।

ঝিন্নি বলল, পারমিশান হলে উনি আপনাকে একা পাঠাবেন না, আমাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতে বলবেন।

কি করে এতখানি নিশ্চিত হতে পারছ?

ঝিন্নি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, চুপ করুন তো, চাচাজীকে আমার চেয়ে আপনি ভাল চেনেন নাকি!

একটু থেমে গলা নরম করে আবার বলল, আমার ওপর একটুও কি ভরসা রাখতে পারেন না।

বললাম, ঠিক আছে, তোমার প্ল্যানমাফিক কাজ হবে।

ঝিন্নিকে যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে, কি দ্রুত ওর মনের আনাচে-কানাচে ভাব-ভাবনাগুলো চড়ুইয়ের মত হুটোপুটি খেলা করে বেড়ায়।

সে রাতে ঝিন্নি কিন্তু আমার অনুচ্চারিত ইচ্ছেগুলোর কোন দামই দিল না। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডায় বৃষ্টি ঝরার শব্দ, ভিতরে রুমহিটারের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা উত্তাপ, একটি পুরুষের সান্নিধ্য, সব কিছু আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে ঝিন্নি চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, আমি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে যাই?

বললাম, তোমার খুশি।

ও হিটারের সুইচ অফ করে আমার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের জমাট অন্ধকার লাফি'য পড়ল হিটারের নিভে আসা লাল আলোটুকু শুষে নিতে।

ঝিন্নির ছায়া আস্তে আস্তে অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে। আমি একটা দরজা ভেজিয়ে দেবার আওয়াজ পাচ্ছি; অস্পষ্ট পায়ের সাড়া নিচে নেমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন বেজে উঠছে বাইরের ঝড়ো হাওয়া আব বৃষ্টির একটা সম্মেলক শব্দ। কেউ যেন অশান্ত আবেগে কাউকে বুকে চেপে ধরে অর্থহীন শব্দের প্রলাপে চাবদিক ভরে তুলছে।

আমার হঠাৎ পাওয়া আশ্চর্য ক'টি মুহূর্ত আমার উন্মুখ যৌবনের ভাবনাকে ছুঁয়ে দিয়ে প্রজাপতির

মত উড়ে চলে গেল।

ঝিন্নির অনুমান যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হল পরের দিন। আউট হাউসে বসে ব্যবসার কথা শুনতে শুনতে আসল কথাটা তুললাম। চাচা নরসিংলালজী আমার মুখ থেকে কথাটুকু খসামাত্রই রাজি হয়ে গেলেন। নিজে যেতে পারছেন না বলে অসহায়ের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে ঝিন্নির কৃতিত্বের তারিফ করলেন। ঝিন্নি সঙ্গে থাকলে তাঁর চেয়েও যে সবদিক থেকে ব্যবস্থা ভাল হবে তা জানালেন।

তবু একবার বললাম, ডিসেম্বরে আপনাকে না হয় টানাটানি নাই করলাম কিন্তু এপ্রিল-মে-তে যদি নাগ্‌গরে যাই, তখন কিন্তু আপনি না করতে পারবেন না।

চাচাজী অমনি বললেন, আলবৎ যাব। কাজকাম তখন কমতি থাকবে, যাবার কোই মুশকিল থাকবে না।

রাতে আবার ঘরে এল ঝিন্নি। বলল, কিছু কথা হল চাচাজীর সঙ্গে?

গম্ভীর মুখ করে বললাম, চাচাজী রাজি হয়ে গেছেন। সামান্য কি কাজ আছে, সেটুকু এর ভেতর শেষ করেই আমার সঙ্গে বেরোবেন।

ঝিন্নির গলায় বিস্ময় ভেঙে পড়ল, চাচাজী এ সময়ে বেরোবেন! আপনাকে সত্যি বললেন! একটা অসম্ভব ব্যাপার।

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, তাহলে কথাটা আমি বানিয়ে বলছি।

ঝিন্নি বলল, না না—তা কেন বলবেন। আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম। সত্যি হেরে গেলাম।

শেষের দিকে ঝিন্নির গলায় আশাভঙ্গের একটা ভাঙা ভাঙা ঢেউ।

বললাম, নাগ্‌গরে তোমার বাসায় যদি তিন-চারদিন থাকতে হয়, তাহলে রান্নাবান্নার কি ব্যবস্থা হবে? কেউ তো এখন সেখানে নেই।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখ নিচু করে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, তাই তো ভাবছি। চাচাজী কি করে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছেন! কোনোদিন একটুখানি দুধও গরম করেন নি নিজের হাতে।

বললাম, আমি তোমার কথাও বলেছিলাম। বলেছিলাম, ঝিন্নির কি খুব অসুবিধে হবে আমাদের সঙ্গে যেতে?

অমনি চাচাজী বললেন, কোলি-রি-দেওয়ালিতে যে কেউ একজনকে তো কোঠীতে থাকতে হবে, না হলে দীপ জ্বালাবে কে?

চাচাজীর কথা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

ঝিন্নি আমাকে এবার সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, নাগ্‌গরে রোশনাই দেখবেন, মেলা দেখবেন, গান শুনবেন, ভারী ভালো লাগবে আপনার। এখানে এ ধরনের উৎসব তো আগে দেখেন নি। আর চাচাজী নিশ্চিত কাউকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। থাকা খাবার অসুবিধে কিছু হবে না।

বললাম, ডিসেম্বরের শীতে বরফের রাজ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে হবে, সেখানে কেউ তো আর শোবার ঘরে হিটার জ্বেলে দেবে না।

ঝিন্নি বলল, এবারের মত আমাকে মাপ করে দিন। আর আমি কোনদিন আপনাকে নাগ্‌গরে আসতে বলব না। সত্যি আপনাকে কি অসুবিধের ভেতরই না ফেললাম।

বললাম, মুশকিলের ভেতর ফেলেছ, এখন তার একটা আসানের পথ করে দাও।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর তার চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল। সে যে কত অসহায়, তার ছবি ফুটে উঠেছিল ওর সারা মুখে।

দেখে খুব মায়া হল। তবু মনের ভাব চেপে রেখে বললাম, তুমি তো পথ পেলে না, দেখি আমি কিছু পাই কিনা।

ও চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে রইল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ছায়া কাঁপছে ওর চোখের পাতায়।

বললাম, তুমি জেনো ঝিন্নি, নাগ্‌গরে যদি আমি যাই তাহলে তুমিও যাবে। আর তা না হলে দুজনেরই যাওয়া হবে না।

ঝিন্নি আমার চারপাইয়ের কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। আকুল হয়ে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, এমনটি করবেন না। চাচাজী বড় দুঃখ পাবেন, তাছাড়া কিছু ভেবে বসতেও তো পারেন।

ওর বিনুনিটা কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের ওপর লোটাচ্ছিল। ওটিকে হাতে তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, চাচাজী আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতে পারেন ঝিন্নি?

জানি না, বলেই ও ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে বিনুনীতে টান পড়ায় আমার চারপাইয়ের ওপর ঘুরে এসে পড়ল।

ওকে ধরে ফেলে বললাম, ভয় নেই, চাচাজী কিছুই ভাববেন না। তিনি নিজে যেতে পারছেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটিমাত্র ডাকাবুকো মেয়েকে অতিথির সমস্ত তদারকীব ভার দিয়ে পাঠাতে চান।

হঠাৎ কি হল, ঝিন্নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

কি হল ঝিন্নি, খুশি তো?

ও আর হাত নামায় না। এক সময় জোর করে ওর হাত নামাতেই দেখি, ওর চোখে সজল মেঘের ছায়া।

বললাম, তুমি কাঁদছ ঝিন্নি!

ও উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বাইরে চলে গেল। আমি খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ঝিন্নি ফিরে এল। একেবারে অন্য চরিত্র। হিটার জ্বেলে আলো নিভিয়ে আমার পাশে এসে বসে বলল, দুজনে নাগ্‌গরে যাব, এই সারপ্রাইজটুকু দেবার জন্যেই আমি প্ল্যান করেছিলাম।

বললাম, তোমার সারপ্রাইজ তো সফল হল তবে এমন কাঁদো কাঁদো মুখ করে উঠে গেলে কেন?

ও বলল, আপনি প্রথম এমন ভয় পাইয়ে দিলেন যে, আসল কথাটা তারপর যখন পাড়লেন তখন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না।

মনে মনে বললাম, তোমার চোখে জল দেখে বুঝেছি তুমি খুশি হয়েছ।

মুখে বললাম, এখনও কোলি-রি-দেওয়ালির সাত আটদিন বাকি। এখন থেকে রোজ অন্তত একবার করে আমরা ঐ উৎসবের দিনগুলোর প্ল্যানিং করতে বসব।

দারুণ খুশিতে উপচে উঠল ঝিন্নি, সারাদিন আমরা ঘুরে বেড়াব! সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে বসে পরের দিনের প্ল্যানিং করব।

বললাম, খুব মজা হবে।

ঝিন্নি বলল, কিন্তু হিটারের ব্যবস্থা তো ওখানে নেই, আপনার যদি খুব শীত করে? যেমন শীতকাতুরে আপনি।

বললাম, কিচ্ছু হবে না। লেপ তোষক কম্বল থাকলেই হলো।

ও বলল, খুব দামী গরম কম্বল আছে। ভি-আই-পি-দের জন্য একসেট বিছানা তোলাই থাকে।

হেসে বললাম, কোনদিন তো ভি-আই-পি হতে পারলাম না, এখন ঝিন্নির দৌলতে যদি ভি-আই-পি-র খাতিরটা পাওয়া যায়।

ঝিন্নি বলল, গোল্ডেন অর্চার্ডের মালিক বিখ্যাত ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জী সাব যদি ভি-আই-পি না হন, তাহলে ভি-আই-পি-র ডেফিনেশন আজও আমার জানা হয় নি।

এক ঝলক হেসে বললাম দু'খানা ফলের বাগানের মালিক আর একজন ডাক্তারকে ভি-আই-পি-র দলে ফেললে সত্যিকারের ভি-আই-পি-দের অপমান করা হয় ঝিন্নি।

ও বলল, তা হোক্, আপনি আমার কোয়ার্টারে ভি-আই-পি-র খাতিরই পাবেন। 'কোলি-রি-দেওয়ালি' তে নাগ্‌গরে আপনার চেয়ে বড় ভি-আই-পি আমার আর কেউ নেই।

সকালে নিচে নেমে দেখি আমার অপেক্ষায় একটি লোক দাওয়ায় বসে। চাচাজী তার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

চাচাজী লোকটির আগমনের উদ্দেশ্যটুকু যা বুঝিয়ে বললেন, তার মর্মার্থ দাঁড়াল, আখরা বাজারের ডানদিকে যে পাহাড়, তার ওপর ওয়াল্টার লী সাহেবের বাংলো আর বাগিচা। ওখানে কদিন ধরে বড়দিনের উৎসবের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। একটি ছেলে কাজের সময় তাড়াহুড়োতে পাহাড়ের খানিক নিচে গড়িয়ে পড়ে পায়ে বেশ চোট পেয়েছে। রাতে ডাক্তার মেলেনি, ভোরে খবর পেয়ে চাচাজীর ডেরায় লোক পাঠিয়েছেন লী সাহেব।

বললাম, মিঃ লী কি করে আমার খোঁজ পেলেন চাচাজী?

নরসিংলালজী বললেন, মানালীতে আমাদের বাগিচার পাশেই মিঃ বেননদের বাগিচা আছে তুমি জান। ওঁদের সঙ্গে সামান্য আলাপও আছে তোমার, বাবুজী। ওঁরা মিঃ লীদের ফেস্টিভ্যালে এসেছেন। তাঁদের কাছে তোমার এখানকার ডেরার কথা জেনে থাকবেন।

আমি আর দেরি করলাম না। লী সাহেব আমার যাবার জন্যে একটি টাট্টুও পাঠিয়েছেন। লোকটি সেই টাট্টু আমার সামনে হাজির করার জন্যে মাকুর মত হাওয়ায় কনুই ঠুকতে ঠুকতে আউট-হাউসের দিকে ছুটল।

সার্জিক্যাল ব্যাগটা নেবার জন্যে আমি ওপরের ঘরে চলে এলাম। আসার সময় সিঁড়ি থেকে দেখলাম, ঝিন্নির সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে নিচের ঘরে খড়ের মাদুরে হাঁটু মুড়ে বসে ছেঁড়া কাপড়ের খিন্দ্ তৈরি করছে। ঐ বস্তুটি মাদুরের ওপর কাঁথার মত পেতে রাখতে দেখেছি বাড়িতে বাড়িতে।

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ঝিন্নি উবু হয়ে সেলাই করতে করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার কাজে মন দিল।

আমি ওপরের ঘরে এসে পোশাকটা বদলে নিলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরুবো, ঝিন্নি প্রায় নিঃশব্দে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ও চোখে প্রশ্ন এঁকে তাকাতেই বললাম, লী সাহেবের ওখানে ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাই যাচ্ছি। উনি টাট্টু পাঠিয়েছেন। চাচাজীর কাছে সব খবর পাবে।

আমার ব্যস্ততা দেখে ও সরে দাঁড়াল। আমি ওর পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যতক্ষণ না আমি পথের বাঁকে মিলিয়ে যাই ততক্ষণ ওর দুটো চোখ আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

আমি ক্ষুদ্রাকার টাট্টুতে চড়ে চলেছি। ভারবাহী পশুটি মাঝে মাঝে দৌড়ে আর বিপজ্জনক বাঁকগুলি অবলীলায় পেরিয়ে তার সামর্থ ও নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছিল। জীবটির পরিচালক তার পেছন পেছন ছুটে আসতে আসতে তাকে বিচিত্র অনুকার ধ্বনিতে উৎসাহিত করে চলল। কখনও বা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে লাগল অশ্ববোধ্য ভাষায়।

মিঃ লী আর বেননদের আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম। পাহাড়ের কোলে ছিমছাম সুন্দর বাংলো। ফুলের কেয়ারী। লনের ওপর ধবধবে সাদা বেতের চেয়ারে বসে উজ্জ্বল রঙের গরম পোশাক পরা গুটিকয় সাহেব মেম।

আমি বাংলোর ঠিক নিচে গিয়ে পৌঁছতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ওঁদের ভেতর এক প্রৌঢ় সমর্থ ভদ্রলোক খাঁজকাটা পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এলেন। মনে হল, উনিই গৃহকর্তা মিঃ লী। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা।

আমার টাট্টুর লাগাম নিজের হাতে ধরে আমাকে গ্রীট্ করলেন।

টাট্টু থেকে নেমে সহিসের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, মিঃ লী আমার হাতের ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিলেন।

আমরা ওপরে উঠে এলাম। মানালীর ক্যাপটেন বেননের ফ্যামিলির কয়েকজন আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ভেতরে একটি ছোট্ট ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে রোগীটি শুয়েছিল। অতি ক্ষীণ একটা কাতর শব্দ উঠছিল কম্বলের ভেতর থেকে।

মুখের কম্বলটা সরাতেই একটি মিষ্টি মুখ চোখে এসে পড়ল। বছর বারো বয়সের ছেলে। এ দেশীয় পাহাড়ী। মুখখানা থমথম করছে। থারমোমিটার দিয়ে দেখলাম টেম্পারেচার রয়েছে। চোট লেগেছে পায়ের আঙুলে। ওপর থেকে পরীক্ষা করে মনে হল আঙুলেব হাড় ভেঙে গেছে। বাঁ পায়ের পাঁচটা আঙুলই বিচ্ছিরি রকম ইনজিওরড্।

লী সাহেব যা বললেন, তাতে জানা গেল কাজ করতে গিয়ে ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নি, একটা ভারি পাথরই হঠাৎ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন ও সাস্তাক্রুজের হরিণটানা রথের কাছে বসে তন্ময় হয়ে দেখছিল। সবাই পাথর গড়াতে দেখে সরে এলেও ও বেচারা আর সরে আসতে পারে নি। ওর পায়ের পাতায় আঘাত করে ভারী পাথরখানা নিচে নেমে যায়।

থেঁতলানো পা-টা দারুণরকম ফুলে উঠেছিল। বুড়ো আঙুলের মাংস উঠে গেছে। হাড়ের আধখানা দেখা যাচ্ছিল।

প্রাথমিক যা কিছু করার তা করলাম। এক্স-রে নেবার কোন সুযোগ নেই এ তল্লাটে। যেখানে আছে, সেখানে শেষ ডিসেম্বরে কোন যানবাহনই চলাচল করে না। এ অবস্থায় রোগীকে নিয়ে কি করা যায় ভেবে পেলাম না।

আমার অসুবিধের কথাগুলো মিঃ লী-কে জানিয়ে বললাম, ইমিডিয়েটলি ওর একটা অপারেশনের দরকার মনে হচ্ছে।

লী সাহেব বললেন, আমারও তাই মনে হয়েছিল। হয়ত ওব আঙুলগুলো কেটে বাদ দিতে হতে পারে। এখন দুটো সমস্যা আমাদের সামনে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতেই মিঃ লী বললেন, একটি জীপ জাতীয় গাড়ির সমস্যা, অন্যটি ওর মা বাবা।

বললাম, জীপের ব্যাপার বুঝলাম, কিন্তু ওর মা বাবার সমস্যাটা ঠিক বুঝলাম না।

লী সাহেব যা বললেন তাতে জানা গেল, ছেলেটি মেষচারক গাদ্দী-সম্প্রদায়ের। ভেড়া চরাতে চবাতে ওরা কাংড়া থেকে চুম্বা কুলু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গরমে আর বর্ষায় ওরা থাকে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর। ভেড়া নিয়ে সে সময় লাহুল, পাঙ্গী এমনকি স্পিতি পর্যন্ত চলে যায়। আবার শীত পড়লেই নীচে নামতে থাকে। ডিসেম্বরেব শেষে ওরা ভ্যালিতে এসে আশ্রয় নেয় ওদের ভেড়ার পাল নিয়ে।

ছেলেটির নাম ভাগ্‌তু। ও বছর তিনেক ওর মা বাবার সঙ্গে কুলুভ্যালিতে আসছে। মিঃ লীদের এই উৎসব দেখতে আসে ওরা। ছেলেটিকে মিঃ লীর ভালো লেগে যায়। উৎসবের দিনগুলো তাঁর বাংলোতেই কাটিয়ে যায় ছেলেটি।

এখন হঠাৎ এবছর এই আকস্মিক অঘটন।

এদিকে ভাগ্‌তুর মা বাবা নাকি পাহাড়ের ঢালের দেবতা কেহ্‌লুবীরের পুজো করছে গত বাত থেকে। তাদের ধারণা কেহ্‌লুবীর যে কোন কারণেই হোক্ রাগ করেছেন আর তাই তাদের ছেলের ওপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন। এখন অপারেশন করতে গেলেই ওদেব অনুমতি চাই।

মিঃ লী বললেন, এখুনি ওর বাবা মা এসে যাবে, ওদের বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, গাড়ি জোগাড় হলেও সিমলা যাওয়া সম্ভব হবে কি ? ওপরের পাহাড়ী পথ তো বরফে ঢেকে গেছে।

বললাম, অপারেশন করা যেতে পারে, কিন্তু ব্লাড চাই আর তার জন্যে পরীক্ষা দরকার। মানালীতে মোটামুটি ও অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার করা আছে। অন্তত কাছাকাছি মানালীতে পেসেন্ট সিফ্‌ট কবার ব্যবস্থাটুকু করুন।

ভাগ্‌তুর মা বাবা এলো। তারা কেহ্‌লুবীরের পূজার ফুল ছেলের গায়ে মাথায় বুলিয়ে বিছানার তলায় রেখে দিলে। দেখলাম, হলুদ রঙের গট্রর ফুল।

তারপর ফ্রকের মত চোল থেকে ভাগ্‌তুর মা বের করল কটি পাতা! একটা নোড়ার মত পাথরে সেই পাতা থেঁতো করে ছেলের ভাঙা পায়ে বেঁধে দিলে। আমরা ওদের ব্যাপারস্যাপার দেখছিলাম। গাদ্দান মেয়েটি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ লী ওদের ছেলের পায়ের গুরুতর অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ভাগ্‌তুর বাবা বলল,

জিৎ বণ বসটী বরে
তিৎ মাণু কি আঁ মরে।

বণ গাছের পাতা বেটে লাগান হল। সব ব্যথা সেরে যাবে।

যদিও জানি ভাগ্‌তুর অবস্থা গুরুতব এবং ওর জন্যে এখুনি কিছু একটা করা দরকার, তবু বসে দেখা ছাড়া উপায় রইল না। ওদের বিশ্বাসে বাধা দিতে পারলাম না।

যথাবীতি ইন্‌জেকশান দিয়ে বাংলোতে ফিরলাম। মিঃ লী-কে বলে এলাম দরকার পড়লে আমাকে অসংকোচে ডাক দেবেন। পেসেন্টকে নিয়ে মানালী যাবার জন্যে আমি তৈরি রইলাম।

দু'দিন পেবোতে না পেরোতেই মিঃ লী এলেন আমার বাংলোয়। পথে একখানা জীপ দাঁড়িয়ে। এসেই বললেন, বিরক্ত করলাম ডাক্তার। এখুনি একবার মানালী আসতে হয়। জীপে পেসেন্ট রয়েছে। কন্ডিশন ভাল মনে হচ্ছে না।

চাচাজীকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, ঝিন্নিকে সাথ্‌মে লে যাইয়ে বাবুজী। নেহি তো বহুৎ তক্‌লিফ হোগা।

বললাম, যা হোক্‌ করে ম্যানেজ করে নেব। ঝিন্নি চলে গেলে আপনাকে অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে।

সমস্ত মন কিন্তু চাইছিল, ঝিন্নি চলুক আমার সঙ্গে। হাতের কাছে অনেক দরকারী জিনিস ও এগিয়ে দিতে পারবে।

নরসিংলালজীর কাছে আমার অসুবিধেটা এত বড় হয়ে দেখা দিল যে তিনি আমার কথার কোন উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করলেন না। ঘরের ভেতব ঢুকলেন আর অল্প সময়ের ভেতরেই ঝিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি আর ঝিন্নি, মিঃ লী ও বেননদেব সঙ্গে রোগীকে নিয়ে প্রায় দশটায় মানালীর বাংলোতে পৌঁছলাম।

অগোছালো অপারেশন টেবিলটাকে মোটামুটি ঠিকঠাক কবে নিলাম। ঝিন্নির ব্লাড নেওয়া হল, কারণ আশ্চর্যভাবে শুধু ওরটাই মিলে গেছে রোগীর ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে।

সত্যি ঝিন্নি না এলে কি যে হত!

পরের দিন অপারেশন হল। কেটে বাদ দিতে হল ভাগ্‌তুর কচি কচি আঙুলগুলো।

ঝিন্নি তো রীতিমতো নার্স। একটুও বিচলিত না হয়ে আমাকে সব কাজে নিখুঁত সাহায্য করে গেল। মিঃ লী আর বেনন পরিবারের লোকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ঝিন্নির।

ক'টা দিন বেননরা ঝিন্নি আর আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ওঁদের বাংলোয়।

রোগী বিপদমুক্ত হল আর আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম কুলুতে। বেননরা মানালীর বাংলোতেই থেকে গেলেন। ওঁরা আর বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে এলেন না। যে হারে দিনে দিনে বরফপাত বাড়ছে তাতে ফেরার পথে সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

মিঃ লী আমাদেব কুলুর বাংলোয় এলেন একদিন। ভারী আমুদে লোক। উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ঝিন্নি, চাচাজী আর আমাকে বিশেষভাবে ইনভাইট করলেন। যাবার সময় বললেন, অসাধ্য সাধন কবেছ ডাক্তার, এখন সান্তাক্রুজের পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

২৫শে ডিসেম্বব আমাদেব জন্যে দুটো টাট্টু এলো। মিঃ লী চিঠিতে লিখেছেন, আর একটি টাট্টু যোগাড় করতে পাবি নি বলে দুঃখিত। যে কোন দুজনে চলে আসার পরে আবার টাট্টু পাঠানো হবে তৃতীয়জনকে আনাব জন্যে। নিঃসন্দেহে তিনি সবচেয়ে সম্মানীয় অতিথি।

চাচাজী বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমার ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছি মিঃ লী। ওতেই আমি খুশি। ঘর আগলাতে হবে, তাই আমার পক্ষে যাবার একটু অসুবিধে আছে। আপনার আর কষ্ট করে টাট্টু পাঠানোর দরকার নেই। অনুপস্থিতির জন্য মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

মিঃ লী আর তাঁর ফ্যামিলির সবাই আমাদের কর্ডিয়ালী রিসিভ করলেন।

উৎসবের মঞ্চ পরিকল্পনা হয়েছে বাংলোর ওপরের পাহাড় ঘিরে। লী পরিবারের সঙ্গে আমরা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ধরে এগোতে লাগলাম। আমার মুখে কোন কথা ছিল না। প্রকৃতির পটভূমিকে এমন করে যে কাজে লাগান যায় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

পাহাড়ের উঁচু মাথায় কে যেন অভ্র ছড়িয়ে রেখেছে। কুচি কুচি বরফের টুকরোগুলো রোদ্দুরে ঝক্ঝক্ করছে। ঠিক তার নীচেই বনরেখা শুরু। দেওদারের সারি অনেক ওপরে থাকায় আকারে ছোট। যেন এক সারি দর্শক দাঁড়িয়ে। তারপরেই পাইনের সমারোহ। পাহাড়ের গায়ের রঙ কোথাও কোথাও ব্রাউন আবার কোথাও বা নীলচে ধূসর।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক যেন ওপর থেকে নেমে আসছেন যীশু। মেষচারকের পোশাক পরা। ঢিলে ফারানে ঢাকা দেহ। হাতে লম্বা লাঠি। বাঁ হাত দিয়ে সস্নেহে বুকের ওপর চেপে ধরেছেন একটি মেষশাবক। যীশুর পেছনে মেষের পাল ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসছে। কাছে গিয়ে দেখলাম তারের ফ্রেমে কাপড় আর প্লাস্টার সেঁটে তুলির টানে এই জীবন্ত দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। এরপর মেরীর কোলে নবজাতক যীশু আর দূর নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ তিন প্রাচ্যজ্ঞানীকে দেখতে দেখতে বাঁ দিকের পাহাড় ঘুরে এলাম।

এখন আমাদের দৃষ্টি সূর্যের দিকে। শৈলশিরা ধরে নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে এক সারি নিবিড় ঘন পাইন। তার ফাঁকে সূর্যের ঝাঁক ঝাঁক রশ্মি সোনালী সিল্কের গোছা গোছা সুতোর মত বেরিয়ে আসছে! বনের লম্বা লম্বা গাছের কাণ্ডের ফাঁক থেকে লাফ দিয়ে ছুটে আসছে শিং-উঁচু হরিণের দল। তারা টেনে আনছে সান্তাক্লজের রথ। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, সূর্যের সোনালী রশ্মিগুলি ঠিক যেন সান্তক্লজের হাতে ধরা বল্গা।

আমাকে একেবারে হতবাক করে দিল এ দৃশ্য। আমি মিঃ লীকে তাঁর এই পরিকল্পনার জন্য প্রশংসা করতেও ভুলে গেলাম।

মিঃ লী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে জানতে পারি নি। তিনি হয়ত আমার মুগ্ধতাকে তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন।

একসময় মিঃ লী-ই কথা বললেন, ডাক্তার মুখার্জী, সত্যিকারের সমঝদার তুমি। এমন নিবিষ্ট হয়ে দেখছ যাতে আমি মনে করতে ভরসা পাচ্ছি যে আমার রচনা, পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে।

লী সাহেবের হাত ধরে বললাম, সিমপ্লি চার্মড, মিঃ লী। অনেক শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আপনার মত একজন গুণী শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ এই আমি প্রথম পেলাম।

মিঃ লী বললেন, এ আমার একটা সখ বলতে পার ডাক্তার। আমাদের লী পরিবারের ক্যাপ্টেন লী আঠারশ সত্তর সালে বানড্রোলে প্রথম ইউরোপীয় জাতের আপেল বাগান করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তার চেয়ে শিল্পী কিছু কম ছিলেন না। সারা দুনিয়া ঘুরে তিনি এই কুলু ভ্যালিকেই তাঁর নির্জন বাসের যোগ্য জায়গা বলে ভেবেছিলেন। আমার সেই গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের কাছে এ জন্যে আমি ঋণী মিঃ মুখার্জী।

হাসতে হাসতে বললেন লী, আমার রক্তেও বোধহয় ক্যাপ্টেন সাহেবের কিছু প্রেরণা থেকে থাকবে।

বললাম, কিছু নয়, পুরোপুরি। আরও উৎকর্ষ হয়ত এসেছে আপনার ভেতর।

মিঃ লী বললেন, সুন্দর জায়গায় থেকে সুন্দরকে ভালবেসে ফেলেছি মিঃ মুখার্জী। মেজর বেননও ঐ একই কথা বলতেন। সারা দুনিয়ায় চার ঋতুর এমন মন-মাতানো খেলা কোথাও নেই। চারদিকে তুষারের এমন শোভাও নাকি দুর্লভ।

বললাম, আমার তো মনে হয় কুলু সিলভার ভ্যালী।

মিঃ লী আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ওম্যান ইন হোয়াইট। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় রূপো। বসন্তের ফলের গাছে সাদা ফুলের মেলা, সব মিলিয়ে শ্বেতবসনা কুলুসুন্দরী—কি বল?

বললাম, নিখুঁত উপমা।

সুইটস আর স্ন্যাকস-এর ব্যবস্থা ছিল। রাতের ডিনারে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাওয়া দাওয়ার শেষে ফিরে আসছি, মিঃ লী আমার হাতে খামে আঁটা একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, এ চিঠিখানা বাংলোতে গিয়ে খুলবে।

আমরা দুজনে দুটো পনিতে ফিরে এলাম। মিঃ লীর সহিস এল আমাদের সঙ্গে।

লোকটি ফিরে যাবার সময়ে একটি টাট্টু নিয়ে যাচ্ছে দেখে জানতে চাইলাম, পরে আবার এসে অন্য টাট্টুটা কি নিয়ে যাবে?

সহিস সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করে বলল, সাহেবের হুকুম নেই।

হঠাৎ মনে পড়ায় চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম :

প্রিয় ডাক্তার মুখার্জী,

তোমাকে সান্তাক্রুজের একটা উপহার দেব বলেছিলাম। তাই আমার সব সেরা টাট্টুটি তোমাকে দিলাম। এর ওপর তুমি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পার। তুমি ডাক্তার, তাই এ বস্তু তোমার অপরিহার্য। পাহাড়ী এলাকায় তোমাকে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করতে হবে। অন্য বাহন সেখানে অচল। পছন্দ হল কিনা জানালে খুশি হব।

তোমার একান্ত অনুরক্ত

লী

আমার দারুণ পছন্দের কথা লী সাহেবকে জানিয়ে তক্ষুনি চিঠি লিখে দিলাম। চাচাজী মিঃ লীর অনেক সুখ্যাতি করলেন।

আমাদের রাতের আসরে পায়ে পায়ে ঝিন্নি এসে ঢুকলে তাকে বললাম, আজ লী-দের উৎসব তোমার কেমন লাগল ঝিন্নি?

ও বলল, কুলুর লোকেরা দূর থেকে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের উৎসব দেখে। আমিও তাই দেখেছি এতদিন। আজ আপনার দৌলতে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল।

বললাম, মিঃ লী আমাকে একেবারে যাদু করে ফেলেছেন।

ও বলল, মিস লী কিন্তু আপনার একজন অ্যাডমায়ারার!

কি রকম? ওঁর সঙ্গে আমার মাত্র একবারই কথা হয়েছে। মিঃ লী যখন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ঝিন্নি হেসে বলল, মেয়েদের প্রশংসার কথা ছেলেদের শুনতে নেই।

বললাম, তার চেয়ে বল একটি মেয়ের প্রশংসার কথা অন্য মেয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে নেই।

ঝিন্নি অমনি চেপে ধরল, কেন এমন কথা বললেন বলুন।

হেসে বললাম, আচ্ছা পাগল তো, এমনি বললাম।

ঝিন্নি তবু জেদ ধরতে লাগল, কেন বললেন সত্যি করে বলুন।

বললাম, আচ্ছা এসো আমরা একটা কম্প্রোমাইজ করে নি।

ও ওর বায়না ছেড়ে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, তুমি আমাকে বল মিস লী আমার সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তাহলে আমিও তোমাকে একটা কথা শোনাব।

ও বলল, আগে আপনার কথাটা শুনি।

বললাম, উঁহু সেটি হচ্ছে না, আগে তোমাকে বলতে হবে। শেষে দারুণ একটা কথা তোমাকে শোনাব।

ঝিন্নি বলল, আপনি যখন সান্তাক্রুজের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন মিস লী আপনার দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল, আ হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান লাইক পোয়েট বায়রন। দেখ দেখ, কেমন তন্ময় হয়ে সান্তাক্রুজের দিকে চেয়ে আছে।

হেসে বললাম, মিস লী আমাকে এত বড় একখানা কমপ্লিমেন্ট দিলেন কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে একটুও কিছু ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে।

ঝিন্নি বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টুমি করতে ভালবাসেন। আর বানিয়ে কথা বলতেও।

কি রকম?

কি রকম আর কি, নিশ্চয়ই মিস লী সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন। এত সুন্দর মিস লী, তার সম্বন্ধে না ভেবে পারাই যায় না।

অন গড বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে আসে নি।

ঝিন্নির ডান হাতখানা হঠাৎ ওর থুতনি আর ঠোঁট দুটোর ওপর চাপা পড়ল। ও নিবিষ্ট চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি ঝিন্নির সেই মুহূর্তের মনোভাব ওর ঢেকে রাখা মুখ থেকে পড়ে নিতে পারলাম না।

ঝিন্নি হয়ত আমার কথায় খুশি হয়েছে। একটি বিশেষ মেয়ে সম্বন্ধে একটি পরিচিত ছেলের উদাসীনতা অনেক সময় মেয়েদের খুশির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত ঝিন্নিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবু সঠিক কিছু জানতে না পারায় ওকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল।

এবার ও কথা বলল, মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়েছে। সেখানে আগের মুহূর্তের ভাবনার কোন ছায়া পড়ে নেই।

এবার আপনার কথাটা বলুন।

কথাটা কিভাবে বলা যায় তাই ভাবছি দেখে ঝিন্নি বলল, কি হল বলুন!

বললাম, কথা যখন দিয়েছি তখন বলতেই হবে। তবে তুমি কিভাবে নেবে, তাই ভাবছি।

ভণিতা না করে বলুন তো—ঝিন্নির অধীর ঔৎসুক্যের সুর বাজল।

বললাম, তাহলে চোখ বন্ধ করেই বলি আর তুমি না হয় কানে আঙুল দিয়েই শোন।

ঝুমঝুমি বেজে উঠল ঝিন্নির হাসিতে। বলল, তাই হবে। আগে তো আপনি বলুন।

বললাম, এ আমার কথা নয়, মিঃ লীর কথা। অপরাধ যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে সে দায় কিন্তু আমার নয়।

ঝিন্নি এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, আসল কথাটা বলতে এত দেরি হয় আপনার। যে শুনবে তার ধৈর্যের বাঁধটুকু একেবারে ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝি কথাটা মুখের বাইরে বের করতে নেই।

বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, রাগ করো না, সব বলছি। আমরা যখন লী সাহেবের বাংলোর দিকে টাট্টু নিয়ে উঠছিলাম তখন উনি আমাদের দেখেছিলেন। তোমার চুলে গোঁজা সবুজ পাতাটা পড়ে গেলে আমি টাট্টু থেকে নেমে সেটা তোমাকে কুড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাও তিনি দেখেছিলেন। এবপর আমরা সবাই যখন লী সাহেবের বড়দিনের সাজসজ্জা দেখে চায়ের টেবিলে ফিরে এলাম তখন উনি আমাকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে একটা আর্টের বই খুলে ছবি দেখালেন।

এখানে এসে থেমে গেলাম দেখে ঝিন্নি বলল, কি ছবি?

বললাম, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া। মধ্যযুগের একজন নাইট ঘোড়া থেকে নেমে পথের ধারে পড়ে থাকা একটি রঙীন পালক তুলে তার বিলাভেড-এর হাতে দিচ্ছে।

ঝিন্নি আমার সামনে আর দাঁড়াল না। সেই মুহূর্তে আবহাওয়ার খবর ঘোষণা তার কাছে জরুরী হয়ে পড়ল।

দারুণ শীত পড়েছে আজ। এতক্ষণ হিটারটা জ্বালাতে একদম খেয়ালই হয় নি। —বলতে বলতে আমার দিক থেকে মুখখানাকে সরিয়ে নিয়ে ও সুইচটা অন করল। তারপর ঘরের কোণে রাখা হিটারটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে তার জ্বলাটা দেখতে লাগল।

ঝিন্নি যে লী সাহেবের ছবির বিষয়-বস্তুর কাছ থেকে পালাতে চাইছে, তা বুঝতে পেরে বেশ

কৌতুক বোধ করছিলাম মনে মনে। এতক্ষণে হিটারের লালচে আলোর মত হয়ত রঙের ছোপ ধরেছে ঝিন্নির গোল্ডেন অ্যাপেল মুখখানাতে।

আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওর এই হঠাৎ পালিয়ে বেড়ানো আর নিজেকে লুকোনোর খেলাটুকু উপভোগ করছিলাম, এক সময় বললাম, কতক্ষণ এমনি করে সরে থাকবে ঝিন্নি?

উঁ—শব্দটুকু উচ্চারণ করেই ও কিন্তু লক্ষণীয় ভঙ্গীতে শরীরটাকে পাক দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আমার পাশে!

বললাম, আজ যে বড় আলোটা জ্বেলে রাখলে? চোখে লাগছে না?

ও মুখখানাকে ওপর-নীচে কয়েকবার নাচাল। তারপর সোজা চলে গেল সুইচ বোর্ডের ধারে। আমাকে প্রথমে আশ্বস্ত তারপর অবাক করে দিয়ে ঝিন্নি সুইচ অফ করে দরজা ভেজিয়ে পাহাড়ী স্রোতের মত সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, ঝিন্নি হাতের নাগালের বাইরে ওড়ার খেলা দেখানো রঙীন একটি প্রজাপতি। একেবারে সহজলভ্য নয়।

সকালে কাপে চা ঢালতে ঢালতে ঝিন্নি নীচু গলায় বলল, ডাক্তার সাব, আপনার পেসেন্টের মা আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে বাইরের উঠোনে বসে আছে।

বললাম, কোন পেসেন্ট, ভাগ্তু?

ঝিন্নি বলল, ঐ একটিই তো পেসেন্ট এখন অব্দি।

বললাম, তা যা বলেছ। যে রকম হাতযশ ডাক্তাবের তাতে ওব বেশি পেসেন্ট থাকাই আশ্চর্যের।

ঝিন্নি টুলটুলে কাপটা প্লেটে বসিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, ও কথা কেন বলছেন, আপনি না থাকলে ভাগ্তুর ভাগ্যে যে কি অঘটন ঘটত তা ভাবাই যায় না।

হঠাৎ বলে বসলাম, তোমার মত অ্যাডমায়ারার পাশে থাকলে পেসেন্টের অভাব আমার কোনদিনই হবে না।

ও আমার দিকে এক ঝলক কড়া চাউনি হেনে পাশের ঘরের দিকে উঁকি দিল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, চাচাজী ঘরের ও প্রান্তে হিসাবের খাতা খুলে নিবিষ্ট হয়ে অঙ্ক কষছেন।

চা-পর্ব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি ভাগ্তুর মা বসে আছে। বছর তিরিশ বয়স হবে নিশ্চয়ই তবু এত বয়স মনে হয় না। কালো রঙের ঘাগরার ওপর লাল চোলি পরেছে। লম্বা সুথানের আকাশ-নীল রঙ। সাদা দোপাট্টায় মাথাটি ঢাকা। মেষচারক গাদ্দীদের মেয়ে গাদ্দান।

মেয়েটি আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করেও যেন করল না। আমার পাশে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা আপেল গাছের একটা ডালের দিকে চেয়ে গাদ্দীদের ভাষায় কি যেন বলে গেল।

আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পারলেও বেশ বুঝলাম, কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে! অবুঝ আপেল শাখাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ও আবেগভরা গলায় আবার কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করল। আমি ওর দিকে চেয়ে দারুণরকম বিচলিত আর অসহায় বোধ করলাম। ভাগ্তুর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ত্রাণকর্ত্রীর মত আমাদের মাঝখানে ঝিন্নি এসে না দাঁড়ালে হয়েছিল আর কি! সামনে মেয়েটির সঙ্গে তারই ভাষায় সে অনেকক্ষণ কি সব কথা বলে গেল। আমি নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে একসময় বলল, ও জানতে চাইছে ওর ছেলে একেবারে ভাল হয়ে গেলে তার বাপের মত কাংড়া থেকে ভুবুজোত পেরিয়ে কুলুতে ভেড়া চরিয়ে আনতে পারবে কি?

মাথা নেড়ে জানালাম, তা কি করে হয় বল। পাহাড়ে খুশিমত ওঠা-নামা করা কি ভাগ্তুর পক্ষে আর সম্ভব।

আমার কথা গাদী ভাষায় ও মেয়েটিকে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলে।

কথা শুনে ভাগ্‌তুর মার দোপাট্টায় মুখ ঢেকে সে কি কান্না! এবার ফুঁপিয়ে নয়, একেবারে ডুকরে ডুকরে কান্না। ঝিন্নি যত বোঝায়, তার কান্না তত উথলে ওঠে।

শেষটায় গতিক সুবিধের নয় বুঝে বললাম, ভাগ্‌তুকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে বল। যদি ওর বাবা সঙ্গে আসে তো ভাল হয়।

ঝিন্নি মেয়েটিকে কথাটা বলতেই সে কান্না থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। আমি চাচাজীর সঙ্গে বাগান পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছি। চাচাজী আমাকে বিভিন্ন জাতের আপেলের গাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করার চেষ্টা করছেন।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বললাম, কত জাতের আপেল আছে চাচাজী?

নরসিংলালজী একটু ভেবে বললেন, জাত তো দুটো, খাট্টা আওর মিঠা। তবে পুরা দুনিয়ামে ভ্যারাইটি আছে বাবুজী দো হাজার সে ভি জাদা।

বললাম, আমাদের বাগানে কত রকম আছে চাচাজী?

বললেন, পনের-বিশ রকমের। তোমার পিতাজী ক্যাপ্টেন বেননের 'সানসাইন অর্চার্ড' থেকে খুব ভাল জাতেব কলমের গাছ সংগ্রহ কবেছিলেন।

আবার জানতে চাইলাম, আমার কাছে সব গাছই তো সমান মনে হয়। কোন গাছে কি রকম আপেল হবে তা আপনি বলতে পারবেন?

চাচাজী প্রাণ খুলে হাসলেন। বললেন, আমার বাগানের গাছ আমি চিনবো না! ডালিয়ার ছোট ছোট চারা দেখলেই মালীর মালুম হয়ে যাবে, কোন গাছে কি রঙের ফুল ফুটবে। এসো তোমাকে চিনিয়ে দি।

আমি চাচাজীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছ চিনতে লাগলাম।

এটা ককসেস অরেঞ্জ পিপিনস। ঐ হল নিউটন। এদিকে ছোটা ছোটা যে গাছ দেখছ ওটা মেরী লুইসের গাছ। আমাদের বাংলোর উঠোনের গাছটা উইলিয়ম পিয়ার্স।

বললাম, এদের ভেতর কোনগুলি টক চাচাজী?

কোনটাই না আছে। সব কটা জাত-আপেল বাবুজী। তাছাড়া পাহাড়ের দিকের ঐ সারিটা কুলুর ফেমাস গোল্ডেন আপেলের গাছ।

বললাম কোন্ আপেলের বাজারে চাহিদা বেশি?

চাচাজী বললেন, নিরেস হোক সো ভি আচ্ছা, বায়ার্সদের টুকটুকে লাল রঙের আপেল চাই।

আপেলের জাত ধর্ম ছেড়ে এখন ঐ বিশেষ ফলটির ব্যবসার দিক নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

চাচাজী বললেন, পহিলে বহুৎ অসুবিধা থা বাবুজী। ট্রান্সপোর্ট খুব কিছু ছিল না। এখন ট্রান্সপোর্টের কিছু সুবিস্তা হয়েছে। বাঙ্গালোর কলকাত্তা উটকামন্ড যাচ্ছে কুলুর আপেল।

বললাম, কাশ্মীরী আপেল কিন্তু মার্কেট জুড়ে বসে আছে চাচাজী।

নরসিংলালজী অমনি বললেন, সোজাসুজি পাঠানকোট থেকে ট্রান্সপোর্টের সুবিস্তাটা পাচ্ছে। আমাদের তো তা নেই বাবুজী। আগে বহুৎ ফল একদম বরবাদ হয়ে যেত, এখন মানালীতে জ্যাম, জেলি তৈয়ারির ফ্যাক্টরী হয়েছে। তাছাড়া ফি বরষ ট্যুরিস্ট লোক আসছে। আপেল পিষে রস তৈয়ারী হচ্ছে। বিক্রি ভি হচ্ছে বহুৎ।

কথা বলতে বলতে আমার চোখ পড়ল আউট হাউসের দিকে। একটা টুপি উঁকি দিচ্ছে। আমি যতটুকু জানি এ টুপি গাদ্দীদের। কৈলাস পর্বতের চূড়োর আকারে টুপি বানিয়ে ওরা মাথায় দেয়। ওদের ধারণা ওদের দেবতা শিবকে ওরা সারাক্ষণ মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি পায়ে পায়ে ওদিকে এগিয়ে গেলাম। চাচাজীও এলেন আমার পেছন পেছন।

ভাগ্‌তুকে তার বাবা বয়ে এনেছে। আউট হাউসের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে ভাগ্‌তু। আমাকে দেখে এক মুখ হাসি ছড়াল।

চাচাজীকে আজকের ঘটনাটা বললাম। তারপর পরীক্ষা করে দেখলাম ভাগ্‌তুর পা-খানা। অপারেশনের ক্ষত শুকিয়ে গেছে প্রায়।

চাচাজী ভাগ্‌তুর বাবাকে বোধ করি তার ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বক্তৃতা দিলেন। মনে হল, ভাগ্‌তুর বাবা অবুঝ নয় ওর মায়ের মত। মাথা নেড়ে নেড়ে লোকটি সব শুনল। তারপর হঠাৎ তুবড়ির মত অজস্র কথা ওগরাতে লাগল ওর মুখ থেকে। আবার এক সময় চুপচাপ। যেমন শুরু ওর কথা, তেমনি হঠাৎ থেমে যাওয়া।

চাচাজী এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, লোকটি তার আক্ষেপের কথা বলছে বাবুজী। এ খোঁড়া ছেলেকে নিয়ে সে চলবে কেমন করে।

বললাম, প্রাণে বাঁচত না ও। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তো বেঁচে থাকবে চাচাজী।

চাচাজী বললেন, সেই কথা তো সমঝালাম এতক্ষণ ধরে, বাবুজী। ও শুনছে কই। বলে কি, ছেলে জিন্দা থেকে ভি মরে রইল। কি কামে লাগবে।

হঠাৎ কি মনে হল ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম, আপনি ভাগ্‌তুর বাবাকে বলুন চাচাজী, আমি ওর ছেলের ভার নিতে রাজী আছি। ও আমার মানালীর বাংলোতে থাকবে। ফি বছর যখন ভেড়া চরিয়ে কাংড়া থেকে কুলুতে আসবে তখন ছেলেকে দেখে যাবে। তাছাড়া আমি ভাগ্‌তুর কাজের বাবদ বছরে বছরে কিছু টাকাও ওদের দেব।

চাচাজী আপন মনে কি যেন ভাবলেন। হয়ত ভ্রাতুষ্পুত্রটির খেয়ালীপনার পরিণামটা একবার ভেবে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর গাদী ভাষায় লোকটিকে আমার মনোভাব জানালেন।

ভাগ্‌তুর বাবার মুখে প্রথমে একটা ভাবনার ছবি ফুটল, পরক্ষণেই মুখখানা খুশি খুশি হয়ে উঠল। ও চাচাজীর কাছে ওর মনের ইচ্ছার কথা জানাল। আমি ওর ভাষা না বুঝলেও ওর মুখের ভাবে সমর্থনের আভাস পেলাম।

ভাগ্‌তুকে বসিয়ে রেখে লোকটি কোথায় চলে গেল। চাচাজীর কাছ থেকে জানলাম, ভাগ্‌তুর বাবার অমত নেই। সে গেছে ভাগ্‌তুর মাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তার সম্মতি আদায় করে আনতে।

সেই থেকে আমার কাছে থেকে গেল ভাগ্‌তু। ঝিন্নির সঙ্গে ওর দোস্তি জমল বেশি। ওর সুবিধের দিকে ঝিন্নির সারাক্ষণ নজর। তাছাড়া ভাগ্‌তুর গাদী ভাষা আমার কাছে একদম হিব্রুর সামিল। এদিকে সারাদিন ঝিন্নি তুখোড় ভাষাবিদের মত ভাগ্‌তুর সঙ্গে ওর ভাষাতেই কথা চালিয়ে যাচ্ছে। দুজনের ছেলেমানুষী হাসি-ঠাট্টা, কথার তরঙ্গে সারা ঘর কলকলিয়ে উঠছে।

মনে মনে আমিও খুশি হয়ে উঠলাম। ভাগ্‌তু ছেলেটার মুখে এমন একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে যা তার চারদিকের সব্বাই-এর দৃষ্টি কেড়ে নেবে। ওদিকে ঝিন্নিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছি। একটি অখ্যাত গাদ্দীদের ছেলের জন্যে কি অগাধ মমতা তার! ভাগ্‌তুর সারাক্ষণের সুখ-দুঃখের সে যেন সমান অংশীদার।

ঝিন্নিকে একান্তে পেয়ে বললাম, কেমন হেলপার যোগাড় করে দিয়েছি বল। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

ঝিন্নি অল্প হেসে আমার দিকে চোখ টিপে তাকিয়ে বলল, ছোটে সাহেবের খিদমতগারের তোয়াজ করছি।

বললাম, চাচাজী কি বলেন?

ঝিন্নি বলল, আপনার রকম-সকম দেখে বলেন, বিলকুল দাদাসাহেব। ঠিক তেমনি মেজাজ, তেমনি খেয়াল খুশির মানুষ!

আমার ভেতর বাবার চরিত্রের কিছু ছাপ আছে জেনে হঠাৎ মনে একটা দোলা লাগল। এ আমার নিজের আবিষ্কার নয়, বহু দূর প্রবাসী অনাত্মীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত।

আমাকে অন্যমনস্ক হতে দেখে ঝিন্নি বলল, কি ভাবছেন এত?

বাবার কথা।

ঝিন্নি বলল, আপনার চলনে-বলনে কাজে-কর্মে পিতাজীর অনেক মিল আছে।

বললাম, আমি তাঁর ছেলে হয়েও তাঁকে দেখার যতটুকু সুযোগ পেয়েছি তারচেয়ে অনেক বেশি

পেয়েছ তোমরা। তাই তোমাদের মুখে তাঁর কথা শুনলে আমার ভেতর অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি জাগে।

ঝিন্নি বলল, আপনি যখন বিপাশার ধারে বসে ওপারের পাহাড় আর বনের দিকে তাকিয়ে থাকেন তখন আমি আপনার কাছে বসে অপনাকেই দেখতে থাকি। তখন একেবারে অন্য মানুষ আপনি! আপনার দৃষ্টি তখন হয় আপনার ভেতর নয়তো আপনার দেহের সীমা ছাড়িয়ে ঐ দূরের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। পিতাজীর চোখেও আমি ঠিক এই একই ছবি দেখেছি।

আচ্ছা ঝিন্নি আমার বাবা নদীর ধারে বেড়াতে এসে কোথায় বসতেন?

ঝিন্নি বলল, আপনি যে মসৃণ পাথরটার ওপর বসেন, ঠিক ওখানেই বসতেন। অবিকল আপনার মত তাকিয়ে থাকতেন।

কোথায় রক্তের অণু-পরমাণুতে স্বভাব আর সংস্কারের অদৃশ্য বীজ লুকিয়ে থাকে, যা পুরুষানুক্রমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়ে চলে। তাই পিতৃ-পিতামহের মেজাজ-মর্জির অংশীদার হয় তার উত্তর-পুরুষেরা।

আমি ভাবতে ভালবাসি। নির্জনে খেলা করতে ভালবাসে আমার মন। সে খেলার সঙ্গী আমার একান্ত প্রিয়জনেরা। অনুপস্থিত সেই চরিত্রগুলিই আমার নির্জনে খেলার সঙ্গী। আমি একটিও কবিতা লিখিনি কিন্তু প্রকৃতির গহন গভীরে আমার নিত্য যাওয়া-আসা। আমি আমার চারদিকের চরিত্রাবলীকে আমার প্রিয় প্রকৃতির মাঝখানে এনে দাঁড় করাতে ভালবাসি। যাদের মনে মনে ভালবাসতাম, কৈশোর জীবনেই তাদের হাত ধরে আমি কল্পিত কোন নদীর বালু-চিকচিক চরে ঘুরে বেড়াতাম। সে রোগ আমার আজও সারেনি। হয়ত আমার বাবার রক্তে এ রোগের বীজ থেকে থাকবে।

ঝিন্নি ঘরের কাজে যাবার আগে মনে করিয়ে দিল, কাল বাদে পরশু আমাদের নাগ্‌গরে যাবার দিন স্থির হয়েছে। ঐ দিনই কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব শুরু।

বললাম, কদিন কুলু মানালী করতে গিয়ে বেমালুম ভুলে বসেছিলাম কথাটা। দারুণ জমবে, কি বল?

ঝিন্নি যেন নিভে গেল। যেতে যেতে বলল, জমবে না ছাই।

ও চলে যেতে ভাবলাম, ঝিন্নি এ কথা বলল কেন! খানিক হাতড়াতে হাতড়াতে রহস্যটা স্বচ্ছ হল। আমি যে নাগ্‌গরে যাবার মত একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে ভুলে বসে আছি, সেজন্য ঝিন্নির অভিমান। হয়ত অনেক প্রতীক্ষিত মুহূর্ত নিয়ে ও রঙে রসে আপন মনে জাল বুনে গেছে। ঐ অভাবনীয়কে আমি অনুভব করিনি অথবা যথোচিত মর্যাদা দিই নি, তাই ঝিন্নি ক্ষোভ দেখিয়ে চলে গেল আমার সামনে থেকে।

যাবার আগের রাতে ঝিন্নি চাচাজীকে পই পই করে বলল, যেন কোলি-রি-দেওয়ালির সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িতে চেরাগ জ্বালান হয়। সব সাজিয়েই সে রেখে যাচ্ছে, শুধু জ্বালিয়ে দেবার অপেক্ষা।

আর বারণ করে গেল ভাগ্‌তুকে। উৎসবের রাতে আলোর রোশনাই দেখার জন্যে একদম তার ছুটোছুটি করা চলবে না। সে চেরাগেও হাত দিতে পারবে না। শুধু অনুমতি রইল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসবের রোশনাই দেখার। তাও বেশিক্ষণ নয়। দুর্বল পায়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ক্ষতি হতে পারে।

ঝিন্নির আদেশ ঘোষণার পর দেখলাম, ভাগ্‌তু বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। মনমরা হয়ে সে ঘুরতে লাগল। হাসি কথাবার্তা মুখ থেকে একেবারে মুছে গেছে। বেচারা ভাগ্‌তুর অবস্থাটা দেখে বড় মায়া হল। কিন্তু হার্ড টাস্কমাস্টার ঝিন্নির হৃদয়ের কঠিন বরফ তাতে একটুও গলল না।

কুলু থেকে একটা স্পেশাল বাস ছাড়ল নাগ্‌গরের দিকে। উপলক্ষ মেলা। বরফ যেভাবে আর্লি পড়েছে এবার তাতে গাড়ি মাঝপথ থেকেও ফিরে আসতে পারে। এ সম্বন্ধে গাড়ির চালক যাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তবে বাস ছাড়ল। আমরা ঐ বাসে ঠাঁই করে নিয়েছিলাম। যাত্রীদের সুকৃতির ফলেই হোক অথবা ওপরওয়ালার দয়াতেই হোক, বিনা বাধায় গাড়ি নাগ্‌গরে এসে পৌঁছল।

আমি আর ঝিন্নি বাস থেকে নেমে ওপরের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ঝিন্নি একটা পাহাড়ীকে পাকড়াও করেছে আমাদের মালপত্রগুলো ওপরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। লোকটা কিল্‌তায় ভরে নিয়েছে আমাদের সব-কটা মাল। তিনকোণা বাক্সটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে সট্‌ধি ঠুকতে ঠুকতে লোকটা এগিয়ে চলল আমাদের ডেরার দিকে।

পাহাড়ের প্রায় চূড়ো বরাবর নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারী।

আমরা আর্ট গ্যালারী লক্ষ্য করে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। বিপাশার কুল ছেড়ে একটা বাঁধানো পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরেক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। আমরা ঐ পথ ধরে চলেছি। ঘড়িতে দেখলাম, নটা বাজে বাজে। শীতের দিনের সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ একটা জ্যোতি আছে, কিন্তু উত্তাপ ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। আমরা উপরে উঠছি আর একটা অতি শীতল অভ্যর্থনা ডান দিকের পাহাড় আর পাইন বন থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। পাইনের ডালে পাতায় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ জমে আছে। ওপরের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফের কুচি ছড়ানো। হাওয়া তীব্র নয় তবু শীতের দারুণ প্রভুত্বের সামনে সসম্ভ্রমে নত হয়ে আমাকে এগোতে হচ্ছিল।

খানিক ওপরে উঠে আসতেই বাঁদিকে একটা কাঠের তৈরি বাড়ি দেখা গেল। আমি থমকে ওদিকে তাকাতেই ঝিন্নি বলল, এক সময় এটি কুলুর রাজাদের প্রাসাদ-কেল্লা ছিল। এখন এটি গভর্ণমেন্ট রেস্ট হাউস।

পাশে একটি ছোট্ট মন্দির দেখিয়ে বলল, আজ এই কেল্লার মন্দিরে পুজো হবে। এখান থেকেই সূচনা হবে উৎসবের।

বললাম, তাই বুঝি ? তাহলে সন্ধ্যায় আসব আমরা।

ঝিন্নি এবার চলতে চলতেই বলল, সন্ধ্যায় দারুণ ঠাণ্ডা পড়বে। তখন আপনাকে নিয়ে এখানে নেমে আসাটা ঠিক হবে না।

একটু রাগ করে বললাম, তাহলে নাগ্‌গরে এলাম কেন ঝিন্নি।

ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। আমাদের পায়ের জুতোগুলোর শব্দ পাথুরে রাস্তার ওপর বেজে বেজে চলল।

হঠাৎ ও চলার পথে থেমে গিয়ে ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ আমাদের আর্ট গ্যালারী। ওখান থেকে উৎসব দেখতে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ওপর থেকে সবকিছু অনেক সুন্দর দেখায়।

বললাম, তোমার ওপর ভরসা করে এসেছি, আমার নিজস্ব ভাবনা বলতে কিছু নেই।

ও ছোট্ট করে বলল, একটু ভরসা করে দেখুনই না।

ঝিন্নির কোয়ার্টারে বসে মনে হল সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি একটা শূন্যলোকে রয়েছি আর সেখান থেকে পৃথিবীর আশ্চর্য সব ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমার তিনদিক ঘিরে গভীর উপত্যকা। সবুজ চাদর বিছান। রোদ্দুরে নানা ধরনের সবুজের ছবি ফুটছে। কোথাও ঘন, কোথাও হালকা, কোথাও একেবারে ফিকে। উপত্যকার বুকের ওপর যেন অগোছালো সাদা কাপড়ের মত লুটিয়ে পড়ে আছে ধবধবে সাদা একটি নদী। উপত্যকার ওপরে অনেক উঁচু-উঁচু পাহাড়। হালকা নীল তাল তাল কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও বসতির চিহ্ন, তার ধারে পাইন গাছগুলো ছোট ছোট সংসার রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণের পাহাড়ে নিবিড় বন। নীচে ব্লু পাইন। ওপরে সারে সারে দেওদার আর সিলভার ফার উঠে গেছে। দূর দক্ষিণে দুটো নীলাভ পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের চূড়োর ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দুধের মত সাদা একটা পর্বতশীর্ষ। পীরপাঞ্জালের কোন একটা তুষার ধবল শৃঙ্গ মনে হয়।

আমার সামনে এক টুকরো ছবি ফুটে আছে। শীতের দিনের একটি ভায়োলেট ফুল উঁকি দিচ্ছে একটা পাথরের আড়াল থেকে। কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের দেখা কবেকার সেই ফুলটি আজও যেন ঠিক তেমনি থেকে গেছে—'হাফ হিডন ফ্রম দ্য আই'। বড় নম্র নত আর লাজুক।

কোয়ার্টারের পেছন থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠল, কোথায় আপনি ?

এই যে ঘরের ভেতর। তুমি কোথায় ?

উত্তর এলো, ঘরের পেছনে লহরীতে। একা একা কি করছেন? আসুন না এখানে।

গিয়ে দেখি সব্জির বাগানে বসে একটা ফুলকপির গায়ে হাত বুলোচ্ছে ঝিন্নি।

বললাম, কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ তোমার সব্জিক্ষেতে ফুলকপি এল কোত্থেকে?

ঝিন্নি বলল, যাবার আগে গাছ তৈরি করে গিয়েছিলাম, এখন ফুল ফুটেছে সেই গাছে। আজ আমার হাতের তৈরি ফুলকপির সব্জি রান্না করে খাওয়াব আপনাকে।

একটা কুহল সব্জি ক্ষেতের ধার দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছিল। বললাম, এই স্রোতধারাটি বুঝি তোমার জল সংগ্রহের উৎস?

ঝিন্নি বলল, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু জানলেন কি করে?

এটা আবার খড়ি পেতে জানতে হয় নাকি?

ও বলল, আর কটা দিন পরে অন্তত মাসখানেকের জন্যে এই কুহলটি একটা সাদা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

তাকিয়ে দেখলাম, পাহাড়েব গায়ে পাইন গাছের ওপরের দিকে কয়েকটা ওক আর দেওদার দাঁড়িয়ে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা স্রোত এঁকেবেঁকে নীচে নেমে এসেছে। পালিশ করা রূপোর হারের মত মনে হচ্ছে ঐ স্রোতধারাটিকে। ওপরের দিকে ওর গায়ে বরফের একটা সরের মত জমে আছে। জায়গায় জায়গায় রোদ্দুর পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

বললাম, সত্যি ঝিন্নি, তুমি আমাকে একটা ছবির রাজ্যে এনে ফেলেছ। কি যে ভাল লাগছে!

ঝিন্নি অমনি আমার সামনে ওর হাতখানা পেতে দিলে।

বললাম, কি?

ও বলল, কিছু দিন। এমন একটা ভাল জায়গায় এনে ফেললাম, বকশিস দেবেন না?

হেসে বললাম, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা এই ভাল লাগার বিনিময়ে তোমাকে দিতে পারি।

ঝিন্নি তার প্রসারিত হাতখানা ছোট করে গুটিয়ে নিল। শুধু হাতের পাতাটা পেতে রেখে বলল, আমি এই এতটুকুতেই খুশি। যা দেবেন, তাতেই খুশি।

হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। ওকে ওখানে বসতে বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝিন্নির কোয়ার্টার আর রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারীর মাঝে এক চিলতে বাগান। দুটি আপেল গাছ দাঁড়িয়ে ওখানে। ঘরে ঢোকার সময় চোখে পড়েছিল অসময়ের একটি আপেল, গাছের ডাল-পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে।

আমি গাছ থেকে আপেলটি পাড়লাম। সাদাটে রঙ, গোলাপী আভা মেশান, আকারে অনেক বড় আব নিটোল গোলাকার।

আপেলটা বাঁ হাতে ধরে পেছন দিকে লুকিয়ে নিয়ে সব্জি বাগানে ঝিন্নির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও চুপচাপ তেমনি হাত পেতে মুখ নিচু করে বসেছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে বলল, কই দিন কি দেবেন?

বললাম, তুমি তো দেখছি দারুণ মেয়ে। সেই থেকে হাত পেতে বসে আছ?

ঝিন্নি বলল, পাওনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বুঝে না নিলে কখন তামাদি হয়ে যায় সেই ভয়ে হাত পেতেই বসে আছি।

বললাম, চোখ বন্ধ কর তো দেখি।

ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল।

আমি তবু বললাম, অ্যাই—দেখছো।

ও চোখ না খুলেই বলল, আমাকে তাহলে একেবারে অন্ধ করে দিন, তবে যদি বিশ্বাস হয় আপনার।

কি কথায় কি এসে পড়ল। আমি আর কথার পিঠে কথা না বাড়িয়ে বললাম, একদিন গার্ডেন অব ইডেনে প্রথম রমণী ইভ অ্যাডামকে একটি আপেল দিয়েছিল। তাই ইভকে চিরদিন দুঃখ সৃষ্টির জন্য অপবাদ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আর আজ একটি পুরুষ তোমাকে গার্ডেন অব ইডেনের শেষ আপেলটি

দিচ্ছে। অপবাদ যদি কিছু রটে, তাহলে তা আজ থেকে ঐ পুরুষের।

বলতে বলতে আপেলটা ওর প্রসারিত হাতে দিয়ে দিতেই ও চমকে উঠে তাকাল। অনেকক্ষণ আপেলটার ওপর চোখ রেখে কি যেন ভাবতে লাগল।

এক সময় উঠে দাঁড়াল ঝিন্নি। কি অপূর্ব দেখাচ্ছিল ওকে সেই মুহূর্তে। সিমলার মিশনারী স্কুলে পড়া মেয়ে ঝিন্নির কাছে গার্ডেন অব ইডেনের আপেলের তাৎপর্য নিশ্চয় অজ্ঞাত ছিল না। ঐ ফলের মত ঝিন্নির মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ও আর সেখানে দাঁড়াল না। কোন কথাও বলল না। আপেলটা নিয়ে কুহলের পাশ কাটিয়ে লহরী পেরিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

আমি বুঝলাম, গার্ডেন অব ইডেনের ঐ নিষিদ্ধ ফলটি স্পর্শমাত্রই ঝিন্নির মধ্যে ক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দুটি দেওদার গাছের ফাঁকে পাথরের মূর্তি পড়ে আছে। রোদ্দুর এসে পড়েছে মূর্তির ওপর। কোন দেবীমূর্তি নয়। আভরণ আর আবরণহীন এক নারীমূর্তি। চোখ কেড়ে নেয় তার যৌবনের উদ্ধত ভঙ্গীটি। হয়ত শিল্পী রোয়েরিখ এই নারীমূর্তি পাথর কেটে সৃষ্টি করেছিলেন। হয়ত বা তিনি এটিকে উপত্যকার কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনে এখানে রেখে দিয়েছিলেন। যিনিই এ মূর্তি পাথরে খোদাই করুন, তিনি যে জীবনশিল্পী তাতে সন্দেহ কি! পাথরের মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে নারীদেহের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘোষণা করছে।

আমি মূর্তি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই দেখলাম ঝিন্নি জানালার লম্বা লম্বা গরাদগুলোতে মুখ চেপে রেখে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে।

আমি এতক্ষণ ওর জানালার অদূরে রাখা মূর্তিটাই দেখছিলাম। হয়ত আমি যখন নিবিষ্ট হয়ে ঐ নারীমূর্তিটিকে লক্ষ্য করছিলাম, তখন ঝিন্নি আমাকেই দেখছিল। এখন অবশ্য ওর চোখ দুটো দূর পাহাড়ের পাইন বনের গভীরে হারিয়ে গেছে। আবার এমনও হতে পারে ওর বাইরের চেয়ে থাকাটা সত্যি নয়। ওর দৃষ্টি মনের কোন অতল তলে ঢেউ তুলে সাঁতার কাটছিল।

ওখনে থেকে আমি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম কোয়ার্টার-সংলগ্ন বাগানে। বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালে কাঠের কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ছোট মন্দিরটির ওখান থেকেই নাকি সূচনা হবে কোলি-রি-দেওয়ালি উৎসবের। আমি জানি না কেমন সে উৎসব, তবে দেওয়ালির মত দীপ জ্বালানো হবে, রোশনাই হবে—এটুকু জেনে এসেছি। দুদিন পরে একটা মেলাও বসবে এখানে। দশেরা উৎসবের পরে এটি নাকি কুলুবাসীদের কাছে বিশেষ প্রতীক্ষিত মেলা।

টুকরো টুকরো কথা ভাবছি, পেছন থেকে শান্ত গলায় ডাকল ঝিন্নি, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন ভেতরে।

কোন কথা না বলে ফিরে দাঁড়ালাম। ঝিন্নি এবার ঘরের দিকে পা বাড়াল, আমি ওর পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকলাম।

ঝিন্নি বিছানা পেতেছে কখন। বলল, বসুন এর ওপর, ঠাণ্ডা লাগবে না।

বসলাম। ও ভেতরের আর একখানা ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল হাতে চায়ের কাপ আর নানখাটাই-এর মত একটা বস্তু নিয়ে।

আমার হাতে চা ধরিয়ে দিয়ে ও আবার ভেতরে চলে গেল। এবার বেরিয়ে এল নিজের কাপটা হাতে নিয়ে।

আমি চা খেতে খেতে তাকাতে লাগলাম ঝিন্নির দিকে। ও দরজার চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে কাপে পিঙ্ক রোজের পাপড়ির মত ঠোঁট ছুঁইয়ে চোখ নামিয়ে চা খাচ্ছিল। আমার দিকে কিন্তু ও একবারও তাকাচ্ছিল না, কিংবা ঘরের ভেতর আসছিল না।

বললাম, দাঁড়িয়ে কেন, বসবে না?

অন্যমনস্ক অবস্থায় কোন কথা শুনলে চমক লাগে, ঝিন্নিও তেমনি করে তাকাল। তারপর বলল, রান্না চাপিয়েছি এখন বসব কি? আপনি বরং বসুন।

বলতে বলতেই ঝিন্নি ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল।

সারা দুপুর ওর খাওয়াতে আর বাসন-কোসন ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে কেটে গেল। খাওয়ার পর আমার বিছানায় কম্বল একখানা ফেলে দিয়ে বলল, মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন, সন্ধ্যের আগেই ডেকে তুলব।

বেশ শীত করছিল খাবার পর, বাধ্য ছেলের মত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বিকেল চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙল ঝিন্নির হাতের ছোঁয়ায়। আমার মাথায় হাতটা রেখে আস্তে আস্তে ও নাড়া দিচ্ছিল। ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসলাম।

টেবিলে চায়েব কাপ বসানোই ছিল। ধোঁয়া উঠছিল তার থেকে, শীতের দিনের সকালে পুকুরের জল ছুঁয়ে কুয়াশাগুলো যেমন এলোমেলো উড়তে থাকে।

ঝিন্নি আমার হাতে কাপটা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল দেখে বললাম, কি হয়েছে তোমার ঝিন্নি? আমি কি তোমাকে কোনরকম আঘাত করেছি?

ঝিন্নি খুব সহজ শান্ত গলায় বলল, কই না তো! আপনি আঘাত করতে যাবেন কেন?

বললাম, সারাদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকছ, আমি নিজেকে তাই তোমার অশান্তির কারণ বলে ভাবছি।

ঝিন্নির গলায় উদ্বেগ, ওভাবে বলবেন না। বিশ্বাস করুন, এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যাতে আপনাকে আমি আমার দুঃখের কারণ বলে ভাবতে পারি।

ও আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভেতরে চলে গেল।

খানিক পরে আমার বিছানার পাশে এসে স্বাভাবিক গলায় বলল, উৎসবের অনেক দেরি, এখন চলুন আপনাকে নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারীটা দেখাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঝিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে দেখি পাইন আর দেওদার বনের দীর্ঘ ছায়া নেমেছে সামনের বাগান আর পথের ওপর। রোদ্দুরের রঙ লালচে সোনার মত। পথের ওপর পেতে রাখা একটা সোনালী কার্পেট যেন ছায়া কালো ডোরায় কেটে কেটে গেছে।

ঝিন্নি আর আমি আর্ট গ্যালারীর দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝিন্নি তালায় চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, আপনি একটু দাঁড়ান, ভেতরে ভাল দেখা যাবে না, আমি আলোটা জ্বেলে নি।

দরজা খুলে ঝিন্নি ঢুকল। আলো জ্বেলে ভেতর থেকে আমাকে ডেকে বলল, আসুন।

আমি ঢুকে বাঁদিকের টেবিলের ওপর রাখা একটা বাঁধানো মন্তব্যের পাতা দেখলাম। নীচে পণ্ডিত নেহরুর স্বাক্ষর। পড়ে দেখলাম, দার্শনিক দৃষ্টিতে পণ্ডিতজী শিল্পী রোয়েরিখের সৃষ্টির বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতভূমির ওপর যে মহান হিমাচল দাঁড়িয়ে আছে, তার আত্মার সুরটি বেজে উঠেছে এই ভারতপ্রেমিক শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্যে।

আমি ওখান থেকে চোখ সরিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। ছবি দেখার ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। কোন একক শিল্পীর প্রদর্শনী দেখতে গেলেই আমি আগে একবার ঘুরে সব ছবিগুলোর ওপর মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিই। তারপর এক একটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। ওতে শিল্পীর সামগ্রিক মেজাজটা ধরতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয় না।

ঠিক আগের পদ্ধতিতেই আমি ছবিগুলো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখে নিলাম। এবার ফিরে এলাম প্রথম যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। একবার তাকালাম ঝিন্নির দিকে। ও অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। কেউ যে এমন দু-এক মিনিটে ছবি দেখে নিতে পারে, তা বোধহয় ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি মনে মনে হেসে আবার ছবি দেখার কাজ শুরু করলাম।

প্রথম দেখায় আমার মনে হল রোয়েরিখের ঝোঁক নীল রঙের ওপর। তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই নীলের ঢালাও ব্যবহার। শিল্পীর মনের সীমাহীন প্রসার যেন ঐ নীল রঙের ভেতর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। পাহাড় পর্বতের ধূসর নীলাভ দেহ, কুয়াশার ফিকে নীল, আকাশের ঘন নীল, সাদা আর নীলে মেশা জলপ্রবাহ, সব কিছু মিলে আশ্চর্য এক নীলের জগৎ।

একটি ছবির কাছে এসে আমার চোখ আটকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জলধারা।

তার পাশে একটি গেরুয়া রঙের শিলা দাঁড়িয়ে। ঐ শিলার তলায় ছড়িয়ে পড়ে আছে আরও কয়েকটি শিলা। সব কটিই গৈরিক। ভাল করে দেখলাম, যেগুলিকে শিলা মনে হচ্ছিল সেগুলি মানুষেরই ফর্ম।

আমি ভাবতে লাগলাম। এ কি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের পরিকল্পনা? না সনাতন ভারতের ধ্যানের কোন ছবি? হিমালয়ের বিরাট সাধনলোক থেকে কি সমভূমির দিকে বয়ে আসছে নিরন্তর করুণাধারা।

এসব প্রশ্ন আমার মনে জাগছিল।

আমি ছবির পর ছবি দেখে যাচ্ছিলাম আর মনে মনে এক একটা অর্থ খাড়া করে নিচ্ছিলাম।

ঝিন্নির দিকে চোখ পড়তেই ও এগিয়ে এল। এতক্ষণ যেন আমাকে কিছু বলার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

কাছে এলে বললাম, কিছু বলবে?

ঝিন্নি বলল, আপনি যে ছবির সমঝদার তা বুঝতে আমার ভুল হয় নি। তবে একটা কথা বলব।

বললাম, আমি সমঝদার কিনা জানিনা কিন্তু ছবি আমি ভালবাসি। আর আমি আমার মত করেই দেখতে ভালবাসি। কারো শেখান পথ পদ্ধতি ধরে নয়। হাঁ, এখন কি বলতে চাইছিলে বল।

ঝিন্নি বলল, শিল্পী রোয়েবিখের শিল্পসৃষ্টিতে আর একজনের যে দান আছে এ কথাটুকুই বলতে চাইছিলাম। হয়ত এটা আপনার জানা নেই।

বললাম, কি রকম! কে তিনি?

ঝিন্নি বলল, ওঁর স্ত্রী। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্রী। রোয়েরিখের সৃষ্টির প্রেরণা ছিলেন তিনি। বহু ছবির ভেতর স্বামী-স্ত্রী একাত্ম হয়ে আছেন।

ঝিন্নির কথা শোনার পর আমার মনে শিল্পী রোয়েরিখ আরও গভীর দাগ কেটে দিয়ে গেলেন।

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম। হিমালয়প্রেমিক এক শিল্পী নিজেকে এক সীমাহীন নির্জনতায় নির্বাসিত করে রেখেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেরণার উৎস তাঁর সঙ্গিনী পাশে দাঁড়িয়ে। দূর হিমালয়ের নিসর্গ চিত্রাবলীর দিকে প্রসারিত তাঁদের দৃষ্টি।

আমরা গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। সূর্য সরে গেছে ওপরের পাহাড়ের আড়ালে। দেওদার গাছগুলো মৃদু একটা আওয়াজ তুলছিল। অতীতের দ্রষ্টা তারা। হয়ত দূর অতীতের কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছিল ঐ শব্দে। আমরা দেওদার গাছগুলোর নীচ দিয়ে হাঁটছিলাম। বিশাল বৃক্ষগুলোকে শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

একেবারে জনহীন অরণ্যভূমির ভেতর দিয়ে আমরা চড়াই পথে উঠে চলেছিলাম দুটি প্রাণী। ঝিন্নি কিংবা আমার মুখে কোন কথা ছিল না। ঝিন্নি সেই মুহূর্তগুলোতে কি ভাবছিল তা অনুমান করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটা ভাবনার মৌমাছি আমার চারদিকে গুনগুন করে উড়ে ফিরছিল। আমি সেই মৌমাছির গান শুনতে শুনতে ঝিন্নিকে অনুসরণ করছিলাম।

মৌমাছিটা আমাকে কি গান শোনাচ্ছিল? ছ'হাজার ফিট ওপরের এই অরণ্যলোক, ঐ শেয় সূর্যের সিঁদুরমাখা পীরপাঞ্জালের তুষারশিখর, দুটি মাত্র নারী আর পুরুষ, সব কিছু মিলে এক বিহ্বল করে দেওয়া গার্ডেন অব ইডেনের গান!

আমি যেন সেই আদি পুরুষ অ্যাডাম, অনুসরণ করে চলেছি প্রথমা নারী ইভকে। স্যাটান ভাবনার মৌমাছি হয়ে ক্রমাগত গান শুনিয়ে প্রলুব্ধ করে চলেছে।

ঝিন্নি নৈঃশব্দের মধ্যে হঠাৎ ঢেউ তুলে বলল, আমরা কিন্তু কোয়ার্টার ছাড়িয়ে একটা নতুন আস্তানায় উঠে এলাম।

কথা শেষ হতে না হতেই বনের জটলা পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে একটি ছোট বাংলো।

ঝিন্নি বলল, এটি আমাদের ফরেস্ট গার্ডের ডেরা। এখন মাস দেড়েক ছুটিতে নীচে নেমে গেছে। ওর চাবি থাকে আমারই কাছে। এ তল্লাটে ঐ বৃদ্ধই আমার একমাত্র ভরসা।

সেই মুহূর্তে আমার দারুণ শীতবোধ হচ্ছিল। হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল একটা হাওয়া। বললাম, ঝিন্নি দারুণ শীত এখানে।

ও বাংলোর দরজা খুলে ফেলল। আমার হাত ধরে সন্ধ্যের আবছায়ায় ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। একটা চারপাই-এর মত কিছু পড়েছিল। ও বলল, এর ওপর বিছানা পাতা, কম্বলও আছে। আপনি বসুন, আমি আসছি। এখানে কিন্তু ইলেকট্রিকের কোন ব্যবস্থা নেই।

আমি পাতা বিছানার ওপর বসে পড়লাম। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। আমার কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে কমে এল।

ঝিন্নির যেন সব কিছু মুখস্থ। এই অন্ধকারে সে একটা লণ্ঠন জ্বেলে আনল। আলোয় ঘরখানা ভরে উঠতেই দেখলাম, চারপাই-এর ওপর পরিচ্ছন্ন একটা বিছানায় আমি বসে আছি। বিছানার চাদর, লেপ, কম্বল সবকিছু মনে হল আমার চেনা। কুলুর বাংলোতে ঝিন্নিকে ব্যবহার করতে দেখেছি। বুঝলাম, আমি যখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলাম ঝিন্নি তখন তার বিছানাখানা ওপরের এই বাংলোতে তুলে এনেছে।

বললাম, ঝিন্নি, এখানে আমরা এলাম কেন?

ও ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা কাঠগুলো সাজাতে সাজাতে বলল, এখান থেকে কুলু উপত্যকা সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায়। আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন আর এই বিছানায় বসেই উৎসব দেখবেন।

কি মনে এল, বললাম, আমি একা থাকব এখানে?

ইচ্ছে হলে একা থাকতে পারেন।

বললাম, আমার কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। আসার আগে সবই তো তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি।

ও কাঠের ওপর একটা বোতল থেকে কেরোসিন ঢালতে ঢালতে বলল, তাহলে চুপচাপ বসে থাকুন, যা হচ্ছে হতে দিন।

দেশলাই জ্বেলে ও কাঠ ধরাল। কিছুক্ষণের ভেতর চিড়চিড় শব্দ করে কাঠ জ্বলতে লাগল।

আগুনটা নাচছে, ঝিন্নির ছায়া কাঁপছে। মেঝেতে খড়ে বোনা মাদুর পাতা। তার ওপর পুরোনো কাপড়ে তৈরি খিন্দ্ বিছানো। ঝিন্নি হাঁটু মুড়ে তারই ওপর বসে ফায়ারপ্লেসে একটার পর একটা কাঠ জুগিয়ে যাচ্ছে। যখন গনগনে হল আগুন, ঘরের হাওয়ায় আরামের তাপ লাগল, তখন ও উঠে এল আমার পাশে। বলল, এখুনি উৎসব শুরু হবে। জানালার ধারে সরে বসুন। তাকিয়ে থাকুন বাইরের দিকে।

আমি দূরে তাকিয়ে ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। বললাম, কিছু তো দেখছি না।

একটু ধৈর্য্য ধরে বসে থাকুন, ঠিক দেখতে পাবেন।

নিজের চঞ্চলতায় নিজেই লজ্জা পেলাম।

ঝিন্নি বিছানায় বসল না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ও জানালা দিয়ে ঘোলাটে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ এমনি চেয়েছিলাম অভাবিত কিছু দেখার আশায়। হঠাৎ ঝিন্নি বলে উঠল, দেখুন, দেখুন, কেল্লার মন্দির থেকে প্রথম হাউই উঠছে আকাশে।

দেখলাম, অথৈ অন্ধকাব সমুদ্রের বুক চিরে একটি উজ্জ্বল অগ্নিনাগ তীরবেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটা শব্দে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল। অতল আঁধারের জলে ডুবে গেছে সেই অগ্নিনাগ। এখন আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে রাশি রাশি আলোর জলবিন্দুগুলি।

সে দৃশ্য মুছে যেতে না যেতেই নীচের উপত্যকা থেকে অন্ধকারের বুকে শুরু হল আলোর ফুল ফোটানোর খেলা। ঝাঁকে ঝাঁকে উজ্জ্বল সাদা সাদা ফুল ফুটে উঠছে আকাশে আবার সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর ঝরে পড়ে যাচ্ছে পাপড়িগুলো। কখনো বা এক পাহাড়ী টিকা থেকে অন্য টিকায় ছুটে চলেছে আলোর ঝাঁক ঝাঁক তীর।

প্রায় দু'ঘণ্টা এই উৎসব চলল। পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত শব্দে, রোশনাই-এর উজ্জ্বল আলোর বৃষ্টিতে কুলু উপত্যকা অদৃশ্য কোন যাদুকরের রহস্যময় সৃষ্টি বলে মনে হল।

এখন রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আর আকাশমুখী আলোর খেলা থেমে গেছে। শুধু দূরে কাছে পাহাড়ী গ্রাম বা টিকা থেকে ঝিকমিক জোনাকীর মত জ্বলতে দেখা যাচ্ছে কোলি-রি-দেওয়ালির

চেরাগের আলো।

ইতিমধ্যে একবার চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঝিন্নি। তারপর আর তার উপস্থিতির খবর রাখিনি। চোখের উৎসবে আমার মন এমনি ডুবে ছিল যে ঝিন্নির আসা যাওয়ার লঘু পদধ্বনি আমার কানে তেমন করে বাজেনি।

এখন উৎসব শেষে পাহাড়ী রাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক উত্তেজনার পরে ঝিমিয়ে পড়েছে রাতের নিসর্গ। আমি জানালা থেকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম, ফায়ারপ্লেসের ধারে ঝিন্নি একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। আমার দিক থেকে মুখখানা ফায়ারপ্লেসের দিকে ফেরানো। নতুন কোন কাঠ তখন জ্বলছিল না। সব কাঠ-পুড়ে দগদগে লাল একটা আভা ছড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কারো যেন রক্তঝরা হৃদয় পড়ে আছে।

আমি ডাকলাম, ঝিন্নি!

ও যেন আচ্ছন্ন একটা অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, আপনি রোশনাই দেখছিলেন তাই ডাকিনি। রাতের খাবার তৈরি।

বললাম, খাবার ইচ্ছে নেই ঝিন্নি, মন আর চোখ ভবে গেছে কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব দেখে।

ও বলল, আমি কিন্তু আপনার মত বসে বসে উৎসব দেখিনি, অতিথির জন্য কিছু আয়োজন করেছি।

বললাম, নিয়ে এসো, খাবার পাটটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

আমাকে একটা টেবিলের ওপর খাবার দিয়ে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে দেখে বললাম, একটা অনুরোধ রাখবে?

ঝিন্নি আমার দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকাল।

বল রাখবে?

বলুন।

হেসে বললাম, তুমি খুব হুঁশিয়ার মেয়ে ঝিন্নি, অনুরোধটা রাখবে কিনা স্পষ্ট করে বললে না।

ও অমনি বলল, রাখব, এবার বলুন।

আমি থালা থেকে একখানা পকৌড়া তুলে নিয়ে ঝিন্নির দিকে হাত উঁচিয়ে বললাম, এটুকু বিনা প্রতিবাদে খেতে হবে। আর তোমার খাবারও আন এখানে, একই সঙ্গে বসে খাব।

ঝিন্নি হাত বাড়াল পকৌড়াটা নেবার জন্যে। অমনি আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

উঁহু ওটি হবে না, আমার হাত থেকেই খেতে হবে।

ঝিন্নি মনে হল দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও হঠাৎ বলল, আমি আসছি, খাবারটা নিয়ে আসছি।

মুহূর্তে ও অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার বৈপ্লবিক প্রস্তাবটা একেবারে মেনে নেবার আগে একটুখানি ভেবে নেবার সুযোগ নিল ঝিন্নি।

এক সময় একটা থালা হাতে বেরিয়ে এলো ও। চেয়ারখানা আমার টেবিলের সামনে টেনে এনে বসল। তারপর নিজের থালায় হাত দিয়ে বলল, বাব্বা কি ভীষণ লোক আপনি। এই বসলাম একসঙ্গে খেতে, হল তো?

আমি কোন কথা না বলে বসে রইলাম। হাতে আমার পকৌড়াটা তেমনি ধরা রইল।

ও আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিজের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, দিন।

ওর মুখে 'দিন' শব্দটা অনেক দূরের থেকে ভেসে এল।

আমি হাত বাড়াতেই ঝিন্নি আমার হাতটা ওর দুটো হাতে চেপে ধরল, তারপর মুখখানা আমার হাতের ওপর ছুঁইয়ে পকৌড়াটা তুলে নিয়েই ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। ঝিন্নি আর ফিরে আসে না! আমার সারা শরীরে তখন এক অননুভূত

রোমাঞ্চ খেলা করছে। ভোরের শিশিরে ভেজা আধফোটা একটা গোলাপ যেন আমি ছুঁয়ে আছি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেলাম। আমার পা দুটো কাঁপছিল। ও-ঘরে আলো ছিল না। বাইরের ঘরের আলোর সামান্য রশ্মি পড়েছিল ভেতরে।

আমি দেখলাম, ঝিন্নি একটা শূন্য চার-পাই-এব ওপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি ঝিন্নির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও মাথা তুলল না। আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর চুলে ভরা মাথায়।

কতক্ষণ পরে ও একটু শান্ত হল। আমি ওকে চারপাই-এর ওপর তুলে বসালাম। ও কিন্তু ওর মুখখানা দুটো হাতের পাতা অঞ্জলিবদ্ধ করে ঢেকে রাখল।

আমি ওর পাশে বসে হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি কিন্তু শক্ত করে মুখের ওপর চেপে রাখল ওর হাত।

বললাম, একটা দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। তোমার সেবার বিনিময়ে আমি তোমাকে অপমান করে বসলাম। আমি তোমার যোগ্য অতিথি নয়।

মুখ থেকে দুটো হাত সরে গেল ঝিন্নিব। আমি অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ঝিন্নি আমার দিকে স্থির দুটো চোখ মেলে চেয়ে আছে।

আমরা কেউ কারো মুখেব ভাষা প৬তে পারছিলাম না।

ও কথা বলল, আপনি এমন কথা বললেন কেন বলুন?

তুমি কাঁদলে যে!

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁদালে কাঁদব না!

বললাম, তাই তো তোমার কাছে যে হাত দিয়ে অন্যায়টা করলাম, সেই হাত জোড় করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঝিন্নি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। ও নীচু হয়ে আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে ওর মুখ ঢেকে ফেলল।

আশ্চর্য একটা শিহরণ আমার রক্তের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি ওর নরম নিটোল গাল দু-হাতে চেপে ধরতেই মনে হল ও চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছে। আমি দারুণ উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। ডিসেম্বরের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও আমাব তপ্ত নিশ্বাসগুলো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।

আমি ওকে চুমু খেতে গেলাম। হয়ত আমার অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ওকে সচেতন করে দিয়েছিল। ও আমাকে ওর চাঁপার পাপড়ির মত দুটো সুন্দর নরম ঠোঁটে চুমু খেতে দিল না। আমার বুকের ওপর মুখখানা চেপে রেখে বলল, ছোটেসাহেব, তুমি আমাকে এমনি করে মেরে ফেলো না। তুমি এমন করলে সত্যি মরে যাব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঝিন্নি একথা উচ্চারণ করল কেন! সে যদি আমার সান্নিধ্য না চাইত, তাহলে প্রথমেই রূঢ় তিরস্কারে আমাকে ফিরিয়ে দিত। আমার বুকের ভেতর মুখখানাকে এমন করে লুকিযে রাখত না। কিন্তু ঝিন্নি এমন করে বলল কেন? ও কি তবে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাব আকর্ষণে আমার কাছে এসেছে!

ওর কাছ থেকে আমি ধীরে ধীবে নিজেকে সরিয়ে নিতে গেলাম। ঝিন্নি আমার কাঁধের ওপর ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি ভীষণ খেয়ালী ছোটেসাহেব, আর তুমি দারুণ.....।

কথাটা ও শেষ কবতে পারল না দেখে বললাম, দারুণ কি ঝিন্নি?

ঝিন্নি ফিস্ ফিস্ করে বুকের ভেতর থেকে বলল, দারুণ কাঁদাতে পার।

আমি সে রাতে পাইন আর দেওদারের গান শুনলাম ঝিন্নিকে বুকে চেপে রেখে। রাতে আধো ঘুমে হিমেল স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালাম। পাবলো পিকাশোর সেই বিখ্যাত ছবি 'জলি ইভা'এর কথা মনে এল। সেই সুন্দরী আদি নারী ইভের ছবি। কোনারকের মন্দিরে মিথুন চিত্রের সামনে দুজনে গিয়ে

দাঁড়ালাম। নিটোল স্তনে হাত রেখে প্রেমিকটি চেয়ে আছে তার মুদে-আসা আঁখি প্রেমিকার মুখের ওপর। আশ্চর্য সেই ভাস্কর যে আমার ঝিন্নিকে কোন জন্মান্তরে দেখেছে।

আজ সকালের সেই সুন্দর আপেলটি মনে হল দ্বিখণ্ডিত হয়ে আমার বুক ছুঁয়ে আছে।

কখন ঘুমের মাঝে ভোর হল আমি জানতে পারিনি। চেয়ে দেখি আমার কাছ থেকে নিঃশব্দে কখন উঠে চলে গেছে রাতের ধরা পড়া সেই সোনার হরিণটি।

বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম কত অপূর্ণতাকে কে যেন একটি রাতেই পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। এতদিনের নিঃসঙ্গতার সব অবসাদ মুছে গিয়ে বাইরের ঐ রোদ্দুরে স্নান করা ডালিয়াটির মত আমি তাজা হয়ে উঠেছি। কি অজস্র ঠাসা পাপড়ি তার। কি আকুল তার ফুটে ওঠার আবেগ।

ঝিন্নি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাতে চায়ের কাপ। ওকে চেনা যাচ্ছে না। এক রাতের ভেতর ও যেন অসম্ভব রকম পাল্টে গেছে। ওর সুন্দর চোখ, দর্শনীয় মুখখানা অনেক স্থির আর গম্ভীর হয়েছে।

বললাম, ঐ কাপে আজ আর খেতে মন চাইছে না ঝিন্নি।

ওব চোখে বিস্ময়। বলল, আমি তো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করেই এনেছি।

বললাম, তুমি দুনিয়ার সব সেরা পাত্রে অমৃত এনে দিলেও মন আমার আর ভরবে না। এই দশটি আঙুল কাল রাতে যে দুটি আশ্চর্য সোনার পেয়ালা ধরেছিল, যে মাদক পান করেছিল তার থেকে, সেই পেয়ালার স্মৃতি আমি মুছে ফেলতে পারব কি করে ঝিন্নি।

হঠাৎ ওর চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে উঠল! ও চায়ের কাপখানা টিপয়ে বসিয়ে রেখে খপ্ করে আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে ক'টা আঙুলে দাঁত বসিয়ে দিলে।

বেশ দাগ পড়ে গেলেও আমি চেঁচালাম না দেখে ও আহত হাতখানা গালের ওপর সজোরে চেপে ধরে সোহাগে আদরে ভরে দিতে লাগল। মুখে বলে চলল, তুমি ভী-ষ-ণ অসভ্য ছোটেসাহেব, বিলকুল একটা ডাকু।

দু'দিন পরে মেলা বসেছে নাগ্‌গরে। আমি আব ঝিন্নি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি মেলা দেখতে। আমার পরিচিত কারো সঙ্গে যদি এ সময় আমার চোখাচোখি হয় তাহলে নিশ্চিত সে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আমি যে পুষ্কর মুখার্জী, আস্ত এক বাঙালী সন্তান, তার কোন চিহ্নই আর আমাব ভেতর তারা আবিষ্কার করতে পারবে না।

আমি পরেছি গ্রে উলেন একখানা ট্রাউজার। তার ওপর কোমরে জড়িয়েছি একটুকরো গরম কাপড়। কুর্তার ওপর চাপিয়েছি একটা ছোট কোট। সবার ওপরে গায়ে দিয়েছি রঙীন একখানা কম্বল। আমার মাথায় ডিপ মেরুন রঙের টুপি। টুপির একেবারে চূড়োয় লালের ছোঁয়া। টিপিক্যাল কুলুর ভদ্রলোক এখন আমি। চুপচাপ আছি শুধু ভাষাটা এখনো রপ্ত করতে পারি নি বলে।

আমার পাশে চলেছে ঝিন্নি। তার পরনেও গরম সুথান। চোলির ওপব বুক থেকে বিশেষ ভঙ্গীতে কাপড় জড়ান। ব্রোচ দিয়ে জায়গায় জায়গায় আটকানো হয়েছে মেরুন রঙের কাপড়খানা। কোমব ঘিরে হলুদ রঙের একখানা ব্ল্যাঙ্কেট। কানের একাধিক ছিদ্র থেকে ঝুলছে কানবালা। অজস্র ঝুরি দোল খাচ্ছে ওর চলার তালে তালে। লম্বা বিনুনী পিঠে। টাসেলটা ঝুলছে আরও অনেকটা নীচ অব্দি। মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা, তার ওপর টুপি।

আমার আজকের সাজখানা ঝিন্নির রচনা। সে তার বাবার এক সেট পোশাক রেখেছে এখানে। চাচাজী নাগ্‌গরে এলেই এই সেটটি ব্যবহার করেন। ঝিন্নি আমাকে পোশাক পরিয়ে ঘুরে-ফিবে দেখেছে। নিজের পোশাক পরতে ভেতরের ঘরে ঢুকেও আড়চোখে বারবার দেখেছে আমার দিকে তাকিয়ে। এই পোশাকে আমায় দেখে দেখে যেন ওর আশ মেটে না।

ও পরেছে ওর মায়ের পোশাক আর অলঙ্কার। এক সুটকেশ বোঝাই পোশাক ও রেখেছে নিজেব কাছে। ওর মায়ের স্মৃতি মাখা সব ক'টি জিনিস।

কানবালা ঘাড় কাত করে পরার সময় মুক্তোর মত দু'ফোঁটা জল ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে

দেখে অবাক হয়ে বলেছিলাম, তুমি আবার কাঁদছ ঝিন্নি?

ও চোখ মুছে বলেছিল, আমার সারা গায়ে আজ মায়ের ছোঁয়া লেগেছে ছোটেসাহেব, তাই কাঁদছি।

ঝিন্নির সাজসজ্জা হয়ে গেলে ওকে বললাম, তোমার মায়ের ঐ সুন্দর ছোট্ট টুপিটা মাথায় পরবে না?

ও মাথা নেড়ে বলল, বিয়ে না হলে কোন কুমারী মেয়েই টুপি পরে না ছোটেসাহেব।

আমি ওর মায়ের টুপিখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। তারপর ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এক ফাঁকে সেই টুপি ওর মাথায় পরিয়ে দিতেই ও চমকে আমার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, এ কি করলে ছোটেসাহেব! এর অর্থ তো তোমার অজানা নয়।

বললাম, জানি বলেই তোমার মাথায় ঐ সুন্দর টুপিটা পরিয়ে দিলাম ঝিন্নি। এর সব দায় আমার। তোমার অমত না থাকলে এ দায় আজীবন বইতে পারব।

ঝিন্নির চোখে আবার জল গড়াল। ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি কাছে এসো ছোটেসাহেব। তোমাকে আমি আর একটুও দেখতে পাচ্ছি না।

আমি কাছে যেতেই ও আমাব বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদল কতক্ষণ। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ও শান্ত হল। মাথায় সুন্দব ছোট্ট টুপিটা তেমনি পরা রইল।

মেলায় বেরিয়ে আসার সময় ঝিন্নি বলল, জান ছোটেসাহেব, টুপিটা মাথায় বেখে মনে হচ্ছে আমার মায়ের আশীর্বাদ আমি মাথায় ধরে আছি।

আমি ওর সুন্দর মুখখানা তুলে অনেকক্ষণ ওকে দেখলাম।

এখন আমরা কেল্লা ছাড়িয়ে অনেক নীচে নেমে এসেছি। আবও খানিক নীচ থেকে মেলার শুরু। গানের সুর ভেসে আসছিল। মেলার কোলাহলও। সাজ-পোশাক পরে ছেলে-বুড়ো তরুণ-তরুণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানপসার বসে গেছে। এখন দুপুর। অনেক অনেক লোক ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা কবছে।

আমরা এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ঝিন্নি তাব মাথা থেকে এক ঝটকায় টুপিটা খুলে ফেলে আমার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলল, তোমার কম্বলের ভেতর লুকিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি।

কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই কোন প্রশ্ন না করে ওর টুপিটা কম্বলের আড়ালে ঢেকে ফেললাম।

ঝিন্নি চোখের পলকে পথ বদলে নিল। আমিও ওকে অনুসরণ করে মেলার জনারণ্যে হারিয়ে গেলাম।

মেলা ছেড়ে আমরা এক সময় নেমে এলাম একটা পাহাড়ের ঢালে। ওখান থেকে আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এক সময় এসে পড়লাম বিপাশার তীরে।

কাছাকাছি কতকগুলো গাছের জটলা। তার তলায় এক দঙ্গল ভেড়া। কতকগুলো গদ্দী মেয়ে-পুরুষ সেখানে সংসার সাজিয়ে বসে আছে। ওবা পায়ে চাপড় দিয়ে দিয়ে গান গাইছিল :

> গদ্দী চরদা ভেদন
> গাদ্দান দিন্‌দি ধুপ।
> গদ্দী জো দিন্‌দা ভেদন
> গাদ্দান জো দিন্‌দা রূপ।।

ঝিন্নি চলতে চলতে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওরা গান থামিয়ে ঝিন্নি আর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসল। ঝিন্নিও সে হাসিতে যোগ দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঝিন্নি কাছে যেতেই গদ্দী মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। ঝিন্নি ওদের সঙ্গে গাদী ভাষায় অনর্গল কথা বলে চলল। মাঝে মাঝে সবাই মিলে হাসির লহর তুলছিল।

পুরুষদের পরনে চোল, টুপিতে পালক, কানে রিং, কোমরে উলের দড়ি।

গাদ্দানরা চোল পরেছে পুরুষদের মত। এদের পোশাক আঁটসাঁট। গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে একেবারে গোড়ালী ছুঁয়ে মেয়েদের পোশাক। মাথাটি ঢেকে নিয়েছে চাদরে। কানে দুলছে বালি। রূপোর টাকা আধুলি সিকি দিয়ে তৈরি হয়েছে ওদের হার। সুন্দর গলায় সে হার মানিয়েছেও সুন্দর।

আমি চেয়ে আছি ওদের মুখের দিকে। কথায় কথায় এমন চোখের কারুকার্য দেখলে মাথায় ঘোর লাগে। পাশে নীচু একটা পাহাড়। গদ্দীরা বলে ব্যান। সেই ব্যানে গার্ণা আর কাংগুর ঝোপ। একটা কাংগু অতি দীনের মত একরাশ ডালে গোটাকতক পাতা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক'টা লোভী ভেড়া শীতের দিনে ঘাস পাতা না পেয়ে গার্ণার ঝোপে মুখ ঠেকিয়ে বুলবুল করে পাতা চিবোচ্ছে। তাদের ভেতর দুঃসাহসী একটা মদ্দা ভেড়া পেছনের দুটো পা পাহাড়ের ওপর ঠেলে রেখে সামনের পা দুটো তুলে দিয়েছে কাংগু গাছটার কাণ্ডে। অনেক কসরৎ করে একটিমাত্র পাতা সংগ্রহ করতে সে সমর্থ হল।

একটি গদ্দী বুড়ো উঠে এল গাছতলা থেকে। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের ডেরায়।

আমি গাছতলায় গিয়ে পৌঁছতেই একটি মেয়ে ছাগলের লোমে তৈরি একখানা রঙীন থোবি পেতে দিল মাটিতে। লোকটি ইঙ্গিতে বসতে বললে, আমি তার ওপর বসলাম। মেয়েটি আমার দিকে সেই আশ্চর্য চোখে চেয়ে একটু হেসে চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে একটা কলি আগুন বোঝাই করে নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

তামাক খাবার অভ্যেস আমার নেই। একে তো সেজেছি উদ্ভট, তার ওপর যখন বেপরোয়া হয়ে আনাড়ীর মত কঙ্কে টানতে লাগলাম, তখন নিশ্চয়ই সে এক দর্শনীয় ব্যাপার হল। ভাগ্যিস আয়না ছিল না সামনে। আর বিধাতার অনুগ্রহে মানুষ নিজের চেহারাখানা ভাল করে দেখতে পায় না, এই যা রক্ষে। আমি কলি টানি এক এক দম আর কেশে কেশে খুন হই। শেষে সবিনয়ে একজনার হাতে চালান কবে দিয়ে নিষ্কৃতি।

তাও নিষ্কৃতি চাইলেই কি পাওয়া যায়। কথা বলছে ওরা, আমি মাথা নেড়ে মৃদু হাসিতে পরিস্থিতি ঠেকাচ্ছি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসি গল্পে মেতে আছে ঝিন্নি। বার চারেক আড় চোখে ও দেখল আমাকে। কিন্তু কি ভীষণ মেয়ে রে বাবা, আমি ঘোর বিপদে পড়ে আছি জেনেও একেবারে কাছে ঘেঁষল না।

কিছু সময় ওদের ভেতর কাটিয়ে উঠলাম আমরা। চলতে লাগলাম বিপাশার তীর ঘেঁষে। পেছন ফিরে দেখলাম, গদ্দী মেয়েরা কোমর জড়িয়ে ধরে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। আমরা হাসি দিয়ে ওদের হাসির জবাব দিলাম।

চলতে চলতে ঝিন্নি বলল, বেশি চেয়ো না ওদের দিকে, ঘরে ফিরতে পারবে না। গাদ্দানদের চোখের ভাষা ওদের মুখের ভাষার চেয়েও জোরালো।

বললাম, ওদের দোষ দিচ্ছ কেন ঝিন্নি, সব মেয়েরই মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষার জোর বেশি।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর মৃদু তিরস্কারের এক চাউনি হানল। ওর চোখ দুটো সুন্দর। আরও সুন্দব আর অর্থবহ হয়ে উঠল এখন।

আমরা গমের একটা ক্ষেত পেরিয়ে এলাম। ক্ষেতের ঢাল কয়েকটা ঢেউ তুলে তুলে বিপাশার তীর অব্দি নেমে এসেছে। সবুজের যেন ঢল নেমেছে শীতের নদীতে।

ঝিন্নি কথা বলল, আমরা যখন গদ্দীদের আড্ডায় গিয়েছিলাম তখন ওরা একটা গান গাইছিল না?

বললাম, হাঁ, কিন্তু ধুপ আর রূপ এ দুটো শব্দ ছাড়া আর কিছু বুঝি নি।

ঝিন্নি বলল, জানো, গদ্দীদের নানা ধরনের বিচিত্র সব বিশ্বাস আছে। ওদের পথে পথে দেবতার বাস। ওরা যখন লাহুল স্পিতি, আরও অনেক উঁচু উঁচু পর্বতে ভেড়া নিয়ে যায় তখন গিরিপথেব দেবতার কাছে ভাল আবহাওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানায়। ওরা পাস পার হবার সময়ে মাথা নীচু কবে চলে, কথা বলে না, পাছে পর্বতের দেবতার কোপে পড়তে হয়। আবার বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ওরা বনের দেবতা বাণবীরের পুজো করে। ওরা যখন নদী পার হয়, তখন নদীর আত্মা বাতালের উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করে। সাপে যাতে ওদের না কাটে, সে জন্যে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে সাপের রাজা

কেলাং-এর মূর্তি। ওদের আদি বাসভূমি ধৌলাধারের টিকায় টিকায় দেবতা গুগার পূজো হয়। গদ্দীদের সম্পদ ভেড়াদের রক্ষা করার ভার তাঁর ওপর।

বললাম, যাযাবর মেষচারক ওরা, খোলামেলা প্রকৃতির সঙ্গেই ওদের নাড়ীর যোগ। তাই প্রকৃতির পাহাড় নদী বন সব জায়গাতেই ওদের দেবতার এক একটা আস্তানা রেখে দিয়েছে।

ঝিন্নি বলল, দেখ তো, কি কথা নিয়ে শুরু করলাম আর এসে পড়লাম কোন কথায়।

বললাম, তোমার ঐ গানের কথা হচ্ছিল।

ঝিন্নি বলল, মনে আছে। ওরা অনেক দেবতার পুজো করে ঠিক, কিন্তু ওদের আসল দেবতা শিব। আর ঐ গানটিতে শিবের কথাই হচ্ছিল।

ঝিন্নি গানটা সুর করে নীচু গলায় গাইল :

গদ্দী চরদা ভেদন
গাদ্দান দিন্‌দি ধূপ।
গদ্দী জো দিন্‌দা ভেদন
গাদ্দান জো দিন্‌দা রূপ।।

নির্জন নদীর পথে গানের পাহাড়ী সুরটুকু বড় ভাল লাগল। এ গানে গলার কাজ নেই। শুধু সুরের ওঠানামা আছে। পাহাড়ের যেন চড়াই উৎরাই। ঝিন্নির গলায় ঠিক গদ্দী মেয়েদের সুরটা যেন বেজে উঠেছে।

গান থামিয়ে ঝিন্নি বলল, গদ্দীরা মেষ চরায় তাই শিব তাদের দান করলেন মেষ। আর গদ্দী মেয়েরা শিবকে দিল ধূপ তাই শিব দিলেন তাদের রূপ।

বললাম, চমৎকার।

ঝিন্নি বলল, ওদের গানের ভাবগুলো ভারী সুন্দর। আর একটা গান শুনবে?

কথাটা বলেই ঝিন্নি আবার গুন গুন করতে লাগল। একটু পরে বলল, দূর ছাই মনে আসছে না সুরটা। আচ্ছা মানেটা বলছি শোন। মেয়েটির বাপের বাড়ি কাংড়ায় ধৌলাধার পাহাড়ের কোলে। বিয়ে হয়েছে তার ধৌলাধারের ওপারের চম্বা ভ্যালিতে। মেষ চরাতে গিয়ে অনেক দূরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসেছে বাপ। এখন বাপের বাড়িটা দেখার জন্য মেয়ের মন কেঁদে উঠল। বাধা ধৌলাধার পর্বতটি। সে তাই মিনতি করে বলছে, হে ধৌলাধার, কৃপা করে একটুখানি নীচু কর তোমার মাথা, আমি এক পলকে আমার বাপের বাড়িটা একবার দেখে নি।

বললাম, ঝিন্নি, সত্যি তোমার গুণের শেষ নেই। আঁকতে পার গাইতে পার আবার গবেষকের মত হাজার তথ্যও যোগাড় করতে পার।

ঝিন্নি বলল, আর এত মুখরোচক খাবারগুলো যে তৈরি করে খাওয়ালাম সেগুলো বুঝি কোন গুণের নয়?

বললাম, তোমার এতগুলো গুণের কথা শুনলে পাত্রপক্ষ আর সাহস করে তোমার কাছে এগোবে না।

ঝিন্নি বলল, বাঁচা যাবে।

বললাম, একজন কিন্তু এ বিষয়ে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছে। সে নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছে।

ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

ওর কাছে গিয়ে বললাম, আমি শুধু ডাক্তার ঝিন্নি, কানাকড়ি এমন গুণ আমার নেই যার বলে তোমাকে কাছে টানতে পারি।

ঝিন্নি আমার হাত দুটো হাতের ভেতর ধরে দোলাতে দোলাতে বলল, তাই তো! একটুও তুমি আমার পছন্দের মানুষ নও ছোটেসাহেব! এখন বল তোমাকে নিয়ে আমি কি করি।

হঠাৎ মনে এলো কথাটা। বললাম, আচ্ছা মেলা থেকে তুমি হঠাৎ এ পথে চলে এলে কেন ঝিন্নি, আর কেনই বা টুপিখানা আমাকে লুকিয়ে ফেলতে বললে?

ঝিন্নি আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, মদনলালকে দেখলাম যে।

মদনলাল কে, ঝিন্নি? তোমাদের পরিচিত?

ও চলা শুরু করল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, বলতে পার। ও সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোর একজন অফিসার।

বললাম, ওঁকে দেখে লুকোবার বা ভয় পাবার কি আছে?

ঝিন্নি বলল, বড্ড জ্বালাতন করে লোকটা। কুলুতে যখন ছিল তখন রোজ হাঁটাহাঁটি করত চাচাজীর কাছে। চাচাজী তো মদনলালের ব্যবহারে একেবারে গলে জল। এখন আমার যেই নাগ্‌গরে চাকরিটা হয়েছে অমনি পিছু নিয়েছে। তদ্বির করে কুলু থেকে এসেছে নাগ্‌গরে।

বললাম, ভদ্রলোককে খারাপ ভাবছ কেন ঝিন্নি? হতে পারে উনি একজন গুণগ্রাহী।

ঝিন্নি কেমন যেন ক্ষেপে গেল, তুমি থামবে? আমার চেয়ে তুমি ওকে বেশি চেন ছোটেসাহেব? একটি পুরুষের মুখের দিকে চাইলেই আমরা তার মনের অনেক কিছু আঁচ করতে পারি।

বললাম, ভয় পেয়ে যাচ্ছি ঝিন্নি। কতবার তোমার মুখোমুখি হয়েছি, কি যে ভেবে বসে আছ তুমি আমার সম্বন্ধে তা ভগবানই জানেন।

ঝিন্নি বলল, আচ্ছা সব কথাকে এমন হালকা করে দাও কেন বল তো? লোকটা ভীষণ খারাপ।

আমার চেয়েও?

ঝিন্নি বলল, সারা পথ দেখো তোমার সঙ্গে যদি আর একটিও কথা বলেছি।

আমি ঝিন্নির পেছনে চলেছিলাম। এখন ওর একখানা হাত ধরে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, ঝিন্নি, সব কিছুকে সিরিয়াসলি নিলেই কষ্ট পেতে হয়। এমনও তো হতে পারে মানুষটি মনে মনে তোমাকে ভালবাসে।

ঝিন্নি কোন কথা বলল না।

আবার বললাম, এই যে তোমার আমার চারদিকে এত অজস্র টুকরো টুকরো ছবি, এদের দিকে কি না তাকিয়ে পারা যায় ঝিন্নি? তেমনি ও মানুষটাও হয়ত সুন্দরের দিকে না তাকিয়ে পারে না। এতে তুমি খুশি না হতে পার, কিন্তু মানুষটাকে নিশ্চয়ই তারিফ করতে হয় তার শিল্প-রুচির জন্য।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে খুব জোরে পা চালিয়ে চলে গেল সামনের দিকে। আমি যেমন চলছিলাম তেমনি চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের ভেতর সামনের একটা পাহাড়ের বাঁকে ও অদৃশ্য হল। আমি সম্ভবমত জোরে পা চালিয়ে পাহাড়টার কাছে গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই।

পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় দুটো বড় বড় শিলাস্তূপ দেখা যাচ্ছিল। আমি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে ভেবে পেলাম না, এত লম্বা একটা পাহাড়ী বাঁক ও এই অল্প সময়ের ভেতর পেরিয়ে গেল কি করে।

আমি ধীরে ধীরে অচেনা পথে এগোতে লাগলাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি দুটো শিলাস্তূপের ভেতর অন্ধকার একটা ফাটলের মত। একটা ঝোরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নীচের উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে।

বেশ খানিক নীচে সরশোনার ক্ষেত। ফিকে হলুদ ফুলগুলো যেন বিরাট একখানা হলুদ কার্পেট পেতে রেখেছে। জলধারা গেছে ক্ষেতের মাঝ বরাবর। ওপর থেকে আমি দেখেছিলাম। সূর্যের আলো নীচের জলধারার ওপর পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কে যেন আকাশ থেকে রূপোলী তীর ছুঁড়ছে ঝাঁক ঝাঁক।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অনেক পথ হেঁটে। জলতেষ্টা পেয়েছে। ঝোরার জল খাব বলে যেই বসে হাত বাড়িয়েছি, পেছন থেকে ঝিন্নির গলা ভেসে এল, এই, খেয়ো না ও জল, শরীর খারাপ করবে।

পেছনে চেয়ে দেখি অন্ধকার পাহাড়ী ফাটলের ভেতর থেকে একটি পরিচিত মুখ উঁকি দিচ্ছে। সে মুখে আতঙ্কের ছবি।

কোন কথা না বলে আমি যেন ঝিন্নিকে উপেক্ষা করছি এমনি ভাব দেখিয়ে আবার আস্তে আস্তে জলের দিকে হাত বাড়ালাম।

একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার তুলে ঝিন্নি প্রায় আমার পেছনে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল।

কি হচ্ছে ছোটেসাহেব, এ জল কেউ খায় না, খেতে নেই।

ঝিন্নি পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মুখ ফিরিয়ে বললাম, এত পথ হাঁটালে, এখন তেষ্টা মেটাই কিসে বল?

আমার চোখে দুষ্টুমির ছবি ফুটে উঠেছিল। ঝিন্নি আমাকে সামনের দিকে প্রায় ঠেলে দিয়ে পিছু হটে দাঁড়াল। আমি কোন রকমে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ঝিন্নি বলল, খু-উ-ব লোভী হয়ে উঠেছ তুমি।

কোন কথা না বলে ওর পাশ কাটিয়ে পথেব ওপর গিয়ে উঠলাম। তারপর ঝোরাটা পেরিয়ে পাযে পায়ে চলতে লাগলাম।

ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল ঝিন্নি। বলল, অমনি রাগ হয়ে গেল?

বললাম, অনেকক্ষণ বাইরে তো ঘুরে বেড়ান হল, এখন মেলায় ফিরবে না?

ঝিন্নি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারলাম আমার কথায় ঝিন্নি আহত হয়েছে। আমি যে ওর নির্জন সঙ্গ থেকে মেলায় যাওয়াটাকে পছন্দ করছি এটা তার অভিমানে আঘাত করেছে। ফিরে বললাম, কি হল?

ঝিন্নি নীচের সেই হলুদ ক্ষেতের দিকে চেয়ে রইল, মুখে কথা নেই।

কাছে গিয়ে বললাম, দেবী হির্মার নামে শপথ করছি, ঝিন্নি .....।

হঠাৎ ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে আমার মুখে ওর হাতটা চেপে রেখে বলল, দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, হির্মার নামে শপথ নিও না। আমার বড় ভয় করে। হির্মা বড় জাগ্রত। তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেব।

ওর চোখ ছলছল, গলাটা কাঁপছে।

ওর হাতটা ধরে আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললাম, ভয় নেই ঝিন্নি, আমি শপথ নেবো না। আর তোমার কাছে এত পেয়েছি যে লোভীব মত আরও বেশি চেয়ে আমার পাওয়া জিনিসগুলোর মূল্য কমিয়ে দেব না।

ঝিন্নি সহজ হল। সে শক্ত করে আমার হাত ধরে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওর হাতের ভাষা থেকে বুঝলাম, ঝিন্নি ওর আকুল অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়েছে।

একসময় ও বলল, প্রথম যেদিন তুমি চাচাজীর সঙ্গে কুলুতে এলে সেই দিনটি থেকেই আমার সমস্ত মন তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত ছোটেসাহেব। তোমার প্রতিটি পায়ের সাড়া, প্রতিটি কথা আমার কানে ধরা পড়েছে। তোমার হাসি চলাফেরা আমি আমার চোখের ভেতর ধরে রেখেছি। শুধু মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আমি তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে একটু চুপচাপ থাকতে চাই।

বললাম, বেলাশেষের আলোয় সেদিন তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনেক কথা শুনেছিলাম তোমার সম্বন্ধে, তাই মনে হল তুমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা। যাকে চোখের প্রথম দেখায় ভাল লাগে তার সম্বন্ধে বোধহয় এমনি মনে হয়।

ঝিন্নি বলল, পিতাজী থাকলে কি যে খুশি হতেন আমাদের দেখে।

বললাম, চাচাজী যখন বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে কলকাতায় চিঠি লিখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কুলুতে চলে আসতে বললেন, তখনও বুঝি নি আমি কুলুতে এসে সত্যিকারের কি পাব। আজ মনে হচ্ছে বাবার ওপর অভিমান করে যদি না আসতাম তাহলে বেলা শেষের হলুদ আলোয় যে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম, তাকে এত কাছে পেতাম না।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে রইল। ও কথা বলতে পারছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি ঝিন্নি অল্পতেই গভীর হতে পারে। ও যেমন উচ্ছল তেমনি আবার আবেগপ্রবণ।

ঝিন্নি নিজেকে এবার সহজ করে নিয়ে বলল, এসো তোমাকে আজ আমার একটা গোপন জায়গা দেখাই। কুলুর বাংলো থেকে পাহাড়ের বাঁক পেবিয়ে বিপাশা নদী আর বন দেখিয়ে তোমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলাম না?

ওর পেছনে চলতে চলতে বললাম, হাঁ, সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ঝিন্নি এবার আমার হাত ধরে ঝোরাটা সাবধানে ডিঙিয়ে ঢুকল সেই অন্ধকারপ্রায় ফাটলের ভেতর।

একটু ভেতরে যেতেই একটা আলোর রশ্মি দেখা গেল। আরও কয়েক পা এগোলাম, কখনো বা জল ছুঁয়ে আবার কখনো বা পাথরের বড় বড় নুড়ির ওপর সাবধানে পা রেখে। জায়গাটার পরিসর এখন অনেক বেড়েছে।

ঝিন্নি একটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল, এসো এখানে বসি।

ভেতরে যতটা শীত বোধ হবে ভেবেছিলাম তা হচ্ছিল না। বাইরের কনকনে হাওয়াটা ছিল না এখানে, তাই রোদ্দুর না থাকলেও জায়গাটা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক ছিল।

আমি কম্বলটা গা থেকে খুলে পাথরখানার ওপর পাততে যাচ্ছিলাম, ঝিন্নি বাধা দিয়ে আমার হাত থেকে কম্বলটা টেনে নিয়ে বলল, বসই না এমনি। কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিলে আরাম পাবে।

আমি পাথরখানার ওপর বসে পড়তেই ঝিন্নি আমার গায়ে কম্বলটা ঢেকে দিতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে আমার পাশে বসালাম। কম্বলখানার ভেতর ওকেও জড়িয়ে নিলাম।

ও মিঠি মিঠি হাসছিল আমার দিকে চেয়ে। ফিসফিস করে বলল, আবার দুষ্টুমি!

আমি শুধু ওর চোখের দিকে চেয়েছিলাম। ওর ঐ ছোট্ট আয়নায় আমার প্রতিবিম্বখানা কিভাবে পড়েছে তাই দেখছিলাম।

বললাম, ঝিন্নি, আমার মনে হচ্ছে এখন আমরা পৃথিবীব সবচেয়ে নিভৃত নির্জন স্থানে রয়েছি। এখন দুষ্টুমি করে এই নির্জনতাটুকুকে ভেঙে দিতে কি মন চায়।

ও চোখের পাতা ফেলছে না। অবাক হয়ে আমার কথা শুনছে। একটি যুবক যে এই নির্জনতাকে ভাঙতে চাইছে না এটা যেন অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা।

ওকে আমার বাঁহাতে জড়িয়ে ধরে আরো কাছে টেনে এনে বললাম, ঝিন্নি, এ জায়গাটা তুমি আবিষ্কার করলে কি করে বলতো? আমার ভীষণ অবাক লাগছে।

ঝিন্নি বলল, বলব না।

হেসে বললাম, আমার এমন কিছু নেই যে ঘুষ দিয়ে কথা আদায় করে নেব।

ও বলল, তাহলেও বলতাম না।

বললাম, তাহলে তো আমার সব কথাই এখানে ফুরোলো।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবল। এক সময় বলল, তুমি হয়ত জাননা আমার চরিত্রে একটা বেপরোয়া ভাব আছে। আমি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। ভয় পাই না কোন কিছু থেকে। নিভৃত কোন জায়গা হঠাৎ আবিষ্কার করাতেই আমার আনন্দ।

নাগ্‌গর থেকে একদিন নেমে ঠিক এমনি দুপুরে এই নির্জন পাহাড়ী পথটা ধরে চলছিলাম। হঠাৎ পাহাড়ের এই ফাটলের কাছে এসে একটা চাপা আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রথমে ভাবলাম এই কুহলটার শব্দ। কান পেতে কিন্তু আমার ধারণা পাল্টাল। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে মনে হল। হয়ত অন্য কেউ হলে ভয় পেত, আমার কিন্তু দারুণ কৌতূহল হল। আমি পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে এতদূরে চলে এলাম। দেখি, একটি মেয়ে বসে আছে ঠিক যেখানটাতে আমি বসে আছি এখন।

মেয়েটা আমাকে দেখে চমকে উঠল। আমি তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ওর চোলি বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সারা গায়েব কাপড় এলোমেলো। আমাকে এখানে দেখবে ও একেবারে ভাবতে পারেনি। অজানা একটা ভয়ে ওর কান্না থেমে গেছে।

বললাম, তুমি এখানে!

ও বলল, বেরোতে পারছি না। বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি আমার চোলিখানা ওকে খুলে দিয়ে বললাম, শিগ্‌গির পরে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

ও আমার কথামত কাজ করল। যাবার সময় আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানাল। বললাম, আর কোনদিন এখানে এসো না, তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

মেয়েটা বলল, ও যে এমন সাংঘাতিক তা আমি বুঝতে পারিনি। ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

বললাম, নিজেকে রক্ষা করার বুদ্ধি বা শক্তি কোনটাই তোমার নেই। তাই ও তোমাকে ঠকাতে পেরেছে। ওকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।

মেয়েটি পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল। আমি সন্ধ্যে না নামা পর্যন্ত এইখানেই বসে রইলাম। চোলি ছাড়া দিনের আলোয় বেরিয়ে আসতে পারলাম না। সেই থেকে এ গুহা আমার দখলে।

বললাম, তুমি চিনতে মেয়েটিকে ?

ঝিন্নি বলল, না।

অবাক হয়ে বললাম, সেকি ! তাহলে সব কাহিনীটুকু জেনে নিলে না কেন?

ঝিন্নি বলল, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার অভ্যেস কোনদিনই আমার নেই ছোটেসাহেব। আর জেনেই বা লাভ কি। একটি পুরুষ মেয়েটিকে লোভ দেখিয়ে এখানে এনেছে। মেয়েটি হয়ত বেশিদূর এগোতে চায় নি, ফলে পুরুষটি হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এর বেশি জানার কি আছে।

বললাম, আজ এমন সুন্দর একটা জায়গায় এসে মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল ঝিন্নি। পৃথিবীতে কি এমন কোন নিভৃত জায়গা নেই যেখানে বুকের মধ্যে একখানা মুখ নিবিড় করে ধরে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপচাপ বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ঝিন্নি আমার বুকের মধ্যে ওর মুখখানা লুকিয়ে ফেলে বলল, আমি হারিয়ে গেছি ছোটেসাহেব, তুমি আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

ওর একরাশ চুলে ভরা মাথায় আমার মুখখানা নামিয়ে এনে বললাম, কোথায় হারাবে ঝিন্নি, আমার বুকের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে আমি ঠিকই আমার হারানো রক্তপ্রবালটি খুঁজে পাব।

ঝিন্নি দুষ্টুমি করে ওর কপাল আর টিকলো নাকখানা আমার বুকের মাঝে ঘষতে লাগল। তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে একটা খরগোশের মত কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যা! আসল জিনিসটাই তোমাকে দেখানো হয়নি ছোটেসাহেব। এসো একটা ম্যাজিক দেখাই।

বোকার মত বললাম, তুমি ম্যাজিক দেখাবে ঝিন্নি?

ও আমার হাত ধরে তুলে ঐ পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে আরও দু-এক পা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, এবার বাঁদিকে উঁকি দিয়ে দেখ, আর এক পা-ও এগিয়ো না যেন।

আমি ওর কথামত চেয়ে দেখি, পাহাড়ের এপাবে নাগ্গবের সেই পরিচিত মেলা, সেই জনারণ্য।

বললাম, সত্যি অবাক যাদু দেখালে ঝিন্নি! এই পথে সুড়ঙ্গ পেবিয়ে পাহাড়েব গা বেয়ে নামলে অল্পসময়ের ভেতরেই আমরা মেলায পৌঁছে যাব।

ঝিন্নি পাশ থেকে আমার হাতখানা জোরে টেনে ধরে বলল, মাথায় হঠাৎ প্ল্যানটা গজিয়ে উঠল বুঝি ? খুব সোজা পথে মেলায় নেমে যাবে, তাই না?

হঠাৎ ঐ কুহুলের মত কলকল হাসি হেসে বলল ঝিন্নি, ছোটেসাহেব, এটা যাদুর মেলা, যাদুর তৈরি পথ। এ পথে নামতে নেই।

পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের মেলাটা মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা সাজানো ফুলের বাগান। সাদা নীল লাল হলুদ ফুল ফুটে আছে। বাতাসে ফুলগুলো যেন দুলছে। কত বিচিত্র রঙের পোশাক, কত সজ্জিত নারীপুরুষের মিছিল।

মেলার একপ্রান্তে একটি বৃত্ত রচনা করে কোমরে হাত জড়িয়ে উদ্দাম নেচে চলেছে একদল পুরুষ। ধবধবে পোশাকে তাদের মনে হচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় জেগে ওঠা পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র ফেনা। বৃত্তের কেন্দ্রে লালপোশাক পরা কটি মেয়ে ঠিক যেন পাপড়ি-খোলা একটি রক্ত-শতদল। বৃত্তের ঢেউগুলো শ্বেতহংসের মত একবার এগিয়ে চলেছে সেই রক্তপদ্মের দিকে, আবার পিছিয়ে আসছে। উদ্দাম হয়ে উঠেছে তাদের আকাঙক্ষা। স্পর্শ করতে হবে ঐ অধরা রক্তপদ্মটিকে। ঘুর্ণির মত ঘুরে ঘুরে প্রবল বেগে চলেছে নাচ। সমুদ্রের ঢেউ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে এগিয়ে চলেছে, আবার পেছনের টানে সবে যাচ্ছে দূরে।

আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম, আমার হাত ধরে ভেতবের দিকে টানল ঝিন্নি। বলল, তোমাকে না এগিয়ে যেতে মানা করেছি! সবার চোখ এসে পড়বে এই সুড়ঙ্গের মুখে।

লজ্জিত হলাম। নিচ দেখতে দেখতে কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি। হয়ত অধরাকে ধরার নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকেও।

আমরা আবার এসে বসলাম সেই পাথরের আসনে, ঠিক তেমনি কম্বলের ভেতরে দুজনে। হঠাৎ আমার মনে হল, সবটা সত্যি বুঝি যাদু! এই চঞ্চল রঙিন মেলা, এই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গ-পথ আর এই রহস্যময়ী তরুণী যাকে পৃথিবীর এমন এক নির্জন নিভৃততম স্থানে বুকের মধ্যে পেয়েছি।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সেই যাদুর জগৎ থেকে আমরা দুজন বেরিয়ে এলাম। বাইরে প্রচণ্ড শীত। হাওয়ায় করাতের ধার।

ঝিন্নি আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অস্তসূর্যের ঘোলাটে লাল রঙটা পীরপাঞ্জালের মাথায় থমকে থেমে আছে।

ও বলল, চল তাড়াতাড়ি পালাই। তুষার ঝড় শুরু হতে পারে।

আমরা যে পথে পাহাড়ে উঠেছিলাম সেই পথে নেমে এলাম। ঝিন্নি আর আমি চলেছি পাশাপাশি, কখনো বা আগে পিছে। আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি, এখন থেকে অনাগত দিনের কত উঁচু নিচু পথ আমরা এমনি করে একই সঙ্গে চলব। ঝিন্নি আমার পাশে থাকবে একথা ভেবে একধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করছি। কত মানুষ এই পৃথিবীর কত পথ ধরেই না চলে। হঠাৎ দুজন থমকে দাঁড়ায়। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলে, চল, এখন থেকে আমরা একই সঙ্গে পথ চলি।

আবার কোথা থেকে একটা ভাবনা এলো মনে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ঘোলাটে রঙের মত বিষণ্ণ হয়ে উঠল মন। ঝিন্নি আমার অনেক কাছে সরে এসেছে ঠিক কিন্তু স্পষ্ট করে ও তো কখনো বলেনি যে ও আমার জীবনের সঙ্গী হতে চায়! নিজের মনের থেকেই একটা উত্তর ভেসে এল। একটি মার্জিত রুচির মেয়ে এর চেয়ে বেশি কি বলবে। ওর বাধাহীন আত্মসমর্পণের ভেতরেই তো ওর সব কথা পাণ্ডুলিপি হয়ে আছে। শুধু পাঠোদ্ধার করে নেবার অপেক্ষা।

আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে রাতের দুটো পাখি উড়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, কি ভাবছ এত ?

বললাম, এখুনি যে দুটো পাখি উড়ে গেল, বলতে পার তাদের কথা।

ঝিন্নি যেন কিশোরী হয়ে গেছে। বলল, কি ভাবছ একটু বল না?

বললাম, ওদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটা কেমন ছিল তাই ভাবছি। দুজনের দুজনকে ভাল লাগার পর কি কথা ওরা বলছিল। মন দেয়া-নেয়ার পরের মুহূর্তগুলোতে ওদের মনে কি ধরনের রোমাঞ্চ জেগেছিল। দুজনে নীড় রচনা করে প্রথম যেদিন সে নীড়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন কি ওরা নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপে পরস্পরকে সবচেয়ে সুখি মনে করেছিল!

ঝিন্নি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, তুমি কিছু জান না ছোটেসাহেব। ওরা ডিম পাড়ার সময় এলেই বাসা বুনতে থাকে।

বললাম, হয়ত তোমার কথা ঠিক। দুজনের নিবিড় ইচ্ছার সৃষ্টিকে কত সুখে কত নিরাপদে রাখা যায় তাই ভেবেই হয়ত ওরা নীড় রচনা করতে থাকে।

ঝিন্নি আকাশের দিকে চেয়ে বলল, এখুনি ঝড় উঠবে, তার আগেই আমাদের কোয়ার্টারে পৌঁছতে হবে।

বললাম, ঝড়ের আগে পাখি দুটো তাদের বাসায় পৌঁছতে পারবে তো!

. ঝিন্নি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল। বলল, জানার এই ইচ্ছাটা চিরদিনের, কিন্তু এর কোন উত্তর চাইলেই কি পাওয়া যায় ছোটেসাহেব?

আমার মনটা আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি ঐ পাখি দুটির নির্বিঘ্নে বাসায় পৌছানোর জন্য জীবনের অদৃশ্য পরিচালকের কাছে প্রার্থনা জানালাম।

মেলা অনেক আগেই ভেঙে গেছে। শূন্য মেলায় শুধু কিছু এঁটো পাতা আর ছেঁড়া কাগজ উড়ছে। আমরা মেলা পেরিয়ে কাঠের কেল্লার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে ঝড় উঠল। আমরা

আত্মরক্ষার জন্য কেল্লার এপারে পরিত্যক্ত একটি গুমটি ঘরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চোখ গিয়ে পড়ল পথের ওপারে কেল্লাব একটি ঘরের ভেতর। আলো আসছিল জানালার পথে রাস্তা পেরিয়ে গুমটি ঘর অব্দি। একটি লোক সে ঘরে বসে একমনে ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছিল। নেশার ঘোরে ঝড়ের খবরটা হয়ত পাযনি, তাই খোলা থেকে গেছে জানালাটা।

হঠাৎ আমাকে ওখানে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে কেল্লার দিকে দৌড়ে গেল ঝিন্নি। বাইরে থেকে চুপি চুপি জানালার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবার ছুটে এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

আমার সারা শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল কেন? এই সামান্য ঘটনাটুকুর ভেতর কোন অশুভ ইঙ্গিত কি আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে গেল? ঐ মানুষটাই কি মদনলাল? তাহলে ঐ মত্ত বেহুঁশ লোকটাকে সাহায্য করার ইচ্ছে জাগল কেন ঝিন্নির! এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে মদনলালকে দূর থেকে দেখে নিজেকে মেলা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল ও। আমাকে বলেছিল মদনলাল লোকটা নাকি ভীষণ খারাপ। এখন সেই মদনলালকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করাব জন্যে নিজেকে ঝড়ের ভেতর ফেলতেও দ্বিধা করল না ঝিন্নি।

কি এক অপরিচিত যন্ত্রণা আমার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। তখন মনে হল, এমন করে বিষয়টাকে দেখা আমার ঠিক হয়নি। বিপদের মুখে যে কোন মানুষকে সাহায্য করাই মানুষের কাজ। আর পাহাড়ী দেশের মানুষ একটু বেশিরকমের কর্তব্যসচেতন। তাই ঝিন্নি ছুটে গেছে তার কর্তব্যটুকু করতে। ঐ লোকটা মদনলাল না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তাহলে ঝিন্নি নিশ্চয়ই এমনিভাবে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।

আমার মনে হল, লোকটা মদনলাল নাও তো হতে পারে। আর যদি সত্যি তা না হয় তাহলে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী ভূভারতে আর কেউ থাকবে না। এর সমাধান কে করতে পারে? একমাত্র ঝিন্নি। কিন্তু এ ঘটনায় আমার উদ্বেগের যতবড় কারণই ঘটুক না কেন আমার আত্মসম্মানকে ভাসিয়ে দিযে ঝিন্নিকে আমি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করতে পারব না।

আমি ঝিন্নির মুখ থেকেই কোনকিছু শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

ঝিন্নি বলল, ঝড় পর পর বেড়ে উঠছে। বরফ পড়তেও পাবে। তার চেয়ে কষ্ট করে এটুকু চড়াই ভেঙে কোয়ার্টারে পালিয়ে যাই চল।

অন্ধকারে আমরা আবার পা বাড়ালাম। পথটা ঝিন্নিব মুখস্থ। ও আমার হাত শক্ত করে ধরে প্রায় টানতে টানতে আর হুঁশিয়ারী দিতে দিতে ওপরের দিকে নিয়ে চলল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার মত শীতকাতুরের পক্ষে জমে যাবারই কথা কিন্তু ঐ কেল্লার কাছ থেকে ঝিন্নিকে নিয়ে চলে আসতে পেরে আমার সোয়াস্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি তীব্র শীতের কামড় তেমন অনুভব করতে পারছিলাম না।

আর্ট গ্যালারী সংলগ্ন কোয়ার্টারে পৌঁছে ঝিন্নি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলে আমাকে ভেতবে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বলল, আজ এখানেই থাকব, ওপরে যাওয়া অসম্ভব। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালছি।

সুইচ্ অন্ করার শব্দ হল কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝিন্নি বলল, ঝড়ে এইমাত্র কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। একটু আগে কেল্লায় আলো জ্বলছিল। কিন্তু বিপদ যে চারদিক থেকেই এল ছোটেসাহেব। এখানে ইলেকট্রিক আছে বলে টর্চ কিংবা লণ্ঠন কোনটাই নেই।

বললাম, আপদ গেছে। এখন হাত ধরে আমার পোশাকগুলোর কাছে নিয়ে চল, আমি আধভেজা জামাকাপড়ের ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পাই।

ও আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর আমার সুটকেশখানা টেনে আনল। বলল, নাও, আন্দাজে হাতড়ে বের করে নাও তোমার দরকারী কাপড়চোপড়।

বলেই ঝিন্নি অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি খুঁজে পেতে জামাকাপড় বের করে পরে নিলাম। ঝিন্নি ভেতরের ঘরে কি করছে কে জানে।

ও নিশ্চয়ই এতক্ষণ বদলে ফেলেছে ওর ভেজা পোশাক।

আমি হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়লাম শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে।

ঝিন্নির দেখা নেই। আমি কম্বল জড়িয়ে অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ঝড়ের একটানা গোঙানী। দমকা হাওয়ায় পেছনের পাইন বনে কান্নার রোল উঠেছে। বরফ পড়া হয়ত শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে।

আমি কতক্ষণ একইভাবে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই পেছন ফিরে ঝিন্নিকে দেখতে গেলাম, কিন্তু কোথায় ঝিন্নি! কেউ কেথাও নেই, আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই ঝিন্নি সুইচটা অন করে রেখে থাকবে, তাই কারেন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা জ্বলে উঠেছে।

আমি ঘরে বসেই ডাকলাম, ঝিন্নি, কোথায় তুমি?

কোন সাড়া এল না।

অমনি কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের সূক্ষ্ম কোন্ ছিদ্রপথে শীতের কালনাগিনী ঢুকে পড়ে আমাকে ছোবল দিয়ে গেল। একটা কঠিন কন্‌কনে যন্ত্রণা আমার রক্তমাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তবু ঝিন্নির সন্ধানে আমাকে ভেতরের ঘরে যেতে হল। অনুমানে সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে আলো জ্বাললাম। কেউ নেই। পাতি পাতি করে খুঁজলাম, সারা কোয়ার্টারের কোথাও ঝিন্নি নেই। ভেজা পোশাকখানা না বদলেই ঝিন্নি কোথায় চলে গেছে?

একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমি যেন মূর্ছিত হয়ে রইলাম। আসার আগে নরসিংলালজী বলেছিলেন, ওপরের জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভালুক দেখা যায়। শীত প্রচণ্ড পড়লে ওরা স্নো-লাইন থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। তখন জঙ্গলের গুহা-গহ্বরে আশ্রয় নেয় ওরা।

পেছনের যে দরজাটা কোয়ার্টার-সংলগ্ন সব্জি ক্ষেত বা লহরীর দিকে রয়েছে, আমি সেখানে চলে গেলাম। দরজা ভেজান ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নেই। আমি হাত দিয়ে ঠেলতেই বাইরের দিকে খুলে গেল। মনে হল দরজাটা ভেজিয়ে ঝিন্নি একটা পাথর চাপা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঐ খোলা দরজার পথে এখন ঢুকে আসছে ঝড়ো হাওয়া। আমি কোনরকমে দরজাটা আবার টেনে নিয়ে বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার মনে এখন আর কোন অনুমানই কাজ করছে না। শুধু ঝড়ের রাতে কোন একটা অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি।

বাইরে করাঘাত বেজে উঠতেই দরজাটা খুলে দিলাম।

ঝিন্নি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ওর হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার।

ও কথা বলতে পারছিল না। ঘরের ভেতরে গিয়ে টিফিন কেরিয়ারটা রেখে দিয়ে ও আমাকে বলল, চারপাইয়ের ওপব চাবির গোছাটা পড়ে আছে, তুমি আলনার পাশে ঐ সুটকেশটা খুলে শুকনো পোশাকগুলো বের করে দাও। আমার সারা শরীর ভিজে গেছে।

ওর কথাগুলো প্রবল কাঁপুনিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে ওর নির্দেশমত পোশাকগুলো বের করে দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলাম।

কিছুক্ষণ পরে ঝিন্নি আমার ঘরে এল। ফায়ার প্লেসে কাঠ সাজিয়ে আগুন ধরাল। কাইল আর ফার গাছের কাঠ সহজেই ধরে যায়। ঝিন্নির তাই আগুন ধরাতে বেশি সময় লাগল না।

আধ ঘণ্টার ভেতরেই হিমঘরখানা আরামদায়ক উত্তাপে ভরে গেল। ঝিন্নি চুল খুলে ফেলেছিল। ভেজা চুল মুছে দুটি গাল ও পিঠের ওপর দিয়ে প্রপাতের মত বইয়ে দিয়েছিল। এখন আগুনের তাপে শুকিয়ে নিচ্ছিল সে চুলের রাশ।

আমি কথা বললাম, কেন এমন দুঃসাহসের কাজ করতে গেলে ঝিন্নি?

ও এইবার চিরুনি বের করে মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে তো? ভাবছিলে, লেপার্ড বুঝি তোমার ঝিন্নিকে লোপাট করে দিলে। অথবা পাহাড়ী প্যানথার হয়ত আস্ত গিলেই ফেলল মেয়েটাকে।

বললাম, যখন দেখা গেল তুমি ঘরে নেই তখন আমি কিছু ভাবতেই পারছিলাম না।

ঝিন্নি বলল, তোমার সুটকেশখানা বের করে দিয়েই আমি দেশলাইয়ের খোঁজে গিয়ে দেখি দেশলাই নেই। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল ওপরের কোয়ার্টারে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সারারাত ফায়ার প্লেসে আগুন না জ্বেলে থাকতে পারা যাবে না। তাই ওপর থেকে দেশলাই আনতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও বেলার তৈরি খাবারগুলোও নামিয়ে আনলাম।

বললাম, ঝিন্নি, আমি যদি জানতাম তুমি এ ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছ তাহলে তোমাকে একপাও বাইরে বেরুতে দিতাম না।

ঝিন্নি বলল, তাইতো তোমাকে কিছু বলিনি, চুপিচুপি বেরিয়ে গেছি।

আমি শুধু বললাম, সত্যি ঝিন্নি খুব দুঃখ পেয়েছি।

ঝিন্নি চুলে চিরুনি চালানো বন্ধ করে বলল, কেন, দুঃখের আবার কি হল?

আমি আর কোন কথা বললাম না দেখে ও উঠে এল আমার পাশে। হঠাৎ আমার মাথাটা ওর বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, তোমার জন্যে এত কষ্ট করলাম, একটু আদর করে দেবে না? তাহলে সব কষ্টই আমার দূর হয়ে যাবে।

আলো জ্বলছে। ওর ফুলে-ফেঁপে ওঠা চুলের অরণ্য থেকে জেগে ওঠা মুখখানা যেন আমার একটুখানি আদর কেড়ে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

বললাম, তোমার এ অতি বাস্তব ভোজপর্বটা শেষ হোক, তারপর সারারাত গল্প করে কাটানো যাবে।

ঝিন্নি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুলে বিনুনী করতে লাগল। হঠাৎ খেয়াল চাপল আমার। বললাম, একটা ইচ্ছা আছে, পূরণ করবে?

ও বলল, তোমার ইচ্ছার কথাটা শুনি আগে।

কোন ভণিতা না করেই বললাম, তোমাকে আজ খোলা চুলে কাছে পেতে চাই ঝিন্নি। এটা যে কতবড় থ্রিল তা তুমি মেয়ে হয়ে বুঝবে না।

ঝিন্নির হাত থেমে গেল। সে মাথা দুলিয়ে বলতে লাগল, কি যে পাগলামী তোমার ছোটেসাহেব, দারুণ দারুণ সব খেয়াল বন বন করে ঘুরছে তোমার মাথায়। চুল খোলা রেখে কি শোওয়া যায়?

ও চটপট হাত চালিয়ে বিনুনীটা কোনরকমে শেষ করে রাতের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বিছানায় বসে বসে দেখতে লাগলাম, কত নিখুঁত আর গোছানো কাজের হাত ঝিন্নির। ওর কোন কিছু দেয়া নেয়ার ছন্দটি সমঝদারের চোখে ধরা পড়বেই পড়বে। একটি পরিচ্ছন্ন সুখী সংসারের ছবিগুলো যেন ফুটে উঠছে ওর প্রতিটি কাজে।

রাতের খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমি বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে দুটো হাতের পাতায় মাথা রেখে সিলিংয়ের দিকে মুখ করে শুয়ে আছি। আলো জ্বলছে, তাই বন্ধ করে রেখেছি চোখ। ঝিন্নি ভেতরের ঘরে কিছু করছে। মিশ্রিত কতকগুলো ছোটবড় শব্দ ভেসে আসছে আমার কানে। ফায়ার প্লেসের থেকে উঠে আসছে তৃপ্তিকর তাপ-প্রবাহ। আমার লেপটিতে রয়েছে অনেক আরামের সঞ্চয়। ভেতরের ঘর থেকে শব্দের ধারগুলো ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো আর আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভেতর।

কতক্ষণ ঝিন্নি ঘুমন্ত পুষ্কর মুখার্জীকে দেখেছিল জানিনা। কি অনুভূতি একটি মেয়ের জাগে যখন সে চেয়ে চেয়ে দেখে তার ভালবাসার মানুষটিকে অকৃত্রিম অচেতন অবস্থায়, তা আমার জানা নেই। তবে ঝিন্নি যে সেই আলো জ্বালা ঘরে অন্তত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তা কারোর পক্ষেই অনুমান করা কষ্টকর ছিল না।

আমার অবচেতন মন ঝিন্নির উপস্থিতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, তাই হঠাৎ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আর ঠিক আমার চোখের ওপর দেখলাম,একটি মুখ তার রাশি রাশি ছড়ানো চুলেব ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

ঝিন্নি আমার মাথার দিকে বসেছিল, আর আলো ছিল ঠিক তার উল্টো দিকে। তাই আমি ঝিন্নির

উদ্ভাসিত মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে ঝিন্নি তার মুখখানা একটু ওপরে তুলে নিয়ে বলল, কি ঘুম-কাতুরে মানুষ তুমি,সারারাত না গল্প করে কাটাবে বলেছিলে?

মিথ্যে কথা বললাম, চোখ বুজে তোমার ছবি দেখছিলাম।

ঝিন্নি আমার কপালে ওর ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে নাড়া দিতে দিতে বলল, মিথ্যুক কোথাকার, এত কথাও বানিয়ে বলতে পার তুমি। সেই কতক্ষণ বসে আছি, চেতনাই নেই।

ওর চুলে ভরা মাথাটা আমার মুখের ওপর রেখে বললাম, এতক্ষণ কি দেখছিলে ঝিন্নি?

ঝিন্নি অনুচ্চে বলল, তোমার মুখে দুষ্টুমীর ছবিগুলো কেমন ফুটে ওঠে তাই দেখছিলাম।

বিছানায় পাশ ফিরে ওর থুতনি আর গোলাপী আভার নাকটা ঠোঁটে চেপে আদর করলাম।

ও শুধু বলল, তুমি অনেক লোভী হয়ে যাচ্ছ কিন্তু ছোটেসাহেব, শাসন না করলে বিপদ ঘটাবে।

ওকে আমার মাথার দিক থেকে টেনে আনলাম বিছানার ওপর। আশ্লেষে আদরে ভরে দিতে লাগলাম আমার ঝিন্নিকে। লুঠেরার মতো লুঠ করতে লাগলাম বহু যত্নে সংগোপনে রক্ষিত ওর দুর্মূল্য রত্নগুলি।

একসময় আমার লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি যখন দুর্দম হয়ে উঠল তখন করুণ মিনতির সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে ঝিন্নি বলল, আমার যা আছে এখন থেকে সে তো তোমারই হয়ে রইল। এই মুহূর্তে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিও না ছোটেসাহেব। সব তোমার, শুধু তুমি আমাকে সযত্নে গচ্ছিত রাখবার অধিকারটুকু দাও। কোন এক বিশেষ লগ্নে আমি আমার যা কিছু আছে অনেক শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশিয়ে তা তোমার সেবায় উজাড় করে দিতে চাই।

আমি ঝিন্নির মর্যাদা রাখলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও।

বললাম, তাই হবে ঝিন্নি। তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাব না। আর যদি কোনদিন বড় বেশি লোভী হয়ে উঠি তাহলে তুমি আমার সে লোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে শাসন কোরো।

অনেক গভীর রাত অব্দি বাইরে ঝড়ের গান আর ভেতরে দুজনের বুকের ধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে জেগে উঠে দেখি নিবিড় বিশ্বাস আর নির্ভরতায় ঝিন্নি আমাকে জড়িয়ে অচেতনে ঘুমিয়ে আছে।

রোদ্দুরের সোনা ছড়িয়ে পড়তেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম কুলুর বাংলোর উদ্দেশ্যে। রাতের ঝড়ে পথের ওপর বরফ জমে গেছে। পাইনের সবুজ ঝালরে রূপোলী লেস ঝুলছে। দূরে কাছে পাহাড়ের মাথায় বরফ বরফ আর বরফ। সারা পীরপাঞ্জাল ধব্‌ধবে সাদা। সূর্যের আলোয় চারদিকের বরফ ঝকঝক করছে।

ঝিন্নি বলল, হেঁটে যাওয়াই স্থির, তবে তুমি যদি লাকি হও তাহলে গাড়ি একটা পেয়ে যেতেও পার।

বললাম, লাক আমার কোনদিনই ভাল না, তবে তোমার সঙ্গে থেকে যদি কপালটা খোলে।

আমবা কেল্লার কাছাকাছি এলে ঝিন্নি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগল।

কেল্লা পেরিয়ে ঝিন্নি বলল, মদনলাল আস্ত একটা শকুনি। অনেক দূরের থেকেও ও সবকিছু দেখতে পায়।

একটু থেমে আবার বলল, কাল দেখলে না আমি ঝড়ের ভেতরেও চুপি চুপি গিয়ে ওর জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। জানালা খোলা থাকলে আলোর রেখা ধরেই ও আমাদের চিনে ফেলত।

বললাম, তোমার যত সব উদ্ভট ভাবনা। তবে কাল ঝড়ের রাতে কাজটা তুমি ভালোই করেছ। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা মানুষকে তুমি বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

মনে মনে কিন্তু আমি ঝিন্নির কথায় গভীর তৃপ্তি পেলাম। মদনলালের ওপর ওর বিতৃষ্ণা আমার মনের ওপর গেঁথে থাকা ছোট্ট কাঁটাটা তুলে দিয়ে গেল।

নাগ্‌গরের পাহাড় ছেড়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। ঝিন্নি কুলীর খোঁজে কাছাকাছি একটা টিকার দিকে চলল। আমি মালের পাহারায় রইলাম।

ঝিন্নি সেই যে গেছে আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি মালের ওপর চেপেচুপে বসে আছি। হঠাৎ একটা গাড়ির হর্ন শুনে উঠে দাঁড়ালাম।

ওপর থেকে আমার সামনে গড়িয়ে এল একখানা জীপ। ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দেখলাম গত রাতে কেল্লার ভেতরে দেখা সেই মানুষটি। এই তাহলে মদনলাল! দূর থেকে যার চেহারার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাই হয়নি, আজ তাকে মুখোমুখি দেখলাম। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে। বয়সের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট।

গাড়িটাকে পথের একধারে সুবিধামত জায়গায় রেখে মদনলাল এগিয়ে এল আমার পাশে। প্রথমে কুলুহী ভাষায় কথা বলে আমার মুখ থেকে বিস্ময় আর মৃদু হাসি ছাড়া যখন কিছুই পেল না তখন ইংরাজীতেই শুরু করল।

মদনলালের প্রথম জিজ্ঞাসা, আপনি একা একা এভাবে বসে আছেন কেন? কোথায় যেতে চান?

বললাম, আমার সঙ্গীটি বিশেষ কাজে পাশের টিকাতে গেছে তাই অপেক্ষা করছি। ও এসে পড়লেই আমরা মানালীর দিকে রওনা দেব।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বললাম। আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম, মদনলাল কুলুর পথেই পাড়ি জমাবে। আর সত্যি কথাটা বললেই মদনলালের গাড়িতে বন্দী হয়ে যেতে হবে কুলু।

মদনলাল বলল, আপনি ট্যুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে আর ট্যুরিস্ট হলে নিশ্চয়ই দুঃসাহসী ট্যুরিস্ট। এ সময় বেড়িয়ে বেড়ানোতে হিম্মত চাই।

মৃদু মৃদু গর্বের হাসি হাসতে লাগলাম। ভাবটা, তুমি ঠিক ধরেছ মদনলাল।

মদনলালের আবার প্রশ্ন, আপনি কি মেলা দেখতে এসেছিলেন? উঠেছেন কোথায়?

দেখলাম লোকটা দারুণ কৌতূহলী আর এক একবারে অন্তত দুদুটো করে প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত।

বললাম, হাঁ, কোলি-রি-দেওয়ালি উৎসব দেখতেই এসেছিলাম। আশ্রয় পেয়েছিলাম সামনের ঐ পাহাড়ী টিকায়।

মদনলাল বলল, ইনফরমেশান রাখেন না তাই নইলে আপনার একটু ওপরের পাহাড়েই সরকারী বাংলো আছে। দিব্যি আরামে থাকতে পারতেন।

হেসে বললাম, এখানে এসে পাহাড়ীদের সঙ্গে কাটাতেই চেয়েছিলাম। আর তাই আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

মনে মনে বললাম, এখন তুমি দয়া করে জীপখানা চালিয়ে এখান থেকে সরে পড়লেই বাঁচি।

মদনলালের যাবার তাড়া নেই। লোকটা যেন প্রশ্নের তুবড়ি। আমার বাড়িঘর দেশ গাঁ থেকে চতুর্দশ পুরুষের খবর নিতে লাগল আর আমিও রকেটের গতিতে গল্প বানিয়ে চললাম। ডাহা মিথ্যেগুলো বলতে মাঝে মাঝে খারাপই লাগছিল, কিন্তু লোকটাকে নিয়ে কেমন যেন খেলার নেশায় পেয়ে বসেছিল আমার।

হঠাৎ মনে হল কারা যেন পাশের পাহাড়ের বাঁকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আমার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠল। এখুনি ঝিন্নি এসে মঞ্চে হাজির হবে আর নাটক দারুণভাবে জমে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে মিথ্যুক গল্পকারটা।

আমি পেছন দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না। প্রশ্নের তুবড়ি কি যে বলে চলেছে তাও ঠিকমতো কানে যাচ্ছিল না। হয়ত আমাকে অন্যমনস্ক দেখে মদনলালের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেতাদুরস্ত একটা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। তার গাড়ি গোঙানি ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলল আর আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেলাম কারা আসছে।

কাউকেই দেখতে পেলাম না। তাহলে আমি কি ভুল শুনেছিলাম!

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে আধখানা নাক আর দুটো চোখসহ একটা মাথা বেরুলো।

আমি হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলাম। ঝিন্নির চোখ থেকে তখনও ভয় মুছে যায়নি। চেঁচিয়ে বললাম, বেরিয়ে এসো, এতক্ষণে মদনলাল কুলু পৌঁছে গেল বলে।

ঝিন্নি পেছন থেকে কাদের যেন ডাক দিলে। জনাদুয়েক লোক এগিয়ে এল। সঙ্গে চারটে টাট্টু। কাছে এলে বললাম, লোকটা ফিরছিল, গাড়িও এসেছিল কিন্তু তুমি পাশে না থাকায় লিফ্‌টটা আর নেওয়া গেল না।

তখনও ঝিন্নির চোখে দারুণ উত্তেজনা। সে ঘটনাটা জানার জন্যে আমার দিকে চেয়ে আছে।

বললাম, ভয় নেই, তোমার নাম মুখেও আনিনি। আর আমার নাম-ধাম যা বাতলেছি, ভূ-ভারতের কোথাও খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। তবে দেখলাম কৌতূহলের একটা চলন্ত বিজ্ঞাপন কাকে বলে।

চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঝিন্নি বলল, বাঁচিয়েছ। আমার তো এত আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে এখুনি আবার কোয়ার্টাবে ফিরে গিয়ে হুল্লোড় করি।

বললাম, আপত্তি নেই আমারও। এক পায়ে দাঁড়িয়ে, আদেশ হলেই পাহাড়ে উঠি।

ঝিন্নি বলল, হয়েছে। এখন টাট্টুর ওপর ওঠো তো দেখি, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আমরা দুটো টাট্টুতে উঠলাম। দুটো পাহাড়ীতে মাল বাঁধাছাঁদা করে বাকী দুটো টাট্টুর ওপর চাপিয়ে আমাদের পেছনে আসতে লাগল। আমি লক্ষ্য করলাম, ওদের পায়ে খড় কিংবা ঐ ধরনের ঘাস জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে তৈরি জুতো।

ঝিন্নিকে বলতেই ও বলল, এ অঞ্চলের পাহাড়ীরা খড়ের তৈরি জুতো পরে থাকে।

বললাম, টেঁকে?

মাসখানেক তো চলে যায়। মানুষগুলো বড় গরীব, ছোটেসাহেব। কালেভদ্রে আমাদের মত খেয়ালী দু-একটি খদ্দের পেয়ে যায়, নইলে দু-চার জায়গায় মাল বয়ে যা দু'দশ টাকা রোজগার করে।

আমরা চলেছি পাশাপাশি। কখনো বা সামনে পেছনে। পাহাড়ী দেশের উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা ভাঙাচোরা পথে টাট্টুই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বাহন। খচ্চরে আর টাট্টুতে ভারী মাল বয়। ছাগলের পিঠেও মাল বোঝাই দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। পশুদের গলায় সারি দিয়ে ঘণ্টা বাঁধা থাকে। চলতে গেলেই টং টং টুং টুং আওয়াজ ওঠে। পথচারীরা জানতে পারে। অমনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

ঝিন্নি এক সময় বলল, এত জোরে ছোটাচ্ছ কেন তোমার টাট্টু ?

বললাম, ঘর পৌঁছতে হবে না?

ঝিন্নি বলল, সন্ধ্যের আগে কুলুতে আর ঢুকছি না। ওদিকে ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে দিয়েই যাবার পথ। মদনলালের এলাকা। এ অবস্থায় দেখতে পেলেই গল্প বানানেওয়ালাকে লাড্ডু বানিয়ে ছাড়বে।

বললাম, তোমার মদনলাল কিন্তু আমাকে প্রথমে বেকুব বানিয়েছিল।

ঝিন্নি বলল, আমি তোমার কথায় দারুণ রকম আপত্তি জানাচ্ছি। এক নম্বর, ও লোকটা আমার মদনলাল নয়। দু নম্বর, তোমাকে বোকা বানানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই মদনলালের নেই।

বললাম, বিশ্বাস কর ঝিন্নি, তোমাদের কুলুহী ভাষাতেই যখন আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করল, তখন আমি তো এক নম্বর বুড়বক বনে গেলাম। তারপর অবশ্য ইংরাজীতেই চালিয়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে ছুটি ফুরোবার আগেই কুলুহী আর গাদী ভাষা দুটো চলনসই রকমের শিখিয়ে দেব। কথাবার্তা মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারবে।

বললাম, এখন দু-দুটো মাস চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তার ভেতর একটা কাজে জড়িয়ে থাকলে সময়টা কাটবে ভাল।

ঝিন্নি বলল, দক্ষিণা চাই। গুরু-দক্ষিণা।

বললাম, আমার তো পেছনের কোন বাঁধন নেই ঝিন্নি। তাই এখন থেকে আমার বলতে যা কিছু তার সবটাই তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই।

ও বলল, আমি যদি সবকিছু নষ্ট করে ফেলি?

বললাম, তার জন্যে আর যা হোক তোমার কাছে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত চাইব না। আর এও জানি, আমার কাছে যা থাকবার নয় তা তোমার কাছে অনেক যত্নে থাকবে।

ঝিন্নি টাট্টুর মুখখানা নাগ্‌গরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল।

বললাম, কি হল, টাট্টুর মুখ ফেরালে যে?

ঝিন্নি চেয়ে দেখতে দেখতে বলল, এবার পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলে আর আমরা নাগ্‌গরের কোয়ার্টার, পাহাড়, বন কিছু দেখতে পাব না। তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।

হঠাৎ বললাম, এখানেই যদি আমাদের বিয়ে হয় ঝিন্নি।

ঝিন্নি টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে চলতে চলতে বলল, তাই যেন হয় ছোটেসাহেব। নাগ্‌গরে বিয়ের আগেই আমরা দুজনকে এমন ঘনিষ্ঠ করে পেলাম, তাই বিয়ের বাসর, মধুচন্দ্রিমা সবই এখানে হোক এই আমারও মনের ইচ্ছে।

বললাম, নাগ্‌গরে আমার জীবনের সব সেরা স্মৃতিগুলো রইল ঝিন্নি।

ঝিন্নি কতক্ষণ কথা বলতে পারল না। সে হয়ত ডুবে রইল কটি হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতির অতলে।

এক সময় বলল, আচ্ছা ছোটেসাহেব, বিয়ের ব্যাপারে তোমার দিনক্ষণ মানার সংস্কার আছে?

বললাম, একেবারে নেই। তবে তুমি যদি মানো তাহলে আমার তা স্বীকার করে নিতে আপত্তিও নেই।

ঝিন্নি অনেক ভাবনার ওপার থেকে যেন বলল, চাচাজীর মত হবে কিনা জানি না, তবে আমার ইচ্ছে কোলি-রি-দেওয়ালির দিনটিতেই আমাদের বিয়ে হোক। সারা কুলুতে চলবে উৎসব আর সেই উৎসবের রাতে নাগ্‌গরের পাইন বনে ঘেরা ছোট্ট কোয়ার্টারে আমরা মন্ত্র পড়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করব।

বললাম, এখনও কোলি-রি-দেওয়ালি ফিরে আসতে একটা বছর বাকী। তাহলেও আমি মানালীতে বনে বসে সেই বিশেষ দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে রইব ঝিন্নি। যেখানেই থাকি, অন্ধকার আকাশে আলোর ফুল ফোটার রাতে আমি আমার সেরা ফুলটিকে কুড়িয়ে নিতে আসব এই নাগ্‌গরে।

ঝিন্নি হঠাৎ তার টাট্টুটা আমার টাট্টুর পাশে নিয়ে এসে বলল, কেউ নেই এখানে, তোমার হাতের আঙুলগুলো একটু ছুঁতে দেবে আমাকে?

একটু হেসে ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরে রেখে বললাম, আর যদি ছেড়ে না দিই?

ঝিন্নি মিনতির সুরে বলল, এখুনি পোর্টাররা এসে পড়বে। দোহাই তোমার দুষ্টুমী করো না ছোটেসাহেব।

আমি হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, চিরদিন যে হাতখানা ধরে চলতে হবে, তাকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পুষ্কর মুখার্জী কারো ভাবনার পরোয়া করে না ঝিন্নি।

মিষ্টি হাসিতে শাসনের একটা ছবি ফুটিয়ে টাট্টুটা সামনের দিকে ছুটিয়ে দিল ঝিন্নি। আমি ওকে ধরবার জন্যে দ্রুত এগোতে লাগলাম। আমাদের পাশ দিয়ে খলখল খুশিতে ভেঙে পড়া নীলাম্বরী নদীটা [illegible] পথ দেখিয়ে ছুটে চলল।

বসন্ত এসেছে!

রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে পাহাড়ী দেশটার চেহারা। উপত্যকা পথ পাহাড় নদীতীর সব জায়গাতেই লেগেছে বসন্ত উৎসবের ছোঁয়া। আপেলের ডালে ডালে থোকা থোকা সাদা আর পিঙ্ক ফুলের সমারোহ। ভালবাসার রঙীন প্রলাপগুলো যেন বেরিয়ে আসছে বুক ঠেলে। হায়উন্দ্ বা হিম ঋতুর ধার কমে গিয়ে হাওয়ায় লেগেছে তউন্দি বা তপ্তঋতুর আমেজী একটা ভাব। বুনো চেরীর লাল আর লালচে

বেগুনী ফুলগুলো ফুটিয়ে তুলছে রঙের বাহার। মুঠো মুঠো রঙীন ফুলের পাপড়ি কারা যেন উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। উড়ছে প্রজাপতি, হাজার রঙের ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি।

গান গেয়ে উঠল নদী, ঝর্ণা, কুহল, সারা দেশটা। গদ্দীরা এখন ভেড়া নিয়ে শীতের ভ্যালি ছেড়ে উঠছে ওপরের পাহাড়ে। ওরা ভারী একটা মিষ্টি সুরে ভেড়াগুলোকে ডাক দিতে দিতে নিয়ে চলেছে।

লী সাহেবের টাট্টু চড়ে পাহাড়ী টিকাগুলোতে ডাক্তারী করে বেড়াচ্ছি। কদিন আগে একটা গদ্দী তরুণ ছেলে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কোথা থেকে শুনেছে আমি নাকি ধন্বন্তরী। গিয়ে দেখি রাস্তার ধারে একটা পাণ্ডাড় গাছের তলায় কালো কাপড় দিয়ে টাঙানো তাঁবু। চারদিকে ঘিসঘিস করছে কতকগুলো ভেড়া। তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বাচ্চা বউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। লেবার পেইন।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, পুরো একটা দিন পার হয়ে গেছে।

জায়গাটা আমার বাংলোর কাছাকাছি। ছেলেটাকে ছুটিয়ে দিলাম ঝিন্নিকে ডেকে আনতে।

ঝিন্নি এলে ওকে নিয়ে ঢুকলাম তাঁবুর ভেতর। বছর ষোল সতের বযেস হবে মেয়েটার। ফার্স্ট ইসু। পরীক্ষা করে দেখলাম, ডাইলেটেশান তেমন হয়নি। অস ওয়ান ফিংগার মাত্র। ইউটেরাইন কন্ট্রাকসন মোটেই জোরালো নয়। প্রেসার নিয়ে দেখা গেল, হাড্রেড ফিফটি ওভার নাইনটি। ইডিমা নেই। ফিটাল ডিসট্রেসের লক্ষণ স্পষ্ট নয়।

ঝিন্নি আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, সিজার করতে হবে নাকি ?

বললাম, না। আরও অপেক্ষা করা যাবে। আমাদের বাংলোতে মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়।

অনেক কষ্টে ধরাধারি করে বয়ে আনা হল বাংলোতে। গদ্দী ছেলেটাব মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। একদিন অপেক্ষা করে দেখা গেল, টু ফিংগারের বেশী অস ডাইলেটেশান হল না।

ওকে এবার ট্রায়াল লেবার দেওয়া হল। অমনি একটা ফুটফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এল। তরুণী মা ঝিমিয়ে পড়ে রইল কতক্ষণ। গদ্দী তরুণটির মুখে হাসি আর ধরে না।

মনে হল সবচেয়ে খুশি হয়েছে ঝিন্নি। আমার নির্দেশে চব্বিশ ঘণ্টা সে নার্সিং করে চলল বাচ্চা আর প্রসূতির।

গতকাল সকালে ছেলে কোলে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেছে মেয়েটি। আমি বাধা দিইনি। ভেড়া ছাগলের ভেতরেই বেড়ে ওঠে গদ্দীদের বাচ্চাগুলো। ইনফেকশানেব ভয় নেই ওদের।

বিকেলেই একটা ভেড়া নিয়ে হাজির সেই গদ্দী তরুণটি।

বললাম, কি ব্যাপার ?

ও বলল, এটা তোমাকে নিতে হবে ডাক্তার। তোমার সেবার জন্যে এনেছি।

না নিলে দুঃখ পাবে, তাই নিতে হল। বড় সহজ সরল এই গদ্দী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো।

রাতে ঝিন্নির মুখে একটা খবর পেলাম। গদ্দী ছেলেটি মেয়েটিকে ঝিন্দ্‌ফুঁক করে বিয়ে করেছে। কাউকে না বলে লুকিয়ে বিয়ে করা হল ঝিন্দ্‌ফুঁক। পালিয়ে এসে একটা ঝোপে আগুন লাগিয়ে ক'পাক ঘুরে নিয়ে বিয়েটাকে সিদ্ধ করে ফেলেছে ওরা।

ঝিন্নিকে বললাম, ব্যাপারটা জানলে কি করে ?

ঝিন্নি বলল, গোপীর বউ পিন্‌ঝি নিজেই আমাকে বলেছে। তাই বেচারা এখন কিছুদিন দলছাড়া হয়ে আছে।

বললাম, বাচ্চাটা কিন্তু ভারী মিষ্টি হয়েছে দেখতে। প্রায় সারাক্ষণ চোখ বুজে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি কাটছে মুখে।

ঝিন্নি কিছুক্ষণ উদাস হয়ে অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর হাত ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, কি হল ঝিন্নি ?

চোখ দুটো ওর ছলছলিয়ে উঠল। আঙুল দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, খুব খারাপ লাগছে আমার।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কেন?

ঝিন্নি বলল, দুদিন ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করে বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই ও চলে যেতে একটুও ভাল লাগছে না।

আমি ঝিন্নিকে পাশে টেনে বসিয়ে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, ওরা গদ্দী ঝিন্নি, ওরা আদ্দেক যাযাবর। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ভেড়া চরিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ওদের কাজ। বয়ে যাওয়া নদীর মত ওদের চলা। গদ্দীদের পায়ের তলায় পাহাড় আর মাথার ওপর আকাশ। ওদের কাছে টানতে নেই। ওদের ভালবাসলে দুঃখ পেতে হয়।

ঝিন্নি আর কিছু বলল না। আমার বুকের কাছে ওর মাথাটা শুধু এগিয়ে আনল। আমি ওর চুলেভরা মাথাটা বুকে চেপে ধরে ভাবতে লাগলাম, আমার ঝিন্নি ঐ গদ্দীদের বাচ্চাটির মত ছোট্ট সুন্দর একটি শিশুর স্বপ্ন দেখছে।

আজ সকালে গোপী আর পিন্‌ঝিকে আবার দেখলাম। বাচ্চাটাকে পিঠে পুঁটলি বেঁধেছে পিন্‌ঝি। আগে চলেছে গোপী। পিঠে বোঝা, হাতে একখানা পাতলা কুঠার। পাহাড়ে চলার সময় ব্যালান্স রাখতে আর কাঠ কাটতে দরকার হয় ঐ অস্ত্রটি। গোপীর পেছনে একপাল সাদা ফেনাতোলা তরঙ্গিত ভেড়া। সবার পেছনে চলেছে পিন্‌ঝি। হাতে ঘুরছে উলবোনা তকলি।

আমি টাট্টুতে চড়ে ভোরবেলায় ছবি দেখতে বেরিয়েছিলাম। উপত্যকা জুড়ে বসন্ত বাহারের ছবি। দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। আমার ঠিক নীচের পথটা ধরে চলেছে।

গোপী কুঠারখানা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতখানা নাড়তে লাগল। আমিও হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন জানালাম।

গোপী যতক্ষণ আমার দিকে চেয়েছিল, পিন্‌ঝি ততক্ষণ একমনে ঘুরিয়ে চলেছিল তকলি। এখন সারা দলটা এগিয়ে যেতেই পেছন ফিরে পিন্‌ঝি এক কাণ্ড করে বসল। তকলিটা ফেলে দুটো হাঁটু গেড়ে বসে ও আমাকে নমস্কার করল। তারপর একমুখ মিষ্টিহাসি ছড়িয়ে তকলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

ওরা পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে আমি শেষবারের মত দেখতে পেলাম পিন্‌ঝির পিঠে বাধা বাচ্চাটাকে। আমার দিকেই ফেরানো ছিল তার মুখ। সকালের মিষ্টি রোদটুকু পড়ে ওর ধবধবে মুখখানা নরম টিউলিপ ফুলের মতন মনে হচ্ছিল।

ওরা চোখের ওপর থেকে হারিয়ে গেল, আমার মনটাও কেমন করে উঠল। আমি ঝিন্নির পিঠে বাধা আর একটা রেশমের মত নরম টিউলিপ ফুলের ছবি দেখতে লাগলাম।

আজ বসন্ত পঞ্চমী। পাহাড়ী ছেলেমেয়ের দল আমার সামনে দিয়ে হলুদ পোশাক পরে হৈ-হল্লা করতে করতে চলে যাচ্ছে। ওরা দল বেঁধে উৎসবের দিনে পিকনিক করতে চলেছে।

আমার একা একা আর ভাল লাগল না। টাট্টুটাকে জোরে চালিয়ে আমি নীচের বাংলোতে নেমে এলাম।

ঝিন্নি সকালবেলার হলুদ রোদ মাখছিল ফুলেভরা আপেল গাছটায় হেলান দিয়ে। ওর পরনেও হলুদ পোশাক। মেয়েরা হলদে পোশাক পরলেই আমার কেমন যেন মনে হয় মুখখানা সোনামুখি ডাবের মত কোমল লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

টাট্টুটাকে গাছে বেঁধে রেখে আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে ও চমকে ফিরে তাকাল।

চুপি চুপি বললাম, ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠিক পিন্‌ঝির মত।

ঝিন্নি চেঁচিয়ে উঠল, ডাকব চাচাজীকে? বলব তোমার দুষ্টুমির কথা?

আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। এমন করে গলা চড়িয়ে বলছে ঝিন্নি, চাচাজী আউট হাউসে থাকলেও শুনতে পাবেন!

আমি মুখে আঙুল চেপে বারণ করতে যেতেই ও ফুলন্ত আপেল গাছটার মত একমুখ হাসি ফুটিয়ে বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার! কেমন ভয় পাইয়ে দিলাম।

নিশ্চিত চাচাজী সকালে কোন কাজে বেরিয়েছেন, তাই ঝিন্নির এই আস্ফালন।

বললাম, তুমি যে এত সাহসী হয়েছ ঝিন্নি, তা তো জানতাম না।

ও ঠিক আমার সুরেই কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যে এত ভীতু হয়েছ ছোটেসাহেব , তা তো জানতাম না।

দুষ্টু মেয়েটাকে ধরতে যেতেই ও হাসি ঝরাতে ঝরাতে দৌড়ে পালাল। অমনি আপেল গাছের ডাল থেকে এক ঝাঁক চিড়িপাখি বাগানে লুটোপুটি খেতে খেতে ফরফর করে উড়ে চলে গেল।

কাল ভোরেই চাচাজীর সঙ্গে ফিরে যাব মানালী। বসন্ত পঞ্চমীর পূজোর জন্যে যাই যাই করেও থেকে যেতে হয়েছে কুলুর বাংলোতে।

চাচাজী আখরা বাজার থেকে পুজোর জিনিসপত্র কিনে আনলেন। তারই গোছ গাছে আর পুজোর আয়োজনে সারা দিনটা কাটল ঝিন্নির। পুজো শেষে পুরোহিত চলে গেলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঝিন্নি গৃহদেবতা নরসিং-এর পেতলের মূর্তির সামনে স্থির হয়ে বসে আছে। ওর মুখখানা উত্তর আকাশের অচঞ্চল নক্ষত্রটির মত। কে বলবে, ঝিন্নি ছুটে চলা কুহলের মত চঞ্চল।

রাত্রে যখন ও এল আমার ঘরে তখনও মুখে কথা নেই। আমার জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত।

আমি বসে আছি দেখে ও এক সময় উঠে এসে বলল, কাল ভোরবেলা না তোমার গাড়ি, এখনও জেগে আছ?

বললাম, আজ রাতে ঘুম আসবে না ঝিন্নি। চেষ্টা করলেও ঘুমুতে পারব না।

ও কিছু না বলে আবার গোছগাছের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে ও উঠে এসে বসল আমার পাশে। বলল, শুয়ে পড়, আমি বিলি কেটে দিচ্ছি তোমার চুলে।

বললাম, ঝিন্নি, আজ তোমার কোলে একটুখানি মাথা রেখে শুতে বড় ইচ্ছে করছে।

ও অমনি বিছানায় উঠে বসে কোল পেতে দিল। আমি ঝিন্নির কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার জানালার ওপরে জ্বলজ্বল করছে যে নক্ষত্র তারই মত উজ্জ্বল স্থির চোখে ঝিন্নি তাকিয়ে আছে আমার মুখের ওপর।

ঝিন্নির চোখের তপ্ত একফোঁটা জল বকুল ফুলের মত আমার কপালে ঝরে পড়তেই চোখ মেলে তাকালাম।

অপ্রস্তুত ঝিন্নি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে।

বললাম, আমারও কি আর ভাল লাগবে ঝিন্নি একা একা থাকতে। গিয়েই ডিসপেনসারী খোলার কথা, কিন্তু খোলাই সার হবে। কাজে মন বসানো দায় হয়ে উঠবে।

ঝিন্নির কান্না থেমে গেছে। গলার স্বরটা তখনও ভারী। ও বলল, না না, তা কেন হবে। তুমি কত বড় ডাক্তার হবে, কত নামডাক তোমার। কুলুর পাহাড়ী মানুষগুলোর চিকিৎসা করবে তুমি, তারা সুস্থ হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করবে। আমি রাতদিন সেই কথাই ভাবি ছোটেসাহেব।

শুধু বললাম, তাই হবে ঝিন্নি।

আর কোন কথা আমি বলতে পারলাম না। ঝিন্নি আমার মাথার চুলে ওর নরম আঙুলগুলো চালাতে লাগল।

এক সময় ওর কষ্ট হবে মনে করে আমি মাথাটা বিছানায় সরিয়ে নিতেই ও আবার তার কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলল, আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না ছোটেসাহেব। সারাটা রাত এমনি করে বসে থাকতে দাও।

ওর হাতের আঙুলগুলো আমার চুলেভরা মাথাটাকে চেপে ধরে রইল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আঙুলগুলো আবেগে কাঁপছে।

ভোরবেলা ঝিন্নির অন্য রূপ। সকাল সকাল চা আর খাবার খাইয়ে দিলে আমাদের। ভাগ্‌তুটা ইতিমধ্যেই খোঁড়া পায়ের গোড়ালীর ওপর ভর রেখে ব্যালান্স প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। চাচাজী আর আমার সঙ্গী সে। ঝিন্নি ওকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল নাগ্‌গরে। কিন্তু ওর একটা ক্র্যাচ তৈরি

করে দেওয়া দরকার, তাই ওকে সঙ্গে নিলাম আমি।

এক ফাঁকে বললাম, থাক ভাগ্‌তু আমার কাছে। তোমার খবর পাবার জন্যে যখন অস্থির হয়ে উঠব, মন বসবে না কোন কাজে, তখন ওকে মানালীর বাসে তুলে সিধে পাঠিয়ে দেব নাগ্‌গরে। ও হবে আমার পত্রবাহক দূত।

ঝিন্নি বলল, অতশত বুঝি না, ভাগ্‌তু আসে ভাল, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে আমার একটি করে অন্তত চিঠি চাই। আর তা পাঠাবে নীল খামে ভরে হাল্কা হলুদ রঙের কাগজে। ডাকপিয়ন বয়ে আনবে সে চিঠি। আমি পাইনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বেলায় সে চিঠি পড়ব।

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু খামের রং নীল আর কাগজের রং হলুদ কেন ঝিন্নি।

ও বলল, নীল খাম দেখলেই বুঝব তুমি চিঠি লিখেছ, তখন আমার মনটা আকাশ হয়ে যাবে। আব চিঠি পড়ে খুশির আলোর ঝিলিক দেবে মনের ভেতর তাই কাগজটা হবে হলুদ রঙের।

বললাম, তুমি জাত-কবি ঝিন্নি।

ও আমার হাতখানা জোরে টিপে দিয়ে বলল, আর তুমি একজন হার্টস্পেশালিস্ট। তোমার চিকিৎসাতেই মহিলা কবিটির বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

বাইরে থেকে চাচাজীর ডাক শুনে ওর মাথাটায় নাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। ঝিন্নি কুলুতে আসার দিনটির মত আপেল গাছের তলায় রোদ মেখে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা চোখের আড়ালে চলে যাবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত ও সমানে একটা ছোট্ট পতাকার মত ওর হাতের পাতাটা নাড়তে লাগল।

মানালীর বাংলোতে বসে আছি। চাচাজী গেছেন বাগিচা তদারকির কাজে। আমার সামনে গমের ক্ষেত ধাপে ধাপে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সোনালী বাদামী রং ধরেছে গমের গায়ে। আর কিছুদিনের ভেতরেই পাকা ফসল ঘরে তোলা শুরু হবে। উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে ভ্যালিতে গম চাষের কাজ দেরিতে শুরু হয়, কিন্তু ফসল তোলা হয় আগে। ওপরের পাহাড়ে শীত বেশি, তাই চারাগাছগুলো শীতের দাপটে তাড়াতাড়ি মাথা তুলতে পারে না।

গমের ক্ষেতগুলো দেখতে হয়েছে ঠিক বাঘের পিঠের ডোরার মত। ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেওদার আর পাইনের বন। তার পেছনে উঁচু পাহাড়, মাথায় একরাশ বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বাঁয়ে ফিরলেই দুটো ফার গাছের কাণ্ডের ফাঁকে একটা ছবি চোখে পড়ে। অনেক দূরে বরফের কুঁচি ছড়ানো লম্বা টানা একটা পাহাড়। তার তলায় একটা ভ্যালি। পাহাড়ী ঝোরার স্রোত বইছে ভ্যালির ওপর দিয়ে। তার তীরে এখানে ওখানে বাঁকে বাঁকে দু-তিনটে করে পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তুলি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে কেউ।

পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতকগুলো ঘরবাড়ি নিয়ে এক একটা টিকা। দূর থেকে বড় জীর্ণ দেখায়। কাল ওদিকে লী সাহেবের টাট্টু চেপে গিয়েছিলাম রোগী দেখতে। নিমোনিয়া কেস। আপার আর মিড জোনে হয়েছে। টেম্পারেচার ১০৫ ডিগ্রী। পেসেন্ট ডেলিরিয়াস, কোলাপসিংও।

বাজারের মেডিকেল স্টোরে ক্রিস্টেলাইন পেনিসিলিন পাওয়া গেল ভাগ্যিস। টেন ল্যাকস ইনজেকশনের ব্যবস্থা করে এসেছি। ডিসপেনসারীর কম্পাউন্ডার রাতে থাকবে ওখানে। ইনজেকসন দিতে হবে ছ ঘণ্টা অন্তর। রোগীটি বৃদ্ধ, বিপত্নীক। ঝিন্নির মত একটি মেয়ে দেখলাম। খুব শান্ত প্রকৃতির। যা বললাম, কথা না বলে, একটি একটি করে সব করে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন পুরুষ মানুষ নেই তোমার ঘরে?

উত্তর দিতে গিয়ে মেয়েটি অসহায়ের মত তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল, নেই। আবার পরক্ষণেই বলল, আমার দাদা আছেন। মিলিটারীতে কাজ করেন। এখন লাডাকে রয়েছেন।

বললাম, অসুখের খবর জানিয়ে চিঠি দাও নি?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল, খবর দেওয়া হয়নি।

বললাম, অসুখটা সেবে যাবে ঠিক, তবু এ সময় তোমার দাদার এখানে থাকাটা দরকার ছিল।

মেয়েটি দেখলাম অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো। মনের আবেগটুকু চেপে রেখে বলল, দাদা পাঁচ বছর আসেনি, কোন চিঠিও পাঠায় না। লোকের মুখে কখনো সখনো খবর পাই।

কিছু একটা পারিবারিক দুঃখ আছে ওদের, তাই ও ব্যাপারে আর কথা তুললাম না।

আমি চলে আসছি দেখে মেয়েটি অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি আবার আসবেন ডাক্তারসাব?

বললাম, আজ রাতে এখানে থাকার দরকার আছে। তুমি পেসেন্টের কাছে থাক এখন, আমি বাজারের দাওয়াখানায় যাচ্ছি। ওখানে ওষুধ পাওয়া গেলে কম্পাউন্ডারকে পাঠিয়ে দেব। ছ ঘণ্টা অন্তর ইনজেকসান দিতে হবে। রাতে তোমার এখানে থাকবেন কম্পাউন্ডার।

আমি টাট্টুতে নেমে আসছিলাম। মেয়েটি দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ও সোজা পথে নেমে এসেছে।

বললাম, কি হল আবার?

ও একখানা পাঁচ টাকার নোট আমার দিকে তুলে ধরতেই বললাম, ওটা রেখে দাও এখন। আবার আসতে হবে। পরে একেবারে তখন নেওয়া যাবে।

চলে আসতে আসতে মনে হল, এমন কিছু সচ্ছল অবস্থা নয় ওদের। অন্তত বাড়িঘর দেখে তাইতো মনে হয়। কি করে মেয়েটি সংসার চালায়, কি করেই বা বুড়ো বাপের সেবা করে! মিলিটারীতে গিয়ে নিজের পথ দেখে নিয়েছে ছেলে। এখন মেয়েই বৃদ্ধটির একমাত্র ভরসা।

মনে মনে হাসিও পেল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কতদিন বিনি পয়সায় চিকিৎসা চালাবে ডাক্তার? প্রথম প্রথম ফি ছাড়বে, তারপর বিনি পয়সায় ওষুধ জোগাবে, তাহলে আর দেখতে হবে না। ভীড় জমে যাবে। কুলু থেকে মানালী অব্দি।

কম্পাউন্ডার শিউশরণজী কাল রাতে ছিলেন রোগীর বাড়ি। সকাল ছ'টায় ইনজেকশন দিয়ে ডিসপেনসারীতে এসেছিলেন। খবর দিয়ে গেছেন। রোগীর অবস্থা সামান্য ইমপ্রুভ করেছে। উনি আবার বারোটায় গিয়ে ইনজেকশন দেবেন। ওঁকে কাল রাত জাগার জন্য আজ সকালে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

ক'টি পাহাড়ী এসেছিল। ব্রংকাল ট্রাবল, এ্যালার্জি ঘটিত চুলকোনি আব ফিমেল ডিজিজের রোগী। ওদের প্রেসক্রিপশান লিখে বাজারের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি। জানি না, এসব ছোট জায়গায় সবরকম ওষুধ মিলবে কিনা। এবার শিউশরণজীকে পাঠাতে হবে সিমলা, চণ্ডীগড় কিংবা দিল্লীতে। ডিসপেনসারী চালাতে গেলে দরকারী সব ওষুধ মজুদ না করলেই নয়।

দুপুরবেলা খাবার পর বেরিয়েছেন চাচাজী। আমি দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। একা বসে থাকলে মানুষ নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে। কত চরিত্র পুরোনো ঘটনার পোশাক পরে এসে হাজির হয়। সুখ দুঃখ হাসি দীর্ঘশ্বাসের কত গল্পই না চলে তাদের সঙ্গে। আমি নির্জনে আমার পরিচিত অপরিচিত চরিত্রগুলিকে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসি। প্রতিদিনের জীবনে যেসব চরিত্রের মুখোমুখি হতে হয় তাদের কারো কারো সঙ্গ বেশিক্ষণ পছন্দ না হলেও ভদ্রতার খাতিরে সরে আসতে পারি না। আবার কাউকে একান্ত কাছে দীর্ঘসময় পেতে চাইলেও পাওয়া যায় না। কিন্তু নির্জন অবসরে কাউকে আমন্ত্রণ বা প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ অধিকার আমার। তাই নির্জনতা আমার প্রিয়। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপভোগ নির্জনতায় বিচরণ।

বাঁদিকের রাস্তার ওপর চোখ পড়তে দেখি মিঃ বেনন জুনিয়ার আসছে। জুলিয়েন বেনন আমার বয়সী। ভাগ্তুর অপারেশনের সময় ঝিন্নি আর আমাকে বেনন পরিবার বহু সাহায্য আর যত্ন করেছিলেন। সেই সূত্রে মানালীতে আসার পরেই জুলিয়েনের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

জুলিয়েনকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে আর একখানা চেয়ার বের করে আনলাম। ওপর থেকে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালাম ওকে। জুলিয়েনও হেসে হাত নাড়ল। বাগান পেরিয়ে উঠে এলো ওপরের বারান্দায়।

ওর প্রথম কথা, কি ভাবছ ডাক্তার? নিশ্চয় কোন মেয়ে বন্ধুর কথা?

হেসে বললাম, না, এখন পুরোপুরি ভাবছি আমার পুরুষ বন্ধুটির কথা।

ও বলল, এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ছেলেরা মেয়েদের কথা আর মেয়েরা ছেলেদের কথা ভাববে না তাহলে তো ভাবনার জগতে দুর্ভিক্ষ।

বললাম, আমার আর তোমার বেশ খানিক ফারাক আছে জুলিয়েন। তুমি মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে মনের খবর জানতে পার, আর আমি টেথিসকোপ বুকে বসিয়েও বুকের ভাষা পড়তে পারি না। তাই ওদের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি বলতে পার।

জুলিয়েন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ও ভাবনা ছাড়া যায় না ডাক্তার। কেন মিথ্যে লুকোচ্ছো আমার কাছ থেকে।

বললাম, বিশ্বাস কর জুলিয়েন, তোমার আসার আগের মুহূর্তে আমি রোগীদের কথাই ভাবছিলাম।

জুলিয়েন মাথা নেড়ে বলল, স্বাভাবিক। আমাদের মত তুমি তো কেবল ফলের কারবারী নও, আরও একটা বিদ্যে তোমার জানা আছে।

বললাম, ব্যবসার দিকটা পুরোপুরি কিন্তু নরসিংলালজীর। ওটার ভেতর আমাকে আর জড়িও না। ডাক্তারী বিদ্যের পরীক্ষাটা সবে শুরু করেছি।

নরসিংলালজীর নামে দেখলাম জুলিয়েন বিশেষ শ্রদ্ধাবিগলিত। বলল, ঐ এক মানুষ পেয়েছ ডাক্তার। সারা কুলুর ফলের ব্যবসা একদিকে আর নরসিংলালজী একদিকে। ওজন সমান থাকবে।

কথাটা বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। জুলিয়েন বলল, বুঝলে না, একদিকে ব্যবসা আর একদিকে সততা। নরসিংলালজী হলেন সিম্বল অব অনেস্টি। যার যেমন খুশি ব্যবসা করব, এ ধারণাটাই পাল্টে দিয়েছেন। ব্যবসার কানুন সব তৈরি করে দিয়েছেন মানুষটি। বাবা ভীষণ রেসপেক্ট করেন নরসিংলালজীকে। বলেন, আমার সব কটা আপেল বাগিচার যা ভ্যালু, একা নরসিংলালজীর কথার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি।

বললাম, আমার বাবা ভাগ্যবান ছিলেন, তাই ওঁর মত একজন খাঁটি মানুষ পেয়েছিলেন। শুনেছি, বাবা ওঁকেই এখানকার সবকিছু দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উনি তা নেন নি। আমাকে এখানে বসিয়ে তবে ওঁর শান্তি।

জুলিয়েন হঠাৎ বলল, নরসিংলালজীর মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম ডাক্তার? অবশ্য যদি তোমার বলতে বাধা না থাকে।

বললাম, বাধা থাকবে কেন। আমার মনে হয়েছে ঝিন্নি তার বাবার মতই সাচ্চা, আবার বুদ্ধির ধারও রয়েছে।

জুলিয়েন বলল, আমার মায়ের ধারণাও ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়দিনের সময় ঐ যে তোমরা এলে, মা তো ওর ব্যবহারে উচ্ছ্বসিত।

বললাম, তোমার মায়ের ধারণার কোন ভুল নেই।

জুলিয়েন হঠাৎ বলল, আমি মেয়েটিকে কিছু স্টাডি করেছি সে সময়।

বিস্মিত হলাম। জুলিয়েন ঝিন্নিকে স্টাডি করেছে, এ কথার অর্থ কি!

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও বলল, মুখার্জী, বন্ধু বলে যখন মেনে নিয়েছ, তখন মন খুলে কথা বলার অধিকারও দেবে আশা করি।

বললাম, নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম, আমার কথাটা কেমন যেন অস্পষ্ট শোনাচ্ছে।

জুলিয়েন সোজাসুজি বলল, নরসিংলালজীর মেয়ের তোমার ওপর কিছু আকর্ষণ আছে।

আমার এলোমেলো ভাবনার জটটা ছিঁড়ে গেল। এক চোট হেসে উঠে বললাম, তাই নাকি? কি করে বুঝলে বেনন? আমাকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেবে?

জুলিয়েন বলল, আমাদের কোয়ার্টারে একদিন নরসিংলালজীর মেয়ে এলে মা ওকে বাগানের সবসেরা একটা গোলাপ প্রেজেন্ট করেছিলেন। পরে আমি ঐ গদ্দী ছেলেটার পায়ের খবর নিতে এসে

দেখি, তোমার কোটের বাটন হোলে মায়ের দেওয়া সেই গোলাপ।

বললাম, হাঁ, মনে পড়ছে, ঝিন্নি আমাকে একটা গোলাপ এনে দিয়েছিল একদিন।

জুলিয়েন অমনি বলল, গোলাপ দেয়নি শুধু, ওর সঙ্গে আর কিছু বেশি দিয়েছে। একটি কুমারী মেয়ের হৃদয়ের রং আর গন্ধ।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে হাসছি দেখে জুলিয়েন বলল,

'Love and a cough cannot be hid'. বেননের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না ডাক্তার।

বললাম, আমি তো ফাঁকি দিতে চাই নি।

জুলিয়েন ধরে পড়ল, তাহলে তোমার রেড রোজের গান শোনাও ডাক্তার।

বলেই সে আপনমনে আবৃত্তি করল, 'Your voiceless lips, O flowers, are living preachers—each cup a pulpit and each leaf a book.'

বললাম, কি শুনতে চাও বল? যে মেয়েটি আমাকে গোলাপ দিয়েছিল, সে তার সঙ্গে একটা হৃদয়ও উপহার দিয়ে গেছে। তুমি ঠিকই ধরেছ জুলিয়েন। এবার আমার কথাটা শোন। প্রথম দেখাতেই আমি ঝিন্নিকে ভালবেসেছিলাম। এখন আমরা অনেকখানি পথ একসঙ্গে এগিয়ে এসেছি।

জুলিয়েন বলল, তোমাদের শুভদিনের জন্যে বন্ধু হিসেবে আমার আন্তরিক আনন্দটুকু জানিয়ে রাখলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের যেকোন কাজে সাহায্য করতে পারলে বিশেষ গৌরব বোধ করব।

আমি বেননের হাতখানা ধরে বললাম, এতদিন নিঃসঙ্গতাই ছিল আমার সঙ্গী, আজ থেকে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু।

বেনন আমার ধরে থাকা হাতখানায় একটা আন্তরিকতার চাপ দিল। ও আর কোন কথা না বলেই আমার বন্ধুত্বকে আরও গভীরভাবে স্বীকৃতি জানাল।

দুপুর কিংবা রাতের বেলা যখন রোগীর ভীড় থাকে না, তখন আমি জুলিয়েনের জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করি। ও বিশেষ কাজে কোথাও চলে না গেলে আসবেই আসবে আমার বাংলোতে। এ মুল্লুকে মন খুলে কথা বলার দ্বিতীয় বন্ধু আর নেই। আমিও ইদানিং দারুণরকম একটা আকর্ষণ অনুভব করছি বেনন পরিবারের এই যুবকটির ওপর।

জুলিয়েনের মা ইতিমধ্যে আমাকে দু'চারবার চা আর ডিনারের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন। আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি, বেনন পরিবারে কোন ফর্মালিটি নেই। অনেকটা আমাদের ঢিলেঢালা দিশি আচার আচরণের মত। ঝিন্নির কাছে শুনেছিলাম, ক্যাপ্টেন এ. টি. বেননের ছেলে মেজর বেনন এ দেশীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে এত ভালবাসতেন যে ঘরের ভেতর হিন্দু আচার-আচরণের ঢালাও পারমিশান দিয়েছিলেন তিনি। হয়ত সেই থেকে বেনন পরিবারের রিসেপশনে খৃষ্টানী আর হিন্দুয়ানীর সহাবস্থান ঘটেছে।

জুলিয়েন সম্বন্ধে দেখলাম ওর মা কিছুটা চিন্তিত। মিসেস বেননের ধারণা জুলিয়েন পুরোদস্তুর খামখেয়ালী। ওর দাদাদের একজন লন্ডনে গিয়ে বিয়ে-থা করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সেখানে তার সংসার সে নিজের মনোমত সাজিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়টি সিমলায় কিউরিও শপের মালিক। ওখানে পরিবারের ফলের ব্যবসার দেখাশোনাটা সে করে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জুলিয়েনকে নিয়ে। ইচ্ছে হলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কয়েক মাস পড়ে রইল বাগান আর ফল নিয়ে। আবার মাথার পোকা নড়লেই বেরিয়ে পড়ল বন পাহাড়ে। তখন জুলিয়েন পুরোদস্তুর ভবঘুরে। পড়ে রইল ফল প্যাকিং-এর কাজ, জ্যাম জেলি তৈরির তদারকি, জুলিয়েন পলাতক। কখন কোথায় থাকবে তার হদিস নেই। ঘর ছাড়া আর ঘরে ফেরার কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই তার।

মিসেস বেননকে হাসতে হাসতে বলেছিলাম, ছেলেকে সংসারী করে দিন, তাহলে হুট-হাট করে আর পালাতে পারবে না।

মিসেস বেনন বলেছিলেন, স্বভাব না বদলালে নতুন বিয়ে করা বউটিই কষ্ট পাবে। তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক।

জুলিয়েন একটা উত্তর দিয়েছিল সে সময়। বলেছিল, একটা গদ্দী মেয়েকে বিয়ে করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। আমার মত সেও পথে পথে ঘর পাতবে।

জুলিয়েনের কথার পরে আর কোন কথা তোলেন নি মিসেস বেনন। কারণ তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে কথা বাড়ালে ফয়সালার কোন আশা নেই।

বেলা পড়ে এলে লী সাহেবের দেওয়া টাট্টুতে চেপে আমি ভ্যালিতে ঘুরে আসি। এখানে গরমের দিনগুলোতে শেষ বেলার আলোটুকু যাই যাই করেও যায় না। রাতের অন্ধকার নামতে সেই প্রায় আটটার কাছাকাছি।

আমি ভ্যালির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা শীর্ণ জলধারা পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে চলে যাই। পাহাড়ের নীচে এসে টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে নিই আমার বাংলো বাড়িখানা। কত ওপরে দেওদার গাছের ফাঁকে সাদা বাংলোটা ছবির মত দেখায়। তার একটু নীচে কফি সেন্টারের গোল বাড়ি, তারপরেই পাহাড়টা যেন খাড়া নেমে এসেছে!

আমি আবার টাট্টুর লাগাম ধরে উঠতে থাকি পাশের পাহাড়ে। তিন-চারটে পাইন গাছের পাশ দিয়ে একটা কুহল যেখানে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে যাচ্ছে সেখানে একখণ্ড শিলার ওপর বসি। পাশে টাট্টুটা বাঁধা থাকে। আরও খানিক ওপরে ছড়ানো ছিটানো বসতি এলাকা শুরু। আমার মাথার বিশ-তিরিশ ফুট ওপরে একটা গম পেষার কল চলে। কল বললে ভুল হবে, চাকীতে গম পিষে দেয় একটি মেয়ে। ওপরের টিকার লোকেরা এসে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। কুহলের স্রোতের সঙ্গে চাকি ঘোরানোর একটা ব্যবস্থা আছে।

আমি একটানা একটা আওয়াজ শুনতে পাই। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন কাজ সেরে ওপরে উঠে যায়। কেউ বা বেশি গম থাকলে ছাগল কিংবা ভেড়ার পিঠে বেঁধে দেয় বস্তা। ওরা সেই বস্তা পিঠে নিয়ে দিব্যি উঠতে থাকে ওপরে। সবশেষে মেয়েটি যখন কাঠের দরজাটা বন্ধ করে ওপরের টিকার দিকে চলে যায় তখন আমিও টাট্টুটা খুলে নিয়ে নামতে থাকি ভ্যালির দিকে। ঐ চাকীর বন্ধ হাওয়াটা যেন আমার কাছে ঘরে ফেরার ওয়ার্নিং। এরপর বসে থাকলে ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে উঠতে না উঠতেই অন্ধকার নেমে আসবে, আর তখন পথ চিনে পাহাড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একদিন হয়েছিলও তাই। ভ্যালির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল ভূমণ্ডলের একখানা ক্ষুদ্র মানচিত্র যেন আমার সামনে মেলে রেখেছে কেউ। উত্তরে বরফের পাহাড়টা জেগে আছে। স্নো লাইনের তলা থেকে ক্রমে ক্রমে পপলার ফার দেওদার পাইন গাছের সারি ছোট থেকে বড় হয়ে নীচের ভ্যালিতে নেমে এসেছে। আদি মানবগোষ্ঠীর এক একটি দল যেন ওরা। সারি দিয়ে নামছে বিশেষ বিশেষ শৈলশিরা বেয়ে। নীচের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কৃষিকর্ম। এখানে ওখানে সোনালী বাদামী গমের ক্ষেত। অবিকল ডোরাকাটা হলুদ বাঘের পিঠ। ভ্যালির ওপর দিয়ে চলেছে জলধারা। আঁকাবাঁকা চলন তার। পাইনের পাশ কাটিয়ে দেওদার বনের ভেতর দিয়ে সে পথ করে চলেছে। কটি পাহাড়ী গমের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঠে গেল পেছনের বসতি এলাকার দিকে। একজনের পিঠে বাঁধা কিল্‌তা। তিনকোণা বাক্সটিতে দরকারী মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

সূর্যাস্তের আবীর রঙে ধীরে ধীরে মিশছে সন্ধ্যার কালো ছায়া।

চোখ নেমে এল ভ্যালির প্রবহমান জলধারাটির ওপর। একপাল ফেনা তোলা ভেড়া নিয়ে একটি গদ্দী পরিবার চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল। ভেড়াগুলো জল দেখে থমকে গেছে। গদ্দী লোকটা ধেড়ে একটা ভেড়াকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিলে জলের মধ্যে। ভেড়াটা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওপারে গিয়ে উঠতেই অন্য ভেড়াগুলো তাকে অনুসরণ করে জলে নেমে পার হয়ে গেল। সবশেষে গদ্দী পরিবারের লোকগুলো কটা ভীতু ভেড়ার বাচ্চাকে বগলে পুরে জলের স্রোত ভেঙে ওপারে গিয়ে উঠল।

ওরা চলতে চলতে একসময় পাহাড় আর বনের ভেতর হারিয়ে গেল।

আমি তখন গদ্দীদের কথা ভাবতে লাগলাম। ওরা মানালী থেকে এখন উঠবে আরও ওপরের পাহাড়ে। গরম না পড়া অব্দি কাটাবে স্নো লাইনের নীচে বনে পাহাড়ে। বিল কেম্বল খইর গার্ণা গাছের

পাতা খেতে খেতে ওপরে উঠবে ভেড়ার পাল। শীতে এসব গাছের পাতা ছাড়া খাবার আর কিই বা আছে।

গরম যত বাড়বে ওরা তত তাড়াতাড়ি উঠবে স্নো লাইনের ওপরে। ওখানকার ঘাস নাকি ভেড়াদের দারুণরকম পুষ্টি জোগায়।

গ্রীষ্ম বর্ষায় রোটাং পেরিয়ে গদ্দীরা চলে যাবে লাহুল। দূর স্পিতি অব্দি ওরা ঘুরে বেড়াবে ভেড়া চরিয়ে চরিয়ে।

কি অদ্ভুত ভ্রাম্যমাণের জীবন ওদের। জুলিয়েন বলেছিল, বেশ কয়েকবার ও গদ্দীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। গাছের তলায় পাহাড়ের ওপর শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছে রাত। আগুন জ্বেলে লেপার্ড ভালুক প্যানথারের কবল থেকে রক্ষা করেছে ভেড়ার পাল।

জুলিয়েন বলে, গদ্দী মেয়েদের চোখের টানে মানালী থেকে লাহুল পাঙ্গী স্পিতি চম্বা কাংড়াই শুধু নয়, সারা দুনিয়াটা ঘুরে আসা যায়।

আমিও হয়ত জুলিয়েনের মত এমনি একদিন বেরিয়ে পড়ব পাহাড়ী পথে। সামনে নীল আকাশে হেলান দিয়ে জেগে থাকবে পীরপাঞ্জাল। সবুজ বার্চ বনে উঠবে হাওয়ার গান। আর সোনালী আলোয় স্নান করতে করতে গদ্দীদের সঙ্গে এগিয়ে চলব আমি।

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়তেই দেখি ভ্যালিতে ছায়া বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে। আমাকে যেতে হবে ঐ ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে। পেছনে মাথার ওপর চেয়ে দেখি গম ভাঙানো ঘরখানা বন্ধ করে মেয়েটি কখন চলে গেছে।

আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় দারুণরকম বিব্রত হয়ে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি ওপারের পাহাড়ে সন্ধ্যার বাতিগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক করে জ্বলছে।

এখন আমার কোনদিকে যাবার উপায় নেই। পেছনের পাহাড়ে অনেকখানি ওপরে উঠলে তবে বসত এলাকা পাওয়া যাবে। সঙ্কীর্ণ ভাঙাচোরা আজানা পাহাড়ী পথে ওপরে ওঠার প্রশ্নই আসে না। নীচে নামলে আরও বিপদ। পায়ে পায়ে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

আমি কোন পথ দেখতে পেলাম না। সারারাত এখানে বসে থেকে যদি কোনরকমে প্রাণে বেঁচে যাই তবু নিউমোনিয়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচায় কে।

অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে। কুহলের শব্দ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম। না, আমার টাট্টু অজানা অন্ধকারে অস্বস্তি বোধ করছে। তাই শব্দ করে উঠল। আমি অর্থহীন একটা ধ্বনি তুলে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও।

আজ কোন তিথি জানা নেই। আমি চিরদিন তিথি এমনকি বার সম্বন্ধেও কতকটা উদাসীন। তাই চাঁদের উদয়অস্ত সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। চাঁদ উঠলে পথ চিনে হয়ত ঘরে ফেরার চেষ্টা করা যেত কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা অন্তত সামনে দেখা যাচ্ছে না। নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে চোখ পেতে বসে আছি। সর সর করে পাশ দিয়ে কিছু একটা চলে গেল। আমার গায়ে কোনরকম ছোঁয়া না লাগলেও গা-টা দারুণরকম শিরশির করে উঠল। এ অঞ্চলের বিষাক্ত খর্পা সাপ নয় তো! নিরুপায় হয়ে প্রায় দমবন্ধ করে বসে রইলাম। যদি কাছেপিঠে থাকে আর গায়ে বেয়ে ওঠে তাই গাছের একটা অনড় কাণ্ড বলে নিজেকে ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে। অন্ধকার ভেদ করে মানালীর ওপারের পাহাড়ে টকটকে লাল চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। চাঁদের আকার দেখে মনে হল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়। চতুর্থীর চাঁদ। একটা ভরসার হাওয়া যেন ওপার থেকে ভ্যালি পেরিয়ে বয়ে এল আমার বুকের মধ্যিখানে।

চাঁদটায় আটকে গেছে আমার দুটো চোখ। দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে চাঁদের রঙ। কেউ যেন ঘষে মেজে ঝকঝকে করে তুলছে চাঁদটাকে। বড় বড় গাছের পাতার রঙ চেনা না গেলেও তাদের ছায়া আব আকার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে জলো দুধের মত কতকগুলো ঢেউ এসে ভরে তুলল উপত্যকাব কালো পাত্রখানা। দেখতে দেখতে মাজা রূপোর মত ঝকঝকে চাঁদ আকাশের বেশ খানিক ওপরে উঠে গেল।

এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পথপ্রান্তর। আমি কিন্তু ঠায় বসে আছি। উত্তরের পাহাড়ে তুষারের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। কোন কোন জায়গায় বরফের রঙ বেশ খানিকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাছগুলো সিলুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তলায় সাদা খণ্ড খণ্ড বরফ ছড়ানো।

মনে হল, এই জনহীন নিসর্গের সঙ্গে অচ্ছেদ্য কোন বাঁধনে আমি জড়িয়ে আছি। ঐ চাঁদ, তুষাব পাহাড়, নদী অরণ্য উপত্যকা সবকিছু, আমার অনেক দিনের দেখা, বহু যুগের চেনা। এ স্থানটা মানালী না হয়ে পৃথিবীর যে কোন জায়গা হতে পারে। সাইবেরিয়া বা আল্পসের তুষারভূমির ওপর জেগে থাকা চন্দ্রালোক প্লাবিত বনাঞ্চলের রোমাঞ্চ আমাকে বারবার ছুঁয়ে যেতে লাগল। আমার মনে হল, আফ্রিকার কোন নদীবাহিত গভীর উপত্যকা তার আলোছায়ার আমন্ত্রণ নিয়ে ঠিক যেন আমার চোখের সামনে প্রসারিত হয়ে আছে।

আমার টাট্টু এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে তার হ্রেষার সঙ্গে ঘন ঘন পাথরে পদক্ষেপ করে চলেছে। সে বোধহয় ইঙ্গিতে এই কথাটুকু জানাতে চাইছে, হয় আমাকে খাটিয়ে নাও নয়তো বিশ্রামের সুযোগ করে দাও।

আমি ধীরে ধীরে উঠে টাট্টুতে চড়ে উপত্যকার দিকে নেমে চললাম। উপত্যকায় নেমে দেখি পাইন গাছগুলো উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় এক একটি ছায়াসঙ্গিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো স্নান করছে চাঁদের জলে।

ছোট্ট নদীটা পেরিয়ে মানালীর পাহাড়ের দিকে টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে দেখি দেওদার বনের ভেতর দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে। একবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আবার আলোছায়ায় ভেসে উঠছে। আমি টাট্টুর লাগাম টেনে ধীরস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার গাছের জটলা থেকে লোকটির বেরিয়ে আসার কথা কিন্তু তার আর পাত্তাই নেই। গল্পের অশরীরী আত্মার মত আগন্তুক উবে গেল নাকি !

আমাকে এখন ঐ বনের ভেতর দিয়েই টাট্টু নিয়ে উঠতে হবে। কি জানি মতলববাজ কোন লোকের মুখোমুখি যদি হতে হয়।

কে ওখানে?

চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, বেরিয়ে এসো এদিকে।

বাবুজী, আমি ভাগ্‌তু, বলতে বলতে একটা গাছের আড়াল থেকে ভাগ্‌তু বেরিয়ে এল। মোটা লাঠি একখানা দু'হাতে চেপে ধরে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল সে।

টাট্টু থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বললাম, তুই এখানে! এতটা পথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিস?

ভাগ্‌তু মুখখানা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওর খোঁড়া পা খানার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, রক্তে লাল হয়ে গেছে আঘাতের জায়গাটা।

তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, ভাগ্‌তু জখম পাখানাতে চোট লাগিয়ে বসে আছে।

ধমক দিয়ে বললাম, কে তোকে আসতে বলেছে এখানে?

ভাগ্‌তু তেমনি লাঠির মাথায় দুটো হাত মুঠো করে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, ওঠ টাট্টুর ওপর।

ভাগ্‌তু আর নড়ে না। জোর করে ওকে টেনে এনে টাট্টুতে ওঠালাম। ওর লাঠিখানা হাতে নিয়ে প্রবল জোরে ঠুকতে ঠুকতে আর ওকে ধমক দিতে দিতে চললাম।

এদিকে আমার বুক ঠেলে একটা ব্যথা উঠে আসছিল। সারা জীবনের মত পঙ্গু একটা ছেলে আমার কাছে এসেছে তার জীবন কাটাবার জন্য। এ বয়সে যখন ছেলেরা সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে, তখন ভাগ্‌তু সারাদিন মুখ বুজে ছোট্ট বাংলোর সীমানাটুকুর ভেতর হয় আমার ফরমায়েস খাটছে, নয়তো বিষণ্ণ মনে বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে বসে আছে।

আমরা বাঁধানো পাথরের রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'দিকে দাঁড়িয়ে সারি সারি সিডার। ছায়া পড়েছে পথে। টাট্টুর খুরের বিশেষ শব্দটা বাজছে। এখন লাঠিখানা প্রায় টেনে টেনে চলেছি। টাট্টুর ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে বসে আছে শ্রীমান ভাগ্‌তু। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত আহত বালকবীরকে

বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছিল। চাচাজী কুলু গেছেন। ঠিকে রাঁধুনি মুন্নি ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাতের রান্না সেরে নিচ্ছে হয়তো।

আমার মনে হল, শিশুরা কত সহজে তার সবটুকু ভালবাসা নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দিতে পারে। একটা মানুষকে যথাসময়ে ফিরতে না দেখে ভাগ্তুর শিশুমনটিতে যে আলোড়ন উঠেছিল, তাই তাকে নিজের অক্ষমতার কথা ভুলিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছে ঐ দূরের ভ্যালিতে। ভাঙাচোরা আবছা অন্ধকারের পথ পেরিয়ে যেতে আহত হয়েছে সে, কিন্তু প্রিয়জনের বিপদের কথা ভেবে সব যন্ত্রণা লঘু হয়ে গেছে তার।

রাতে খাবারের টেবিলে বসে খাচ্ছিলাম আমি আর ভাগ্তু।

বললাম, হ্যাঁরে ভাগ্তু তুই নাগ্গরে একা একা যেতে পারবি?

ভাগ্তু প্রবল উৎসাহে মাথা দুলিয়ে বলল, খুব যেতে পারব।

আবার বললাম, কিন্তু বাস রাস্তা থেকে যে তোর দিদির কোয়ার্টার অনেক খানি উঠে যেতে হবে, তুই পারবি কি করে?

উৎসাহে টুল থেকে নেমে ওর ঐ লাঠিখানা দেখিয়ে ভাগ্তু বলল, ঐ লাঠিতে ভর রেখে ঠিক চলে যাব।

বললাম, তুই জানিস জায়গাটা?

ও অমনি বলল, আমরা ওদিকে ভেড়ি নিয়ে গেছি। আর দিদি আমাকে সব বলে দিয়েছে। তুমি ছেড়ে দিয়ে একবার দেখই না বাবুজী।

বললাম, থাম্, আর বাহাদুরী করতে হয় না। এখন পা-টি আগে সারুক তো দেখি। তারপর দিদির কাছে যাওয়া।

ওর উৎসাহের আগুন হঠাৎ নিভে গেল।

ভাবলাম, এখুনি যেতে বললেই ভাগ্তু ঐ খোঁড়া পাখানা নিয়ে হয়ত সারারাত নাগ্গরের পথে হেঁটে চলত।

ক'দিন ছোট্ট মানালী টাউন আর তার আশ-পাশের অঞ্চল সরগরম। বম্বে থেকে এসেছে সিনেমা পার্টি। ঋতুর পালা বদলের মত সারা পাহাড়ী এলাকায় হাওয়া বদল হয়েছে। গরীব কুলিরা মালপত্র গাড়িতে ওঠানো নামানোর কাজ করে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। উঠতি বয়সের ছেলেগুলোর চোখে লেগেছে রঙ। তারা পার্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে মণিকরণ, রোটাং, কাতরেইন। ফাই-ফরমায়েস খাটছে। বিনি পয়সার মজুরী। শুধু দৃষ্টিভোগ।

মূল দলটি উঠেছে 'হোটেল বিয়াসে'। মানালীর সব থেকে কস্ট্লি হোটেল—বেননদের চারটি হোটেলের ভেতর একটি।

প্রোডিউসার ডাইরেক্টার হিরো হিরোইন রয়েছে হোটেল বিয়াসে। বাকী সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে। সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোতেও পার্টির লোকজন ঠাসা।

সকালে বাজারে সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি ক্রীম কালারের একটা গাড়ি রোটাং-এর পথে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত হিরোইন ডাইরেক্টর প্রোডিউসাররা বসে। মনে হল শুটিং-এ চলেছে। দেখলাম, নীল মাছির মত এক দঙ্গল ছেলে তাদের ড্রিমল্যান্ডের আশ্চর্য মানুষগুলোকে ঘিরে ভন ভন করছে।

সিগারেটের দোকানে ঢুকতেই দেখি মদনলাল। কয়েক প্যাকেট হাতে ধরা। একটা ছোট বাক্সজাতীয় কিছুর ভেতর প্যাকেটগুলো ভরে দিতে হবে, তাই দোকানীকে তাড়া লাগাচ্ছে। বেচারা দোকানী জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে টুঁড়ে দেখছে একটা উপযুক্ত আধার।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই মদনলালের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিয়ে বলল, নাগ্গরে দেখা হয়েছিল না?

ইংরেজীতেই বলল মদনলাল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে কুলুহী ভাষাটা আয়ত্ত করে ফেলেছি। তাই ঐ

ভাষাতেই বললাম, মনে হচ্ছে।

হর্ন বাজল পাহাড় কাঁপিয়ে। দোকানদারের উপযুক্ত আধার মেলার আগেই মদনলাল প্যাকেটগুলো সামলে ধরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

দেখলাম, ঐ সিনেমা পার্টির গাড়িতেই উঠল মদনলাল। মুখ বের করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোঁড়াগুলোকে দেশজ ভাষায় দু'একটি চোস্ত গালি দিয়ে মুখখানা আবার ঢুকিয়ে নিলে। গাড়ি চলতে শুরু করল, আর হিরো হিরোইনের ফ্যানেরা গাড়ির পেছন পেছন পাঁই পাঁই করে দৌড়তে লাগল।

ঠিক সেদিন রাত ন'টা নাগাদ একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলাম। গোলমালটা মনে হল নীচে বেননদের কোয়ার্টারের দিকে অথবা তার একটুখানি ওপরে সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোতেও হতে পারে।

এত ওপর থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম শুনে ব্যাপারটা যে ঘোরালো তা অনুমান করা যাচ্ছিল।

দেখলাম, বাগান পেরিয়ে লাঠিখানা ঠুকতে ঠুকতে সামনে এসে দাঁড়াল ভাগ্‌তু। ও বাগানের ওদিককার একখানা ঘরে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবুজী বহুৎ মারপিট চলেছে। জুলিয়েন সাহেব মেরে একজন বোম্বাইওয়ালা সাহেবের দাঁত উড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, তুই কি করে জানলি?

ভাগ্‌তু মাথা নিচু করতেই বুঝলাম, ইতিমধ্যে গোলমালের জায়গাটা ঘুরে সরেজমিনে তদন্ত করে আসা হয়েছে।

আমার তখন কোন কিছু ভাববার অবস্থা ছিল না। ব্যাগে দু একটা ওষুধ ভরে নিয়ে দৌড়লাম জুলিয়েনদের হোটেলের দিকে।

গিয়ে দেখি হোটেল বিয়াসের সামনে অনেক লোকের ভীড়। হাঁকডাক ইতিমধ্যে থেমে গেছে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে গাড়ি এসেছে। অফিসার ইনচার্জ হোটেলের বারান্দায় বসে কি যেন লিখছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মদনলাল আর একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি এক হাতে মুখ ঢেকে রেখেছেন। তাঁর মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। দূর থেকে মনে হচ্ছে কেউ যেন চুলগুলো হিঁচড়ে টেনে এলোমেলো করে দিয়েছে। একটা দরজার ওপারে কাঁধের ওপর চুল লটকে ডিপ মেরুন রঙের বেলস্‌ আর ইয়োলো টপ্‌ পরে দাঁড়িয়ে আছে হিরোইন। চোখে মুখে আতঙ্ক!

জুলিয়েন পাশের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল। দারুণ রকম উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। জুলিয়েনের বাবা মিঃ বেনন ছেলের সঙ্গে এলেন হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসারটির কাছে।

আমি কাছাকাছি যেতেই মিঃ বেননের চোখে পড়ে গেলাম। অমনি মিঃ বেনন আমার দিকে পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই যে ডক্টর মুখার্জি এসে গেছেন। ওঁকে দিয়ে চোপ্‌রা সাহেবের উণ্ডটা একটু পরীক্ষা করিয়ে নিলে হয়।

আমি পুলিশ অফিসারটিকে আগে কখনও দেখি নি। উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিশেষ দুঃখিত ডাক্তার মুখার্জী, এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে। একটু ভুল বোঝাবুঝির দরুন এই ভদ্রলোক মুখে আঘাত পেয়েছেন। আপনি যদি ওঁকে একটু পরীক্ষা করে কোন মেডিসিনের ব্যবস্থা করেন, তাহলে বড় উপকার হয়।

মিঃ বেনন আমাকে আর পেসেন্টকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গেলেন। জুলিয়েন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির কাছে।

গরম জল এল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যি ভদ্রলোক দাঁতে দারুণ রকম আঘাত পেয়েছেন। রক্ত পড়ছে তখনও। তবে দাঁতগুলো অক্ষতই আছে। নড়ে গেলেও পড়ে যায়নি।

ভাগ্‌তুর কাছে ব্যাপারটা শুনে দরকারী ওষুধ সঙ্গেই এনেছিলাম। সেগুলো সব সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

আমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে দেখি, মদনলাল পুলিশ অফিসারটিকে চুপি চুপি কি সব বলছে।

কৌতূহলী লোকেরা পুলিশের তাড়া খেয়েই হোক্ অথবা রাত দশটা বেজে যাবার জন্যেই হোক্ সব ভেগে পড়েছিল। জুলিয়েনকে কাছে-পিঠে কোথাও দেখলাম না! হিরোইন অদৃশ্য। সকালবেলার সেই রোটাংগামী গাড়ির আরোহী আরও দুটি ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদনলালের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখলাম।

আমি আর দাঁড়ালাম না। চলে আসার সময় অফিসারটিকে বললাম, আশা করছি কাল-পরশুর ভেতর একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন। আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

মদনলাল একবার হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকাল। নাগ্‌গরের সেই ট্যুরিস্ট হঠাৎ রাত দশটায় ডাক্তার হয়ে গেল কি করে, তা তার মগজে এল না।

অফিসারটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি নেমে এলাম হোটেলের কম্পাউন্ড থেকে। ওপরের রাস্তায় পড়ার আগে আধো অন্ধকারে দেখা হয়ে গেল জুলিয়েনের সঙ্গে। ক'টা মালবাহী কুলি তার পেছনে। ও থমকে দাঁড়াল আমাকে দেখে। বলল, যত রাত হোক আসছি তোমার ওখানে, দরজাটা খুলে রেখো।

জুলিয়েন চলে গেল। আমি পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে শুধু ডাক্তারের কর্তব্যটুকু করে চলে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে জুলিয়েন এল। এসেই বলল, সব ক'টাকে বিদেয় করে দিয়ে এলাম।

বললাম, আমার ডিনার রেডি। তুমি বকসিং লড়ছিলে, সুতরাং তোমার যে এখনও খাওয়া হয়নি, তা ধরে নিতে পারি। চল, খাবার টেবিলে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমরা দুজনে খেতে বসেছি। জুলিয়েন বলল, তুমি হঠাৎ ওপর থেকে নীচে হাজির হলে কি করে?

হেসে বললাম, নীচ থেকে তোমার গলা ওপরে ভেসে এল, তাই আমাকে নীচে নামতে হল।

দেখলাম, জুলিয়েনের বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ও কয়েক গ্রাস খাবার খেয়ে নিয়ে বলল, আসল ব্যাপারটা কিছু জেনেছ?

বললাম, বিশ্বাস কর, আসল নকল কিছুই জানতে পারিনি। ভাগ্‌তুর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি কার দাঁত উড়িয়ে দিয়েছ, তাই ব্যাপারটা দেখতে ছুটে গিয়েছিলাম। আর গিয়েই তোমার বাবার আদেশ পালন করলাম। লোকটা যাতে নিজের দাঁতের ওপর ভরসা রেখে আরো কিছুদিন অন্তত চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম।

জুলিয়েন গম্ভীর হয়ে বলল, একটা স্কাউড্রেল! এত বড় একটা কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

বললাম, এখন আসল ব্যাপারটা কি বল তো শুনি?

জুলিয়েন বলল, এ স্কাউড্রেলটা কদিন আমাদের হোটেলের কুক চম্বিয়ালীর পেছনে লেগেছিল। তুমি জান, হোটেল কম্পাউন্ডের বাইরের রাস্তাটার ঠিক ওপারে ওদের কোয়ার্টার। লোকটা থাকত গভর্ণমেন্ট ট্যুরিস্ট বাংলোতে। রাত দশটা নাগাদ আমাদের হোটেলে আড্ডা মেরে ফেরার পথে চম্বিয়ালীকে একবার করে জ্বালিয়ে যেত।

বললাম, ওর স্বামী নেই?

আছে বইকি, তবে তাকে আগেভাগেই ঐ লোকটা সরিয়েছে। মণিকরণের শুটিং সাইটে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছে। সেখানে ক'টি মেয়ের ছবি নিতে হবে। কাস্তে নিয়ে গম কাটছে, এমন ক'টি যুবতী মেয়ে চাই।

বললাম, তারপর?

জুলিয়েন বলল, মেয়েটা ওর স্বামীর রোজগারের কথা ভেবে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ লোকটা সোজাসুজি আমার হোটেলেই ওকে চরম প্রস্তাবটা দিয়েছে।

বললাম, তুমি জানলে কি করে?

মার কাছে চম্বিয়ালী কেঁদে বলছিল, আমি ওভারহিয়ার করলাম। তারপর যা হবার তাই হল। সবার সামনে কলার চেপে ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে স্কাউড্রেলটার মুখের ওপর একটা ছোট্ট ঘুষি লাগিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাতেই হৈ রৈ কাণ্ড বেঁধে গেল।

বললাম, ভাগ্যিস ঘুষিটা জোরে চালাও নি, তাহলে ভদ্রলোককে বোম্বে ফিরেই ফলস টিথের অর্ডার দিতে হত।

জুলিয়েন পুডিং খেতে খেতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে আবার তুমি ভদ্রলোক বলছ!

বললাম, জুলিয়েন, পুলিশ দেখলাম যে। ওদের কে খবর দিয়ে আনল?

ও বলল, ট্যুরিস্ট বাংলোর ঐ মদনলাল নির্ঘাৎ খবর দিয়ে থাকবে। ও ব্যাটা চেয়েছিল আমার এগেনস্টে ডায়েরী করতে, কিন্তু জানে না, কোর্টে চম্বিয়ালীকে দাঁড় করালে ম্যানেজারের বোম্বে ফেরা ঘুচে যেত। পুলিশ অফিসারকে ও ব্রাইব করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু চম্বিয়ালীকে হাত করতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে জেনে ওরা আর এগোতে চেষ্টা করেনি।

তোমার বাবা কি বলেন?

জুলিয়েন হেসে বলল, বাবা তাঁর পুত্রকে বিলক্ষণ চেনেন। তাই আমার কাজে বাধা দেননি। ল্যাঠা চুকে গেলে শুধু বললেন, আমরা ব্যবসায়ী, কেবল এটুকু কথা মনে রেখ।

এত রাতে কোথায় নির্বাসন দিলে ওদের?

জুলিয়েন বলল, মদনলালই মাথায় করে নিয়ে গেল ট্যুরিস্ট বাংলোতে।

বললাম, মদনলাল লোকটা নাগ্‌গরে ট্যুরিস্ট বাংলোতে থাকে বলে জানতাম, ও আবার এখানে এলো কি করতে?

জুলিয়েন বলল, সরকারী অফিসে ওর দারুণ খুঁটির জোর। ও সুযোগ বুঝে ওর কর্মক্ষেত্র পালটে নেয়।

লোকটাকে দেখলেই মনে হয় ধুরন্ধর।

জুলিয়েন বলল, ওর সঙ্গে আগে একবার আমার ডুয়েল লড়া হয়ে গেছে।

সকৌতুকে বললাম, কি রকম?

জুলিয়েন বলল, একবার অক্টোবরে দুটো কলেজের ছেলে দিল্লী থেকে বেড়াতে এসে বিপদে পড়ে যায়। কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে আমার এখানে আসে। কিন্তু তুমি জানো, 'হোটেল বিয়াস' বেশ কস্টলি। ওতে ঘর ছিল ঠিক কিন্তু ঐ দুটি কলেজ বন্ধুর থাকবার মত রেস্ত ছিল না। আমি হয়ত ওদের ঘর দিতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আমাকে হোটেলের নিয়ম ভাঙতে হয়। তাই একটু মুশকিলেই পড়ে গেলাম।

বললাম, সে তো ঠিক।

জুলিয়েন বলল, তারপর শোন। ওদের নিয়ে গেলাম মদনলালের কাছে। মদনলাল স্রেফ বলে দিল, নো ভেকেন্সি। তখন নিজের আইন নিজে ভেঙে ওদের চার দিন রাখলাম। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম, মদনলালের হাতে একাধিক ঘর খালি আছে। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। বেআইনী হলেও ওর অফিসের খাতা টেনে নিয়ে দেখলাম, ঘর খালি। ওর চোখের ওপর তুলে ধরে বললাম, সরকার বাহাদুর নিশ্চয় তোমাকে এই ট্যুরিস্ট বাংলো নিয়ে ব্যবসা চালাতে বলেন নি।

ও অপমানিত হল, কিন্তু আমাকে জানে বলে কথা বাড়াবার সাহস করল না।

বললাম, ছেলে দুটোকে জায়গা না দেবার কারণ কি থাকতে পারে জুলিয়েন? ওদের কাছ থেকেও তো টাকা পেত।

জুলিয়েন বলল, ব্যাপারটা তা নয়। দু'বছর আগে আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম রূঢ়ভাবে, তাই রাগ।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, প্রস্তাবটা কি?

জুলিয়েন বলল, সরকারী বাংলোতে স্থান নেই জানিয়ে বিভিন্ন শাঁসালো পার্টিকে মদনলাল আমার হোটেলগুলোতে এনে তুলবে আর মোটা কমিশন লুটবে। ওর এই লোভনীয় প্রস্তাবটি আমার মত নির্বোধ নিতে পারেনি, তাই প্রতিশোধ।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে অনেকখানি রাত হয়ে গেল।

বললাম, এত রাত্তিরে নীচে নেমে আর কাজ নেই, এখানেই শুয়ে পড়।

জুলিয়েন বলল, অনেক রাতে ঘুম না এলে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে মুখার্জী।

বললাম, বিয়ে করলেই ঘুম এসে যাবে।

জুলিয়েন বাগানে লাফ দিয়ে নামল। চলে যেতে যেতে বলল, যেমন আজকাল তোমার ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জী।

জুলিয়েন চলে গেল, আমার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। আমি বিছানার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝিন্নিকে চিঠি লিখতে বসলাম। জুলিয়েন আমাকে এই মুহূর্তে ঝিন্নির কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি চিঠি লিখছি। এ চিঠি নিয়ে চারখানা লেখা হল ঝিন্নিকে, কিন্তু একছত্র লেখাও ওদিক থেকে আসেনি। কুলু থেকে আসার সময় ঝিন্নি বলে দিয়েছিল, চাচাজী তোমার কাছে থাকবেন, আমি এখন মরে গেলেও তোমাকে চিঠি লিখতে পারব না। আমার হাতের লেখা ওঁর চোখে পড়লে ভীষণ খারাপ লাগবে। তুমি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অন্তত একখানা করে চিঠি আমার নামে নাগ্‌গরে পাঠাবে।

বলেছিলাম, চমৎকার! নিজের পাওনাটা বুঝে নিচ্ছ কড়ায় গণ্ডায় আর আমার বেলা টুঁ টুঁ।

ও অমনি বলেছিল, চাচাজী ফসল তোলার জন্যে মাসখানেক বাদেই কুলুতে ফিরে আসবেন। এখানে থাকবেন পুরো দুটি মাস। সে সময় সুদে আসলে তোমার পাওনাগুলো চুকিয়ে দেব। সব চিঠির জবাবই আমার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে থাকবে, তুমি কেবল একসঙ্গে পাবে সেগুলো।

চাচাজী চলে যাবার পরই আমি নাগ্‌গরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ঝিন্নিকে। দু-এক দিনের ভেতরেই ওর অনেকগুলো চিঠি একসঙ্গে আশা করছি। কিন্তু আজ আবার লিখতে ইচ্ছে করল। তাও এই রাত জেগে।

জুলিয়েনের আজকের ঘটনার কোন উল্লেখ করলাম না। কিন্তু ওর শেষ কথাটির উল্লেখ না করে পারলাম না।

অনেক আদরের ঝিন্নি!

এখন রাত শেষের ভাঙা চাঁদটা বাগানের পাইন গাছের শাখায় খেলনার একটা পেতলের নৌকার মত বাঁধা পড়ে আছে। এখুনি জুলিয়েন রাতের আড্‌ডা শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে গেল। ওকে আমার এখানে থেকে যেতে বলছিলাম। ও বলল, রাতে ওর নাকি ঘুম না এলে নদীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।

আমি ওকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলাম, ঘুমের ওষুধ হিসাবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে কি জবাব দিল জান, তোমার যেমন আজকাল ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জী।

ও চলে যাবার পর আমার কিন্তু আর ঘুম এল না। কলম নিয়ে কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটতে বসে গেলাম।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাতগুলো তোমার কাটছে কেমন? ক্ষীণ চাঁদটা হয়ত তোমার জানালার বাইরে আপেল গাছটার ডালে এখন আটকে আছে। ঐ চাঁদটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছে, আমরা কত কাছে রয়েছি।

তোমার কোয়ার্টারের পাশের ঐ আপেল গাছটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম চাচাজীকে। চাচাজী আশ্চর্য একটি নাম শোনালেন। কি নাম বল তো? বলতে পারলে না তো! তবে শোন, 'অ্যাডামস অ্যাপেল'।

আসলে কিন্তু অ্যাডামস অ্যাপেল বলে কোন আপেলের নাম নেই। ওটা গলার সামনে লারিংস-এর যে প্রোজেকসান থাকে তারই নাম। তবে প্রবাদে আছে, আদি মানবের গলার ঐখানে নাকি ইভের দেওয়া আপেলের একটি টুকরো আটকে গিয়েছিল। তাই ও জায়গার ঐ নাম হয়েছে। চাচাজীকে প্রশ্ন

করে জানলাম, রোয়েরিক গ্যালারীর ঐ জায়গাটা নাকি আগে এক ইংরেজের ছিল। আপেল গাছটির নাম তাঁরই দেওয়া।

এবার শোন, তোমার ইচ্ছাগুলো দেখছি পূর্ণ হতে চলেছে, অবশ্য ধীরে ধীরে। রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। বেলা এগারটা অব্দি চেম্বারে রোগী দেখি। তারপর স্নান ভোজন সেরে খানিক সময় বিশ্রাম নিতে না নিতেই ভোগীর দল আসে। না, না, রোগী নয়, ভোগী। পাহাড়ীদের বাচ্চাগুলো দল বেঁধে বাগানের ওপার থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভাগ্‌তু দাদার সঙ্গে ভাব জমায়। এক সময় ভাগ্‌তু ওদের মুখপাত্র হয়ে আসে আমার কাছে। ওদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। আমার কাছ থেকে গ্রীন সিগনাল পেলেই ভাগ্‌তু হাতছানি দেয়, আর অমনি লিলিপুট ব্যাটেলিয়ান দৌড়ে আসে বাংলোর দাওয়ায়।

ওদের জন্যে জমা থাকে লজেন্স, ট্রফি, চিক্‌লেট। ভাগ্‌তু একটি একটি করে বিতরণ করে যায়। ওরা একটুও গোল করে না তখন। অসীম ধৈর্যে হাত পেতে রাখে। সে সময় তুমি যদি ওদের মুখের চেহারা দেখতে তাহলে মনে হত, মুঠো মুঠো ভোরের মিঠে রোদ যেন লুটোপুটি করছে তোমার বাগানে।

এদিকে ভাগ্‌তু নাগ্‌গরে যাবার জন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মুখ থেকে স্টার্ট কথাটা খসার যা অপেক্ষা।

দেখ শ্রীমতী ঝিন্নি, আমি রাত জেগে জেগে কঠোর তপস্যা করে প্রেমিকাকে চিঠি লিখছি আর তুমি দিব্যি টেনে টেনে ঘুম দিচ্ছ। তাই মনে হচ্ছে জুলিয়েন কথাটা আমাকে না বলে তোমাকে বললেই ঠিক মানাতো।

তোমার ছোটেসাহেব।

পুনশ্চ : এরপর তোমার চিঠি না এলে এদিকের কোন চিঠি নিয়ে নাগ্‌গরে আর ডাকপিয়ন উঠবে না।

পরের দিনই চিঠি এল। ঝিন্নির হাতে ঠিকানা লেখা খাম। অনেকগুলো টিকিট সাঁটা, অনেক ভারী চিঠি। আমি রোগী দেখছিলাম তখন। পিয়নের হাত থেকে খামখানা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিলাম।

রোগী দেখে চলেছি তো চলেইছি। আজ কেন জানি না মনে হতে লাগল যে কটি রোগী দেখেছি তারা আমার একটি প্রেসক্রিপশানেই ভালো হয়ে যাবে।

গভীর একটা বিশ্বাস আমার সমস্ত চেতনার ভেতর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি জন্ম নিল আমার মনের মধ্যে। মনে হল, ঝিন্নি আমার পাশেই রয়েছে। আমার প্রতিটি কাজ সে নিবিড় ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

আজ রোগী দেখতে গিয়ে অন্যদিনের চেয়ে সময় কিছুটা বেশী লাগল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারোটার ঘর ছুঁইছুঁই, শেষ রোগীটি ডাক্তারকে ছুটি দিয়ে নমস্কার জানিয়ে নেমে গেল।

আমার একি হল! আমি সেই মুহূর্তে কিছুতেই ঝিন্নির খামখানা খুলতে পারলাম না। সুন্দর একগুচ্ছ ফুলকে যেমন নোংরা জামা কাপড় পরা থাকলে ধরতে ইচ্ছে করে না, আমিও তেমনি সারাদিনের গ্লানি ধুয়ে মুছে না ফেলা পর্যন্ত ঝিন্নির চিঠিগুলো খুলতে পারলাম না। চিঠির খামখানা নিয়ে বিছানায় বালিশের তলায় রেখে আমি স্নান সেরে নিতে গেলাম।

স্নানের ঘরে নিজের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম · কি ডাক্তারী শিখলে এতদিন পুষ্করবাবু? একটা হৃদয় অনেক দূরে থেকেও আর একটা হৃদয়কে ছুঁয়ে গেলে কেন সারা বুকখানা জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়? কেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় আচার আচরণগুলো, বলতো দেখি? এর কি ব্যাখ্যা দেবে তোমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্র? ডক্টর বার্নার্ড, আপনি তো হার্টের বিশ্ববিশ্রুত সার্জন, কিছু হদিস পেয়েছেন কি এসব হৃদয়ঘটিত প্রশ্নের?

জল ঢালতে গিয়ে হঠাৎ গান এল গলায়—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

কয়েক মগ জল হুড়হুড় করে মাথায় ঢেলে তাড়াতাড়ি তোয়ালেতে গা মুছে বেরিয়ে এলাম।

খাবার টেবিলে কখন বসলাম আর কখন উঠলাম তা বুঝতে পারলাম না। ভাগ্‌তু তার বাবুজীর ক্রিয়াকলাপগুলো ছোট্ট মাথাখানা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। আবার দরজা খুলে ভাগ্‌তুর নাম ধরে জোরে ডাক পাড়লাম। ভাগ্‌তু কাছে এলে বললাম, শোন, তুই একবার বাজারে যেতে পারবি?

ভাগ্‌তু মহা খুশি। এতদিন সে নিজে গেছে লুকিয়ে চুরিয়ে, কিন্তু আজ কি সৌভাগ্য তার, বাবুজী নিজের মুখে আদেশ জারি করছে।

ভাগ্‌তু তার ডান কাঁধে বার তিনেক কান আর মাথা ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ভাবখানা এই, সে যাবার জন্যে তৈরি।

বললাম, এই নিয়ে যা টাকা। লাডড়ু কিনে আন। ছেলেগুলো এলে তাদের আজ লাডডু খাওয়াবি। আর শোন, তোর ঘরে ওদের খেতে দিবি, তারপর সবাই মিলে বাগানে খেলা করবি।

ভাগ্‌তু টাকা নিয়ে ক্র্যাচ বগলে গুঁজে বেরিয়ে গেল। বাগানের বাইরে গাছের আড়ালে গিয়ে সে একটা হাঁক দিলে। বুঝলাম, এতদিনে সে নিজেকে মুক্তপুরুষ বলে মনে করছে। এবার থেকে তার আর চুরি করে বাইরে যেতে হবে না।

এবার ঘর বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। বালিশের তলা থেকে খামখানা বের করে ছিঁড়ে ফেলতেই বেশ ক'খানা চিঠি বেরিয়ে এল।

ঝিন্নি প্রতিটি চিঠির মাথায় তারিখ লিখে রেখেছে। দিন রাত্রির কোন বিশেষ বিশেষ লগ্নে সেগুলো লেখা হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

চিঠিগুলো সাজিয়ে নিলাম পর পর তারিখ অনুযায়ী। ঝক্‌ঝকে সাদা কাগজগুলোর কোণায় রং তুলি আর পেনের আঁচড়ে ছোট ছোট ছবি আঁকা হয়েছে।

ছবিগুলো আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ লেখার ছত্রে চোখ পড়তেই মনে হল, প্রতিটি ছবির সঙ্গে চিঠির ভাষার মিল আছে।

প্রথম চিঠিতে ঝিন্নি একটা পিঙ্ক ফুলেভরা আপেলের ডাল এঁকেছে।

চিঠি শুরু হয়েছে :

আমার ছোটেসাহেব।

আজ সকালবেলা কি দুষ্টুমি শুরু করলে তুমি। উঠোনে নেমেই দেখি, তোমার গার্ডেন অব ইডেনের সেই আপেল গাছটা একরাশ ফুল ফুটিয়ে ফিক্ ফিক্ হাসছে। নাগাল যদি পেতাম, তাহলে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে দিতাম। ঐ ডাল থেকেই তো তুমি গার্ডেন অব ইডেনের শেষ আপেলটি উপহার দিয়েছিলে একটি মেয়েকে।

তুমি লিখেছ, তোমার ঠাসা দিনগুলো কেটে যাচ্ছে কাজের ভেতর। আমার কিন্তু অলস অবসরগুলো শুধু একটি ছেলের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়।

যখন তুমি আসনি, তখন দিব্যি একরকম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘরের কাজগুলো গুছিয়ে তুলতেই ফুরিয়ে যেত আমার সময়। এখন সব কাজ এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে আমার দিকে চেয়ে। প্রয়োজনে অনিচ্ছায় কোনক্রমে সেগুলিকে সেরে তুলি। তুমি কোথা থেকে ডেকে আনলে একটা ঝড়ের হাওয়া। আমার সবকিছু উড়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

জান ছোটেসাহেব, ভালবাসতে খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু ভালবাসার ভার বইতে বুক ভেঙে যায়। রাতে যখন বিছানায় শুয়ে থাকি তখন ঘুম আসে না চোখে। কেবল মনে পড়ে যায় তোমার হাজারো রকমের আদরের ছবিগুলো। কত দুষ্টুমির খেলা খেলতে তুমি। কত ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা আসত তোমার মাথায়। কেউ যে আর একটি দেহকে নিয়ে খেলতে গিয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে, তা

তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত কোনদিন জানতে পারতাম না।

অনেক সময় মনে হয় তুমি কতকিছু চেয়েছিলে আমার কাছে, কিন্তু আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারিনি। সে দুঃখ যে আমারও ছোটেসাহেব।

আজকাল আমার কেবলই মনে হয় কুলুর সেই শেষ রাতটার কথা। তুমি কেমন আমার কোলটিতে মাথা রাখতে চাইলে। আমি সারা রাত কাটিয়ে দিলাম তোমার মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে।

তোমার অনেক আদরের ঝিন্নি।

পরের চিঠিখানা John Dryden-এর একটি উক্তি দিয়ে শুরু :

'Pains of love be sweeter far than all other pleasures are.'

এ পাতাতেও একটি ছবি। সেই ফুলেরই ছবি। বড় বড় পাতা হাওয়ায় ভাসিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ আকাশ-নীল রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়ে জেগে আছে 'ফরগেট মি নট'।

ঝিন্নি লিখেছে : ছোটেসাহেব, আমার কুহলের ধারে গরমের হাওয়া লেগে ফুটেছে 'ফরগেট মি নট' ফুলগুলো।

শুনেছিলাম, কোন এক নাইটের মনোরমা স্ত্রী তাঁর এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি স্রোতধারার কাছে ঐ লোভনীয় ফুলগুলো দেখে তিনি তাঁর রক্ষীটিকে পাঠালেন একগুচ্ছ ফুল তুলে আনবার জন্য। দেহরক্ষীটি মনে মনে ভালবাসত তার প্রভুপত্নীটিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ফুল তুলে আনতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, ফুল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল স্রোতের ভেতর। সাঁতার জানে না, তাই সে তলিয়ে যেতে লাগল জলের গভীরে। শেষবারের মত মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে সে বলে উঠল, 'ফরগেট মি নট'।

সেই থেকে ফুলটির নাকি ঐ নাম হয়েছে।

জান ছোটেসাহেব, এই ফরগেট মি নট নামটির ভেতর কোথায় যেন কারো মনের মধ্যে বেঁচে থাকার করুণ একটা আবেদন আছে।

তোমার আদরের ঝিন্নি।

একটি একটি করে সবগুলো চিঠি ওর পড়লাম। চিঠি পড়ে মনে হল, ভালবাসার বর্ষা বসন্ত পাশাপাশি ছুঁয়ে আছে ওর বুকখানা। ওর মনের সেতার এমন করে বাঁধা, যাতে একটুখানি ছোঁয়া লাগলেই বেজে ওঠে।

জানালার বাইরে অন্যমনস্ক চোখ গিয়ে পড়তেই দেখি, হাল্কা নরম ডালের মাথায় ঝুলছে ব্লু-বেল ফুলগুলো। অবিরাম দুলে দুলে ঘণ্টাকৃতি ফুলগুলো যেন একান্ত কোন অন্তরঙ্গজনের আসার কথাটি ঘোষণা করে চলেছে।

ছেলেদের হুড়োহুড়ি কলরব শোনা যাচ্ছে। আজ ওদের খুশিটা যেন উপচে উঠেছে। ওরা কেউ আসছে না এদিকে। ভাগ্‌তু ওদের বাগানের ওপারে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এলো একজন, যাকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা ভাগ্‌তুর ছিল না। আর ঘরের মালিকেরও নিশ্চয়ই তা নেই।

জুলিয়েন, ডাক্তার, ডাক্তার ডাক দিতে দিতে বাগান পেরিয়ে এসে উঠল দাওয়ায়। আমি ঘরের দরজা খুলে ওর সামনে এসে দাঁড়াতেই ও অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি হাসছি দেখে সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বলল, দুপুরে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলে, কি ব্যাপার বলতো ডাক্তার। নিশ্চয় কোন সঙ্গিনী ভেতরে রয়েছে।

আমি জুলিয়েনের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম।

খুঁজে দেখ, আমার সুইট হার্ট-কে দেখতে পাও কিনা।

জুলিয়েনের চোখ বিছানার ওপর ছড়ানো চিঠিগুলোতে আটকে গেল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছি ডাক্তার।

হেসে বললাম, আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণশক্তি। সঙ্গিনী দেখবে বলে ঘরে ঢুকলে, এখন বলছ ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছি।

জুলিয়েন হা হা করে হেসে উঠল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আমি প্রেমে পড়ি নি বলে কি প্রেমের গন্ধও আমার নাকে এসে লাগবে না!

Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

ওর হাত ধরে বিছানার ওপর বসালাম। তারপর একটি একটি করে ঝিন্নির সবকটা চিঠি ওকে পড়ে শোনালাম।

জুলিয়েন গালে হাত রেখে শুনছিল। চিঠি পড়া হয়ে গেলে ওর দিকে চাইলাম। জুলিয়েন মনে হল তন্ময় হয়ে শুনছিল। ওর ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল।

একসময় জুলিয়েন বলল, চিঠিগুলো আয়নার মত একটি মনের আসল চেহারাখানা ধরে রেখেছে।

একটু থেমে একেবারে অন্য সুরে বলল, এখন বল তো দেখি ডাক্তারসাব, মেয়েটিকে কবে এখানে আনছ? চাচাজীর কাছে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।

বললাম, সবেমাত্র শুরু হয়েছে দুজনের জানাজানি। তৃতীয় আর একজন এখন জেনে ফেলেছে, সে আমার পাশেই বসে। চাচাজীকে বলতে সুযোগ চাই। কারণ লোকাপবাদের ভয় তাঁর বড় বেশি। চাচাজীর যদি মনে হয়, আমাদের বিয়ে হলে লোকে বলবে, নরসিংলাল মালিকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাজ হাঁসিল করল, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাবে। তাই ঝিন্নির কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া অব্দি চাচাজীর কাছে ব্যাপারটা একেবারেই প্রকাশ করা যাবে না।

জুলিয়েন বলল, এ তো আবার এক ফ্যাসাদ। দেহে মনে মিলে গেল, হাত ধরাধরি করে চলে এলাম, তা নয়। ফাদার, মাদার, গ্র্যান্ড ফাদার-মাদারদের জিজ্ঞেস কর। তাঁরা কৃপা করে অনুমতি দিলেন—ভাল, না হয় বুক চাপড়ে মর।

বললাম, ঝিন্নি তার পিতাজীকে শুধু ভালবাসে না, মা মারা যাবার পর গভীর একটা টানেও জড়িয়ে পড়েছে। তাই পিতাজীকে অস্বীকার করে চলে আসা ওর পক্ষে খুব সহজ নয়।

জুলিয়েন অধীর হয়ে বলল, এ সব যদি জানতে মুখার্জী তাহলে ভালবাসতে গেলে কেন?

হেসে বললাম, Love really has nothing to do with wisdom or experience or logic It is the prevailing breeze in the land of youth.

জুলিয়েন বলল, দারুণ একখানা কথা বলেছ তো মুখার্জী। ভালবাসাটা তারুণ্যের ধর্ম বলেই দুজনে দুজনকে ভালবাসে। যুক্তিতর্কের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই জুলিয়েন। ঝিন্নি এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব নিজের ওপরেই তুলে নিয়েছে।

জুলিয়েন যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, কি হল, এখুনি চলে যাচ্ছ?

জুলিয়েন বলল, হোটেল ছেড়ে একটি ফ্যামিলি আজ যাচ্ছে কুলুর ডাকবাংলোতে। চারটেতে ওদের গাড়ি। হিসেবগুলো বুঝে নিতে হবে।

জুলিয়েন বেরিয়ে গেল। আমি জুলিয়েনের মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম। নিজের পছন্দমাফিক কাজ করে জুলিয়েন। প্রকৃতিতে অর্ধ যাযাবর। দুনিয়ায় কারো তোয়াক্কা রাখে না, নিজের বিপদ হতে পারে জেনেও নয়। বন্ধুত্বের টান তার কাছে প্রবল ও অকৃত্রিম।

ভাগ্‌তু এসে দাঁড়াল সামনে। বললাম, কি খবর?

ও বলল, দোঠো লাড্ডু বেশি হয়ে গেছে বাবুজী।

বললাম, ও দুটো ভাগ্‌তুরাম খাবে।

ভাগ্‌তুর মুখে খুশি ঝলকে উঠল।

পাহাড়ী ছেলেবুড়ো সবাই দেখেছি, বড় সৎ আর বিশ্বাসী। ও দুটো লাড্ডু ভাগ্‌তু নির্বিকার মুখে

পুরে হজম করে ফেলতে পারত। কিন্তু যা তার প্রাপ্য নয় তাকে অগোচরে নিয়ে নিতে কোথায় যেন তার স্বভাবধর্মে বেধেছে।

বিকেল চারটে নাগাদ বেড়াতে বেরোলাম টাট্টুতে চড়ে। ক'দিন বেরোন হয় নি। আজ ভেতরের তাগিদেই বেরোতে হল। পকেটে ঝিন্নির চিঠিগুলো পুরে নিয়ে চলেছি। নির্জনে বসে পড়ব। চিঠি নয় এগুলো, একটা মন তার সব দুঃখ সুখ তৃপ্তি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বাঁধা পড়ে আছে এই চিঠির ভেতর। উপকথার পাথরপুরীর অন্তঃপুরে পাথরের মূর্তি হয়ে থাকা মেয়েটির মত। আর একটা মনের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙবে তার। অমনি ভোরের রোদের মত হেসে উঠবে সে। বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ টপ করে ঝরাবে কান্না। আর বাদল দিনের ফোটা কদমের মত শিউরে শিউরে উঠবে তার প্রিয়-মিলন সমুৎসুক দেহ।

টাট্টুটা প্রায় খাড়া পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাটা ধরে অবলীলায় নেমে এল ভ্যালিতে। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির নিশ্চিত। দুর্গম পথে ওরাই যথার্থ ভয়কে জয় করেছে। চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে এই প্রাণীগুলোর পদস্খলন হয়েছে এমন খবর কোন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখেও শোনা যাবে না।

আজ ভ্যালির বুকে ছোট স্রোতধারাটি পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল দুটি ছোট ছেলেমেয়ে গাছের আড়ালে বসে কি যেন করছে। জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখি, দুটিতে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরছে।

কাছে গিয়ে বললাম, কি মাছ ধরলে?

বছর আটেকের মেয়েটি ভারী মিষ্টি দেখতে, অমনি মুখে আঙুল রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

নিবিষ্টচিত্ত বছর বারো বয়সের বীর শিকারীটি দেখতে না দেখতে একটি কুনি মাছ গেঁথে তুলল বঁড়শিতে।

এতক্ষণে মেয়েটি তার মাছের সঞ্চয় আমাকে দেখাতে লাগল। গুটিকয় গুলগুলি আর দুটি মাত্র মোরি মাছ ধরা পড়েছে। ঐ ক'টি মাছ নিয়ে মেয়েটির গর্বের যেন আর শেষ নেই। সে তার দাদাটির দিকে আঙুল তুলে বারবার দেখাতে লাগল।

ছোট্ট দাদাটি কিন্তু নির্বিকার। সে তার শিকার সন্ধানে তখনও অনন্যমনা।

বেশি কথা বলে ক্ষুদে শিকারী দুটির নিবিষ্টতা নষ্ট না করে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে এসে টাট্টুটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেখে বসলাম পাথরখানার ওপর।

কিন্তু বসেই মনে হল, ওপরের গম ভাঙানো চাকীর আওয়াজ পাচ্ছি না কেন!

আকাশে তখনও আলোর ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যায় নি। স্বাভাবিক কৌতূহলে ওপরের দিকে চাইলাম। চাকী ঘরে দেখি মেয়েটি কুলুপ লাগাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে গমের ব্যাগ মাথায় আর একটি মেয়ে। ওদের দুজনের কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আমি আবার ভ্যালির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। এত আলো থাকতে কোনদিনই এখানে আসি নি। আজ যে সব কিছুই ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে। বাঁদিকে পীর পাঞ্জালের পাহাড়টা তাব বরফের সাদা চাদরখানা অনেক ওপরে তুলে নিয়েছে। নীচে পোড়া ঝামার মত পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে বার্চ-এর বিচ্ছিন্ন সারি।

নীচের সেই ছোট্ট স্রোতধারাটির দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো যেন সীমাহীন জ্যোতিতে ভরে গেল। জলের তরল দেহের একটা অংশ লক্ষ্য করে আকাশ থেকে কেউ যেন ছুঁড়ছে ঝাঁক ঝাঁক রূপোলী তীর, ঝিলিক মেরে উঠছে রুপোলী তীরের ঝকঝকে ফলাগুলো। আশ্চর্য এক চোখের উৎসব।

বাবুজী, আপনি একা একা এখানে বসে?

চমকে নদীর জলের থেকে চোখ তুলে চাইলাম, আমার পাশে দাঁড়ান মেয়েটির মুখের দিকে।

আরে তুমি, কি ব্যাপার? গম ভাঙাতে এসেছিলে বুঝি?

মেয়েটি মাথার ব্যাগটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, হাঁ বাবুজী, তবে আজ ভাঙানো হল না।

বললাম, কেন বল তো? আজ দেখলাম চাকী ঘরের ঐ মেয়েটি কুলুপ এঁটে সকাল সকাল চলে গেল।

কম্পাউন্ডারবাবুর মুখে সে সময় এই মেয়েটির কি যেন একটা নাম শুনেছিলাম, অনেক চেষ্টায় সেটা মনে আনতে পারলাম না।

মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, আকাশে আজ ইল্ পাখি উড়ছে দেখছেন না!

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা চিল প্রসারিত ডানায় রোদ্দুরের সোনা মেখে ভ্যালির ওপর চক্কর দিয়ে ঘুরছে। কে যেন একটা সোনালী ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আকাশে।

বললাম, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ও বলল, আজ শুক্রবার, এমনিতেই 'গাল লাগ্‌দি', ভায়েদের বিপদের দিন, তার ওপর ঐ অশুভ ইল্ পাখিটা টিকার ঘরে ঘরে ওর ছায়া ফেলে ফেলে উড়ছে।

বললাম, আজকের দিনটা বুঝি ভায়েদের পক্ষে অশুভ ?

ও সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের এলোচুল দেখিয়ে বলল, আজ চুল বাঁধতে নেই। এলো চুলেই রয়েছি।

ওর সংস্কার দূর করার কোন চেষ্টাই করলাম না। সীমান্ত অঞ্চলে পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক ভাইটিব মঙ্গলের জন্যে মেয়েটি তার রেশমের মত নরম বাদামী চুলগুলোকে খোলা রাখে রাখুক।

শুধু বললাম, আজ ইল্ উড়ছে, তাই বুঝি ঐ চাকী ঘরের মেয়েটিও চলে গেল তাড়াতাড়ি ?

ও বলল, আজ বড় কেউ একটা আসবে না, তাই আর বসে থেকে কি করবে। তালা বন্ধ করে চলে গেল। তাছাড়া ইল্ দেখার পর ও নিজেও আর কাজ করতে চাইছে না।

অন্য কথা পাড়লাম, তোমার পিতাজী কেমন অছেন বালু?

হঠাৎ করে ওর নামটা মনে এসে গেল।

মেয়েটি বলল, এখন কিছুটা ভাল আছেন বাবুজী। তবে হাঁটাহাঁটি আর করতে পারেন না।

বললাম, আচ্ছা একদিন পণ্ডিতজীকে দেখে আসব।

বালু হঠাৎ করে বলে বসল, বাবুজী এই টিকা থেকে আমার বাড়ী খুব কাছে। আপনি শহর ঘুরে যান তাই দূর মনে হয়। আজ দয়া করে আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

দেখলাম, কথাটা বলে ফেলেই বালু কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যাখ্যানেব কথা ভেবে হয়তো লজ্জায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

বালুকে এমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোদ্দুরের জলে স্নান করতে কোনদিন দেখি নি। ওর আঠাবো উনিশটি বসন্তের ছোঁয়া লাগা মুখখানা বড় সুন্দর, কিন্তু লজ্জা-সংকোচের ছোঁয়ায় সে মুখ অসাধাবণ হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বেড়াতে বেরিয়েছি, এখন কাজ তো কিছু নেই, চল দেখা করে আসা যাক্ তোমার পিতাজীর সঙ্গে।

বালুর মুখ থেকে লজ্জার লাল আভাটুকু মিলিয়ে গেল। খুশির ঝিলিক লাগল চোখে মুখে।

বালু চলেছে আগে আগে টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে, পেছন সরু ভাঙাচোরা পাহাড়ী পথে ওকে অনুসরণ করে চলেছি আমি।

কিছু পথ ওপরে উঠে টিকার শেষ। ওপারের পাহাড়টার সঙ্গে এপারের পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ শৈলশিরার মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। বালু অবলীলায় পেরিয়ে গেল। নির্ভীক টাট্টু তার পেছন পেছন ঠিক চলে গেল। আমি কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে পার হলাম। নীচের খাদের দিকে তাকালে এটুকু পথ পার হওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। ভ্যালির ওপর যে বিরাট বিরাট পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন এক একটি.অন্ধ দৈত্য। কোন জীবন ওপর থেকে পিছলে তার ঘাড়ে পড়লেই সে মুহূর্তে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

একটা পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম।

আমি এই পাহাড়েব পথ ধবে ভ্যালি পেরিয়ে বাজার ঘুরে যাতায়াত করতাম পণ্ডিতজীর অসুখেব সময়। বালুদের ছোট্ট ঘবের কাছে পিঠে কোন বাড়ি নেই।

ওপরে তাকিয়ে দেখি উঠোনে সোনালী গম বিছানো রয়েছে। বালু আগে উঠে টাট্টুকে বেঁধে ফেলল একটা পাঙাড় গাছের কান্ডের সঙ্গে। আমি উঠোনে উঠেই শুনতে পেলাম তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে কেউ যেন কিছু পাঠ করছেন। মনে হল পণ্ডিতজীই হবেন।

বালু ঘরের দাওয়ায় তাড়াতাড়ি একখানা পুরানো থোবি পেতে দিল। আমাকে তার ওপর বসতে বলতেই আমি বললাম, বসছি, কিন্তু তুমি এখন ঘরের ভেতর যেও না। আমি বাইরে বসে তোমার পিতাজীর পাঠ শুনব।

বালু আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। সে বোধহয় ডাক্তার মানুষটির খেয়ালীপনায় একটু অবাকই হচ্ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছাকে এড়িয়ে য'বার কোন উপায়ই ছিল না তার।

আমার মাসীদের বাড়ির পাশে থাকত এক রাজস্থানী দোকানদার। রোজ ভোর চারটেতে সেই মানুষটি রামচরিত মানস থেকে কিছু অংশ পাঠ করত। প্রথম প্রথম ভোরবেলাকার ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে উঠলেও পরে রামায়ণ শোনাটা একরকম যেন নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ অনেকগুলো দিনের পবে রামায়ণ-কথা শুনতে পেয়ে মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পণ্ডিতজী পাঠ করে চলেছিলেন :

মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ।
প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ॥
সাসু সসুর গুরু সজন সহাঈ।
সুত সুন্দর সুসীল সুখদাই॥
জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে।
প্রিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে॥
তনু ধনু ধামু ধরনি পুররাজু।
পতিবিহীন সবু সোক সমাজু॥
ভোগ রোগ সম ভূষণ ভারু।
যম জাতনা সরিস সংসারু॥
প্রাণনাথ তুম্‌হ বিনু জগ মাহী।
মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কিছু নাহীঁ॥
জিয়া বিনু দেহ নদী বিনু বারী।
তৈ সিতা নাথ পুরুষ বিনু নারী॥
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্‌হারেঁ।
সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ॥

এবার পণ্ডিতজী নারীর কাছে পতির মাহাত্ম্য সুন্দর কুলুহী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সীতা বনে যেতে চান, কিন্তু রাজবধূর বনবাস যাত্রায় সবাই বাধা দিতে লাগলো। তখন সীতা বললেন, মাতাপিতা গুরু পুত্র পরিজন কাছে থাকলেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের কোন কিছুই ভাল লাগে না। ঐশ্বর্য ধন বাজ্য দেহধর্ম ঘর সবকিছুই পতিহীনার কাছে পীড়াদায়ক। একমাত্র স্বামীই নারীকে দিতে পারে সুখ। দেহ থেকে প্রাণ ছেড়ে গেলে কিংবা নদী থেকে জল শুষ্ক হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, পতিহীনা নাবীব অবস্থা ঠিক তাই।

আর বেশিক্ষণ বোধহয় বালুকে এমনি চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না ভেবে বললাম, বালু তোমার পিতাজী রোজ এ সময় বুঝি রামচরিত মানস থেকে পাঠ করেন?

বালু একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ওপারের টিকা থেকে প্রায় রোজ মেয়েরা এ সময় পিতাজীর কাছে রামচরিত কথা শুনতে আসে।

তুমি শোন না?

ও মাথাটা আস্তে কাৎ করে জানাল, সেও শোনে।

বললাম, এ সময় তোমার পিতাজীকে আমার আসার কথা জানানোটা বোধহয় ঠিক হবে না বালু।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, ওতে কি আছে? আপনি কিছু ভাববেন না। পড়ার মাঝে কাজ পড়লেই পিতাজীকে পড়া ছেড়ে উঠতে হয়। আর তাছাড়া চাকী ঘরে যাবার সময় পাঠ শুরু হয়েছে। এখন পাঠ ভেঙে যাবারই কথা। বেশিক্ষণ পড়লে পিতাজী হাঁপিয়ে ওঠেন। আগের মত দম রাখতে পারেন না।

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল বালু।

সামান্য সময়ের ভেতর দেখলাম, একটি একটি করে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের টিকার দিকে চলে যেতে লাগল। যাবার সময় ওরা কোন কথা না বলে আমার দিকে ফিরে একটি করে নমস্কার করে গেল। আমি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার জানাতে লাগলাম।

ওরা চলে গেলে বালু ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন।

আমি বালুর পেছন পেছন আব্‌রীতে এসে পড়লাম। শোবার ঘর কাম স্টোররুম এই আব্‌রী। পাশেই এক চিলতে রসুই ঘর দেখা যাচ্ছে। জানালার ফাঁকে চোখ পড়তেই দেখলাম, ঘোরালের ভেতর একটি গরু দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে।

একটা চারপাইয়ের ওপর থেকে নেমে দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলেন পণ্ডিতজী। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

লক্ষ্য করলাম, পণ্ডিতজীর দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো কাঁপছে। বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গিয়ে হাত ধরে বসালাম চারপাইয়ের ওপর।

বললাম, আমি বাইরে থেকে আপনার রামচরিত পাঠ শুনছিলাম।

উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বাবুজী, আপনি পাঠ শোনার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন?

হেসে তাকালাম বালুর দিকে। ও মুখখানা নীচু করে মেঝের ওপর চোখ পেতে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম, আপনার মেয়ে কিন্তু ভদ্রতার কোন ত্রুটি রাখেনি। আসন পেতে অতিথির বসাব সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।

তৃপ্তির একটা ছবি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। পণ্ডিতজী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আমাকে তাঁর পাশটিতে বসতে অনুরোধ জানালেন।

আমি বসে ওঁর হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলাম। হাত নামিয়ে রেখে বললাম, বেশ সুস্থই তো রয়েছেন দেখছি।

পণ্ডিতজী বললেন, রঘুনাথজীর কৃপায় আমার কোন কষ্ট নেই বাবুজী। দেহে যাতনা হলে তাঁর নাম করি। অমনি সব ভুলে যাই।

আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে অসুখের কথা ছাড়া নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

ডাক্তারী করতে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। কোন পরিচিত বাড়িতে বিনা কারণে গিয়ে পড়লেও আর সব কথা বাদ দিয়ে রোগের কথাই উঠবে সেখানে। ডাক্তার ছাড়া মানুষ হিসাবে আমার যেন আর কোন পরিচয়ই নেই। সাধারণ কথার স্বাদ নেবার অধিকার যেন ডাক্তার হয়ে আমি হারিয়ে বসে আছি।

কিন্তু এই একটি জায়গা দেখলাম, বার্ধক্যের সবকটি অসুস্থতা সঙ্গে নিয়েও মানুষটি একবারের জন্য রোগের কথা ওঠালেন না।

কথায় কথায় বললাম, পণ্ডিতজী, আপনারা কি কুলু অঞ্চলেরই মানুষ?

পণ্ডিতজীর মুখে সরল একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। বললেন, কেন বলুন তো বাবুজী?

বললাম, কুলুতে যখন রয়েছেন ঘরবাড়ি করে তখন কুলুর লোক তাতে সন্দেহ কি। তবে আপনার কিংবা আপনার মেয়ের পোশাক পরিচ্ছদে একটু তফাৎ লক্ষ্য করেছি, তাই কথাটা তুললাম।

ঠিক ধরেছেন বাবুজী, বললেন পণ্ডিতজী, আমরা আসলে রাজপুত। জয়পুরে ছিল আমাদের আদি বাস। আমার পিতামহ এসে এখানে বসতি পত্তন করেন।

আপনাদের পৈতৃক কিছু কি ব্যবসা ছিল?

আগে ছিল ক্ষেতখামার, এখন ওসব কিছু নেই বাবুজী। রামজীর কৃপায় দিন চলে যাচ্ছে। সামনে এক চিলতে যে ক্ষেতি দেখলেন, তাতে গম আর মকাই এর চাষ হয়। কোনরকমে দুটো প্রাণীর চলে যায় ওতে।

লক্ষ্য করে দেখছি, বেশ অভাবের ভেতরেই এঁদের দিন গুজরান করতে হয়, কিন্তু একটা পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যের ছাপ লেগে আছে এঁদের আচার আচরণে।

আমাদের কথার ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল বালু। আমি লক্ষ্য করিনি। আবার যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তখন ঝকঝকে কাঁসার থালায় দুটি বেসনের লাড্ডু আর কটি তিলৌড়ী সাজিয়ে এনেছে। সোনার মত ঝিলিক দেয়া চুমকিতে জল টলটল করছে।

বালু মেঝেতে পিঁড়ি পেতে তার ওপব ওগুলো সাজিয়ে রেখে আমার দিকে তাকাল।

পণ্ডিতজী এতক্ষণ কথায় মেতেছিলেন। এবাব জলযোগের থালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার হাতখানা ধরে বললেন, সামান্য একটু মুখে দিতে হবে বাবুজী।

আমি উঠে গিয়ে বসলাম মেঝের ওপর পাতা ছাগলোমে তৈরী থোবির ওপর।

তিলৌড়ী মুখে দিয়ে বললাম, এটি খেতে কিন্তু আমি খুব ভালবাসি। তুমি দেখছি মনের কথা জানতে পার বালু!

এবার সলজ্জ হাসি ফুটল বালুর মুখে।

হঠাৎ করে ও ভেতরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম, আর নয় কিন্তু। শেষ বেলায় খাবার অভ্যেস নেই, শুধু তোমার দেওয়া জিনিসগুলোর লোভ ছাড়তে পারছি না বলেই খাচ্ছি।

বালু ফিরে দাঁড়াল।

পণ্ডিতজী বললেন, একটা মকাই খাবেন বাবুজী? বালুর সেঁকা মকাই খেতে খুব ভাল লাগবে। ও বেটী নিমক মরচা মাখিয়ে এমন মকাই সেঁকে দেবে, যার সোয়াদ জিভে লেগে থাকবে বহুৎ দিন।

বললাম, তাহলে খেতে হয়। কিন্তু অসময়ে আবার আগুন জ্বালতে হবে, তার চেয়ে থাক্ অন্য আর একদিন খাওয়া যাবে।

বালু এবার আর আমার কথা শুনল না। রসুই ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তিল আর মুগের তৈরি মিষ্টি খেয়ে আবার এসে বসলাম চারপাইয়ের ওপর। কিছুক্ষণের ভেতর মকাই সেঁকে একটা পাত্রে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিল বালু।

মকাইএ কামড় দিয়ে মনে হল, জিভের কাছে এর যথেষ্ট অবদান আছে। একটুও বাড়িয়ে বলেননি পণ্ডিতজী।

বললাম, যদি জানতাম তুমি এত ভাল মকাই সেঁকতে পার বালু, তাহলে তোমার পিতাজীর অসুখের সময় ওষুধের দামটাও দিতে হত না। মকাই খেয়ে ও দাম উসুল করে নিতাম।

বালু বলল, আপনি টাকা নিলেন কই। না নিলেন নিজের, না কম্পাউন্ডারবাবুর। কত ওষুধ ডিসপেনসারি থেকে বিনি পয়সায় দিয়ে দিলেন। বাজার থেকে ওষুধ তো দাম দিয়ে কিনতে হতো বাবুজী।

পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ তাহলে উঠতে আদেশ করুন পণ্ডিতজী। বেলা পড়ে এসেছে, যেতে হবে অনেকখানি।

পণ্ডিতজী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবুজীকে তুমি বাজারের পথ অব্দি পৌঁছে দিয়ে এসো বালু।

আমার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন, আসতে বলতে সঙ্কোচ হয় এ ঝোপড়িতে। তবে এদিকে বেড়াতে এলে কৃপা করে আসতে ভুলবেন না বাবুজী।

পণ্ডিতজী চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন দেখে ওঁকে হাতে ধরে বসালাম। বললাম, বালুর হাতে তৈরি খাবারের লোভে আবার আসতে হবে আপনার কোঠীতে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমি বালুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশ জুড়ে সে এক বিচিত্র ছবি আঁকার খেলা শুরু হয়েছে। সূর্যাস্তের মরা হলুদ আর আবীর রঙে রাঙানো আকাশ। টুকরো টুকরো এক দঙ্গল মেঘ লাল হলুদ জামা গায়ে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপরের পাহাড়ের আড়াল থেকে তখনও আধখানা ডুবন্ত সূর্য দেখা যাচ্ছে। এদিকে পুবের আকাশে ঝক্‌ঝকে চাঁদ।

আমি টাট্টুতে না উঠে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচের ভ্যালির পথে সাবধানে নামতে লাগলাম।

ভ্যালিতে নেমে এসে দেখি, পশ্চিম আকাশে রক্তের ঢেউ ইতিমধ্যে ঘন কালো জমাট হয়ে উঠেছে। পুবের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ থেকে একটা তরল সাদা জ্যোৎস্নার ঢল গড়িয়ে আসছে পাহাড় বনের গা ভাসিয়ে ভ্যালির মধ্যে। দুটো পাইন গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িযে আছে সাদা জ্যোৎস্নার ঢেউতে স্নান করার ইচ্ছা নিয়ে।

পাশ ফিরে দেখলাম, বালু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমার চলার অপেক্ষায়। বললাম, এ পথ আমার অচেনা নয় বালু। তুমি ফিবে যাও, তোমার পিতাজী একলা রয়েছেন।

বালু চমকে মুখ তুলে বলল, না বাবুজী, আপনাকে বাজারের রাস্তায় পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না। পিতাজী বলে দিয়েছেন।

বললাম, বাজারের পথ, সে তো অনেকখানি দূর! তুমি একা একা ফিরবে কি করে?

বালু বলল, দরকার পড়লে রাতে ভিতে আমি একাই তো কোঠী থেকে বাজারে যাওয়া আসা করি বাবুজী।

বললাম, তোমার ভয় করে না?

বালু বলল, ডর কিসের বাবুজী, কিছু থেকে আমার ডর নেই।

বালুর সঙ্গে এই আধো জ্যোৎস্নার মায়াময়তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভাল লাগছিল। বললাম, বালু, তোমার যদি খুব একটা তাড়া না থাকে তাহলে একটুখানি বসবে এখানে?

বালু মাথা নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আচ্ছা থাক, অনেক রাত হয়ে যাবে তোমার বাড়ি ফিরতে।

ও মুখ তুলে বলল, না না, আমার তো কোন তাড়া নেই। আসুন না, এই গাছের তলায় পাথরটার ওপর বসি।

বালু গাছের সঙ্গে টাট্টুর লাগাম বেঁধে পাথরের পাশে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আমি বসে আছি তাই পাশাপাশি সে সংকোচে বসতে পারছিল না।

বললাম, তুমি পাথরের ওপর উঠে বস বালু, সংকোচের কোন কারণ নেই।

ও তবুও অনেক সংকোচে আমার কাছ থেকে বেশ খানিক দূবত্ব বাঁচিয়ে পাথরের ওপর আধবসার ভঙ্গীতে বসল।

কেউ কোন কথা বললাম না কিছুক্ষণ। চাঁদের আলোয় গাছের তলায় ছায়ার ফুল ফুটে উঠেছে।

এক সময় বললাম, বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দেখ, ভ্যালির ভেতর বাতাসটা কেমন খেলে বেড়াচ্ছে।

বালু বলল, দক্ষিণের পাহাড়ী অঞ্চলে গরমের সময় বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু ভ্যালির ভেতর বাবুজী মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার খেলা চলতে থাকে। এখানকার এই দস্তুর।

বললাম, আজকাল দুপুরে পাহাড়ের মাথাগুলোও কেমন যেন অস্পষ্ট অস্বচ্ছ বলে মনে হয়। দূরের দৃশ্যগুলো ভাল করে দেখা যায় না।

বালু বলল, পিতাজী বলেন, ওটা হালকা ধূলির ওড়না। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে।

তউন্দির সময় এটা প্রায় হয়।

আমার বেশ ভাল লাগছিল। মুখে লজ্জা আর মিষ্টি একটা সারল্য মাখা থাকলেও বালু যে প্রকৃতির লীলারহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয়, একথা জেনে ওকে আরও বেশী ভাল লাগল।

অন্য কথায় এলাম। বললাম, সারাদিন তোমাকে কি কাজ করতে হয় বালু?

বালু বলল, আমার সংসার তো দেখলেন বাবুজী, কত ছোট কিন্তু সারাদিন কাজের কি শেষ আছে। এখন গম ঝাড়াই বাছাই-এর কাজ চলছে। আবার যখন শরৎকাল আসবে, তখন মকাই উঠবে ঘরে।

বললাম, আমি যখন প্রথম মানালী আসি তখন মকাই তোলা হয়ে গেছে। পাহাড়ী টিকার প্রায় প্রতিটি ঘরের ছাদে মকাই শুকোচ্ছে। যেদিকে তাকাই সেদিকে পাকা সোনার ঝিলিক। সে ছবি এত সুন্দর যে এখনও চোখের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে।

বালু বলল, সারা দেশটা ছবি, বাবুজী। শরৎকালের শেষে গাছ থেকে যে পাতা ঝরবে, তার রঙেও সোনার চমক।

বললাম, তোমরা রাজপূত, তাই না বালু?

ও মাথা নাড়ল।

বললাম, প্রতিটি জাত তাদের নিজের নিজের দলের লোকজন নিয়ে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু তোমরা ঐ নির্জন পাহাড়ে দুটি প্রাণী থাক কি করে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বালু। এক সময় কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, আমরা রাজপুত বাবুজী, তবে পতিত হয়ে আছি?

বললাম, তোমরা পতিত কিসে?

বালু বলল, মিয়ান রাজপুত ছিলাম আমরা। লোকে আমাদেরও এক সময় 'জয় দিয়' বলে চলতে ফিরতে সম্মান দেখাত। কিন্তু আমাদের ক্ষেতিতে এক সময় কাজ করত একটি মানুষ। তার কাজে সাহায্য করতে আসত তার কিশোরী মেয়েটি। মেয়েটি কৃষক কানেতের বাড়ির হলে কি হবে, রূপ যেন তার পাকা ফসলের মত আলো করে থাকত সারা ক্ষেত।

একটু থেমে চোখদুটো আমার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বালু বলল, তিনি আমার মা বাবুজী, আর তাই আমরা এক ধাপ নীচে নেমে গেছি।

বললাম, তোমরা এক ধাপ উঁচুতে উঠে গেছ বালু। তোমার পিতাজী শুধু পণ্ডিতই নন, তিনি সত্যিকারের মানুষ।

বালু উৎসাহে আমার মুখের ওপর তার চোখ রেখে বলল, আমাদের জাতের মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে হয় বাবুজী, কিন্তু এখন এক ধাপ নেমে যাওয়ায় আমরা আর ওসব মানি না। পিতাজী মাকে এনে ঐ নির্জন পাহাড়ে সংসার পাতেন। মা মারা গেলে আমার দাদা বাজারে কোঠী বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতাজী ও জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। শুধু বলেছিলেন, তোমরা নতুন দিনের মানুষ, বাজারের আনন্দে মেতে থাকতে চাইছ, আমি বাধা দেব না। তবে আমি এই ঝোপড়িতে তোমার মায়ের স্মৃতি নিয়ে থাকব শেষ কটা দিন।

বলুন তো বাবুজী, এরপর আমি আমার বুড়ো পিতাজীকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? আর তাছাড়া এখন তো উনি একেবারে নড়াচড়ার বাইরে।

বললাম, তোমার দাদা সেই থেকে মিলিটারীতে চলে গেল বুঝি?

বালু বলল, ঠিক ধরেছেন বাবুজী। তারপর থেকে আর এমুখো হয়নি।

বললাম, বালু, তুমি আর কিছু কাজ কর?

ও বলল, মরশুমে আপেল পাকলে আমি আপেল তোলার কাজ করি বেনন সাহেবদের বাগানে। তারপর পথের ধারের দোকানে ফলের রস তৈরি করার কাজে লেগে যাই। ফলের মরশুমে যারা বেড়াতে আসে বাবুজী, তারা আপেলের রস খেতে চায়।

বললাম, জুলিয়েন বেননকে চেন তুমি?

বালু মাথা দুলিয়ে জানাল, জুলিয়েন তার চেনা।

বললাম, কেমন মানুষ?

বালু বলল, বহুৎ খেয়ালী। ওকে বহুৎ ডর করে সব্বাই।

বললাম, খেয়ালী কি রকম?

বালু বলল, আমরা দল বেঁধে ওদের বাগানে আপেল তুলতে যাই। একবার একটা মেয়ে বাগানে ফল তুলতে তুলতে একটা আপেলে কামড় দিয়েছিল। পড়বি তো পড় জুলিয়েন সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী খতম।

বললাম, ঐটুকু দোষে চাকরী হারাতে হল?

হাঁ বাবুজী, বলল বালু, তবে ও মেয়েটি আবার ভাল কাজ পেয়ে গেছে।

বললাম, কি কাজ?

বালু বলল, তাঁত বোনার কাজ। আর কাজটা ঐ জুলিয়েন সাহেবই যোগাড় করে দিয়েছে।

হেসে বললাম, তাহলে তো দারুণ সাচ্চা মানুষ বলতে হয়।

বালু বলল, কি রকম খেয়ালী জানেন বাবুজী? ঐ মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে জোর ধমক লাগিয়ে বাগান থেকে তাডিয়ে দিলে। তারপর সন্ধ্যাবেলা ওব বাড়ি বয়ে একঝুড়ি বাগানের সেরা আপেল দিয়ে এল। আবার ভাল চাকরীও জুটিয়ে দিলে, কিন্তু বাগানের কাজে আর ফিরিয়ে আনল না।

বললাম, ও মানুষটা ঐরকমই বালু।

চাঁদের আলোয় দুজনে কতক্ষণ বসে বসে ছোট ছোট সুখ-দুঃখের গল্প করলাম। আমার কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে বালুর মনের রুদ্ধ জানালাটা ধীরে ধীরে অভাবিত এক আলোর দিকে খুলতে লাগল।

এই নির্জন প্রকৃতির বিরাট নৈঃশব্দের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল, বালু ঠিক এই নৈশ প্রকৃতির মতই একান্ত নির্জনে নির্বাসিত। সব ঐশ্বর্য, সব শ্যামল সমারোহ থাকা সত্ত্বেও সে এক মহা গতিহীন অভিশাপে বাঁধা পড়ে আছে। তার ভরাযৌবনের বাসনাগুলো রাতের ঝিঁঝিদের মত যেন বুক কুরে কুরে অবিশ্রাম কান্না ঝরিয়ে চলেছে।

কখনো বা উপত্যকার বসন্ত বাতাস পথচলতি বালুকে ছুঁয়ে যায়। লাল ঠোঁটে তোতাপাখি চেরী ফল নিয়ে সবুজ ডানা ভাসিয়ে ওড়ে। ফুলেভরা বন্য আপেলের শাখায় কোয়েল নিজের কালো দেহখানা লুকিয়ে সুরের আগুন জ্বালাতে থাকে। বুকখানাকে একেবারে উদাস করে দিয়ে কখনো বা বৈশাখী দুপুরে দূর বনে ঘুঘু ডাকে। সাদা তগ্‌গর ফুল নাকের কাছে আলতো করে ছুঁইয়ে তার করুণ গন্ধটাকে শুঁকতে শুঁকতে শূন্যে চেয়ে থাকে বালু। যে হিসেব কোনদিন মিলবে না, জীবনের সেই হিসেবগুলো মেলাবার চেষ্টা করতে করতে একসময় একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাল ছেড়ে দেয় সে। আবার নিজের কাজ। কাজে বিলম্বের কৈফিয়ৎ মনে মনে খাড়া করতে করতে কঠিন পাথরের পথে আঘাত খেতে খেতে ছুটে চলা।

একসময় যখন বালু তার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেক কথা স্বগতোক্তির মত শুনিয়ে গেল তখন আমি এক অবসরে বললাম, একটা ছোট্ট কাজ আছে, করবে বালু।

ও আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

বললাম, একেবারে সম্মতি দিয়ে দিলে? আগে কথাটা শোন, ভেবে দেখ, পিতাজীর সঙ্গে পরামর্শ কর—তারপর সম্মতি অসম্মতির প্রশ্ন আসবে।

বালু কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল।

বললাম, ডেলিভারীর কেস এলে অনেক সময় বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। এসব পাহাড়ী অঞ্চলে বড বেশি সংকোচ আর সংস্কার আছে। আমার হঠাৎ কিছু দরকার হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়েদের কাছে সাহায্য পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। তোমার যদি এসব কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে কোন সংস্কার না থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বোলো। এখুনি বলার দরকার নেই, ভেবেচিন্তে বললেই হবে। কাজটা প্রতিদিনের নয় তাই বোজ তোমাকে ব্যস্ত থাকতেও হবে না। দরকার পড়লেই আমি তোমাকে ডেকে নেব।

কথাগুলো বলে প্রতিক্রিয়া দেখাব জন্যে চাঁদেব আলোয ওব মুখেব দিকে চেয়ে বইলাম।

বালু বলল, আমাব কোন সংস্কাব নেই। আপনি যদি মনে কবেন আমি আপনাকে সাহায্য কবতে পাবব তাহলে আমি খুব বাজী আছি।

বললাম, তোমাব পিতাজীব সঙ্গে একবাব আলোচনা কবে নাও।

ও বলল, ফিবে গিয়েই পিতাজীকে বলব। তবে উনি কি বলবেন তাও আমাব জানা আছে। তাই আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে কথাটা দিতে পাবলাম।

বাত সত্যি সত্যি অনেকখানি হয়ে গিয়েছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বালুকে বাড়ি ফিবে যাবাব জন্যে অনেক বোঝালাম কিন্তু ওব সেই এক কথা—পিতাজী বলেছেন আপনাকে বাজাবেব বাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নিব কথা মনে পড়ল। সেও একদিন এমনি পিতৃভক্তিব পবিচয দিয়েছিল আমাকে যোগনীব হাত থেকে বাঁচাতে।

বালু ফিবে গেল নির্দিষ্ট সীমানা ছুঁয়ে। আমি টাট্টুতে চড়ে বাঁধান বাস্তা ধবে বাজাবেব পথে এগোতে লাগলাম। বাস্তাব ধাবে বড় বড় সিডাব গাছগুলো পেবিয়ে চলেছি। গাছেব ফাকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা।

হঠাৎ কি মনে হল, টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম। গাছেব ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বইলাম ভ্যালিব দিকে।

জ্যোৎস্নায একটি ছাযামূর্তি দ্রুতপাযে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমি জানি সে বালু। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ওব নামধাম, পবিচযেব পার্থিব সূত্রগুলো ভুলে গেলাম। আমাব মনে হল সৃষ্টিব শুরু থেকে একটি তরুণী কুমাবী বহস্যময জ্যোৎস্নাব আলো গাযে মেখে একাকী অনন্ত পথ পাড়ি দিযে চলেছে। সমস্ত বিশ্বচবাচবকে সে তাব যৌবনেব মহিমায মূক স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস কবে বেখেছে।

বাত তখন প্রায দশটা। খাওযাব পব বিছানায শুযে 'দ্য বা-একসপিডিশানস' বইখানাব পাতা ওল্টাচ্ছি। কেমন কবে পেপাইবাসেব তৈবি নৌকোয আধুনিক যুগেব মানুষ দুস্তবসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, তাব ছবি দেখে বোমাঞ্চিত হচ্ছি। হঠাৎ জানালাব বাইবে থেকে লম্বা একখানা হাত ঢুকে আমাব বইটা টেনে নিতেই আমি লাফ দিয়ে মেঝেতে উঠে দাঁড়ালাম।

জানালাব দিকে তাকিয়ে কিন্তু হেসে উঠলাম।

জুলিয়েন বাইবে থেকে বলল, চটপট ড্রেস কবে বাইবে বেবিয়ে এসো মুখার্জী। দবকাব আছে।

জুলিয়েনকে কোন প্রশ্ন কবা বাহুল্য। ও মর্জি হলে কথাব জবাব দেবে নযত নিঃশব্দে নেমে চলে যাবে। শুধু বললাম, দবজাটা কি ভেজিয়ে বেখে যাব?

ওপাশ থেকে ভাবী গলাব শব্দ ভেসে এল, না। ভাগতুকে ভেতব থেকে দবজাটা বন্ধ কবে দিতে বল। আব তুমি যে বাইবে বেবিয়েছ একথা যেন ও কাউকে না বলে।

দশ মিনিটে কাজ শেষ কবে বেবিয়ে এলাম। বাইবে নেমে দেখি, চাঁদ ডুবছে পাহাড়েব আড়ালে। চাবদিকে ছাযা ঘনিয়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট আলোয কিন্তু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জুলিয়েনকে। পুলিশ অফিসাবেব ড্রেস পবে টুপি মাথায হাতে ব্যাটন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বললাম, এ কি রূপে দিলে দবশন!

জুলিয়েন লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে বলল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নির্জন পথ। আমবা চলেছি বাজাবেব দিকে। জুতো থেকে একটা ভেজা সপসপ শব্দেব মত আওযাজ উঠছিল।

বাজাবেব কাছাকাছি এসে জুলিয়েন বাঁদিকেব সিডাব জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমি ওকে সাবধানে অনুসবণ কবে চললাম। অনেকখানি পথ বনেব ভেতব ঠাওব কবে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু চেনা পথ দুজনেবই, তাই একসময জঙ্গলটা পেবিয়ে আসতে পাবলাম।

এখন আমরা নদীর জলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ আমার মুখে ওর হাতখানা চেপে ধরে জুলিয়েন চাপা গলায় বলল, খবরদার, শব্দ কোরো না যেন।

তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বলল, ঐ দূরে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্ধকারে ততক্ষণে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বললাম, বেশ বড় আকারের একটা কিছু দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

জুলিয়েন ফিসফিস করে বলল, একখানা লরী। এখন যা বলি, তাই কর। চুপচাপ নদীর ধারের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। দেখো, পাথরটাথর গড়িয়ে শব্দ করে বসো না যেন।

আমি জুলিয়েনের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। নদীর জলপ্রবাহ এত তীব্র আর শব্দতরঙ্গ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে একখানা পাথর গড়িয়ে পড়লেও অতিরিক্ত কোন শব্দের সৃষ্টি হত বলে মনে হয় না।

আমি সাবধানে নীচের রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে যতটুকু সময় নিয়েছিলাম তারই ভেতর জুলিয়েন নিশ্চয়ই কিছু কাণ্ড করে থাকবে। আমি ঐ লরীর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি দুটো চোখে আগুন ছড়িয়ে লরীটা আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমি রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। লরীটা আমার পাশে এসে থেমে গেল। জুলিয়েনের চাপা গলার আওয়াজ জলের শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠলো, উঠে এসো তাড়াতাড়ি।

আমি বাক্যব্যয় না করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। আর অমনি লরীখানা বন পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলল সামনের পথ ধরে।

জুলিয়েনের মুখে কথা নেই। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে সে ম্যাজিক কার্পেটের মত গাড়িখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বেশ খানিক পথ যাবার পর জুলিয়েনই প্রথম কথা বলল, চোরের ওপর বাটপাড়ি করলাম মুখার্জী।

বললাম, এতক্ষণ গোলকধাঁধায় রয়েছি, এখন দয়া করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল তো দেখি।

জুলিয়েন বলল, নদীর ধারে সরকারী লগ হাউস তৈরি হচ্ছে। মধুর খবর পেয়ে মদনলাল যথারীতি এখানে এসে হাজির হয়েছে। এখন নদীর স্রোতে টিম্বার মার্চেন্টদের যে লগ ভেসে যাচ্ছে তাই চুরি করে ও ঘর বানাচ্ছে। এদিকে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কাঠ সাপ্লাই-এর বিলটা তুলে নিচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে।

বললাম, নদীর জলে ভেসে আসা লগগুলো এতদূরে না ধরে লগ হাউসের পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময়ে তো ধরতে পারত। তাহলে কন্ট্রাক্টরের লরীতে ওঠানোর হাঙ্গামা থাকত না।

জুলিয়েন বলল, ওপরের পাহাড়ে এখন বরফ গলছে। জানুয়ারীতে যেখানে জলের অ্যাভারেজ ফ্লো সাড়ে চার হাজার কিউসেক সেখানে এখন প্রায় পনেরো হাজার কিউসেক জল নামছে। ভেবে দেখ, জলের স্রোত কত প্রবল। লগ হাউসের কাছে নদীর স্রোত ঝড়ো হাওয়ার মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওখানে লগ ধরে সাধ্য কি। তাই পিছিয়ে গিয়ে নদীর বাঁকে যেখানে লগগুলো মাঝে মাঝে আটকে পড়ে যায় সেখান থেকে লরীতে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসছে।

বললাম, গাড়িতে কেউ ছিল না?

জুলিয়েন বলল, আমি যতটুকু ইনফরমেশান পেয়েছিলাম তাতে রাত একটা নাগাদ চাঁদের আলো ফুটলে ওরা মরা জ্যোৎস্নায় নদী থেকে কাঠ তুলে লরী বোঝাই করার তাল করছিল। গিয়ে দেখি, লরীতে শুধু ড্রাইভার ভেজা বেড়ালের মত একলা বসে।

বললাম, পুলিশ অফিসারের পোশাকটা তাহলে অকারণেই চাপালে বল?

জুলিয়েন বলল, নিশ্চয়ই নয়। আমাকে এই পোশাকে দেখেই তো ড্রাইভার লাফ দিয়ে ভেগে পড়ল।

লরী গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছিল। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

একসময় বললাম, জুলিয়েন, এখন কোথায় চলেছি দয়া করে তার যদি একটা হদিস দাও।

জুলিয়েন বলল, ঐ প্রশ্নটি করলেই কিন্তু গাড়ি থেকে সোজা ঠেলে ফেলে দেব! চুপচাপ বসে থাক। যেখানে নামাবো সেখানে নামবে।

হেসে বললাম, তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন চালাও দোস্ত্। যেখানে ঠেকাবে সেখানেই ঠেকব।

রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। নদী পাহাড় বন কাঁপিয়ে জুলিয়েনের বাটপাড়ি করা লরী যেখানে এসে দাঁড়াল রাতের অন্ধকারে সে জায়গা আমার অচেনা। জুলিয়েন গাড়ি থেকে নেমে বলল, চিনতে পার জায়গাটা?

বললাম, না।

একেবারেই না?

বললাম, আমার চেনা জায়গা বলে তো মনে হচ্ছে না।

জুলিয়েন বলল, তাহলে গাড়িতে ওঠ। যেখান থেকে এনেছি সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বললাম, সত্যি জুলিয়েন ধাঁধায় পড়ে গেছি।

জুলিয়েন বলল, কপালে তোমার দুঃখ আছে মুখার্জী।

বললাম, দুঃখ যদি থাকে তবে খণ্ডাবে কে!

জুলিয়েন বলল, চল এখন ওপরে ওঠা যাক্। রাত প্রায় একটা বাজে। চারটের আগেই কিন্তু এখানে ফিরতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় কুলু থেকে যে বাস যাবে সেটা ধরতে হবে আমাদের। লরী এখানেই পড়ে থাক্।

জুলিয়েনের হাতে জোরে একটা চাপ দিয়ে মনের আবেগ জানালাম। আমার কাছে সব এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বললাম, তুমি সত্যি নাগ্গরে নিয়ে এলে আমাকে!

মুখার্জী, তোমার ঝিন্নির কাছে নিয়ে এলাম।

আমরা টর্চের আলোয় পথ চিনে ওপরে উঠতে লাগলাম!

নিরন্ধ্র অন্ধকারে নাগ্গর ঘুমিয়ে আছে। ঝিন্নির কোয়ার্টারের সামনে দুজনে এসে দাঁড়ালাম। জুলিয়েন বলল, তুমি আর্ট গ্যালারীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও। আমি দরজায় নক্ করছি।

আমি গ্যালারীর দিকে চলে গেলাম। কানে এসে বাজতে লাগল জুলিয়েনের দরজা ধাক্কানোর শব্দ।

কে? কে?

ভেতর থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠল। ঘুমে আর শঙ্কায় জড়ানো সে কণ্ঠস্বর।

জুলিয়েনের গলা শোনা গেল, ভয় নেই, আমি কুলুর পুলিশ স্টেশন থেকে আসছি।

ভেতরে আলো জ্বলে উঠেছে। দরজা খুলে দিয়েছে ঝিন্নি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, জুলিয়েন কিন্তু তেমনি বাইরে দাঁড়িয়ে।

ঝিন্নি দবজা ধরে বাইরে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বলুন তো?

জুলিয়েন ভারী গলায় বলল, মিস শর্মা, আপনাকে এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্যে সত্যি দুঃখিত, কিন্তু এ সময় ছাড়া সেই ভদ্রলোকের নাগাল পাবার কোন উপায় নেই।

ঝিন্নির গলা জড়িয়ে এসেছে, কি বলছেন আপনি? এখানে দ্বিতীয় কোন মানুষ তো নেই।

ইতিমধ্যে উত্তেজনায় ঝিন্নির হাত লেগে পুরো দরজাটাই খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো আর্ট গ্যালারীর দেয়াল ছুঁয়ে আমার ওপর এসে পড়ল।

ঝিন্নির চোখ মুহূর্তে আমাকে চিনে ফেলল। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, তুমি ওখানে ছোটেসাহেব!

জুলিয়েন হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, সব প্ল্যানটা ভেস্তে দিলে তো মুখার্জী!

ঝিন্নির দিকে তাকিয়ে দেখি ও ততক্ষণে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কি হল ঝিন্নি?

ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

বেশ খানিক পরে নিজেকে স্বাভাবিক করে যখন ও ঘরে ঢুকল তখন মুখে সলজ্জ একটা হাসি লেগে। সে যে দারুণ রকম বোকা বনেছে, চোখে মুখে তারই ছায়া।

জুলিয়েন বলল, আমি অপরাধী, এখন শাস্তিটা আমাকেই দিন।

ঝিন্নি বলল, বসুন। অপরাধটা আমারই। বলতে পারেন অকৃতজ্ঞ আমি। ভাগ্‌তুর অপারেশনেব সময় আপনাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করেছি কতবার কিন্তু আজ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

জুলিয়েন অমনি বলল, টুপিতে মাথা ঢাকা, পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে, কেমন করেই বা চিনবেন আমাকে।

জুলিয়েন আর বসল না। আমার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক চারটেতে নাগ্‌গরের বাস রাস্তার ধাবে গিয়ে দাঁড়াবে, এখন আমি চললাম। ঐখানেই দেখা হবে।

ঝিন্নি বলল, অসম্ভব। রাতে আমার ঘুম ভাঙালেন, এখন আপনাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন। শেষ রাতটুকু গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

জুলিয়েন বলল, আর একদিন বিরক্ত করব মিস শর্মা, আজ নয়। চোরাই একখানা গাড়ি আছে, রাতে ওটাকে পাহারা দিয়ে আগলে বসে থাকতে হবে। ভোরবেলা ওটাতে কুলু পৌঁছে জঙ্গলে বিসর্জন দিয়ে মানালীর ফার্স্ট বাস ধরেই রওনা দেব দু' বন্ধুতে।

বললাম, তাহলে চল জুলিয়েন আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়।

জুলিয়েন বলল, আমার কথার ওপর কথা চালাতে যেও না মুখার্জী, তাহলে মানালীতে তোমাব বাংলোয় আর জুলিয়েনকে দেখতে পাবে না।

বললাম, আজ তোমার দিন জুলিয়েন, আমি হার মানছি।

ঝিন্নি বলল, ছেড়ে দেবার আগে আপনাকে অন্তত এক কাপ চা খাইয়ে তবে ছাড়ব।

জুলিয়েন টেবিলের কোণায় উঠে বসে বলল, রাজী।

ঝিন্নি ভেতরে চলে গেল! আমরা গল্প করতে লাগলাম। এক সময় ঝিন্নি এল দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে।

জুলিয়েন টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাপটা হাতে ধরে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

ঝিন্নি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতেই জুলিয়েন বলল, চায়ের কাপ হাতে গল্প শুরু করলে কাল আর বন্ধুকে নিয়ে মানালী পৌঁছতে হবে না। চোরাই গাড়ির খোঁজে পুলিশ আসবে আর দুজন পলাতককে এখান থেকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। তখন মিস শর্মা আজ রাতের অভিনয়টাই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

জুলিয়েন তাড়াতাড়ি করে কয়েক চুমুকে চাটুকু গলার ভেতর চালান করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমিও তার সঙ্গে বাইরে আসতে আসতে বললাম, অন্তত নীচের রাস্তা অব্দি তোমার সঙ্গে যেতে দাও।

জুলিয়েন বলল, যেতে আসতে অকারণে আধ ঘণ্টারও সময় কেন মিথ্যে আমার পেছনে নষ্ট করবে মুখার্জী। তোমরা আধ ঘণ্টা বেশি গল্প করলে বন্ধু হিসেবে আমি বরং আরও বেশি খুশি হব।

বিদায় নেবার জন্য জুলিয়েন হাত তুলল, তারপর পথের ওপর টর্চের ঝলক দিতে দিতে নীচেব দিকে নেমে গেল।

আমি উঠে এসে দেখি ভেতরের দরজায় হাত রেখে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরের দরজা আমিই বন্ধ করলাম। ঝিন্নি কোন কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, ঝিন্নি কত যুগ তোমাকে দেখি নি।

ও আরও কিছু সময় অন্যমনস্ক হয়ে রইল। এক সময় বলল, এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ছোটেসাহেব। একটু পরে তুমি যখন চলে যাবে তখন মনে হবে আমি সত্যি স্বপ্ন দেখেছি।

ওর হাত ধরতেই ও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় ওর মুখখানা আমার বুকের ওপর থেকে তুলে নিলাম দু'হাতের পাতায়। একটি ফুটে ওঠা ম্যাগনোলিয়া যেন তার অতি কোমল লাবণ্য আর গন্ধ নিয়ে আমার অঞ্জলিতে বাঁধা পড়ল।

ফুলটির দিকে চেয়ে দেখলাম, দু'ফোটা ভোরের শিশির সেখানে টলটল করছে।

ছোট্ট এইটুকু মুখ কিন্তু অনেক সময় মনে হয় সে মুখ এতবড় বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ধরে রাখা যাবে না। তার আনন্দ তার আকুলতা মহাবিশ্বকে প্লাবিত করে উপছে পড়বে যেন।

আমি ঝিন্নির মুখখানাকে হৃদয়ের গভীরে ধরে রাখতে গিয়ে দেখলাম, আমার সমস্ত মন ভাদ্রের ভরা দীঘির মত টলমল করছে।

ঝিন্নি চোখ তুলে বলল, ছোটেসাহেব, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না, তোমাকে কোন চিঠিও লিখবো না কোনদিন।

আমি অবাক হয়ে ঝিন্নিকে টেনে নিয়ে এলাম ওর বিছানার ওপর। ওকে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, কি অপরাধ আমি করেছি ঝিন্নি, যাতে তুমি এত বড় শাস্তি দেবে?

ঝিন্নি বলল, তোমার শেষ চিঠিখানা তুমি কেন এমন করে লিখলে? আমার মনটা কি পান্থপাদপ যে তুমি ক্রমাগত আঘাত করে যাবে আর আমি বন্যার মত চোখের জল ঝরিয়ে যাব?

আমার মনে পড়ল শেষ চিঠির কথাগুলো। চিঠির একটি অংশে আমি লিখেছিলাম :

আজ আমি একটি তুষারক্ষতে আক্রান্ত পর্বত-অভিযাত্রী তরুণকে ছ'ঘণ্টা অন্তর হেপারিন ইনজেকসান দিচ্ছি। থ্রম্বসিস অথবা গ্যাংগ্রিন হবার সম্ভাবনা আর নেই। রোটাং পেরিয়ে লাহুলের দিকে যাবার সময় হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ে পড়ে যায়। রোটাং-এ ইগ্‌লুর মত যে ছোট্ট ঘরখানা রয়েছে, সেখানকার একটি লাহুলী মেয়ে ওকে টেনে নীচের পাহাড়ে নামিয়ে আনে। ভাগ্যিস একটি মিলিটারী জীপ সে সময় এসে পড়েছিল। ওরা তরুণটিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

শুনলাম রোটাং-এ নাকি গ্রীষ্ম আর শরতের শুরুতে প্রায়ই তুষারঝড় বয়।

ছেলেটি শুয়ে আছে বেডে। ও একটু আগে বলেছিল, ডাক্তার সাব, আর যা করুন দয়া করে আমার পা-টা কেটে বাদ দেবেন না। তাহলে আর কোনদিন পাহাড়ে চড়তে পারব না!

আমাদের দেশে এমন পাহাড়-প্রেমিক ছেলে আছে জেনে দারুণ ভাল লাগছে।

আজ ওকে ইনজেকসান দিয়ে আমি কিছু সময়ের জন্য ভ্যালির দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড় শুরু হল। ভ্যালির ভেতর বয়ে এল একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত সাদাটে একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ মাটি দিক-বিদিক ছুঁয়ে। চলে আসার জন্যে আমি টাট্টুর লাগামটাও খুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু এ দৃশ্য চোখ ভরে না দেখে এক পাও নড়তে পারলাম না।

আমি তাকিয়ে রইলাম দূর তুষার-পাহাড়ের দিকে।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যেন মেরু-অভিযাত্রী ওট্‌স, ক্যাপটেন স্কটের তাঁবুতে রয়েছি। চারদিকে মৃত্যুশীতল তুষারঝড়ের হাহাকার বাজছে। আমার হাতে পায়ে তুষার-ক্ষত। আমি দ্রুত চলার শক্তি হারিয়েছি। আমাকে ফেলে ক্যাপটেন যেতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে আমি কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। তীব্র তুষারপ্রবাহের ভয়াবহ মৃত্যুর ভেতর নিজেকে সঁপে দিলাম। হারিয়ে যেতে যেতে আমি বলে উঠলাম, আমি চলে যাচ্ছি, হয়ত আবার কোনদিন তোমাদের ভেতর ফিরে আসব।....

চিঠির কথাটা মনে পড়তেই বললাম, অস্বাভাবিক কল্পনার একটা অসুখ আছে আমার ভেতর। পরে যখন ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি তখন নিজেকে পাগল ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না। তোমাকে যখন ভ্যালি থেকে ফিরে এসে সেদিন চিঠি লিখি, তখনও আমার মনকে ঐ কল্পনার ঘোর পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ঝিন্নি বলল, বল, তুমি আর কোনদিন এমন চিঠি লিখবে না?

একটু হেসে বললাম, বেশ, তোমার কথাই মেনে চলার চেষ্টা করব।

ঝিন্নি এবার আমার একখানা হাত ওর দু'হাতের ভেতর ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বললাম, দেখ তো কত সহজে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল।

ঝিন্নি আমার হাতখানা ওর মুখের ওপর ঢেকে শুধু খুশি খুশি চাউনি মেলে আমার দিকে চেয়ে

রইল। ওকে বুকের কাছে টেনে এনে বললাম, আমার হারিয়ে যাবার এই একটিমাত্র জায়গাই তো আছে।

ঝিন্নি ওর মুখখানা ক্রমাগত আমার বুকে ঘষতে লাগল। কোন কথা বলল না।

এক সময় ও ওর বিনুনী খুলতে শুরু করল। কিছু পরে কি ভেবে আবার খসানো বিনুনী বেঁধে ফেলল।

বললাম, কি হল? চুল নিয়ে হঠাৎ খেলা শুরু করলে?

ও বলল, আর কিছু পরেই তো তোমার সঙ্গে নীচে নামব, তখন খোলা চুল বেঁধে তুলতে অনেক সময় লাগবে। ভেবে দেখলাম, চুল বেঁধে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই।

বললাম, কি করে এখানে এলাম জান ঝিন্নি?

ও অমনি আমার মুখে ওর নরম আঙুলগুলো চেপে ধরে বলল, দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, কৃপণের ধনের মত আমার একটুখানি সময় আজ আর কেড়ে নিও না। চিঠিতে সব ঘটনা অনেক বড় করে জানিও, শুধু এই ক'টা মুহূর্ত তোমাকে একটু দেখতে দাও।

ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বললাম, তুমি আমার এই বুকের পাঁজরের ওপর কান পেতে শোন তো ঝিন্নি, কোন শব্দ শুনতে পাও কিনা?

ও কান পাতল। তারপর বলল, তুমি দারুণ লোভী আছ ছোটেসাহেব। খালি তোমার বুক বলছে, দাও দাও দাও দাও।

প্রবল আকর্ষণে ঝিন্নি সেই মুহূর্তে আমার বুকের খাঁচায় একটা ভীরু পাখি হয়ে গেল।

বালু বাড়িতে কিছু কাজ করে দিচ্ছে আমার। কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকলে বালু সকালে রোগীর ভীড় ঠেকায়। আমার নির্দেশমত লাইনে দাঁড় করিয়ে পর পর স্লিপ ধরে রোগীদের ডাক দিয়ে আনে আমার কাছে।

এতদিন এ কাজ কম্পাউন্ডার একাই করত ওষুধ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখন রোগীর ভীড় বেড়েছে তাই বালুর দরকারটা বেশ বুঝতে পারি।

ও বেচারা প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কাজের ধান্দায়। কোথাও কাজ জুটলে ভালো, নয়তো বনে বনে ঘুরে লকড়ি এক বোঝা পিঠে বেঁধে নিয়ে চলল।

আজকাল আমার কাছে ও প্রায়ই আসে। কাজে যাবার আগে ভোরবেলা একবার হাজিরা দেয় আমার ডিসপেনসারিতে। কোন কথা বলে না ও। আমার রোগী দেখার ঘরে টেবিলের ওপর ফুল রাখার অভ্যেস! বালু ওটা জেনে ফেলেছে। ও দু'একদিন বাদে বাদে ফুলপাতা নিয়ে এসে ফ্লাওয়ার ভাসটা সাজিয়ে দিয়ে যায়। কোথা থেকে যে ও ফুল আনে তা আমি জানি না, তবে আমার বাগানের ফুল তুলে বালুকে কোনদিন ফুলদানি সাজাতে দেখি নি।

আমি ওপরের বারান্দায় বসে আকাশ পৃথিবী জুড়ে ভোরের আয়োজন দেখি। দূরের পাহাড়ের মাথায় যেখানে সিডার বন গহন ঘন হয়ে আছে, তার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মত টকটকে লাল সূর্যটা উঁকি দেয়। আমি দেখি বন আর পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা দু'এক টুকরো মেঘ হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠছে। আকাশের যেখানে যেখানে মেঘ সেখানে আঁধার ছড়িয়ে পড়ছে।

বাঁ দিকে নীল আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ো। ভ্যালিতে কুয়াশার চাদর বিছানো। পীরপাঞ্জালের শৈলশিখরে কখন শুরু হয়ে যায় রঙের খেলা! গোলাপী আভা ধীরে ধীরে সোনালী হয়ে ওঠে।

কোন কোনদিন দোয়েলের ঝাঁক তীরের ফলার মত শৈলসম্রাটকে গার্ড অব অনার দিতে দিতে উড়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঠাণ্ডায় ভালিতে জমে যাওয়া মেঘগুলো রোদ্দুরে গা সেঁকার জন্যে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

এবার আমার নীচে নামার পালা। দু'একটি করে রোগী জমতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

বালু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না। কোনদিন হয়তো ভাগ্তুর সঙ্গে ছোটখাট বিষয়

নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকে, তাও নীচু গলায়।

আমি নীচে নামি। ও আমার জুতোর আওয়াজ পেলেই বাগানের ছড়ানো মোরামগুলোর ওপর চোখের দৃষ্টি নামায়। আমি ডিসপেনসারির দাওয়া থেকে যদি বলি, আজ তোমার কাজে গিয়ে কাজ নেই বালু, ও অমনি বাকী ইঙ্গিতটুকু বুঝে নেয়। রোগীদের নামগুলো পর পর স্লিপে লিখতে থাকে। ওর খুশি খুশি ভাবটা তখন আমি ওর স্বচ্ছন্দ চলার ভেতর থেকে ধরতে পারি।

ডেলিভারী কল এলে বালু সারাদিন ব্যস্ত থাকে আমার কাজে। আমি যাই টাট্টুতে চড়ে, বালু আগেভাগে আমার ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে চলে যায় পেশেন্টের বাড়ি। পথের লোক, আশপাশের দু'পাঁচখানা টিকার লোক আমাদের চিনে ফেলেছে। বালুকে ব্যাগ হাতে যেতে দেখলেই ওরা জানে এবার টাট্টুতে চড়ে ডাক্তার আসছে। বালুর সঙ্গে আমার অ্যাসোসিয়েশনটা যেন লোকের মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

কাজ শিখে ফেলেছে বালু। ও সরল কিন্তু নির্বোধ নয়। বলার চেয়ে চুপচাপ সব শুনে যেতেই ওর আগ্রহ বেশি। তারপর নিখুঁত দক্ষতায় ওর ওপর দেওয়া কাজটুকু করে দিয়েই ও খুশি।

কোন কোনদিন আমাদের দূর টিকা থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা থাকলে টাট্টু নিয়ে বেরোই না। চাঁদের আলোয় অথবা টর্চ জ্বেলে বালু আমাকে পথ দেখিয়ে আনে। যত রাতই হোক আমাকে বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে বালু ভ্যালি পেরিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আমি কোন কোনদিন ওকে এগিয়ে দিয়ে আসার প্রস্তাব তুললে ও দ্রুত মাথা নেড়ে আমাকে বারণ করে।

অনেক সময় বাধা না শুনে আমি এগোই ওর সঙ্গে। গল্প করতে করতে কখন ওর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। বালু উঠতে থাকে পাহাড়ের ওপর। আমি নীচে থেকে দেখি। একটি নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তি ভাঙাচোরা উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে চলতে থাকে! সারাদিনের শ্রান্তির পর সামান্য আহার আর বিশ্রামের জন্যে ঘরে ফেরা। তারপর ভোর না হতেই কাজের সন্ধানে আবার পথ চলা।

পণ্ডিতজীর জন্যে হয়ত শেষরাতে খাবার তৈরি কবে রেখে দেয় বালু। কাজে বেরোবার আগে ঘোরাল থেকে গরুটিকে বাইরে এনে বেঁধে খাবার আর জল দিয়ে যায় সে। দুপুরে একবার ফিরে আসে। পিতাজীকে খেতে দেয়, পরিচর্যা করে। সংসারের দুচারটে কাজ করে আবার বেরিয়ে পড়ে।

ফিরে আসতে আসতে ভাবি, কতদিন এমন করে কাটাবে বালু। একদিন হয়ত দেখবে, বুড়ো পিতাজীর সেবা করতে করতে তার জীবনের অনেকগুলো বসন্ত-দিন কখন নিঃশব্দে পার হয়ে গেছে। তখন কোন প্রিয়জনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে গেলেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠে আসবে তাঁর বুক ঠেলে।

কোনদিন ফিরে চলার পথে হঠাৎ পেছনে তাকালে দেখতে পাই, বালু চাঁদের আলোয় উঠোনের সামনে ফসল রাখা পেরুর গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। মনে মনে কষ্ট হয়। জীবনের এ সময়টিতে কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটাই তো স্বাভাবিক। কি পাব আর কি পাব না, তার হিসাব কষে মানুষ কোনদিনই ফাল্গুনদিনের স্বপ্ন দেখে না। বালু হয়ত মনে মনে কোন অতিথি-সমাগমের স্বপ্ন দেখে।

নির্জন পথে দিনের পর দিন চলতে চলতে বালু একসময় আমার মনের কাছে সরে এল। এখন ওকে আর অনেক দূরের মানুষ মনে হয় না। আমরা টুকরো টুকরো কথা বলে নির্জন পথ চলার ভারটুকুকে লঘু করে তুলি।

এক সন্ধ্যায় ভ্যালি পেরিয়ে ওর বাড়ির পথে যাচ্ছিলাম। আমি ঘোড়ার ওপর, বালু ঘোড়ার লাগাম ধরে আগে আগে চলেছে। চাঁদ উঠেছে পাইন গাছের মাথায়। ভরা চাঁদের রাত দেখে টাট্টুটাকে এনেছি সঙ্গে। ফেরার পথে একা যখন ভ্যালি পেরিয়ে যাব, তখন এই অতি বাধ্য জীবটিই আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আমি চোখ বুজে থাকলেও ও আমাকে অতি বিশ্বস্ত পদচারণে পৌঁছে দেবে আমার বাংলোতে। আমার পথ-পরিক্রমার মানচিত্রখানা ওর যেন মুখস্থ।

আমি বালুর পাশে পাশে হেঁটে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বালু কোন কথা শোনে নি। আমাকে প্রায় জোর করেই টাট্টুর ওপর উঠিয়েছে। আমি টাট্টুতে না উঠলে সে একটি পাও আর নাড়বে না। এই হুঁশিয়ারীকে মান্য করেই আমি টাট্টুতে উঠেছি। বালু নিজের হাতে লাগাম ধরে ভ্যালির সমতলটুকু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর সে যেন মেতে উঠেছে খুশির খেলায়।

এক জায়গায় এসে টাট্টু থেকে নেমে পড়লাম। চড়াইতে লাগাম ধরতে হবে। নেমেই বললাম, বালু এস আমরা এখানটায় বসে একটু গল্প করি।

বালু টাট্টুর লাগাম ছেড়ে দিল। বাধ্য সেবকের মত জীবটি দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। আমরা একখণ্ড পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

বালু হাঁটুতে থুত্‌নি গুঁজে বসে আস্তে আস্তে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল।

বললাম, তুমি এ পাহাড়ী দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেছ নিশ্চয়ই?

বালুর হাল্কা দুলুনিটা থেমে গেল। ও হাঁটুর ওপরে রাখা মুখখানা কাৎ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, অনেক।

বললাম, বিয়ের ভেতর তো অনেক অনুষ্ঠান থাকে, কোনটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় বালু?

ও তার হাঁটুতে তেমনি মুখ গুঁজে বসে রইল। সোজা হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি বলবে তাই বোধহয় ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, বর, আসবে তাই সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বর আসছে অনেক দূরের থেকে।

এই সময়টা বাবুজী আমার খুব ভাল লাগে। তারপর বর কাছে এলেই সবাই যখন তাকে ঘরেব ভেতর ডেকে নেয় তখন মনে হয় সে মানুষটি যেন বাড়ির সকলের অনেক অনেক দিনের চেনা। এ ব্যাপারটাও বাবুজী আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগে।

হেসে বললাম, এ সবই তো বিয়ের ব্যাপার দেখছি।

বালু বলল, তাহলে শেষের কথা শোনাই। সে বড় দুঃখের বাবুজী। মেয়ে কোঠী ছেড়ে চলে যাচ্ছে এতদিনের সব খেলাধুলো ফেলে। 'বেটী কি বিদাই' শুরু হয়ে গেল। সবার চোখে তখন আঁসু নেমেছে।

বললাম, কি রকম সে অনুষ্ঠান বালু?

ও বলল, মেয়ে তার পিতাজীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমার ঘরের ভেতর আমার পুতুল ছেড়ে যাচ্ছি।

তেবেয়াঁ মহলাঁ দে অন্দর জী
বাবা মরিয়াঁ গুড়িয়াঁ রহিয়াঁ।

পিতাজী তখন মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, তুমি বাড়ি যাও মা, আমি তোমার পুতুলগুলো তোমার নতুন ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তেরিয়াঁ গুড়িয়াঁ দিংগে পজাঈ
ধীয়ে ঘর জা আপনে।

বললাম, বালু তোমার যখন বিয়ে হবে তখন তোমার পিতাজীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে, তাই না?

ও প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় বলল, বাবুজী, আপনি ডাক্তার, আপনি তো সবই জানেন। পিতাজীকে ছেড়ে কোন জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে কি আর সম্ভব?

কথাটা বলেই ও আবার ওর মুখখানা হাঁটুর ওপর রেখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আমি ওর কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। সহজ লঘু ছন্দে শুরু করেছিলাম কথা কিন্তু কথাটা যে এমন একটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে তা ভাবতে পারি নি।

একটি মেয়ে তার অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না, অথচ তার যৌবন স্বামীপ্রার্থনায় কুঁড়ির ভেতর অবরুদ্ধ গন্ধের মত গুমরে গুমরে কাঁদছে, এ ছবি আমাকে বিহ্বল করে তুলল।

এক সময় বললাম, বালু জীবন কখনো সাজানো ছকে ঘর গুনে গুনে চলে না। কোথা দিয়ে কখন

কি ঘটে যায় তা কে বলতে পারে। তুমি যা ভেবেছ বা আর কেউ যা ভাবছে, তার সবকিছুকে ভণ্ডুল করে দিয়ে ঐ ওপরওয়ালার ভাবনাই কাজ করে যায়।

বালু আমার দিকে হঠাৎ ওর মুখখানা ফিরিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

আমি পরিস্থিতিটাকে লঘু করে দেবার জন্যে বললাম, দেখি তোমার হাতখানা, বালু।

ও হাঁটু থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে নিঃসংকোচে ওর হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরেই বুঝলাম, বালু উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমি ওর হাতের পাতাখানা আমার হাতের ওপর রেখে চাঁদের আলোয় রেখাগুলো পড়তে লাগলাম। খুব বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ এদিকওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, হুঁ।

পৃথিবীতে যে ব্যাপারগুলো মানুষের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি জাগিয়ে তোলে, তার ভেতর হাতদেখা অদ্বিতীয়। এ ব্যাপারে নারীপুরুষের আগ্রহে কোন ভেদ নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হয়, মেয়েদের আগ্রহ এ ব্যাপারে সীমাহীন।

বালু এতক্ষণে একেবারে ঘুরে বসেছে আমার দিকে। আমি হুঁ বলতেই ও ওর বড় বড় চোখের পরিপূর্ণ চাউনি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, কোন সময় একটা বড় রকমের অসুখে পড়েছিলে বালু?

হাঁ বাবুজী।

দেখলাম, বালুর গলা উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি যে একজন সত্যিকারের হাত দেখনেওয়ালা তাতে তার মনে কোন সংশয় নেই।

বললাম, তোমার হাতের রেখা তাই বলছে বালু। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তুমি কোন কঠিন অসুখে ভুগেছিলে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন বাবুজী। কি একটা অসুখে ভুগতে ভুগতে আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। এক আঙ্‌রেজ ডাক্তার ছিলেন তখন, তাঁর চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাই।

বালুর ছেলেবেলার অসুখের ব্যাপারটা আমি কথায় কথায় একদিন পণ্ডিতজীর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। আজ ওটা দিয়ে আমার হাতদেখা বিদ্যেতে পাসমার্ক পেয়ে গেলাম।

আমার দ্বিতীয় কথা আর বালুর অতীতকে নিয়ে নয়, কারণ সেখানে আর কোন পুঁজি নেই আমার। এখন ওর বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞের মত একটা চাল চেলে বসলাম।

বললাম, বালু, দারুণ একটা অশান্তি আজকাল মাঝে মাঝে তোমার মনটাকে বড় চঞ্চল করে তোলে, তাই না? তার থেকে তুমি বেরিয়ে আসার জন্যে খুবই চেষ্টা কর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পথই খুঁজে পাও না।

বালু মাথা নেড়ে বলল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবুজী আপনার কথা শুনে। আমার মনটা একেবারে আয়না ধরে আপনি দেখে নিয়েছেন।

মেয়েটির যৌবনের পাখিটা রঙীন পাখা মেলে উড়ছে। কোন উত্তপ্ত নীড় থেকে হয়ত তার কাছে আসে আভাসে ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ। তার সারা দেহমন সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা কঠিন কর্তব্যের সুতো ঘুড়ির মত তার সব ইচ্ছাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর।

বালুর মত তরুণী মনের অবদমিত ইচ্ছার কথাটা আমার অজানা নয়, তাই ওর বর্তমান নিয়ে ঐ ধরনের একটা মন্তব্য করা আমার পক্ষে কোন ভাবনার ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু বালু! কি সহজ আর গভীর বিশ্বাসে এই মিথ্যাচারী মানুষটার সব কথা নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

এবার ওর ভবিষ্যতের ওপর কিছু বলতে হবে। আমি বালুর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপরই কিছু মন্তব্য করতে চেয়েছিলাম। আর তাই ওর বিশ্বাসটাকে পাকা করে নেবার জন্যে অতীত আর বর্তমানের অবতারণা করেছিলাম।

বললাম, বালু, আশ্চর্য তোমার হাতের রেখা। তুমি খুব সুখী হবে একদিন। এখন যত কষ্ট, তখন তত সুখ। চাঁদের আলোতেও তোমার হাতের ভাগ্যরেখাটা অমার তারের মত জ্বলজ্বল করছে।

বালু হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অমনি আমার মনে হল, তউন্দির দিনে কুলুর পাহাড়ঘেরা তপ্ত ভ্যালিতে হঠাৎ এক একটা হাওয়া কোথা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই হাওয়া স্তব্ধ পাইনের পাতা কাঁপিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে আবার কোথায় চলে যায়। ক্ষীণ আশার একটা আভাস জাগিয়ে গভীর নিরাশার ভেতর ফেলে দিয়ে যায়।

বালুর দীর্ঘশ্বাসে সেই নিরাশার সুর বেজে উঠল দেখে বললাম, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো বালু। সব হতাশার মেঘ একদিন তোমার বুকের ওপর থেকে কোথায় উড়ে চলে যাবে, তুমি জানতেও পারবে না। আমার কথা মিথ্যে হবে না বালু।

শেষের বাক্যটা আমার মন যেন একটা সত্যের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল। আমি বুঝতে পারলাম না, এতক্ষণ মিথ্যার অভিনয় করতে গিয়ে কেন হঠাৎ একটুখানি সত্যের জন্য আমার সমস্ত প্রাণ এমন প্রার্থনার মত বেজে উঠল।

বালু কিন্তু আমার হাত থেকে ওর হাতখানা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

আমি বললাম, কান্নার এতে কি আছে বালু। আমি এ বয়সে যতটুকু দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় বলতে পাবি, ভাগ্য দীর্ঘদিন কাউকে দুঃখে বা সুখে ফেলে রাখে না।

কিছুক্ষণ পরে আবেগটুকু উপছে পড়ে মনটা যখন স্থির হয়ে এল, তখন জ্যোৎস্নার মত নরম গলায় বালু বলল, বাবুজী, সুখ যদি আসে সে আমার ভাগ্য। তবে সেই দুরাশার ছবি কোনদিনও আমি দেখি না।

আমি বললাম, তুমি যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। তাই তোমার চারদিকে বিপদ ওৎ পেতে থাকবে বালু। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শক্তিতেই সব বিপদ-আপদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

বালু এ কথার কোন জবাব দিল না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, আমার এ ধারণা কত ভুল। একটি মেয়ের সরলতা আর সৌন্দর্য তার কতবড় শত্রু হতে পারে, সে প্রমাণ পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। কস্তুরী হরিণীর মত সে সহজেই শিকার হয়ে পড়ে যে কোন সুচতুর লোলুপ ব্যাধের।

বাহাদুর ভাগ্‌তু একা গিয়েছিল নাগ্‌গরে। ক'দিন কাটিয়ে ফিরে এল। এবার একা নয়, সঙ্গে এলো যে তাকে সন্ধ্যার আবছায়ায় চিনতে পারিনি। সে আপেল গাছের ডালভরা সবুজ ফল আর পাতার তলায় সন্ধ্যার ধূসর আলোয়ানখানা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইদানীং ডেলিভারী কেসগুলোতে ডাক'পড়ছে প্রায়ই। প্রথম প্রথম কিছু কিছু সঙ্কোচ আর সংস্কার ছিল পাহাড়ীদের মনে। এখন বালু সঙ্গে থাকায় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে আর সময় লাগছে না। তাছাড়া অনিবার্য প্রয়োজন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার সংস্কারের ঢাকাখানা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

আমি বাংলোর পাশ দিয়ে যখন বালুকে এগিয়ে দিতে ভ্যালির দিকে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে শেষ আলোর যাই যাই ভাব। বালু আমার টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। আমরা কিছু পথ একসঙ্গে গিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হলাম। বালুর হাতে দিলাম আমার টর্চ। ও ভ্যালিতে নেমে গেল, আমি বাঁধান রাস্তা ধরে ফিরে এলাম টাট্টুতে চড়ে।

বাংলোর সামনে টাট্টু থেকে নেমেই যে ছায়ামূর্তি দেখলাম তাকে ঘন সন্ধ্যার আলোয় চেনা সম্ভব ছিল না। সে যে আমার রাঁধুনী মুন্‌নী নয় তা আমি জানতাম। কারণ মুন্‌নী কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয়। সে স্বভাবে ক্ষিপ্র। দ্রুত কাজ সেরে সরে যায়। একটি পলকও সে কাজের বাইরে তাকিয়ে অকারণে খরচ করে না।

তবে মেয়েটি কে ! কোন কথা বলছে না সে। মনে হল আমার দিকেই চেয়ে আছে! আমিও কোন কথা না বলে টাট্টুটাকে টেনে নিয়ে এসে বেঁধে রাখলাম যথাস্থানে।

সামনে এসে দাঁড়াল ভাগ্‌তু। মিঠি মিঠি হাসছে।

বললাম, তুই কখন এলি?

আমার গলার স্বরে আনন্দের উত্তেজনাটুকু চেপে রাখা গেল না। ভাগ্‌তুর উপস্থিতির ভেতর তখন

নতুন একটা জগতের ছবি দেখছিলাম আমি।

ভাগ্‌তু বলল, এসেছি সেই দুপুরবেলা। তখন সবে আপনি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সারা দুপুরের ক্লান্তির পর আমি একটু বিশুদ্ধ ঝরঝরে হতে চাই। তারপর ভাগ্‌তুকে পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেব আমাব ঝিন্নিব কথা।

স্নান সেরে পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই ভাগ্‌তুর মুখোমুখি হলাম।

ভাগ্‌তু বলল, খাবার ঘরে যান, আপনার চা দেওয়া হয়েছে।

ঢুকে পড়লাম ডাইনিং রুমে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে কিছু ডালমুট, দুখানা ক্রিমক্যাকার বিস্কুট। মুখ নীচু করে কাপে চা ঢালছে ঝিন্নি।

আমি প্র য় চেঁচিয়ে উঠলাম, ঝিন্নি তুমি!

ও মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল, এসো, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, কিছু খেয়ে নাও।

আমি পলকে ঝিন্নির পাশে গিয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম, ঝিন্নি একটু তফাতে সরে গিয়ে বলল, আঃ কি হচ্ছে, ভাগ্‌তু বাইরে দাঁড়িয়ে না?

চেঁচিয়ে ডাকলাম, ভাগ্‌তু।

ভাগ্‌তু কাছেই ছিল, এসে দাঁড়াল। বললাম, দিদি এসেছে মেঠাই আনিসনি বোকারাম। বুদ্ধি খরচ করে এটুকু তো করতে হয়। যা এখুনি বাজার থেকে নিয়ে আয়।

আমি এই মুহূর্তে ভাগ্‌তুটাকে ঘর থেকে ভাগাতে চাইছি।

কিন্তু এবারও বাদ সাধল ঝিন্নি। বলল, কোন দরকার নেই ওর বাজারে গিয়ে। আমি মেঠাই এনেছি।

ঝিন্নি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা কৌটো এনে রাখল খাবার টেবিলে। কৌটো খুলে একটা লাড্ডু বের করে আমার প্লেটে রেখে বলল, নাও খাও।

দমে গেলাম। আমি যেন সত্যি লাড্ডু খেতে চাইছি।

বেশ খানিকটা অভিমান নিয়ে ডালমুট চিবুতে চিবুতে আমি চা খাচ্ছিলাম। পাশের একটা চেয়াবে বসে ঝিন্নি তার চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। কোন কথা হচ্ছিল না আমাদের ভেতর। এখন আমি প্রতি মুহূর্তে ঝিন্নির মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে কান পেতে ছিলাম।

ঝিন্নি কথা বলল, আর কিছু দেব?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথার উত্তর নিজেই তৈরি করে নিয়ে বলল, এখন বেশি কিছু খেলে তো আবার রাতের খাবার খেতে চাইবে না। তার চেয়ে থাক।

বললাম, আমি যখন বাংলোতে ঢুকি তখন তুমিই কি বাগানের আবছায়ায় দাঁড়িয়েছিলে ঝিন্নি?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে অন্য কোন মেয়ে।

বললাম, কে সে ঝিন্নি?

ও বলল, কি দরকার তার খবর জেনে? তার খোঁজ নেবার দরকার থাকলে বাংলোতে ঢোকার মুখেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারতে।

বললাম, ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। আমি অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারিনি।

ঝিন্নি অমনি বলল, বললাম তো আমি নই।

এখন আমার কোন সন্দেহই রইল না যে আপেল গাছটার তলায় সন্ধ্যার আবছায়ায় ঝিন্নিই দাঁড়িয়েছিল। ওকে কোন প্রশ্ন করিনি তখন তাই তীব্র একটা অভিমানে ও নিজেকে কঠিন করে তুলেছে।

আমি চা খাওয়া শেষ করে শুধু বললাম, তুমি আজ তোমার ঘরে এসেছ ঝিন্নি, কারো ডাকেব অপেক্ষা রাখনি। তাই বলছি, এ ঘরের সুবিধে অসুবিধে সুখ দুঃখ সবই তোমার।

ঝিন্নি কোন কথা বলল না। কেবল দু-একবার আমার দিকে চোখের কোণে তাকাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বললাম, আমার আজ উৎসবের রাত ঝিন্নি, তুমি সেই উৎসবের দীপ জ্বালাবে মানালীর বাংলোতে।

কথাটা বলে আমি চলে এলাম আমার বসার ঘরে।

ঝিন্নি একটু পরেই আমার পাশ দিয়ে চলে গেল আমার শোবার ঘরের দিকে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, ঝিন্নির আর দেখা নেই।

আমি পায়ে পায়ে শোবার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আধভেজানো দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, আমার বিছানায় সুন্দর কাজকরা একটি বেডকভার পাতা রয়েছে। বুঝলাম, ঝিন্নির হাত পড়েছে বিছানায়।

ঝিন্নি কিন্তু ওখানে নেই। আমি আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। ঘরের এক কোণে টিপয়ের ওপর রাখা ফুলদানির ফুলগুলো একমনে দেখছে ঝিন্নি।

বললাম, অগোছালো ঘরখানার চেহারা একদম পাল্টে ফেলেছ দেখছি।

ঝিন্নি এবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, ফুলদানির এ ফুলগুলো কোথায় পেলে? আমাদের বাগানে তো নেই।

বললাম, বালু কোথা থেকে এনে সাজিয়ে রেখে গেছে।

ঝিন্নি ওখান থেকেই বলল, বালু কে?

বললাম, ভ্যালির ওপারে এক পণ্ডিতজী থাকেন, তাঁরই মেয়ে। বড় অসহায় তাই ডাক্তারখানার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

ঝিন্নি পায়ে পায়ে সরে এল আমার পাশে। আমার মুখের ওপর ওর স্থির দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, তুমি তো কোনদিন বালুর কথা আমাকে জানাও নি।

ঝিন্নির গলার স্বরে কি ছিল আমি জানি না, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। যাকে ভালবাসা যায় তার কাছ থেকে বুঝি কোন কিছু গোপন করে রাখতে নেই। এই সত্যটা এতদিন মনে জাগে নি বলে দারুণ একটা ক্ষোভ জন্মাল নিজের ওপর। আমি সহজভাবেই বালুর অসহায় অবস্থার কিছুটা সমাধান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা যে আর একজনকে জানানো দরকার তা আমি কোনদিন ভাবিনি। ঝিন্নির কাছে তাই বালুর প্রসঙ্গ অনুক্তই থেকে গেছে।

ঝিন্নির কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, তোমাকে বালুর কথা না জানিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছি ঝিন্নি। আমি ভাবতেও পারি নি যে এমন একটা তুচ্ছ ঘটনা তোমাকে জানানো আমার উচিত ছিল।

ঝিন্নি বলল, তুচ্ছ ঘটনা বলছ কেন। তোমার আমার ভেতর ছোটবড় বলে তো কিছু থাকতে পারে না। দুজনে আমরা দুজনের কাছে সব কথা খুলে বলব, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন।

বললাম, ভুল যদি হয়ে থাকে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঝিন্নি।

হয়ত আমার গলার স্বরে একটা অভিমান বেজে উঠে থাকবে, ঝিন্নি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম! সেই মুহূর্তে কোন কথা বলে মিথ্যে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করলাম না।

একটা সন্দেহের কীট সূক্ষ্ম কোন ছিদ্র-পথে ঢুকে পড়েছে ঝিন্নির মনের মধ্যে। সে কীট ইতিমধ্যেই তার ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বাসের বাতাসে ভরা বুকখানাকে সে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে চলেছে।

আমার কেন জানি না মনে হল দুটি সূত্র থেকে বালুর খবর পেয়েছে ঝিন্নি। ভাগ্তু যখন নাগ্‌গরে ছিল তখন কৌতূহলী ঝিন্নি আমার প্রতিদিনের কাজকর্মের হিসেব নিয়েছে ভাগ্তুর কাছ থেকে। আর এটাই তো তার দিক থেকে স্বাভাবিক। সরল ভাগ্তুর মুখে সহজেই এসে পড়েছে বালুর নাম আর তার প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মের কথা। আমার সঙ্গে কাজের ভেতর দিয়ে তার সংযোগ। ডাক্তারীর ব্যাপারে আমাদের দিনেরাতে একই সঙ্গে বাইরে ঘোরাফেরা।

এই ব্যাপারই ঝিন্নিকে টেনে এনেছে নাগ্‌গর থেকে মানালীর বাংলোতে। এখানে এসে মনে হয় সে

দেখেছে বেলাশেষের পথ ধরে বাংলোর পাশ দিয়ে আমাকে আর বালুকে এগিয়ে যেতে।

ঝিন্নিকে বুকে ধরে রেখে বললাম, এক বুকে দুজনের কি করে জায়গা হয় ঝিন্নি?

ও সঙ্গে সঙ্গে আরও জল ঝরাল আমার বুকে। কেঁদে কেঁদে একসময় কিছুটা শান্ত হল। আমি বুঝতে পারলাম দারুণ একটা ব্যথা ও বুকে বয়ে এনেছিল নাগ্‌গর থেকে।

আমি ওর হাত ধরে টেনে এনে বসালাম বিছানার ওপর। বললাম, আসা অব্দি আমার ঝিন্নির মুখখানা ভাল করে দেখতে পাইনি, আমাকে একটু দেখতে দাও।

বলতে বলতে আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে সুইচটা অন করে দিলাম। অমনি ঝিন্নি হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফেলেছে।

ঘরের উত্তর দিকের জানালাটা কেবল খোলা। ওদিকে প্রসারিত ভ্যালি আর তার ঠিক পরেই পাহাড়ের বুকে পাইন সিডারের অরণ্য। সবার পেছনে ঝকঝকে তুষার পাহাড়।

চাঁদ ওঠেনি এখনও। আমি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝিন্নির দিকে তাকালাম। ওর মুখখানা ঢাকা। আমি শুধু ওর আলোয় ভাসা আঙুলগুলো দেখতে পেলাম। বালুর সঙ্গে ওর আঙুলের তফাতটা চোখে পড়ে। ঝিন্নি শিল্পী আর বালু কর্মী। সারাদিন কাজের চাকায় ঘুরছে বালুর দুখানা হাত। কিছুটা শক্তির রুক্ষতা সে হাতের আঙুলে। আর ঝিন্নি সব কাজের ভেতর থেকেও শিল্পীর হাতের সুষমাটুকু বাঁচিয়ে চলেছে।

ওর হাতের আংটিতে বড় একটা হলুদ পাথর। আলো পড়ে ভারী কোমল একটা আভা ছড়াচ্ছে। ওর নিটোল কনকচাঁপা রঙের আঙুলগুলো ঠিক যেন জাফরীর মত ঢেকে রেখেছে অন্দরমহলের রহস্য।

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, তোমার সুন্দর আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য লাগচে মুখখানা। ঠিক যেন রহস্যজড়ানো কারুকার্য।

ঝিন্নি আঙুলের ফাঁকগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় করে ফেলল আর অমনি ওর মুখের কারুকার্যগুলো ঢাকা পড়ে গেল।

ওর পাশে বসে ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর ওর দু-হাতের আঙুলে দুটো চাঁপাফুল ফুটিয়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখল মুখখানা।

আমি আর ওর মুখ দেখতে চাইলাম না। ওর বাদামী চুলে ভরা মাথার ওপর আমার থুতনিটা আলতো করে চেপে ধরে চুপচাপ ওকে অনুভব করতে লাগলাম।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ভাগ্‌তু বাগান পেরিয়ে চলে গেল বাইরের ঘরে শুতে। আমি শোবার ঘরে আসার পথে দেখলাম, রসুইখানার পাশে আব্‌রীতে আর একখানা বিছানা পাতা। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ঝিন্নি কি তাহলে এখানে শোবার আয়োজন করেছে!

ঝিন্নি নীচে গেছে ভাগ্‌তুর সঙ্গে। চাঁদটা কোথায় যেন গাছের ডালে পাতায় আটকে আছে, আব আলো এসে পড়েছে বাগানে। আমি শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভ্যালিটা চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে পাতলা দুধে ভরা। ভ্যালির উত্তরের পাহাড়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি তখনও। তবে তার ওপারে পীরপাঞ্জালের চূড়োর সাদা বরফ চাঁদের আলোয় বেশ ফুটে উঠেছে।

আমার শোবার ঘরের আলো নেভানো। বারান্দার আলো জ্বলছে। আমি ভ্যালির দিকে চেয়ে বালুর ঘরখানার অবস্থিতি আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক দূরের অতি ক্ষুদ্র একখানা কোঠী দিনের আলোতেই স্পষ্ট দেখা যায় না, রাতের আবছায়ায় সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

এখন বালু কি করছে? সারাদিনের শ্রান্তির পর ঘরের মেঝেতে বিছানো খিন্দের ওপর শুয়ে পড়েছে। হয়ত এখন অচেতনে ঘুমোচ্ছে সে। হয়ত বা সে আদপেই ঘুমোচ্ছে না। ঝোরকার রন্ধ্রপথে আমারই মত চেয়ে আছে ভ্যালির দিকে। এমনও হতে পারে আমারই মত বালুও খুঁজছে একখানা ঘর, যে ঘরখানা ভ্যালির রহস্যসাগরের পরপারে।

বালুর ভাবনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই, তার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয়। সে কম কথা বলে। আমার ইঙ্গিতগুলো সে সহজে ধরে নিয়ে কাজ করে যাবার মত বুদ্ধি রাখে। ডাক্তার হিসেবে ওতেই আমি খুশি। কিন্তু একটি তরুণীর ভাবনা কল্পনা নিশ্চয়ই শুধু তার কর্তব্যের সীমানাতেই শেষ হয়ে যায় না, চাঁদের আলোর মত জীবনের রহস্যময় অন্ধকারকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়াতেই তার সুখ-দুঃখ। রাতের একটি তগ্‌গর ফুলের গন্ধ নিতে নিতে কেন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা সে জানে না। বসন্তের উতল হাওয়া যখন ফুলেভরা আপেলের ডাল ছুঁয়ে বয়ে যায় তখন কেন সে চলতি পথে স্থির হয়ে দাঁড়ায় তাও তার কাজে অজানা। তবু এই অচেনা আধোচেনা জগতটাই তার ভাবনার রাজ্য। এ রাজ্যের পথে পথে সে উদাসী পথচাবিণী। শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, যেতে যেতে থেমে দাঁড়ানো, এ রাজ্যে চলার রীতি।

আমার ভাবনার পথ কিন্তু এখন একটি নির্দিষ্ট রাজ্যকে সিঁথির মত ভেদ করে চলে গেছে। তার দুধারের শোভা আর সম্পদ আমি আলো আর হাওয়ার মত স্পর্শ করে আছি।

ঝিন্নি কখন এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে জানতে পারি নি। হঠাৎ উত্তরের উপত্যকা থেকে বয়ে আসা একটা হাওয়া আমার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। সেই বাতাসের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠা ওর দোপাট্টার ছোঁয়া লাগল আমার মুখে।

ঝিন্নির দিকে ফিরে বললাম, স্টোররুমে বিছানা পাতা দেখে এলাম! তাই এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম ক্লান্ত হয়ে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঝিন্নি কোন কথা না বলে ইজিচেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আবার বললাম, ভাগ্‌তুকে ঘুম পাড়িয়ে এলে নাকি ?

ঝিন্নি এবারও কথা বলল না। শুধু চুলগুলো মুঠো করে ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে দিল। বুঝলাম, উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্যে ঝিন্নি আমাকে মৃদু তিরস্কার করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ও নিজেই কথা বলল, আমি কাল দুপুরের গাড়িতে চলে যাচ্ছি।

এবার আমি কোন কথা বললাম না।

ও হঠাৎ ওর দুটো হাত শাঁখে ফুঁ দেবার ভঙ্গীতে আমার কানের কাছে ধরে টেনে টেনে বলল, আমি কা-ল চলে যা-চ্ছি।

বললাম, তুমি নিজের ইচ্ছাতেই যখন এসেছ তখন যাবার সময়েও যে নিজের ইচ্ছাতেই যাবে তা তো জানা কথা।

ঝিন্নি বলল, এতক্ষণের ভেতর একটিবারও আমাকে থাকতে বলেছ তুমি?

বললাম, আশ্চর্য কথা বললে ঝিন্নি। তোমার ঘরে তুমি এসেছ, আমি তোমাকে থাকতে বলব কোন দুঃখে। লোকে জানি অতিথিকেই থাকবার অনুরোধ জানায়।

ঝিন্নি বলল, আমার খুব খারাপ লাগছে ছোটেসাহেব। কাল চলে যেতে হবে একথাটা যতবার মনে পড়ছে ততবারই ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে সময় নষ্ট করে চাচাজীকে বলে থাকবার একটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা করে ফেল।

ঝিন্নি বলল, চাচাজীকে বলার সময় এখনো আসে নি। অক্টোবরে আপেল তোলা শেষ হয়ে গেলে যখন চাচাজীর মন খুশিতে ভরে উঠবে ঠিক তখনই চাচাজীর অনুমতি চাইব। তারপর ডিসেম্বরের শেষে কোলি-রি-দেয়ালীর দিনে তোমার পথ চেয়ে থাকব। সেদিনটি মনে থাকবে তো?

ওর হাত ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে এনে বললাম, সব ভুলে যেতে পারি কিন্তু যে বিশেষ দিনটিতে ঝিন্নির বুকের উত্তাপ প্রথম পেয়েছিলাম সেদিনের কথা কি ভোলবার?

ঝিন্নি আমার কোলের ওপর বসে আমার বুকের ভেতর ওর হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তুমি রোগা হয়ে গেছ ছোটেসাহেব।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললাম, কখখনো না।

ঝিন্নি বলল, সত্যি বলছি, আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। নাগ্‌গর থেকে আসার পর তুমি যেন খুব তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে গেলে।

হেসে বললাম, তাহলে নিশ্চিত তোমার ভাবনা ভেবে।

ঝিন্নি আমার হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, বড্ড খাটুনি যাচ্ছে তোমার। রাতদিন পাহাড়ী টিকায় ঘুরে ঘুরে কাজ। ঠিকমত নাওয়াখাওয়ার ব্যবস্থা নেই।

বললাম, এ সব ইনফরমেশন শ্রীমান ভাগ্‌তুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই।

ঝিন্নি ধমকের সুরে বলল, তুমি আসল কথা বড্ড এড়িয়ে যাও ছোটেসাহেব। আমার কথাটা দয়া করে একটু শোন। দরকার পড়লে লোকেরা রোগীকে বয়ে আনবে হাসপাতালে, তুমি এখানে বসেই চিকিৎসা করবে। কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।

বললাম, ছেলেমানুষী করো না ঝিন্নি। সব সময় ঘরে বসে কি ডাক্তারী করা চলে?

ও অমনি বলল, বেশ তুমি যাবে, কিন্তু কথা দাও আমি যতদিন তোমার কাছে না আসি ততদিন একেবারে দরকার না পড়লে ডিসপেনসাবি ছেড়ে বাইরে চিকিৎসার জন্যে কোথাও বেরোবে না।

বললাম, কথা দিচ্ছি তেমন দরকার না পড়লে আমি আমার ঝিন্নির কথাই মেনে চলব।

ঝিন্নি চুপচাপ বসে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর আমার একখানা হাত তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, অনেক অন্যায় তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছি, তাই না ছোটেসাহেব? মানুষ বিপদে না পড়লে কি কাউকে কখনো ডাকে। ভাগ্‌তু বলেছিল, পাহাড়ী লোকেরা নাকি তোমাব নাম দিয়েছে নরসিং।

বললাম, কথাটা কানে এসেছে আমার কিন্তু এর মানেটা ঠিক বুঝতে পারি নি।

ঝিন্নি আমার কোলের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বিছানার ওপর। বলল, খেয়ে ঘুমিয়ে শরীরটা বড্ড হেভি হয়ে যাচ্ছে, তাই না।

বললাম, মোটেই না। তোমার শরীর নিয়ে কথা বলে কার সাধ্যি। এমন একখানা দর্শনীয় ফিগার বিশখানা টিকা ঢুড়লেও মিলবে না।

আমার কথায় ঝিন্নি যে খুশি হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম, ঝিন্নির কথান্তরে যাওয়া দেখে।

ও বলল, লোকে তোমাকে নরসিং বলে কেন জান? নরসিং দেবতা পাহাড়ী মেয়েদের সুস্থ সন্তান দেন আর সব রোগ সারিয়ে তোলেন।

বললাম, তোমাদের হাজারটি দেবতা আর অপদেবতার ঠেলায় গেলাম।

ঝিন্নি আমার মুখে সপ্তপর্ণীর পাতার মত তার হাতখানা চাপা দিয়ে বলল, অ্যাই, দেবতাকে নিযে খবরদার কথা বলবে না বলছি।

ও এক সময় হাত নামিয়ে নিলে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি অশিক্ষিত পাহাড়ী নও ঝিন্নি। আধুনিক শিক্ষা পেয়েছ, সবকিছু বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আছে তোমার। অকারণ কতকগুলো সংস্কার থাকবে কেন তোমার ভেতর?

ঝিন্নি চুপচাপ বসে রইল।

আমি বললাম, কিছুদিন আগের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি তোমাকে। রোগী দেখে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা টিকার পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলাম, অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে, কান ফাটিয়ে ড্রাম বাজছে। একটা ভেড়াকে চোখের সামনে বলি দেওয়া হল।

টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

বলির শেষে বাদ্যি বাজনা থেমে গেল। একটা লোক গড় গড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল :

পর্বত গুফা ওৎ বসে বাপ তেরা
সিন্দু বীর তু হ্যাঁয় ভাই মেরা
উগুর বীর কা পৌত্‌রা
গুরাঁ কা শিখ্‌ হামারা
সন্দিয়া আয়ে
হামাবা ভেজাইয়া আয়ে
হামারা কম্‌ সিতাব কর্‌ আয়ে ....।

আরও অনেক মন্ত্র বলে গেল লোকটা। দ্বিতীয় দিন আমি পেশেন্টকে দেখে ফেরার পথে লোকটাকে ক্রমাগত তেমনি মন্ত্র পড়ে যেতে দেখলাম। বালুর মুখে শুনলাম, লোকটাকে নাকি 'চেলা' বলে। ও সিন্দুবীরের আত্মাকে ডাকছে। রোজ একশো একবার লোকটা ঐ একই মন্ত্র পড়বে। এমনি একুশ দিন মন্ত্র পড়া আর পূজো চলবে। তারপর গদ্দীর পোশাক পরে হুইসিল দিতে দিতে নাকি সিন্দুবীর আসবেন। তিনি যত নষ্টের দেবতা। তাই তাঁকে শান্ত করার জন্যে এই চেষ্টা।

ঝিন্নি বলল, আমি উগুর বীরের পৌত্র সিন্দুবীরের কথা জানি ছোটেসাহেব।

বললাম, কিন্তু ঐ চেলার পরিণতির কথাটা তুমি জান না।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, একদিন একটা লোককে আমার ডিসপেনসারিতে কয়েকজন পাহাড়ী মিলে বয়ে নিয়ে এল। দেখি সেই চেলা, যে সিন্দুবীরের মন্ত্র আওড়াচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কোন এক টিকায় লোকটা গিয়েছিল গণৎকার হয়ে। সেখানে ওর ওপর নাকি কোন দেবতার আত্মা ভর করে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের হাতে ধরা লোহার কড়া দিয়ে আঘাত করতে করতে শরীরটাকে রক্তাক্ত করে ফেলে। মুখে কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে যায়। শেষে ঘণ্টা দুয়েক কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ঝিন্নি বলল, ওর ওপর নরসিং দেবতার ভর হয়েছিল। দেবতার ভর না হলে ওরা কিছু বলতে পারে না। ওদের কাঁপুনি এলেই বুঝতে হবে দেবতার ভর হয়েছে।

হেসে বললাম, ওর ওপর নরসিং দেবতার ভর হয়েছিল কিনা জানি না, তবে আমার ওপর তোমাদের ঐ চেলা পুরো একটি দিন আর একটি রাতের জন্যে ভর করেছিল।

ঝিন্নির চোখে ঔৎসুক্য। বলল, কি হয়েছিল ওর?

বললাম, উদ্দাম নাচ নাচতে নাচতে লোহার কড়া দিয়ে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করা ওদের অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ঐ করতে গিয়ে লোকটা মরল টিটেনাসে।

ঝিন্নি বিস্ময়ের একটা শব্দ করে বলল, মারা গেল!

বললাম, ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে আর এইসব চেলাদের মৃত্যু ওদের নিজেদের তৈরি মন্ত্রতন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের হাতে।

দেখলাম, ঝিন্নির ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন উপায় বড় একটা হাতে ছিল না। টিটেনাস স্টার্ট করে গিয়েছিল।

ঝিন্নি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, জানো, আমি বেশ বুঝি এসব বড় পুরনো সংস্কার, এতে মানুষের ক্ষতিই হয়। তবু সংস্কারগুলো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারি না।

হেসে বললাম, এগুলোও এক ধরনের রোগ ঝিন্নি। তুমি যখন আমার কাছে একেবারে চলে আসবে তখন প্রথমেই তোমার সংস্কারগুলো সরিয়ে নেব। তারপর দুজনে মিলে ঐ সংস্কারগুলোকে সাফ্ করার জন্য টিকায় টিকায় বিজয় অভিযান চালাব।

ঝিন্নি হঠাৎ ওর দু-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, তুমি দারুণ অবিশ্বাসী ছোটেসাহেব। তোমার কিছু হলে দেখো আমি মরে যাব।

বললাম, তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে? বেকার ডাক্তারী শিখিনি। তাছাড়া অত সহজে তোমার ছোটেসাহেবের কিছু হবে না ঝিন্নি, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমি আলো নিভিয়ে দিলাম। এ জগতে আমি আর ঝিন্নি ছাড়া কেউ নেই এখন। জানালার বাইরে সেই রহস্যময় উপত্যকা চাঁদের আলোয় আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মনে হল, যে তরুণীকে আমি বুকের ভেতর জড়িয়ে বসে আছি, সে ঐ সুপ্রাচীন পর্বতের মতই পুরোনো, ঐ রাতের উপত্যকার মতই চির রহস্যময়।

মনে মনে ভাবলাম, আমরা সকলেই সংস্কারকে দূর করতে চাই, কিন্তু নিজেরা সৃষ্টির শুরু থেকে একটা অচ্ছেদ্য সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছি। তাই আজ এই রাতে ঝিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, ও ঝিন্নি নয়, ও একটি তরুণী, যাকে আমি মনুষ্যসৃষ্টির আদি থেকে বুকে নিয়ে বসে আছি।

ভোরবেলা গা এলিয়ে দিয়েছি ওপরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তটিকে এইভাবে দেখা আমার এক ধরনের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

নীচের বাগানে ভাগ্‌তুর সঙ্গে খেলায় মেতেছে ঝিন্নি। একটা বল নিয়ে লোফালুফি খেলছে। কে বলবে কাল রাতে এক পূর্ণ বিকশিত নারীকে আমি বুকের মাঝে টেনে নিয়েছিলাম। আজ ভোরে ঝিন্নি একেবারে মুকুলিকা বালিকা বয়সী। দৌড়ে দৌড়ে খেলছে ও। কানের ঝুমকো এক-একবার দারুণ বেগে দোল খাচ্ছে। বিনুনী কাঁধ টপকে বুকে লাফিয়ে পড়ছে। ভাগ্‌তুটা সমানে এদিক-ওদিক বল ছুঁড়ে ঝিন্নিকে বিব্রত করে তুলছে। ঝিন্নি কিন্তু বসে থাকা ভাগ্‌তুর কোলের ওপর নিশানা করে বল ছুঁড়ছে!

আমি ছিলাম ওদের খেলার একমাত্র দর্শক। এখন আমরা তিনজন দেখছি ওদের খেলা। পূবের পাহাড়ে গাছের ডালপাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে সকালের সূর্য। আর এইমাত্র পাশের আপেল গাছের ডালে তিরতির করে উঠে গিয়ে লেজ তুলে তাবিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে একটা কাঠবেড়ালী।

ঝিন্নি নিজের দেহটাকে নিয়ে কি অসম্ভব দ্রুততায় আশ্চর্য ভাঙচুর করতে পারে। আমি ঝিন্নিকে নতুন একটা রূপে দেখছি আজ। সবচেয়ে যেটা আমার চোখ আর মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে সেটা ঝিন্নির নিজস্ব একটা ছন্দ। সে ছন্দ বারে বারে উচ্ছ্বলিত হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসছে।

এক চিলতে ভোরের রোদে ও মাখামাখি হয়ে গেল। ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো গুঁড়ি গুঁড়ি মুক্তোর দানা ওর কপালে ফুটে উঠেছে।

হুড়োহুড়ি করে ঝিন্নি কিছুটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার এখুনি ওকে ওপরে ডেকে নেওয়া দরকার। আমার পাশে বসে ও গল্প করবে আর সকালের হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে ওর ঘামের কুঁড়িগুলো।

কিন্তু আমি ওকে ডাকলাম না! লোভীর মত ওর শ্রমের মূল্যবান ফসলগুলো আমি কুড়োতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল আমার বাগানের রাস্তায়। বালু রোজকার মত উঠে আসছে ওপরে। ও একমনে পথ চলে। এদিক ওদিক বড় একটা তাকায় না। আমি যে এসময় ওপরে বসে থাকি তা ও জানে, তবু সামান্য কৌতূহল নিয়ে ওপরের দিকে একটি দিনও তাকাতে দেখিনি বালুকে।

ওর হাতে ফুল! ভ্যালির মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, তার থেকে ছোট ডাল সমেত ফুল সংগ্রহ করে আনে ও। তারপর আমার বসার আর শোবার ঘরের ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে ফুলগুলো। ফুল সাজানোতে নিপুণতা আছে বালুর।

বাগানে উঠে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে বালু। একপাক সজোরে ঘুরপাক খেয়ে ঝিন্নি আস্তে বলটা ভাগ্‌তুর কোলে ফেলে দিতেই খিলখিল করে শিশুর মত হেসে উঠেছে ভাগ্‌তু।

ঝিন্নি এখন বালুর মুখোমুখি। দুজনে দেখছে দুজনকে। সোনালী জলে স্নান করে দুটি তরুণী যেন মুখোমুখি সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে। একজনের মুখে রাজপুত তরুণীর আদল, অন্যজনের বিশুদ্ধ নাগরকোটীয় ব্রাহ্মণের চেহারা।

একটু পরেই বালু ঝিন্নির ওপর থেকে তার বিস্ময়ে ভরা চোখের দৃষ্টি তুলে নিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল। চোখদুটো পথের ওপর। শান্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। মুখখানা থমথমে। হঠাৎ ভাবনার একটা ঢেউ লেগেছে।

ঝিন্নি চঞ্চল পায়ে ছুটে এল ওর কাছে।

তুমি বালু?

বালু থেমে গিয়ে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে জানাল, ওর অনুমান ঠিক।

ঝিন্নি বলল, বাঃ ফুলগুলো তো ভারি সুন্দর। ভায়োলেট রঙের। ডাল ভরে ছড়িয়ে আছে। একদম তাজা।

বালু কি মনে করে ওর হাতে ফুলগুলো তুলে দিল।

ঝিন্নি বলল, চল আমরা দুজনে মিলে সাজাই।

বালু নতুন পরিস্থিতিতে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। ঝিন্নি কিন্তু খুব স্বাভাবিক আচরণে নিজেকে

ফুটিয়ে তুলল।

ওরা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলে আমি আর ওদের দেখতে পেলাম না।

নিজেদের ভেতর ওরা কি কথা বলছে আমি জানি না। ঝিন্নি বুদ্ধিমতী আর সম্ভ্রান্ত। তাই সে এমন কথা বলবে না বা এমন আচরণ করবে না, যাতে অন্য একটি মেয়ে আহত হতে পারে।

অন্যদিকে বালু তেমন শিক্ষিত না হলেও আচার-আচরণে একটা সরল স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে।

ঝিন্নি এক সময় বারান্দায় আমার পাশে এসে চুপি চুপি বলে গেল, বালু মেয়েটি কিন্তু চমৎকার।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? পরীক্ষায় বসতে না বসতেই ডিস্টিংশানে পাশ।

ঝিন্নি চলে যেতে যেতে এক ঝলক চাউনি হেনে বলল, পাবে না? কার শিষ্যা দেখতে হবে তো।

বললাম, আমাকে আর এর ভেতরে টানাটানি কেন? তোমাদের বোঝাবুঝি তোমরাই কর।

খাবার ঘরে ডাক পড়তে দেখি, দুজনের ইতিমধ্যে হোলি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে। চা তৈরি করছে বালু, আর প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে ঝিন্নি।

ঘরে ঢুকেই বললাম, আজ কিছু ভালোমন্দ ভাগ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে।

বালু মুখ তুলল না, খুললও না।

ঝিন্নি বলল, আজ ভাল যা কিছু লাগবে তা বালুর, আর বিস্বাদ সবটাই আমার।

বালু ঝিন্নির দিকে একবার শুধু অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল। তারপর নিজের মনে কাপে চা ঢেলে চলল।

ঝিন্নির পরিচয় আমি বালুর কাছে কোনদিনই দিইনি। অকারণে একটি মেয়ের মনে অন্য একটি মেয়ে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে লাভ কি। তাই ঝিন্নির কথা বালুর কাছে বলার প্রয়োজনই বোধ করিনি।

খেতে খেতে বললাম, জিনিসগুলো যে-ই বানাক, দারুণ রকম মুখরোচক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত একটা কিছু খারাপ হওয়ার দরকার ছিল। একটু যে অপবাদ দেব তার আর পথ রাখলে না। এমনি নিশ্ছিদ্র করে মুখ বন্ধ করে দেবার অভিজ্ঞতা আগে আমার কখনো হয়নি।

ঝিন্নি আর বালু একটু দূরে বসে গল্প করতে করতে চা আর খাবার খেতে লাগল। ওরা নিজেদের ভেতর অনুচ্চে কথা বলছিল। আমি দু-একটা ভেসে-আসা টুকরো কথা থেকে ওদের আলাপের বিষয় সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

এক সময় ঝিন্নির গলা বেজে উঠল, আজ তোমার চেম্বার খুলবে না ছোটেসাহেব?

দেখলাম, বালু চোখ তুলে ঝিন্নির দিকে চেয়ে রইল। ঝিন্নি আমাকে ছোটেসাহেব বলে ডেকেছে তার অর্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা—তাই হয়ত সে খুঁজতে লাগল ঝিন্নির চোখেমুখে।

বললাম, রোববারেও কি একটু জিরোতে পাব না ঝিন্নি। ডাক্তার বলে কি প্রাণটা পেসেন্টের হাতে উৎসর্গ করে দিয়ে বসে থাকব!

ঝিন্নি বলল, অনেক দূর থেকে এসেছি ছোটেসাহেব, চলে যাব দুপুরেই। অন্তত একটা রোগীকে দেখে তোমার নিয়মভঙ্গ হোক। ডাক্তাররা সব সময়েই স্পেশাল কেস কনসিডার করেন।

হেসে বললাম, কর্ম-বিরতির দিনে রোগী দেখতে গেলে কিন্তু ডাবল ফি লাগবে। তাছাড়া আমার অ্যাসিসটেন্টের ফি-ও আছে।

হঠাৎ কথাটার শেষ অংশ নিজের কানেই কেমন ঠেকল। তাকিয়ে দেখি, ঝিন্নির মুখখানায় কে যেন সেই মুহূর্তে এক মুঠো রাঙা আবীর ঘষে দিয়েছে। ওর ঠোঁটে ঠেকানো চায়ের কাপ, চুমুক দিতে ভুলে গেছে ঝিন্নি।

ব্যাপারটা বালুর কাছে পরিষ্কার নয়, তাই সে চুপচাপ বসে রইল।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে আমি অকারণে একটু যেন রুক্ষ হয়ে উঠলাম। বালুকে লক্ষ্য করে বললাম, আজ তো তোমার কোন কাজ নেই বালু, তুমি বরং আসতে পার। আবার যখন দরকার পড়বে তখন খবর পাঠাব।

বালু কি মনে মনে চমকে উঠল! যে আচরণের সঙ্গে তার একটুও পরিচয় নেই, সেই সম্পূর্ণ

অচেনা আঘাতটা কি তাকে আহত করল! সে হয়ত মনে মনে ভেবে পেল না, আমার দিক থেকে এ ধরনের রূঢ়তা দেখাবার কারণ কি।

বালু উঠে পড়েছে। বালু অভাবী, কিন্তু আত্মসম্মানকে অভাবের কাছে কোনদিন তাকে খুইয়ে দিতে দেখিনি। তাই আমার কথার সূক্ষ্ম আঘাতটুকু হজম করে সে একমুহূর্তও আর বসে থাকতে পারল না।

ঝিন্নি কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে বালুকে।

এখুনি পালাচ্ছ কোথায়? অ্যাসিসটেন্টের ফি-ও ডবল করে দেব, ভয় নেই।

বালুকে এমন করে কাঁদতে আমি কোনদিন দেখিনি। ঠায় দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছে বালু। ফোঁটা ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ে বকুল ফোটাচ্ছে।

আমি অপরাধীর মত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আসতে আসতে দেখলাম ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে আহত বালুকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমি ওপরে আমার শোবার ঘরে চলে এলাম। সামান্য দুটো কথা দুটি মনে কি অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাই ভাবতে গিয়ে নিজের অবিবেচনায় নিজেব ওপরই দারুণ ক্ষোভ হল।

অনেকক্ষণ আমি ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে রইলাম, কিন্তু ঝিন্নি অথবা আর কেউ এল না।

হঠাৎ চোখ পড়ল ভ্যালির ওপর। বালু চলে যাচ্ছে। মন্থর পা টেনে টেনে তার কোঠির পথে চলেছে সে। বিষণ্নতার একটি মূর্তি যেন আলোকিত পথের ওপর দিয়ে ছায়ার মত সরে সরে যাচ্ছে। চারদিকে চঞ্চলতা। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ, কুহলের কুলুধ্বনি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফের ঝকঝকে বিস্তার। তারই ভেতর একটি আহত হৃদয় অন্ধকারের গুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে নিয়ে চলেছে।

দূর থেকে আমার সমস্ত হৃদয় বালুর জন্যে হাহাকার করতে লাগল। আমি কেন তাকে আঘাত দিলাম, নিজে কেন এত ছোট হয়ে গেলাম নিজের কাছে, এই অনুশোচনায় আমার সমস্ত মন বিষণ্ন হয়ে উঠল।

আমি অনুচ্চারিত গলায় বলে চললাম, বালু, তুমি আমার চেয়ে ছোট, তবু আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। আমি অন্তর থেকে চাইনি তোমাকে আঘাত করতে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বালু। তুমি ফিরে এলে বুঝবো তুমি আমার মূঢ়তাকে মাপ করেছ।

ঝিন্নি এসে ঢুকল, শ্যাম্পুর একটা অতি মিষ্টি মৃদু গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে। ওর দিকে চেয়ে দেখি, স্নান সেরে রালার প্রপাতের মত চুলগুলোকে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, বালু চলে গেছে।

বললাম, জানি।

ও আমার পাশে এসে বসল, হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, বালুকে তুমি এমন করে আঘাত করলে কেন ছোটেসাহেব! ও বেচারা শুধু কেঁদেই সারা হল।

বললাম, আমি কোনদিন কাউকে আঘাত করতে চাই না ঝিন্নি। কিন্তু আজ সবাইকে আঘাত দিয়ে বসলাম। বালু হয়ত আহত হয়েছে, আর ওকে আঘাত দিয়েছি বলে আমিও কম আহত হইনি।

ঝিন্নি চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ আমার হাতের আঙুলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একসময় আমার দিকে সোজা ওর চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, একটা কথা আজ আমাকে বলতে দেবে?

বললাম, আজ সবার ভর্ৎসনা কুড়োবার জন্যে আমি তৈরি, বল কি বলবে।

ঝিন্নি বলল, তোমাকে কোন দোষ দেবার কথাই আসছে না, শুধু একটা সত্য তোমাকে জানাতে চাই।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বল।

ঝিন্নি অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় বলল, বালু তোমাকে ভালবাসে।

সমস্ত ঘরের ভেতর ঝিন্নির ঐ কথা বার বার বাজতে লাগল। একসময় আমার মনে হল, ঐ শব্দগুলো এক ঝাঁক তোতার মত উড়ে চলে গেল ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের টিলায়, বালুর কোঠি লক্ষ্য করে।

আমি স্তব্ধ গাম্ভীর্যে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললাম, কারো ভালবাসার খবর রাখার অবসর আমার খুব কম ঝিন্নি।

ও অমনি হেসে ফেলল। বলল, আমার বেলাতেও তাই নাকি?

বললাম, বালুর কথা বলে তুমি আজ একটা গুরুতর রসিকতা করে বসলে ঝিন্নি। তোমার এ ধরনের কথা শুনব বলে আমি তৈরি ছিলাম না। বালু যদি তোমাকে একথা বলে থাকে, তাহলে তার সাহস সীমা ছাড়িয়েছে বলতে হবে।

হয়ত ঝিন্নি আমার খর উত্তাপে ভরা কথাগুলো শুনে মনে মনে খুশিই হল। আমি যে অন্য নারীকে কোন রকমে প্রশ্রয় দিইনি, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করতে পেরে নিশ্চয়ই ঝিন্নি আশ্বস্ত হয়ে থাকবে। তবু সে আমার হাতখানা তুলে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, এত রাগ করছ কেন? তাহলে তো কোন কথাই কোনদিন তোমাকে বলা যাবে না।

আমি চুপচাপ কিছু সময় বসে থেকে বললাম, তোমার এ ধরনের অনুমানের কারণটা আমাকে জানাবে?

ঝিন্নি বলল, বালু এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি ছোটেসাহেব। তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে নাকি তারা তৃতীয় একটা চোখ পায়। আমি আমার সেই চোখের দৃষ্টি ফেলে ওর বুকের ভেতরটা দেখে নিয়েছি।

এবার হেসে বললাম, কি দেখতে পেলে?

ঝিন্নি গম্ভীর হয়ে বলল, হাসি নয় ছোটেসাহেব, বালুর চোখের জল তার মনের খবর দিয়ে গেছে। যদি তোমার ওপর তার ভালবাসার টান না থাকত, তাহলে কাজ পাবার লোভে অপমান হজম করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চলে যেত। নয়ত চোখে ক্ষোভের আগুন জ্বেলে তৎক্ষণাৎ সে নেমে যেত, ফিরে আর তাকাত না।

একটু থেমে ঝিন্নি আবার বলল, তরুণী একটি মেয়ের কান্না শুধু তার ভালবাসার জায়গায় আঘাত লাগলেই ঝরে ছোটেসাহেব।

আমি ঝিন্নির বিশ্লেষণকে এড়িয়ে আর কোন কথা বলতে চাইলাম না। ঝিন্নির কথাগুলো এমন একটা সত্যকে মেলে ধরল, যা আমার চোখের ওপর আগুনের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। যার ওপর কোন আবরণ দিতে গেলেই তা মুহূর্তে পুড়ে মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ঝিন্নি বলল, একটা কথা রাখবে?

ওর দিকে চাইলাম।

ও বলল, মুখ ফুটে বল—রাখবে?

বললাম, রাখব ঝিন্নি।

ঝিন্নি বলল, বালুকে কাছে বেশি আসতে দিও না ছোটেসাহেব। এ আমার ঈর্ষা বলে যদি তুমি মনে কর, তাহলে আমি বড় ছোট হয়ে যাব। তবে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, তোমার কাছে যে একবার এসে পড়বে তার ফিরে যাওয়া শক্ত হবে।

বললাম, একটা অসহায় পরিবারকে আমি কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম ঝিন্নি।

ও বলল, অন্যভাবে কর। নিজের কাজের সঙ্গে না জড়িয়েও একটি মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

বললাম, চেষ্টা করব তাই করতে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে জীপের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছিল ঝিন্নি, সেই জীপে করেই ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে তিনটে নাগাদ চলে গেল।

যাবার আগে আমার হাতখানা ওর মুখে তুলে বার বার চুমু খেল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ওর চোখদুটোতে জলের ছায়া।

বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল তুমি ঝিন্নি। এই তো মানালী থেকে নাগ্‌গর। কতটুকুই বা পথ।

ও ধরা গলায় বলল, না এলেই বুঝি ভাল ছিল ছোটেসাহেব। জানি না, এইটুকু বুকের ভেতর এত কষ্ট কোথা থেকে আসে।

ওর মুখখানা আমার হাতের পাতায় তুলে ধরে বললাম, তোমার দুঃখগুলো যদি বইতে পারতাম ঝিন্নি, তাহলে কত সুখী হতাম। শুধু জেনে রেখো, সারা দেশ যদি বরফের তলায় চলে যায় তবু কোলি-বি-দেওয়ালীর দিনে তোমার ছোটেসাহেব তার ঝিন্নিকে চিরদিনের কবে আনতে নাগ্‌গরে যাবেই। সেদিন আমাদের সব জমে ওঠা দুঃখগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে আসব বিপাশার জলে।

ঝিন্নি বলল, শুধু সেই দিনটির কথা ভাবতে ভাবতে সারা বছরের সব কাজ আমার ভুল হয়ে যাবে ছোটেসাহেব।

বালু আর এল না। তার অভিমানের দুস্তর সমুদ্রটা সাঁতবে সে আর পার হয়ে আসতে পারল না। আমার ফুলদানি বালুর হাতের ছোঁয়া না পেয়ে শূন্য পড়ে রইল।

রোজ সকালে কম্পাউন্ডার শিউশরণজীই আবার রোগীদেব লাইনে দাঁড় কবাবার ভারটা নিলেন। ওষুধ তৈরির ফাঁকে ফাঁকে টিকিট করে ভাগ্‌তুর মারফৎ তিনি পেসেন্টদের ডাক পাঠাতেন। কাজটা অনেক সময় শৃঙ্খলার সঙ্গে হত না। আর ঠিক তখনই বালুর অভাবটা আমার খুব বেশি করে মনে হত।

বাইরের কলে আজকাল আর বড় একটা সাড়া দিই না। অনেক দূরের পথে যাবার ডাক এলে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। সঙ্গে বালু থাকলে টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে কখন পথ চলা শেষ হয়ে যেত টেরও পেতাম না। কিন্তু দু-একবার ইতিমধ্যে বাইরেব কল থেকে ফিরে এসে কেমন যেন শ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম।

বালুর পরিবর্তনটা আমার চোখে ইদানীং যে না পড়ছিল তা নয়, কিন্তু আমাব কাছে বালু এমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে ওর ঐ আকর্ষণের ব্যাপারগুলোকে আমি লঘু করে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

আমার মনের একেবারে গভীরে পাহাড়ে ঘেরা যে সংরক্ষিত সরোবরটি ছিল, যেখানে শুধু আমি আর ঝিন্নি সাঁতার কেটে, ডুবে, জল ছিটিয়ে স্নানের খেলা খেলতাম, সেখানে হঠাৎ যেন কার ছায়া ছায়া উপস্থিতি দেখলাম। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ছায়া ফেলে। উঁকি দেয়, আবার সরে যায়। একটা অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখে, কিন্তু ইচ্ছে হলেও নিষিদ্ধ সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জলকে তোলপাড় করে দিতে সাহস করে না।

হঠাৎ ঝিন্নি এসে পড়ায় সব ওলোটপালট হয়ে গেল। কৌতূহলী ছায়া সরে গেল অনেক দূরে।

মনে মনে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলাম। বালুর অসহায় সংসারেব কথা মনে পড়তে লাগল। কি কাজ করছে বালু? সে হয়ত এখন বনে জঙ্গলে ঘুরছে লক্‌ড়ির সন্ধানে। তাই বেচে সামান্য কিছু পয়সা হয়ত সংগ্রহ করে আনছে। অসুস্থ পণ্ডিতজীর সেবা করছে। তাঁব রামচরিত মানসের আনন্দময় জগত থেকে এই নির্মম কঠিন সংসারে বালু তাঁকে নামিয়ে আনতে চায় না।

জুলিয়েন চলে গেছে সারা ভারত ট্যুর করতে। বেড়িয়ে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজটা দেখাশোনা কববে সে, এই প্ল্যান করে মিঃ বেনন পাঠিয়েছেন তাকে। জুলিয়েন কাছে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলে, পরামর্শ নিয়ে কিছুটা হাল্কা করে নিতে পারতাম ভারী বুকটাকে।

ঝিন্নি আমার এই অনুক্ত ব্যথার দিনগুলোকে যদি তার চঞ্চল উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারত, তাহলে বুকের মধ্যে জমে থাকা সব বরফ গলে খুশির কুহল হয়ে দিকবিদিক মাতিয়ে ছুটে চলে যেত।

এক একসময় মনে হয়, আমাকে নিঃসঙ্গ করে রেখে জুলিয়েন, বালু আর ঝিন্নি যেন কোথায় লুকিয়েছে। আমি কানামাছির চোখবাঁধা মানুষটার মত অসহায়ভাবে ওদের হাতড়ে বেড়াচ্ছি। ওরা রয়েছে এখনও আমার নাগালের অনেক বাইরে।

খবর আনল ভাগ্‌তু। সারা মানালী নাকি ঝাঁক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতির মত হিপি আর হিপিনীতে ছেয়ে গেছে। তারা পাইন ফরেস্ট, নদীর তীর থেকে গভর্ণমেন্ট বাংলোতে যাবার রাস্তার দুপাশ অধিকার করে নিয়েছে। কম্বল পেতে পাথরের ওপরেই তৈরি করে নিয়েছে তাদের দিনরাতের আস্তানা।

ওদিকে যাইনি কতদিন। জুলিয়েন বাইরে চলে যাবার পর থেকে বাজারের দিকে যাবার বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করিনি। বাজার ঘুরে ওদের হোটেলে যাবার যে চার্ম ছিল, সেটা আপাতত আর নেই। এখানে পাহাড়ের ওপর যে মুদিখানা রয়েছে, আমাদের দুতিনটে প্রাণীর প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। তাছাড়া দোকানীটি ডাক্তার বলে আমাকে দেখা হলেই রোজ নমস্কার করে। আমি ওকে দিয়ে অনেক সময় টুকরো টুকরো প্রয়োজনের জিনিসগুলো বাজার থেকে আনিয়ে নিই।

ভাগ্‌তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর একটা খবর বয়ে আনল। সিজন টাইমে পথের ধারে ট্যুরিস্টদের জন্যে ছাউনি ফেলে সাময়িকভাবে সস্তা খাবারের যে রেস্তোরাঁগুলো গড়ে ওঠে, তার একটাতে সে বালুকে রান্না করতে দেখেছে।

আমার কাছে এই মুহূর্তে খবরটি দারুণ চাঞ্চল্যকর হলেও ভাগ্‌তুর কাছে মনের উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললাম, তুই ঠিক দেখেছিস? কাকে বলতে কাকে দেখেছিস কে জানে!

ভাগ্‌তু বলল, নিজের চোখে দেখেছি সাহেব। ট্যুরিস্ট লোকের সঙ্গে কথা বলছে। হাতে চায়ের কেটলি।

বললাম, তা বেশ করেছিস। যা হোক কোন একটা কাজ করা ভাল।

ভাগ্‌তু চলে গেলে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ার পেতে বসলাম। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছিল না। নীচে—অনেকখানি নীচে বাজার। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাজার আর হোটেলের আলোগুলো ঝিকমিক করছে। ওরই ভেতর কোন একটা রেস্টুরেন্টে ট্যুরিস্টদের জন্যে রান্না করছে বালু। এখন তার দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। কিছুক্ষণ পরেই খাওয়া শুরু হবে, তখন হয়ত ওকেই পরিবেশনের ভার নিতে হবে। ছোট রেস্টুরেন্ট। বেশি লোক রাখবে কোত্থেকে। কাজের শেষে ও হয়ত ছুটি পাবে সেই এগারোটা নাগাদ।

কিন্তু বালু এত রাতে কি একাই কোঠীতে ফিরবে! এই অন্ধকার ভ্যালি পেরিয়ে একটি যুবতী মেয়ে প্রায় মাঝরাতে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ফিরে যাবে ঘরে! বালু সাহসী, তবু সাহসের একটা সীমা তো থাকা চাই।

নিজের ওপর রাগ হল। আমি বালুর ভালমন্দের কথা ভাববার কে। আমি তো তার খাওয়া পরা ভালোমন্দের দায়িত্ব নিইনি, তবে তার বিপদ-আপদের কথা নিয়ে চিন্তা করার কি অধিকার আছে আমার। জগতে এই শুকনো সহানুভূতির কি দাম আছে। এগুলোকে অক্ষমের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

ওপরের আকাশের দিকে চোখ পড়ল। রাতের আকাশ ভরে অগণিত নক্ষত্র। কি আশ্চর্য শান্ত আর স্নিগ্ধ। পূর্ব-দক্ষিণের আকাশে জ্বলজ্বল করছে একটি বড় তারা। মনে হল, নাগ্‌গরের অরণ্য আর তুষার পর্বতের ওপরে যে আকাশ, তারই বুকে তারাটা অতন্দ্র জেগে আছে।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল নাগ্‌গরের অরণ্যবাসে নির্বাসিত ঝিন্নি যেন ঐ তারার চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

রোজই ভোরবেলা ওঠার অভ্যেস আমার। আগে টাট্টুতে চড়ে অনেকখানি দৌড়ে আসতাম। তারপর ফিরে এসে সূর্যোদয় দেখতাম আমার বাংলোর বারান্দায় বসে। আজকাল ভোরের চক্কর বন্ধ আছে। টাট্টু নিয়ে বেরোই সেই দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নের দিকে। ভ্যালি পেরিয়ে গিয়ে বসি আমার নির্দিষ্ট জায়গায়।

আজ অনেকদিন পর ভোরবেলা বেরোলাম। টাট্টু রেখে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লাম বাজারের দিকে।

পথের ডানপাশে বিচ্ছিন্ন বসতি, আপেলের বাগান। বাঁদিকে দেওদারের জঙ্গল। বড় বড় কাণ্ড

অনেক ওপর পর্যন্ত কংক্রিট পিলারের মত উঠে গেছে। তারপর ঝাঁক ঝাঁক সুঁচোলো সবুজ পাতার সমারোহ ডাল ভরে।

বনের ভেতর ঢুকলে ওপরের আকাশ ডালে পাতায় ঢাকা পড়ে যায়। মাঝে মাঝে এক চিলতে ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ, সাদা মেঘ উঁকি দেয়। রোদের সোনা ঝর্ণার মত গলে ঝরে পড়ে ঐ ফাঁকে। তখন বনের কোল জুড়ে কি আশ্চর্য সমারোহ। কোথাও সবুজ ঘাসের ওপর সূর্যের কোমল আলো বিছানো। কোথাও বা বড় বড় পাথরের শ্যাওলা-ধরা চাঁই-এর ফাঁকে নাকছবির মত নানা রংয়ের ছোট ছোট ফুলে আলোর ঝিকিমিকি খেলা। সবার ওপর গাছের ডালপালাগুলো সোনালী সবুজ জাজিমে কালো সুতোর এমব্রয়ডারী কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়।

আমি বহুদিন ঐ সরলবর্গীয় অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে এর রোদ জল ঘাস পাতা ফুলে মেশা এক ধরনের অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধ আঘ্রাণ করেছি। কোন কোন দিন শরতের সকালে কিন্নর-কন্যার মত পার্বতী তরুণীদের বাঁশের তৈরি কিলতা পিঠে বেঁধে আপেল বাগিচার দিকে দল বেঁধে যেতে দেখেছি এই বনের পথে। তাদের সরল ভীরু চোখ শুধু চলার পথটুকুর ওপর বিছিয়ে থাকত। ছায়ায় আলোয় তারা চলত ঠিক যেন চঞ্চল চিত্রিত হরিণী।

আমি আজ বাজারের পথে নেমে আসতে আসতে ঢুকে পড়লাম অনেক দিনের অদেখা দেওদার বনের ভেতর।

খানিক ভেতরে ঢুকে বন্যপ্রাণীর মত কতকগুলো বিচিত্র জীবকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। বাইরে আলোর উজ্জ্বলতা থাকলেও দেওদার বন তখনও অস্পষ্ট আলোছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমি কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে এই জীবগুলোকে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ডালপালার অজস্র ঝোরকা পথে আলো এসে পড়তে লাগল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, ঠিক যেন কতকগুলো শ্বেত শূকর ইতস্ততঃ জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোথাও বা মিট শপের হুকে ঝোলানো ছাল ছাড়ানো ধাড়ি ছাগলের মত পড়ে আছে সারে সারে। অর্ধ উলঙ্গ হিপি তরুণ-তরুণীরা বনের গভীরে এই প্রান্তরটুকুকে তাদের নিশ্চিত বিশ্রামের জায়গা বলে নির্বাচন করে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তে একটা ভয় আমার মধ্যে ধীরে ধীরে কুয়াসার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যদি এই মুহূর্তে সেই পাহাড়ী তরুণীরা এসে পড়ে এই পথে! এই আবরণহীন আদিম মানুষগুলোকে যদি ওরা বিকৃত দেহভঙ্গিমায় দেখতে পায়!

আমার আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে ওরা এসে পড়ল। ওদের হাতে ধারালো অস্ত্র। কাঠ সংগ্রহের জন্য ওরা চলেছে বনের গভীরে!

ওরা ওদের পথ ধরে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। শায়িত মানুষগুলোকে এক ঝলক দেখে নিয়ে দ্রুতগতি পাহাড়ী জলধারার মত পেরিয়ে চলে গেল!

কিন্তু আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। দলটি বনের গভীরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে। পেছন ফিরে আমারই মত গাছের আড়ালে নিজেদের ঢেকে ওদের দেখছে।

প্রথমে কৌতূহল। তারপর তরুণী নাভী থেকে কস্তুরীর গন্ধ উঠে আসবে ধীরে ধীরে। সে গন্ধের টানে পা টিপে টিপে শুধু শিকারী জন্তুগুলোই আসবে না, নিজেদের গন্ধের সন্ধান পেয়ে নিজেরাই একদিন পাগল হয়ে উঠবে ওরা।

নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ফিরে এলাম বাজারের পথে।

হঠাৎ সরকারী অ্যালুমিনিয়াম হাট-এর সামনে বিরাট বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল : বিদেশী ট্যুরিস্টরা আমাদের সম্মানীয় অতিথি, তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

বাজার থেকে টুকিটাকি কেনাকাটা করে ফিরতে কিছু দেরী হল আমার। উঠে আসছিলাম, বাঁদিকে ট্যুরিস্ট লজের পথটার ওপর চোখ পড়ল। সাময়িক তাঁবু ফেলে রেস্টুরেন্ট তৈরি করা হয়েছে। কটা হিপি বসে চা খাচ্ছে। জায়গাটা খোলামেলা, তাই পরিবেশনকারিণীকে চিনতে আমার একটুও দেরি হলো না।

ঝকঝকে পোশাক আর হাসিতে বালু ঝলমল করছে। বালু আমাকে দেখছে না, কারণ মেন রোডের

দিকে তার চোখ নেই। অতিথিরাই তার সব নজর কেড়ে নিয়েছে। গরমের দিনে রোদ এতখানি অল্‌টিচিউডেও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বালুকে দেখে মনে হল, রোদের সব তীক্ষ্ণতাটুকু যেন ও ওর সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছে।

আমি বালুর দৃষ্টিসীমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাংলোর পথে পা বাড়ালাম। গাছের আড়ালে যখন রেস্টুরেন্টটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন কেমন যেন এক ধরনের অপরাধবোধ আমাকে আহত করতে লাগল। বালুর এই পরিণতির জন্যে কি আমি দায়ী নয়? তার সহজ জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরানোর জন্যে আমার অবিবেচনা কি কাজ করে নি?

হঠাৎ মনে হল, বারবার আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছি কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। বালু আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেও তার নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই পথ চলেছে। আজও সে সংসার চালানোর জন্যে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজেরই দায়িত্বে। আমি শুধু অকারণ নিজেকে দোষী ভেবে দুঃখ পাচ্ছি।

কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে নিজেকে অনেকখানি হাল্কা মনে হল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলাম আমার বাংলোয়।

রোগীরা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা আমাকে নমস্কার করল। মনে মনে লজ্জিত হলাম। অসুস্থ মানুষগুলিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে গেছি। মনে মনে বললাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, আমিও অসুস্থ। দারুণ একটা মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছিলাম আমি।

রোটাং থেকে কুলু অব্দি, বিপাশার উৎস থেকে বিস্তাব পর্যন্ত উড়ে বেড়াল বুভুক্ষু পঙ্গপালের দল। প্রায় একটি মাস পূর্ণ করে মত্ত পঙ্গপালগুলো আবার উড়ে চলে গেল অতিথিবৎসল ভারতের অন্য কোন নগরে।

ভাগ্‌তুই খবর বয়ে এনেছিল। ভোরের গাড়িতে ফিরে গেছে বিদেশী ট্যুরিস্টরা। আরও খবর, পথের ধারের রেস্টুরেন্টগুলোর সব সাজসরঞ্জাম দুপুরেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

ভাগ্‌তুর হাতে একখানা ফটো দেখে কৌতূহলী হলাম, দেখি ওটা কি?

ভাগ্‌তু বোধহয় আমাকে দেখাতেই চেয়েছিল, তাই বলা মাত্র দারুণ খুশি হয়ে হাতের ফটোটা মেলে ধরল।

ছবিতে ভাগ্‌তু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় কাপড়ের একখানা পাগড়ি বাঁধা, হাতে লাঠি।

বললাম, কোথায় ছিল এ ফটো?

ভাগ্‌তু গলায় এবার গর্ব ফেটে পড়ল, সাহেব তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ বিশ্রীরকম রাগ চেপে গেল। বললাম, ফ্যাল ফটো। তাই বুঝি ঘন ঘন বাংলোর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া হত। ফ্যাল বলছি।

মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ভাগ্‌তুর! সে আত্মরক্ষার জন্য শেষ অবলম্বনটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল এবার।

কেন, বালুদিদির ফটোও তো তুলে দিয়েছে সাহেব। বালুদিদি আমাকে দিয়েছে একখানা।

ভাগ্‌তুর কুর্তার পকেট থেকে আর একখানা ফটো বের করে তুলে ধরল আমার চোখের সামনে এক ফলন্ত আপেল গাছ ব্যাক্‌গ্রাউন্ডে রেখে রাজপুতানীর পোশাক পরা বালু সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখতে লাগলাম। এ কে? এই যুবতীটিকে তো কোনদিন আমি দেখেছি বলে মনে আনতে পারছি না! বালুর চোখ কি এমন করে কোন পুরুষের দিকে উচ্ছল ইঙ্গিতে ঝলসে উঠত? চাপা ঠোঁটের হাসিতে কি কোনদিন ফুটে উঠত এমনি আকুলকরা আমন্ত্রণ!

আমি ভাগ্‌তুর হাতে ফিরিয়ে দিলাম ঐ যুবতী মেয়েটির ফটোখানা।

হাওয়ায় ক্যালেন্ডারের পাতা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। আজ সতেরোই জুন। ছোটি বরসাত্‌ শুরু হয়ে গেছে। হাল্কা ধোঁয়ার মত পাত্‌লা পাত্‌লা মেঘ উড়ে চলেছে উত্তরের পাহাড় নিশানা করে। শোবার ঘরে বসে ভ্যালির ওপর চোখ পেতে আছি। ঝর্‌রি বরসাতের ঝিরঝিরে চিক দমকা হাওয়ায়

দোল খাচ্ছে। ওপারের পাহাড়ের বারাণী খিল্লীতে কটা পুতুলের মত লোক ঘুরে ঘুরে বতর চাষে মেতেছে। ঐ সব বন্ধা বাদামী রঙের পাহাড়গুলোতে লাঙ্গলের ফাল চলে না, তাই বীজ ছড়িয়ে দিয়েই ওরা চলে যায়। প্রকৃতির খেয়ালে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

কিছু সময় ঝিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি ঝরে আকাশটা ঝকঝকে হয়ে গেল। মেঘগুলো তাল তাল ময়লা তুলোর মত তুষার পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। নীল নীল আকাশটা পাটভাঙা বেনারসীর মত ঝলকাচ্ছে। পাইনের সবুজ পাতাগুলো ঝলমল করছে। প্রেমিকার মানভাঙা মিষ্টি হাসির মত হলুদ রোদ্দুরটা চোখ জুড়িয়ে একেবারে বুকে এসে লাগল। সাবা দেশের চেহারাটা মনে হল আমুল বদলে গেছে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অঝোরে বর্ষা শুরু। বন্ধ কাচের সার্সি উল্টোদিকের বৃষ্টির রেণু মেখে ভ্যালিব দৃশ্যটাকে ঢেকে ফেলছে বারবার। আমি মাঝে মাঝে জানালা খুলে ওপারের কাচটা মুছে নেবার চেষ্টা করছি। অমনি এপার ওপারের হু হু হাওয়া আমার চাদরখানাকে উড়িয়ে নিয়ে বিছানাকে বে-আব্রু করে দিচ্ছে। দুটো দেয়াল-ক্যালেন্ডার ভয়পাওয়া পাখির মত সাদা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কতকগুলো মাসের পাতা ফর্‌ফর্ করে উড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে গেল।

আমি বন্ধ কাঁচের জানালায় মুখ ঠেকিয়ে চোখ পেতে বসে আছি। মেঘে মেঘে বিজলীর চক্‌মকি খেলা শুরু হয়ে গেছে। বাজের আওয়াজ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। এখানে মেঘের ডাক বড় অদ্ভুত বাজতে থাকে। মেঘ ডাকলে আমি জানালার পাল্লা একটুখানি খুলে কান পেতে রাখি। শব্দটা একবার বেজে উঠলেই হল। তারপর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গিরিগুহার ভেতরে ভেতরে সেই গম্ভীর আওযাজটা বাঘের গর্জনের মত হুঁসিয়ারি দিতে দিতে ফিরতে থাকবে। কতক্ষণ পরে হাঁকতে হাঁকতে শব্দটা চলে যাবে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে।

একটা বাজ পড়তেই দারুণ আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুরুল পাখি ভ্যালির বুকে বয়ে যাওয়া ছই বা স্রোতোধারাটির তীর থেকে লম্বা পাখা বৃষ্টিতে ভাসিয়ে উড়ে গিয়ে আবার একটু দূরে বসল।

ভাগ্‌তু এসে জানাল, এ বৃষ্টিতে ক'টি পেসেন্ট আমার ডিস্‌পেনসারির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছে।

নীচে নেমে এলাম। চাষাভূষো কটি কানেত শ্রেণীর লোক গুটিসুটি মেরে বসে আছে। একটি লোক তো হি হি কাঁপুনি কাঁপছে।

বর্ষা শুরু হলেই দারুণ মশার উপদ্রব চলে। সারা আবাদী টাকাগুলো যেন তাদের দখলে। চাষাভুষোদের চাষের জো নেই। হুল ছুঁইয়ে দেওয়া মানেই শুইযে দেওয়া। বর্ষায় সারা অঞ্চলটার চাষী মানুষগুলোর অর্ধেক ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে।

ওষুধ দিয়ে ওদের বিদেয় করলাম। যে লোকটা ম্যালেরিয়াব কাঁপুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল, সে কাঁপুনি না থামা পর্যন্ত বসে রইল। ভাগ্‌তু তার সামনে কযলার উনুনখানা বসিয়ে দিলে। লোকটা আগুন পেয়ে যেন বর্তে গেল।

একটু অবস্থাপন্ন বামুন ক্ষেত্রীশ্রেণীর লোকেরা বর্ষায় ধানক্ষেতের পাশ দিয়েই হাঁটবে না। তাদের ধারণা, মশা কামড়াক আর নাই কামড়াক ধানক্ষেতের হাওয়া গায়ে লাগলেই নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়াতে পেড়ে ফেলবে।

এই বর্ষার ভেতর ক'দিন রোগী দেখতে বেরোতে হল। পাহাড় থেকে জলধারাগুলো যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হার্ডল রেসে মেতেছে। জহরু, কুহল, নালা, নালু, ছই— সবরকমের ছোটবড় খাদ বেয়ে জল চলেছে তোড়ে পাক খেতে খেতে। গড়িয়ে পড়ছে ছোটবড় শিলা। আঘাতে আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, এখানকার সব ক'টি জলস্রোত মেশে বিপাশায়।

আমার টাট্টুর নাম রেখেছি, চৈতক। বড় প্রভুভক্ত। প্রভুকে পিঠে নিলে সে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। বিপদের আঁচ পেলেই সে থমকে থেমে দাঁড়াবে। ভাঙনের পথে কখনও পা বাড়াবে না!

বর্ষার ভেতর পথ চললে ভারী সুন্দর একটা ছবি চোখে পড়ে। প্লাবিত ক্ষেতের ধারে মেয়েরা গায়ের কাপড় ভিজিয়ে রুহনী চাষে মেতেছে। হাঁটুর একটু নীচের থেকে অনাবৃত পাগুলো ফিকে হলুদ মোমের মত মনে হয়। পায়ের গোছ কাদায় ডুবিয়ে মাথা নুইয়ে ধানের চারা রোপণ করে। গলায

বাজে একটানা পাহাড়ী সুরের গান। বড় মিঠে সে সুর। বৃষ্টির সরোদ, মেঘের মাদলের সঙ্গে সে গানের সুর আশ্চর্য সঙ্গতি রেখে বাজতে থাকে।

রোপণের কাজটা মেয়েরাই করে। ওরা যখন কাজের ফাঁকে উঠে দাঁড়ায়, তখন ওদের রঙীন ভেজা কাপড়গুলো যৌবনের উদ্ধত শিখর আর উপত্যকাগুলোতে লেপটে থাকে। ঠিক মনে হয়, রেনোর অয়েলে আঁকা এক একটি ন্যাড স্টাডি।

আমি যখন টাট্টুতে চড়ে ওদের পাশ দিয়ে যাই তখন ওরা নীচু হয়ে থাকে না, উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি আর চাহনি উপহার দেয়। অন্য কোন পাহাড়ী যুবক গেলেই তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে আর জল কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। আমি দূরে চলে যেতে যেতেও ওদের হাসির জলতরঙ্গ বারবার বেজে উঠতে শুনি।

এ দুটো মাস পাহাড়ী দেশটাতে যেন বিপ্লব হয়ে গেল। পথঘাট, কাঠের ব্রীজ ধ্বসে ভেঙে ভেসে গেল জলে। রোগী নেই ডাক্তারের। বেড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগও নেই। ঘরের ভেতর বসে বসে কুঁড়ে হয়ে গেলাম। এ সময়গুলোতে ঝিন্নিকে কাছে পেতে দারুণ ইচ্ছে করে। মাঝরাতে পশলা বৃষ্টির আওয়াজে যখন ঘুম ভেঙে যেত, তখন জানালার কাছে উঠে গিয়ে বসতাম। মনে হত, এমন দিনগুলোতে ঝিন্নি থাকলে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর ওর থুত্নি রেখে আমারই মত জানালা দিয়ে চেয়ে থাকত বাইরে। আলোর তন্তু ছড়িয়ে যখন বিদ্যুৎ চমকাত, তখন ও সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকোত আমারই মুখে।

চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না। শুধু, তুমি নেই, বলতে বলতে ডজন কয়েক প্যাডের কাগজ উড়ে গেল। কোনদিন বেলা শেষে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ মোলায়েম হলুদ আলোটুকু ফুটে উঠলে আমি বাগানে নেমে গিয়ে ঐ আলো গায়ে মেখে নিতাম। রঙটা আবরণ খসা ঝিন্নির বুকের বড়ো কাছাকাছি। একটা রোমাঞ্চ আমার সারা শরীরে হেমন্তের ভোরবেলাকার বাতাসের মত শিউরে উঠত।

জলের স্রোত খর থাকলেও আজকের যাত্রায় আমার চৈতক অতি সাবধানে পাথরের ওপর পা রেখে স্রোতের বেগ ঠেলতে ঠেলতে ওপরে গিয়ে উঠল। তারপর ভ্যালি পেরিয়ে অনেকদিনের পরে পৌঁছলাম আমার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

ওপরে গমভাঙা কলের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। শব্দটা অনেকদিন পরে শুনছি, তাই কানে বেশ মিষ্টি লাগল। চৈতককে বেঁধে রেখে বসলাম আমার নির্দিষ্ট আসনে। পাথরটা সারা বর্ষা ধোলাই হতে হতে কেমন যেন চক্চকে হয়ে গেছে। পাথরের তলা থেকে ক'টি ফুল উঁকি দিচ্ছিল। আমি বসে বর্ষাশেষের অপরাহ্ন-প্রকৃতিকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কার সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে দেখি, একটি মেয়ে আমার চৈতকের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি পাশ থেকে মেয়েটিকে চিনতে পারলাম না। ওর পাশে বসানো একটি থলেতে বোধহয় পেষাই করা গম রয়েছে।

মেয়েটি চৈতকের গা থেকে হাত নামিয়ে থলেটা তুলে নিতে যেই মুখ নামাল, অমনি আমি চম্কে উঠলাম।

বালু! এমন চেহারা হয়েছে বালুর! চেনাই যাচ্ছে না। শীর্ণ রক্তশূন্য একটি অচেনা মেয়ে যেন আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বালু চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলে যাচ্ছ বালু?

বালু থামল। তারপর মুখখানা নীচু করে পায়ে পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললাম, কতদিন তোমাকে দেখি নি বালু। সেই যে তুমি বাংলো থেকে চলে গেসে, আর একটিবারও এলে না।

বালু চোখদুটো পথের ওপর পেতে রেখে পায়ের আঙুল ঘষতে লাগল।

আবার বললাম, ভুল যদি আমি কিছু করে থাকি তাহলে সেটাই কি চিরকাল মনে করে রেখে দেবে

বালু? এতদিন একসঙ্গে যে কাজ করলাম, পথ চললাম, তার কি কোন দাম নেই?

বালু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, সেদিন আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছিলাম বালু, কিন্তু তুমিও আমাকে কম আঘাত দাও নি।

বালু আমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ভেজা চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, আমাকে আমার ভুলটুকু শুধরে নেবার সুযোগ তুমি দিলে না। এতে আমি কম আঘাত পাই নি।

বালু ক্রমাগত মাথা দোলাতে লাগল। সে যে মনেপ্রাণে আমাকে আঘাত দিতে চায় নি, তাই বোধহয় বোঝাতে চাইল মাথা দুলিয়ে।

এক সময় বালু বলল, আমার ভাগ্য বাবুজী। আমি আপনার কাছে ফিরে গেলাম না, তাই নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

বললাম, শরীরটা তোমার বড় ভেঙে গেছে বালু। কাল থেকে তুমি চলে এসো ডিস্‌পেনসারিতে। কাজ যেমন করছিলে তেমনি করবে। শরীর মন দুটোই ভাল থাকবে।

বেলা পড়ে আসছিল। বালুকে বললাম, নীচের ছইয়ের স্রোত এখন খুব বেশি। টাট্টু নিয়ে সন্ধ্যায় পেরোনো ঠিক হবে না। আমি আজ চললাম, কাল সকালে যেন তোমাকে চেম্বারে দেখতে পাই।

বালুর ভিজে চোখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল।

আমি চৈতকের বাঁধন খুলে নিয়ে চেপে বসলাম। পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে নামছি আর মাঝে মাঝে মুখোমুখি হচ্ছি বালুর। ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। কেমন যেন বিষণ্ণ ধূসরতার মূর্তি বলে মনে হয়।

বালু এখন আগের মত কাজে যোগ দিয়েছে। ছেঁড়া তারটা পরিয়ে তানপুরোটাকে বেঁধে নিয়ে যেন রোজকার রেওয়াজ শুরু হয়েছে! কোথাও কিছু অপূর্ণতা নেই।

ঝিন্নির একটি অনুরোধই শুধু রেখেছি। আমি আর বালুকে নিয়ে বাইরের কলে বেরোই না।

দেখতে দেখতে আরও দুটো মাস কেটে গেল। সেপ্টেম্বরের শেষে চাচাজী এলেন ফলের বাগিচার তদারকির কাজে।

বালুকে বললাম, এবার আর মিঃ বেননের বাগানের কাজে গিয়ে তোমার দরকার নেই বালু। তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাগিচায় কাজ করতে পার। আমি চাচাজীকে বলে দেব।

বালু মাথা নেড়ে সায় দিল, আর আমি চাচাজীকে বালুর জন্যে অনুরোধ জানিয়ে কথা আদায় করে নিলাম।

পুরো সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর ফল সংগ্রহ আর প্যাকিংয়ের কাজে মেতে রইল মানালীর তরুণী মেয়েরা। আর ঠিক অক্টোবরের শেষেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটে গেল।

একদিন বাগিচা থেকে নীচে নামছিল বালু, হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে এল আমার চেম্বারে।

বালুকে পরীক্ষা করে আমি চমকে উঠলাম। কি সর্বনাশ, বালু সন্তানের মা হতে চলেছে! আমি ডাক্তার হয়েও এতকাল ধরতে পারিনি ওর দেহের পরিবর্তন! ওর পোশাকের আড়ালে ও নিজের ভুলের ফসলকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এতকাল! আর আমি গভীর আকর্ষণে অসহায় ভেবে মেয়েটিকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু বেশি কিছু ভাবার সময় নেই তখন। জরুরী একটা অপারেশনের জন্যে তৈরি হলাম। তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানোই দায় হয়ে উঠবে। যত বড় অপরাধ করুক বালু তার বিচার এই মুহূর্তে নয়। সব বিচারের চেয়েও বড় কথা এখন ডাক্তারের কর্তব্যটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া।

ভাগ্‌তুকে পাঠিয়ে দিলাম পণ্ডিতজীর কাছে। বলে পাঠালাম, একটু সুস্থ হলেই মেয়ে যাবে তাঁর

কাছে। চিন্তিত হবার কিছু নেই।

এদিকে কম্পাউন্ডার শিউশরণজীর সাহায্য নিয়ে শেষ করলাম অপারেশনের কাজ। বালু বেঁচে গেল এ যাত্রায়। নির্জীবের মত বেডের ওপর পড়ে রইল সারারাত।

আমি আলো জ্বেলে বসে আছি বালুর মাথার কাছটিতে। ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। শিউশরণজীকে পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁর কোঠিতে। একবার শুধু চাচাজী এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে। যতটুকু আলো বাইরে পড়েছিল তাতে দেখলাম, একটি থমথমে গম্ভীর মুখ ঘরের ভেতরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মুহূর্তে সে মুখ দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

সম্ভবত চাচাজী কম্পাউন্ডার শিউশরণজীর কাছ থেকে ঘটনাটা জেনে থাকবেন।

রাতে বসে বসে আর কোন কথা মনে এল না। বালুর করুণ মুখখানা শুধু চোখের ওপর বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

অপরাধ করেছে বালু? না কোন অপরাধ সে করেনি। যা করেছে তাকে বড় জোর একটা বড় রকমের ভুল বলা যেতে পারে।

বালুর সঙ্গে বহুদিন আগে ভ্যালিতে বসে চাঁদের আলোয় ওর হাত দেখার মিথ্যে অভিনয় করেছিলাম। সে রাতটার কথা মনে পড়ল। বালুর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম সেদিন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠেছিল। পঙ্গু পিতাজীকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে স্বামীর ঘরে কি করেই বা সে চলে যাবে।

তার তরুণী মনের দমিত ইচ্ছাগুলো হয়ত মুকুলিত হচ্ছিল আমাকে কেন্দ্র করে। প্রকাশের সাহস তার হয়নি কোনদিন। শুধু কাজের ঘূর্ণিতে ঘুরেছে আমার সঙ্গে দেহলগ্ন ছায়ার মত।

তাই কোন কোনদিন ওকে কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি চাঁদের আবছা আলোয় ভ্যালি থেকে মুখ ফেরালেই দেখেছি ও তেমনি আমার চলার পথের দিকে চোখ পেতে চেয়ে আছে। এর অর্থ একটিই মাত্র হতে পারে। একটি হৃদয়ের উত্তাপের জন্য তরুণী মনের অনুচ্চারিত প্রার্থনা।

বালুব ওপর আমার সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু আমার সারা বুক ভরে রয়েছে ঝিন্নি। সেখানে কোন প্রতারণার খেলা চলে না।

ঝিন্নি যেদিন এল, সেদিন বালু নিশ্চয়ই মেয়েদের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে বুঝতে পেরেছিল তার স্থান আমাব কাজের ভেতর থাকলেও হৃদয়ের ভেতর নেই। সে নীরবে হয়ত স্বীকার করে নিত তার ভাগ্যকে, কিন্তু আমার কাছ থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে তার ছোট বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

তার রেষ্টুরেন্টের কাজ নেওয়ার ভেতরেও নিজেকে যে কোন কাজে যুক্ত করে রেখে আগের কর্মজীবনটাকে ভুলে যাবার তাগিদ থাকতে পারে।

তারপর মাঝরাতে যখন সে ফিরে গেছে ভ্যালির পথে কোঠীর দিকে, হয়ত কোন লোভী ট্যুরিস্ট তাকে সঙ্গ দিয়েছে। রাতের পর রাত নির্জন পথে দুটি তরুণ তরুণীর চলার ভেতর দিয়ে বুঝি ঘটেছে তাদের নিবিড়তা। বালুর অবদমিত বাসনা হয়ত তার বিদেশী বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তারপর জীবন বয়ে গেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক খাতে। বিদেশী পাখি কখন উড়ে চলে গেছে অসমাপ্ত বাসাখানা আবর্জনার মত ফেলে রেখে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা অসহায় বেদনার ছবি ফুটে আছে সেখানে।

ভোরবেলার দিকে আমি টেবিলের ওপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি বালু অনেক স্বাভাবিক চোখে তাকাচ্ছে, শুধু নিদারুণ একটা সংকোচ তার সারা মুখখানাকে রক্তিম করে তুলেছে।

বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভাগ্তুও সকালের

ভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও কি নিয়ে যেন আস্ফালন করছিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাচাজী আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কম্পাউন্ডার শিউশরণজী। চাচাজীর মুখখানা কেন যেন পাথরের মত শক্ত দেখাচ্ছে।

শুনলাম, ভাগ্‌তু তার ক্রাচ্‌খানা পাথরের ওপর ঠুকে ঠুকে বলছে, না এলো ভারী বয়েই গেল। যতক্ষণ ভাগ্‌তুর হাত আছে ততক্ষণ সে কাউকে ডরাবে না।

বললাম, কি হল, এমন চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

ভাগ্‌তু বলল, মুন্‌নী সাফ জবাব দিয়েছে সে আর রান্নার কাজে আসবে না।

একটু অবাক হলাম বৈকি। কারণ মুন্‌নীর মুখেই শুনেছি, এ তল্লাটের লোকেরা নাকি বলে ডাক্তারবাবুর মত মনিব পাওয়া ভার।

বললাম, তুই কি ওর কাছে গিয়েছিলি? কেন আসবে না কিছু বলল?

ভাগ্‌তু বলল, বেলা বাড়ছে দেখে ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ও বলল কি, তোর ডাক্তার বদ্ লোক আছে, ও বাংলোতে আর কোন মেয়ে নোক্‌রি করতে যাবে না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা তাহলে এতদূর গড়িয়েছে! বালুর এই স্খলনের পুরো দায়িত্বটা ওরা তাহলে আমার ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এসব রটনা কম্পাউন্ডার শিউশরণজীর। তাঁর রাজ্যে বালুর প্রবেশকে তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি। আবার এমনও হতে পারে, কাল যখন আপেল বাগিচার মেয়েরা বালুকে অচৈতন্য অবস্থায় বয়ে আনে তখনই ব্যাপারটা ওদের কাছে আর গোপন থাকে নি।

বালু দীর্ঘদিন আমারই কাছে কাজ করেছে। দু'পাঁচখানা টিকার মেয়ে পুরুষে জানে, ডেলিভারী কেসে বালু আমাকে সাহায্য করে। অতি কৌতূহলী কেউ বা রাতের বেলা আমাদের নির্জন ভ্যালি পেরিয়ে যেতে দেখে থাকবে। তাই কি আমাকে বালুঘটিত অঘটনের আসামী ভেবে নিয়েছে ওরা!

ভাগ্‌তুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, তুই কাজে যা।

ভাগ্‌তু চলে যাবার আগেই দেখলাম, শিউশরণজী আর চাচাজী আউট হাউসের দিকে সবে গেলেন।

আমি আবার ফিরে এলাম বালুর কাছে। বাইরের কথাগুলো অবশ্যই ঘর পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে, তাই বালুর গাল বেয়ে দেখলাম ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ চোখ মুছে দিলাম। ভেবেছিলাম আমার ছোঁয়া পেয়ে বালু হয়ত আরও চোখের জল ফেলবে, কিন্তু তা ও করল না। ওর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলাম। বুঝলাম, ও অনুশোচনায় কাঁদছিল, পরে ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

বললাম, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক বালু, কোন ভয় নেই। তোমাব পিতাজীব জন্যে ভাবনা করো না, তাঁর ব্যবস্থা আমি করছি।

এবার বুঝি অসীম কৃতজ্ঞতায় বালুর চোখ দিয়ে জল উপচে পড়তে লাগল। বুক ঠেলে যে কান্নার শব্দটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল, অধর দংশন করে তাকে প্রাণপণে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। তারপর একসময় যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হল তখন দুটো হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল বালু।

শরতের অর্ধেক ফসল আর ঘরে এল না। আমার ফলের বাগিচায় মানালীর কোন মেয়ে আর কাজ করতে আসেনি। চাচাজী বালুর ঘটনার পরের দিনই কুলু চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, দাদাজীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বাবুজী! আপনার কাজ আজকে আপনি সমঝে নিন।

কথাটা বলেই দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে বোধ করি আমার পরলোকগত পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন!

আমি কোন কথা বলি নি। প্রতিবাদ নয়, থেকে যাবার জন্যে অনুরোধও নয়। শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ডিসপেনসারিতে রোগীর ভীড় কমে গেছে। মেয়েরা আসে না রোগ দেখাতে। সারাদিন বাংলোর

ভেতর কেটে যায়। শুধু দুপুরে অব্যাহত আছে পাহাড়ী ছেলেগুলোর হুটোপুটি খেলা। ওদের এখন দিয়ে দিয়েছি ফলের বাগানের পুরোপুরি অধিকার। সেলফিশ জায়েন্টের পাঁচিল উঠে গেছে। এখন আমার বাগানের গাছে গাছে নিষ্পাপ শিশুদের দুরন্ত কলরোল।

বালু সুস্থ হয়ে উঠলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওর কোঠীতে। আশেপাশের মেয়েপুরুষ আগে 'ামাকে পথ চলতে দেখলেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতো। কখনো বা তরুণী মেয়েরা মিষ্টি হাসি উপহার :দত। মায়েরা তাদের শিশুদের হাতজোড় করে নমস্কার করতে শেখাত।

কিন্তু বালুর সঙ্গে আমাকে পথে বেরোতে দেখে উঠোন থেকে মেয়েরা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। চলতি পথের লোকেরা একবার তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে গেল।

আমি কোন দিকে ভূক্ষেপ না করে বালুর সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম।

বালু পথের ওপর চোখ পেতে চলছিল। আমি এ ক'দিন অনেক বুঝিয়ে ওর মনের ওপর থেকে অপরাধবোধের কালো দাগটা অনেকখানি মুছে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক সংকোচে চোখ তুলে কথা বলার শক্তি ও হারিয়েছিল।

আবার সেই পুরোনো ভ্যালিতে আমরা দুজনে পাশাপাশি চলেছি। পূর্ণ চাঁদের রূপোলী থালাখানা পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছের ডালে তেমনি আশ্চর্যভাবে আটকে আছে! বালুর পাশাপাশি চলতে চলতে গভীর এক আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠেছে। হয়ত এটা যৌবনেরই ধর্ম। পরিণত বয়সে যাকে বিচার করে আমরা বাতিল করে দিই, যৌবনে তাই আমরা ধুলি ঝেড়ে তুলে নিই অনেক সমাদরে।

বালুর কোঠীতে ঢোকার আগে শুধু বললাম, কোন গ্লানি মনে রাখতে নেই বালু। মনে রাখা মানেই তাকে পুষে রাখা। মনের পাপ মনই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। মাথা উঁচিয়ে পথ চলবে।

বালু হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ওর কপালে ছুঁইয়ে নিলে।

নাগ্‌গর থেকে চিঠির আশা করছিলাম কিন্তু কুলুর স্ট্যাম্প লাগানো চিঠি এল আমার হাতে। অবশ্য চিঠি যে ঝিন্নির তা ঠিকানার লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

চিঠি পড়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। আমি জানি না চিঠিতে কি আছে তবু মনে হল একটা অভাবিত কিছু আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে এ চিঠিতে। আমি যেন ভাগ্যের পাশা হাতে তুলে নিয়ে বসে আছি, কি দান পড়বে তা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু এই শেষ দানটিতেই নির্ভর করছে আমার নিশ্চিত হারজিৎ।

চিঠি খুললাম। তার আগেই মনকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি।

প্রথম সম্বোধনের ভাষাই পালটে দিয়েছে ঝিন্নি :

শ্রদ্ধাভাজনেষু

রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মত দীর্ঘদিন একটা আশ্চর্য ঘুমের জগতে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার চারদিকের সবকিছু পাল্টে গেছে। কতকগুলো অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম। আর স্বপ্নগুলোকে সত্যি বলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবে বসেছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি তারা কখন নিঃশব্দে সরে গেছে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে আমার পুরোনো জগতটাকে।

স্বপ্নের স্মৃতিগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আমার কোন কান্না নেই। তবে আমি এতকাল যে জীবনটাকে ভুলেছিলাম, তাকে আবার কে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?

আমার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসছে যখন ভাবছি আবার ক'দিন পরে নাগ্‌গরের চড়াই ভেঙে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। আবার ঢুকতে হবে আমার ঐ কোয়ার্টারে। যেখানে একদিন আমি আমার সব খুইয়েছি, সেখানে জানি না কোনদিন আর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব কিনা। প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমাকে সব হারানোর কান্না কাঁদতে হবে। আমার বিভীষিকার সে রাতগুলো কতদিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হবে তা কে বলে দেবে?

আজ কারো ওপর কোন অভিযোগ আমার নেই, যদি থাকে সে শুধু নিজের ওপর। জীবনে সরল বিশ্বাসে সবকিছুকে মেনে নিলে যে কোন মুহূর্তে সর্বস্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকে। পরিতৃপ্ত সুখী

জীবনের স্বপ্ন বোধহয় দেখতে নেই, তাহলে ওটা চিরদিন স্বপ্নই থেকে যায়।

জীবন নিয়ে যে বেপরোয়া জুয়া খেলে যেতে পারে হয়ত কোনদিন তারই জেতার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত হারলে তার বুকখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। কারণ সে জানে সে খেলোয়াড়। ভালবাসার খেলায় এক জায়গায় হারলে অন্য জায়গায় জেতার জন্যে তাকে লড়াই করে যেতে হবে।

নাগ্‌গরের ফরেস্ট গার্ডের ছোট্ট কোঠীতে আমি ইদানীং প্রায়ই পড়ে থাকতাম দেখে বুড়ো গার্ড হেসে বলত, আমার তো ছুটির সময় হয়ে এল, এবার চাকরিটা তুই নিয়ে নে বেটী, তাহলে এ কোঠীও তোর হয়ে যাবে।

এবার ফিরে গিয়ে যখন আর ওপথে পা মাড়াব না, তখন বুড়োই হয়ত আসবে নীচে। জিজ্ঞেস করবে আমার না যাবার কারণ। ওর প্রশ্নের জবাব আমি আর কোনদিনও খুঁজে পাব না।

ভাগ্যের সবচেয়ে বড় কৌতুক, যখন সব দোর ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমি চাচাজীর কাছে গৃহ-প্রবেশের জন্য আকুল আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

শুধু অনুরোধ, আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের স্মৃতিগুলো আর কোনদিন কোনভাবেই আমাকে মনে করিয়ে দিও না।

আমাকে আমার দুঃখগুলো আমার মত করেই বইতে দাও।

একটি অতি নির্বোধ মেয়ে।

চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ এসে পড়েছে বিছানায়, চিঠির পাতায়।

কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে। নির্জনে একদিন খেলা শুরু হয়েছিল, সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে সে খেলা খেলে চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠতেই চমকে উঠলাম, ভুল তো আমি কিছু করিনি। তবে হুইসলটা বাজল কেন? প্রশ্ন নয়, অদৃশ্য পরিচালকের ভুল একটা বাঁশির সংকেতে আমি হেরে গেলাম। এবারের মত খেলা আমার শেষ।

বসে আছি উত্তরের ভ্যালির দিকে চোখ পেতে! ছোট্ট স্রোতোধারাটি বুক ভরে জল নিয়ে ছুটে চলেছে। পাইনের সবুজ পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে। পীর পাঞ্জালের মাথায় শেষসূর্যের সোনা গলে ঝরে পড়ছে। কত যুগ ধরে প্রকৃতির বুকে চলেছে এমনি নিরন্তর খেলা। এরা কেউ তো সরে যায় নি খেলার আসর থেকে। আমাকেই শুধু সরে যেতে হল।

যার হৃদয় আছে, যার অভিমান আছে সেই শুধু পারে না উঁচু গলায় প্রতিবাদ জানাতে। সে জানে জীবনের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদ সেখানে শুধু নিজের কাছেই হার মানা।

জীবনের মুখোমুখি যখন আর একটি মানুষ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে মুহূর্তেই চিনে নিতে হয়। সেই প্রথম দেখায় যদি ওকে চেনা না যায় তাহলে সারাজীনব ধরে মোটা মোটা সাইকোলজির বই উল্টে পরীক্ষা চালালেও তাকে আর চেনা যাবে না।

ঝিন্নি যদি নাগ্‌গরের মৃত্যুশীতল পাহাড়ের কোলে আমার ছড়ানো উত্তাপ তার বুকের মধ্যে ভরে নিতে না পেরে থাকে তাহলে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিলেও তাকে হয়ত আর কোনদিন উত্তপ্ত করে তোলা যাবে না! বুকের ভাষা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না, নিজেকেই তার পাঠোদ্ধার করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, যে ঘরে আমি বসে আছি সেটা আমার ঘরই নয়। আমি এই পাহাড়ী দেশে বেড়াতে এসে উঠেছি এই হোটেলে। এর পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য মানুষ সবই দেখা হল, এখন সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে নিজের ফেলে আসা পুরাতন আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া।

অসংলগ্ন ভাবনার ভারে আমার দিনগুলো যখন এমনি মন্থর আর রাতগুলো বড় ক্লান্ত তখন এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মত আমার ঘরে এসে ঢুকলো জুলিয়েন।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হল ও যেন বন্ধ ঘরের ভেতর একরাশ প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিলে। আমি

বিষণ্ণতার অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে ।তলে ।৩লে ব্যথার প্রহর গুনছিলাম, ও যেন এসে সব ক'টা জানালা খুলে দিয়ে বলল, নাও কত হাওয়া নেবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকাব পর ও হঠাৎ বলে উঠল, অসম্ভব, এ কখ্খনো হতে পারে না মুখার্জী!

ম্লান হেসে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোসো।

ও বসলে আবার বললাম, কি হতে পারে না জুলিয়েন?

জুলিয়েন হাত নেড়ে বলল, আমি বাস থেকে নেমেই মদনলালের মুখোমুখি হয়েছিলাম। স্কাউন্ড্রেলটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে বালুর সম্বন্ধে একটা কেচ্ছা আমাকে শুনিয়ে দিলে। ওর নাক আমি উড়িয়ে দিতাম। ব্যাটা পালিয়ে বেঁচেছে।

বললাম, ঠিকই শুনেছ।

জুলিয়েন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, থামো। ডাক্তার মুখার্জীকে চিনতে আমার আর বাকি নেই। তুমি আর নতুন করে আমাকে চেনাতে এসো না।

সেই মুহূর্তে গভীর একটা ব্যথা আমি বুকের ভেতর বোধ করতে লাগলাম। জুলিয়েনের চোখ যে সত্যকে মুহূর্তে চিনে নিল, আমার ঝিন্নির চোখ ঝাপসা হয়ে গেল সেখানে।

বললাম, ঝিন্নিও আমাকে যেখানে অপরাধী সাব্যস্ত করল সেখানে তুমি আমাকে বেকসুর মুক্তি দিতে চাও!

জুলিয়েন মুখ নীচু করে রইল কতক্ষণ। একসময় বলল, তোমার মুখ থেকে সবটুকু ঘটনা আমি জানতে চাই মুখার্জী।

বালুঘটিত সমস্ত ঘটনা পরপর সাজিয়ে শোনালাম জুলিয়েনকে। সঙ্গে সঙ্গে বালু সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম। এখনও যে বালুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে সেটুকুও মনে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বলে গেলাম।

জুলিয়েন বলল, বালু হঠাৎ একটা ভুল করে ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন আমি ওকে দেখেছি আমার বাগানের কাজে। এমন একটা সাচ্চা মেয়ে আমার চোখে খুব কমই পড়েছে মুখার্জী।

বললাম, তোমার ধারণাব সঙ্গে আমার সবকিছু আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে জুলিয়েন।

প্রস্তাবটা এল জুলিয়েনের মা মিসেস বেননের কাছ থেকে। সব শুনে আমি স্তম্ভিত। চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে জুলিয়েন আমার সঙ্গে কি রসিকতা শুরু করলে! একটু দূরে বসে জুলিয়েন চোখ টিপে টিপে হাসছিল।

মিসেস বেনন প্রথমেই আরম্ভ করলেন, ডাক্তার, আমি খুবই দুঃখিত যে জুলিয়েন না থাকায় বালুব ব্যাপারে সব দোষটা তোমার ওপরেই পড়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

আবার মিসেস বেনন তাঁর কথার জের টেনে বললেন, জুলিয়েন আমাদের ব্যাপারটা যদি আগে জানাত, তাহলে আমরা বালুকে ঐ অবস্থায় ঘরে এনেই রাখতাম। ও ট্যুর থেকে ফিরে এলে ব্যবস্থা করতাম বিয়ের। তুমি জানো মুখার্জী, আমার নব্বুই বছরের শাশুড়ী এ দেশেরই মেয়ে।

আমার বিস্ময় তখন চরমে উঠেছে। বালুঘটিত সব দোষটাই জুলিয়েন নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে কখন। সে ইতিমধ্যে তার পরিবারকে রাজী করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার ওপর যে মেঘ জমে অজস্র বর্ষণ আর বিদ্যুতে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল তাকে বিপরীত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম, বালুকে কি আপনার বেনন পরিবারের একজন করে নিতে চান?

মিসেস বেনন বললেন, নিশ্চয়ই। অন্যায়কে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় বাবা।

এই প্রথম মিসেস বেনন আমাকে 'মাই সন' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি এবাব বললেন, তুমি জুলিয়েনের বন্ধু, তাই বালুর পিতাজীর কাছ থেকে তোমাকেই সম্মতিটা আদায় করে আনতে হবে। আব তোমাকে একটা কথা বলে রাখি বাবা, বালু তার বাবাকে যাতে নিজের কাছে রেখে সেবা করতে

পাবে সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব।

বললাম, এ ব্যাপারে আশা করি পণ্ডিতজীর মত পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

বাইবে বেরিয়ে এলাম আমি আর জুলিয়েন। ওদের কোয়ার্টারের আড়ালে এসেই ওকে ধরলাম, ভেতরে ভেতরে প্ল্যানখানা এতদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছ। বালুর ঐ অবৈধ ছেলেটিকেও নিজের বলে চালিয়ে দিতে বাধল না?

জুলিয়েন বলল, ঐ হিপি ব্যাটাচ্ছেলেটাকে যদি পেতাম, তাহলে বাচ্চাসমেত বালুকে ওর ঘাড়েই চাপাতাম। ওর ভবঘুরেগিরি ঘুচিয়ে বালুর কোঠীর ঘোরালে ওকে গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে বেঁধে বেখে দিতাম।

আমি ওর কথা শুনে অনেকদিন পবে প্রাণ খুলে একচোট হেসে নিলাম।

জুলিয়েন বলল, তুমি তো আমাকে চেন না মুখার্জী, আমি ঠিক তাই করতাম। ব্যাটা এতদিনে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার বাইরে চলে গেছে। ওকে খুঁজে পাওযাই দায় হবে। তাই মেয়েটার ভাব নিজেই বইব ঠিক করলাম।

পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গেই মত দিলেন। বললেন, আমার বালুর মা কানেতের মেয়ে বাবুজী। আমার মেয়ে বেনন পরিবারে গেলে আমাব চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আমি চোখের জল ফেলতাম, আর রঘুনাথজীর কাছে প্রার্থনা জানাতাম যেন অতি দ্রুত আমার দিন ফুরিয়ে আসে। আমি এই দুনিয়া ছেড়ে সরে না গেলে আমার বালু কোনদিন সংসারী হতে পারবে না।

বললাম, আপনাকে এ পৃথিবী থেকে না সরিয়ে রঘুনাথজী নতুন একটা পথ তৈরি করে দিলেন।

পণ্ডিতজী পাশে পড়ে থাকা রামচরিত মানসখানা মাথায় ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মুশকিল হয়েছিল বালুকে নিয়ে।

ওকে ভ্যালিতে ডেকে এনে সব বুঝিয়ে বললাম।

বালু সব শুনে বলল, জীবনে একটা ভুল করেছি ঠিক কিন্তু কোন মানুষকে তো আমি ঠকাই নি বাবুজী। জুলিয়েন সাহেবকে আমি জান গেলেও ঠকাতে পারব না।

বললাম, ঠকানোর কথাই উঠছে না বালু। জুলিয়েন সব জেনেই তোমাকে বেনন পরিবাবে নিতে চাইছে।

বালু বলল, মানুষ যদি অন্যায়ের জন্যে আঘাত করে বাবুজী, তাহলে তাকে সহ্য করা যায়। কিন্তু কৃপা করলে তাকে সইতে পারা যায় না।

বললাম, জুলিয়েন অন্য ধাতের মানুষ বালু। ওর খেয়ালের সঙ্গে তোমার কিছুটা পরিচয়ও আছে। কিন্তু ও এমন বড় একটা হৃদয় নিয়ে জন্মেছে, যার নাগাল আমরা কেউ কোনদিন পাবো না। ও মানুষকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, কিন্তু কৃপা দেখাবে না। আর হাত যদি সে বাড়ায় একবার, তাহলে তাব ঐ চওড়া বুকের মাঝখানেই টেনে নেবে।

মানালীর অপূর্ব আলোকিত একটি সন্ধ্যা। বেনন পরিবাব আজ জুলিয়েনের বিযেতে পার্টি দিচ্ছেন। ছোট্ট টাউনের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত। মদনলালকে জুলিয়েন নিজে গিয়ে ওয়েডিং কার্ড দিয়ে এসেছে। মদনলাল এসেছে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। না এসে জুলিয়েনকে অপমান করবে, ঘাড়ে এমন অতিরিক্ত মাথা কার কটা আছে। •

লোকটা এখন বসে বসে রোস্ট্ চিবোচ্ছে আর দামী মদ গিলছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে পিটপিট করে।

মিঃ লী সপরিবারে কুলু থেকে এসেছেন। তিনিও মিঃ বেননের সঙ্গে ঘুরে ঘুবে অতিথিদেব আপ্যায়ন করছেন। অতি অন্তরঙ্গ দুই পরিবার। নিমন্ত্রণ পত্র কুলুতে চাচাজীর কাছেও নাকি পাঠানো হযেছিল। তিনি নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন এবং নবদম্পতির জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন বাহকের হাতে।

এক সময় আমার কাছে এসে মিঃ লী বললেন, ডাঃ মুখার্জী, আমার উপহার দেওয়া টাট্টু তোমাকে অসুখী করেছে কি ?

বললাম, আপনার দেওয়া উপহারে শুধু আমিই নই, মানালীর বহু লোকই উপকৃত হচ্ছে।

মিঃ লী হেসে বললেন, তাহলে বলো ইয়াং ম্যান, উপহার নির্বাচনে আমারও কিছুটা কৃতিত্ব আছে।

হেসে বললাম, হাজার হাজার বার।

মিস লী এক ফাঁকে এলেন আমার সামনে। মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বললেন, চিনতে পারছেন।

বললাম, সম্মানীয় লী পরিবারের মানুষজনকে কি এত সহজে ভোলা যায়। তাঁদের শিল্পবোধ, সম্ভ্রান্ত আচরণ মনে গাঁথা হয়ে আছে।

মিস লীকে কেউ চাপা গলায় ডাকতেই উনি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। যাবার সময় আস্তে বললেন, মিঃ মুখার্জী, যদি কিছু মনে না করেন তো একদিন আমাদের ওখানে উইক এন্ড কাটালে দারুণ খুশি হব।

হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সবাই উঠে দাঁড়ালাম। সজ্জিত গেটের ভেতর দিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে এগিয়ে আসছে বর বধূ। জুলিয়েন পরেছে এ দেশীয় কুলুবাসীদের পোশাক। জরির কাজ করা কুর্তা, সাদা পাজামা, মাথায় টুপি।

সুদেহী জুলিয়েনকে মনে হচ্ছে কুলুর সম্রাট ! পাশে নতমুখী বালু। আমি তাকে আর চিনতে পারছি না। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ওয়েডিং ড্রেসে বালুকে কোন রাজ পরিবারের উপযুক্ত বধূ বলে মনে হচ্ছে।

ওরা পরস্পর ওদের জাতীয় পোশাক বদলে নিয়েছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আড়ষ্টতার কোন চিহ্ন নেই। একটা কৃতজ্ঞতা-ভরা মিষ্টি হাসি ওর মুখে চোখে মাখানো।

আমি মনে মনে বালুকে শুভ কামনা জানালাম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠান শুরু হল। মিঃ আর মিসেস বেনন দুদিকে ধরে নব-দম্পতির সামনে হাজির করলেন নব্বুই বছরের বৃদ্ধা জুলিয়েনের পিতামহীকে। ধবধবে সাদা চুল পরিপাটি করে বেঁধে তার ওপর সোনালী স্কার্ফ জড়ানো। ঘাগরা, চোলি আর সুথানে ঝলমল করছে ছোট্ট দেহটি।

বৃদ্ধা সবার সামনে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। ওরা নত হয়ে ওঁর পা স্পর্শ করল।

আজ থেকে সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের একটি ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন বেনন আজকের জুলিয়েনের মতই তরুণ। তিনি পনের বিশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণীকে তাঁর পাশে নিয়ে এমনি ব্যাঙ্কোয়েট হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

পার্টি ভেঙে গেলে আমি জুলিয়েন আর বালুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বালুর চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে অসীম কৃতজ্ঞতায় করুণ।

আমি বাইরে এসে বাংলোর দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেলাম। আজ এখুনি ওখানে ফিরতে কেন জানি না ইচ্ছে করল না। আমি মানালসু নদীর ধারে চলে এলাম। কাঠের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় নদীর জলপ্রবাহের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমি বিশেষ কোন একটি কথা ভাবছিলাম না। অনেকগুলো এলোমেলো টুকরো কথা মনে জেগে উঠে আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। কথাগুলোর ভেতর অর্থের কোন মিল ছিল না, কিন্তু সবগুলোর ভেতর কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার সুর বাজছিল।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার ছোঁয়া পেয়ে চমকে ফিরে দাঁড়ালাম।

জুলিয়েন !

ও পোশাক বদল না করেই চলে এসেছে। বলল, অনুষ্ঠান এই মাত্র শেষ হল। তোমার খোঁজে বাংলোতে গিয়ে দেখি, তুমি নেই। ভাবলাম, তুমি নিশ্চয়ই তাহলে নদীর ধারে এসেছ, তাই এখানেই চলে এলাম।

বললাম, আজ এভাবে চলে এসে ভাল করো নি জুলিয়েন। অনুষ্ঠানের প্রথম রাতটি পুরোপুরি বালুর জন্যে রাখা উচিত ছিল তোমার।

জুলিয়েন বলল, থামো মুখার্জী, মুরুব্বিয়ানা দয়া করে আর কোরো না। সামনের অনেকগুলো রাত বালুর জন্যে জমা রইল আমার, কিন্তু আজকে তোমার এই নিঃসঙ্গ রাতে কেউ তোমার পাশে থাকবে না, এ হতেই পারে না। তোমার ভাবনার কারণ নেই, আমি বালুর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

এতক্ষণ শুধু বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিলাম, এই মুহূর্তে একটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার হৃদপিণ্ডের ওপর। এ ব্যথার জন্ম বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপে।

আমি শুধু জুলিয়েনের হাতখানা আমার হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম।

আমরা কতক্ষণ দুজনে নদীর তীর ধরে ঘুরে বেড়ালাম। কেউ কোন কথা বলছিলাম না। জীবনে এমন কতকগুলো অনুভূতি আছে যা কথায় প্রকাশ করলে ফিকে হয়ে যায়, যাকে স্তব্ধ হয়ে শুধু অনুভব করে যেতে হয়। আমরা তেমনি পরস্পরকে নীরবতার ভেতর দিয়ে স্পর্শ করছিলাম।

একসময়ে একখণ্ড শিলার ওপর আমরা বসলাম। পায়ের তলায় মানালসু নদীর জলধারার ছুটে চলার শব্দটা বাজছিল। ওপারে সিডারের ঘন বনে চাঁদের আলো আর অন্ধকার দুটি প্রেমিকের মত নিভৃতে মাখামাখি হয়ে আছে।

জুলিয়েন বলল, আমি যদি দিক ভুল না করে থাকি তাহলে শুকতারাটা জ্বলছে নাগ্‌গরের আকাশে, তাই না মুখার্জী?

নরম ক্ষতস্থানটায় আচমকা আঘাত লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরতে লাগল সেখান থেকে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

জুলিয়েন আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তার কথার একটা উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে দরকার, তবু কোন কথা এল না মুখে। বোধহয় স্বাভাবিক ভদ্রতায় আমার মথাটা নড়ে উঠল ওর কথার উত্তরে।

আবার জুলিয়েন ঐ প্রসঙ্গ টেনে আনল। এবার আরও সোজাসুজি। বলল, ঠিক এই মুহূর্তে ঝিন্নি কি করছে তা তুমি অনুমান করতে পার?

প্লিজ জুলিয়েন, এমন একটা রাতে আমাদের দুজনের মাঝখানে আর কাউকে টেনে এনো না।

জুলিয়েন হঠাৎ আমার একখানা হাত ওর দুটো হাতের পাতায় ভরে নিয়ে বলল, আমি তোমার বন্ধু মুখার্জী, কিন্তু জীবনের সবটুকু উত্তাপ তো কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

ওর কথার অর্থ ধরতে না পেরে আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জুলিয়েন আবার নিজের কথাটাকে পরিষ্কার করার জন্যে বলল, দেহ আর মন নিয়ে একটা পুরো মানুষ মুখার্জী। দেহ আর মনের উত্তাপ যার কাছ থেকে পাওয়া যায় সে তোমার লাভার বা ওয়াইফ।

আমি এবার কেন জানিনা হেসে উঠলাম। হাসি থামলে হঠাৎ যেন রাতটা আরও বেশি নিঃশব্দ হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল পায়ের তলায় মানালসুব আঁকাবাঁকা জল খল খল শব্দে আমার হাসির প্রতিধ্বনি তুলল।

জুলিয়েন আমার হাতখানা মনে হল আরও একটু জোরে চেপে ধরেছে।

বললাম, আমি তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নিচ্ছি জুলিয়েন। আর বালুর সৌভাগ্যের জন্যে মনে মনে ঈর্ষাবোধ না করে পারছি না।

জুলিয়েন অমনি বলল, তা হলে মুখার্জী, নিজের দিকটা ভেবে দেখছ না কেন?

বললাম, আমি বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছি, তাই যেদিকে দুটো পা চলছে সেই দিকেই চলেছি। এখন ইচ্ছা, চেষ্টা বলে কোন বস্তু আমার ভেতর নেই।

জুলিয়েন বলল, অতশত হেঁয়ালি আমি বুঝিনে মুখার্জী। তোমরা দুটিতে মিলে আমাকে দেখছি ভাবিয়ে তুললে। আর তুমি ভাল করেই জান ভাবাভাবির ভেতর আমি কস্মিনকালেও যেতে চাই না।

আবার আমি হেসে ওর হাতে নাড়া দিয়ে বললাম, তবে কেন খামোকা ভাবতে যাচ্ছ জুলিয়েন। ওসব ব্যাপার চুকেবুকে গেছে।

জুলিয়েন বলল, মুখার্জী, তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ আর মেয়েটাকেও কষ্ট দিচ্ছ। কেন, ওকে নিয়ে এসোনা নিজের কাছে?

বললাম, প্রেমিকা যদি ভোগ্যপণ্য হত তাহলে বিক্রেতাকে দাম চুকিয়ে দিয়ে ঘরে বয়ে আনতাম।

জুলিয়েন বলল, আবার হেঁয়ালি করছ। বলেছি না আমি সোজা কথার কারবারী। শোন, আমি নিজে আমার বিয়ের কার্ড নিয়ে কুলুতে গিয়েছিলাম।

আমি একটু চমকে ওর দিকে চাইলাম। রাতের আবছায়ায় ও আমার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল না।

জুলিয়েন বলে চলল, প্রথমে মিঃ লীর কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। মিস লী খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। ঘুরেফিরে তোমার কথাই জানতে চাইল।

বললাম, অশেষ কৌতূহল তাঁর। নিজেকে দারুণ রকম ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

জুলিয়েন বলল, তোমার সম্বন্ধে মিস লীর কৌতূহলটা কে বাড়িয়েছে জান?

বললাম, ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আগেই।

জুলিয়েন বলল, তুমি কিচ্ছু জাননা মুখার্জী, ঝিন্নি ওকে তোমার কথা বলেছে। এখন মিস লী প্রায়ই ঝিন্নির বাড়ি আসাযাওয়া করে।

মনে মনে দুঃখ পেলাম। এ দুঃখ কাউকে বুঝিয়ে বলার নয়। যে ভালবাসা একটা মিথ্যে সন্দেহে শেষ হয়ে যায় তাকে নিয়ে পাঁচজনের কাছে ফলাও করে বলার কি অর্থ হতে পারে।

বললাম, জুলিয়েন, এ প্রসঙ্গের এইখানে শেষ হোক। ওকে একটুও ছোট করে ভাবতে আমার এখনও কষ্ট হয়। ও যদি আমাদের পুরানো জীবনের কথা কাউকে বলে শান্তি পায় তো পাক, শুধু আমি ওগুলো শুনতে চাই না।

জুলিয়েনের ভারী গলা হঠাৎ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল, ঝিন্নিকে ভুল বুঝনা মুখার্জী। মিস লীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে ঠিক, তোমার প্রসঙ্গও সেখানে ওঠে, কিন্তু তোমাকে ছোট করে কিংবা তোমার অতীত ভালবাসাকে টেনে এনে নয়।

বললাম, মনে হচ্ছে তুমি অনেক কথাই জেনে এসেছ জুলিয়েন?

জুলিয়েন জোর গলায় বলল, এসেছি বইকি। পুরো দুটো দিন আমি কুলুতে এমনি বসে থাকিনি মুখার্জী। সবগুলো পাথরই উল্টেপাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখে এসেছি।

হেসে বললাম, তুমিও কিন্তু হেঁয়ালীতে কথা বলছ জুলিয়েন।

যদিও হেসে কথাটা বললাম, তবু সারা মন আমার উৎসুক হয়ে রইল কুলুর পরিস্থিতি জানার জন্যে।

জুলিয়েন বলল, কোন ধাঁধা নেই এর ভেতর। তোমাদের ভালবাসার ভেতর বরং যে ধাঁধাটা জটিল হয়ে উঠেছিল তার সলিউশনের একটা পথ খুঁজছিলাম।

আমি আর কোন কথা বললাম না। এই মুহূর্তে দুঃখ সুখের অতীত একটা অনুভূতির ভেতর আমি আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

জুলিয়েন একটুখানি থেমে বলল, কুলুতে দুদিন ছিলাম, আর তার প্রায় পুরো সময়টাই কেটেছে ঝিন্নির মুখোমুখি।

আমার ভেতর থেকে আবার সেই অদম্য ঔৎসুক্যটা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল।

বললাম, চাচাজীর খবর অনেকদিন পাইনি। কেমন আছে ওঁর শরীর?

জুলিয়েন বলল, ভালই তো মনে হল, তবে তোমার বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছোট্ট নতুন একটা ডেরায় রয়েছেন দেখলাম।

বললাম, আমাকে চিঠি লিখেছিলেন কুলুর বাংলোর ভার নিতে। হিসেব-নিকেশও একটা করতে চেয়েছিলেন। আমি শুধু দুচার ছত্রের একটা উত্তর দিয়েছিলাম।

জুলিয়েন আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, কটা লাইনেই ছেদ টেনে দিলাম। লিখে জানালাম, চাচাজী, বাগানবাগিচা আর বাংলো আমার তৈরি নয়। ওতে আমার চেয়ে আপনার দাবীই বেশি, তাই ওর বিলি-ব্যবস্থা যা খুশি করুন, আমি ওর ভেতর নেই।

জুলিয়েন বিজ্ঞের মত গলা করে বলল, তুমি কি লিখেছ তাও আমার অজানা নয় মুখার্জী। আমি চাচাজীর কাছেই তোমার চিঠি দেখেছি।

একটু বিস্মিত হলাম বইকি ! তবে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে জুলিয়েন কুলুতে গিয়ে অনেক কিছুই নেড়েচেড়ে দেখে এসেছে।

বললাম, চাচাজী যদিও বা থাকতেন আমার বাংলোতে কিন্তু আমি জানতাম ঝিন্নি আমাকে চিঠি লেখার পর একটি দিনও আর ওখানে থাকতে চাইবে না।

জুলিয়েন এবারও বিজ্ঞের গলায় বলল, তোমার অনুমান মিথ্যে নয় মুখার্জী। ঝিন্নিই জিদ ধরে নরসিংলালজীকে তোমার বাংলো থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন এতো বড় ফাঁকা বাংলোতে একজন চৌকিদার মোতায়েন রয়েছে দেখলাম।

আমি আর কোন কথা বললাম না। আমার দিক থেকে বলার কিছু ছিলও না। শুধু মনে হল, কি পরিমাণ ক্ষোভ ঝিন্নির মনের ভেতর জমে উঠেছিল, যে জন্যে সে পোড়ো বাড়ির মত পরিত্যাগ করে গেল কুলুর বাংলো।

জুলিয়েন আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, আমি মিস লীর কাছ থেকেই ওদের ঠিকানাটা জোগাড় করি। ওখানে গিয়ে প্রথম আমার দেখা ঝিন্নির সঙ্গে, চাচাজী তখন বাড়ির বাইরে।

একটু থামল জুলিয়েন। আমার কাছ থেকে হয়ত কিছু একটা সাড়া শব্দ আশা করল। কিন্তু আমি সামনের অন্ধকারের মত চুপচাপ আছি দেখে বলল, আমি ঝিন্নির হাতেই আমার ওয়েডিং কার্ডখানা ধরিয়ে দিলাম। ও আমাকে একেবারেই ওখানে আশা করেনি। প্রথমে কেমন যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতেই ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, বসুন, চাচাজী এখুনি এসে পড়বেন।

ঝিন্নি কার্ডখানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আবার বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পরে। হাতে কার্ড নেই, মুখখানাতে কেমন এক ধরনের বিস্ময় থমকে আছে।

জুলিয়েন একটুখানি থামলে বললাম, চাচাজীর ফিরতে বুঝি খুব দেরি হল?

জুলিয়েনের গলায় এবার ধমকের আওয়াজ বেজে উঠল, তুমি একটু থামবে মুখার্জী। কথার মাঝে এমন করে ছেদ টেনে দিলে কথা বলার কোন মানেই হয় না।

বললাম, অপরাধটা স্বীকার করে নিচ্ছি জুলিয়েন, যত পার কুলুর কথা বলে যাও। আমি চুপচাপ শুনে যাব।

জুলিয়েন কথার খেইটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, ঝিন্নি আমার কার্ড পেয়ে যে বিস্ময়ে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত ব্যাপারটা যে তার মনের ভেতর দারুণ রকম একটা ঝড় তুলেছে তাও লক্ষ্য করলাম।

ঝিন্নি একটু দূরে আমার মুখোমুখি একটা কুর্শিতে বসল। তার চোখ কিন্তু আমার দিকে ছিল না। বোধহয় সেই মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি একমাত্র নিজের মনের ভেতরে ছাড়া অন্য কোন দিকেই ছিল না।

চাচাজী এসে পড়ার আগেই আমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাইলাম। ঝিন্নির দিকে চেয়ে বললাম, বালুকে নিশ্চয়ই তুমি চেন, মেয়েটি সম্বন্ধে তোমার কি রকম ধারণা বল?

ঝিন্নি কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইল বালু ভাল মেয়ে।

বললাম, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বললাম, বালু যতটা ভাল আমি কিন্তু ততটা নই মিস শর্মা।

ও আমার দিকে চেয়ে এবার বলল, একথা কেন বলছেন?

বললাম, সে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, বালুর সঙ্গে আমার এনগেজমেন্টের কথাটা আমার ফ্যামিলিতে না জানিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে একটা অঘটন ঘটে গেল। আর সেজন্যে পুরোপুরি দোষটা কিন্তু আমারই! মানে আমার অবিবেচনাটাই দায়ী। এ ব্যাপারে বালু আমাকে ক্ষমা করলেও আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

কথাটা বলেই আমি তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম তোমার ঝিন্নির মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে আমি জুলিয়েনকে কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললাম, আমার ঝিন্নি কথাটাতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

জুলিয়েন অমনি তার স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলল, থামো। দেহের ছায়াকে ইচ্ছে করলেই কি মুছে ফেলতে পার?

আমি জুলিয়েনকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে আর কোন কথা বললাম না।

জুলিয়েন বলল, আমার কথা শুনে ঝিন্নির চোখ দুটো কেমন যেন ছোট হয়ে এলো। ও ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আপনি অনেক অনেকদিন বাইরে ছিলেন মিঃ বেনন। কিন্তু কেন?

হেসে বললাম, জানেন তো সারা পরিবারে আমার বাউন্ডুলে বলে সমাদর। তাই বিয়ের আগে কাজের মানুষ বলে পরিচয় দেবার জন্যে ব্যবসার ব্যাপারে বাইরে চক্কর দিয়ে এলাম।

ঝিন্নি বলল, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জানতে চাই।

বললাম, একটা কেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেও কিছু মনে করার নেই।

ঝিন্নি বলল, আপনি বাইরে যাবার কতদিন আগে বালুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল?

বললাম, তা প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ও আগে আমাদের বাগানেই কাজ করত। বিয়ে করব বাগানের একটা মেয়েকে, হয়ত লোকের চোখে খারাপ ঠেকবে, তাই ওকে পাঠালাম ডাক্তার মুখার্জীর কাছে কাজ করতে।

ঝিন্নি বলল, মুখার্জীসাহেব আপনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন?

বললাম, জানতেন মানে, নাড়ীনক্ষত্র সবই ওর জানা। তবে প্রমিস ছিল, আমাদের সিক্রেট ও ডিসক্লোজ করবে না। কোন অজুহাতেই না।

আমি এবার জুলিয়েনের ওপর রাগ করেই বললাম, তুমি আমার জন্যে এতগুলো মিথ্যার আশ্রয় নিতে গেলে। ভালবাসার ব্যাপারে আমি মর্যাদায় বিশ্বাসী, ভিক্ষেয় নয়।

জুলিয়েনের গলা নরম হল। বলল, ভুল সব মানুষই করে মুখার্জী তা বলে তোমাদের এত বড় একটা ভালবাসাকে তুমি অস্বীকার করবে!

বললাম, আমি তো অস্বীকার করিনি। তবে বলতে পার, যে অস্বীকার করেছে, জোর করে তার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করিনি।

জুলিয়েন বলল, একেবারে ভুল বোঝাবুঝির ওপর দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলে। এখন যদিও বা ঝিন্নির ভুল ভাঙল, তুমি দেখছি অনড়।

বললাম, চাচাজীর সঙ্গে কি কথা হল বল?

জুলিয়েন বলল, অনেক কথাই হয়েছে ওঁর সঙ্গে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে উনি লজ্জায় সংকোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছেন।

বললাম, আর ঝিন্নি?

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নির মর্যাদাবোধ তোমার চেয়ে কম নয় মুখার্জী। ও বলল, অন্যায় করেছি, সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।

জানো মুখার্জী, ও আমাকে তোমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল। তুমি যেখানে শুতে, যেখানে ওর সঙ্গে প্রথম ভালবাসার বিনিময়, সবই আমাকে দেখাল। এমনকি বনের ভেতর যে ঝর্ণার ধারে শেষবেলার আলো মেখে তোমরা বসে থাকতে সেখানেও নিয়ে গিয়েছিল।

জুলিয়েন একটু থেমে বলল, আমি এমন করে কোন মেয়েকে স্মৃতির জায়গাগুলোতে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখিনি।

বললাম, ঐখানেই তো মেয়েদের জিৎ জুলিয়েন। আঘাতে আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি করা আর তাকে চোখের জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া, এ কেবল মেয়েরাই পারে।

জুলিয়েন বলল, আমি তা বুঝি না মুখার্জী, তবে দুটো দিনের ভেতর যতটুকু চিনেছি, তাতে মনে হয়েছে ঝিন্নির সঙ্গে তুলনা করার মত মেয়ে সব সময় চোখের সামনে পাওয়া যায় না।

আমি এবার আর কোন কথা বলতে পারলাম না। বোধহয় ঝিন্নি সম্বন্ধে জুলিয়েনের এই ব্যাখ্যা

আমার চেয়ে সত্য করে কেউ জানে না। আমি ঝিন্নিকে আজও ভালবাসি, না হলে ওর প্রসঙ্গ উঠলেই আমার হৃৎপিণ্ড থেকে এমন করে রক্ত চুইয়ে পড়ে কেন। তবু, শুধু ভালবাসার মর্যাদা রাখার জন্যেই আমার মনে হল, অনাহূতভাবে আমি একতরফা এগিয়ে যেতে পারি না। মনে হল, সত্যকে যদি ঝিন্নি স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে থাকে তাহলে সব সংকোচ কাটিয়ে ওরই এগিয়ে আসা দরকার।

আমার ভাবনার প্রসঙ্গ ধরেই জুলিয়েন বলল, মুখার্জী, সব ভুলে তুমি মেয়েটির হাত ধরে কাছে টেনে আনতে পার না?

বললাম, জীবনের সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি একটি নিয়ম মেনে চলতে হয়, ভালবাসার ক্ষেত্রেই বা তাকে ভাঙব কেন। ভুল বুঝেছে যে, ভুল ভাঙার কাজে তারই তো এগিয়ে আসার কথা।

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নিকে আমি বলেছিলাম, ভুলটাকে মেনে নেওয়া কোন হার নয়, বরং স্বীকার কবার ভেতর একটা জয় আছে। ভুল স্বীকার করে একখানা চিঠি লিখতেও বলেছিলাম। দেখলাম; ওর চোখ দুটোতে জল এসে গেল। ও মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, ও লিখতে পারবে না। পরে এক সময় শান্ত হয়ে বলেছিল, আমার ভুলটা আপনার বন্ধু মেনে নিল, কিন্তু ভাল যদি সত্যিই বেসে থাকে তাহলে ভুলটা শুধরে দেবার জন্যে এগিয়ে এল না কেন? আমাকে ভুলের ভেতর ফেলে রেখে যদি সে শাস্তি দিতে চায় তাহলে সেটাকেই আমার প্রায়শ্চিত্ত বলে মেনে নেব।

বললাম, জুলিয়েন, ঝিন্নিকে আমি শাস্তি দিতে চাই একথা তুমিও কি বিশ্বাস কর?

জুলিয়েন বলল, এটা ঝিন্নির অভিমান মুখার্জী। সব মেয়েরই বোধহয় এমন ধরনের একটা অভিমান থাকে।

বললাম, শুধু পুরুষেরই অভিমান থাকতে নেই, তাই না জুলিয়েন? অভিমান না থাক, আত্মসম্মান বোধটা নিশ্চয়ই তাদের থাকা উচিত।

আমার কথার কোন প্রতিবাদের পথ খুঁজে পেল না জুলিয়েন। সমাধানের কোন সূত্র না পেয়ে গালে হাত ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

ঝিন্নি সম্বন্ধে আমার আহত আত্মসম্মান জুলিয়েনকে নতুন কোন পথের আলো দেখাতে পারল না। ইতিমধ্যে পুবদিক আলোয় ভরে দিয়ে ভোরের সূর্য জেগে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, জুলিয়েন, বিয়ের ব্যাপারে ভোরবেলা কিছু অনুষ্ঠান থাকতে পারে, এখন তোমার একবার কোয়ার্টারে ফেরা দরকার। আর আমার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে যেওনা, ওটা সময়ের হাতে ছেড়ে দাও। স্রোতের মত যে সময় আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তারই টানে একদিন হয়ত আমরা দুজনের কাছাকাছি আসতে পারব। শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা আর সময়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না জুলিয়েন।

জুলিয়েন আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। হাতে হাত রেখে কোয়ার্টারের দিকে চলতে চলতে বলল, একটা ভাঙা ব্রীজ শ্রম আর চেষ্টায় জোড়া দেওয়া যায় মুখার্জী, কিন্তু ভালবাসার ভাঙন বোধহয় আপনি না জুড়লে চেষ্টা করে জোড়া যায় না।

এখন রোগী ভেঙে পড়ছে আমার চেম্বারে। দূর দূর থেকে আসছে নানা ধরনের রোগী। সার্জারীতে এম. এস. ডিগ্রিটা রয়েছে, তাই মানালীর মত ছোট্ট টাউনেও অপারেশনের পেসেন্টের ভীড় ঠেকান দায় হয়ে উঠেছে।

মানালীর ভ্যালীতে বসে মাঝে মাঝে ভাবি, কি বিচিত্র মানুষের মন। যে মানুষগুলো একদিন মিথ্যা সামাজিক অপরাধের অজুহাতে আমার ছায়া অব্দি মাড়াত না, আজ তারাই সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে .রেখেছে।

জুলিয়েন আর বালু তো উঠে পড়ে লেগেছে। রোজ আমার চেম্বারে আসা চাই। জুলিয়েন হয়েছে আমার পাবলিশিটি অফিসার। সারা কুলু ভ্যালীর প্রান্তে প্রান্তে সে ছড়িয়ে দিয়েছে আমার নাম।

বালু আমার সঙ্গে আগের মত বাইরের কলে অ্যাসিস্ট করুক, এ ইচ্ছে একদিন জুলিয়েন প্রকাশ করতেই আমি তাকে বাধা দিলাম। বললাম, বালুকে এখন একটু সংসার করতে দাও জুলিয়েন। অনেক

কষ্ট পেয়েছে ও। তোমার কাছে এসে ও সব কষ্ট ভুলেছে। এখন ওর মনটাকে আর বিক্ষিপ্ত করে দিও না। তাছাড়া আমার অপারেশনের কাজে ওই তো প্রধান সাহায্যকারিণী।

জুলিয়েন বলল, তুমি যা ভাল বোঝ তাই হবে মুখার্জী। বালুর ব্যাপারে তোমার ডিসিসানই তো ফাইনাল। ওখানে আমার কোন কথাই চলতে পারে না।

আমি হেসে বললাম, এতটা ক্ষমতা দিও না, হয়ত কোনদিন তার অপব্যবহার করে ফেলব।

জুলিয়েন আমার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, তাহলেও জেনো, জুলিয়েনের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদই আসবে না।

ওরা দুটিতে প্রায় সারাক্ষণই যেন আমাকে আগলে রেখেছে। আমি বেশ বুঝতে পারি, ওরা আমার নিঃসঙ্গতাকে ওদের উপস্থিতি আর উত্তাপ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়।

কিন্তু রাতে সব কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, গল্পের শেষে কোয়ার্টারে শুভরাত্রি জানিয়ে ফিরে যায় জুলিয়েন তখন কেমন এক ধরনের শূন্যতা আমার বুকের ভেতরে বাসা বাঁধতে থাকে। আমি তাকে ইচ্ছে করলেও সরিয়ে দিতে পারি না। একটা নিঃসঙ্গ পাখির মত সে আমার বুকের ভেতর তৈরি করা বাসায় বসে বহু দিনের বহু ব্যথায় ভরা স্মৃতির সুর তোলে। সে এমন করে গান গায় যেখানে ব্যক্তিগত দুঃখগুলো ধীরে ধীরে সারা নিসর্গে ছড়িয়ে পড়ে একটা চিরন্তন ব্যথার রূপ নেয়। আমি সে সময় শুধু অসহায় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে থাকি। ভোর হলেই সে শূন্যতার পাখিটা গহন কোন অরণ্যের গোপনে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু গভীর রাতে সে আবার ফিরে আসে আমার বুকের বাসায়।

অনেক সময় রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার মনে হয় আমি কুলুর বাংলোতে আমার বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার দিকে জানালা। আমি অনুভব করি জানালার বাইরে আকাশে করুণ মমতার মত কটি তারা চেয়ে আছে। হঠাৎ কানে এসে বাজে চাপা ঘুঙুরের আওয়াজ। আমি মোহাচ্ছন্নের মত বিছানার ওপর উঠে বসি। প্রতীক্ষা করতে থাকি ঝিন্নির। কিন্তু সে প্রতীক্ষার পথ পার হয়ে কেউ আর আমার অন্ধকার ঘরে ঢুকে চোখে চাঁপার আঙুল বিছিয়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে না, বলতো কে ?

আমি আবার বিবশ দেহখানাকে এলিয়ে দিই আমার সঙ্গীহীন শয্যায়।

ক'দিন ধরে আমার বাংলোতে রয়েছে একটি মেয়ে। সিজারিয়ান অপারেশনের পর মা আর বাচ্চা দুটিতেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমি অনেক সময় চেয়ে চেয়ে দেখি পাহাড়ী তরুণী মা কি গভীর চোখে তার প্রথম আলোয় আনা শিশুটির দিকে চেয়ে থাকে। মাতৃত্বের একটা আশ্চর্য অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে দেখি তার সারা দেহে-মনে।

আজ দুপুরে মেয়েটি বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। বালু ক'দিন বাচ্চাটাকে নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছে। তাই যাবার আগে বালু তার কোয়ার্টার থেকে একখানা বেবি ব্লাঙ্কেট এনে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিল। দেখলাম, বালুর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমি ওপরের বারান্দায় বসেছিলাম, বালু নীচের বাগানে হেমন্তের মিঠে রোদ্দুরে বাচ্চাটার কচি গালে গাল ঠেকিয়ে দেহটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ আমার চোখের ওপর সব ছবিটাই পাল্টে গেল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কুলুতে গান্দান মেয়েটার বাচ্চাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ঝিন্নি চলে যাবার আগে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি এমনি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলাম। আবার তাকাতে গিয়ে দেখি ঝিন্নির জায়গায় বালু দাঁড়িয়ে আছে।

আজকাল আমার কেন এমন হচ্ছে আমি জানি না। স্মৃতির সামান্যতম সাদৃশ্য থাকলেই ঝিন্নি এসে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে। আমি যতই দরজা জানালাগুলো ভেজিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন, সে কখন নিঃশব্দে এসে দুহাতে সব ঠেলে সরিয়ে চলে আসছে একেবারে অন্তঃপুরে।

কাজের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে একরকম থাকি, কিন্তু নির্জনে কখনো ভ্যালিতে এসে বসে থাকলে মনের অনেক গভীর থেকে একটা ব্যথার ঢেউ উপত্যকা থেকে উঠে আসা কুয়াশার মত আমার চেতনার চারদিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সূর্যের শেষ আলোটুকু তুষার পাহাড়ের

চূড়া থেকে আবীর রঙ মুছে নিয়ে চলে যায়। ধূসর ছায়া নামে দিগন্তে। আর তখন আমাকে ঘিরে এক আশ্চর্য করুণ রাগিণী বাজতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্যথার রাগরাগিণী আছে, তারা যেন একই সঙ্গে বেজে বেজে ওঠে। আমি তার একমাত্র শ্রোতা। ইচ্ছে করলেই উঠে আসতে পারি না।

কোন কোন দিন আমার চোখের ওপর কান্তিময়ী কুলুর পটভূমিতে অভিনীত হয় আমার জীবনের আশ্চর্য সব সুখ দুঃখ মিশ্রিত নাটক। স্মৃতির গ্রীনরুম থেকে পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে এসে অভিনয় করে যায়। আমি একা দর্শকের আসনে বসে সুখদুঃখের দোলায় দুলতে দুলতে সেইসব অভিনয় দেখি।

নাটক শেষ হলে সম্মোহিতের মত বিষাদ সাগরের ঢেউ দুহাতে সরাতে সরাতে ঘরে ফিরে এসে অবশ দেহটা বিছানায় ছড়িয়ে দিই।

মনে বারবার একটা প্রশ্ন নাড়া দিতে থাকে, আচ্ছা, ঝিন্নিও কি এমনি করে আমার মত কষ্ট পাচ্ছে? তার রাতের বালিশটি কি চোখের জলে ভিজে ওঠে না? আমি তো এখন কুলু থেকে অনেকখানি দূরেই রয়েছি, কিন্তু তাকে তো কুলু আর নাগ্‌গরের যন্ত্রণাময় স্মৃতির পথগুলো প্রতিটি দিন পার হতে হচ্ছে। কি ভাবছে সে? অতীতকে ভুলে থাকার কোন মন্ত্র কি সে মনে মনে প্রতি মুহূর্তে উচ্চারণ করে চলেছে?

একদিন স্বপ্নে দুজনের দেখা। কোন বিচ্ছেদ যে কোনদিন ঘটেছে তার চিহ্ন ছিল না আমাদের আচরণে। আমরা অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষীর খেলা খেলছিলাম। বিপাশার জল খল খল খুশিতে ছুটে চলেছে, আর আমরা তার ওপর পড়ে থাকা বড় বড় নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে চলেছি। ঝিন্নি আমাকে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

আমি ঝিন্নির নাম ধরে ডাকতে লাগলাম, কোন সাড়া নেই। হঠাৎ মনে হল, ও কি স্রোতের ভেতর পড়ে গেল নাকি! সারা শরীরে বিদ্যুতের একটা শক্ খেলাম। আমি ছুটতে লাগলাম সামনের দিকে। বুঝতে পারিনি কতখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম, আচমকা পেছন থেকে ঝিন্নির ঘুঙুর বাজান হাসির শব্দে থমকে পেছন ফিরলাম। ও অমনি আঁজলা ভরে বিপাশা থেকে একরাশ মুক্তো কুড়িয়ে আমার চোখে মুখে ছুঁড়ে মারল। তারপর একটা বড় পাথরের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বউকে ছেড়ে পালানোর পুরস্কার।

দাঁড়াও, আমি তোমার পুরস্কারটা দিয়ে দিচ্ছি,—বলে নীচু হয়ে এক আঁজলা জল তুলে সামনে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেতারের দ্রুত তানের মত একটা হাসি, বিপাশার জল ছুঁয়ে, পাইনের সরু তারের মত পাতাগুলো কাঁপিয়ে, দূরের তুষার ঝক্‌ঝক্ পাহাড়গুলোর বুকে ধাক্কা খেয়ে বাজতে লাগল।

দুপুরের ঘুমটা ভেঙে গেল। জানালার বাইরে চোখ পড়তেই দেখি, কটি পাহাড়ী তরুণ তরুণী আমার বাগানের সর্ট কাট্ পথ ধরে মানালসু নদীর দিকে চলেছে। তারা পরস্পর পরিচিত একটা গানের কলি ফিরে ফিরে গাইছে, আর মাঝে মাঝে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

•

বরফ বরফ আর বরফ। কদিন ধরে সমানে বরফ পড়ছে। পাইন আর সিডারের বনে উঠেছে হাওয়ার হাহাকার। আমি যখন নিঃসঙ্গ বাংলোতে বসে থাকি, তখন কান পাতলে বুকের ভেতর শুনতে পাই এমনি একটা গোঙানির শব্দ। ঝড়ের একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ।

গত ডিসেম্বরের এমন দিনগুলোতে আমি ছিলাম কুলুতে। রাতের ঘরগুলো ঝিন্নি উত্তপ্ত করে রাখত রুমহিটারটা জ্বালিয়ে দিয়ে। তারপর সারারাত ধরে বসে বসে আমরা কথা বলতাম। সে অসংলগ্ন কথায় জগতের কোন ধর্মশাস্ত্র বা মহাকাব্য রচনা করা যায় না, কিন্তু দুটি হৃদয়কে একমাত্র সেই যোগসূত্রহীন কথাই কাছে টেনে এনে বেঁধে দিতে পারে।

ক'দিন কোলি-রি-দেয়ালির সুর লেগেছে হাওয়ায়। পাহাড়ী দেশের টিকায় টিকায় চলেছে নাচের মহড়া আর দীপ জ্বালানোর আয়োজন। টাট্টু নিয়ে পথে বেরোলেই গানের কলি কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজছে।

হঠাৎ একদিন কি হল আমার, আমি অনেক বুঝিয়েও নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ভাগতুকে

ক'দিন বাইরে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম আমার টাট্টু চৈতককে সঙ্গী করে। আমি পথে বিশ্রাম নিতে নিতে, কখনো বিপাশার কুল ধরে কখনো বা পাহাড়ের কোল বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। শেষে কোলি-রি-দেয়ালির দিনটিতে এসে পৌঁছলাম নাগ্‌গরের দেওদার বনে ঘেরা পাহাড়ের প্রান্তে।

আমি দূর থেকে দেখলাম মেলার আয়োজন। দোকানপাট, লোকজনের মিছিল। সারা দুপুর ঘুরলাম নদীর বাঁকে বাঁকে। দেখা হল সেই গদ্দী পরিবারের সঙ্গে। গদ্দীরা আমার দিকে কলি এগিয়ে দিলে আর গাদ্দানরা উপহার দিলে চোখের চাউনি। আমি ওদের সঙ্গে পুরো একটি বছর পরে গাদী ভাষায় কথা বলতে ওরা খুব খুশি হয়ে উঠল। আমাকে ছাড়তেই চায় না। তবু আমাকে চলে আসতে হল।

ওদের কাছে আমি সে রাতের মত রেখে এলাম আমার চৈতককে।

অপরাহ্নের হলুদ আলোয় আমি সেই আশ্চর্য পাহাড়ে উঠে এলাম। ঝোরার স্রোত তেমনি বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। আমি পাহাড়ের নীচে হলুদ সরশোনের ক্ষেত দেখলাম। ঝোরার জল অঞ্জলি ভরে হাতে তুলতেই মনে হল ঝিন্নির গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমাকে বারণ করল সে জল খেতে।

আমি চমকে পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

এবার কে যেন আমাকে ইশারা করল ঐ গুহার ভেতর থেকে। আমি অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে জলের ধারায় পা ডোবাতে ডোবাতে এগিয়ে চললাম।

সেই শিলাটি তেমনি পাতা আছে, যেখানে আমি আর ঝিন্নি বসেছিলাম গত ডিসেম্বরে। আমি বসলাম। মনে হল আমার কম্বলখানাব ভেতর ঢুকে পড়েছে ঝিন্নি। আমার সারা শরীরে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। আরও অনেকখানি এগিয়ে আলো দেখতে পেলাম। ঐ তো সেই মেলা। ঐ তো নাচের আসর। সাদা পোশাকে সজ্জিত পুরুষেরা বৃত্ত রচনা করে ঢেউ তুলে বৃত্তের মাঝে এগোবার চেষ্টা করছে, আবার ফিরে আসছে। বৃত্তের কেন্দ্রে রঙীন পোশাকে ফুলের পাপড়ির মত ফুটে আছে মেয়েবা।

কে যেন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তোমাকে না এতখানি এগিয়ে যেতে বারণ করেছি।

আমি পিছিয়ে এলাম। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

গত ডিসেম্বরের মত এবার কোলি-রি-দেয়ালিতে কিন্তু ঝড় উঠল না।

সন্ধ্যার আগেই মেলা ভেঙে গেল। ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শীত যেন পাহাড়ের গুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল হায়েনার কামড় নিয়ে।

আমি রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর পথে উঠতে লাগলাম। আমার বিশেষ শীত বোধ হচ্ছিল না। মনে হল আমি আমার কথা রাখতে এসেছি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। পথের ওপর একফালি আলো এসে পড়েছে। কাঠের কেল্লা। খোলা জানালার পথে দেখা যাচ্ছে মদনলাল তেমনি ড্রিঙ্ক করে চলেছে। একটু পরে সম্ভবতঃ মদনলালই কেল্লার মন্দির থেকে হাউই ছাড়ার নির্দেশ দেবে।

আমি দু'একটা কুহলেব শব্দ শুনতে শুনতে উঠে এলাম ঝিন্নির কোয়ার্টারের কাছাকাছি। আমি জানি, একটা নেশাব ঘোরে আমি নাগ্‌গরে চলে এসেছি। ঝিন্নি নেই, জনপ্রাণী নেই, কেউ থাকতে পারে না। তবু এসে দাঁড়ালাম ওর কোয়ার্টারের মুখোমুখি।

একি ! এক টুকরো আলো বন্ধ ঘরের রন্ধ্র দিয়ে সোনার কাঠির মত এসে পড়েছে পথে।

আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে চোখ পাতলাম সেই রন্ধ্রপথে।

ঝিন্নি, আমার ঝিন্নি বসে আছে!

আমি চীৎকার করে ডেকে উঠলাম, ঝিন্নি ঝিন্নি ঝিন্নি।

আশ্চর্য, আমার গলা দিয়ে এক বিন্দু স্বর বাইরে বেরিয়ে এল না।

ঝিন্নি তেমনি ফায়ার প্লেসে আগুন জেলে বসে আছে। প্রপাতের মত খোলা চুলে তার মুখ আর হাতের অনেকখানি ঢাকা।

আমি মুখে একবার উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলাম, আমি আমার কথা রেখেছি ঝিন্নি। কোলি-রি-দেওয়ালির দিনে নাগ্‌গরকে আমি ভুলি নি।

হঠাৎ হাউই উঠল আকাশে। ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল জানালাটা। অমনি উঠোনে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সোনার ঈগল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ঝিন্নির দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি সেই আলোর সীমানাটুকু দ্রুত পার হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নামতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হল দূরাগত ধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠল, ছোটেসাহেব, ছো-টে-সা-হে-ব!

এ কি ঝিন্নির কণ্ঠস্বর! আরও দ্রুত আমি নীচে নামতে লাগলাম। বড় বিপদজনক পথ। আমার আত্মাভিমান সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে আমাকে উৎরাইয়ের পথে টেনে নিয়ে চলল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! শব্দটা কি এগিয়ে আসছে আমাকে অনুসরণ করে? সে ডাক কি সারা পাহাড় জুড়ে কান্নার মত ছড়িয়ে পড়ছে? ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? কোন্‌দিকে পালাব কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে ডাক একসময় অনেক কাছে এগিয়ে এল। মনে হল একেবারে আমার বুকের ভেতর বাজছে।

উপত্যকা থেকে অজস্র আলোর রেখা টেনে অন্ধকার আকাশের বুকে উঠে আসছে হাউই। আকাশ ভরে আলোর ফুল ফুটছে, আবার ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে পাপড়িগুলো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখতে লাগলাম।

নির্ঝরের গান
দ্বিতীয় পর্ব

দেখলাম ঝিন্নি খেতে খেতে থামল। মুখখানা ঈষৎ কাৎ করে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন শব্দকে ধরার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। আমিও কান পাতলাম। কিন্তু কোন কিছু আওয়াজ এই রাতের অন্ধকার ভেদ করে আমার কানে এসে পৌঁছুল না। আমি চোখে মুখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে ওর দিকে তাকালাম। ও কোন কথা না বলে থালি থেকে হাতখানা তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল।

দারুণ খেয়ালী ঝিন্নি। কোনদিনই আমি খুব পরিষ্কার করে ওর মনের নাগাল ধরতে পারি না। ও যখন কিছু একটা করে তখন ওকে যেন কেমন একটা রহস্য ঘিরে থাকে। শত চেষ্টাতেও সহসা সে রহস্যটুকু ভেদ করা যায় না। কিন্তু মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ করে চাঁদের বেরিয়ে আসার মত ওর আসল রূপটা আবছায়া থেকে ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ঝিন্নি অনেক দূরের জিনিস যেমন স্পষ্ট দেখতে পায় তেমনি অনেক দূরের শব্দও আশ্চর্যভাবে ওর কানে এসে বাজে। আমি এই প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় দুটির ব্যাপারে রোজই প্রায় ঝিন্নির কাছে হেরে যাই।

ঝিন্নি এখন নীচের পথে ছুটে নামছে বলে মনে হল। আমি ভেতরে থেকে ওর পায়ের সাড়া পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে চড়াই উৎরাই করতে ওর একটুও অসুবিধে হয় না। নাগ্‌গরের প্রতিটি পথ, প্রতিটি কুহল আর গাছপালা ওর চোখের ওপর ছবি হয়ে আছে।

আমিও কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখন আমি শুনতে পাচ্ছি একটা শব্দ। তাও একটানা নয়। একটা ভোমরা কানের কাছে বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে একবার দূরে সরে যাচ্ছে আবার ধেয়ে আসছে আরও জোর শব্দ করে।

হঠাৎ পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই আলোর ঝলক চোখে পড়ল। একটা গাড়ি উঠে আসছে।

এত রাতে কে আসে! দিল্লী থেকে কোন ভি. আই. পি এল কি ? তাহলে তো আগে ভাগেই ঝিন্নি জানতে পারত।

গাড়িখানা পথের মাঝে একবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এগিয়ে এসে থামল একেবারে ঝিন্নির কোয়ার্টারের সামনে। আমি ততক্ষণে হেড লাইটের আলোয় স্নান করে গেছি।

ঝিন্নি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমার পাশে ছুটে এসে দাঁড়াল। আমার চোখের ওপর দুটো হাতের পাতা আড়াল করে বলল, একদম দেখবে না। চুরি করেও না। এখন বল কে এসেছে?

তোমার চাচাজী যে নয় তা জোর দিয়ে বলতে পারি।

ঝিন্নি আমার মৃত বাবাকে বলত পিতাজী আর নিজের বাবাকে ডাকত চাচাজী বলে। ঝিন্নির অন্তর থেকে এ ডাকটি উঠে আসত।

তুমি দারুণ চালাক ছোটেসাহেব। চাচাজীর সামনে যে আমি তোমার সঙ্গে এমন করে কথা বলব না, তা তুমি জান।

তাহলে হেরে গেলাম।

ঝিন্নি অমনি বলল, শুধু হেরে গেছি বললে চলবে না মশাই, ভাল একটা খানার দাম দিতে হবে।

বাজি।

ঝিন্নি আবার জীপের কাছে ছুটে গেল। জীপের হেড লাইট ততক্ষণে নেভান। অস্পষ্ট তারার

আলোয় জীপটাকে একটা বৃহদাকার ভালুক বলে মনে হচ্ছিল।

ঝিন্নি এবার হাত ধরে টেনে আনল একটি মেয়েকে। মুখখানা তার অস্পষ্ট হয়ে গেছে অন্ধকারে।

আবার ঝিন্নি প্রশ্ন করল, বল এবার কাকে এনেছি তোমার কাছে?

সত্যিই চিনতে পারিনি। অনুমানেও না! বললাম, এখনও জয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি চিরদিনের হেরো। কোনদিনই আর জয়ী হতে পারলে না। এই আমার কাছ থেকেই তোমার হারের শুরু।

কথা বলতে বলতে ও মেয়েটিকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এবার ছুঁয়ে দেখ চিনতে পার কি না?

সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিগুলো যেন প্রখর হয়ে উঠল। বললাম, সত্যি বালু এত রাতে তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি।

আমিও এসেছি ডাক্তার, বউকে একা পাঠাতে ভরসা পাইনি।

বলতে বলতে হেডলাইটটা মুখের ওপর ফেলল জুলিয়েন।

বললাম, আমি কিন্তু বেননের আপেল বাগিচায় আমার বুলবুলকে একা ছেড়ে দিতে ভয় পাই না। সে যা হোক, এখন স্টার্ট বন্ধ করে আলোটি নিভিয়ে নেমে এস। এদিকে রাতের খাবার প্রায় নিঃশেষ।

জুলিয়েন হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নেমে এল।

আমরা অন্ধকারে পরস্পরকে জড়িয়ে ঢুকলাম বসার ঘরে। বালু আর ঝিন্নি গেল অন্দরে। সম্ভবতঃ পোশাক বদল আর রাতের খানার তদারকীতে।

হঠাৎ এসে পড়ে খুব চমকে দিলাম, তাই না ডাক্তার?

চমক বলে চমক, এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। এই সারপ্রাইজটা কি যে ভাল লাগছে কি বলব।

এখন অনুমান কর তো দেখি, কেন এলাম?

কারণ ছাড়া জুলিয়েন কি আর আসবে?

শক্ত হাতে আমার হাতখানা চেপে ধরে জুলিয়েন বলল, উইথড্র, না হলে এখুনি কিন্তু চলে যাব।

আমি কৌতুক করে বললাম, তুমি একাই যাবে না বালুকেও সঙ্গে নেবে?

হেসে আমার হাতটা ছেড়ে দিল জুলিয়েন। বলল, তুমি কি সত্যিই মনে কর ডাক্তার, আমি বালুকে তোমার কাছে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারব না?

আমি হেসে উঠলাম, এখন বালুর প্রসঙ্গটা চাপা থাক। আগে বল তো দেখি কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ?

জুলিয়েন বলল, এমন চমৎকার জায়গায় তোমার বউ যদি আমাদের দুজনের থাকার একটু ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে না তাড়ান অব্দি থেকে যেতে পারি।

বাজে কথা রাখ, সত্যি করে বল বেনন কদ্দিন থাকছ?

কালই চলে যাচ্ছি।

আমার খুব খারাপ লাগল কথাটা শুনে, তাই চুপচাপ বসে রইলাম।

আমার মনের অবস্থা অনুমান করে জুলিয়েন বলল, প্রিয় ডাক্তার, বিশ্বাস কর আর না কর পরশু আমাকে জরুরী কাজে সিমলা বেরিয়ে যেতে হবে।

তবে এ রকম কয়েক ঘণ্টার জন্যে সরাইখানায় ঘুমুতে আসার মানে?

জুলিয়েন অন্দরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, এ প্রশ্নটা তোমার খেয়ালী অ্যাসিস্ট্যান্ট বালুকেই কর। হঠাৎ সন্ধ্যায় মার্কেট থেকে ফিরে আসতেই বলল, চটপট পোশাক বদলে কিছু খেয়ে নাও, এক জায়গায় যেতে হবে।

বললাম, জায়গাটার নাম জানতে পারি কি?

ও অমনি [illegible], না জানলে বুঝি যাবে না?

তা কেন, তুমি বলছ যখন নিশ্চয়ই যাব। আমি এখুনি আসছি।

ও বলল, ঝিন্নিকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

আমি অমনি বললাম, তাহলে যাব না। ঝিন্নির বরকে দেখতে ইচ্ছে করছে বললে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

ও মস্ত বড় কীল তুলে তাক করছে দেখেই আমি সরে পড়লাম।

জুলিয়েনের কথায় দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির মাত্রা বোধ করি একটু উঁচু পর্দায় চড়ে গিয়ে থাকবে, ওরা দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ঝিন্নি জুলিয়েনকে লক্ষ্য করে বলল, সামান্য যা আছে ভাঁড়ারে তাই সাজিয়ে দেব। বলতে পারেন, একজনেরই মত। আপনাদের ভেতর কে খাবেন ফয়সালা করে নিন।

জুলিয়েন অমনি বলল, বালু কি বলে?

ঝিন্নি বলল, বালু আপনাকেই প্রশ্নটা করেছে।

জুলিয়েন এবার বালুর দিকে তাকিয়ে বলল, দুজন এক সঙ্গে বসলে কেমন হয়। বন্ধুদের দেওয়া জিনিসের সামান্য এক কণাও অসামান্য হয়ে উঠবে। একজনের খাবারে ঠিক দুজনের হয়ে যাবে।

খাবার টেবিলে বসল ওরা। ঝিন্নি কিন্তু আয়োজনের কোন ত্রুটিই রাখেনি। আমি জানি, ঝিন্নির ভেতর তারিফ করার মত গৃহিণীপনা আছে। সব কিছুকে গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে প্রকাশ করাটাই তার স্বভাব।

জুলিয়েন বলল, এতক্ষণ বিনয় করছিলেন কেন ম্যাডাম? এ যে আপনাদের হিন্দু এপিকের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার।

ঝিন্নি বলল, আমাদের এপিক, মিথলজি সবই দেখছি আপনার পড়া।

খেতে খেতে জুলিয়েন বলল, আমার ঠাকুরমা যে আপনাদেরই ঘরের মেয়ে। তাই তাঁর কোলে বসেই আমরা খুব ছোটবেলা থেকে হিন্দু মিথলজির অনেক গল্প শুনেছি।

বললাম, আচ্ছা বেনন, তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে তোমার ঠাকুরমার কোন কষ্ট হয়নি?

আমাদের পরিবার ঠাকুরমাকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল ডাক্তার। তাই সারাক্ষণ তাঁর অসুবিধেগুলোর দিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি ছিল। মায়ের কাছে এসব কথা শুনেছি। ঠাকুরমার ব্যক্তিত্ব আর স্নেহ সকলের শ্রদ্ধার কারণ হয়েছিল। এখনও ঠিক তাই।

ঝিন্নি বলল, আপনার ঠাকুর্দার পর আপনিই নতুন করে এ দেশের সঙ্গে রক্তের যোগ ঘটালেন।

জুলিয়েন খাওয়ার প্লেট থেকে হাতটা তুলে নিয়ে বলল, দেখুন, যে দেশে কয়েক পুরুষ ধরে আমরা বাস করছি সে দেশের মাটি, মানুষ সবই তো আপনার জন। আজ বালু আমার কাছে এসেছে ঠিক কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার প্লেট থেকে যে খাবারটুকু আমি খাচ্ছি আর যা আমার দেহে রক্ত তৈরী করছে তার সঙ্গে কি আমার কোন রক্ত-সম্পর্ক নেই?

বললাম, সাবাস জুলিয়েন, উত্তরটা দারুণ দিয়েছ।

জুলিয়েনের কথা তখনও শেষ হয়নি। সে বলে চলল, আমাদের আপেল বাগান থেকে যা কিছু রোজগার হয় তা এ দেশেই থাকে। আমরা যেমন নিজেরা টাকার অংশ নি, ঠিক তেমনি বাগানে যারা কাজ করে তারাও অংশ পায়।

একটু থেমে হালকা সুরে বলল, এ দেশের কাঠবেড়ালীগুলোও আমাদের বাগানের ফলের অংশীদার।

বলেই জুলিয়েন আবার প্লেটে হাত ঠেকিয়ে খেতে শুরু করল।

ঝিন্নি বলল, আপনি যে খোদ এ দেশীয় বনে গেছেন তার আর একটা প্রমাণ এখুনি দিতে পারি আমি।

সবাই আমরা ঝিন্নির মুখের দিকে তাকালাম।

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁটা চামচ ছেড়ে আমাদের মত হাতে তুলেই খাবার খাচ্ছেন।

ওটা কেবল মা ছাড়া আমাদের বাড়ির সকলেরই অভ্যেস হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, হাতে তুলে খেতে আমরা একটু বেশি তৃপ্তিই পাই।

খাওয়া শেষ হলে আমরা ড্রইং রুমে এসে বসলাম। গরমকালে হাওয়ায় উপভোগ্য ঠাণ্ডা আমেজ। এদেশের মানুষ এই গ্রীষ্মকালকে বলে তউন্দি। নীচের উপত্যকা এ সময় বেশ খানিক গরম হয়ে ওঠে। উঁচু পাহাড়ের মাথাগুলো মধ্যদিনে একটা অস্বচ্ছ আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। তখন দূরের পার্বত্য ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বললাম, অর্চার্ডের খবর কি জুলিয়েন? ফল কেমন ধরেছে?

জুলিয়েন মনে হল বালুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে একটুখানি হাসির রেখা ফোটাল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বালুকে জিজ্ঞেস কর ডাক্তার।

হেসে বললাম, বালু যে আপেল বাগিচার খুঁটিনাটি সব কিছুই জানে একথা আমার অজানা নয়। কিন্তু তুমি যে বাগানের পুরো দায়িত্ব ওর হাতে আজকাল ছেড়ে দিয়েছ তা আমি জানতাম না।

বালু বলল, ওর কথা আপনি একটুও বিশ্বাস করবেন না দাদাজী। বাগান ওর প্রাণ। পুরো তদারকী ওর হাতে।

আবার হাসির রেখা ফুটল জুলিয়েনের মুখে। বলল, বাগান তৈরি অব্দি আমার কাজ কিন্তু গাছের ফল, তার পরিচর্যা আর রক্ষার ভার বালুর হাতে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ডাক্তার, বাগানে ফল তো ভালই ধরেছে কিন্তু তার বিপর্যয়ের কথাটা তোমার অজানা নয়। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া, ফ্লাইং ফক্সের উৎপাত, বরফপাত এসব দুর্যোগ কাটিয়ে উঠলে তবেই তো কুলুর গোল্ডেন অ্যাপেলের স্বপ্ন সার্থক হবে।

হেসে বললাম, কথাটা ঠিক। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অনেক কম।

জুলিয়েন আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, ধীরে ধীরে এ বিষয়ে তুমিও একদিন অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে ডাক্তার।

আমাদের কথার ফাঁকে দেখলাম বালুর হাত ধরে ঝিন্নি শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। যাবার আগে অবশ্য জুলিযেনের কাছ থেকে তার বউকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে অনুমতি চেয়ে নিল।

আমরা টুকরো টুকরো কথা বলছিলাম। রাত বাড়ছিল।

জুলিয়েন এক সময় বলল, মানালীর ডিস্পেনসারীতে কবে ফিরছ ডাক্তার?

কেন বল তো? আমার ডিস্পেনসারীতে কি খুব বেশি রোগীর ভীড় দেখেছ?

একা কম্পাউন্ডার শিউশরণজী কি তোমার সব কাজ চালাতে পারবে?

হেসে বললাম, সত্যি ডাক্তারী পড়ে কি হালই না আমার হল। দুদিন নির্ভাবনায় যে বউ-এর কাছে কাটাব তার উপায় নেই।

বউকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।

তাহলে রোয়েরিখ সাহেবকে দেখবে কে?

জুলিয়েন বলল, সত্যি এক আশ্চর্য মানুষ এই রোয়েরিখ সাহেব। আমি শুনেছি, আমার বাবা মাঝে মাঝে আপেলের টুকরী নিয়ে আসতেন রোয়েরিখ সাহেবের কাছে। ভারী খুশি হতেন তিনি গোল্ডেন অ্যাপেল পেয়ে। রোয়েরিখের একটি আশ্চর্য সুন্দর ছবি আমার ঘরে আছে। বাবাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন।

বললাম, ছবিখানা কি নিয়ে আঁকা?

তাঁর জীবনের একটি অদ্ভুত অনুভূতির অভিজ্ঞতা নিয়ে।

একটু থেমে জুলিয়েন বলল, একবার নিকোলাস রোয়েরিখ হিমালয় পরিভ্রমণ করছিলেন। রাতে তুষার পর্বতের নীচে তাঁবুতে কাটিয়েছেন। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে চিরদিনের অভ্যেস মত শয্যা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন পুরোপুরি ডন। উনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, উপত্যকা থেকে সাদা মেঘগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ওপরে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল, ওগুলো যেন মেঘ নয়। বিরাট উপত্যকাটি আশ্চর্য এক সরোবর। তার থেকে সাদা পাপাড়ি মেলে জেগে উঠছে

একটি পদ্ম। কিছু পরে সূর্যোদয় হল। তার আলো এসে পড়ল ঐ পদ্মের ওপর। শ্বেত পদ্মের পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। ছবিতে তাঁর এই অনুভূতিকেই তিনি রূপ দিয়েছিলেন।

বললাম, এ ছবির কথা আমি জানতাম না, তবে তাঁর আর একখানা ছবি ঝিন্নি আমাকে দেখিয়েছিল। সেখানেও বিরাট এক স্বপ্ন-দর্শনের কথা আছে।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে দেখে আমি বললাম, এ ছবিখানার বিষয়বস্তু—রামায়ণের মহাকবি।

পার্বত্য পরিবেশের মাঝখানে বসে আছেন কবি বাল্মীকি। তাঁর আয়ত চোখের দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি স্বপ্নময়। অদূরে অস্পষ্ট কুহেলিকার ভেতর থেকে জেগে উঠেছে অযোধ্যা নগরী।

জুলিয়েন বলল, দারুণ। শোন ডাক্তার, শিল্পীর একটা উক্তি শোন। আমি বাবার ডায়েরীতে নিকোলাস রোয়েরিখের কয়েকটি উক্তি পেয়েছিলাম :

'Bring art to the people where it belongs. We should have not only museums, theatres, universities, public libraries, railway stations and hospitals, but even prisons decorated and beautified. Then we shall have no more prisons.'

আর একটা মনে পড়ছে —

'Above all confusions the Angels sing of peace and good will. No guns, no explosives can silence these choirs of heaven.'

বললাম, নিকোলাস জন্মেছেন রাশিয়ান হয়ে, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন ভারতীয়। আর তাঁর বিশ্বমানবতাবোধ তাঁকে মহান বিশ্বনাগরিকের গৌরব দান করেছে।

আমরা প্রায় মধ্য রাত অব্দি এই আশ্চর্য ঋষিতুল্য শিল্পীর বিচিত্র জীবন সাধনার কথা নিয়ে আলোচনা চালালাম। সেই মানুষ যিনি এই নাগ্‌গর পাহাড়ের ওপর তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন এবং যাঁর শেষ নিঃশ্বাসও পড়েছিল হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে, তাঁর কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হলাম।

দারুণ খেয়ালী জুলিয়েন। বলল, চল ডাক্তার বাইরে একটু ঘুরে আসি।

বললাম, চল, কিন্তু মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাচ্ছে।

জুলিয়েন কোন কথা না বলে আমার দিকে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাতে হাত রেখে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বেশিদূর ও গেল না। একজোড়া পাইন গাছের তলায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। নীচের আশ্চর্য কুলু উপত্যকা গায়ে একখানা কালো র‍্যাপার জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিপাশা তাকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে চলেছে। ওদিকে পীরপাঞ্জালের তুষার চূড়া অন্ধকার যবনিকার আড়ালে স্থির হয়ে আছে। কেবল সামনের পাহাড়ে পাইনগাছের ডালের ফাঁকে শীর্ণ চাঁদটা আটকে পড়েছে। সহস্র তারার চোখ মেলে কৌতূহলী আকাশটা তাই দেখছে।

জুলিয়েন বলল, চিন্তা করে রোমাঞ্চিত হতে হয়, নিকোলাসের মত একজন পুরুষ এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কুলু উপত্যকা আর হিমালয়কে দেখতেন। আমরা তাঁর সাধনার একেবারে পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম, এই গাছের পাতার ধ্বনি তিনি শুনেছেন। ঐ কুহলটার ঝরে পড়ার গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কত সন্ধ্যা কত প্রভাতের রঙমাখা পীরপাঞ্জালের ছবি প্রতিবিম্ব ফেলেছে তাঁর চোখের ওপর।

ঝিন্নি অন্ধকারে আমাদের ঠিক খুঁজে বের করল।

বালুর ঘুম পেয়েছে বেনন সাহেব।

জুলিয়েন সত্যি সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, অনেক রাত হয়ে গেছে মিসেস মুখার্জী। আমরা সত্যিই দুঃখিত।

ঝিন্নি বলল, সারা রাত গল্প করলেও আমার ক্লান্তি আসবে না। কিন্তু বেচারা বালু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও আবার সবাই না ঘুমুলে একা একা ঘুমুবে না।

আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরের ভেতর এলাম। ঝিন্নি ড্রইংরুমে ওদের শোবার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা

করে রেখেছে। বালু একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে মুখে মিষ্টি একটুখানি হাসি টেনে সিধে হয়ে বসল। চোখদুটোয় ভরা আছে ঘুমের আমেজ।

ঝিন্নি জুলিয়েনের দিকে ফিরে বলল, বেচারাকে আর জাগিয়ে রাখবেন না যেন। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন। শুভরাত্রি।

বিছানায় শুয়েই ঝিন্নি আমার মুখের ওপর তার মুখখানা ঠেকিয়ে বলল, কিছু বুঝলে?

কিসের?

এই যে আপেল বাগান সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের উত্তরে জুলিয়েন যা বলল।

ও তো ঠিকই বলেছে। ফল ভাল ধরেছে। উৎপাতের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে ঠিক সময়ে সোনা ফলবে।

অন্ধকারে ঝিন্নি বোধহয় আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু পরে চাপা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, সত্যি ছেলেরা কত বোকা হয়। তুমি যে কি করে ডাক্তারী পাশ করলে, কি করে মানালীতে এত পশার জমালে, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আমিও ঝিন্নির কথা শুনে অবাক, কেন বল তো? আমার বোকামীটা দেখলে কোথায়?

ও হঠাৎ আমার নাকটা ওর দুটো আঙুলে চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, খুব চালাক তুমি, ঘুমোও।

সত্যি কি হল, বল না?

ঝিন্নি আমার কপালে ওর থুত্নি ঠেকিয়ে বলল, আপেলের গাছ মা হয় কখন? যখন তার ফল ধরে। বালু মা হতে চলেছে।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসে ঝিন্নিকে দুহাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি আমি একেবারে নির্বোধ। বালু মা হতে চলেছে, দারুণ খবর। জুলিয়েনকে কাল পাকড়াতে হবে। ওকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। ফিস্ট চাই, ফিস্ট। দারুণ রকম একটা ফিস্ট। ও দিতে না চাইলে ওর হয়ে আমরাই দিয়ে দেব, কি বল?

একি! ঝিন্নি আমাকে জড়িয়ে আছে, মুখ তুলছে না কেন? আমি ওর মুখখানা তুলে ধরতে গিয়ে দেখি ও আমার বুকের মধ্যে জোর করে মুখখানা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হল ঝিন্নি?

আমি সত্যি এবার বোকা বনে গেলাম। এতক্ষণ একটি নারীর মাতৃত্বকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে আর এক বঞ্চিতাকে কতখানি ব্যথা দিয়ে ফেললাম তা বুঝে উঠতে পারিনি।

বললাম, তুমি তো অবুঝ নও সোনা। আমাদের বিয়ের দুটো বছর এখনও পূর্ণ হয়নি।

ঝিন্নি আমার বুক থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে সম্ভবতঃ চোখ মুছল। একসময় আমার বুকে ওর একটা আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, শোন, আমাকে তুমি খুব ছোট ভেবেছ, তাই না?

একটুও না।

ঝিন্নি আবার বলল, বিশ্বাস কর, আমি বালুর ছেলে হবার কথা শুনে খু-উ-ব খুশি হয়েছি। ও আমার কাছে খবরটা দেবে বলেই ছুটে এসেছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি ছোটেসাহেব। কিন্তু হঠাৎ কেন আমার চোখ ভরে জল নামল তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। খুব অন্যায় হয়ে গেল, তাই না ছোটেসাহেব?

ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার ঝিন্নি কোনদিন কোন অন্যায় করতে পারে না।

ও বলল, জান ছোটেসাহেব, আমার মাঝে মাঝে কেমন ভয় করে।

কিসের ভয় ঝিন্নি?

কিছু না, বলে ঝিন্নি আবার আমার বুকে মুখ গুঁজল।

অন্ধকারেই আমি ওর মুখখানাকে দু হাতের পাতায় তুলে ধরে বললাম, বল কিসের ভয়?

আমি ওর মুখখানা দেখতে না পেলেও জানি, ও দুটো চোখ বন্ধ করে আছে। আমি যখনই ওকে স্পর্শ করি তখনই ও ঠিক এমনি করে।

ও বেশ কিছুক্ষণ আমার কথার কোন উত্তর দিল না। একসময় চাপা একটা শ্বাস ফেলে বলল, যদি

আমি মা হতে না পারি?

ওকে জড়িয়ে আদরে আশ্লেষে ভরে দিয়ে বললাম, আমার ঝিন্নিব সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই।

তবু ভয় যায় না ঝিন্নির, তুমি কি করে বুঝলে?

ডাক্তার বলে।

আমি জানি, পরীক্ষা না করে ওসব ব্যাপারে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়, তবু ঝিন্নির অকারণ ভয় ভাঙাতে কথাটা জোর দিয়ে বললাম।

ঝিন্নি ভীরু পাখির মত আমার বুকে মাথাটা ঠেকিয়ে পরম নির্ভরতায় বসে রইল।

ওর খোলা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললাম, এমন অদ্ভুত সব ভাবনা তোমার ভেতর আসে কি করে ঝিন্নি? আমি তো এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাই না।

ও একটু নড়ে-চড়ে আবার বুকের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

একসময় বলল, তুমি তোমার রোগীদের সুখদুঃখ নিয়ে থাকবে, আমি কি নিয়ে থাকব?

ওব গভীব ভাবনাগুলোকে হাল্‌কা করে দেবার জন্য কৌতুক করে বললাম, আপাততঃ বুড়ো বায়েবিশ সাহেবেব পরিচর্যা করে কাটাও, পরে একটা পুতুল এনে দেব। তাকে নিয়ে যত খুশি খেলবে।

ও এবার বালিশখানা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে গুঁজে শুয়ে পড়ল।

আমি এবার ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কোন্ পুতুল চাই বললে না তো? মেয়ে না ছেলে?

ও এবার মুহূর্তে চিৎ হয়ে শুয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বসল, তোমার কোন্ পুতুলটা চাই বল?

হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, আমার কোন পুতুল চাই না।

ঝিন্নি যে পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজেছে তা অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম।

এবার ঝিন্নি ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আমি সত্যিই বোকা। বউ-এর মন বুঝে কখন যে কি বলতে হয় তা জানি না।

ওকে জড়িয়ে ধরে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

একসময় ওর কান্না থামল। আমার কাতর অবস্থা দেখে ও নরম হল। অনুযোগের সুরে বলল, তুমি কেন এমন করে বললে বল? তুমি পুতুল না চাইলে আমি পুতুল পাব কি করে?

বললাম, আমার এক আধখানা পুতুলে চলবে না, অন্তত এক ডজন চাই।

অমনি ঝিন্নি তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসে আমার পিঠে কয়েক ঘা কিল কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, খুব খেলোয়াড় হয়েছ দেখছি। একটা পুতুলই জোটে না, বারোটা নিয়ে খেলার শখ।

ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখি সোনার আলোর মুকুট পরে বসে আছে পীরপাঞ্জাল। নীচের উপত্যকার সবুজ সমারোহের ভেতর দিয়ে শুভ্র উপবীতের মত বয়ে চলেছে তরঙ্গিনী বিপাশা।

জুলিয়েনের গলা শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে, ডাক্তার, বিয়ের পর ঘুমের মাত্রা এত বাড়ালে বেচারী রোগীরা যে তোমার ডিস্পেনসারিতে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে।

জুলিয়েনের কথায় বালু আর ঝিন্নি হেসে উঠল। জুলিয়েন আমার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেও আমি যে জেগে উঠেছি তা সে জানতে পারেনি।

ঝিন্নির মন্তব্য শোনা গেল, একদিন রিপ ভ্যান উইংক্‌ল্-এর মত লম্বা ঘুম থেকে জেগে উঠে বউকে আর দেখতেই পাবে না।

জুলিয়েন অমনি যোগ করল, তখন লতাগুল্মে জটিল হয়ে উঠেছে চারদিক, ডাক্তার জঙ্গল চিরে সামনে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ভেড়ার পালের পেছনে একটি গদ্দী রমণীকে দেখে জিজ্ঞেস করে বসবে, তোমরা আমার ঝিন্নিকে দেখেছ? বলতে পার সে কোন পথে গেছে?

আমি চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঝিন্নিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি কি কানা যে ঝিন্নিকে খুঁজে নিতে পারব না। এই তো আমার ঝিন্নি।

ঝিন্নি তখন সত্যিই অপ্রস্তুত, ও কি হচ্ছে ছোটসাহেব, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও প্লিজ।

জুলিয়েন বলল, এতে লজ্জার কি আছে ম্যাডাম। আমরাও বউয়ের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করে থাকি।

বালু কিল দেখিয়ে বলল, খু-উ-ব ভাল কাজই কর।

ঝিন্নি বলল, তা বলে প্রকাশ্যে নয়।

বললাম, অন্তরালে তো অনেক কিছুই ঘটে, প্রকাশ্যে ঘটুক না এটুকু নির্দোষ আমোদ।

ঝিন্নি বালুর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, এখানে বসে থাকলে আরও যে কি দৃশ্যের অবতারণা হবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে চল ব্রেকফাস্টের জোগাড় দেখি।

বললাম, বেড-টির কি হল?

ঝিন্নি ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, এক রাউন্ড হয়ে গেছে। এতক্ষণ বিছানায় পড়ে পড়ে স্বপ্ন দেখব আবার বেড-টিও চাই, তা হয় না মশাই।

তুমি পুতুল পুতুল করে বায়না ধরলে, আমি তাই স্বপ্নের দেশে পুতুল খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

ঘরের ভেতর থেকে ঝিন্নি ছুটে এসে জুলিয়েনের আড়ালে দাঁড়িয়ে মিনতির ছবি ফোটাল চোখে মুখে। তার মুখখানাতে তখন অসহায় লজ্জার একটা ছবি। সে যেন বলছে, প্লীজ ছোটে ঠাকুর, দয়া করে পুতুল খেলার গল্পটা আর ফাঁস করে দিও না।

জুলিয়েনরা লাঞ্চের পর চলে গেল। ঝিন্নি আর আমি, ওদের গাড়ি একেবারে পাহাড়ের নীচে না নেমে যাওয়া অবধি দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলাম। বালু গাড়ির বাইরে মুখ বের করে সমানে মাথার স্কার্ফটা নাড়ছিল।

কত পরিবর্তন হয়ে গেছে বালুর। একেবারে নতুন জন্ম। পণ্ডিতজীর সহায় সম্বলহীন মুখচোরা মেয়েটি আজ ঘটনাচক্রে কুলুর অন্যতম ধনী বেনন পরিবারের সম্মানীয় বধূ। কি বিরাট মাপের হৃদয় ঐ জুলিয়েনের। যখন শুনল, পথভ্রষ্ট হয়েছে বালু আর তাকে নীচে টেনে নামিয়েছে একজন বিদেশী ট্যুরিস্ট, তখন কোনদিকে না তাকিয়ে অসহায় বালুকে গ্রহণ করতে সে এগিয়ে এল। তাছাড়া কত বড় অপবাদের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে জুলিয়েন। যখন সবাই ভেবে বসেছে, বালু আর ডাক্তার মুখার্জী অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, তখন জুলিয়েন সব মানুষের সন্দেহকে চুরমার করে দিয়ে বালুকে নির্দ্বিধায় ঘরে তুলেছে।

আজ আর ওদের দুজনের কারো মুখেই অনুশোচনা কিংবা গ্লানির কোন চিহ্নই নেই। মেঘমুক্ত ভোরের পীরপাঞ্জাল যেন ঝক্‌ঝকে নির্মল হাসি হাসছে।

কি ভাবছ এত ছোটেসাহেব, ওরা তো এখন কদ্দূর চলে গেছে।

আমি ওদের কথাই ভাবছিলাম ঝিন্নি। কত বড় মাপের মানুষ ঐ জুলিয়েন, তাই ভেবে মনটা ভরে উঠছিল।

ঝিন্নি আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, আর আমার মনটা যে কত সংকীর্ণ তা নিশ্চয়ই সেইসঙ্গে মনে পড়ছিল তোমার?

একটুও না।

তাবলে ভালবাসা দিয়ে তো আর তোমার ঝিন্নির অপরাধকে ঢাকতে পারবে না ছোটেসাহেব!

আজ আর সেসব কথা নয় ঝিন্নি। ভুল বোঝাবুঝি মানুষের ভেতরই হয়ে থাকে।

জান ছোটেসাহেব, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম একসময়, একথা মনে পড়লেই বুকে দারুণ একটা যন্ত্রণা হয়। চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসে।

কথাগুলি বলতে গিয়ে ঝিন্নির গলা ধরে এল। সত্যিই ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ।

আমি ওকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকে এলাম।

ঝিন্নির স্বভাবটা ঠিক শরৎ প্রকৃতির মত। এখুনি রোদের ঝিকিমিকি, এখুনি বৃষ্টির ঝির ঝির।

ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে সুন্দর দুটো খুশি খুশি চোখ তুলে বলল, বালুকে একটা জিনিস দিয়েছি।

হেসে বললা[illegible], আগে তাই বল?

বাঃ, ও এতবড় একটা আনন্দের খবর এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে এল আর আমি ওকে কিছু না দিয়ে শুধু হাতে ফেরাব!

এখন বল, কি দিলে?

ওটা তুমি বলবে।

আমি তো হাত গুণতে জানি না।

অনুমান কর।

একটা পুতুল।

এখানে পাব কোথায়?

তাহলে ভাবী ছেলের জন্যে একখানা কাঁথা।

ধ্যাৎ, আমি কি আগে ভাগেই কাঁথা তৈরি করে রেখেছি নাকি।

আরে নিজেবটির কথা ভেবেও তো করে রাখতে পার।

আবার আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছ ছোটেসাহেব।

হেরে গেলাম, এবার তুমি বল?

একটা সোনার গিনি আগাম দিলাম ওর ছেলেকে দেবার জন্যে।

তুমি দারুণ খেয়ালী।

খুশি হওনি?

খু-উ-ব খুশি হয়েছি।

ঝিন্নি বলল, জান ছোটেসাহেব, ওটা আমার মুখ দেখে খুশি হয়ে আমার দিদিমা দিয়েছিল।

স্মৃতির জিনিসটা হাতছাড়া করলে?

যারা আমার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের সর্বস্ব দান করেও আমার শান্তি নেই ছোটেসাহেব।

হেসে বললাম, দোহাই তোমার, দান করতে করতে হরিশ্চন্দ্রের মত আমাকেও দান কবে বোসো না যেন।

শেষবেলায় কেল্লার পাশ দিয়ে দুজন হাঁটতে হাঁটতে নীচে নেমে যাই। একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে বসি। বিপাশা বয়ে চলেছে। তার এপারে চলাচলের রাস্তা, ওপারে পাহাড়ের কোলে কোলে গমের ক্ষেত। গম প্রায়ক্ষেত্রেই তোলা হয়ে গেছে। একেবারে নীচের উপত্যকায় একমাস আগেই গম তোলার কাজ শেষ। ওপরের পাহাড়গুলোতে দেরীতে ফসল কাটা হয় কারণ এখানে শীত বেশি বলে গম বাড়তে দেরি হয়। এখনও যে সব ক্ষেতে ফসল তোলার কাজ বাকি সেগুলোর রূপ চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। এক একটি পাহাড়ের ঢাল সোনালী বাদামী ডোরা কাটা। ঠিক যেন ডোরা কাটা বাঘ শুয়ে শুয়ে রোদ্দুর পোহাচ্ছে।

কৃষকের বাড়িতে ঝাড়াই-মাড়াই আর ফসল ঘরে তোলার কাজ প্রায় শেষ। ওরা বাঁশ ছিলে বাতা দিয়ে পেরু তৈরি করবে। ঐ পেরুর ভেতর রাখবে ওদের সারা বছরের সঞ্চিত ফসল।

দূরে দূরে পাহাড়ী টিকা বা গাঁ দেখা যাচ্ছে। ঐ টিকার কোঠী থেকে হাল্‌কা নীলরঙের ধোঁয়া উঠছে। ক্ষেতখামারে কাজ করে সন্ধ্যায় যারা কোঠীতে ফিরবে তাদের খাবার তৈরির তোড়জোড় চলছে ঘরে ঘরে।

ঝিন্নি আমার পাশ থেকে কখন উঠে গিয়েছিল। ও এখন আমাকে পেছন থেকে 'কু' দিয়ে ডাকতে শুরু করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পেছনে একটা কুহলের নিরন্তর ঝরে পড়ার শব্দ। ঐ কুহলটা আরও নীচে দৌড়ে গিয়ে বিপাশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি পেছনে উঁচুনীচু পাহাড় ডিঙিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ওর সুন্দর সুরেলা ডাক উঠলেই আমি সচেতন হয়ে সেদিকে তাকাই। কিন্তু কোন শিলাস্তূপের আড়ালে যে ঝিন্নি

নিজেকে গোপন রেখে লুকোচুরি খেলছে তা বুঝে ওঠা ভার।

একসময় স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবকন্যার মত ঝিন্নি আমার সামনের টিলায় আবির্ভূত হল শেষবেলার সোনাটুকু এসে পড়েছে তার গোল্ডেন অ্যাপেলের মত মুখখানার ওপর। নীল রঙে সুথানের ওপর সোনালী ঘাগরা। কাজকবা চোলি। মাথায় বেঁধেছে লাল রঙের দো-পাট্টা। সে এক মহিমময় মূর্তি। ঝিন্নি বলে ওকে চেনাই যাচ্ছে না। নাগরকোটীয় ব্রাহ্মণের আভিজাত্য যেন চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

কি ছোটেসাহেব, ধরতে পারলে না তো?

মনে মনে বললাম, তোমাকে ধরতে পারে এমন সাধ্য কার, তুমি নিজে না ধরা দিলে।

মুখে বললাম, তোমাকে দেখে আর চেনা যাচ্ছে না ঝিন্নি। শেষ সূর্যের সোনালী জলে স্নান করে তুমি অনেক অচেনা হয়ে গেছ। যেন অন্য কোন লোক থেকে নেমে এলে।

· ও তরুণী হরিণীর মত লাফাতে লাফাতে নেমে এল নীচে। আমার হাত ধরে বলল, চল তোমাকে একটা জায়গা দেখাই। দারুণ আবিষ্কার করেছি।

আমরা পেছনের দু'একটা শিলাস্তূপ পেরিয়ে যে জায়গায় এসে হাজির হলাম, সেখানে যে প্রকৃতি এমন সুন্দর একটা ছবি এঁকে রেখেছে তা কে জানত।

কুহলটা কুল্ কুল্ শব্দ করে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেখানে দু'চারটে পাইনগাছ দাঁড়িয়ে। জায়গাটা মনোরম। আমরা দুজনে একটা নীচু পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে কুহলের জলে পা বাড়িয়ে দিলাম। ঠাণ্ডা হিমেল জল, কিন্তু গরমের দিনে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল কি তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি। ঝট্‌পট একটা আওয়াজ হতেই দেখি, দুটো চটি-পিন্‌ঝা পাখি গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে ফিরছে।

ঝিন্নি জলের থেকে সুন্দর অনাবৃত দুটি পা তুলে নিতেই ওর পায়ের ঝাঁঞ্জর ঝুম্ ঝুম্ করে বেজে উঠল। কি যে ভাল লাগল আমার রূপোর নূপুরের সেই মিষ্টি আওয়াজ!

ঝিন্নি বলল, চল না ছোটেসাহেব আমরা আজ এই পেছনের টিলাগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে কেল্লার রাস্তায় উঠি।

বললাম, বাঁধাধরা পথের বাইরে চলতে আমারও খুব ইচ্ছে করে ঝিন্নি।

দুজনে নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করলাম।

ঝিন্নি আমার হাত ধরে বলল, তা বলে বউয়ের হাতের বাঁধন খুলে নতুন পথে চলার চেষ্টা কর না যেন।

আমি হেসে বললাম, আমার হাতের সবটুকু জোর দিয়েও কি আর তোমার তৈরি বাঁধন খুলতে পারব ঝিন্নি।

ও হাসতে হাসতে ছুটল। আমিও ছুটলাম ওকে অনুসরণ করে।

পারব কেন আমি ওর সঙ্গে। এ দেশে ওর জন্ম, উঁচু নীচু পাহাড়ে অবলীলায় ওঠা নামা করতেই ওরা অভ্যস্ত। আমি সমতলভূমির মানুষ, পাহাড়ে উঠতে গেলেই হাঁফিয়ে উঠি।

ঝিন্নি কিন্তু বিবেচক। আমার অবস্থাটা ও ভাল করেই বুঝে নিয়েছে। তাই এক একবার পিছিয়ে এসে ও আমাকে হাত ধরে ওপরে টেনে তুলছে।

আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে কয়েকটা কুইল গাছের তলায় একটা ছোট কোঠী। তার ডাইনে এক চিলতে জমিতে সাদা আর গোলাপী রঙের পপি হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, সিল্কের মত পাপড়ি। এক একটি ছোট কাপ যেন কেউ হাওয়ায় ভাসিয়ে রেখেছে। পাতাগুলো সুন্দর ধূসর সবুজ। এই পপি গাছের কাঁচা নরম অপক্ক বীজের ঘন রস শুকিয়ে আফিং তৈরি হয়।

ঝিন্নি বসে পড়ে ফুলগুলোতে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এত সুন্দর ফুল, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে এইখানেই বসে থাকি।

বললাম, পপি আর ঝিন্নির ভেতরে যে অসম্ভব মিল রয়েছে।

ও বসে থেকেই ওর শাঁখের মত ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলল, কি রকম।

পপির পাপড়ির মত কোমল আর মসৃণ আমার ঝিন্নির শরীর। সাদা আর গোলাপী ফুলের মিশ্রণে তৈরি তার রং। আর ....।

কথাটা শেষ না করে চুপ করে গেলাম দেখে ঝিন্নি বলল, আর কি ?

নিতান্তই শুনতে যদি চাও তাহলে বলি, আর ওর সান্নিধ্যে আফিং-এর মাদকতা।

ঝিন্নি মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছিল আমার দিকে, কিন্তু কোঠী থেকে এক ঝলক হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে এল। অমনি ও ফিরে দাঁড়াল। আমার দৃষ্টিও কোঠীর দিকে গিয়ে পড়ল।

কোঠীর দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি তরুণী মা, তার এতটুকু বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে। ঝিন্নির কাণ্ড দেখে সে হেসে উঠেছিল, এখনও সে হাসি তার চোখে মুখে লেগে আছে।

ঝিন্নি গতি পরিবর্তন করল। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তরুণী মায়ের বুক থেকে বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, কি সুইট। আমার ভীষণ চটকাতে ইচ্ছে করছে।

বললাম, প্লিজ, ওটুকু বেবীকে চটকাবার চেষ্টা করনা, ময়দার তাল বনে যাবে। দেখছ না চোখ দুটো প্রায় বুজে আছে, নাকটা ছোট্ট একটা মার্বেল। ওর পুরো ফর্মটাই এখনো আসেনি।

ঝিন্নি ফিরে গেল বাচ্চার মায়ের কাছে। বাধ্য হয়েই যেন ফিরিয়ে দিতে হল। পারলে মাথাব দো-পাট্টায় জড়িয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে চলে যেত।

পথে চলতে চলতে এবার গম্ভীর হয়ে গেল ঝিন্নি। বেশ বুঝলাম, ঐ ক্ষুদে বাচ্চাটা ওর মনে এখন তোলপাড় তুলেছে।

আমরা এখন আর আবিষ্কারের আনন্দে চলছি না, কোনরকমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে ওঠার আগে কেল্লার পথটা পেয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

কোয়ার্টারে ফিরে দেখলাম ভাগ্‌তু দাওয়ার ওপর তার ক্র্যাচটা ফেলে রেখে বসে আছে।

হৈ হৈ করে উঠল ঝিন্নি, কিরে ভাগ্‌তু তুই! হঠাৎ এখানে চলে এলি যে বড় ? ডাক্তার সাহেবকে কটা দিন না দেখে মন কেমন করল?

সেই বালক ভাগ্‌তু আজ পরিণত কিশোর হয়ে গেছে। লী-সাহেবের বাংলোতে পাথর পড়ে বেচারার পাটা থেঁতলে গেল। তারপব অপারেশন করে বাদ দিতে হল পা। গদ্দী মা বাপের সে কি ক্ষোভ পাটাই যদি বাদ চলে যায় তাহলে কি লাভ বেঁচে থেকে। ভেড়া চরিয়ে যাকে নিয়ে যেতে হবে লাহুল, স্পিতি আর কুলু থেকে কাংড়া তার কি খোঁড়া হয়ে বসে থাকলে চলে।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস ভাগ্‌তুটার প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলাম আমি। আজ ভাগ্‌তু ছাড়া আমার ডিস্পেনসারী অচল।

লাজুক মুখে কথা নেই ভাগ্‌তুর। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে।

ঝিন্নি ছাড়ার পাত্রী নয়। সে ভাগ্‌তুর পাশে বসে পড়ে বলল, ঠিক করে বল ভাগ্‌তু, তুই তোর দিদিকে বেশি ভালবাসিস না সাহেবকে ? আমি কিচ্ছু মনে করব না।

আগে হলে সাদাসিধে ভাগ্‌তু মনে যা আসত তাই বলে ফেলত, কিন্তু এখন বয়েস যত বাড়ছে, লোকজনের সঙ্গে যত মেলামেশা করছে, তত বুদ্ধিটাও খুলছে।

ভাগ্‌তু অনেক আস্তে বলল, দুজনকে।

ঝিন্নি অমনি বলল, শুনছ কি বলছে, আমাদের দুজনকে নাকি ও সমান ভালবাসে। বড্ড বুঝদাব হয়ে গেছে আজকাল ভাগ্‌তু। কাউকে দুঃখ দিতে চায় না।

ঝিন্নি ঘরের ভেতর ঢুকে বাইরের আলোটা জ্বেলে দিল।

আমার চোখ হঠাৎ গিয়ে পড়ল ভাগ্‌তুর পায়ের ওপর। বোধহয় পায়ের ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে পরিচয় বলেই আমার চোখটা ওখানে গিয়েই পড়ে। দেখলাম, ভাগ্‌তুর আস্ত পাটাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, ব্যান্ডেজ ভেদ করে রক্ত চুঁইয়েছে। তবে ভাগ্‌তু ঐ পায়ে ভর রেখে যখন বাস থেকে নেমে এতটা ওপরে উঠে আসতে পেরেছে তখন আঘাতটা নিশ্চয়ই গুরুতর নয়।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ওখানে? ব্যান্ডেজ কেন?

ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জানাতে চাইল, ওটা এমন কিছু নয়।

ধমকে উঠলাম, বল্ ঠিক করে?

ভাগ্‌তু ধীরে ধীরে যা বলল, তার মর্মার্থ এই, মে'র ট্যুরিস্টরা এসে গেছে মানালীতে। হঠাৎ মেয়েদের সামনে হিপিরা অশ্লীল ইংগিত করেছিল বলে পাহাড়ী ছেলেরা ক্ষেপে যায়। তারা পাথর ছুঁড়তে থাকে। হিপিরা সঙ্গে সঙ্গে মদের বোতল ছোঁড়ে। সেই বোতলের ভাঙা কাঁচে ভাগ্‌তুর পা কেটে যায়।

বললাম, তুই মারামারিতে যোগ দিতে গিয়েছিলি?

ভাগ্‌তু মাথা নেড়ে জানাল, সে যায়নি।

তবে তোর পায়ে কাচ লাগল কি করে?

ভাগ্‌তু বলল, আমি বাজার থেকে ফিরছিলাম, ভাঙা বোতলটা ছিট্‌কে এসে পায়ে লাগল।

এ. টি. এস. নিয়েছিস?

শিউশরণজী দিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাণ্ডেজ করার আগে ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তুই ব্যথা পা নিয়ে এতটা পথ এসেছিস কেন?

এবার চুপ। আর কোন কথা বলে না-ভাগ্‌তু।

বললাম, আঙুল-টাঙুল উড়ে যায় নি তো?

ভাগ্‌তু মাথা নেড়ে জানাল আঙুলগুলো তার আস্তই আছে।

খুব ডিপ্ হয়েছিল নাকি?

এবার ভাগ্‌তু বলল, শিউশরণজী বলেছে, এবার আর কোন ভয় নেই।

তাই তুমি চলে এসেছ বাঁদর। একটুও ভয়ডর নেই।

ভাগ্‌তু মাথা নীচু করে বসে রইল।

আমি জানি, আমি ওখানে না থাকলে ভাগ্‌তুর একটুও ভাল লাগে না। তাই খোঁড়া পা-খানা টেনে টেনে ও ছুটে এসেছে আমার কাছে।

ভেতরে গিয়ে ঝিন্নিকে ভাগ্‌তুর কীর্তিকলাপ সব বললাম। ঝিন্নি বাইরে এসে ভাগ্‌তুকে খুব একচোট বকুনি আর আদর করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে গরম দুধ আর বিস্কুট নিয়ে এল ভাগ্‌তুর জন্যে। ওকে আমাদের বসার ঘরে রাখাব ব্যবস্থা হল। রাতে যদি ব্যথা বাড়ে তাই একটা ট্যাবলেটের ব্যবস্থা করে দিলাম। ঝিন্নি সারাক্ষণ লেগে রইল ওর সেবায়।

পরদিন ভোরবেলা উঠে দেখি ভাগ্‌তু ক্র্যাচ ঠুকতে ঠুকতে মর্ণিং ওয়াক সেরে চড়াই ভেঙে আসছে।

দারুণ রাগ হল। এখুনি ব্লিডিংটা আবার শুরু হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মনে হল, ও মেষচারক গদ্দীদের ছেলে। কপাল দোষে এখানে বন্দী হয়ে থাকলে কি হবে, রক্তের ভেতর ঘোরার নেশাটা ওকে অস্থির করে তুলেছে।

ঝিন্নি চা নিয়ে এল। জানালার বাইরে আঙুল তুলে দেখালাম।

অমনি ঝিন্নি চায়ের কাপ টিপয়ের ওপর বসিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আমার চোখের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ও নামল উৎরাই-এর পথে। একটা পাহাড়ী ঢল যেন দ্রুতলয়ে নাচের ছন্দে নেমে যাচ্ছে। আমি এখন ওপর থেকে ঝিন্নিকে দেখতে পাচ্ছি।

অনেক ভোরে ওঠার অভ্যেস ঝিন্নির। সে পরিচ্ছন্ন হয়ে চুল বেঁধে, পোশাক পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। আমাকে বেড-টি সার্ভ করে, বিছনার এক প্রান্তে বসে নিজের চা... দিতে দিতে গল্প করে।

আজ টুকিটাকি গল্প করার সুযোগ পেল না সে।

এখন ঝিন্নি ভাগ্‌তুর পিঠে হাত রেখে চড়াই ভাঙছে। বক্‌ বক্‌ করে তার বেপরোয়া ঘোরাফেরার জন্য শাসন করছে। অবশ্য ভাগ্‌তুকে চড়াই ভাঙার ক্ষেত্রে সে কোন বাড়তি সাহায্য করছে না, আর উঠে আসতে সাহায্য করা সম্ভবও নয়। যে উঠবে সে তার ক্রাচখানা নিজের বশেই তুলে তুলে আসবে। তবু ভাল লাগছে ভাগ্‌তুর পিঠে ঝিন্নির এই হাতটুকু রাখা।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঝিন্নির বুকের মধ্যে মমতার একটা প্রস্রবণ আছে। সে যেখানে শূন্যতা দেখে সেখানেই জলের ধর্মের মত মমতা দিয়ে পূর্ণ করে দেবার চেষ্টা করে।

আপেল বাগিচায় অনেক দিন থেকে যে মেয়েরা কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে, নরসিংলালজী স্বাভাবিক কারণে তাদের কাজ থেকে ছুটি করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের একেবারে ছুটি করে দিতে পারেনি ঝিন্নি। সে আমার কাছে একদিন আবেদন নিয়ে মানালীতে এল।

ছোটেসাহেব আবেদন আছে।

হেসে বললাম, এমন করে কথা বললে আবেদন মঞ্জুর হবে না।

তুমি মালিক, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আবেদন জানাতে হবে।

খুব কষ্ট পাই ঝিন্নি, যদি তুমি এমন করে কথা বল।

আচ্ছা, তবে আসল কথাটা বলি। এ আবেদন আমি জানাচ্ছি তাদের হয়ে যাবা এতদিন তোমার ফলের বাগানে কাজ করেছে।

কি হল তাদের? আর ফলের বাগানের আবেদন আমার কাছে কেন, চাচাজীর কাছে কর গিয়ে।

ঝিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চাচাজী তাদের বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

ঝিন্নি এবার অন্য দিক থেকে তার কেসের স্বপক্ষে প্লীড করা শুরু করল।

আচ্ছা, ছোটেসাহেব তোমার মা আজ বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে থাকতেন, তুমি তাঁকে অক্ষম বলে তোমার সংসার থেকে বের করে দিতে পারতে?

হো হো করে হেসে উঠে বললাম, বুঝেছি, আর ভণিতা করতে হবে না। ওদের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা তোমার চাচাজীই করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তুমি জান, ওঁর ওপরেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া আছে।

ঝিন্নি বলল, সেজন্যেই চাচাজী কিছু করতে পারছেন না। তোমার ব্যবসার লোকসান করে উনি অন্যের উপকার করবেন না।

বললাম, আমার হয়ে এবার তুমিই ডিসিশানটা নাও।

ওরে ব্বাস, অসম্ভব। আমি কারু অধিকারে ভাগ বসাতে পারব না। এটা যে যার নিজস্ব এক্তিয়ার।

বললাম, বেশ তাই হবে। আমার পৈতৃকসূত্রে যখন বাগানটা পাওয়া তখন আমাকে ডিসিশানটা নিতে হবে বৈকি।

আমার গলায় বোধকরি ক্ষোভ ও বেদনার মিশ্র একটা সুর বেজে উঠেছিল। বুদ্ধিমতী ঝিন্নির কান এড়াল না।

আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে ও বলল, রাগ করছ কেন ছোটেসাহেব। তোমার ঝিন্নি মনে মনে তাদের জন্যে একটা ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।

আমি তো আমার ঝিন্নির মুখ থেকে এতক্ষণ এই কথাটুকুই শুনতে চেয়েছিলাম।

চঞ্চল ঝিন্নি এবার আমার মুখোমুখি স্থির হয়ে বসল। বেশ বিবেচকের মত মুখখানা দেখতে হয়েছে এখন ঝিন্নির।

ছোটেসাহেব, আমাদের কুলু আর মানালীর দুটো বাগানেই বেশ কিছুটা করে খালি জায়গা আছে। ওখানে যদি আমরা কিছু খরচ করে দুটো বড় শেড্‌ তুলে দি তাহলে বুড়ো বয়সে আমাদের বাগানের বরখাস্ত মেয়েকর্মীরা মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পায়।

বললাম, উত্তম প্রস্তাব।

ঝিন্নি বলল, এখানেই শেষ নয় কিন্তু আমার কথা। এখন বাকী রইল ওদের ভরণপোষণ সমস্যা। বল, আমরা কিভাবে এ সমস্যার সমাধানে এগোতে পারি?

ঝিন্নি বলল, এ ব্যাপারে আমাকে কিছুটা করতে দাও। আমি যেটুকু সরকারী কাজ করে রোজগার করি, তার বেশকিছু অংশ আমি ওদেব পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রের জন্য খরচ করতে চাই।

ঝিন্নিকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, বাকী পরিকল্পনাটা আমাকে করতে দাও ঝিন্নি।

বল কি করতে চাও?

বললাম, আমার ফলের বাগান থেকে লাভের একটা অংশ অক্ষম কর্মহীন মেয়েদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। ওতে তাদের দুবেলা খাবার ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে।

দারুণ পরিকল্পনা ছোটেসাহেব।

বললাম, সবাই কিন্তু তোমার ঐ অভয়াশ্রমে থাকতে নাও চাইতে পারে। তারা ছেলেমেয়ে নাতিনাত্নীর সঙ্গ চাইবে।

ঝিন্নি বলল, তাদের জন্যে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

উত্তম।

ঝিন্নি বলল, তোমার অভযাশ্রমের মেয়েরা একেবারে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত কিছু কাজকর্মও করতে পারে।

যেমন?

এই ধরো ফলের গুটি বেরুবার মুখে কিংবা পাকার সময় উড়ুক্কু কাঠ বেড়ালী কিংবা পাখপাখালি যেরকম হামলা করে, ওরা হাতের কাছে রাখা দড়ি টেনে গাছে বাঁধা ক্যানেস্তারাগুলো বাজিয়ে ওদের রুখবে।

খুব ভাল পরিকল্পনা। শেষ অব্দি কাজ করে ওরা দয়ার দানে না বেঁচে আত্মসম্মান বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

নরসিংলালজীর কাছে কথাটা পাড়তেই উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, একদম দাদাজী কা মাফিক তোমারা খেয়াল বাবুজী। যো আচ্ছা লাগে করো।

এরপর উৎসাহে ঝিন্নি টগবগিয়ে ফুটে উঠল। ছুটির দিনগুলোতে শুরু হল ঘর তৈরির কাজ। এখন ছুটি ফুরিয়ে যেতেই নাগ্গরে ফিরে এসেছে নিজের কাজে। সারা ছুটি কুলুর বাগানে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করিয়েছে পরিকল্পনা মাফিক ঘর। শেষ কাজটুকু নরসিংলালজীর হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আসার সময় বলে এসেছে, দেখো চাচাজী, যেন আমার প্ল্যান মাফিক কাজটা হয়।

এসব ব্যাপারে ভারী খুঁতখুঁতে ঝিন্নি। প্রতিটি কাজে শিল্পীর হাতের ছোঁয়া থাকা চাই।

ও কদিন আগেই আমাকে বলেছে, জান ছোটেসাহেব, মানালীতে যখন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে তখন তুমি আমি দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করব। তোমার ডিস্পেনসারীর যত কাজ থাক, আমার জন্যে কিছুটা সময় তোমায় দিতেই হবে।

ঝিন্নি ঢুকল ঘরে। বাইরের দাওয়ায় একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এসেছে ভাগ্তুকে। আমি ঘরে বসেই নিশ্চিত করে বলতে পারি, শেষ ধমকের সঙ্গে সঙ্গে বেড-টীও পরিবেশন করা হয়ে গেছে।

ঝিন্নি ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, চা-টা যে তোমার বিপাশার শীতল সলিল হয়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, হোকগে, ওতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু ছোটেসাহেব 'সলিল' কাকে বলে?

হেসে বললাম, আমার পিতাজী বেঁচে থাকতে তোমাকে যে বাংলার পাঠ দিয়েছিলেন, এখন বোঝা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ হয়নি।

ও কথা বল না ছোটেসাহেব। পিতাজী কত যত্ন করে আমাকে কাছে কাছে রেখে বাংলা শেখাতেন। তাছাড়া একটা বাংলা অভিধান আমার জন্য উনি আনিয়েছিলেন।

বললাম, 'সলিল' মানে জল। সারা অভিধানটা মুখস্ত করে রাখা হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু তার কোন দরকার নেই ঝিন্নি।

ও ঐ ঠাণ্ডা চাটুকু চুমুক দিয়ে খেতে খেতে বলল, ভাগ্‌তু কোথায় নেমে গিয়েছিল বলত?

আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু সঠিক বলতে পারব না।

তবু বল?

এই কেল্লার ধারে হয়ত একবার চক্কর দিয়ে আসতে।

উদ্দেশ্য?

অকারণে।

অকারণে ভাগ্‌তু যাবে!

যেতেও পারে।

ঝিন্নি বলল, হল না। ঐ তোমার পি. ডব্লিউ. ডি-র গেস্ট হাউস দেখতে আর যে যাক, ভাগ্‌তু যাবে না। ও গিয়েছিল বিপাশার জল মাথায় নিতে।

হঠাৎ ভোরবেলা বিপাশার জল নেবার ধুম পড়ল কিসে?

ঝিন্নি বলল, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং, আমার খুব ভাল লাগল। ওর মা বাবা এবার শীতকালে যখন ওকে দেখতে আসে তখন ওর কানে দুটো রিং পরিয়ে দিয়ে যায়। সেইসময় ওকে নাকি বলে যায়, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পূর্ণিমায় ও যেন বিপাশার জল মাথায় ছিটিয়ে নেয়।

বললাম, উদ্দেশ্য?

ঝিন্নি বলল, খোঁড়া ছেলের জন্যে মায়ের মঙ্গল কামনা। তুমি জান শীতকালে ওপরের পাহাড়ে বরফ পড়ে যায় বলে গদ্দীরা (মেষচারক) তাদের ভেড়া নিয়ে নীচে ভ্যালিতে নেমে আসে। ওরা নীচু 'ব্যান' অঞ্চলে চরে বেড়ায় তখন। ঘাস নেই কোথাও প্রায়, তাই ওরা খায় বিল, কেম্বল, গার্ণা, খইর গাছের পাতা। তারপর শীত কেটে গেলে ওরা আর ভ্যালিতে থাকতে চায় না। তখন হাজার হাজার ভেড়ার পাল নিয়ে ওরা উঠতে থাকে ওপরের পাহাড়ে। শেষ গ্রীষ্মে ওরা ছাড়িয়ে যায় বার্চ, পপলার আর রোডোডেনড্রনের সীমারেখা। তখন শুধু স্নো-লাইনে ভেড়ারা ঘোরে। ওখানে ঘাস জন্মায়, সেই নীরু ঘাস খেয়ে দারুণ পুষ্ট হয় ভেড়াগুলো।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ঝিন্নি।

কি হল, থামলে যে?

ঝিন্নির মুখে চোখে সলজ্জ একটা ছাপ। বলল, দেখত কি বলতে গিয়ে আলতু ফালতু কত কি গাইছি।

বললাম, দারুণ ইন্টারেস্টিং! থিসিসের সাবজেক্ট।

ঝিন্নি এবার তার আসল চরিত্রে ফিরে এল, শোন এখন ভাগ্‌তুর মায়ের কথা। ও ছেলেকে বলে দিয়েছে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম পূর্ণিমায় ওরা ভেড়া নিয়ে প্রতি বছরই থাকে রোটাং পাশের কাছাকাছি। এবার থেকে ওরা ফি বছর রোটাং-এ বিপাশার উৎস মুখে ছেলের মঙ্গল কামনা করে জল স্পর্শ করবে। আর ভাগ্‌তুও যেন তাই করে।

থামল ঝিন্নি। এতক্ষণে বিপাশা রহস্যটি ভেদ করা গেল।

ঝিন্নি উঠে গেল কাজে। আমি বসে বসে ভাগ্‌তুর কথা ভাবতে লাগলাম।

এখনও 'লী' সাহেবের উপহার দেওয়া টাট্টুটি আমার বাহন হয়ে আছে। সেই যে কুলুতে 'লী' সাহেবের বড়দিনের উৎসবে ছোট্ট ভাগ্‌তুটার পায়ে পাথর পড়ে গেল, আর ডাক পড়ল আমার। ভাগ্‌তুর পায়ে অপারেশন করা হল। বলতে গেলে সেই অপারেশনে পুরস্কার দিলেন মিঃ লী একটি সুন্দর জাতের টাট্টু।

কিন্তু ভাগ্‌তুর মা বাপ কেঁদে কেটে সারা হল। তাদের খোঁড়া ছেলে এখন কি কাজে লাগবে। তারা গদ্দী পহাল। ভেড়া নিয়ে চম্বা, কাংড়া, কুলু, লাহুল, স্পিতি ঘোরাঘুরি করাই তাদের কাজ। পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের চলা, তাদের বিশ্রাম। অগত্যা আমাকে নিতে হল ভাগ্‌তুর প্রতিপালনের ভার। ওরা প্রতি বছর শীতের মরশুমে একবার করে ভেড়া নিয়ে নামে কুলু ভ্যালিতে। ছেলের সঙ্গে সে সময় দেখা করে। হাতে বোনা উলের পোশাক দিয়ে যায় ভাগ্‌তুকে। আমাদের প্রতি বছর উপহার দিয়ে যায়

একটি করে কম্বল।

আমি একবার ওর বাবাকে বললাম, তোমার ছেলেকে আমি একখানা ছোট্ট কোঠী তৈরি করে দেব। ও আমার ফলের বাগানের তদারকী করবে আর ভালো মাসোহারা পাবে।

ভাগ্‌তুর বাবার উত্তরটি ভারী সুন্দর। সে বলেছিল, তোমরা দেবতাকে কোঠীর ভেতর বন্দী করে রাখ। আর আমাদেব দেবতা 'বানবীর', 'কেহ্‌লুবীব', 'গুগা', 'বাতাল', সব ঘুরে বেড়ান বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, নদী আর কুহলের স্রোতে স্রোতে। তাঁরা কেউ বসে থাকেন না বাবুজী। গদ্দীরা যে সারাক্ষণ চলে, তাই তাদের দেবতাও চলছেন। আমার বাচ্চাটাকে তোমরা ঠাকুর বানিয়ে দিলে। ও বাঁধা কোঠীতে থেকে গেল। আকাশের মহিমা দেখল না। পাহাড়ের বরফ ছুঁয়ে দেখল না। বনের ভেতর পাখির গান শুনল না।

একটু থেমে একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, বাবুজী, ও ব্যাটা গদ্দী না।

ভাগ্‌তুর বাবা 'গদ্দী' ভাষায় কথা বলেছিল। ঝিন্নি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ভাষান্তর করে।

সত্যি আশ্চর্য একটা স্রোত আছে এই গদ্দীদের জীবনযাত্রার ভেতর। 'তউন্দি' বা তপ্তঋতুতে যে হাড়ী কুহল আর ঝোরাগুলি শুকিয়ে যায়। আবার যখন 'বরসাত্' শুরু হয় তখন ঘুমন্ত ঝোরাগুলো প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। তারা সারা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে এঁকে বেঁকে লাফাতে লাফাতে নীচের উপত্যকায় নেমে আসে।

শীতের সময় ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালেই বর্ষার দিনে ঝরে পড়া ঝর্ণাগুলোর মত একটা ছবি চোখে পড়বে। মনে হবে এখানে ওখানে পাহাড় থেকে সাদা ফেনা তুলে নেমে আসছে অগণিত স্রোতধারা। আসলে ওগুলো গড্ডলিকা প্রবাহ। গদ্দীরা দলে দলে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে তাদের সাদা সাদা ভেড়ার পাল নিয়ে উপত্যকায়।

ওরা সারা শীতকালটা চরে বেড়াবে কুলুর উপত্যকাগুলোতে। উঁচু পাহাড়ে তখন প্রচণ্ড বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে। হাওয়ায় হাওয়ায় চলবে শীতের তীক্ষ্ণ করাত। মনে হবে হাড়ের ভেতর সে করাতের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ঝিন্নি নাস্তা নিয়ে এল ঘরের ভেতর। প্লেটখানা হাতের পাতায় রেখে হাতটা ওপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে রইল একটি সুন্দর মডেলের মত। মুখখানাতে মিষ্টি হাসি।

বললাম, তুমি যে শিল্পী তা তোমার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়।

আগে বল, আজ কি খাবার তৈরি করে এনেছি তোমার জন্যে?

বললে কি দেবে?

তোমার খালি, চাই চাই চাই। দাও দাও দাও। তুমি একটি পাক্কা চম্বীয়াল বিজনেসম্যান।

বললাম, আচ্ছা, কিছু চাইব না, এমনি বলছি। তুমি মোহনভোগ তৈরি করে এনেছ।

ও সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে প্লেটটা নামিয়ে রাখল টিপয়ের ওপর। সত্যিই প্লেটে মোহনভোগ।

ও বলল, তুমি অবাক করলে ছোটেসাহেব। আচ্ছা, আমার দিকে চেয়ে সত্যি করে বলতো, তুমি কোন ফাঁকে রসুইখানা ঘুরে দেখে আসনি?

বিশ্বাস কর, আমি এখানেই বসে।

তাহলে কি করে তুমি এত বড় একটা আন্দাজ করলে?

আমার থার্ড আই আছে ঝিন্নি, আমি ইচ্ছে করলে সবকিছু দেখতে পাই।

ঝিন্নি এবার আমার কাছে এসে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি করে বলনা গো ছোটেসাহেব? আমি তো আগে কোনদিন মোহনভোগ করে তোমাকে খাওয়াইনি।

বললাম, আমি এখানে বসেই ঘি, সুজি, চিনি, দুধের মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলাম। তেজপাতা, কিশমিশ, বাদামের মিশ্রিত গন্ধটাও আমার চেনা। আমাদের মাসীর বাড়িতে প্রায়ই মোহনভোগ সকালের জলখাবার হত। মাসী বলতেন, এ খাবারটা আমার মা নাকি অনেক ভাল তৈরি করতেন।

ঝিন্নি বলল, আমি পিতাজীর কাছ থেকে এ খাবার তৈরির প্রসেসটা শিখেছি। তিনিও এ খাবার

তৈরির ব্যাপারে মাতাজীর কথা বলেছেন।

বললাম, ঝিন্নি, আমার নাকটি কিন্তু ভীষণ জাগ্রত। অনেক দূরের গন্ধ ও সহজেই বুঝে নিতে পারে। আর আমার ঝিন্নি যেখানেই থাক তার সুন্দর শরীরের মিষ্টি গন্ধটা আমি পাবই।

ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনে তার চোলির মাঝে নাক মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে, আমি বিছনায় বসে। ও আমার মাথার চুলে তার পাঁচখানা আঙুলই চালাতে চালাতে বলল, তুমি এখনও সেই আগের মত পাগল আছ ছোটেসাহেব। তোমার চিকিৎসার দরকার।

ওর কোমরখানা তেমনি জড়িয়ে ধরে বুকের থেকে মুখটা একটু তুলে ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, আমার এ রোগের চিকিৎসক তাবৎ বিশ্বে তুমিই একমাত্র আছ ঝিন্নি।

ও আমার মাথাটা দুহাতের পাতায় চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, বিশ্বের একমাত্র ডাক্তারের ফিটাও কিন্তু অনেক বড় রকমের ছোটেসাহেব।

পুঁজি আমার খুবই কম। তবু সবটুকু পুঁজি তোমাকে উজাড় করে দিতে রাজি আছি ঝিন্নি।

ও এবার আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে প্লেটটা নিজের হাতে তুলে নিল। চামচেয় খানিকটা খাবার নিয়ে ও আমার মুখে পুরে দিয়ে বলল, ডাক্তার নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে তার পেসেন্টকে, কেমন লাগছে?

বললাম, শুধু ডাক্তার নয়, লেডি ডাক্তার। স্বাদটা তাই দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

ঝিন্নির হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যেতেই সে প্লেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি, নিজে নিজে খেয়ে নাও। আমি আসছি।

বলতে বলতেই ছুটল ও ভেতরে। রসুইখানা থেকে আবার দ্রুত বেরিয়ে গেল।

খেতে খেতে মনে হল, চারদিকে নজর ঝিন্নির। বাইরে যে ভাগ্তু বসে আছে, তাকে যে নাস্তা দেওয়া দরকার যথাসময়ে, সেটুকু বিবেচনা স্বামী-স্ত্রীর উপভোগ্য আনন্দের মাঝেও সে হারায়নি।

দু'দিন যেতে না যেতেই শ্রীমাণ ভাগ্তু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝিন্নির ওপর তার যে গভীর একটা আকর্ষণ আছে তা আমাদের কারোরই অজানা নয়। আর ঝিন্নি তাকে যে শাসনে সোহাগে একেবারে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে তা কুলু আর মানালীর তাবৎ পরিচিত লোকেরাই জানে।

তবু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভাগ্তুর রক্তে একটা ঘূর্ণি আছে। সে খুব বেশি সময় কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে যে সবার মত স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের অধিকারী নয় তা সে প্রাণপণ শক্তিতে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। আমি এ ব্যাপারে তাকে মনে মনে সাপোর্ট করলেও ডাক্তার হিসেবে বাইরে অনেক সময় কঠিন হতে হয়।

দুপুরে খাবার পর একটা কি উইকলির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কাদের যেন জোরে জোরে কথাবার্তায় আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। আমি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কান পাতলাম।

ভাগ্তুর গোয়ার্তুমী আর ঝিন্নির ধমক চলছিল ঘন ঘন।

চেয়ার থেকে উঠে উঁকি দিলাম। বারান্দায় বসে দুজনে। ঝিন্নি একটা আধবোনা ডিপ মেরুন রঙের সোয়েটার নিয়ে ভাগ্তুর গায়ে বারে বারে ঠেকিয়ে বলছে, হাঁদারাম দেখ রঙখানা কিরকম খুলেছে।

ভাগ্তু সমানে গা ঝাড়া দিয়ে ঐ রঙটা সম্বন্ধে তার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, ভাগ্যবান ভাগ্তুর আগামী শীতের পোশাক তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

উভয়পক্ষের মতবিরোধ যখন দেখলাম তুঙ্গে তখন আমি অন্তরাল ছেড়ে সশরীরে মঞ্চে প্রবেশ করলাম।

আমাকে দেখেই উভয়পক্ষ চুপ করে গেল।

আমি যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছি ঝিন্নির হাতের সোয়েটারখানা, এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, দারুণ সোয়েটারখানা তো। তুমি যে আমার জন্য বোনা শুরু করে দিয়েছ তা তো জানাওনি।

ভাগ্তু দেখলাম অমনি তাকাল ঝিন্নির মুখের দিকে। তার সোয়েটারে যে অন্যে ভাগ বসাচ্ছে এটার

প্রতিবাদ ঝিন্নি কিভাবে করে তাই সে এখন দেখতে চায়।

ঝিন্নি তার সুন্দর চোখের কোণ একটু উঁচিয়ে তাকাল আমার দিকে।

সত্যি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?

দারুণ। এ রঙটা আমার গায়ে কেমন মানায় দেখি একবার।

আমি ঝিন্নির হাত থেকে সোয়েটারটা টেনে নিয়ে আমার অনাবৃত হাতের ওপর চাপিয়ে দু'একবার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় কাৎ করে দেখলাম। তারপর মুখে তারিফের একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, আমার তো দারুণ লাগছে, কিন্তু সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আমার গায়ের মাপের আন্দাজ তুমি করতে পারনি।

ঝিন্নি ধরতে পারেনি আমার কৌশল। সে অমনি বলল, তোমার যখন ভাল লেগেছে তখন আমি খুলে ফেলে আবার বুনে ফেলব।

আমি আর একবার নিজের হাতের ওপর ওটাকে ফেলে দেখলাম। মুখে বললাম, রঙটা সত্যিই আমাকে ভাল মানাবে।

সোয়েটারটা ঝিন্নির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি নীচের লনে নেমে আর্ট গ্যালারীর প্রান্তে ফারগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যাবার সময় আড়চোখে ভাগ্‌তুর মুখের চেহারাখানা দেখলাম। মনে হল, ওষুধ ধরেছে।

পেছন থেকে ঝিন্নি আর ভাগ্‌তুর কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কথার অর্থটা কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না।

আমি বেশ খানিকটা সময় ওদের বোঝাপড়ার সুযোগ দিলাম।

পীরপাঞ্জালের বরফ দেখছিলাম এমন সময় হাতে ছোঁয়া লাগতেই পেছন ফিরলাম।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, কি, ভাগ্‌তু সাহেবের পছন্দ হল রঙটা?

ঝিন্নির চোখে মুখে বিস্ময়, তুমি জানলে কি করে সোয়েটারটা ভাগ্‌তুর?

আগে বল, রঙটা এখন ভাগ্‌তুর পছন্দ হয়েছে কিনা?

ঝিন্নি একমুখ হাসি হেসে বলল, তুমি চলে আসার ঠিক পরেই ভাগ্‌তু আমার হাত থেকে সোয়েটারখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলল, এ সোয়েটার আমার। ডাক্তারসাবকে তুমি আলাদা সোয়েটার বানিয়ে দেবে।

আমি বললাম, তুমি কি আমাকে ভাগ্‌তুর মত ছেলেমানুষ পেলে নাকি।

কেন বলতো?

আমার ঐ রঙের সোয়েটার পরতে হলে আবার জন্মাতে হবে।

ঝিন্নি আমার হাতখানা নেড়ে দিয়ে বলল, ছোটেসাহেব আমার বুড়ো হয়ে গেল। এখন বুড়ো বরের জন্য আমি কি রঙের সোয়েটার বুনি?

তুমি তো সোয়েটারে সোয়েটারে আমার বাক্স প্যাটরা সব ভরে দিয়েছ। এখন আবার সোয়েটার বানাবার আগে নতুন আর একখানা বাক্স কিনে দিও।

ঝিন্নি বলল, এখন বল, তুমি কি করে জানলে আমি ভাগ্‌তুর জন্যেই সোয়েটারটা বানাচ্ছি?

ঘরের ভেতর থেকে তোমাদের বাদপ্রতিবাদ শুনছিলাম। তাই তোমাকে রক্ষা করার জন্য একটুকরো অভিনয় করলাম।

দারুণ অভিনয় করেছ ছোটেঠাকুর, নইলে ঐ গোঁয়ারকে বোঝান দায় হত। আর আমার এত দামের উলটা একেবারে বরবাদ হয়ে যেত।

বললাম, তোমার এত উপকার করলাম, এখন আমাকে একটুখানি সঙ্গ দাও।

ঝিন্নি বলল, এখানে বেড়াবে, না ফরেস্ট বাংলোতে যাবে?

অনেকদিন ওখানে যাইনি। চল দুজনে একটু ওপরের পাহাড়টা ঘুরে আসি।

ঝিন্নি আর আমি পাহাড়ের গায়ে পাইন অরণ্য পেরিয়ে উঠতে লাগলাম। দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা একটা ধ্বনির মত পাতায় পাতায় হাওয়ার শব্দ বাজছিল।

আমরা একসময় ঘন বনের মাঝখানে এসে গেলাম। বাইরে থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আমরা কিন্তু গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেকখানি নীচে বন, বসতি, বিপাশা নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর কুলু উপত্যকা। আর বেশ খানিক ওপরে আলো ঝলমল পীরপাঞ্জালের তুষার মহিমা।

আমরা সেই মুহূর্তে গভীর বনের মাঝে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে দিয়ে হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে পালান দুষ্টু মেয়ের মত একটা কুহল শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছিল বিপাশা লক্ষ্য করে। এই ঝর্ণাটা আবার শীতকালে রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কত সকাল কত সন্ধ্যায় আমরা দুজনে ঐ কুহলের পাশে উঁচু পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে কত কথা বলে গেছি। কি মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি হেসেছে ঐ কুহল আমাদের কথা শুনে। আবার আমরা ওর শীতের ঘুম ভাঙাতে ওর গায়ে আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গান গেয়েছি। আমি গেয়ে গেছি রবীন্দ্রনাথের গান, আর ঝিন্নি গেয়েছে ওর কুলুহী ভাষার লোক-সঙ্গীত।

আমি গীতবিতানের বেশ কিছু গান জানলেও তেমন ভাল একটা গাইতে পারি না। কিন্তু ঝিন্নিব গলা বড় মিষ্টি, একেবারে লোক-সঙ্গীতের জন্যে যেন তৈরি। ও কিন্তু আমার গানের দারুণ ভক্ত। মোটামুটি বাংলা ভাষায় বলতে কইতে আমার বাবা ওকে শিখিয়েছিলেন, তবে গুরুদেবের গানের কথার গভীরে সবসময় ও ডুব দিয়ে মুক্তো সঞ্চয় করতে পারত না। তাই ওকে আমি গান শোনাবার আগে ধরে ধরে সূক্ষ্ম ভাবগুলো ব্যাখ্যা করে দিতাম।

ও অনেক সময় আমার গলায় গলা মিলিয়ে গীতবিতানের গানগুলো গাইবার চেষ্টা করত, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কী কোনভাবেই ফুটে উঠত না ওর গলায়। বড় উৎসাহী ও। কি গভীর মনোযোগ দিয়ে ও সব কিছু শেখার চেষ্টা করে। ওর তদ্গত ভাবটি কত মিষ্টি। টলটলে ছোট্ট পুকুরে অপরাহ্নের লাবণ্যময় আলো এসে পড়লে যেমন সৌন্দর্যের সঙ্গে গভীরতার যোগ হয়, ঝিন্নির মিষ্টি মুখখানা সময় সময় তেমনি গভীর হয়ে ওঠে।

কি ভাবছ ছোটেসাহেব?

ঝিন্নির ডাকে আমি চমকে তাকালাম।

ও এসে আমাব হাতখানা ধরে মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, তোমার কথা ভাবছিলাম ঝিন্নি।

ও ছেলেমানুষের মত করে বলল, কি কথা বল না?

সব কথা কি বলা যায়?

কেন যায় না ছোটেসাহেব?

বললাম, এমন অনেক ভাল লাগার অনুভূতি আছে যাকে কথা দিয়ে সাজান যায় না।

ও আমার গায়ের কাছে আরও নিবিড় হয়ে দাঁড়াল। এক সময় আমার বুকের মধ্যে কান চেপে দাড়িয়ে রইল।

হেসে বললাম, কি খেয়ালে তোমায় পেল ঝিন্নি?

ও আমার দিকে ওর হলুদ পাতার মত হাতখানা তুলে কথা বলতে বারণ করল।

এক সময় আমার বুক থেকে কানটা সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার সব কথা জেনে নিয়েছি ছোটেসাহেব।

হেসে বললাম, স-অ-ব কথা!

ও বলল, সব।

তাহলে বল, কি জেনেছ?

ঝিন্নি অমনি বলল, অনুভব করেছি সব, ভাষায় তো প্রকাশ করতে পারব না।

ঝিন্নিকে দুহাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, এত দুষ্টু হয়েছ তুমি, আমার কথায় আমাকে ঘায়েল!

ও আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুহলটার ধারে চলে গেল। অঞ্জলিতে জল তুলে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে একাদশী বালিকার মত খেলা করতে লাগল।

মেয়েদের মনে কখন যে কি ভাবের উদয় হয় তা বোঝা ছেলেদের পক্ষে বড় মুশকিল। আর ঐ না বোঝাটুকু আছে বলেই মেয়েদের ঘিরে ছেলেদের এত বিস্ময়, এত রোমাঞ্চ।

ঝিন্নি এবার অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, হাতে নিয়ে দেখ, সমস্ত মনটা জুড়িয়ে যাবে।

আমি ঝিন্নির হাত থেকে জলটুকু ধরে নিয়ে আচমকা ওর মুখে মাখিয়ে দিয়ে বললাম, আঃ, প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে গেল।

ও আমার হাতখানা ধরে আমার মুখের দিকে চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, অপূর্ব সুন্দর একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি।

আমি মুখ নীচু করে বললাম, কি দেখতে পাচ্ছ?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, কি হচ্ছে ছোটেসাহেব, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। একটুও মাথা নাড়িও না।

আমি আদেশ প্রাপ্ত সৈনিকের মত স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও আমার গালে ওর দুটো হাত চেপে ধরে একটু এদিক ওদিক ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাক। একটুও নড়াচড়া কর না যেন।

এবার আমি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরীভূত একটি প্রাণীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি রাজা হবে ছোটেসাহেব। তোমার কপালের মাঝখানে এসে পড়েছে গোল একটি আলোর তিলক।

একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি রাজা হতে যাব কোন দুঃখে ঝিন্নি? সারা দুনিয়া থেকে যেখানে রাজতন্ত্র মুছে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সেখানে এই নির্জন অরণ্যে তুমি আমাকে রাজা বানাবার চেষ্টা করছ!

ঝিন্নি বলল, আমার রাজা মানুষের হাতের তৈরি কোন সিংহাসনে বসে থাকে না, সে প্রতিটি মানুষের অন্তরের আসনে প্রিয় অতিথি হয়ে বসে।

একটু থেমে ঝিন্নি গম্ভীর হল [illegible] ছোটেসাহেব, আমার ঠিকই মনে হচ্ছে ঈশ্বর ঐ একবিন্দু আলোর তিলক তোমার কপালে মিথ্যা এঁকে দেননি।

বললাম, সব জিনিসকে এমনি সিরিয়াসলি নাও কেন ঝিন্নি?

দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, আমার ধারণাকে এমন করে আঘাত কর না। আমি ঈশ্ব[illegible] মহিমাতে বিশ্বাস করি। কোন পথ দিয়ে যে তাঁর করুণা নামে, কাকে যে সে করুণা কখন স্পর্শ ক[illegible] যায়, তা কে বলতে পারে।

আমি ঝিন্নির সহজ অন্তরের গভীর বিশ্বাসটুকুর মর্যাদা দিলাম। বললাম, আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ঝিন্নি। তবে হয়ত তোমার মত গভীর করে কখনো তাঁকে অনুভব করিনি।

ঝিন্নি আমাকে বাধা দিয়ে বলল, তোমার ভেতর ভগবানের যে কতখানি দান রয়েছে তা তুমি বুঝবে না। এত মানুষের ভালবাসা তুমি পেয়েছ, এত রোগী, দুঃখী তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করে, ঈশ্বরের করুণা না থাকলে সে কি সম্ভব হত। তুমি রাজা নয়ত কে রাজা ছোটেসাহেব?

ঝিন্নির হাত ধরে বললাম, চল. আমরা আরও ওপরে যাই। সেখান থেকে দিনান্তের ছবিটা দেখব।

ঝিন্নি আর আমি ওপরে উঠলাম। অনেকখানি ওপরে উঠে ফরেস্ট বাংলো। সেখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য মনোরম।

ফরেস্ট বাংলোতে তালা দেওয়া। একটু তফাতে চৌকিদারের ডেরা।

ঝিন্নি আর আমি বাংলোর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। একটা সুন্দর স্মৃতি হালকা কুয়াশায় মেঘের মত উঠে এসে আমাদের আচ্ছন্ন করে দিয়ে যেতে লাগল।

বিয়ের আগে যেবার প্রথম কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব দেখতে নাগ্‌গরে এসেছিলাম, ঝিন্নির সঙ্গে সেবার এই বাংলোতে এসেছিলাম একটি রাত কাটাতে।

ডিসেম্বরে ওপরের পাহাড়ের গায়ে ধবধবে সাদা আলোয়ান চাপানো। নীচের পাহাড়গুলো গরীব

লোকের মত সাদা আলোয়ান গায়ে দিলেও মাঝে মাঝে ফুটোর ভেতর দিয়ে গা দেখা যাচ্ছে। সবুজ সতেজ তরুণ দেওদার আর পাইন গাছগুলো যেন রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেছে। ডালপালা পাতাপত্র সব সাদা। প্রকৃতির রঙ-মিস্ত্রি ওপর থেকে সাদা রঙের পোঁচ মেরে ধীরে ধীরে নেমে গেছে নীচে। ঢালিতে ধুলোর মত গুঁড়ো বরফ। কেবল এখানে ওখানে পাহাড়ী টিকার কোঠী থেকে উঠছে নীলাভ ধোঁয়া। আকাশ নীল। আর নীল, বিপাশার চলমান জলপ্রবাহ। এতখানি সাদার ভেতর ধোঁয়া, আকাশ আর জলের নীল চোখ জুড়িয়ে দিয়ে যায়।

আমি আর ঝিন্নি সারাদিন এইসব ছবি দেখে, মেলায় ঘুরে ঘুরে, গদ্দীদের সঙ্গে মিশে, হলুদ সরগুনের ক্ষেতের পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে কত আনন্দ করেছিলাম। তারপর রাতে কেল্লা থেকে রোশনাই দেখব বলে আশ্রয় নিয়েছিলাম এই বাংলোয়। খালি বাংলো পড়ে আছে ডিসেম্বরে, কেউ কোথাও নেই। সব নেমে গেছে ছুটিতে। ঝিন্নির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি রেখে গিয়েছিল বুড়ো ফরেস্ট গার্ড। তাই দিয়ে ঘর খুলে রাতের মত থাকার আস্তানা পেতেছে ঝিন্নি। দুজনের নির্জন-নিবাসে সে রাতে শুধু অন্ধকার আকাশ জুড়ে কোলি-রি-দেওয়ালির রোশনাই দেখা আর প্রচণ্ড শীতল ঝড়ের গান শোনা। খোলা চুলে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে টুকরো টুকরো কাঠ আগুনে ফেলে দিচ্ছিল ঝিন্নি। আমি চেয়েছিলাম ওর দিকে। দুজনের মনের গভীরে কি অশান্ত উত্তেজনার ঢেউ। কেউ কিন্তু প্রথমে অতিক্রম করতে চাইছিল না সংযমের অদৃশ্য সীমারেখাটুকু।

সেদিন ঝিন্নিকে আমার সবচেয়ে রহস্যময়ী নারীর মূর্তি বলে মনে হয়েছিল। আমি ডাক্তার। নারী পুরুষের দেহ নিয়ে আমার নিত্যদিনের কাজ। আমার কাছে মানুষের শরীরের কোন অংশই অজ্ঞাত বা অনাবৃত নয়। তবু সেই প্রচণ্ড শৈত্য-ঝড়ের গভীর অন্ধকারে ঐ ফায়ারপ্লেসের ধিক্‌ধিক্ আগুনের সামনে বসে থাকা ঝিন্নিকে আমার মনে হয়েছিল, বিশ্বের প্রথম রহস্যময়ী রমণী-মূর্তি, যাকে অবাক চোখে দেখছে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ।

নারীকে আবিষ্কারের ভেতর যে রোমাঞ্চ তা বুঝি কোনদিনও কাটবার নয়।

ঝিন্নি প্রথম কথা বলল, ছোটেসাহেব, কত যুগ পরে আমরা এখানে এলাম।

মনে হচ্ছে আমাদের সেদিনের খেলা যেন আজই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ঝিন্নি এবার আমার দিকে পুরোপুরি ফিরে বলল, তুমিও সে দিনটির কথা ভাবছ?

মৃদু হেসে বললাম, এতদিন পরে এখানে এলাম, দুজনের ভাবনা কি আলাদা হতে পারে ঝিন্নি।

ও আমাকে একটুখানি দাঁড়াতে বলে কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোগী দেখতে বেরিয়ে পাহাড়ী টিকায় ঘুরতে ঘুরতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাহাড়ী মেয়েরা চোখ নামিয়ে শান্তভাবে কথাগুলো শুনে নেয়, তারপর মুহূর্তে আশ্চর্য একটা চাঞ্চল্য আসে তাদের ভেতর। কাজটুকু করার জন্যে চলমান ঝর্ণার স্রোতের মত তারা ছন্দিত লয়ে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়! ঝিন্নিও ঠিক তেমনি দ্রুত লয়ে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এল হাতে একগোছা চাবি নাচাতে নাচাতে। ঘর খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে আনলাম।

তোমার সঙ্গে বুঝি চৌকিদারের ভাল রকমই জানাশোনা?

জানাশোনা মানে। সেই যে বুড়ো ফরেস্ট গার্ডের সময় আমরা প্রথম এসেছিলাম, তারই নাতি। এখন তার কাছ থেকেই তো নিয়ে এলাম।

বললাম, চৌকিদারটিকে কোনদিন আমি দেখি নি।

ঝিন্নি ঘর খুলে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে। আমার কথা শুনে পেছন ফিরে বলল, বরটিকে দেখনি, কিন্তু বউটিকে আগে ভাগেই দেখে ফেলেছ।

কি রকম?

কি রকম আবার কি। পেছনের লহরীতে (সবজীবাগান) এসে সকাল বেলা দুধের ঘটি নিয়ে যে মেয়েটি বসে থাকে তাকে কি চুরি করেও এক ঝলক দেখনি ছোটেসাহেব?

ঘরের ভেতর ঢুকে ঝিন্নির হাত ধরে বললাম, চুরি করে দেখার যে একটা রোগ আমার আছে, তা

আমি একবারও অস্বীকার করব না। তবে আমি যেখানে সেখানে চুরি করি না। রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারিতে একটি তরুণী কাজ করে। তার কাছে বিপুল ঐশ্বর্য আছে। সেদিকেই সারাক্ষণ চোরটির চোখ পড়ে রয়েছে।

ঝিন্নি বলল, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সে এখন তরুণী নেই।

দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে ভেজিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঝিন্নি ঐ চোরের দৃষ্টিতে আগেও তরুণী ছিল, এখনও রয়েছে, পরেও থাকবে।

ও আমার দুহাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। আমার মুখের দিকে ওর বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল। ওর চোখে বন্ধ ঘরের আবছায়ায় আমি যেন জলের আভাস দেখলাম। ও এমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি করে বল ছোটেঠাকুর, আমি কি এখনও তোমার চোখে সেই তরুণীটি রয়েছি?

কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমারও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমি সেই রুদ্ধপ্রায় গলায় বললাম, বিশ্বাস কর, চাচা নরসিংলালজীর সঙ্গে প্রথম কুলুর কোঠীতে এসে বেলাশেষের আলোয় যে তরুণীকে দেখেছিলাম, আজও সে তেমনি ঔৎসুক্যের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে আমার মনে। তাকে আমি ভুলব কেমন করে ঝিন্নি। সেদিনের দেখা তরুণীটি শুধু একটি দেহধারী নারী ছিল না, আমার প্রথম ভাল লাগার ছোঁয়ায় সে সেদিন চিরকালের তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

ঝিন্নি আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। সে এখন ধীরে ধীরে তার হাত দুটো শিথিল কবে নিজের চোখ দুটো ঢেকে ফেলল। আমি বুঝলাম ঝিন্নি তার উদ্‌গত অশ্রুকে মুছে ফেলছে।

ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল ঝিন্নি। তুমি এমন খুশির মুহূর্তে চোখেব জল ঝরালে।

তুমি এত ভালবাস তোমার ঝিন্নিকে তাই চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না।

আমি নিজে কতটা ভালবাসতে পারি তা জানি না তবে তুমি আমার বুকে যে ভালবাসার ঝড তুলেছিলে, আজও সে ঝড় থামেনি।

আমি ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে পায়ে পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। সাজানো বাংলো। পর্দা থেকে বিছানার চাদর, সবকিছু ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। ফরেস্ট অফিসার কিংবা বিশিষ্ট অতিথি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। তাই সারাক্ষণ ছিমছাম।

ঝিন্নি বলল, থাকবে আজ রাতে এখানে?

যদি কোন অফিসার এসে পড়ে রাতে, তখন?

ঝিন্নি বলল, আমরা তো জলে পড়ে নেই, বনেব ভেতর দিয়ে দশ মিনিট হাঁটলেই কোয়ার্টাবে পৌঁছে যাব।

গ্র্যান্ড আইডিয়া, কিন্তু ভাগ্‌তু? ও যে জানবে না।

ঝিন্নি বলল, অত ভাবছ কেন, ভাগ্‌তু আমার হেঁসেলের খবর ভাল করেই জানে। আমি চৌকিদাবের বউকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি। ও আমার তৈরি করা খাবারগুলো খেয়ে একটা রাত কোয়ার্টারে দিব্যি ঘুমিয়ে থাকবে।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইল। চৌকিদারটি এল একটু পরে। ঝিন্নির সঙ্গে ঘরের বাইরে তার কিছু কথা হল। সে চলে গেলে কিছুক্ষণের ভেতরেই এল তার বউ। ঝিন্নি তাকে নীচের পাহাড়ে তার বাংলোতে পাঠিয়ে দিলে।

সব ব্যবস্থা পাকা করে ঝিন্নি এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

আজ ছোটেঠাকুর, এখানে আমাদের সেদিনের সংসার পাতা হল।

বললাম, একটা হারিয়ে যাওয়া রাতকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে।

এটা কিন্তু ডিসেম্বরের রাত কিংবা কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসবের দিন নয়।

বললাম, সেই ঝিন্নি কিন্তু উপস্থিত রয়েছে এখানে। আর সেই পরম আকাঙিক্ষত নায়িকাব উপস্থিতিই সূচনা করছে সেদিনের উৎসব।

ঝিন্নি আমার বুকে তার বাঁ গালখানা আলতো করে ছুঁইয়ে রেখে বলল, আর আমার ছোটেসাহেবও রয়েছে আমার পাশে।

বললাম, রাতের খাবার কি চৌকিদারের বউ বানাবে?

ঝিন্নি এখন সহজ হয়ে গেছে। সে বলল, কেন, সেই প্রথমবারের রাতে কি চৌকিদারের বউ তোমার রাতের খাবার বানিয়ে দিয়েছিল?

কিন্তু ঝিন্নি, তুমি খাবার বানাবার কাজে যদি রান্নাঘরে ঢোক তাহলে আমরা গল্প করব কখন?

কেন, সে রাতে কি আমরা খাইনি না গল্প করিনি?

বেশ, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হোক্।

ঝিন্নি চটপট চলে গেল রান্নাঘরখানা পরীক্ষা করে দেখতে। আমি জানি ইতিমধ্যেই খাদ্যবস্তু সংগ্রহের ভার ঝিন্নি চৌকিদার কিংবা তার বউকে দিয়েছে।

আমি ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। একটি রাতের সংসারের কথা ভেবে আমার দারুণ ভাল লাগছিল। স্মৃতির একটা গন্ধ ঘরের চারদিকে বহমান বাতাসের মত আমার অনুভূতিতে এসে লাগছিল।

এখান থেকে কেল্লার একটা দিক পরিষ্কার দেখা যায়। সামনের জানালার ধারে বসে সেবার আমি কোলি-রি-দেওয়ালির আতসবাজির খেলা দেখছিলাম।

একটা ঘটনার কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত মনে পড়ল। সেবার উৎসব শেষ হয়ে গেলে তরুণী ঝিন্নি খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। টেবিলের ওপর খাবার দিয়ে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে দেখে বললাম, একটা অনুরোধ রাখবে?

ঝিন্নি আমার দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকাল।

বল রাখবে?

বলুন।

হেসে বললাম, তুমি খুব হুঁশিয়ার মেয়ে ঝিন্নি, অনুরোধটা রাখবে কিনা স্পষ্ট করে বললে না।

ও অমনি বলল, রাখব, এবার বলুন।

আমি থালা থেকে একখানা পকৌড়া তুলে নিয়ে ঝিন্নির দিকে হাত উঁচিয়ে বললাম, এটুকু বিনা প্রতিবাদে খেতে হবে। আর তোমার খাবারও আন এখানে, একই সঙ্গে বসে খাব।

ঝিন্নি হাত বাড়াল পকৌড়াটা নেবার জন্যে। অমনি আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

উঁহু ওটি হবে না, আমার হাত থেকেই খেতে হবে।

ঝিন্নি মনে হল দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও হঠাৎ বলল, আমি আসছি, খাবারটা নিয়ে আসছি।

মুহূর্তে ও অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার বৈপ্লবিক প্রস্তাবটা একেবারে মেনে নেবার আগে একটুখানি ভেবে নেবার সুযোগ নিল ঝিন্নি।

এক সময় একটা থালা হাতে বেরিয়ে এলো ও। চেয়ারখানা আমার টেবিলের সামনে টেনে এনে বসল। তারপর নিজের থালায় হাত দিয়ে বলল, বাব্বা কি ভীষণ লোক আপনি। এই বসলাম একসঙ্গে খেতে, হল তো?

আমি কোন কথা না বলে বসে রইলাম। হাতে আমার পকৌড়াটা তেমনি ধরা রইল।

ও আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিজের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, দিন।

ওর মুখে 'দিন' শব্দটা অনেক দূরের থেকে ভেসে এল।

আমি হাত বাড়াতেই ঝিন্নি আমার হাতটা ওর দুটো হাতে চেপে ধরল, তারপর মুখখানা আমার হাতের ওপর ছুঁইয়ে পকৌড়াটা তুলে নিয়েই ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

আমার সারা শরীরে তখন আশ্চর্য এক উত্তেজনার খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটি অনাঘ্রাতা কন্যা আজ তার দুটি ঠোঁটের স্পর্শ রেখে গেছে আমার করতলে। আমি ওকে প্রলুব্ধ করেছি, ও সাড়া দিয়েছে সে প্রলোভনে। যৌবনের ধর্মে আমরা আকৃষ্ট হয়েছি পরস্পরের দিকে। এবার আমরা পরিপূর্ণ মিলনের

জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হব।

আমি চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু ঝিন্নি আর ফিরে আসছে না। ভোরের শিশিরে ভেজা আধফোটা একটা গোলাপের স্পর্শ নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেলাম। আমার পা দুটো কাঁপছিল। ও-ঘরে আলো ছিল না। বাইরের ঘরের আলোর সামান্য রশ্মি পড়েছিল ভেতরে।

আমি দেখলাম, ঝিন্নি একটা শূন্য চার-পাই-এর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও মাথা তুলল না। আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর চুলে ভরা মাথায়।

কতক্ষণ পরে ও একটু শান্ত হল। আমি ওকে চারপাই-এর ওপর তুলে বসালাম। ও কিন্তু ওর মুখখানা দুটো হাতের পাতা অঞ্জলিবদ্ধ করে ঢেকে রাখল।

আমি ওর পাশে বসে হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি কিন্তু শক্ত করে মুখের ওপর চেপে রাখল ওর হাত।

বললাম, একটা দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। তোমার সেবার বিনিময়ে আমি তোমাকে অপমান করে বসলাম। আমি তোমার যোগ্য অতিথি নয়।

মুখ থেকে দুটো হাত সরে গেল ঝিন্নির। আমি অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ঝিন্নি আমার দিকে স্থির দুটো চোখ মেলে চেয়ে আছে।

আমরা কেউ কারো মুখের ভাষা পড়তে পারছিলাম না।

ও কথা বলল, আপনি এমন কথা বললেন কেন বলুন?

তুমি কাঁদলে যে।

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁদালে কাঁদব না!

বললাম, তাই তো তোমার কাছে যে হাত দিয়ে অন্যায়টা করলাম, সেই হাত জোড় করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঝিন্নি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। ও নীচু হয়ে আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে ওর মুখ ঢেকে ফেলল।

আশ্চর্য একটা শিহরণ আমার রক্তের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যেই চা করে এনেছে ঝিন্নি। পাতলা ধোঁয়া উঠছে কাপের থেকে।

আমার হাতে কাপটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, কি ভাবছ এত ?

হেসে বললাম, বল তো কি ভাবছি?

আমাদের এখানে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা।

বললাম, প্রায় ঠিকই ধরেছ, তবে অভিজ্ঞতা নয়, রোমাঞ্চের কথা।

ঝিন্নি বলল, দাঁড়াও আমার চা-টা নিয়ে আসি।

ও চায়ের কাপ নিয়ে আবার ফিরল। ফিরতে ফিরতেই বলল, কি বিচ্ছুই না তুমি ছিলে!

এখন আর বিচ্ছু নই, তাই না ঝিন্নি।

ও কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, স্বভাব কি আর যায়।

হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। বললাম, আর একটুখানি চিনি মিশিয়ে দেবে ঝিন্নি?

ও হাতের কাপ আমার সামনের টেবিলে রেখে ছুটল চিনি আনতে। আমি সেই সুযোগে বদল করে নিলাম ওর কাপখানা।

ও এসে আমার হাতে ধরা কাপে এক চামচ চিনি গুলে সরবত বানালে। আমি ঝিন্নির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, অসাধারণ।

ও বলল, কি অসাধারণ ছোটেসাহেব?

এই যে তোমার চায়ের গন্ধ আর স্বাদ ঠিক যেন সেই প্রথম দিনটির আঘ্রাণ বয়ে আনে।

তুমি সেদিনের কথা একেবারেই ভুলতে পারনি, তাই না?

তুমি পেরেছ ঝিন্নি?

বোধহয় চেষ্টা করলেও পারা যায় না ছোটেসাহেব।

ঝিন্নি হঠাৎ নিজের হাতের কাপটা দেখতে লাগল।

আরে, এ যে তোমার কাপ ছোটেসাহেব। আমার কাপের গায়ে ছিল পিঙ্ক রোজের ছবি আর তোমারটাতে ছিল পিঙ্ক কসমস। কি করে এমন হল!

হেসে বললাম, রঙটা যে এক। দুটোই পিঙ্ক।

ঝিন্নি কান্নার গলায় বলল, তুমি দুষ্টুমি করে কাপ বদল করে নিয়েছ ছোটেসাহেব। আমি যে চুমুক দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম।

বললাম, তাই তো বদল করে নিলাম। নিরামিষ বিশুদ্ধ কাপ হলে কি আর বদলাবদলি করতাম।

আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমার ভারী ভাল লাগছে। তবে বিশ্বাস কর, আমার কাপে আমি ঠোঁটই ঠেকাই নি।

আচ্ছা, তোমার কি ঘেন্না বলে কিছু নেই ছোটেসাহেব? একজনের এঁটো চা খাচ্ছ।

দুবছর বিয়ে হল ঝিন্নি, এখনও কি আমরা বিশুদ্ধ হয়ে আছি, এঁটো হয়ে যাইনি!

কাপটা টেবিলের ওপর বসিয়ে রেখে আমার মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, ভারী অসভ্য হয়ে গেছ তুমি ছোটেসাহেব। মুখে তোমার একটুও কিছু আটকায় না।

চা-পর্বের পর আমরা বেরুলাম সূর্যাস্ত দেখতে। বাংলোর পেছনে পাশাপাশি দুটো দেওদার গাছ নীল আকাশের বুকে সবুজ পাতার সমারোহ মেলে ধরেছে। নীচে ছোট্ট এক টুকরো ভ্যালি। তার ওপর পাশাপাশি দুটো পাহাড়। মাথার দিকে দুটি পাহাড়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঝখানে একটা 'ভি'-এর আকার সৃষ্টি করেছে। ঠিক ঐ 'ভি'-এর ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জালের চূড়া। ঝক্ ঝক্ করছে সাদা তুষার শৃঙ্গটি। তার ওপর পাতলা ধোঁয়াটে এক টুকরো মেঘ আটকে আছে। পাহাড়ের সারা দেহ জুড়ে থরে থরে পাইনের সবুজ সমাবেশ।

আমরা মসৃণ একটা শিলাখণ্ডের ওপর পাশাপাশি বসলাম। এমন কতদিন কত নিভৃত জায়গায় আমরা পাশাপাশি বসেছি। নীল নির্জন পরিবেশে হাতে হাত রেখে কোন কথা না বলে প্রকৃতিকে দেখেছি। দ্যুলোক ভূলোকের অমৃত পাত্র থেকে চুইয়ে চুইয়ে ভরে তুলেছি অনুভূতির অদৃশ্য পাত্রখানি। আমরা যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন কানায় কানায় পূর্ণ দুটি হৃদয়।

আমরা কতক্ষণ কোন কথা বলিনি। কারণ পৃথিবীর কোন ভাষায় তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না।

আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করে দেখেছি, মানালীর ভ্যালির ওপারে যখন চাঁদ উঠত আর ভ্যালির থৈ থৈ অন্ধকারের জলটাকে ধীরে ধীরে পাতলা দুধের মত সাদা করে তুলত, তখন চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ত ঝিন্নির। আমি জানতাম, ওর অসহ্য ভাললাগার প্রকাশ এমনি করেই ঘটে। আর আমার ভাললাগার অনুভূতি এক ধরনের রোমাঞ্চের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুতভাবে শিউরে শিউরে উঠত। আমরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে আসতাম বাংলোতে। পারতপক্ষে কেউ কোন কথা বলতাম না।

যখন বরসাত শুরু হয়ে যেত প্রবলভাবে, আর পাহাড় ভেঙে নেমে আসত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতধারা, রাতে বিদ্যুতের চমকে, বজ্রের গর্জনে পার্বত্য-প্রকৃতি আলোকিত, শব্দিত হত তখন জানালার ধারে ঘন হয়ে বসে আমরা ভ্যালির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ঝিন্নি এ সময় মাঝে মাঝে একটি অনুরোধ রাখত আমার কাছে, তোমার ভাষায় বর্ষার গান গাও।

আমি গীতবিতান উজাড় করে গাইতাম। ঝিন্নি শ্রোতা, আমি গায়ক, মাঝে কোন সমালোচক নেই। ও নিবিড় হয়ে আমার গায়ে গা ঘেঁষে বসে বসে গান শুনত আর সামনের ভ্যালিতে নিশীথ-বর্ষার উচ্ছল সমারোহ দেখত।

বজ্রের সে কি গর্জন! একবার বজ্র পড়লে কিংবা মেঘ ডেকে উঠলে সে ডাক সহজে থামত না।

ভ্যালির চারদিকের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরত। কতক্ষণ পরে কোন গিরিপথের ফাঁকে বুঝি সে শব্দ বেরিয়ে যেত।

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' কিংবা 'বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা', এই দুটো গান বর্ষার এ ধরনের শব্দিত সমারোহে ঝিন্নির বড় ভাল লাগত। গান শুনতে শুনতে কখনও বা ঝিন্নি তার হাত দিয়ে আমাকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে রাখত।

আবার আসত ফলের প্রাচুর্য নিয়ে শরৎ। ঝিন্নি কুলু কিংবা মানালীর বাগানে আসত সে সময় প্রতি শনিবার সন্ধ্যায়। ওকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত, যখন ও পিঠে 'কিলতা' (তিন কোনা কাঠের বাক্স) বেঁধে বাগানের ফলসংগ্রহকারিণীদের সঙ্গে আপেল তুলত।

ও কোনদিনই ওর কোন কর্মচারীর সঙ্গে পার্থক্য রেখে চলত না। হাসি, গল্পে, গানে ও সবার সখি, সবার প্রিয়।

সেবার ভারী সুন্দর একটি আয়োজন করেছিল ও। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ট্যুরিস্টরা আসে কুলুমানালী বেড়াতে। ওরা পথের ধারে ফলের দোকান থেকে ফলের রস কিনে খায়। ঝিন্নি সবকটি দোকানকে সেবার সংঘবদ্ধ করল। কুলুমানালীর শুধু বাজার অঞ্চলে নয়, সবকটি ট্যুরিস্ট স্পটে ছড়িয়ে দিল ছোট ছোট ফলের দোকান। ফল খাও, রস খাও, ঝুড়ি বন্দী করে নিয়ে যাও।

সবকটি দোকান নিজেই ঘুরে ঘুরে, সুন্দর করে সাজাল। এ কাজে তার প্রধান সমর্থক ও সাহায্যকারী জুলিয়েন। সে তার জিপে ঝিন্নি আর বালুকে নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়াল দোকান সাজাতে। আমি সাহায্যের প্রস্তাব দিতে গিয়ে ধমক খেলাম। ওদের কথা হল, যে যার কর্ম করে যাও। জুলিয়েন পুরোপুরি ফলের ব্যবসায়ী আর ঝিন্নি শিল্পী, সুতরাং এই নতুন পরিকল্পনায় থাকবে দুজনের সমন্বয়। অন্যে নাক গলাতে এলে কুঁচ করে কেটে নেওয়া হবে তার নাকটি। অবশ্য নাকটি কেটে নেওয়ার পরিকল্পনা ঝিন্নির এবং সে তা কেবলমাত্র আমার কাছেই প্রকাশ করেছিল। ডিমনস্ট্রেশান সহযোগে।

ফলের ছোট ছোট ঘরগুলিতে রইল টিপিক্যাল কুলুর পোশাক পরা একটি করে মেয়ে আর একটি করে ছেলে। দূর থেকে রঙীন কাঠ আর তাঁবুর তৈরি ঘরগুলো ট্যুরিস্টদের চোখকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। ঝিন্নি অক্লান্ত পরিশ্রমে রাতদিন ছবি এঁকেছিল। দোকানের সামনের প্যানেলে আপেলের ফুলন্ত ডাল। সাদা আর পিঙ্ক ফুলে ভরা বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ। তারপর শরতের ফল সম্ভার দুটি ক্যানভাসের পার্শ্ব প্যানেলে চিত্রিত। জননী সন্তানকে তুলে ধরেছে ঊর্ধ্বে। শিশু উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে হাতটি প্রসারিত করেছে ফলের দিকে।

একটি রুচিসম্মত চিত্রিত বুকলেট ছাপা হয়েছে ইংরাজীতে। কুলুতে আপেল চাষের ইতিহাস।

১৮৭০ সালে বানড্রোলে ক্যাপটেন লী-র প্রথম আপেল বাগান। তারপর এলেন ক্যাপটেন বেনন ১৮৮৪ সালে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'সান-সাইন-অর্চার্ড'। ইংলিশ ভ্যারাইটির ফল পাবার জন্যে রোপণ করলেন চারা। গন্ধে বর্ণে আকারে উৎকৃষ্ট হল কুলুর আপেল। বিশেষ করে কুলুর 'গোল্ডেন অ্যাপল' হল ভারতবিখ্যাত।

এমনি অজস্র সমাচারে পূর্ণ ঐ পুস্তিকাটি। পাতায় পাতায় আপেলের ফুল ফল আর আপেল সংগ্রহকারিণীদের ছবি।

সত্যি চোখে পড়ার মত রূপসজ্জা।

ঝিন্নির ডাকে চমকে তাকালাম। এতক্ষণ আমি মগ্ন হয়ে কুলু আর ঝিন্নিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলাম।

ঝিন্নি বলল, সামনের ঐ মেঘের তালটা শেষ সূর্যের রঙ লেগে কেমন গোলাপী হয়ে উঠেছে দেখ।

আমাদের চোখের সামনেই আকাশের বুকে যেন বিরাট এক গোলাপী আভার খরগোস গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

ওদিকে উঁচু পীরপাঞ্জালের তুষার চূড়োয় তখনও সোনার ঝলমলানি।

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'—গানটি প্রাণের থেকে বেরিয়ে এল কণ্ঠে। কিছুটা গেয়ে নিয়ে

ওকে 'দিনান্তের এই এক কোণাতে, সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে। মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ'—এই কথাগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলাম। ও অমনি ইঙ্গিতে বলল, গেয়ে যাও, বোঝাতে হবে না।

সব গানটুকু গাওয়া শেষ হলে ধীরে ধীরে আকাশ থেকে রঙের খেলা মুছে গেল। আমরা পাশাপাশি কথা না বলে কতক্ষণ বসে রইলাম।

একসময় ঝিন্নি নীরবতা ভেঙে বলল, তোমার ঐ গানের সুরই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কথার অর্থের কোন দরকার হয়নি আমার।

বললাম, যাঁর গান, তিনি কথাকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, সুরকেও ঠিক তাই। সুর আর কথাকে একটু আলাদা করে রাখেননি বলে তুমি সুর শুনেই কথার ভাবটিকে ধরে নিয়েছ।

ঝিন্নি বলল, শিল্পী রোয়েরিখ আর টেগোরের কয়েকখানা চিঠি আমি পড়েছি। দুজন মহান পুরুষ যেন মুখোমুখি বসে ভাব বিনিময় করছেন। আমার মনে হয় রোয়েরিখ যদি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতেন তাহলে তিনি টেগোরের আর একটি বিস্ময়কর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতেন।

বললাম, রবীন্দ্রনাথের গান প্রতিটি জীবনের সুধারস।

সন্ধ্যায় বাংলোতে ফিরে এলাম। বাংলোর ধার ঘেঁষে সেই কুহলটা কলকল আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে। ঝিন্নি কুহলে পা ডুবিয়ে এল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক বাড়ছে। পাহাড়ী ঝিঁঝির অদ্ভুত ডাক। মনে হয়, অবিকল একটা ট্রেন দূর থেকে শব্দ করতে করতে আসছে।

চৌকিদারের বউ কিছুতেই শুনল না। সে রসুইখানায় ঢুকে ঝিন্নিকে খানা তৈরির কাজে সাহায্য করতে লাগল।

একসময় ঝিন্নি এসে আমার কানে কানে বলল, বউটির বড় কৌতূহল হয়েছে, আমরা কোয়ার্টার থাকতে এখানে এসেছি কেন?

বল গিয়ে দুটো পাগল আমাদের কোয়ার্টার থেকে তাড়া করে এখানে এনেছে। রাতটা গা ঢাকা দিয়ে ভোরবেলা নীচে নেমে যাব।

ঝিন্নি বলল, তাহলেই হয়েছে আর কি। ভয়ে চেঁচিয়ে বন চিরে ফেলবে।

তবে হানিমুনে এসেছি বলে বল।

অ্যাদ্দিন পরে!

বল বিবাহ-বার্ষিকী।

ও একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, তা বলা যায়। যদিও বার্ষিকী নয়, তবু এটাই আমাদের প্রথম মিলনের জায়গা।

তাহলে বরং বল স্মৃতিবাসর।

ঝিন্নি আমার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, নামকরণে দেখছি ওস্তাদ।

আমি ওর হাত ধরে ফেলে বললাম, আমার চুল কিন্তু চিরুণী চালিয়ে ঠিক করে দিয়ে যেতে হবে, নাহলে তোমাকে ছাড়ছি না।

ঝিন্নি হাতটা টানতে টানতে বলল, হাত না ছাড়লে আমি কেমন করে চিরুণী চালাব। ছাড় হাত।

আমি হাত ছাড়তেই ও পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করল। আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে জাপটে ধরলাম। ও অমনি চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আঃ ছাড়, রান্নাঘর থেকে চৌকিদারের বউ উঁকি দিচ্ছে।

আমি জানি এটা ঝিন্নির দুষ্টুমি। কেউ কোথাও উঁকি দিচ্ছে না। আরও জোরে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, আমি তো পরের বউকে ধরিনি, ধরেছি বিয়ে করা নিজের বউকে।

ঝিন্নি বলল, দারুণ সাধুপুরষ তুমি। নিজের বউ ছাড়া কোন মেয়ের মুখ দেখ না, কথা শোন না, স্পর্শ কর না।

বললাম, ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জীকে হয়ত তা করতে হয় কিন্তু রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর কেয়ারটেকারের স্বামী কখনও তা করে না। সে সেদিক থেকে তার স্ত্রীর কাছে শুধু নয়, নিজের কাছেও

ষোল আনা সাচ্চা।

তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন ছোটেসাহেব?

আমি ততক্ষণে আমার হাতের বাঁধন শিথিল করে দিয়েছি।

এবার ঝিন্নি আমাকে নিজেই জড়িয়ে ধরল, সত্যি তুমি রাগ করলে আমার কথায়?

আমি একটুও রাগ করিনি, তবু গম্ভীর হবার ভাণ করে বললাম, এখন ছেড়ে দাও, চৌকিদারের বউ হয়ত এসে পড়বে।

আসুক। ও আরও ঘনিয়ে দাড়াল। তারপর একখানা হাত তুলে আমার বুকের কাছে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগল।

ওর মুখখানা ঘরের মেঝের দিকে। আমি জানি ঝিন্নির অভিমানের ছবিখানা। খুব একটা দুঃখ বা অভিমান প্রকাশ করতে হলে ও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকায় না।

এবার আমি ঝিন্নিকে ধরে আস্তে নাড়া দিলাম। বাতাস যেমন করে পাতার কিনারা থেকে বর্ষার জমে থাকা জল ঝরিয়ে দেয় তেমনি করে আমার নাড়া খেয়ে ঝিন্নির চোখের জল ঝরল মাটিতে। আমি অমনি ওর পানপাতার মত মুখখানাতে নিজের মুখ ঠেকিয়ে বললাম, ছোটি বরসাত যেমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে, আমার ঝিন্নিও হয়েছে ঠিক তেমনি।

মুখ সরিয়ে নিতে গেলেও ও আরও নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে পড়ল।

বললাম, আমার কাছ থেকে কতদূরে পালাবে তুমি? পারবে তোমার ছোটেসাহেবকে ছেড়ে থাকতে?

ঝিন্নি এবার কথা বলল, তুমি আমার দুর্বলতাটুকু জান, তাই তুমি আমাকে কাঁদাও।

আমি তোমাকে কাঁদাই কেবল?

কাঁদাও না তো কি? আমি কি ইচ্ছে করে কাঁদি?

ওকে হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে বললাম, বেশ, এবার থেকে তোমাকে কাঁদাব না। আমি কথা দিচ্ছি।

ঝিন্নি এবার নিজেই আমার হাত চেপে ধরে রইল।

বললাম, আজ পুরনো স্মৃতির জায়গায় এসে দুটো মনকে বিষণ্ণ নাই বা করে তুললাম আমরা। এসো বিবাদ মিটিয়ে ফেলি।

ওর মুখখানা হাতের পাতায় তুলে ধরতেই ও চোখ বন্ধ করল। মুখখানাতে ফুটে উঠল নবীন ভোরের মিষ্টি সোনালী এক টুকরো হাসি।

আমি আমার ঝিন্নিকে আদরে সোহাগে ভরে দিলাম।

একসময় ও নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, রসুই ঘরে বসে রয়েছে চৌকিদারের বউ। আমি গেলে রান্না চাপাবে। মনে হয় বসে বসে ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

বললাম, এখুনি যা খাওয়া গেল, এর চেয়ে ভাল খাবার কি আজ তুমি আমাকে দিতে পারবে?

ও কীল দেখিয়ে বলল, দারুণ অসভ্য তুমি ছোটেসাহেব। অসভ্যদের জন্যে এটাও একটা খাবার।

ঝিন্নি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি আলো নিভিয়ে জানালার ধারে বসলাম।

মনে হল আজ চাঁদ উঠবে আরও পরে। কৃষ্ণপক্ষ, তবে তিথির হিসেব রাখিনি। কয়েক দিনের অনুমানে তাই মনে হচ্ছে।

জানালার ফাঁকে চোখ ফেললাম। সামনে পাইন আর দেওদারের অরণ্য। অন্ধকারে মুছে গেছে সব আকার। কেবল কীটপতঙ্গের সম্মিলিত শব্দে অরণ্যভূমির অস্তিত্ব ঘোষিত হচ্ছে। পাশের কুহলটিও কলহাস্যে নীচে নেমে যেতে যেতে বলছে, ঝিন্নি আর তোমার স্মৃতিভরা রাতটি শুভ হোক।

জানালার বাঁয়ে চোখ ফেললাম। কেল্লার আলোটা দেখতে পাচ্ছি। তার পাশ দিয়ে দৃষ্টি আরও নীচে নেমে গেল। এখন আমার চোখ অন্ধকারে উপত্যকা, বিপাশা, বনভূমি, ক্ষেতি, পাহাড়ী টিলা, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে একটি অপরূপ জিনিস। কুলু উপত্যকায় ছড়ান জনবসতি এলাকার কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে। দূর থেকে সে আলোগুলি জড়োয়ার অলঙ্কারে

বসান মূল্যবান পাথরের মত ঝলমল করছে।

আমি কতক্ষণ এই দৃশ্য দেখলাম। এসব দৃশ্য ঝিন্নির নিশ্চয়ই দেখা। তবু আজ এই অন্ধকারের ভেতর ওকে আমার একান্ত পাশে বসিয়ে এই দৃশ্যটুকু দেখাতে ভারী ইচ্ছে করছে।

আশ্চর্য! ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ও ঘরে ঢুকল। আমি ওকে কাছে ডাকলাম। পাশেই আর একখানা বসার আসন।

ও বলল, আলো জ্বালি?

না।

বড় অন্ধকার যে।

আমার গলার শব্দ ধরে চলে এস।

যদি অজানা কিছুতে আছাড় খাই?

খরগোসের মত না দৌড়ে কচ্ছপের মত গুটি গুটি পায়ে চলে এস।

ভীষণ জেদী তুমি।

এতক্ষণ ভীষণ অসভ্য ছিলাম, এখন পদোন্নতি হল বলে মনে হচ্ছে।

ঝিন্নি আর কোন কথা বলল না। সে অন্ধকারে এখন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। ঘরখানা বেশ বড় এবং নানা ধরণের আসবাবে ভরা। নিশ্চয় ধীরে, অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। ওর আর আমার ভেতর যেন কানামাছি খেলা শুরু হয়েছে!

আমি ছোট্ট করে একটা চুম্বনের আওয়াজ তুললাম। ও সাড়া দিল না।

একটার পর একটা আমি দিয়েই চললাম। ওর কোন সাড়াই পেলাম না।

ওকি ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল নাকি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নি আমার গায়ে তার হাত ঠেকিয়ে বলল, আমার মানুষটিকে চিনে আমি কি আর এইটুকু পথ আসতে পারব না।

আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আমার ঝিন্নি ঘরের বাইরে চলে গেছে।

ও বলল, যদি কোনদিন ঘর ছেড়ে পালাই তাহলে নিজের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই পালাব।

বললাম, জানালা দিয়ে ভ্যালির দিকে চেয়ে দেখ একবার।

ঝিন্নি জানালার ধারে না এসেই বলল, আলোর জোনাকীর কথা বলছ তো?

তুমি কি করে বুঝলে?

অন্ধকারে চেয়ে থাকার ঐ তো একটিই অর্থ আছে এখন।

বললাম, তোমার দেশের অনেক কিছুই তুমি একেবারে শৈশব থেকে দেখছ ঝিন্নি, কিন্তু আমার কাছে আজও এই কুলু উপত্যকার বহু জিনিসই বিস্ময়।

আমার দেশ বলছ কেন, এটা কি এখন তোমার দেশ নয়?

বললাম, ঝিন্নি আর তার ছোটেসাহেব যেখানে অভিন্ন সেখানে দুজনের দেশটাও এক বই কি। তবে তুমি এখানে জন্মেছ বলে আমার চেয়ে অনেক বেশিই জানো।

আমরা অন্ধকারে পাশাপাশি বসলাম। ভ্যালিতে দেখলাম সেই জোনাকীর ঝিল্‌মিল্‌।

ঝিন্নি আলো দেখে দেখে আন্দাজ করে বলতে লাগল পাহাড়ী টিকা বা গাঁয়ের নামগুলো।

বললাম, কি করে শিখলে এত?

বুড়ো ফরেস্ট গার্ডই আমাকে টিকার নামগুলো বলে বলে ওপর থেকে সব চিনিয়ে দিয়েছিল।

বনের মধ্যে পোকারা ডাকছে। কখনও আলাদা, কখনও মিশ্রিত স্বর। ঝিন্নি কয়েক ধরণের পোকার নাম করে গেল। আমাকে তার একান্ত কাছে টেনে নিয়ে এক একটা ডাকের অর্থ বোঝাতে লাগল আর সেই ডাক সৃষ্টিকারী পোকার পরিচয় দিয়ে গেল।

আমি একসময় বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বললাম তুমি এমন কীটপতঙ্গ বিশারদ হলে কি করে ঝিন্নি?

এটা আমার চাচাজীর শিক্ষা ছোটেসাহেব। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, লতাপাতা, ফুল, গাছগাছালি,

সবই ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে চিনিয়ে চিনিয়ে বেড়াতেন। তাঁর ধারণা হল, দেশকে চিনতে হলে এসব জিনিসকে ছেলেবেলা থেকে চেনা চাই।

চাচাজীর ওপর আমারও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ঝিন্নি। এসব আজকাল কোন অভিভাবকই তাঁদের ছেলেমেয়েদের শেখান না। হয়ত তাঁরা নিজেরাও অনেক কিছু জানেন না।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার মুখখানা অন্ধকারে তার মুখের ওপর চেপে ধরে বলল, আমার ছোটেসাহেবের ছেলেকে আমি সবকিছু শিখিয়ে দেব।

ওর হাতের বাঁধনের ভেতরে থেকেই বললাম, ও ছেলেটা বুঝি তোমার ছোটেসাহেবের খালি, তোমার নয়?

ঝিন্নি অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বলল, আমার বললে যদি সে না আসে, তাই আমার ছোটেসাহেবের বললাম।

আমি জোর দিয়ে বললাম, একশোবার ও ব্যাটা তোমার আর আমার, আসবে না মানে? ওকে আসতেই হবে।

ওরকম করে কথা বল না, ছোটেসাহেব। শিশু তো মানুষ নয়, দেবতা। ভগবান ওদের আপনার ঘর খালি করে পাঠিয়ে দেন।

রাতে বিছানায় আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম, ও বেশ খানিক পরে চারদিক বন্ধ করে এল।

বললাম, তোমার রসুইখানার কাজ সারতে একটু বেশি দেরি হল বলে মনে হচ্ছে?

ঝিন্নি বলল, ওদের পাত পেড়ে বসিয়ে খাওয়াতে হল না?

ওরা কারা? কাজ তো করছিল শুধু চৌকিদারের বউ।

বাঃ, বউটিকে খাওয়ালে তার বর আর বাচ্চা দুটোকে খাওয়াতে হবে না?

তোমার সামান্য রান্নায় এতজনের হয়ে গেল?

ঝিন্নি যেন এক মহা অবুঝের সঙ্গে কথা বলছে, সামান্য রান্না তোমাকে কে বলেছে। আমি আগেই ওদের হিসেব না ধরে কি রান্না চাপিয়েছি।

আমাকে ভুল বুঝ না ঝিন্নি। আমি শুধু সবটুকু কথা জানতে চেয়েছিলাম। ওদের খাওয়ানোতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

ঝিন্নি বলল, থাম তো মাস্টারজী, আমার ছোটেসাহেবের মন কি রকম তা আমাকে আর চেনাতে হবে না।

রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে শুরু হয়ে গেল সেই ছেলের গল্প।

আচ্ছা, ছোটেসাহেব, তোমার ছেলে পছন্দ, না মেয়ে?

আমি ছেলেমেয়ে দুটোই পছন্দ করি।

তার ভেতর কার ওপর তোমার টানটা বেশি, বলই না?

বলেছিই তো ছেলে মেয়ে দুটিতেই আমার সমান আসক্তি। একসঙ্গে দুটো মুখ দেখতে পেলে আমি সবচেয়ে খুশি হব।

ঝিন্নি আমার শেষ কথাটুকু নিয়েই বলল, দুটো মুখ একসঙ্গে আবার কোথায় পাব?

সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কেন, যমজ উপহার দিয়ে।

ও আমার বুকে সঙ্গে সঙ্গে কিল উপহার দিলে।

বললাম, ছেলেমেয়ের জন্যে তোমার এত কান্না, সে কান্না একেবারে থেকে যেত দুটিকে একসঙ্গে কোলে নিয়ে। তারপর তোমার হাসি হাসি গরবিনী মুখের কালার ছবি তুলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিজ্ঞাপন ছেপে দিতাম।

ও চুপ।

বললাম, কথাটা ঠিক বলিনি?

কোন সাড়া নেই।

ওকে নাড়া দিয়ে বললাম, কি হল আবার?

ঝিন্নি দুহাতে মুখখানা ঢেকে পাশ ফিরল।

বললাম, একটুতেই তুমি এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কিংবা কান্নাকাটি করলে কোন কথাই তো তোমাকে বলা যাবে না আর।

ঝিন্নি কান্না ভেজা গলায় বলল, আমি তোমাকে সুখ দিতে পারিনি, সন্তান দিতে পারিনি, তাই কাঁদি।

গভীর আবেগে বললাম, আমি কোন সন্তান চাই না, শুধু আমার ঝিন্নি, সারাক্ষণ আমার বুকের ভেতর জেগে থাক।

ঝিন্নি অন্ধকারে দ্রুত তার হাতখানা আমার মুখে চাপা দিয়ে বলল, ও কথা বলতে নেই ছোটেসাহেব, এমন করে বললে ওরা আর আসতে চাইবে না। ওদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকতে হয়, তবেই ওরা ঘর আলো করে ছুটে আসে।

অনেক রাত অব্দি আমরা কথা বলতে লাগলাম।

ঝিন্নি তার নিজের জন্যে একটা স্টুডিও করতে চায়। যেখানে সে বসে বসে ছবি আঁকবে।

আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, স্টুডিওটা তুমি মানালীতে করলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

কেন বল তো?

বললাম, নাগ্গরের এই স্পটে তো কোন জমি নেই। থাকলে তা কিনে তোমার জন্যে একটা স্টুডিও বানিয়ে দিতাম।

তা ঠিক। এক চিলতে জায়গা আর এখানে নেই।

বললাম, তুমি কি কুলুতে স্টুডিও করতে চাও?

না, মানালীতেই একটা ছোট্ট স্টুডিও করে দিও। আমি সারাদিন ছবি নিয়ে মেতে থাকব, আর তুমি থাকবে তোমার ডিসপেনসারী নিয়ে। রাতে কাজ থেকে ছুটি পেলে তুমি চলে আসবে আমার স্টুডিওতে।

ওখানে তোমার সারাদিনের রঙ তুলির কাজ দেখব। সমালোচনা করব। অবশ্য যদিও এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য হবে একেবারে আনাড়ী।

তা কেন, ছবির ব্যাপারে সমঝদারের মূল্য অনেক বেশি মানি, কিন্তু প্রিয়জনের মন্তব্যের দাম তার চেয়ে একটুও কম নয়।

বললাম, রাতের থাকা খাওয়া আমাদের কোথায় হবে?

ঝিন্নি বলল, কখনো স্টুডিওর ছোট্ট ঘরে, কখনও বা আমাদের কোয়ার্টারে।

আমাদের ছেলেমেয়ে তখন কি করবে? আয়ার কাছে রাখতে হবে?

ঝিন্নির গলায় বিস্ময়, কেন?

বললাম, তুমি আমি দুজনেই ব্যস্ত থাকব কাজে।

ওরা অন্য পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের মত বাগানে, পথে খেলে বেড়াবে। কুলুর আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে তাদের কোন তফাৎ নেই এটা প্রথম থেকেই তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমার এতে একটুও অমত নেই।

ঝিন্নি বলল, আমার কাছেও থাকবে। স্টুডিওতে এলে ওদের বড় বড় কাগজ আর রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে বসিয়ে দেব। ছোটবেলা থেকে রঙ দেখুক, রঙ চিনুক।

আমার ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের মত শিল্পী হোক্ এই আমি চাই।

না, তারা তাদের বাবার মত ডাক্তার হবে।

কেন, শিল্পী হলে ক্ষতি কি?

ডাক্তারীতেই বা তোমার আপত্তি কেন?

একটা সমাধানের সূত্র টেনে বললাম, আচ্ছা বেশ, ছেলে হলে তোমার কথা রইল। সে ডাক্তারী পড়বে।

অমনি ঝিন্নি বলল, মেয়ে হলে ওকে আমি মনের মত ছবি আঁকা শিখিয়ে শিল্পী করে তুলব।

এখন আমরা দুজনে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

আমরা স্থির হতেই রাতের শব্দগুলো প্রাধান্য পেল। কুহলের খল্‌খল্‌, কীটপতঙ্গের উচ্চরোল রাতের কালো পর্দাটাকে নাড়া দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শব্দ মাঝে মাঝে কানে এসে বাজছিল। আমি ঝিন্নির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে ও বলল, অনেক আগে থেকেই ঝড়ের হাওয়া বইছে, তুমি কি শুনতে পাওনি?

কথার ভেতর আমি খেয়াল করিনি ঝিন্নি। তাছাড়া শব্দ চেনা আর ধরার ব্যাপারে অসাধারণ তোমার কান।

ঝিন্নি বলল, জান, আমি যখন আর্ট কলেজে পড়তাম তখন অনেক দূরের থেকে মাস্টারমশায়দের পায়ের আওয়াজ শুনে বলে দিতে পারতাম, কে আসছেন। আমার ক্লাশের বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখত আমার কথা আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে।

এ এক ধরণের অদ্ভুত ক্ষমতা ঝিন্নি। চোখের দৃষ্টিও কারু কারু এমনি প্রখর হয়।

আমাদের কথার ভেতরেই ঝড়ের একটা ঝাপটা ঘরে ঢুকে পড়ল। জানালার কটা পর্দা আক্রান্ত মুর্গীর পাখা ঝাপটের মত শব্দ করে উড়তে লাগল। বনের কীটপতঙ্গ এখন একেবারে চুপ।

বললাম, বেশ বড়রকম ঝড় এল ঝিন্নি।

ও বলল, দেখবে ঝড়? চল জানালার ধারে যাই।

আমরা একখানা বড় লাম্বলী থুলমার ভেতর ঢুকে শুয়েছিলাম। এগুলো বড় আকারের কম্বল। বস্তার মত ঢুকে পড়ে আরামে শুয়ে থাকা যায়।

আমি থুলমার থেকে আগে বেরুলাম। ঝিন্নি তার সুথান আর চোলি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল বেরিয়ে আসার আগে। ও বলে উঠল, খবরদার, পাট্টু গায়ে না জড়িয়ে জানালার কাছে যেও না ছোটেসাহেব।

আমি দুষ্টুমি করে থল্‌মা সমেত ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, এর চেয়ে গরম আর কোন কিছুতেই হবে না। বুকে করে তুলে নিয়ে যাই জানালার ধারে, কি বল ঝিন্নি?

ও তখন থুল্‌মার ভেতর বন্দী হয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আর বলছে, দারুণ ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি যা হোক। ছাড় ছাড় ছোটেসাহেব, আমাকে দয়া করে বেরুতে দাও।

বললাম, দয়াটয়া নেই আমার। শুধু একটি শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।

কাতর গলা ঝিন্নির, বল?

যখনই চুমু খেতে চাইব বারণ করতে পারবে না।

আহা মরে যাই। ছোটেসাহেবের বলিহারি খেয়াল।

জোর করে জড়িয়ে ধরে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি সমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

এক সময় থুল্‌মা ছেড়ে দিয়ে বললাম, বেশ, কিছুই চাইব না তোমরা কাছে।

ঝিন্নি এবার নিজের পোশাক আসাক ঠিকঠাক করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায় ছোটেসাহেব, না চাইলেই অনেক বেশি পাওয়া যায়।

বললাম, বেশ এখন থেকে মুখ বুজে থাকব, দেখি কত বড় দাতা তুমি।

ও আমার গায়ে একখানা পাতলা ধরণের পাট্টু (কম্বল) জড়িয়ে দিয়ে বলল, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত ঝড় দেখতে চল তো খোকন।

আমরা দুজনে একটা ডিভান টেনে নিয়ে বসলাম খোলা জানালার ধারে। আমার পাট্টুর ভেতর ওকে ঢুকিয়ে নিয়ে দুজনে জড়িয়ে বসলাম।

ঝড়ের সঙ্গে এখন চিক্‌কুর হানছে ঘন ঘন। পাহাড়ী ঝড়ের চরিত্র হল দ্রুত গতিতে ঘনিয়ে ওঠা। গাছপালার আর্ত হাহাকার শোনা যাচ্ছে। ঝড়ের নির্মম শাসনে পাইন বন ক্ষতবিক্ষত।

মেঘ মুহূর্মুহু ডাকতে লাগল। শব্দে প্রতিশব্দে নৈশ প্রকৃতির বুকে সে কি বিপুল হুঙ্কার।

বৃষ্টি এল। তবলার লহরার মত বাংলোর ছাদে বেজে উঠল প্রথম বৃষ্টির পশলা। তারপর হাওয়ার দমকে বৃষ্টির মেজাজ বদলাতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

ঝিন্নি দারুণ খুশী হয়ে উঠেছে। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে পাট্টুতে সর্বাঙ্গ ঢেকে খালি মুখখানা বের করে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে ঝিন্নি। এক সময় বলল, এরই ভেতর ছোটি-বরসাত শুরু হয়ে গেল ছোটেসাহেব!

বললাম, এবার সামান্য আগে হল।

সাধারণতঃ কুলু ভ্যালিতে পনেরই জুন নাগাদ ছোটি-বরসাত শুরু হয়। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি, আবার আকাশ ঝকঝক। শেষে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে নামে বর্ষণ। আসল বরসাতের শুরু এই সময় থেকে।

বেশ খানিক সময় ধরে বনের গাছপালা আর পাহাড় পর্বতকে স্নান করিয়ে দিয়ে বৃষ্টি থামল। বাতাসের সেই বৃষ্টি তাড়িয়ে বেড়ানোর বাখালিয়া খেলা আর নেই। গাছপালা স্থির। কীটপতঙ্গ চুপ। একটা ধূর্ত চিতার মত গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসে শীত। পাট্টুর ভেতরে থেকেও তা অনুভব করতে পারছি।

ঝিন্নি বলল, কেল্লার আকাশটার দিকে একবার চেয়ে দেখ ছোটেসাহেব।

তাকালাম। নিষ্প্রভ একটা বিদ্যুৎ তিরতির করে কাঁপছে। ভুবনজোড়া অন্ধকারের পটভূমিতে দিগন্তের কোণায় ঐ একটুকরো কম্পমান বিদ্যুতের শিখা অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি করছিল।

মনে হচ্ছিল আমি আর ঝিন্নি চলেছিলাম অন্ধকার সমুদ্রের বুকে নৌকো ভাসিয়ে নিরুদ্দেশের পথে। হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। দুলিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল চরাচর। আমরা দুটি যাত্রী পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম সেই তরণীতে। এখন বৃষ্টি থেমে প্রশান্ত সে সমুদ্র। বহু দূরের কোন বাতিঘর থেকে যেন চোখে এসে পড়ছে অনুজ্জ্বল এক আলোর ইশারা।

ঝিন্নি আর আমার জীবনে আরও একটি বছর পার হয়ে চলে গেল। নাগ্গর থেকে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে ঝিন্নি মানালীতে। ইতিমধ্যে ভ্যালি আর পীরপাঞ্জালের দিকে মুখ করে তৈরি হয়েছে ঝিন্নির বহু আকাঙিক্ষত স্টুডিও।

বসন্তকাল। সেই সাদা আর গোলাপী আভার ফুলে ভরা ডাল। ঝিন্নি এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে পাগলের মত রঙের সাগরে চোখ ডুবিয়ে বসে আছে। ছবির পর ছবিতে ভরে যাচ্ছে স্টুডিও। নানা মিডিয়ামে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা। একটি ছবি শেষ হবার আগে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঝিন্নির পেছনে দাঁড়িয়ে একদিন আমি ওর ছবি আঁকা দেখছিলাম। কি তদ্গত হয়ে ও ছবি আঁকছিল! যখন ছবিখানা সামনের দেয়ালে রেখে ও ধীরে ধীরে পেছিয়ে আসতে আসতে নিজের সৃষ্টিকে দেখছিল তখন হঠাৎ আমি পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও দারুণ চমকে উঠেছিল। আমার মনে হল ও নিজের মধ্যে এমন করে ডুবেছিল বলেই এতখানি চমক লেগেছিল ওর।

ও ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বড় বড় দুটো চোখ আমার চোখে রেখে বলল, তুমি কোনদিন আমার ছবি শেষ না হলে দেখবে না ছোটেসাহেব। কথা দাও, দেখবে না?

বললাম, কেন ঝিন্নি? আমার ওপর এ শাস্তির ব্যবস্থা কেন?

যে কোন সৃষ্টিকে কখনো সম্পূর্ণ না হলে দেখতে নেই। অবশ্য একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া।

আর কিছু বলার ছিল না, তবু বললাম, বিশ্বস্রষ্টা ফুলের কুঁড়িটি যখন সৃষ্টি করেন তখন কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সবেমাত্র শুরু। তাকে তো তিনি আড়াল করে রাখেন না দর্শকের চোখের সামনে থেকে।

ঝিন্নি আমার বুকে মৃদু একটা চাপড় মেরে বলল, তুমি কি বোকা ছোটেসাহেব। কুঁড়ি অসম্পূর্ণ সৃষ্টি হতে যাবে কেন? কুঁড়ি তো কুঁড়ি হিসেবেই সম্পূর্ণ। তখন নাই বা ফুটল সে। আচ্ছা শোন, বিয়ের আগে পিন্‌ঝি বলে মেষপালক গদ্দীদের একটি মেয়ের ডেলিভারী করেছিলে, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার?

থাকবে না কেন।

তুমি যখন টাট্টু নিয়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছিলে তখন পিন্‌ঝি বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে পাহাড়ী চড়াই

ভাঙছিল। তুমি ফিরে এসে বলেছিলে, মা আর শিশুর ঐ ছবি অসাধারণ। ওখানে কি মিষ্টি বাচ্চাটা সম্পূর্ণ নয়?

হার মানছি ঝিন্নি।

ও অমনি হেসে বলল, অত তাড়াতাড়ি হার মেনে নাও কেন ছোটেসাহেব?

আমিও হেসে বললাম, বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, যুক্তি অকাট্য হলে মাথা পেতে স্বীকার করে নিই। সেখানে হেরে গিয়ে দুঃখ নেই।

ও আমার বুকে (জামার ওপরেই) একটা চুমু খেয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তুমি কি ভাল। ঠিক এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি।

এত ভালবাস, তবুও তোমার অসম্পূর্ণ ছবি দেখাবে না?

তোমাকে ভালবাসি বলেই তো দেখাব না। ঠাকুরঘরে ফুল, চন্দন, নৈবেদ্যের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে তবেই তো আমরা ঈশ্বরকে ডাক দি।

আবার হার হল আমার।

ঝিন্নি এবার আমার কোমর জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে তার ছবির কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখ, যত খুশি চেয়ে চেয়ে দেখ।

আমি ওর ছবির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ও বলল, কি, কেমন দেখলে?

মনে হল, আশ্চর্য এক অন্ধকার জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ও আমার কথার ধরণ দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে ফিরল।

তারপরই আমাকে ঠায় চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠেলা দিয়ে বলল, যাও তোমাকে আর আমার ছবি দেখতে হবে না।

আমি ঝিন্নির অসমাপ্ত ছবি না দেখেই বেরিয়ে এসেছিলাম। অবশ্য সেই দিনই বাইরে এসে ঝিন্নি আর আমার ভেতর একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। আমি খোলা মনেই বলেছিলাম, তোমার সবকটা ছবিই আমি দেখব, তবে শেষ তুলির টান পড়ে যাবার পর। আর এইটাই ঠিক ঠিক দেখার নিয়ম।

সত্যি, রাগ করে বলছ না তো?

একটুও না।

ঝিন্নি আমাদের কোয়ার্টার অব্দি সঙ্গে সঙ্গে এল। পথে একটি সুন্দর কথা ও বলল।

কোনদিন ছোটেসাহেব আমাকে দেখেছ, নিজেকে যেমন তেমন করে সাজিয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি? না, মনে হয় তুমি চেষ্টা করলেও তেমন একটা দিনের কথা স্মরণ করতে পারবে না। যাকে ভালবাসি তার কাছে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর করে নিবেদন করতে হয়।

ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, তবু কি মহিমা তার। একেবারে যেন নয়নভোলান রূপে এল। ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় কি শোভা! মখমল সবুজ পাতার ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা আর হালকা পিঙ্ক ফুলের অজস্র সমারোহ। বাতাসে ঠাণ্ডার উপভোগ্য আমেজ। নীচের ভ্যালিতে শুরু হয়েছে গম তোলা।

সন্ধ্যা সকাল, বিকেল দুপুরে কোন সময়েই গানের বিরতি নেই। ফসল কাটতে কাটতে গান করছে কুলু রমণী। ফুলে ভরা আপেলের বাগানে, সিডার বনের আড়ালে, কোন সঙ্গীতমুখর কুহলের ধারে বসে গান গাইছে প্রেমিক-প্রেমিকা।

বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় দলে দলে মেয়ে পুরুষ নাচে গানে কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণ মাৎ করে দিচ্ছে। এ সময়টা বসন্ত উৎসব সারা কুলু জুড়ে।

একটা এগজিবিশানের আয়োজন করা হল। ঝিন্নির বসন্ত-সমাগম সিরিজের প্রায় পঁচিশখানা ছবির প্রদর্শনী। বসন্ত আসার অনেক আগে থেকেই অবশ্য সে আসে, সে আসে, ভাবখানা গুঞ্জন করছিল ঝিন্নির মনে। আর তখন থেকেই ছবি আঁকার শুরু। শীতে স্টুডিওর ভেতর রুম হিটার জ্বালিয়ে কাজ

করে গেছে ঝিন্নি। শীতের ভেতরেই দেখেছে বসন্তের স্বপ্ন। দিবসরজনী শিল্পী ঝিন্নি বসন্তের ভাবনায় ভরপুর।

আমি দুপুরে কাজ না থাকলে আমার দোতলার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে জানালা খুলে দি। আমাব কোয়ার্টারের ঠিক একধাপ নীচের পাহাড়ে রাস্তার ওপারে ঝিন্নির স্টুডিও। পাইন বনের ছায়ায় কাঠ আর মোটা গ্লাস দিয়ে তৈরি ঘব। ভেতরে কমলা রঙের স্ক্রীন টানা। কেবল ভ্যালির দিকটাই খোলা। ও বসে বসে কাজ করে, আমি ওকে দেখতে পাই না। দুজনের ভেতর কমলা রঙের ওই স্ক্রীনেব আড়াল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কাজের ফাঁকে ঝিন্নি পর্দা সবিয়ে তাকালে আমি ওকে দেখতে পাই। ও ওর সুন্দর হাতখানা ভারী সুন্দর ভঙ্গীতে নাড়তে থাকে। আমি হয়ত পাশে পড়ে থাকা কাপখানা তুলে চুমুক দেবার ভঙ্গী করে ওর কাছে জানতে চাই, বিকেলের চায়ে ও কোয়ার্টারে আসছে কিনা।

ও হাতের পাতা দোলালে আমি বুঝে নি, চা যাবে শিল্পীর স্টুডিওতে। মুখখানা দ্রুত ওপর নীচ করলে বুঝি, এখন কাজে ক্লান্ত, তাই কাজ ছেড়ে আসবে বিকেলের চায়ের আসরে যোগ দিতে।

আমার কোয়ার্টারে বিকেলের চা-পর্বে জোটে জুলিয়েন। কোন কোন দিন বালু আসে তার বাচ্চাটাকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে। একটা দারুণ সুইট পুতুলের মত। আমার কোয়ার্টার সংলগ্ন ডিসপেনসারীতে বাচ্চাটা জন্ম নিয়েছে। জুলিয়েনের অনুরোধে আমি আর ঝিন্নি ওর ডেলিভারীর দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছিলাম। দারুণ হেলদি বেবী হয়েছে। আমার তত্ত্বাবধানে ঝিন্নি এখন একজন ওস্তাদ ধাত্রী। কিন্তু ডিসপেনসারী থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে যেদিন বালু বাড়ি গেল সেদিন রাতে বিছানায় আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ঝিন্নির সে কি কান্না।

আমি যত ওব মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলি, কি হযেছে সোনা, কি হয়েছে তোমার?

ও কতক্ষণ কথার কোন জবাব না দিয়ে মুখ গুঁজে শুধু কাঁদল।

একসময় আকুল হয়ে বলল, আমার কোলে কোন শিশু নেই কেন ছোটেসাহেব? পিন্‌ঝির বাচ্চাটাকে বুকে জড়ালাম কদিন, সে চলে গেল। বালুর বাচ্চাটাও ঠিক তেমনি করে চলে গেল। আমি কি নিয়ে থাকব?

আবার কান্না। আমার কেবল তাকে অনাগত শুভ আবির্ভাবের আশ্বাস দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

তারপরই স্টুডিও নিয়ে মাতাল ঝিন্নি। চাকরী ছেড়ে হোলটাইম আঁকিয়ে। এখন স্টুডিওই ওর ধ্যান জ্ঞান। সারাদিন নিজের সৃষ্টি নিয়ে মেতে আছে।

ওর এগজিবিশানের ব্যাপারে পুরোপুরি মাথা গলিয়েছে জুলিয়েন। তার পরিকল্পনাতেই ঝিন্নির এগজিবিশানের স্থান নির্বাচন হয়েছে। বিরাট বাগানওয়ালা বেনন পরিবারের দু'নম্বব হোটেল-বাড়ি জুলিয়েন ছেড়ে দিয়েছে এগজিবিশানের জন্যে।

ঝিন্নি বলেছিল, পনের দিন এগজিবিশান চললে আপনার হোটেল ভাড়া দিতে আমি যে ফকির হয়ে যাব জুলিয়েন সাহেব।

জুলিয়েন তার স্বভাবসিদ্ধ মাথা নেড়ে বলেছিল, ডাক্তার দেবে।

ঝিন্নি হাত মুখ নেড়ে উত্তর করেছিল, তাহলেই হয়েছে। বউ যদি পনের দিনে এতগুলি মুদ্রা খবচ করে তাহলে ডিসপেনসারী ছেড়ে আপনার বন্ধু বনবাসে চলে যাবে।

আমি একান্তে পেয়ে জুলিয়েনকে বলেছিলাম, সবে সিজন শুরু হল আর তুমি এমন একটা বেহিসেবী কাণ্ড বাধালে! কতগুলো টাকা লোকসান দিতে হবে বল তো?

ও অমনি বলল, জুলিয়েন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে ডাক্তার। সে লোকসান দিতে নামেনি। সারা দেশবিদেশ ঝেঁটিয়ে এখন ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করবে। তাদের হাতে অঢেল টাকা। দশ টাকা করে প্রদর্শনী ফি ধার্য করলে অনেক টাকা উঠে আসবে।

একটু থেমে আবার বলল, আর এটা বুঝছ না কেন ডাক্তার, কত বড় একটা পাবলিসিটি হবে এতে। আমাদের হোটেলের তো বটেই, সারা কুলু ভ্যালির।

বললাম, তোমাদের দুজনের প্ল্যান প্রোগ্রাম আমার বোঝার অতীত।
জুলিয়েন অমনি বলল, বুঝে কাজ নেই তোমার, শুধু দেখে যাও।

ইতিমধ্যে জুলিয়েন আর ঝিন্নি ঘুরে এল সিমলা থেকে। ঝিন্নি তার আর্ট কলেজের দু'চারজন অধ্যাপককে এগজিবিশান দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এল।

ঝিন্নি ফিরে এলে ওর ভেতর বেশ একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। ওদের সময়ের একজন খুব নামকরা অধ্যাপক, যিনি সম্প্রতি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন, তিনি নাকি উদ্বোধনের দিন আসতে রাজি হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সে সময় দিল্লী থেকে তাঁর বিশেষ পরিচিত এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের এক সেক্রেটারী আসছেন ছুটি কাটাতে সিমলা। তিনি কথা দিয়েছেন, ঐ সময় তাঁকে নিয়ে এসে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করাবেন।

ঝিন্নির উত্তেজনার কারণ আছে বই কি। সে এতটা প্রত্যাশা করে নি।

এক রাতে ঝিন্নি আমাকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা ছোটেসাহেব, কি করা যায় বল তো? ভারী একটা ভাবনায় পড়ে গেছি।

কি এমন ভাবনা?

এই যে আমার প্রফেসার আর সেক্রেটারী সাহেব আসবেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা কি করি। জুলিয়েনকে এ নিয়ে আবার বলতে ইচ্ছে করছে না। অথচ ওঁদের গভর্ণমেন্ট গেস্ট হাউসে সরাসরি তুলে দিতেও সংকোচ হচ্ছে। ওঁরা তো আমার জন্যেই আসছেন। আমি দুদিন ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, কিন্তু কূলকিনারা কিছুই পাচ্ছি না।

এই প্রথম আমি ঝিন্নিকে আমাব অপরিচিত একটা রূপে দেখলাম। আঘাতটা অভাবিত ছিল, তাই বুকে এসে বাজল। ঝিন্নি তার নিমন্ত্রিত অতিথিদের কোথায় এনে তুলবে তাই নিয়ে দুদিন ভেবেছে। অথচ সে এর ভেতর একবারও আমাকে বলার সুযোগ পায়নি। ঠিক তাও নয়, আমাকে না বলে কোন কিছু করা যায় কিনা তাই হয়ত ভেবেছে। তার নিশ্চয় মনে হয়েছিল দু'চারজন ভি. আই. পি-র ঝামেলা আমি কিভাবে নেব। শেষে কোন কিছু উপায় দেখতে না পেয়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে।

আমি নিজের আঘাতটা ওকে বুঝতে না দিয়ে বললাম, এটা এমন কিছু একটা সমস্যা বলে আমাব মনে হচ্ছে না। এ নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামিয়ে তুমি এগজিবিশানের ছবিগুলো কিভাবে সাজাবে তাই ভাব।

ঝিন্নি আমার কথায় ভরসা পেল না।

কি বলছ তুমি, মাথা ঘামাব না। কারা আসছেন বুঝতে পারছ তো।

আমি আরও আঘাত পেলাম। ঝিন্নির এ ধরণের উত্তেজনার কারণ কি। যে সমৃদ্ধ মন নিয়ে এতকাল ওকে আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছি হঠাৎ তার ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত হলাম। একি ঝিন্নির এক ধরণের হীনমন্যতা! ভাবতে গিয়েও মনে মনে বড় কষ্ট পেলাম।

তবু বললাম, হয়ত অনেক বড় মাপের মানুষ ওঁরা, কিন্তু আমাদের এই ছোট ঘরে তাঁদের যদি এনে তোল তাহলে যত্নের অভাব হবে না, এটুকু অন্তত বলতে পারি।

ও কোন কথা বলল না কিন্তু দারুণ রকম একটা ভাবনার হাত থেকে যে নিষ্কৃতি পেল তা বুঝলাম যখন ও অন্ধকার বিছানায় আমার হাতটাকে জোরে চেপে ধরে রইল।

ব্যবস্থা হল ঝিন্নির স্টুডিওতেই। সিমলা থেকে ওর অধ্যাপকের শেষ চিঠিতে জানা গেল, ওঁরা সপরিবারে আসছেন না। কেবলমাত্র দুই পরিচিত বন্ধুতেই আসছেন।

আমি আমাদের কোয়ার্টারের দোতলার হলঘরে ওদের কয়েক জনের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম কিন্তু চিঠিটা পাবার পর প্ল্যানটা বদলে গেল। স্টুডিও সংলগ্ন রুমে দুজনের থাকবার খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া ওখানকার বাড়তি আকর্ষণ, জানালার পর্দা সরালেই বহুদূর বিস্তৃত উপত্যকা ও পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ার চোখ জুড়ানো শোভা।

অবশ্য খাবার দাবার সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের কোয়ার্টার থেকেই। বালুকে জুলিয়েন পুরোপুরি এই খাবারের চার্জেই রেখেছে।

ঝিন্নিকে বললাম, নতুন ব্যবস্থাটা তোমার মনঃপূত হয়েছে তো?

দারুণ। এ সব পরিকল্পনাতে তুমি দেখছি মাস্টার।

ঝিন্নি হয়ত সহজভাবেই কথাগুলো আমাকে বলল, কিন্তু আমার কানে ওর কথাগুলো শোনাল পিঠ চাপড়ানোর মত।

একটা বিষয়ে দেখলাম, ঝিন্নি আমার প্ল্যানকে মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য না দিলেও আমার কিছু বলার ছিল না।

ও ছবি সাজানোর ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, প্রদর্শনীটার নাম দাও 'বসন্ত-সমাগম'। প্রবেশ দ্বারের ওপরে বড় ক্যানভাসে আঁকা ছবিখানা প্লেস কর। সাদা আর পিঙ্ক রঙ ছড়ানো ছবিতে বসন্তের পুষ্পিত ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। ঐ ছবির নামকরণটাও আমি করে দিয়েছিলাম, 'পুষ্পিত ব্যাকুলতা'।

তারপর ডাইনে বাঁয়ে দুখানা করে চারখানা ঘর। বাকী চব্বিশখানা ছবির বারখানা গেল একদিকে আর বারখানা অন্যদিকে। এ ছবিগুলোর নির্বাচনেও আমি কিছুটা মাথা ঘামিয়েছিলাম।

একদিকে বসন্ত-প্রকৃতির ছবি, অন্যদিকে বসন্তের মানুষ।

যেমন, প্রকৃতি পর্যায়ে রয়েছে একটা ছবি, ভাসমান সাদা একখণ্ড মেঘ নীলাকাশের বুকে। ঐ সাদা মেঘের কোথাও কোথাও লেগেছে গোলাপী রঙের আভা। মেঘটি উড়ে আসছে উপত্যকার দিকে। ঠিক যেন প্রেমের দেবতা মদন বসন্তের বার্তা নিয়ে নেমে আসছে ধরাতলে। ছবিটির নাম 'বসন্তের দূত'। অন্য একটি ছবি কুলুর আপেল-বাগিচা। সাদা আর পিঙ্ক ফুলের ডালগুলো প্রসারিত-বাহু নর্তকীর মত আশ্চর্য নৃত্য ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এটির নামকরণ করা হয়েছে, 'বসন্ত-রাস'।

এমনি বসন্তের নানা ফুল, পাখি নিয়ে সাজান হয়েছে প্রকৃতি-পর্বের বারখানা ছবি।

অন্যদিকে বসন্তের নরনারী পর্বে বারখানা নির্বাচিত ছবি। বসন্তের ক্ষেতে প্রথম গম কাটছে মেয়েরা। একহাতে কাস্তে, অন্যহাতে গমের আঁটি। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে খুশির হাসি। ছবিটির নাম, 'বসন্তের দান'। মেষচারক গদ্দীরা শীতের শেষে ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে উঁচু তুষার-পর্বতের দিকে। নামকরণ করা হয়েছে, 'বসন্ত-উৎসবের যাত্রী'। একটি ছবির নাম 'মধু মিলন'। নির্জন পাহাড়ের কোলে একটি পুষ্পিত গাছের তলায় প্রেম নিবেদন করছে পাহাড়িয়া তরুণ-তরুণী। এমনি বসন্ত উৎসবের নৃত্যমত্ত তরুণ-তরুণীর নাম রাখা হয়েছে 'ব্যাকুল বসন্ত'।

যদিও সব কটি ছবি বসন্তকে ঘিরে তবুও ছবিগুলিতে কোন একঘেয়েমি নেই। ঝিন্নি বিভিন্ন মিডিয়ামে ছবি এঁকে দর্শকের দৃষ্টিকে শেষ পর্যন্ত পিপাসার্ত করে রেখে দিতে পেরেছে।

নির্দিষ্ট দিনে ছোট্ট মানালী শহরটিতে জনসমাবেশ কম হল না। জুলিয়েন বিভিন্ন হোটেল এবং গভর্ণমেন্ট রেস্টহাউসে সুন্দর চিত্রিত কার্ড বিলি করেছিল। দলে দলে ট্যুরিস্ট আসতে লাগল এগজিবিশানে।

সন্ধ্যায় 'হোটেল পীরপাঞ্জাল'-এ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন এডুকেশান সেক্রেটারী মিঃ সাকসেনা। তাঁর ছোট্ট ভাষণে তিনি এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন।

তাঁর ভাষণ শেষ হলে উৎসবের আমন্ত্রিত অতিথি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর. কে. শর্মা দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা আজ যে শিল্পীর ছবি দেখার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন, তিনি একসময় আমার ছাত্রী ছিলেন। আমি এমন একটি প্রতিভাময়ী ছাত্রী পেয়েছিলাম বলে আজও গর্ববোধ করি। নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন এবং নব নব ভাবনার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণের পথেই আসে প্রতিটি শিল্পীর সার্থকতা। তারপর চিন্তার সর্বকালব্যাপী বিস্তারের সূত্র ধরেই আসে একজন রূপদক্ষের কালজয়ী প্রতিষ্ঠা। আমার বিশেষ প্রিয় ছাত্রীটি বয়সে তরুণ। তাঁর সামনে এখনও পথ দিগন্তের দিকে প্রসারিত। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এখনও তাঁকে বহু পথ অতিক্রম করতে

হবে। আমি তাঁর মধ্যে যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও ভাবসম্পদের পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি তাঁর সিদ্ধি সম্বন্ধে আশাবাদী।

আজ যে ছবিগুলি তিনি আমাদের দৃষ্টির উৎসবে পরিবেশন করতে চলেছেন, সেগুলি কাব্যধর্মী। ঋতুরাজ বসন্তের বিজয় বৈভবই এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু।

আমি আমার পরম প্রিয় ছাত্রীটিকে তাঁর কাজের মাধ্যমে চিনে নেবার জন্য সম্মানীয় দর্শকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

দীর্ঘদেহী সুপুরুষ মিঃ শর্মা অনুর্ধ্ব পঁয়তাল্লিশটি বসন্ত হয়ত পার করেছেন। সুপ্রশস্ত ললাটের দুদিকের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। শিল্পীর চেহারা, শিল্পীর ভাব, শিল্পীর ভাষা আর আচরণ। যে কোন মানুষের দৃষ্টির সামনে যথার্থই তিনি একজন আকর্ষণীয় পুরুষ।

বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে দর্শকরা ঘরে ঢুকে ছবি দেখতে লাগলেন। সামনে জুলিয়েন আর ঝিন্নি। মিঃ সাকসেনা ঝিন্নিকে ছবি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন করছেন। ঝিন্নি তাঁকে সব কিছু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। মিঃ শর্মা আপন মনে ছবি দেখে চলেছেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের ছবি দেখা শেষ হলে জুলিয়েন ওঁদের পাশের ছোট্ট একটি ঘরে নিয়ে ঢুকল। ঐখানেই ওঁদের সান্ধ্য চায়ে আপ্যায়িত করবে জুলিয়েন। প্রদর্শনীর ঘর আর ঐ ছোট্ট ঘরখানার মাঝে একটি দরজা। সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে দরজায়।

ঝিন্নি পেছন ফিরে হঠাৎ আমার মুখোমুখি হয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি রইলে ছোটেসাহেব, আমি ওঁদের দেখছি।

মাথা নেড়ে বললাম, নিশ্চয়। দেখব বই কি। তুমি নিশ্চিন্তে যাও, আমি আছি।

ঝিন্নি চলে গেল। আমি দর্শকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাদের মন্তব্যগুলো শুনতে লাগলাম। তারা ঝিন্নির রঙের ব্যবহার, রেখার বলিষ্ঠতা, বিভিন্ন মিডিয়ামে ছবি আঁকার দক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। আমি দর্শকদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একসময় ঐ ছোট্ট ঘরখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। অতিথিরা ভেতরে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। আমার কানে এল মিঃ সাকসেনার একটি মন্তব্য, আপনার ছবির নামকরণ আমার খুবই ভাল লেগেছে।

আমি সেই মুহূর্তে ঝিন্নির একটি উত্তর আশা করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মন্তব্য শুনলাম মিঃ শর্মার, তোমার এই ছবি সাজানোর পরিকল্পনাটা আমার খুবই ভাল লেগেছে।

এবারও ঝিন্নি নীরব।

সামান্য সময় বিরতি। হঠাৎ জুলিয়েনের গলা শোনা গেল, এই মুহূর্তে একজন আমাদের ভেতরে নেই, তার ভূমিকা এ ব্যাপারে কম নয়।

এবার কিন্তু ঝিন্নি জুলিয়েনকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার স্বামী ডাক্তার মুখার্জী এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং দক্ষ। সাজানোর সমস্ত পরিকল্পনাটা তাঁর।

মিঃ শর্মা বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। ডাক্তার মানুষের এসব খেয়াল প্রশংসনীয়। তিনি কোথায়? একসঙ্গে একজিবিশান হলে ঢুকলাম বলে মনে হল।

ঝিন্নি বলল, এক্সকিউজ মি, আমি এখুনি আসছি।

ঝিন্নির চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরে এসে পাশের ঘরে দর্শকদের সঙ্গে মিশে গেলাম।

ঝিন্নি একসময় আমার পাশে এসে বলল, তোমার সঙ্গে ওঁরা কথা বলতে চাইছেন। তোমার নামকরণ ওঁদের দারুণ ভাল লেগেছে।

বললাম, আমাকে আবার ওর ভেতর টানাটানি কেন? তোমাদের ছবির রহস্য আমি কিছুই বুঝি না।

ঝিন্নি আমার হাতের আঙুলে চাপ দিয়ে বলল, দুষ্টুমি করতে নেই ছোটেসাহেব। প্লিজ চল একবারটি।

এইখানেই আমি ঝিন্নির আন্তরিকতার কাছে হেরে গেলাম। এতক্ষণ আমার মনে যে মেঘ জমে উঠেছিল তা একটা 'হঠাৎ হাওয়া'র ধাক্কায় ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চায়ের আসরে ঢুকতেই মিঃ শর্মা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করে বললেন, আপনি তো দারুণরকম প্রতিভাবান মশাই। লুকিয়ে থেকে কি গুণ লুকোতে পারবেন?

হেসে বললাম, আপনাদের শিল্পের প্রথম পাঠটিও আমার পড়া নেই। বিলিভ মি অর নট।

মিঃ শর্মা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আপনার নামকরণ আর ছবি সাজানোর পরিকল্পনা কিন্তু অন্য সাক্ষ্য দিচ্ছে ডাক্তার মুখার্জী।

আমি এবার বললাম, এটা আপনার ছাত্রীরই ভাবনা। স্বামী হিসেবে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করেছি মাত্র।

ঝিন্নি আমাকে কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, ও কথা বল না, এর পুরোপুরি কৃতিত্বটাই তোমার।

একটু আগে ওদের প্রশংসার উত্তরে ঝিন্নি তাহলে নিরুত্তর ছিল কেন? এখন ঝিন্নির এই সহজ সত্য প্রকাশের স্বাভাবিক ভঙ্গীটা আমাকে স্পর্শ করল।

বললাম, ছবি আপনাদের কেমন লাগল বলুন?

মিঃ শর্মা ঝিন্নির দিকে চোখ টিপে চেয়ে হাসলেন। বললেন, কবার প্রশংসা শুনতে চাও মিসেস মুখার্জী?

ঝিন্নি বলল, আপনি ছাত্রছাত্রীদের সব সময়েই উৎসাহ দিতেন। তাই আপনার প্রশংসাটা আমাদের প্রাপ্য বলেই মনে করে এসেছি। এবার আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে সত্যিকারের সমালোচনা শুনতে চাই।

মিঃ শর্মা হেসে বললেন, ওটা একান্তে হবে তোমার আমার ভেতর। সব ভদ্রলোকের সামনে কি একজন শিল্পীর বিরূপ সমালোচনা করা উচিত?

ঝিন্নি আনুনাসিক সুরে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই ছবিগুলো আপনার তেমন পছন্দ হয় নি।

মিঃ শর্মা অমনি বললেন, তোমার পরম নিন্দুক সমালোচকও একথা বলবে না। সামান্য যেটুকু ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে তা আমি এক সময় আলোচনা করব।

ঝিন্নি বলল, নিশ্চয়ই স্যার। মানালী ছেড়ে যাবার আগে কিন্তু করে যেতে হবে।

মিঃ সাকসেনা এতক্ষণ সকৌতুকে গুরু শিষ্যার বাক্যালাপ শুনছিলেন। তিনি বললেন, আমার কিন্তু ছবিগুলো ভীষণ ভাল লেগেছে। ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আমি যেন ফেয়ারী ল্যান্ডে ঘুরছি।

ঝিন্নি বলল, দারুণ সার্টিফিকেট! দয়া করে মন্তব্যের খাতায় কথাটা লিখে দেবেন স্যার।

মিঃ সাকসেনা এবার যে প্রস্তাবটি করলেন তার জন্যে কেউই প্রায় প্রস্তুত ছিলেন না। আমার মনে হল, কথাটা শুনে ঝিন্নি রীতিমত উত্তেজনায় কাঁপছে।

মিঃ সাকসেনার প্রস্তাব হল গভর্নমেন্টের পর্যটন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কুলু ভ্যালির ওপর দিল্লীতে এই ছবির একটি প্রদর্শনী হোক। তাতে গভর্নমেন্টের দারুণ একটা পাবলিসিটি হবে। মে-তে ভেকেসান। তখন তাঁর পক্ষে ভাল একটা স্কুল বা কলেজে প্রদর্শনীর স্থান করে দেওয়া অসম্ভব হবে না। তিনি এ সম্বন্ধে পর্যটন বিভাগের সঙ্গে কথা বলে জানাবেন।

মিঃ সাকসেনার কথার পরে কথা বললেন মিঃ শর্মা, তোমাকে কুলুর জনজীবনের ওপর আরও কিছু ছবি এঁকে ফেলতে হবে মুখার্জী। বাঘের গায়ের ডোরার মত কুলুর আশ্চর্য সব পাহাড়ী ক্ষেত, সেখানকার কর্মরত সব নরনারী। তাছাড়া ভেড়াচারকদের আরও কিছু ছবি চাই পাহাড়ের নানা পটভূমিতে। এখানকার তুষার, নদী, অরণ্যেরও ছবি থাকা দরকার। পাহাড়ী ফুল, পাখি, এরাও বা অনুপস্থিত থাকবে কেন। সব মিলিয়ে তোমার ছবিতে রূপবতী কুলুর সামগ্রিক চেহারাটা ফুটে উঠুক। অবশ্য সব কিছু ছবি হবে, বিজ্ঞাপন নয়।

একটু থেমে বললেন, তোমার কাজের স্পীড দারুণ। তুমি চেষ্টা করলে মে-র এন্ড নাগাদ এমনি আরও কিছু ছবি যোগ করতে পারবে।

মিঃ সাকসেনা বললেন, আমি দিল্লী পৌঁছে ব্যবস্থা পাকা হলে চিঠি দিচ্ছি।

সত্যি অসাধারণ ক্ষমতা ঝিন্নির। দিল্লী এগজিবিশানে ও আরও কয়েকখানা উৎকৃষ্ট জাতের ছবি যোগ করল।

আমি দিল্লী এগজিবিশানের উদ্বোধন দিনে ঝিন্নির একান্ত পীড়াপীড়িতে হাজির ছিলাম। আমার কয়েকটি সিরিয়াস রোগীকে ছেড়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। তবু যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে ঝিন্নির অভিমানকে শান্ত রাখার জন্য আমাকে ঐ বিশেষ দিনটিতে থাকতে হয়েছিল। জুলিয়েন এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হতে পারে নি। সে মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিল তার জরুরী ব্যবসায়ের ব্যাপারে। তবে কথা দিয়েছিল, এগজিবিশানের শেষ দু'তিনটে দিন সে দিল্লীতে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল উদ্বোধনের দিনে। মিঃ সাকসেনার স্ত্রী টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। পারস্পরিক পরিচয়ের সময় মিসেস সাকসেনা হঠাৎ আমার সঙ্গে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, আমাদের আজকের প্রদর্শনীর প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীমতী মুখার্জীর অত্যন্ত সৌভাগ্যবান স্বামী।

মিসেস সাকসেনার কথায় সবাই হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। তাঁরা এইভাবে আমাকে সংবর্ধিত করলেও আমার মনে হল এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর আমার আত্মসম্মানের কোমল জায়গাটায় এসে আঘাত করল।

আমি ঠিক এ ধরণের তথাকথিত উঁচু সমাজটাকে চিনি না। শুনেছি, এ সব সমাজে মানুষের সম্মানের মূল্য নির্ধারিত হয় টাকার মূল্যে। মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে সাধারণত সেটা নির্ধারিত হয় না। এ সমাজের আচার আচরণ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

করতালির পর অনেক ক'টি হাত এগিয়ে এসেছিল আমার হাতের সঙ্গে মিলিত হতে, কিন্তু আমি ওদের হাত স্পর্শ না করে করজোড়ে আমার ভদ্রতা রক্ষা করেছিলাম। ওঁরা হয়তো সেই মুহূর্তে আমাকে একজন বিশিষ্ট গাঁইয়া বলে ভেবে নিতে পারেন, কিন্তু তাতে আমার দিক থেকে অন্তত বিন্দুমাত্র অনুশোচনার কারণ ঘটে নি।

সাংবাদিকেরা নানা ধরণের প্রশ্ন করতে লাগলেন ঝিন্নিকে।

ঝিন্নি সব সময়েই অত্যন্ত গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারে। কথা বলার সময় ওর একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে, সেটা ওর সামান্য অসংবদ্ধ দাঁতের ভারী সুন্দর একটা হাসি।

উপস্থিত সকলেই ঝিন্নির মুখের লাবণ্য ও চোখের দীপ্তিতে যে দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কলাসমালোচকদের কাছে তার শিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিল ঝিন্নি। এরপর জনৈক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস মুখার্জী, ছবি আঁকার ব্যাপারে আপনি কার কার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন?

আমার প্রথম প্রেরণা এসেছে আমার জন্মস্থান অপরূপা কুলুর কাছ থেকে। তারপর আমার শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছে পিতাজীর উৎসাহে। এখন আমি উৎসাহ বলুন, প্রেরণা বলুন, সবকিছু পাচ্ছি, আমার স্বামীর কাছ থেকে।

আবার প্রশ্ন, আপনার স্বামী কোথায় যুক্ত আছেন?

উনি ডাক্তার। নিজের চেম্বার রয়েছে।

ওঁর আর আপনার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা, অসুবিধে হয় না? মানে ডাক্তার মুখার্জী কোনরকম অসুবিধে বোধ করেন না?

এবার ঝিন্নি হেসে আমার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, দয়া করে এ প্রশ্নটা ওঁকে করুন।

ঝিন্নির কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

আর একজন বললেন, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করব।

স্বচ্ছন্দে।

আপনাদের বিয়েটা কি ভালবাসার?

কি মনে হয়?

ঐ ভেবেই তো প্রশ্নটা করলাম।

আপনার অনুমান মিথ্যে নয়।

অন্য একজন প্রশ্ন করলেন, ছবি আঁকা ছাড়া আপনার আর কি হবি আছে?

সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নির উত্তর, সময় খুঁজে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গল্প করা।

আবার হাসির রোল উঠল।

এবার প্রশ্ন, বিয়ে আপনাদের ক'বছর হল?

ফোর্থ ইয়ারে পড়ল।

আপনাদের কোন ইস্যু?

আমি লক্ষ্য করলাম, ঝিন্নি মুখে কিছু না বলে শুধু মাথাটা ঝাঁকাল। তার দারুণ খুশি খুশি মুখের ওপর সেই মুহূর্তে একটা ছায়া নেমে এল। অন্য কেউ না বুঝলেও আমার দৃষ্টি এড়াল না।

দুদিন মানালীতে ফিরে এসেছি, কিন্তু মন বসছে না কাজে। ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু হঠাৎ কেউ পর্দাটা সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ে না। ভাগ্‌তু সারাদিন ওটার পাহারায় থাকে। রাতে কাজকর্ম শেষ করে আমি ওখানে ঘুমুতে যাই। আমি ঝিন্নির ছবি আঁকার ঘরখানাতে চুপচাপ বসে থাকি। রঙ তুলির বাক্সগুলো অকারণে নাড়াচাড়া করি। মনে হয়, ঝিন্নির হাতের ছোঁয়া পেলাম। একসময় আলোটা নিভিয়ে দি। অমনি সারা উপত্যকাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গত রাত আর আজকের রাতে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। ভ্যালিটা তরল জ্যোৎস্নার জলে একটা হ্রদ বলে মনে হচ্ছে।

কতদিন এই ভ্যালি পার হয়ে আমি আমার টাট্টু নিয়ে ওপারে গেছি। গম পেষা কলের এক ধাপ নীচে একটা পাঙাড় গাছে টাট্টুটাকে বেঁধে রেখে মসৃণ বড় একটা পাথরের ওপরে বসে প্রকৃতির কত ছবি, কত খেলা দেখেছি। আমার বাঁ দিকে উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেখেছি ক্ষেত থেকে গম কেটে মানুষ মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় ভেঙে উঠে চলেছে। কত শক্তসমর্থ ওরা। কি নিশ্চিত ওদের পদপাত। একটি মেয়ে গমের কল চালায়। গম ভাঙাতে দূর দূর থেকে লোক আসে। তারা চলে গেলে মেয়েটি কল বন্ধ করে কলঘরে চাবি লাগিয়ে পাশের পাহাড়ে নিজের কোঠির দিকে চলে যায়।

একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমি ভ্যালি পেরিয়ে সূর্যাস্তটা দেখব বলে টাট্টুতে করে আসছিলাম। এসে যথারীতি ঘোড়াটিকে গাছে বেঁধে রেখে আমার নির্দিষ্ট আসনে বসার জন্যে এসে দেখি, একটি থালায় কয়েকটি আস্ত ফল ও দুটো বেশ বড় আকারের মেঠাই রয়েছে। থালার সামনে মাজা ঝকঝকে গেলাস ভর্তি জল।

আমি তো দৃশ্য দেখে তাজ্জব। এ আবার কোন ব্যক্তি আমার জায়গাটি দখল করে ফলারের আয়োজনে ব্যস্ত।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। গেল কোথায় মানুষটা। নিশ্চয়ই পাহাড়ের ধারে কোন ঝর্ণায় হাত মুখ ধুতে গেছে। এসেই সূর্যাস্তের আগে ফলারে বসবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সূর্য প্রায় পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতে চলল তবু মানুষটার দেখা নেই।

হঠাৎ মাথার ওপরে গম পেষাই কলটা বন্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ পেষাই কলের কোঁক কোঁক আওয়াজটা পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে স্থানটাকে সরগরম করে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ কলটা বন্ধ হয়ে যেতেই চরাচব একেবারে চুপ হয়ে গেল।

আমি সেই রহস্যের উপচার সামনে রেখে উপকথার নায়কের মত কোন দত্যিদানার আগমন প্রতীক্ষা করছি এমন সময় পেছনে মৃদু পায়ের সাড়া পেলাম। ফিরে দেখি, গম কলের সেই মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

আমাকে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ও বলল, বাবুজী আপনার ভোগের জন্যে ওটুকু রেখে গেছিলাম, দেখছি আপনি এখনও মুখে তোলেন নি।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, এ খাবার আমার জন্যে?

হ্যাঁ, বাবুজী।

কিন্তু কেন? মানে উপলক্ষটা কি?

আজ আমার গম পেষা কলের প্রতিষ্ঠার দিন, তাই আপনার জন্যে সামান্য কিছু এনেছি।

হেসে বললাম, তাহলে তো নিশ্চয়ই খেতে হয়।

ও বলল, আজ কম পয়সার গম পিষে দি' বলে অনেক দূর দূর থেকে সব খদ্দের এসেছিল, তাই আপনার কাছে আর আসতে পারিনি।

বললাম, কিন্তু আমি তো রোজ আসি না। তুমি কেমন করে জানলে যে আমি আজ আসব, আর আমার জন্যে খাবার রেখে গেলে?

আমি কল ঘরে বসে আপনাকে টাট্টুতে করে ওপারেব পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাই এক ফাঁকে খাবারটা রেখে গেছি। কাজের চাপে বলতে আসতে পারিনি।

আমি ওর থালা থেকে একটা আপেল আর একটা মেঠাই তুলে নিয়ে বললাম, ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি হোক, আজ এই প্রার্থনা জানাই ঈশ্বরের কাছে।

মেয়েটি অমনি বলে উঠল, ওটুকু সব এখানে আমার সামনে বসেই খেতে হবে বাবুজী।

ওর কথায় এতখানি জোর ছিল যে আমি না বলে ওকে দুঃখ দিতে পারলাম না। ওর সামনে বসেই ফল আর মিষ্টি ফলার করে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল পেটে চালান করে দিলাম।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে ও থালা আর গ্লাস তুলে নিল। আমাকে বলল, বড় শান্তি পেলাম ডাক্তাব সাবকে ফলার করিয়ে।

আমি যে ডাক্তারী করি তা তুমি জানলে কি করে?

বালু আমার বন্ধু ছিল বাবুজী। ওর কোঠী তো ঐ নজদিগ। ওর বাবার কাছে মাঝে মাঝে আমরা তুলসীদাসজীর রামায়ণ শুনতে যেতাম। ওখানে আপনার কথা বহুৎ শুনেছি।

বললাম, বালুর যখন বিয়ে হয়নি তখন ওর ঐ বাড়িতে আমি কয়েক বারই গেছি। বালু তখন আমার ডিসপেনসারীতে কাজ করত।

আপনার দয়ার কথা বালু আমাকে সব বলেছে বাবুজী। জুলিয়েন সাহেবের সঙ্গে ওর সাদিটাও তো আপনি ঘটিয়ে দিয়েছেন।

বললাম, তুমি যার কাছ থেকেই শোন না কেন, কথাটা ঠিক নয়। জুলিয়েন নিজের ইচ্ছাতেই ওকে বিয়ে করেছে। আমি কেবল জুলিয়েনের ইচ্ছার কথাটাই ওদের জানিয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল, বাবুজী, মাপ করেন তো একটা কথা জানতে চাইব।

বল।

জুলিয়েন সাহেব কি বালুর সব কথা জেনে ওকে সাদি করেছিলেন?

সব জেনে। কিন্তু বালু সে কথা আজও জানে না। জুলিয়েন যে সব জেনেশুনে ওকে বিয়ে করেছে তা কখনও বালুর কাছে প্রকাশ করেনি।

মেয়েটি বলল, সত্যি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ জুলিয়েন সাহেব।

আমি বললাম, তুমি যখন সবই জান তখন এ কথাটাও জান যে আমার সঙ্গে বালুকে জড়িয়ে একটা কথা উঠেছিল?

আশেপাশের কয়েকখানা টিকায় ছড়িয়েছিল ডাক্তার সাব। কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিল, তবে বেশির ভাগ লোকই করেনি।

বললাম, যারা বিশ্বাস করেছিল, ব্যাপারটা মিথ্যে হলেও তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

এ কথা কেন বলছেন বাবুজী?

বলছি এইজন্যে যে সন্ধ্যে সকাল যেখানেই আমি ডেলিভারী কেসে গেছি সেখানেই বালু আমার

সঙ্গী হয়েছে। তাতে লোকের মনে আমাদের সম্বন্ধে যদি একটা ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েটি এবার একটু উত্তেজিত হয়েই কথা বলল, কিন্তু আমি তো জানি বাবুজী, বালু যে মা হতে চলেছিল সেটার জন্যে দায়ী বিদেশী একজন ট্যুরিস্ট।

তুমি জানলে কি করে কথাটা।

বালু আমাকে কোন কিছু বলতে বাকী রাখেনি। আপনার কাছ থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসার পর তার মাথাটা প্রায় বেঠিক হয়ে যায়। তখন সে জীবনটাকে নিয়ে সাধারণ মেয়ের মত খেলা করে বেড়াতে চেয়েছিল। তার ফলে ঐ বিদেশী লোকটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

বললাম, কাজ করতে করতে আপেল বাগানে পড়ে যাবার ফলে ওর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। আমি সে সময় সেবা করে ওর প্রাণ রক্ষা করেছিলাম মাত্র। আর তাইতেই আমার নামে বদনামটা রটে যায়।

পরে আমি বালুর মুখে এ সব কথাই শুনেছি বাবুজী। ও আক্ষেপ করে বলেছিল, আমার দোষে দেবতার মত মানুষটাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হল।

ও সব পুরোনো কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললাম, তুমি থাক কোথায়?

পাহাড়টার ওধারে।

অনেকখানি পথ তোমাকে যেতে হবে।

ও কিছু না বাবুজী, অভ্যেস হয়ে গেছে।

কে আছে তোমার বাড়িতে ?

খালি আমার মা।

এ গমের কলটা কি তোমাদের?

হাঁ বাবুজী। ওটা আমার পিতাজীর ছিল। এখন আমি চালাই।

বললাম, এখন আমি যদি তোমাকে কোন একটা প্রশ্ন করি তাহলে কিছু মনে করবে না তো?

না, না বাবুজী। আপনি যে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

তুমি বিয়ে করনি কেন?

আমি তো বিবাহিতা বাবুজী।

তবে যে তুমি বললে, খালি তোমার মা আছেন সংসারে।

সে কথাও ঠিক বাবুজী। বিয়ের এক বরষ যেতে না যেতেই আমার স্বামী মারা গেছে।

খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু ... কিন্তু ...।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কথাটা জেনে নিয়ে বলল, আমি আবার সাদি করিনি কেন তাই তো জানতে চাইছেন? আমি ব্রাহ্মণ নই, দাঘী সম্প্রদায়ের মেয়ে। আমার বিধবা বিয়েতে কোন বারণ নেই।

ও একটু থামল। অমনি বললাম, তবে? এক বছরের ভেতর যে বিয়ে শেষ হয়ে গেল তাকে মুছে ফেলে নতুন সংসার করতে বাধা কি ?

বাধা আর কেউ নয় বাবুজী, আমার মন।

তুমি কি একটা বিয়ের পরিণতি দেখে ভয় পেয়ে গেছ?

হাসল মেয়েটি। বলল, না বাবুজী, কথাটা আদপেই তা না। ও আমাকে ঐ এক বছরে এমন করে ভালবেসেছিল যে সারা মনটা আমার ভরে আছে।

কথাটা শুনে খুবই ভাল লাগল, কিন্তু তুমি কি সারা জীবন এই স্মৃতিটুকু নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে?

চেষ্টা করব বাবুজী।

শেষে যখন বয়েস বাড়বে, শক্তিতেও টান পড়বে, কোন মানুষকে সাহায্যের জন্যে তেমন করে কাছে পাওয়া যাবে না, তখন কি ঠিক সময়ে আর একটা সংসার না পাতার জন্যে অনুশোচনা আসবে না?

যখন আসবে বাবুজী, তখন নিজের মনের সঙ্গে একটা মোকাবিলায় বসা যাবে। এখন আমি একটা

সুন্দর স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই না।

বললাম, বড় ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। কি করতেন তোমার স্বামী?

বালবাচ্চাদের ইস্কুলে মাস্টার ছিল।

কি অসুখে মারা গেলেন?

ওর কোন অসুখ ছিল না ডাক্তারসাব।

তবে?

একটা দুষ্টু ছেলেকে খাদে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। তারপর খাদ থেকে তুলে ওর দেহখানাকে যখন ঘরে আনা হল তখন পাঠশালা ভেঙে ছেলের পাল ছুটে এল। মানুষটার জন্যে বাচ্চাগুলোর সে কি কান্না বাবুজী!

একটু থেমে মেয়েটি আবার বলল, একটা মানুষকে ভালবেসে দুধের বাচ্চাগুলো যদি এমন করে কাঁদতে পারে তাহলে আমি তার স্ত্রী হয়ে সারাটা জীবন তার জন্যে একটু ভালবাসার কান্না কাঁদতে পারব না? আর জীবন কতটুকু কাল বাবুজী, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটির কাছে হার মেনে নিয়ে বললাম, তোমার স্বামীর স্মৃতি তোমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাক, এই কামনা করি।

সূর্যাস্ত হয়ে সন্ধ্যা নেমেছিল। বললাম, যাবে কি করে?

ও বলল, ফিরে দেখুন, চাঁদ উঠেছে।

আমি পুব দিকে ফিরে দেখলাম, বড়সড় চাঁদটা সিডার বনের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

আজও তেমনি জ্যোৎস্নায় রহস্যময় মানালীর উপত্যকা। ওপরের গম পেষাই-এর ঘরখানা ছায়া ছায়া আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ও কি এখনও ওর স্বামীর স্মৃতিটুকু বুকে আগলে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। জানতে ভারী ইচ্ছে করে।

পরক্ষণেই মনে এল, কেন মনে এল জানি না, আমি যখন থাকব না তখন আমার ঝিন্নি কি আমার জন্যে এমন করে ভাববে।

চারদিন পরে জুলিয়েন আমার কোয়ার্টারে হাজির। ঝিন্নির খান তিনেক ছবি ও ওপরের ঘরে তুলে নিয়ে এসে যত্ন করে রেখে দিল। আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখে গেলেও কোন কথা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম না। কারণ জুলিয়েনের মেজাজ মর্জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও নিজের থেকে কোন কিছু বলতে শুরু করলে তবেই কথাবার্তা চালান যায়।

ছবিগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে আমার ইজিচেয়ারখানায় গা এলিয়ে বসে ও একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, বস।

আমরা দুজনে সিগারেট ধরিয়ে পাশাপাশি বসলাম।

দু'একটা টান মেরে ও বলল, এই তিনটে ছাড়া ঝিন্নির সব কটা ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে। না, না, ভুল বললাম, একখানা ছবি ঝিন্নি মিসেস সাকসেনাকে প্রেজেন্ট করেছে।

খুব ভাল, কিন্তু তোমাদের সেই উপহারদাতা শিল্পীটি কোথায়, তাকে তো দেখছি না।

জুলিয়েন বুক পকেট থেকে খামে বন্দী একখানা চিঠি টেনে বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

বললাম, খুব জরুরী? এখুনি পড়তে হবে?

পড়ই না।

আমি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম।

ঝিন্নি লিখেছে—আমার অনেক অনেক আদরের ছোটেসাহেব।

তুমি দিল্লী থেকে চলে যাবার পর আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমি জানি, তুমি কতকগুলি অসহায় মানুষকে ফেলে রেখে এসেছ, তোমাকে বেশিদিন আটকে রাখা চলে না।

ইতিমধ্যে ছবিগুলো দারুণভাবে প্রশংসা পেয়েছে কাগজে কাগজে। শেষের দুদিন দর্শকদের ভীড়

ঠেকান দায় ছিল। ভাগ্যিস জুলিয়েন সাহেব এসে পড়েছিলেন, তাই রক্ষে। ইতিমধ্যে বেশ দামেই বলব, ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। মিসেস সাকসেনার একটা ছবি খুব চোখে লেগেছিল, সেটা ওঁকেই প্রেজেন্ট করেছি। ওঁরা আমার জন্যে যা করেছেন তার ঋণ শোধ করা যায় না।

আজ একটা বিশেষ দাবী জানিয়ে তোমার কাছে এ চিঠি লিখছি। জানি না তুমি আমাকে কতদূর খেয়ালী ভাববে। মিসেস সাকসেনার ভাই গভর্ণমেন্টের পর্যটন বিভাগের উঁচু পদে কাজ করেন। তিনি মিসেস সাকসেনাকে নিয়ে কাশ্মীরে যাচ্ছেন। আমাকে ওঁরা নিয়ে যেতে চান। কাশ্মীরের ওপর যদি আমি এমন ধরণের কিছু কাজ করতে পারি তাহলে ওঁরা পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে এমনি আর একটা প্রদর্শনী অবশ্যই করবেন। সেটা পরে দিল্লী অথবা কাশ্মীর, যে কোন জায়গাতেই হতে পারে।

মিসেস সাকসেনার ভাই খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। ওঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি স্কেচ নেব, সঙ্গে সঙ্গে উনি কালার ফটোও নেবেন, পরে বড় করে ছবি আঁকার বেলায় আমার একটুও অসুবিধে হবে না।

এখন সব কিছু নির্ভর করছে তোমার অনুমতির ওপর। তুমি কুলু ফিরে যেতে বললে আমি তাই যাব। মনে কর না তাতে আমি দুঃখ পাব। তবে এত বড় একটা সুযোগ এসেছে বলেই তোমাকে সব কথা জানালাম। তুমি একখানা টেলিগ্রামে শুধু ইয়েস অর নো, লিখে জানাও।

কাশ্মীর গেলে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যাবে ফিরতে। টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় রইলাম।

—তোমার ঝিন্নি।

পুনশ্চঃ আমার তৈরি করা চার্ট অনুযায়ী ভাগ্তুর কাছে থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছ তো? আমি কাছে নেই বলে দুষ্টুমি কর না লক্ষ্মীটি।

চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। বিয়ের পর এ কটা বছর আমরা প্রায় কাছাকাছিই থেকেছি। দু'ঘণ্টার দূরত্ব এমন কিছু ছিল না আমাদের কাছে। হঠাৎ করে আমি নাগ্গরে চলে গিয়ে ওকে অবাক করে দিতাম অথবা ও এসে আমাকে। এটা যেন আমাদের লুকোচুরি খেলার মত ছিল। কাছে পিঠে লুকিয়ে আছি, হঠাৎ এসে বুড়ি ছুঁয়ে দেব। কিন্তু কাশ্মীর যে অনেকখানি দূর। হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়ায় মন কেমন করে উঠলে তো ওকে কাছে পাব না। তাছাড়া কতটুকু পরিচয় মিঃ সাকসেনাদের ফ্যামিলির সঙ্গে। এর ভেতর ঝিন্নির এতখানি ঘনিষ্ঠতা কি খুব শোভন হচ্ছে?

হয়ত ঝিন্নি জীবনে এই প্রথম একটা নামের স্বাদ পেয়েছে। যাঁরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে আছে। তাই হয়ত আহ্বানটা কোনরকমে উপেক্ষা করতে পারছে না। অথবা নামের ওপর একটা মোহের টানে ঝিন্নি খাল থেকে নদী, নদী থেকে সাগরে ভেসে যেতে চাইছে।

কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আমার মাথাটা যেন গুলিয়ে উঠল। এবার আমি আর কিছু না ভেবে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছু পরে জুলিয়েনের দিকে চেয়ে দেখলাম, ও নিশ্চিন্তে ওপরের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

বললাম, ছবিগুলো আনতে পথে কোন ট্রাবলে পড়নি তো?

জুলিয়েন তেমনি শূন্যের দিকে চেয়ে বলল, না। কিন্তু তোমার উত্তরটা কি হবে, ইয়েস্ অর নো?

তুমি হলে উত্তরটা কি হত?

জুলিয়েন এবার আমার দিকে ফিরল, বুঝতে পারছ না ডাক্তার, কেন মেয়েটা এমন করে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কেন সে হঠাৎ ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে এমন মেতে উঠল?

আমি জানি জুলিয়েন, কিন্তু যা সম্পূর্ণ আমাদের হাতের বাইরে তার জন্যে সারাক্ষণ হাহাকার করলে কি সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে? আমি সবরকম ডাক্তারী পরীক্ষার পর বুঝেছি, সন্তানের পিতামাতা না হবার কোন বিশেষ কারণই আমাদের ভেতর নেই। তবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কি করণীয় আছে বল?

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নি কাশ্মীর ট্যুরে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছিল।

তুমি নিশ্চয়ই মত দিয়ে এসেছ।

আজকাল ডাক্তারী ছেড়ে ভূত ভবিষ্যৎ গণনার কারবার শুরু করেছ মনে হচ্ছে।

আমার অনুমানের একটিমাত্র কারণ ছিল জুলিয়েন, তা হল তোমার চিরকেলে ভ্রাম্যমান স্বভাব।

তোমার অনুমান ভুল। আমি ওকে শুধু বললাম, এ বিষয়ে ডাক্তারের অনুমতি চূড়ান্ত হোক। ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে লেখা ওর চিঠিখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, আমি এ চিঠিতে ওর মতামতই জানতে চেয়েছি। ও শুধু আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে, ইয়েস অর নো।

বললাম, কফি না চা খাবে?

কফি।

বললাম, আজকাল পাহাড়ের মাথাগুলো কেমন অস্বচ্ছ আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ওটা তো গ্রীষ্মের ধর্ম ডাক্তার।

আমি ভাগ্‌তুকে দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে বললাম।

এবার মে-তে কিন্তু বেশ গরম পড়েছে জুলিয়েন।

দারুণ। আমি তো একখানা শার্ট পরে সারাদিনটা কাটিয়ে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে ভ্যালিতে হাওয়ার ঝলক দেয় তাই রক্ষে, নইলে দস্তুরমত ঘামতে হত।

বললাম, এখন সবচেয়ে আরামে রয়েছে কারা বল তো?

দেখলাম, অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সব কিছু ভেবে নিতে পারে জুলিয়েন।

খানিক সময় থেমে ও বলল, আরামে থাকার কথা যদি বল তাহলে গদ্দীরা। এখন ওরা বার্চ, পপলার, রোডোডেনড্রনের সীমা রেখা ছাড়িয়ে স্নো লাইনে ঢুকেছে। বার হাজার ফিট ক্রস করে গেছে।

জুলিয়েন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ও আমাকে আর অফার করল না। ও জানে আমি একসঙ্গে বেশি সিগারেট খাই না।

আমি ঝিন্নির প্রসঙ্গটাকে একটুখানি চাপা দিতে চেয়েছিলাম। একান্তে ভাবনার একটা সুযোগ আমার দরকার ছিল। তাই কথান্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম জুলিয়েনকে। একটা গুণ আছে জুলিয়েনের, সে নিজের থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেশি কথা জানতে চায় না। তার অকারণ কোন কৌতূহল নেই।

কফি দিয়ে গেল রান্নার মেয়েটি। আমরা কফি খেলাম। জুলিয়েন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাচ্ছি ডাক্তার। মায়ের সঙ্গে এখনও দেখা করে উঠতে পারি নি।

কি ব্যাপার, তোমার মা বড়িতে নেই?

এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে। কুলুতে 'লী' সাহেবের বাংলোতে গিয়েছিল।

জুলিয়েন হেসে হাত তুলে বেরিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতর চুপচাপ বসে রইলাম।

ঝিন্নি বাইরে যেতে চাইছে। সে আমার অনুমতি চেয়েছে। সে কি জানে না, আমি তাকে কখনো কোন কাজে বাধা দিইনি, আজও দেব না। তবু চেয়েছে আমার মত, এটা তার নিশ্চিত কর্তব্য বলে মনে করেছে, এতেই আমার সান্ত্বনা।

ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে চোখ পড়ল। পাইনগাছের তলায় ইতিমধ্যে ভাগ্‌তু গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি ও নীচে নিশ্চয় জুলিয়েনের জন্যে অপেক্ষা করেছিল। ঝিন্নি কেন ফেরে নি, জুলিয়েনের কাছ থেকে সেটা জানবার জন্যে তার ভেতর একটা অদম্য কৌতূহল আসা স্বাভাবিক। ভাগ্‌তু ঝিন্নিকে ছাড়া তার অবস্থিতির কথা ভাবতেই পারে না। তাই তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। ও চলে গেছে ঝিন্নির স্টুডিওতে। তাকিয়ে আছে উত্তরে তুষার পর্বতের দিকে।

কি ভাবছে ভাগ্‌তু। ঝিন্নির না আসার জন্যে নিশ্চয় গভীর একটা অভিমানে তার কিশোর মনটা ভরে উঠেছে। ও এখুনি হয়তো ভাবছে, ঝিন্নি যদি তাদের ফেলে কাশ্মীরে চলে যেতে পারে তাহলে সেও তার মা বাবা এবার শীতে ভ্যালিতে এলে তাদের সঙ্গে অনেক ওপরের পাহাড়ে উঠে চলে যাবে। যদি তার খোঁড়া পা নিয়ে উঠতে মর্মান্তিক কষ্টও হয় তবুও সে থাকবে না ঝিন্নি আর ডাক্তারসাবের কোঠীতে।

ভাগ্তুর চোখে হয়তো একটা ছবি ফুটে উঠেছে, তার মা বাবা আরও অনেক জাতভাই গদ্দীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলেছে হাজাব হাজার ভেড়ার পাল নিয়ে। ভেড়াগুলো নীচের পাহাড়ে চবতে চরতে ক্রমে ওপরে উঠছে। তারা রোডোডেনড্রন গাছের তলা দিয়ে চলেছে। শেষ গ্রীষ্মে আগুন লেগেছে রোডোডেনড্রনের বনে। ডালে ডালে টকটকে লাল ফুলের সে কি সমারোহ!

ভেড়াব পাল ধীবে ধীরে বনরেখা ছাড়িয়ে গেল। তাবা এখন চলেছে স্নো লাইন ধবে। গাছপালাব চিহ্নহীন তুষার রাজ্য। শ্বেতবর্ণের মেষপাল ঠিক যেন তরঙ্গিত এক তুষার নদী। তারা চলেছে রোটাং গিরিপাশ পেরিয়ে লাহুল, স্পিতি অভিমুখে। ক্রমে তারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ভাগ্তু তার বালককালে এসব ছবি দেখেছে। সে কাংড়া থেকে কুলুতে এসেছে ভুবুজোত পেরিয়ে। গদ্দীদের মেষ নিয়ে আসার সোজাসুজি পাহাড়ী পথ এই ভুবুজোত। তারপর শীতের সময় কুলু উপত্যকার 'ব্যান' অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওরা ধীরে ধীরে উঠেছে ওপরে। যত শীত কমবে তত উঠবে তারা ওপবে। তারপর একেবারে স্নো-লাইন ধবে দূরে বহু দূবে, যাত্রা। এ স্মৃতি কি ভোলার। খোঁড়া ভাগ্তুর এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্চয়ই চোখ দুটো জলে ভরে আসছে।

পরের দিন আমার কনসেন্ট জানিয়ে ঝিন্নির কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম।

সাতদিন পর ঝিন্নির কাছ থেকে পিকচার পোস্টকার্ড এল। ঝিন্নি নিজের হাতে ছবি এঁকে পাঠিয়েছে। কাশ্মীরে ডাল লেকের ওপর দিয়ে নৌকোতে ফুল নিয়ে চলেছে ফুলওয়ালী।

নীচে দুষ্টুমি করে লিখেছে, 'তোমার জন্যে'।

এখন ফুলওয়ালী ফুলগুলো আনছে আমার জন্যে, না ফুলওয়ালীকেই নির্বাচন করেছে ঝিন্নি আমার জন্যে, ঠিক বোঝা গেল না।

আবার এমনও হতে পারে ওসবের কোন কিছুই সে ভেবে লেখেনি। শুধু ছবিখানা এঁকে আমাকে উপহার পাঠিয়ে লিখে দিয়েছে, 'তোমাব জন্যে'।

ছোট্ট একটা চিঠিও লিখেছে ঝিন্নি।

আমার ছোটেসাহেব,

কী ভীষণ কান্না পাচ্ছে তোমাকে কি বোঝাব। আমি যখনই সুন্দর কিছু একটা দেখছি তখনই তুমি পাশে নেই ভেবে কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেন আমি একা এলাম। তোমার সঙ্গে কিছুকাল পবে এলেই তো পারতাম। একটা খেয়ালের বশে চলে এসে না পারছি পুরোপুরি ভোগ করতে, না পারছি চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে।

এঁরা চমৎকার মানুষ। ট্যুরিস্ট হাউসেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। মিসেস সাকসেনা এখানে এসে কবি হয়ে গেছেন। হাফেজ, সাদি, ওমরখৈয়ামের কবিতা থেকে অনর্গল আবৃত্তি করে চলেছেন। কখনো বা উর্দু সায়ের থেকে লাগসই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ওঁর অফিসার ভ্রাতা আমার জন্যে কয়েক ডজন রঙীন ছবি তুলেছেন।

তোমার আদরের ঝিন্নি

চিঠিটা পেয়ে কয়েকদিনের বিষণ্ণ মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঝিন্নি আমার জন্যে চোখের জল ফেলেছে, একথাটুকু পড়ার পরই আমার এতদিনের রুদ্ধ অভিমান বিপাশার স্রোতে ভেসে চলে গেল। মনে মনে ওকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলাম, তুমি কেন অধীর হয়ে পড়লে ঝিন্নি? এসময় মাথা ঠাণ্ডা, মন প্রসন্ন না রাখলে কি তোমার ছবি আঁকাব কাজ সুন্দর করে সম্পন্ন করতে পারবে? যে কাজে গেছ, সেটা নিয়েই তোমার মেতে থাকা উচিত।

ওকে সঙ্গে সঙ্গে একখানা চিঠি লিখে দুপুরের ডাকে পোস্ট করে দিয়ে এলাম। এখন নিজেকে বেশ একজন উদারচেতা পুরুষ বলে ভাবতে ভাল লাগছে।

ভাগ্তু বেচারা ক'দিন দারুণ রকম মনমরা হয়ে ছিল। ওকে কাছে ডাকলাম। ছবিখানা দেখিয়ে

ঝিন্নির খবর দিলাম। ও যে এখানে ফিরে আসার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে এ-কথা জানাতেই ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। আমি ইচ্ছে করেই ওকে তুষ্ট করার জন্যে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম।

এরপর আরও দু'তিনখানা কার্ড ঝিন্নির কাছ থেকে এসে পড়ল।

শেষ চিঠিতে কিন্তু ওর ফেরার খবর আমাকে যতখানি আশ্বস্ত করল, তার চেয়ে অনেক বেশি দমে গেলাম আর একটি খবর পেয়ে।

ও লিখেছে, ফেড্রিক নামের একজন অসাধারণ শিল্পীর সঙ্গে নাগিন লেকে পরিচয় হল। ফ্রান্স থেকে এসেছেন। আর্ট কলেজের তরুণ অধ্যাপক। তিনি একটি পপলার গাছের তলায় ছোট্ট সুন্দর হাউসবোট ভাড়া করে আছেন।

আরও লিখেছে, ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে আমি একটি শিকারাতে বেরিয়ে পড়ি। নাগিন লেকের ঐ হাউসবোটে যেতে আমার মিনিট পনের সময় লাগে। ফেড্রিক তৈরি হয়ে থাকেন। আমরা শিকারা নিয়ে জল কেটে কেটে চলে যাই বিভিন্ন আঁকার স্পটে। আমরা যখন হ্রদের ওপর দিয়ে যাই তখন কাশ্মীরের আশ্চর্য সব পদ্ম হাত দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে চলি। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত আমাদের একটানা ছবি আঁকা চলে। ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে ছবির জগৎ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত।

আর কিছু লেখেনি ঝিন্নি শিল্পী ফেড্রিক সম্বন্ধে, কিন্তু ঐটুকুতেই আমি রাতের ঘুম হারালাম।

একটি তরুণ অধ্যাপক এবং এক তরুণী শিল্পীর সান্নিধ্য যে কোন মুহূর্তে শিল্পের জগৎ থেকে অন্তরঙ্গতার জগতে প্রবেশ করতে পারে।

একটা যন্ত্রণা সারা বুকে মোচড় তুলে আমাকে অসহায় করে ফেলল। মনকে কি বলে বোঝাব তা ভেবে পেলাম না। সারারাত কখনো ঘরে পায়চারি করছি, কখনো বা ইজিচেয়ারে বসছি, আবার কখনো বিছানায় পড়ে চেষ্টা করছি ঘুমোবার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাথাটা এমন তপ্ত হয়ে উঠছে যে বেসিনের একেবারে ঠাণ্ডা জল মাঝরাতে মাথায় ঢেলেও তাকে শান্ত করতে পারলাম না।

একটা কিছু ঘুমের ওষুধের সন্ধানে নীচে নেমে গেলাম। হাতে নিয়ে কাচের গ্লাসে জল গড়ালাম। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েও পারলাম না। হয়ত আমি ওটা খেলে গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে যাব, সাময়িকভাবে ভুলে যাব আমার মানসিক যন্ত্রণা, তবু শেষ মুহূর্তে খেতে চাইল না আমার মন। যত কষ্টই হোক ঝিন্নিকে আমার চোখের সামনে আমি সারাক্ষণ রেখে দিতে চাইলাম।

ভোরবেলা ভাগ্‌তু এসে জানাল, একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

নীচে নামলাম। ভ্যালির ওপারের টিকা থেকে একটি লোক এসেছে। সে আমাকে জানাল, একটি মেয়ের ভারী অসুখ, আমাকে দেখতে যেতে হবে। মেয়েটি নাকি আমার নাম করেছে।

বললাম, আমাকে চিনল কি করে?

লোকটি বলল, ঠিক জানিনা বাবুজী, সারাদিন তো ও গম কল চালায়, কোথাও যাওয়া আসা করে না, মনে হয় কারো কাছে শুনে থাকবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। হাত দেখিয়ে বললাম, ঐ ভ্যালির ওপারের পাহাড়ে যে মেয়েটি গম কল চালায়?

হাঁ, ডাক্তার সাব।

আমি আর কোন কথা জানতে চাইলাম না। ব্যাগটা লোকটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে টাট্টুতে চেপে বসলাম।

ওপারের পাহাড়ে যখন ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা বাজে। সাধারণ কাঠের তৈরি বাড়ি যেমন হয় ঠিক তেমনি।

ঢুকেই দেখলাম, মা বসে আছে মেয়েটির মাথার পাশে।

আমাকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। ক্লান্ত মুখে সামান্য একটু হাসির উদ্ভাস।

আমি পরীক্ষা করলাম। নিউমোনিয়ার কেস। হাই টেম্পারেচার আছে।

বললাম, ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।

আবার মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল।

বললাম, এখুনি একজনকে পাঠাতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ দিয়ে দেব। আর আমার কম্পাউন্ডার এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যাবে।

বাইরে বেরিয়ে আসছি, মেয়েটির মা উঠে এলেন। আঁচল থেকে কয়েকটা টাকা বের করে আমার হাতে দিতে আসতেই আমি বললাম, আপনার মেয়ে গমকলের প্রতিষ্ঠার দিনে আমাকে ব্রাহ্মণ পেয়ে অনেককিছু খাইয়েছে। আমি ঋণী হয়ে আছি। এখন ঋণ শোধের সুযোগ এসে গেছে। আমাকে টাকা দিয়ে আর ঋণী করে রাখবেন না।

একটুখানি থেমে হেসে বললাম, ভাল হয়ে যখন আপনার মেয়ে আবার কল চালাবে, তখন না হয় দু'চারবার বিনি পয়সায় আমার গম ভাঙিয়ে দেবে।

চলে আসব হঠাৎ নজরে পড়ল, ওদের কোঠির পাশ দিয়ে একটা কুহল ছুটে চলেছে। আর ঠিক কুহলটার ধারেই ফুটে উঠেছে নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফরগেট-মি-নট ফুল। বড় বড় পাতার ফাঁকে ছোট ছোট ফুল। অযত্নে বেড়ে ওঠা ফুলগুলো যেন বার বার পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, ফরগেট-মি-নট।

আমি সারা পথ গমকলের সেই মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে এলাম।

ঝিন্নি ফিরে আসার পর মিসেস সাকসেনার চিঠি এল। প্রীতির ছোঁয়া সে চিঠির সর্বাঙ্গে। লিখেছেন, ঝিন্নির মত সুন্দর মিষ্টি একটি মেয়ে তাঁর থাকলে তিনি জীবনে খুবই সুখী হতেন। তা যখন বিধাতা দেননি তখন ঝিন্নিকেই নিজের মেয়ে বলে ভেবে নিতে ক্ষতি কি।

একগোছা কাশ্মীরের রঙীন ছবি এসেছে মিঃ সাকসেনার শালার কাছ থেকে। ঝিন্নি বার বার ছবিগুলো দেখছে আর তার নিজের কম্পোজ করা ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে।

চিঠি এল ফ্রান্সের আর্ট কলেজের অধ্যাপক ফেদ্রিকের কাছ থেকে। আমার হাতেই চিঠিখানা এসে পড়েছিল। এয়ারমেলের একপাশে ফেদ্রিকের নাম লেখা। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম স্টুডিওতে ঝিন্নির কাছে।

কয়েকদিন পার হয়ে গেল, ঝিন্নি কিন্তু আমাকে ফেদ্রিকের চিঠিখানা পড়াল না, কিংবা সে কি লিখেছে তারও কোন উল্লেখ করল না। হয়ত অনাবশ্যক বলে দেখানোর দরকার মনে করেনি ঝিন্নি।

ইদানিং আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমি ঝিন্নির কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। আমাদের ভেতর প্রায় দুজনেরই অজ্ঞাতে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার, ও শিল্পী। দুজনের চিন্তা, বৃত্তি, কর্মক্ষেত্র, সবই আলাদা। কিন্তু এই ব্যবধানটা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতেই কেবলমাত্র ধরা পড়ে। দৈনন্দিন জীবনের কোন আচার আচরণ কিংবা ব্যবহারে নয়। আমরা যেন আমাদের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন হয়ে উঠেছি। আগের স্বাভাবিক আচরণগুলো যেন ভুলতে বসেছি।

এবার প্রবল বর্ষণ শুরু হল জুলাই-এর প্রায় গোড়া থেকেই। সমস্ত দৃশ্যপটটাই একেবারে বদলে গেল। যেসব স্রোতধারা বিপাশাতে এসে পড়েছে সেগুলো জলসম্ভারে স্ফীত হয়ে বিপাশাকে উন্মাদিনী করে তুলল। বন্যায় ভেঙে গেল পথঘাট, ভেসে গেল ছোট ছোট কাঠের সেতু। ধ্বস নামল পাহাড়ে। বহু স্থানে চলাচলের পথ প্রায় অবরুদ্ধ।

মেঘের ডাক, বিদ্যুতের ঝিলিক, বর্ষার হাওয়াই নৃত্য, সব মিলিয়ে দস্তুর মত সমারোহপূর্ণ এক অভিযান। কুলু উপত্যকা জুলাই আগস্টে যথার্থই এক রণক্ষেত্র।

এর মাঝে অক্লান্ত পরিশ্রমে ডুবে থাকতে হয় আমাকে। শুধু ডিসপেনসারীতে বসেই ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা নয়, দূরে দূরেও ধ্বসনামা পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে টাট্টুতে চড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। আমার যে ব্রত তাতে নিজের বিপদের চেয়ে অন্যের বিপদকেই বড় করে দেখার অলিখিত প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হয়েছে।

এর ভেতর ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটল। সেই ছোট্ট ঘটনাটুকু অসামান্য হয়ে দেখা দিল আমার আর ঝিন্নির জীবনে। কুলুর বর্ষাঋতুর দিকজোড়া ভাঙন যেন শুরু হয়ে গেল আমাদের দুজনের সংসারে।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমার দোতলার শোবার ঘরের জানালা খুলে আমি তাকিয়েছিলাম ভ্যালির দিকে। ঠিক ভ্যালি নয়, দিগন্তের দিকে। আকাশ জুড়ে বর্ষা-মেঘের বিপুল আয়োজন থাকলেও দিগন্তের একটি কোণায় শেষ সূর্যের রঙের আশ্চর্য খেলা চলছিল। বর্ষাধৌত অরণ্য, আকাশের কাল মেঘ, পীরপাঞ্জালের তুষার-শিখর স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়েছিল সেই সূর্যাস্তের দিকে। প্রকৃতির সমস্ত উদ্দাম উন্মাদনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

আমি ওদিক থেকে পলকের জন্য চোখ ফিরিয়ে তাকালাম ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে। ওকে দেখা গেল না বাইরে। হয়ত ঝিন্নিও ভেতরে বসে এই অসাধারণ মুহূর্তটিকে লক্ষ্য করছে। সত্যি, যে কোন শিল্পীর কাছে এই মুহূর্তের দিগন্তচিত্রটি স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত।

পেছন থেকে আমার কাঁধে দুটি হাত রেখে থুত্‌নিটা মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়াল ঝিন্নি। অনেকদিন পবে ওর সেই স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করল। ওর নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। আমাব কাঁধের ওপর পড়ে থাকা ওর চুলগুলো সারা দেহে এক ধরণের শিহরণ সৃষ্টি করছিল।

আমি আমার দুটো হাত তুলে ওর হাতের আঙুলগুলো ধরে বললাম, এখুনি বড় বেশি করে তোমাব কথা মনে হচ্ছিল ঝিন্নি। দেখেছ দিগন্তের ঐ সূর্যাস্ত?

দেখেছি।

ঝিন্নির এই 'দেখেছি' শব্দটা এমন নিরুত্তাপ সাধারণ এক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল যে আমি মনে মনে আহত হলাম। ঝিন্নি তার শিল্পীর চোখ দিয়ে হয়ত এত বেশি দেখেছে যে, এই সূর্যাস্ত তার দৃষ্টির কাছে অনন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। তা হোক, তবু দুটি হৃদয়ের অনুভূতির যদি মিলন ঘটে তাহলে অনেক অকিঞ্চিৎকরও যে পরম অভাবনীয়ের মূল্য পায়।

ঝিন্নি এবার আমার মাথা থেকে ওর মুখখানা তুলে নিল। তারপর আমার হাত ধরে তার দিকে আকর্ষণ করে বলল, ছোটেসাহেব, তুমি আমার দিকে ফিরে দেখবে না?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঝিন্নির দিকে ফিরে ওকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলাম। অনেক দিনের অশান্ত বুভুক্ষু মন ওকে একান্ত কাছে পেয়ে কিছুটা শান্ত হল।

সেই মুহূর্তে সূর্যাস্তের খেলা শেষ হয়ে নামল অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকাকে বর্ষার শবে বিদ্ধ করে শুরু হল তাল তাল মেঘের রণযাত্রা। যুদ্ধের দামামা উপত্যকার চারদিকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। বিদ্যুতের কষাঘাতে রাতের অন্ধকার ফেঁড়ে চৌচির হয়ে গেল।

কাচের শার্সিটা বন্ধ করে দিয়ে এল ঝিন্নি। অনেকদিন পরে একই শয্যায় ওকে বুকের মাঝে নিয়ে শার্সির ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় উপত্যকা, পাহাড় আর বনবনান্ত জুড়ে প্রকৃতির উন্মাদ রূপ দেখতে লাগলাম। অঝোরে বর্ষার ধারা কখন আমাদের রক্তের মাঝেও প্লাবন এনে দিল। আমি ঝিন্নিকে সোহাগে আদরে বুকের মাঝে ভরে নিয়ে পূর্ণ করে দিলাম। ডিনারের টেবিলের ডাক না আসা পর্যন্ত আমরা বিছানায় শুয়ে টুকরো টুকরো কথার এমব্রয়ডারি বুনে চললাম।

খাওয়া শেষ করে এলাম শোবার ঘরে। আমার সঙ্গে আজ ঝিন্নিও এল। আজকাল বড় একটা ও আসে না। ছবি এগজিবিশান অক্টোবরে হবার কথা, তাই স্টুডিওতেই ও প্রায় সারাক্ষণ থাকে। অনেক রাত অব্দি ছবি এঁকে ওখানেই শুয়ে পড়ে। ভাগ্‌তু ওখানকার পাহারাদার।

ঝিন্নি এসে বসল কুশন মোড়া চেয়ারে, আমি ঠিক তার পাশেই বিছানায় বসলাম।

ঝিন্নি এবার কোন ভূমিকা না করেই বলল, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে ছোটেসাহেব।

কি বিষয়ে ঝিন্নি?

বলছি—বলে ওর ব্যাগ থেকে এক তাড়া চিঠি বের করল। সবকটিই ছোট্ট ফাইলে সাজানো।

চিঠিগুলো হাতে রেখে বলল, এগুলো পড়ানোর আগে ছোট্ট করে বিষয়টা একটু বলে নিই, তোমার বোঝার পক্ষে সুবিধে হবে।

আমি ঝিন্নির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কি বলবে ঝিন্নি? হাতের কাগজগুলোই বা কিসের?

ঝিন্নি বলল, আমি আমার প্রফেসার শর্মার পরামর্শে আর মিঃ সাকসেনার সহযোগিতায় একটা ফরেন স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা করছিলাম। সেটা আমার হাতে এসে গেছে। বিদেশে যাবার খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থাই ওঁরা আমার জন্যে করে দিচ্ছেন। অক্টোবরে কাশ্মীরের ওপর এগজিবিশানটা শেষ করেই ডিসেম্বরে যাতে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি সেই ব্যবস্থাই ওঁরা করছেন। আমি ফ্রান্সেই যাব, কারণ ফ্রান্সই এখন শিল্পীকুলের পীঠস্থান।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমার আঁকার কাজ নিশ্চয় মিঃ ফেড্রিকের অধীনেই চলবে?

ঝিন্নি যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, আশ্চর্য, একেবারে সত্য অনুমান করেছ তুমি। এই দেখ সব করেসপন্ডেন্স। তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে কিছু বলিনি।

সত্যি এমন সারপ্রাইজ আমার জীবনে এই আমি প্রথম পেলাম। মুখে ঝিন্নিকে কিছু বললাম না।

ঝিন্নি সাগ্রহে কাগজগুলো আমার দিকে এগিয়ে ধরতে অত্যন্ত শান্ত গলায় আমি বললাম, তুমি তো মুখেই সব বললে, ওগুলো দেখার আর কি দরকার।

বেশ বুঝলাম, ঝিন্নি সঙ্কুচিত হয়ে ওর হাতখানা সরিয়ে নিল। একটা পাতলা ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখলাম ওর মুখের ওপর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ও একসময় আমার চোখে চোখ ফেলে বলল, তোমাকে কোন কিছু আগেভাগে বলিনি বলে কি তুমি রাগ করলে?

বললাম, দেখ ঝিন্নি, আমি শিল্পী নই, তোমার ঐ জগৎ সম্বন্ধেও আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, আমার পরিচিতিও তোমার মত এতখানি ব্যাপ্ত নয়, তাই বলছিলাম, এসব ব্যাপারে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর!

ঝিন্নির মুখখানা মনে হল ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ছোটেসাহেব, অমি কি এতই বোকা যে তোমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পারব না। আমার মনে কাল থেকেই এ সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল।

বললাম, উত্তেজিত হোয়োনা ঝিন্নি। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝখানে একটা সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে। সেখানে লুকোচুরি থাকবে কেন।

ঝিন্নি তখন রাগে ফুঁসছে, থাম, আমি সবই বুঝি। তুমি চাও না যে আমি আঁকি। আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসাটা তোমার ভান ছাড়া কিছু নয়। সেবার দিল্লী এগ্‌জিবিশান থেকে তুমি কাজের অছিলায় চলে এলে, এগুলো কারো চোখে পড়ে না? কুলুর এগ্‌জিবিশানে তুমি আমার আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলে? বুকে হাত রেখে বল তো দেখি।

আবারও ঠাণ্ডা গলায় বললাম, উত্তেজিত হোয়ো না ঝিন্নি, শান্ত হও। আমাদের সম্পর্কটা এমন, যে কোন কঠিন জিনিসের সহজ একটা সমাধান করে ফেলতে পারি।

ঝিন্নি আরও ক্রুদ্ধ অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, বল কি দিয়েছ, কি দিয়েছ তুমি আমাকে? থাক, আর করুণায় কাজ নেই। আমার কাজ, আমার পথ আমি নিজেই ঠিক করে নিতে পারব।

উত্তেজিত ঝিন্নি ওর চিঠির ফাইলটা চেয়ারের ওপর ফেলে রেখেই চলে গেল।

আমি জানি এই প্রবল বৃষ্টিতে ও ওর স্টুডিওতেই ফিরে যাবে। পথ ভাসিয়ে এখন বৃষ্টির প্রবাহ চলেছে, এ অবস্থায় অন্ধকার পথে চলা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এসময় ঝিন্নিকে বাধা দিতে যাবার অর্থই হল আরও বিপদের ভেতর ওকে ঠেলে দেওয়া।

আমি কোন কিছু উপায়ান্তর না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে বিছানার ওপর বসে রইলাম।

মনে হল, ঝিন্নি কোনদিনই আমার দিকটা ভেবে দেখেনি। এই যে আমি কলকাতায় আমার বন্ধুবান্ধব, আমার স্নেহময়ী মাসীমাকে ফেলে রেখে এসেছি, এতগুলি বছরের ভেতর একটিবারও যাইনি, সে কার টানে? নিশ্চয়ই বাবার ফলের বাগানের কতকগুলো টাকার লোভে নয়। যে মেয়েটিকে কুলুর বাগানে বেলা শেষের কোমল সোনালী আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিটুকুই তো আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে এই পাহাড় ঘেরা উপত্যকায়। থাক, নিজের

সুখ দুঃখের কথা ভেবে এখন আর কোন কাজ নেই। আজ ঝিন্নি আমাকে যথার্থই তার অভিযোগটা জানিয়ে গেছে, আমি কি দিয়েছি তাকে ? সত্যিই তো তাকে আমি কিছু দিতে পারিনি। না দিতে পেরেছি তার শিল্পী মনের খোরাক, না পেরেছি তার কোলে এনে দিতে একটি সন্তান। যাকে নিয়ে সে করতে পারত তার মাতৃস্বর্গ রচনা।

অনেক মনোকষ্ট নিয়ে রাত কাটিয়েছি, কিন্তু ভোরে উঠে অবাক হয়ে শুনতে পেলাম, ঝিন্নি নীচে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

আমি নীচে নেমে গিয়ে ওদের দেখতে পেলাম। ভাগ্‌তু আর ঝিন্নি।

আমাকে মুখোমুখি দেখতে পেয়ে ঝিন্নি বলল, আমি চাচাজীর কাছে কুলুতে যাচ্ছি। তোমার স্টুডিওর চাবি ভাগ্‌তুর কাছে রেখে গেলাম। গাড়ি এখুনি ছাড়বে, আমি চলে যাচ্ছি।

বললাম, তোমার দরকারী ফাইলটা কিন্তু ওপরে কাল ভুলে ফেলে গেছ। দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।

ঝিন্নি বলল, ওর আর কোন দরকার নেই। ওর কাজ ফুরিয়ে গেছে।

ভাগ্‌তুর দিকে ফিরে বলল, ওপরের চেয়ারে এক বান্ডিল কাগজ পড়ে আছে, ওটা ডাস্টবিনে ফেলে দিস।

হাতের কাছে রাখা কাপড়ের ব্যাগখানা তুলে নিয়ে ঝিন্নি তর তর করে নীচে নেমে গেল। আকাশ ভারাক্রান্ত হলেও বৃষ্টি নেই।

বাস কি করে মানালী থেকে কুলু যাবে আমি ভাবতেই পারছি না। পথঘাট অতি দুর্গম আর ভাঙা। ক'দিন তো পরিবহন ব্যবস্থা তচনচ হয়ে গিয়েছিল।

ঝিন্নির বেরিয়ে যাবার কিছু পরে বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। বাস বন্ধ, ভাঙা পথ এখনও পুরোপুরি সারাই হয়নি। কিন্তু ঝিন্নি কোথাও নেই। দারুণ জেদী সে। ঐ দুর্গম চব্বিশ মাইল পথ সে পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল ধ্বস পেরিয়ে, নদীনালা সাঁতরে যাবে, তবু ফিরবে না।

উদ্বেগে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। আমি দ্রুত হেঁটে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। ওপরে উঠে যত্ন করে ওর চিঠির বান্ডিলটা ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখে দিলাম। আলনা থেকে ওয়াটারপ্রুফখানা টেনে নিয়ে ভাগ্‌তুকে হাঁক দিয়ে বললাম, আমি কুলু যাচ্ছি। দু'চারদিন পরে ফিরব। তুই কম্পাউন্ডার বাবুকে বলিস, এ ক'দিন ডিসপেনসারীর কাজটা চলিয়ে নিতে।

ভাগ্‌তু তার বগলের ক্র্যাচটা ধরে বড় বড় চোখে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। সকাল থেকে ঝিন্নি আর আমার আচরণটা তার বুদ্ধির অগম্য থেকে গেল।

মানালী থেকে কুলুর সরকারী রাস্তাটা বাস চলার পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠলেও পায়ে চলার পক্ষে অগম্য হয়ে দাঁড়ায়নি। কয়েক মাইল পথ ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত চলে আসার পর একটা বড় রকমের ধ্বসের মুখোমুখি হতে হল। অতি কষ্টে বড় বড় পাথরের চাঁই, মাটি, গাছপালার ওপর পা রেখে রেখে ওপারে পৌঁছলাম। পথ চলতে গিয়ে ভাবলাম, এই পিছল ধ্বসটা পেরিয়ে আসতে ঝিন্নির কত কষ্টই না হয়েছে। ওর কথা যত ভাবছি ততই ওর ওপর থেকে আমার সব ক্ষোভ, অভিমান ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

অনেক পথ পেরিয়ে এলাম, কিন্তু ঝিন্নি কই! ওকি আমার চেয়েও দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। হয়ত তা হতে পারে। যারা পাহাড়ে কাটায় আশৈশব তারা অনেক দ্রুত পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে পারে।

অনেক বেগবতী স্রোতধারা পেরিয়ে, প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত-বিক্ষত পা টানতে টানতে প্রায় অপরাহ্নকালে এসে পৌঁছলাম কুলুর বাংলোর কাছাকাছি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বহু বর্ষণের পর ক্লান্ত মেঘ পশ্চিমাকাশ থেকে সরে গেছে। সেখানে সেই প্রথম কুলুতে আসার দিনটির মত লাবণ্যেভরা অপরাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি। আমি আরও দেখলাম, তেমনি বাংলোর বেড়ার ধারে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে। আজ সে একা নয়। ঝিন্নির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা বৃদ্ধ নরসিংলালজী। তাদের দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ ছিল পূর্বাকাশের দিকে।

আকাশের ওপর চোখ পড়তেই পথের ক্লান্তি ভুলে গেলাম। রামধনু উঠেছে। অশ্রুভারাক্রান্ত মেঘের বুকে অনেক আশার স্বপ্ন জড়ানো রামধনু। পাঁচটি কুরুল পাখি (সারস) সারি দিয়ে আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে।

কতক্ষণ চেয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ একটা ডাকে চমকে তাকালাম।

ছোটেসাহেব, ছোটেসাহেব, ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে ঝিন্নি। আমার কাছে এসে রক্তাক্ত পায়ের দিকে তাকিয়ে ও কেঁদে ফেলল।

কে, কে তোমাকে এই ভাঙা পথের ওপর দিয়ে এত কষ্ট সহ্য করে আসতে বলেছিল ছোটেসাহেব। তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে?

ম্লান হেসে বললাম, তোমার কষ্ট না হলে আমার কেন কষ্ট হবে ঝিন্নি।

ও আমার হাত ধরে বলল, তুমি এস ছোটেসাহেব, আমার অনেক কসুর হয়ে গেছে।

ওকে বললাম, ঝিন্নি, সেই প্রথম দিনটির কথা মনে আছে, যেদিন এমনি এক বেলাশেষের আলোয় আমার ঝিন্নিকে ঐ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

সেদিনটির কথা মনে করে ঝিন্নির সেকি আকুল কান্না।

ছোটেসাহেব, ছোটেসাহেব, সত্যিই তুমি তোমার ঝিন্নির সব কসুর মাপ করতে এলে, ছোটেসাহেব!

রাতে খাবার পর চাচা নরসিংলালজী আউট হাউসে আগের মত শুতে গেলেন। আমাকে ঝিন্নি একেবারে নীচে নামতেই দেয়নি। আমার ছেঁড়া কাটা পা গরম জলে ধুইয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে ও আমাকে একেবারে বিছানায় এনে তুলেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট বিছানায় বসেই চুকেছে আমার।

নীচের কাজ সেরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঝিন্নি এল। ঠিক প্রথমদিন চাচাজী আউটহাউসে শুতে গেলে ও রুম হিটার জ্বালাবার অছিলায় যেমন করে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল।

দরজাটা বন্ধ করে ও সুইচ অফ করতে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে করে ও ওর সুন্দর কাঁধের ওপর দিয়ে দৃষ্টি হেনে বলল, এবার দি' নিভিয়ে আলোটা?

ওর কানের ঝুমকো জোড়ার ঝুরিগুলো টুলটুল্ করে নড়ে উঠল। আমি অবিকল সেই প্রথমদিনের ঘটনাটি অভিনীত হতে দেখলাম।

বললাম, আলো নিভিয়ে দিলেও অন্ধকারে আমি আমার ঝিন্নিকে ঠিক চিনে নিতে পারব।

ও আলো নিভিয়ে আমার বিছানায় এসে বসল। আমার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, খুব কষ্ট দিলাম তোমাকে আজ।

তুমিও তো কম কষ্ট পাওনি ঝিন্নি।

ও আবার বলল, তুমি কিন্তু এতটা পথ চলে আসবে তা আমি ভাবিনি।

তোমার ভাবা উচিত ছিল ঝিন্নি। আমাদের মনের বাঁধনটা যদি শিথিল হত তাহলে দুজনে দু-জায়গায় থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু বাঁধনটা কঠিন বলে তোমার ঠিক পেছনেই আমাকে চলে আসতে হয়েছে।

আমি আর কোনদিন ছবি আঁকব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি ছোটেসাহেব।

আমি ওর একথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি আমাকে আজ অনেক কষ্ট দিয়েছ বলে বলেছিলে না?

দিয়েছিই তো।

ওর হাতটা আমার বুকে চেপে ধরে বললাম, কষ্ট যখন দিয়েছ বলে স্বীকার করে নিচ্ছ তখন শাস্তি পাবার জন্যে তোমাকে তৈরী থাকতে হবে।

দাও শাস্তি। আমার ছোটেসাহেবের কাছ থেকে শাস্তি পাওয়াটাও তো একটা ভাগ্যের কথা।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে ওর মাথায় রাখল।

উঠে বসে বললাম, ঝিন্নিকে তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার ছবি আঁকতে হবে, এই তার শাস্তি।

তুমি কেন আমাকে আবার ছবির জগতে যেতে বলছ ছোটেসাহেব? আমি বরং আমার পুরোনো

জীবনে ফিরে যাই, সেখানেই তো শান্তি। তুমি ফিরবে রোগী দেখে, আমি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখব পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে তোমার টাট্টু তোমাকে নিয়ে ফিরে আসছে। আমি তোমার জন্যে খাবার তৈরি করব। দুজনে একসঙ্গে বসে খাব। অবসর সময়ে একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কুলুর জলেস্থলে আকাশে বাতাসে বিভিন্ন ঋতুর ছবি আঁকা দেখব। এর চেয়ে বড় কাজ আমার কি হতে পারে।

এসব করেও তুমি তোমার ছবি আঁকার অফুরন্ত সময় পাবে ঝিন্নি। আমি চাই না, তোমার মত একজন শিল্পী নিঃশেষে মুছে যাক্। তুমি সামনের অক্টোবরে এগজিবিশানের জন্যে তৈরি হবে, আর ডিসেম্বরে আরও আরও সুন্দর ছবি আঁকা শেখার জন্যে চলে যাবে ফ্রান্স। আমি অন্তর থেকে এসব কথা তোমাকে বলছি ঝিন্নি। আমার কথার আর প্রতিবাদ কর না লক্ষ্মীটি। তাহলে আজ যে কষ্ট দিয়েছ, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কষ্ট পাব।

ঝিন্নি আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি ঝিন্নিকে আমার কম্বলের ভেতর টেনে নিয়ে বললাম, এই তো আমি আমার ঝিন্নিকে পেয়েছি। তোমার বিকাশের পথে বাধা হলে আমার পাওয়াটাই যে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে সোনা।

আমরা একই উত্তপ্ত কম্বলের ভেতর শুয়ে বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে কখন উদ্বেগহীন ঘুমের ভেতর হারিয়ে গেলাম।

শরৎ এসেছে। তরঙ্গিত ভেড়ার পাল নিয়ে উঁচু পর্বত থেকে ভ্যালি লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে নেমে আসছে গদ্দীরা। নির্মল নীল আকাশখানা ঝক্‌ঝক্ করছে। চারদিকের পর্বতদেহের বক্ষ পর্যন্ত আবৃত সাদা চাদর। পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ায় সংলগ্ন হয়ে আছে একখণ্ড শুভ্র মেঘ। ফলের বাগানে কুলুর সুন্দরী মেয়েরা সারি বেঁধে ঢুকছে ফল তুলতে। লাল, সোনালী ফলভারে অবনত আপেল বৃক্ষ। সামনে গাছের ডালে বসে শিস দিয়ে চলেছে ঝুঁটি বাঁধা চটিপিন্‌ঝা পাখি।

সকাল থেকে রোগী দেখায় ব্যস্ত। আজ কোন্ ফাঁকে যে একটুখানি জলখাবার খেয়ে নিয়েছি তা আমিই জানি। এক একদিন বহু দূর দূর থেকে রোগীরা এসে ভীড় জমায়। তখন নাওয়াখাওয়ার আর অবসব থাকে না।

একটুখানি চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ঝিন্নির সঙ্গে। ও ওপরে ওঠার সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে পত্‌পত্ করে হাত নেড়ে ডাকছে।

আমি যে রোগীটিকে দেখে প্রেসক্রিপশান লিখতে যাচ্ছিলাম, তার ওষুধগুলো লিখে কম্পাউন্ডারবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলাম বাইরে। ঝিন্নি তখনও আমার জন্যে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতেই ও চাপা গলায় বলল, একবার আমার সঙ্গে চলে এস ওপরে, কথা আছে।

আমি ঝিন্নির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে থামলাম। ও দরজাটা ভেজিয়ে দিল। কি একটা যেন উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে ঝিন্নি।

বললাম, কি হয়েছে তোমার, এমন করছ কেন?

ও আমার কাছে এসে প্রায় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলভরা দুটো চোখ আমার চোখের ওপর রেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, সে আসছে ছোটেসাহেব। আমি নিশ্চিত জানতে পেরেছি, সে আসছে।

আমি ঝিন্নিকে নিবিড় করে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললাম, সত্যি! সত্যি বলছ ঝিন্নি?

সত্যি বলছি ছোটেসাহেব।

বলতে বলতেই আনন্দে, অশ্রুতে, উত্তেজনায় ঝিন্নি একাকার। টপটপ করে ক'ফোঁটা আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল মেঝেতে।

আমি পাগলের মত ওকে জড়িয়ে ধরে সোহাগে আদরে চুম্বনে ভরে দিলাম। আমার ঝিন্নি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মা হতে চলেছে। সকালের সোনালী আলোর জলে লেখা চিঠিতে সে খবর যেন দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপাশার নীল জলধ্বনিতে যেন সেই আনন্দেরই সংবাদ।

সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হল, ঝিন্নি আর এতদিনের বহুচেনা ঝিন্নি নেই, সে এই মুহূর্ত থেকে পরিপূর্ণ আর এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পাঁচটি বছর পরে এক বিহ্বল বসন্তের দিন। উৎসবের সাজে সেজেছে সারা কুলু উপত্যকা। গাছের ডাল ভরে শুধু সাদা আর পিঙ্ক ফুলের সমারোহ।

ভোরবেলা বাগানের দিকের শার্সিটা খুলে দিতেই এক ঝলক সোনালী আলো চোখে এসে পড়ল। আপেলের ডাল ভরে শুধু ফুলের নিমন্ত্রণ। অজস্র রঙীন প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া রঙীন কাগজের টুকরোর মত উড়ছে। গাছের তলায় মা আর মেয়ে। রঙীন রিবন দিয়ে বো বাঁধা কালো চুল। পিঙ্ক ফুল ছড়ানো সাদা ফ্রক পরে দেবকন্যার মত নাচতে নাচতে প্রজাপতির পেছনে ছুটছে পাঁচ বছরের তিন্নি। রোদ্দুরের ওড়না গায়ে জড়িয়ে বাগানে বসে মেয়ের জন্যে হলুদ রঙের পুলওভার বুনছে ঝিন্নি। উলের গোলাটাও ঝিন্নির হাতের টানে চারদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছে।

আমার সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, পৃথিবীর সংগ্রহশালার একটি শ্রেষ্ঠ ছবি যেন আমি চোখের সামনে দেখছি। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, চিত্রকর না হয়েও আজ একটিমাত্র শ্রেষ্ঠ চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা আমি নিজে।

●

তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি
তৃতীয় পর্ব

কয়েকটা দিন ভারি উত্তেজনায় কাটছে তিন্নির। চণ্ডিগড় থেকে জুলিয়েন আঙ্কেলের ছেলে তার দু'একটি মেডিক্যাল কলেজের বন্ধু নিয়ে মানালী আসছে। তাদেরই আপ্যায়নের পরিকল্পনায় কাটছে তিন্নির মুহূর্তগুলো।

মানালীতে ছুটি কাটানোর জন্যে ভাল হোটেলের অভাব নেই। জুলিয়েন বেননেরই তো দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস হোটেল আছে। তারই তো একমাত্র ছেলে ক্যারল আসছে তার দু'তিনজন বন্ধু নিয়ে। দিব্যি কেটে যেত তাদের অ্যাপেল অর্চার্ডের ভেতর নিজেদের পেল্লাই বাড়িতে। সেখানে থাকতে না চাইলে হোটেলের স্যুইট আছে। কিন্তু জুলিয়েন আঙ্কেল সেদিক দিয়ে গেলেন না। তিনি তিন্নিকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন, মম্, পুরো একটা বছর পরে ক্যারল আসছে তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। ওরা তোমার অতিথি হয়ে থাকুক, এটাই আমাদের ইচ্ছে। চিঠিতে যা জানিয়েছে তাতে মনে হয়, দিন দশেকের প্রোগ্রাম ওদের।

জুলিয়েন আঙ্কেলের পাশে তখন বসেছিলেন বালু আন্টি আর তিন্নির মা স্বয়ং।

তিন্নি বুঝে নিল এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভেতর ব্যাপারটা নিয়ে আগাম আলোচনা হয়ে গেছে।

তিন্নি স্বভাবে শান্ত গভীর। তার আবেগ কিংবা আনন্দ মনের ভেতরেই খেলা করে, উচ্ছ্বসিত হয়ে তা বাইরে ভেঙে পড়ে না।

আঙ্কেলের কথায় সে মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল।

প্ল্যান প্রোগ্রাম সবই কিন্তু তোমার।

তিন্নি বলল, আমি প্রোগ্রাম ছকে ওদের কাছে ফেলে দেব। তারপর সবাই মিলে আলোচনার পর ফাইন্যাল করা যাবে।

বেশ। টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল কিন্তু ওরা আসছে।

তিন্নি আবার মাথা নাড়ল।

তুমি, তোমার আন্টি কিংবা আমার সব রকম সাহায্যই পাবে। তোমার মা তো সব সময়েই তোমার সঙ্গে আছেন।

জুলিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে অর্চার্ডের দিকে চলে গেলেন।

তিন্নি আর দাঁড়াল না। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে তার মনে। সে দ্রুত চলে গেল তার নিজস্ব কোঠির দিকে।

ভ্যালির গা ঘেঁষে রাস্তার ওপর তিন্নির বাবা ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জী বিশাল বাড়ি তৈরী করেছিলেন। অবশ্য বাড়ির প্রায় তিনভাগই ছিল একটা নার্সিং হোম। গোটা বারো বেড, ডিসপেনসারী, অপারেশন থিয়েটার। দুটি নার্স, চারটি আয়ার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। দারোয়ানের কোয়ার্টার বাগানের এক কোণে। সে তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। একটু দূরের থেকে রোজ আসেন কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁর লালচে রঙের টাট্টুতে চড়ে।

মুখার্জী সাহেব মারা যাবার পর অপারেশান থিয়েটারের দরজা বন্ধ। কম্পাউণ্ডারবাবু কোনরকমে আউটডোরের কাজগুলো সামলে যাচ্ছেন।

জুলিয়েন বেনন ছিলেন ডাক্তার মুখার্জীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ডাক্তারী ডিগ্রি পাওয়ার পর পুষ্কর মুখার্জীর

সুদূর হিমাচলপ্রদেশে এসে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করার বিন্দুমাত্র কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সৎ মানুষের চিঠি পেয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে কুলুতে চলে আসতে হয়েছিল। এই সৎ ও সুভদ্র মানুষটি ছিলেন অর্ণব মুখার্জীর ভবঘুরে ও খেয়ালী পিতৃদেবের অ্যাপেল অর্চার্ডের ম্যানেজার।

ছোটবেলায় মা মারা যান ডাক্তার মুখার্জীর। স্ত্রীর শোকে ডাক্তার মুখার্জীর বাবা এমনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে তিনি শিশু-পুত্রটিকে তার মাসীর কাছে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। জীবিত থাকতে তিনি আর কখনো ছেলের কাছে ফিরে আসেননি।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি কুলু আর মানালীতে দুটি অ্যাপেল অর্চার্ড করেছিলেন। নরসিংলালজী ছিলেন সেই অর্চার্ড দুটির ম্যানেজার।

মালিক মুখার্জী সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি নিজে অর্চার্ড দুটি আত্মসাৎ না করে কলকাতায় মুখার্জী সাহেবের সদ্য ডাক্তারী পাশ করা ছেলেটিকে ডেকে আনেন। তার হাতেই তুলে দেন অর্চার্ড দুটির ভার।

নরসিংলালজীর একটিমাত্র মেয়ে, ঝিন্নি। সে আর্টকলেজ থেকে সদ্য পাশ করে কুলু উপত্যকার নাগ্গরে রোয়েরিক আর্ট গ্যালারীতে একটা কাজ পেয়েছিল। আশ্চর্য কান্তিময়ী সেই কন্যাটির আকর্ষণে তরুণ ডাক্তার মুখার্জী মানালীতেই তার সাধনার আসন পাতল।

ডাক্তার মুখার্জী আর ঝিন্নির ভালবাসা একদিন বিপাশার স্রোতকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। পাইন অরণ্যে বাতাসের কানাকানিতে শোনা যেত দুটি প্রেমিকের প্রায়-অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন। ভোরের ছোঁয়ায় তুষার চূড়ায় লাগত তাদেরই হৃদয় থেকে ঝরে পড়া অনুরাগের রঙীন ফাগ। ওদের হাসি গানের সোনালী আলোয় ভরে গিয়েছিল কুলুর পথ প্রান্তর।

এই সময়গুলোতে ডাক্তার মুখার্জীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক বলিষ্ঠ মনের মানুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ও ধর্মের এই যুবকটি যেমন হৃদয়বান, বন্ধুবৎসল তেমনি বোহেমিয়ান প্রকৃতির। এই জুলিয়েন বেননদের তিন পুরুষ কুলু ভ্যালিতে অ্যাপেল অর্চার্ডের সঙ্গে যুক্ত। কেবল ফল ব্যবসা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁদের হোটেল ব্যবসাও।

জুলিয়েনের দাদু এবং জুলিয়েন এ দেশের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের মুক্ত মনে সংস্কারের লেশমাত্র ছিল না। জুলিয়েনের স্ত্রী বালু, কুলুবাসিনী এক রাজপুত কন্যা। তাঁদেরই একটি মাত্র সন্তান ক্যারল।

ডাক্তার মুখার্জী অকালে চলে যাওয়ায় মানবদরদী এই মানুষটির জন্য আজও মানালীর সমস্ত অধিবাসী শোক প্রকাশ করে। পাহাড়ীদের জীবনে এই শূন্যতা কে পূর্ণ করবে, সে নিয়ে আজও ঘরে ঘরে আলোচনার শেষ নেই।

আসলে অসহায় পাহাড়ীরা চায় অসুখের সময় একজন নিশ্চিন্ত অভয়দাতা। ডাক্তার মুখার্জী ছিলেন সে রকম একজন দেবদূত যিনি কাতর মানুষের ব্যথার তরঙ্গ দূর থেকেই অনুভব করতে পারতেন। কখনো সখনো দেখা যেত একটি টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি চলেছে পাহাড়ী পথে। মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার করছে। তিনিও তাদের রোগ ব্যাধির খোঁজ খবর নিচ্ছেন। দরকারে তাঁর প্রায়-দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে ওষুধ আনতে বলছেন।

বছর দুয়েক আগে ওপারের পাহাড়ী টিলা থেকে একটা অ্যাবনর্মাল ক্রিটিক্যাল ডেলিভারী কেস অ্যাটেন্ড করে ফিরছিলেন। রাত একটা, চাঁদের দুধসাদা জলে ধোয়া ভ্যালি। ফিরছিলেন একাই। যত রাতই হোক, সঙ্গে কাউকে নিতে চাইতেন না। হঠাৎ টাট্টু থেকে কি করে যেন নিচে পড়ে গেলেন।

ভোর হয়ে গেল তবু ডাক্তার মুখার্জী বাড়ি ফিরছেন না দেখে উদ্বিগ্ন ঝিন্নি দেবী স্বামীর অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু জুলিয়েন সাহেবের কাছে খবর পাঠালেন।

জুলিয়েন অমনি ছুটলেন বন্ধুর খোঁজে। যখন ফিরলেন তখন দেখা গেল, ডাক্তার মুখার্জীর প্রাণশূন্য দেহখানা লুটিয়ে পড়ে আছে বন্ধুর কাঁধের ওপর।

খবরটা কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কাতারে কাতারে মানুষ তাদের প্রিয় ডাক্তার সাহেবকে দেখার জন্য বন্যার মত আছড়ে পড়তে লাগল হসপিটাল চত্বরে।

সেই বেদনার দিনগুলো আজও বড় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে ডাক্তার মুখার্জীর প্রিয়জনদের স্মৃতি।

সেদিনের ছোট্ট অথচ বড় উজ্জ্বল একটুকরো ঘটনা আজও গাঁথা হয়ে আছে তিন্নির মনের গভীরে।

বাবার সুন্দর দেহখানা শোয়ানো আছে বাড়ির সামনে বিশাল লনে। ফুলেফুলে ছেয়ে গেছে দেহ। সারি দিয়ে পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ চোখেব জলে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

মা আর বালু আন্টি শবদেহের শিয়রে বসে আছে দুটি পাথরের পলকহীন স্থির মূর্তির মত। জুলিয়েন আঙ্কেল সমারোহপূর্ণ শেষযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।

একটা পিলারের আড়ালে একা দাঁড়িয়েছিল তিন্নি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তার জলের ফোঁটাগুলো। ভিড়ের ভেতর থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল একান্ত নির্জন এই জায়গাটিতে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন এসে তার একটা হাত ধরল।

পেছনে ফিরে দাঁড়াল তিন্নি।

ক্যারল!

ভারী গলায় ক্যারল জানাল, আমি ডাক্তারী পড়ব স্থির করে ফেলেছি তিন্নি।

অবাক হয়ে তিন্নি বলল, তুমি না বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ঢুকবে বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছ।

এই মুহূর্তে সব বাতিল করে দিলাম। চণ্ডিগড়েও আমি সিলেক্টেড হয়ে আছি।

কিন্তু কেন?

দেখছ না আঙ্কেলের জন্য মানুষগুলোর কি শোক। আঙ্কেল চলে গেলেন, ওদের দেখবে কে?

তিন্নি সেদিন এতবড় শোক ভুলে উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিল, সত্যি ক্যারল, তুমি আমার ড্যাডির মত ডাক্তার হবে!

ডাক্তার আঙ্কেলের সেরকম ইচ্ছে ছিল তিন্নি। তিনি আমাকে বার বার বলতেন।

সেদিন এতখানি শোকের ভেতরেও উত্তেজনায় ক্যারলের হাতখানা চেপে ধরেছিল পঞ্চদশী তিন্নি।

সেদিনের সেই একান্ত নিভৃতে দেওয়া কথাটির মর্যাদা রেখেছে ক্যারল। সে আজ দুবছর হল ডাক্তারী পড়ছে চণ্ডিগড়ে। বাড়ি আসতে চায় না বড় একটা। তবে প্রতিমাসে নিয়ম করে একটি চিঠি পাঠায় তিন্নির নামে। এ দুবছরে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই কয়েকদিনের ছুটির কথা তিন্নিকে আভাসেও জানায়নি ক্যারল। সম্ভবত হঠাৎ এসে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

তিন্নিদের বাড়ির সংলগ্ন পাহাড়ের একটা অংশ প্রকৃতির খেয়ালে অনেকখানি ঝুঁকে আছে গভীর একটা কড়ার মত ভ্যালির দিকে।

পাহাড়ে নিবিড় ঘন অরণ্য-বৃক্ষের সমাবেশ। সেখানে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন বাড়ি নেই।

ঝিন্নিদেবীর আগ্রহে একসময় ডাক্তার মুখার্জী অনেক তদ্বির করে ভ্যালির দিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের ঐ অংশটিতে একটি কুঠি তৈরীর অনুমতি পান।

অপূর্ব কাচের গোল একখানি বড় ঘর। সামনে ছোট্ট লন। ফুলের কেয়ারী। লনের মাঝখানে তিনটি ঘন পাতায় ছাওয়া পাইন গাছ দাঁড়িয়ে। ঘরের গা জুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে লতানে গোলাপ। লালে সাদায় ভারি দৃষ্টি-নন্দন।

ঝিন্নিদেবী নামকরা শিল্পী। ঐ ঘরে বসে তিনি তাঁর শিল্প-সাধনা করতেন। এখন তিন্নির দখলে এসেছে ঐ ঘরখানা। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের কাছ থেকে পাঠ নেয় ছবি আঁকার।

ঝিন্নিদেবী যৌবনে একবার ফ্রান্সে গিয়ে চিত্র-শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় তিন্নিকে বিদেশে পাঠিয়ে তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছেটা পূর্ণ করেন।

তিন্নি পাহাড়ে উঠে এখন তার ছবিঘরে ঢুকেছে। গেস্টদের নিয়ে সে তার পরিকল্পনার ছক তৈরী

করবে এখন। দায়িত্বটা কম নয়। এটা তার কাছে বিশেষ ধরনের একটা পরীক্ষা। সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে হবে এ পরীক্ষায়।

কোথায় অতিথিদের রাখা হবে, খাবার মেনু কি হবে, দর্শনীয় কোন্ কোন্ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এই কদিনে, ছোটখাটো কি উপহার দেওয়া যায় তাদের, এইসব নানান ভাবনা মৌমাছির গুঞ্জনের মত বেজে চলেছে তার মাথায়।

সবকিছু ভাবনার ভেতরে সূক্ষ্ম অভিমানের একটা করুণ গন্ধ মাঝে মাঝে তাকে উদাস করে তুলছিল। ক্যারল তাকে একটি কথাও জানায়নি। চিঠি এসেছে বারো দিন আগে, তাতে অনেক কথা আছে, নেই কেবল তার আসার সামান্যতম খবর।

এটা কি শুধুই সারপ্রাইজ? ক্যারল কি জানে না, জুলিয়েন আঙ্কেলকে চিঠি দিলে তা গোপন থাকবে না। তা সে যত ছোট খবরই হোক। আঙ্কেল হা হা করে হেসে যেমন হাওয়ায় হাসি ছড়িয়ে দেন, তেমনি খবরগুলোকেও চেপে না রেখে উড়িয়ে দেন আকাশে। আসলে মানুষটির ভেতর গোপনতা বলে কিছু নেই।

বার বার সুষ্ঠু একটা প্ল্যান ছকতে বসছে তিন্‌নি, কিন্তু এই সব বুদবুদের মত জেগে ওঠা চিন্তায় তা ভেস্তে যাচ্ছে।

ভ্যালির ওপারে ঝলমল করছে তুষার চূড়াগুলো। নিচে বাঁকা তলোয়ারের মত ঝিলিক মেরে বইছে একটা পাহাড়ী নদী। মার্চের শেষ সপ্তাহ। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে বরফের ধবধবে যে চাদর জড়ানো ছিল তা এখন ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। আপেল গাছে শুরু হয়েছে সাদা আর গোলাপী ফুলের মরসুম।

বন্ধুদের জন্য প্ল্যান তৈরী করতে গিয়ে বসন্তের ছবি দেখতে লাগল তিন্‌নি।

ঐ তো একপাল ভেড়া সবুজ বনের পথে আঁকাবাঁকা ঝর্ণার ঢেউ তুলে নিচের দিকে নেমে চলেছে। তাদের পেছনে একজোড়া গদ্দী পহাল। মেষচারকদের টিপিক্যাল পোশাকে তাদের মানিয়েছে চমৎকার।

প্ল্যান তৈরী মাথায় উঠল তিন্‌নির। সে কার্ড নিয়ে অতিথিদের উপহার দেবার জন্য ছবি আঁকতে বসে গেল।

পাইন গাছের পাশ দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে নামছে একটি গদ্দী পহাল। তার পেছনে তার তরুণী বউ। সুন্দর কুলুর তৈরী টুপি মাথায়। কোলে দুধসাদা একটা ভেড়ার বাচ্চা।

ছবিখানা এঁকে ভারি খুশি হয়ে উঠল তিন্‌নি। নিজের হাতে আঁকা তরুণী বউটিকে বার বার দেখছে আর রোমাঞ্চ জাগছে সারা শরীরে। ষোলটি বসন্ত পার হয়ে এসে তিন্‌নি এখন সপ্তদশী।

আরও একখানা ছবি এঁকে ফেলল সে।

ফুলন্ত আপেলের ডাল। একটি ঝুটিওলা বাহারী রঙের পাখি বসে আছে সেই ডালে। নিচের সরু শাখাটিতে বসে আছে পক্ষিণী, তার দোসরটিকে দেখছে মুগ্ধ চোখে।

এবার তার মনে হল, এই দু'খানা ছবিতে মনের কথা খুব বেশী করে মেলে ধরা হয়েছে। গোপন মনের গভীরে যা থাকে তাকে দিনের আলোয় তুলে আনলে কি বড় বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ে না? গোপন ভাবনার একটা আলাদা সুগন্ধ আছে।

এবার সে বিষয় বদল করল।

দুই তীরে ছোট বড় শিলাস্তূপ। তাদের ফাঁকে ফাঁকে উঠেছে সতেজ সবুজ পাইন গাছ। মাঝ দিয়ে বইছে নীলাম্বরী বিপাশা।

এখানেও মনে হল, অনেকগুলি পুরুষ আবেগে উচ্ছল একটি নারীকে দেখছে।

তার চতুর্থ চিত্রটি তুষার পাহাড়কে নিয়ে।

নীল আকাশের গায়ে বরফের মুকুট পরা পর্বত। চূড়ায় তার লেগেছে সকালবেলার সোনালী আলোর ছোঁয়া।

শেষ ছবিখানা আঁকতেই সন্ধ্যের ধূপছায়া দেখা দিল।

স্কেচ শেষ হয়ে গিয়েছিল, টুক্ করে আলোর সুইচ টিপল তিননি। অমনি ঝলমল করে উঠল কাচের

ঘর। আলোয় রঙের কাজ শেষ করতে হবে।

ঝিন্নিদেবী নিচের ঘরের জানলা থেকে দেখলেন, ছবিঘর আলোর বন্যায় ভাসছে। শৌখীন বেলোয়ারী ঝাড় থেকে সাত রঙের স্রোত সৃষ্টি করছে অলৌকিক ইন্দ্রধনু। দূর থেকে দেখলে দৃশ্যটা ভারি চমকপ্রদ মনে হয়।

ঝিন্নিদেবী ভাগ্‌তু, ভাগ্‌তু বলে ডাক পাড়তে লাগলেন।

ক্রাচে ভর দিয়ে তিরিশ বছরের যুবক ভাগ্‌তু এসে দাঁড়াল।

ঝিন্নিদেবী কাতর গলায় বললেন, হাঁরে বাবা, তিন্‌নি তো এখনও নামল না। সেই কখন দুপুরের খাওয়া খেয়েছে, চায়ের টেবিলেও হাজির হল না।

ভাগ্‌তুরাম বলল, তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলে ফেল।

ঝিন্নিদেবীর গলায় সংকোচের সুর, তুই আবার এই ভর সন্ধ্যেয় খাবার নিয়ে ছবিঘরে উঠবি?

তাই তো তোমার ইচ্ছে। আমি বুঝি না, তিন্‌নিকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস।

তোকে বাসি না বুঝি ?

ভাগ্‌তু এর কোন জবাব না দিয়ে বলল, কি দেবে, আমার ঝোলায় ভরে দাও। ঐ জঙ্গলের রাস্তায় একটা বালব আবার কদিন ধরে জ্বলছে না।

উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী বললেন, তাহলে তুই বাবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোনকে সঙ্গে করে আনিস।

যদি এখুনি নামতে না চায়?

তুই একটু বসে থাকবি। মোট কথা, তোর সঙ্গে যেন ও নেমে আসে।

ভাগ্‌তুরাম কাঁধের ঝোলায় খাবারের প্যাকেট আর চা ভর্তি ফ্লাস্কখানা ভরে নিয়ে ক্রাচ বগলে বেরিয়ে গেল।

ঝিন্নিদেবী তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফেলে আসা অতীতে ডুবে গেলেন।

এই সেই ভাগ্‌তুরাম। গদ্দী পহালদের দশ বার বছরের ছেলেটি। বাপ মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো ভেড়্ বক্‌রি চরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে। ভারি মিষ্টি ছেলেটা। কিন্তু একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল একদিন। আর সেই দুর্ঘটনায় ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে একখানা পা কেটে বাদ দিতে হল। ডাক্তার মুখার্জীকেই করতে হল এই দুঃখজনক কাজটি।

সেরে উঠল ভাগ্‌তুরাম। ওর বাপ এসে একদিন ডাক্তার মুখার্জীকে ধরে বলল, এ লেড়কাকে লিয়ে হামি কি করবে ডাগ্‌দর সাব? ও বেটা তো কুছ কাম মে আসবে নাই। কে জীবনভর দেখভাল করবে ওর?

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, তবে আমাকে দিয়ে দাও, ওর ভার আমিই বইব।

সেই থেকে ভাগ্‌তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর কাছেই থেকে গেল। অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মায় এক একটা ছেলে। তারা ভাগ্যের হাতে মার খেলেও কিছুতেই হার মানতে চায় না। ভাগ্‌তুরাম সেই জাতের ছেলে।

সে ক্রাচ বগলে সারা পাহাড় চষে বেড়ায়।

তখনও বিয়ে হয়নি ঝিন্নিদেবীর। নাগ্‌গরের আর্ট গ্যালারিতে দিন কাটছে। ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে চলছে অনুরাগ পর্ব। মানালী থেকে নাগ্‌গরে এই পঙ্গু ভাগ্‌তুই ছুটে ছুটে খবর লেনদেনের কাজ করেছে।

সে সব স্বপ্নের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না ঝিন্নিদেবী। আজ ভাগ্‌তু ঝিন্নিদেবীর সংসারে অপরিহার্য। নির্লোভ, আনন্দময়, অভিমানী, শিশুর মত সরল একটি হৃদয়ের অধিকারী এই যুবক। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে যে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

ঝিন্নিদেবীর মনে হয়, ভাগ্‌তু তাঁর নিজেরই ছেলে। তিন্‌নির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে রাতে যে নাচের আসর বসে, তারই একটা ছবি এঁকেছে ঝিন্নি।

কয়েকটি নর্তক নর্তকী নাচছে চক্রাকারে। বেশ মাতন লেগেছে নাচে। জোড়ায় জোড়ায় কোমর জড়িয়ে নাচছে।

পুরো রঙ দেওয়া তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দরজার সামনে মনে হল কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে তুলি, তিন্‌নি চোখ তুলে তাকাল।

মুহূর্তে বিস্ময় ঘনীভূত হল চোখের দৃষ্টিতে।

দরজা ধরে যে বাইশ চব্বিশ বছরের যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পূর্ণ অচেনা। সুদর্শন দীর্ঘদেহী যুবক। মেরুন রঙের ট্রাউজার্সের ওপর গাঢ় হলুদ রঙের টি-শার্ট পরেছে। বুকের মাঝখানে লেখা, 'উই আর ফ্রেণ্ডস্'।

তিন্‌নিকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে ছেলেটি বলল, আমি বদরী-প্রসাদজীর নাতি। তাঁর মেয়ের ছেলে।

ভেতরে এসে বসুন মিঃ অর্কদীপ। কখন পৌছলেন?

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে একমুখ হাসি ছড়িয়ে ছেলেটি বলল, আমাকে কেবল অর্ক বলে ডাকলেই খুশি হব।

অসংকোচে অর্ক বসে পড়ল তিন্‌নির মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

তিন্‌নি বলল, অর্কের আবির্ভাবের ঘোষণা আমি ভোরবেলাতেই জজসাহেবের মুখ থেকে শুনেছি. তবে ঠিক কোন মুহূর্তে এত দূরের বিদেশী মানালীতে এসে পৌছবেন তা জানতে পারিনি।

দরজার সামনে আর একটি মুখ দেখা দিল। উত্তরটা সেই মুখ থেকেই শোনা গেল।

বেলা এগারোটায়। একখানা সাদা মারুতিতে সওয়ার হয়ে। আমিই তো ওঁকে জাস্টিস বদরীপ্রসাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে দিলাম।

অর্ক ততক্ষণে পেছন ফিরে বলল, হাঁ ইনিই আমাকে নানার বাড়ির নিশানা বলে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিন্‌নি বলল, ইনি আমার দাদা ভাগ্‌তুরাম।

অর্ক হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়েও হাতখানা টেনে নিয়ে নমস্কার করল। তখনও ভাগ্‌তুরাম হাতের ক্রাচ যথাস্থানে নামিয়ে রাখেনি।

এবার ক্রাচ দুখানা নামাতে নামাতে বলল, আপনারা জায়গামত বসে থাকুন আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

অর্ক অমনি বলল, 'আপনারা' নয়, 'তোমরা' আর 'থাকুন' নয়, 'থাক'।

চায়ের আর একখানা কাপ পাওয়া গেল ছবিঘরে, কিন্তু ভাগ্‌তুর ঝোলায় খাবার প্লেট এসেছে একখানা মাত্র।

তাই সই। প্লেটে ঢালা হল সামোসা অরা কচুরি। বিকেলে চায়ের আসরের জন্য বাড়িতে তৈরী।

অর্ক বলল, দারুণ জিনিস।

তিন্‌নি বলল, প্রতি ছুটির দিনে মা এসব খাবার নিজের হাতে বানায়। বাবা বেঁচে থাকতে প্রতি রোববার অনেক আয়োজন হত। সেখানে মায়ের হাতের সামোসা ছিল মাস্ট। বাবার সব বন্ধুরা এসে খেয়ে যেতেন।

ওরা গল্প করতে করতে একই প্লেট থেকে তুলে খেতে লাগল।

তিন্‌নি প্লেট থেকে একটা কচুরি তুলে নিয়ে ভাগ্‌তুরামের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, নে খা লোভী। জান অর্ক, রোজ খাবার থালায় বেশী কম নিয়ে মায়ের সঙ্গে এই দাদাটা ঝগড়া করে। ফিফ্‌টি গ্রাম হলেও ভাগ্‌তুদার দিকেই মায়ের পাল্লা ভারি।

একটা নির্মল হাসি ওদের মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সে হাসির ঢেউ লাগল পাহাড়ে। দুচারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই হাসির তরঙ্গ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নেমে গেল ভ্যালির দিকে।

বদরীপ্রসাদ হাইকোর্ট জজ ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। ম্যাথমেটিক্‌সে ফার্স্ট ক্লাশ পাবার পর এক ক্লাশ ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে দুজনেই হায়ার স্টাডির জন্য ইউ. এস. এ চলে যান। ডক্টরেট ডিগ্রি

পাবার পর তাঁরা একটি ইউনিভারসিটিতে চাকরি করতে থাকেন। কয়েক বছর পরে অর্কদীপের বাবা প্রতিরক্ষা বিভাগে সাইনটিফিক্‌ রিসার্চ ইউনিটে কাজ পান।

দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে কাটছিল তাঁদের দিন। ইতিমধ্যে সংসারে তৃতীয় অতিথিরও আবির্ভাব হয়েছে। দুজনের আনন্দ আবর্তিত হচ্ছে শিশুটিকে ঘিরে। জীবনকে সুন্দরভাবে ভোগ করার পরিকল্পনায় মেতে উঠেছেন তাঁরা।

নাতিকে দেখার জন্য বদরীপ্রসাদ ও স্ত্রী সরযুদেবী আমেরিকাতে উড়ে গেলেন। সেখানে কয়েকমাস সবাই মিলে আনন্দ উৎসবে কাটালেন।

ফিরে আসার পর সরযুদেবীর মন বসে না সংসারের কাজে। নাতির মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে চোখের ওপর। চার বছরের ছেলে সাইকেল চালাচ্ছে লনে। ক্যারাটের প্যাঁচ চালাচ্ছে নানার ওপর। ক্ষুদে ওস্তাদের মারে জব্দ হয়ে দুঁদে বিচারপতি লুটিয়ে পড়ছেন বিছানায়।

সাত বছরের অর্ককে নিয়ে তার বাবা মা আসবে মানালীতে একটা ছুটি কাটাতে।

নির্দিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে প্লেন ধরার জন্য আসছিলেন তাঁরা। সময় খুব কম ছিল হাতে। অর্কের বাবাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাশে এক বন্ধু। দারুণ স্পীডে গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ছিট্‌কে ডিগবাজি খেল গাড়ি। বন্ধুটি হাত ভেঙে রক্ষা পেল। অর্ককে জড়িয়ে ধরেছিলেন তার মা। দুজনেই আশ্চর্যভাবে অক্ষত। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন অর্কের বাবা। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

এই আঘাতে প্রায় মূক হয়ে গিয়েছিলেন অর্কের মা।

বদরীপ্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মেয়ের কাছে। অনেক শাস্ত্রীর শ্লোক আউড়ে বিচারক বদরীপ্রসাদ মেয়েকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে আসার, কিন্তু কোন দিক থেকেই তিনি সফল হতে পারেননি। মেয়ে স্বামীর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে পড়ে রইল আমেরিকায়।

তারপর দীর্ঘ ষোল বছরে বদরীপ্রসাদ অন্তত বার ছয়েক স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন মেয়ে আর নাতির কাছে।

এখন অতি বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়েছেন জজ সাহেব। তাই নাতিই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছে নানা নানিকে।

অর্ক হায়ার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারী কাজে নিযুক্ত। টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা নামও করেছে।

চিকিৎসক বলে জজসাহেবের বাড়িতে প্রায়ই ডাক পড়ত ডাক্তার মুখার্জীর। সেই সুবাদে দুবাড়ির ঘনিষ্ঠতা।

তিন্‌নি দিনে একটিবার অন্তত না গেলে বৃদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের অসুখী মনে করেন। অস্থির হয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁদেরই মুখে তিন্‌নি কতবার শুনেছে অর্কের কাহিনী। কৃতি ছাত্র হিসেবে তার উত্থান, অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ অথচ স্নেহরসে মাখা তার ঘরোয়া জীবনের ছবিগুলিও। সরযুদেবী যখন এসকল গল্প করতেন তখন পাশে বসে থাকা বদরীপ্রসাদজীর মুখখানা নাতির কৃতিত্বের কাহিনীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হত, এই প্রথম তিনি কোন তাজ্জব কাহিনী শুনছেন।

ভাগ্‌তুরাম বেরসিক নয়। চায়ের পাট চুকলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিচে অনেক কাজ পড়ে। তোরা আয় আমি এগোচ্ছি।

অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এইতো দাদার মুখের কথা। তুই তুকারি না করলে কি দাদা মানায়।

তিন্‌নি অমনি বলল, এতকাল বিদেশে থেকে এসব অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ডাকের কথা তুমি জানলে কি করে?

আমার মা আদ্যোপান্ত ভারতীয়। ছোটবেলা থেকে এদেশের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবই তার কাছ থেকে শিখেছি, জেনেছি। আমার কথাবার্তায় কোন জড়তা দেখছ কি?

তিন্‌নি বলল, একটুও না, সত্যি অবাক লাগছে !

ভাগ্‌তুরাম পথের দিকে ক্রাচখানা বাড়িয়ে বলল, তোরা গল্প কর, আমি এগোচ্ছি।

ভাগ্‌তু চলে গেলে ওরা আবার মুখোমুখি বসল।

অর্ক বলল, তোমার নিজের কোন দাদা আছে বলে তো শুনিনি?

তিন্‌নির মুখখানা উত্তর দিতে গিয়ে উদ্ভাসিত হল, আমার নিজের আর কোন ভাইবোন নেই ঠিক, কিন্তু ভাগ্‌তুরাম আমার আপনার ভাইয়ের চেয়েও বড়। ও আমাকে কোলেপিঠে নিয়ে মানুষ করেছে। আমাকে ধমক দেয়, শাসন করে, কিন্তু দরকার হলে ও প্রাণ দিয়ে দিতে পারে আমার জন্যে। এটা কিন্তু কথার কথা নয়, খাঁটি সত্যি।

এরপর ভাগ্‌তুরামকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলল দুজনের ভেতর।

অর্ক এক সময় বলল, তুমি কি মায়ের মত শিল্পী হবে ভেবেছ?

এই কয়েক ঘন্টা আগে মানালীতে পৌঁছে, আমার মায়ের সম্বন্ধে এত কথা জানলে কি করে?

আমার মায়ের মুখে তোমাদের পরিবারের সব কথাই শুনেছি। তাছাড়া প্রায় প্রতি ডাকে নানির চিঠিতে তোমাদের খবর থাকবেই।

ও তাই।

তোমার বাবা হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় আমাদের পরিবারেও শোকের ছায়া ফেলেছিল। মা আক্ষেপ করে বলেছিল, আমি মা বাবার জন্যে কিছুই করতে পারিনি, যা করেছেন, ডাক্তার মুখার্জী। তাঁর সামান্য ঋণশোধেব সুযোগ না দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

তিন্‌নির গলায় কষ্টের সুর ফুটে উঠল, বাবার প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক, এসো, আমরা বরং অন্য কথা বলি। হাঁ, তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। মায়ের ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েট হবার পরে পুরোপুরি ছবি নিয়েই থাকি।

অর্ক মন্তব্য করল, আন্টি ঠিকই বলেছেন।

তিন্‌নি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি কি মুখ দেখে জাতকের সবকিছু জানতে পার নাকি ? ছবি যে আমার হাতে আসবে এ কথা তুমি জানলে কি করে?

অর্ক বলল, মৌমাছি, প্রজাপতিকে দেখলেই বলে দেওয়া যায়, তাদের সবথেকে আকর্ষণের বস্তুটি কি, অথবা কোথায় তাদের মানায়।

মিষ্টি হাসির ঢেউ তুলে তিন্‌নি বলল, কম্পিউটারে তুমি ছবি আঁক না কবিতা লেখ? তিন্‌নির হাসিতে যোগ দিয়ে অর্কও হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, তিন্‌নি, আজ কিন্তু তোমার কাছে অর্কদীপ নামে কালিফোর্ণিয়াবাসী কোন যুবক আসেনি। যে এসেছে সে এক জাঁদরেল জজ গৃহিণীর দূত মাত্র। নিছক একটি সমাচার পৌঁছে দিতে এসেছে।

তিন্‌নি ঘাড় কাৎ করে হাসি মুখে খবরটি শোনার জন্য চেয়ে রইল।

প্রভাতী চা ও নাস্তায় জজসাহেবের কোঠিতে তিন্‌নিদেবীর আমন্ত্রণ।

ঠিক আছে। কাল নাস্তার টেবিলে কালিফোর্ণিয়ার এক আগন্তুকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হবে।

দুজনে নীচে নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তিন্‌নি ভেতরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল।

বনের সংকীর্ণ পথটা এখানে এসেই শেষ হয়েছে। লাইটপোস্ট থেকে ম্লান হলুদ বাল্‌বটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে বনের পথটাকে চেনাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনি দূরে দূরে কয়েকটা বাল্‌ব টিম্ টিম্ জ্বলছে।

বন রহস্যময়। আকাশে চাঁদ নেই। ঝিঁঝির ডাক একটানা বেজে চলেছে।

ওরা হাত ধরাধরি করে নামতে লাগল।

যেখানে একটা বাল্‌ব না থাকায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে অন্ধকার থমকে আছে সেখানে অনেক নীচের বাতিটার দিকে লক্ষ্য রেখে নামতে হচ্ছিল।

এখন তিন্‌নি শক্ত করে ধরেছে অর্কদীপের হাত।

তুমি আমার সঙ্গে নিশ্চিন্তে নেমে এসো। একটু আস্তে আর সাবধানে পা ফেলবে।

ওদের চলার গতি অনেকখানি কমে গেছে। এখানে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। ঝিঁঝিদের একটানা সানাই ঘন অন্ধকারে যেন মাতন তুলেছে। কয়েকটা জোনাকি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে নাচতে নাচতে ওপরের দিকে উঠে গেল।

একবার থমকে দাঁড়াল অর্ক। হাতে টান পড়তেই থেমে গেল তিন্‌নিও। মুহূর্তে অজানা একটা আশঙ্কা তার সারা শরীরটাকে হিমেল ছোঁয়ায় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্‌নি বলল, দাঁড়ালে যে?

অর্ক বলল, শোন, ঝিঁঝিরা কি অদ্ভুত ভাবে ডাকছে।

তিন্‌নি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল, অর্ক সত্যিই কবি। একটু অগে সে প্রজাপতি আর মৌমাছির কথা বলছিল। ফুল যে ওদের প্রিয় আর আকর্ষণের বস্তু তা যেমন কাউকে বলে দিতে হয় না তেমনি তিন্‌নির যে শিল্পের ওপর আকর্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অর্কের উত্তরটা ভারি ভাল লেগেছিল তখন। এই মুহূর্তে ওর ভেতরে একজন সত্যিকার কবিকে আবিষ্কার করল সে।

তিন্‌নি বলল, ওরা রাতের রাগিণী তুলেছে।

ভারি চমৎকার বললে তো।

দেখ অর্ক, দিনের মত রাত্রি নিজেকে আলোয়, উত্তাপে প্রকাশ করে না। তার প্রকাশ বড় স্নিগ্ধ। দিনের বেলা সবকিছু বড় বেশী লাউড। রাতে ঐ যে আকাশে কটি ঝিকিমিকি তারা, এই যে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে গেল কটি জোনাকি, ঝিঁঝিদের করুণ সুরে একটানা ভায়োলিন বাজানো, এগুলোতেই ঘোমটা পরা রাতের হৃদয়টাকে চেনা যায়।

তুমি দার্শনিক তিন্‌নি।

আমাকে এতবড় কমপ্লিমেন্ট দিও না অর্ক। তবে আমি বলার চেয়ে ভাবতে বেশী ভালবাসি।

তোমার বলাও কিন্তু খুব সুন্দর।

আমি কথা কম বলি অর্ক। আজ হঠাৎ তোমার ভারি সুন্দর কয়েকটা অনুভূতি আমার মনকে ছুঁয়েছে, তাই এত কথা বলছি।

অর্ক বলল, আমার বুকের ওপর লেখাটা তোমার চোখে পড়েছে?

ওটা কেবল তোমার বুকের ভাষা নয় অর্ক, আমাদের মত আজকের সব তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ভাষা। 'উই আর ফ্রেণ্ডস'। কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে অর্ক।

সামান্য সময়ে আর কোন কথা হল না। দুজনের হাতের স্পর্শ দুজনকে অনুভব করল।

চল নামি।

দুটি তরুণ তরুণী অল্প সময়ের ভেতরেই আলোর রাজ্যে এসে পড়ল।

তিন্‌নি বলল, চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অর্ক বলল, আমি একবার যে পথে আসি সে পথ ভুলি না।

তিন্‌নি বলল, আমারও তোমার মত একটা গুণ আছে।

কি?

আমি যাকে একবার দেখি এবং একটি কথা অন্তত বলি তাকে কোনদিন ভুলি না।

অর্ক বলল, তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

দুজনেই হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমি পথ চিনি কিন্তু পথের বন্ধুকে সহজে ছেড়ে দিই না।

আবার হাসি, দুজনে দুজনের হাত ধরল।

তিন্‌নি বলল, এবার তোমাকে আর একটা পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব। এটা বাঁধানো পথ নয়, আপেল বাগিচার ভেতরের পথ।

ওটা তো অন্ধকারে ঢাকা।

আমি কি তোমাকে অনেকখানি অন্ধকারের পথ পার করে আনিনি? তাছাড়া আমার ছবিঘরে ওঠার সময় তুমি তো ঐ অন্ধকারের পথটুকু একাই পেরিয়ে গিয়েছিলে।

অর্ক বলল, আমার ওঠার সময় কিন্তু তোমার ঘরের ঐ উজ্জ্বল আলোর কিছুটা রশ্মি ঐ পথে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিন্‌নি বলল, ভয় নেই। ঐ আপেল বাগিচা জুলিয়েন আঙ্কেলের। ওখানে সারারাত আলো জ্বলে। তিনটি মেয়ে বাগিচার ভেতর কুঠিতে থাকে।

বাগানের পথে চলতে চলতেই ওদের কথা হচ্ছিল।

ওদের কাজ কি?

তদারকি করা। আপেল বাগানে জুলিয়েন আঙ্কেলের নার্সারি আছে। সেগুলোর পরিচর্যা করে ওরা। তাছাড়া 'এপ্রিল-মে'তে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হলে কিংবা হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করলে ওরা নানাভাবে ফলের গুটি রক্ষার চেষ্টা করে। ফলের মুরসুমে তৈরী ফল খাবার জন্য ফ্লাইং ফক্সের হামলা তো আছেই। এরা সেই সব ঠেকায় নানা কৌশলে।

একটা কুহলের শব্দ ওরা শুনতে পেল। বাগিচার ভেতর দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। জলে উপলে মিলে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

একটা অপরিসর কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে কুহলটার ওপারে গেল ওরা। সাঁকোর পাশে আলোটা বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোর টুকরো পড়ে কুহলের স্রোত ঝলকাচ্ছে। তারই ধারে বাগানের একমাত্র পাইন গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। পাইনের তলায় একটি মসৃণ বাদামী পাথরের বেঞ্চ।

অর্ক বলল, যাঁর বাগান তিনি বেশ শৌখিন মানুষ।

তিন্‌নি বলল, জুলিয়েন আঙ্কেল যেমন শৌখিন তেমনি মেজাজী। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এখন আমাদের কুলু, মানালীর দুটো বাগানই উনি দেখেন।

একদিন ওঁর সঙ্গে আলাপ করব।

বেশ তো, আমি একদিন আঙ্কেলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

কি পরিচয় দেবে?

বলব, আমার এক বিদেশী বন্ধু। সানসাইন অর্চার্ডের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

অর্ক বলল, এই বাগিচার নাম বুঝি 'সানসাইন অর্চার্ড?'

এসো, আঙ্কেলের বাগিচার ঐ বেঞ্চে দুদণ্ড বসি।

ওরা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসল।

তিন্‌নি বলল, হাঁ বাগিচার ঐ নাম। এই অর্চার্ডের খ্যাতি আজও সব জায়গায়। জুলিয়েন আঙ্কেলের গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার এইটিন এইট্টি ফোরে মানালীতে আপেল বাগিচার পত্তন করেন। তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন এ. টি. বেনন।

কুলু ভ্যালিতে তিনিই তাহলে প্রথম আপেল বাগিচার পত্তন করেন?

না, প্রথম করেন ক্যাপ্টেন লী 'বান্দ্রোলে'। তাঁর প্রেরণায় ক্যাপ্টেন বেনন 'মানালীতে'।

অর্ক বলল, এখন কুলুতে খুব উৎকৃষ্ট আপেলের অনেক বাগিচা হয়েছে বলে শুনেছি।

তোমার নানা বদরীপ্রসাদজীরও একটি বাগিচা আছে। ছোট কিন্তু মূল্যবান। কুলুর বিখ্যাত গোল্ডেন অ্যাপেলের গার্ডেন।

আমি জানি উনি ঐ আপেল মার্কেটে পাঠান না। আত্মীয় বন্ধুদের পার্শেল করে উপহার পাঠান।

ঠিক। চাষবাসের দিকে ওঁর খুব নজর। উৎকৃষ্ট গমের একটি ক্ষেতও আছে। নানান ফুলের চাষ নিয়েও মেতে থাকেন।

হাঁ নানার এসব হবি আছে। শুনেছি তোমাদের উনি খুব ভালবাসেন। নানির মুখে প্রায়ই তোমাদের নাম শুনি।

তিন্‌নি বলল, তুমি হয়তো জান না, ওঁর গার্ডেনের প্রথম তোলা কয়েকটা আপেল উনি সবার আগে

বাবার কাছে উপহার হিসেবে পাঠাতেন। বাবা মারা যাবার পর তোমার নানি নিজে এসে মাকে ঐ আপেল দিয়ে যান। তাছাড়া আমি নানার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ফুল উপহার পাই।

অর্ক হেসে বলল, আমার নানা নানির কাছে কিন্তু তুমি আমার চেয়েও প্রিয়।

তিন্‌নি হেসে উঠে বলল, ঐ দেখ, তোমার কথা শুনে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিয়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ। ঝক্‌ঝক্ করছে। দুধ ঢেলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে চরাচর। বনের মাথা থেকে সরে গেছে অন্ধকারের ঘোমটা।

একটি মেয়ে কুহলের ওপার থেকে অনুচ্চে ডাক দিয়ে বলল, তিন্‌নি দিদি?

তিন্‌নি এতক্ষণ কথায় মশগুল হয়ে কোনদিকে তাকায়নি। সে এখন শব্দের দিকে মুখ ফেরাল।

কে, পার্বতী?

কৌতূহলী মহিলাটি হাতছনি দিয়ে তিন্‌নিকে কাছে ডাকল। সে সংকোচে সাঁকো পেরিয়ে আসতে পারছিল না।

তিন্‌নি ওর কাছে এগিয়ে গেল।

ওরা হাত নেড়ে অনুচ্চে কথা বলছিল। অর্কের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না সে সব কথা।

তিন্‌নি দিদি, ঐ সুন্দর ছেলেটি কে ? ওকে অগে তো কখনো মানালীতে দেখেছি বলে মন হয় না।

ছেলেটি আজই এসে পৌঁছেছে আমেরিকা থেকে। জজ সাহেবের নাতি। ওকে এই বাগানের ভেতর দিয়ে বদরীপ্রসাদজীর বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম।

তোমার কুঠিতে গিয়েছিল বুঝি ?

তিন্‌নি পাহাড়ের ওপর ছবিঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি যাচ্ছি তিন্‌নি দিদি।

তিন্‌নি বলল, যাও, তোমাদের তো আবার খাবার সময় হয়ে গেছে। আমি এখুনি এই পথেই ফিরে আসব।

অর্ককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তিন্‌নি।

সানসাইন অর্চার্ড পেরিয়ে পথ। পথের ওপারে বদরীপ্রসাদের ছোট্ট বাগান। তারপরেই জজসাহেবের ছবির মত বাড়িখানা।

এবার নিশ্চয় যেতে পারবে?

পারব, কিন্তু তুমি আসবে না?

আসব, তবে আজ নয় কাল। নাস্তার নিমন্ত্রণে।

অর্ক হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে পথ পার হয়ে বাগানে নেমে গেল। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল তিন্‌নি।

দুই

মা বলল, এত দেরী কেন রে তিন্‌নি? সেই কত আগে ছবিঘরের আলো নিভতে দেখলাম, ছিলি কোথায়?

কেন, ভাগ্‌তুদা তোমাকে কিছু বলেনি?

বদরীপ্রসাদজীর নাতি এসেছে বলেছিল। সে নাকি ছবিঘরে গিয়েছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে।

তিন্‌নি হঠাৎ মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, ভেরি ভেরি হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান। ওকে তোমার সামোসা খাইয়ে দিয়েছি। বলল, দারুণ !

মোটে তিনটে তো পাঠিয়েছিলাম, একটা ভাগ্‌তুর, তোর দুটো।

ভাগ্‌তুদার একটা কেন?

ও তো এখানে খেয়ে গেছে। তবু তুই ওকে না দিয়ে খাবি না বলে একটা বেশী পাঠিয়েছিলাম।

তোমার লোভী পুত্রকে একটা খাইয়েছি। আমরা দুজনে বাকি দুটো খেয়েছি। তাই খেয়েই অর্কদীপ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ছেলেটির নাম অর্কদীপ বুঝি?

হ্যাঁ মা। নামটা কিন্তু বেশ।

অর্কদীপ মানে কি রে? তোর বাবা তো তোকে সংস্কৃত পড়িয়েছিল।

তিন্নি বলল, অর্ক মানে সূর্য। সূর্য তো বিশাল এক দীপ। সেই দীপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আলো।

তা ছেলেটি জজসাহেবের ওখানে চলে গেল?

আমি এগিয়ে দিয়ে এলাম।

তোর দেরী হচ্ছে দেখে আমি ভাগ্তুকে তোর খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। ও সারা পথ ঢুঁড়ে এসেছে, তোদের কোথাও দেখতে পায়নি।

আমি ওকে জুলিয়েন আঙ্কেলের আপেল অর্চার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথটা শর্টকাট, তাই।

ওখানে মেয়েরা ছিল না?

থাকলই বা, ওরা কি আমাকে বাধা দেবে নাকি? পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অর্কের পরিচয় জানতে চাইল, বলে দিলাম।

ব্যাপারটা ঠিক হল না।

কেন মা, অন্যায় তো কিছু করিনি। বরং জুলিয়েন আঙ্কেলের অর্চার্ডের ঐ বেঞ্চটায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। চাঁদ উঠল আর আমরাও উঠলাম।

ঝিন্নিদেবী বললেন, আমি জানি, কোন রকম অবিবেচনার কাজই তুই করতে পারিস না। তবু সামান্য সূত্র ধরে জটিল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি হঠাৎ জটিল হতে যাবে কেন মা? ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

রাতে শোবার সময় তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

অতএব ডিনার পর্ব, তারপর শয়ন পর্ব পর্যন্ত তিন্নিকে একটা সাসপেন্সে থাকতে হল।

শোবার ঘরের লম্বা বড় জানালাটার ধারে দুটো চেয়ার পেতে বসেছে মা ও মেয়ে। নিচে গভীর ভ্যালিটার বুক চিরে এঁকে বেঁকে মানালসু নদীটা বয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়ে ধবধব করছে উপবীতের মত। পাইন গাছের সারি, বড় ছোট শিলাখন্ড ডুবে আছে চাঁদের স্বচ্ছ জলে। অদ্ভুত মায়াময় সাগরতল বলে মনে হচ্ছে চাঁদের আলোয় ডোবা গভীর ভ্যালিটাকে। উপত্যকার চারদিক ঘিরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, তারই ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

ঝিন্নিদেবী ভ্যালির ওপারে একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ পাহাড়টার কথা মনে পড়ে তিন্নি?

পড়ে বইকি মা। বার তের বছর বয়স পর্যন্ত বাবার টাট্টুর সামনে চড়ে এই ভ্যালি পেরিয়ে ঐ পাহাড়ে উঠেছি।

ওখানে তোর বালু আন্টির বাবা পণ্ডিতজী বিকেলে সুর করে রামায়ণ পড়তেন, মনে পড়ে?

পাহাড়ী বস্তির মেয়েরা সারি সারি বসে ওঁর মুখ থেকে তুলসীদাসের রামায়ণ গান শুনত। আর বাবার টাট্টু উঠোনে পৌঁছলেই মেয়েরা নমস্কার করে সরে দাঁড়াত। পণ্ডিতজী পুঁথি রেখে উঠে আসতেন। বাবা পাশের ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করত। আমি ততক্ষণ মেয়েদের দেওয়া তিলৌড়ি খেতাম। বাবা খেতে ভালবাসত বলে ওরা অনেক কটা ঠোঙায় পুরে আমারে হাতে দিয়ে দিত।

সবই দেখছি মনে আছে তোর।

এই তো সেদিনের কথা মা।

পণ্ডিতজীর সাংসারিক অবস্থা কিন্তু ভাল ছিল না। মা মরা ঐ বালু আন্টিকে নিয়ে খুব কষ্টেই তাঁর দিন কাটত। তিনি জাতিতে রাজপুত হয়েও কুলুতে এসে কৃষিজীবী কানেতের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাই পতিত হলেন নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। দু'এক বিঘে ক্ষেতির ফসলে সংসার চলত টেনেটুনে। স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলেটা মিলিটারীতে ঢুকল। একটি পয়সা পাঠাল না

বাবাকে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে পণ্ডিতজী পড়ে রইলেন ঐ পাহাড়ী কুঠিতে।

তিন্নি বলল, বালু আন্টির যে একজন দাদা আছেন, তা তো জানতাম না।

থেকেও যে নেই তার কথা কে মনে রাখে মা।

তিন্নি বলল, বালু আন্টির সঙ্গে কি করে বিয়ে হল মা জুলিয়েন আঙ্কেলের? ধর্ম কিংবা পদমর্যাদা কোনটাতেই তো মেলে না। ওঁদেরও কি আমার মা বাবার মত ভালবাসার বিয়ে, না অন্য কিছু?

না মা, একটা পরিস্থিতির ভেতরে পড়ে ওদের বিয়েটা হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির ভেতরে আমি, তোর বাবা সকলেই জড়িয়েছিলাম।

কি রকম মা?

সেটা বলব বলেই আজ তোকে এখানে ডেকে এনেছি।

খানিক সময় থামলেন ঝিন্নিদেবী। তিন্নি অজানা কিছু জানার জন্য মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি তখন থাকি নাগ্গরে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারিতে কাজ নিয়ে আছি। তোর বাবা তখন একটা ডিস্পেনসারি খুলেছে মানালীতে। তোর নানা নরসিংলালজী কুলু মানালীর দুটো অর্চার্ডেই তদারকি করছে।

তখন কি তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

না। তবে আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম বিয়ে করব বলে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

তোমরা দুজনেই তো ব্রাহ্মণ ছিলে মা, তবে বাধাটা কোথায়?

আমার বাবা খুবই সাচ্চা মানুষ ছিলেন। তিনি কুলু মানালীর বাগিচা নিজের নামেই করে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কলকাতা থেকে তোমার বাবাকে ডেকে এনে তার হাতেই বাগিচা দুটি তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বলল, চাচাজী, আমি অতশত বুঝি না, আপনি যেমন বাগানের কাজ চালাচ্ছিলেন তেমনি চালাবেন। আমি মানালীতে ডাক্তারী করব।

সে না হয় হল, কিন্তু তোমাদের বিয়েতে বাধাটা এল কোন দিক থেকে?

আমার বাবার বড় লোক-নিন্দার ভয় ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের বিয়ে হলে লোকে ভাববে, নরসিংলালজী বড় চালাক লোক।

কেন, এতে চালাকির কি আছে?

ওরা ভাববে, নিজের মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়ে দুটো বাগান নিজের কব্জায় রেখে দিলে। ডাক্তারের অন্য জায়গায় বিয়ে হলে নরসিংলালের আর এমন নবাবী থাকত না।

এর সমাধান হল কি করে?

আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম, যত বাধাই আসুক ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেওয়ালির মেলা বসবে নাগ্গরে, সারা রাত বাজি পুড়বে, সেই দিনই আমরা বিয়ে করব। কিন্তু একটা বাধা এল। সে বাধাটা আমিই সৃষ্টি করলাম। আমারই ভুলে বিপর্যয় ঘটল।

কি রকম?

পণ্ডিতজী অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার বাবা একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। সেখানেই বালুর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। তোমার বাবার মনটি ছিল কোমল। পণ্ডিতজীর সংসারের চরম দুরবস্থা দেখে বালুকে তার ডাক্তারখানার কাজে বহাল করে। ডেলিভারি কেসে বালু তোমার বাবার সঙ্গে সব জায়গাতেই যেত; পাহাড়ী মেয়েদের সংকোচের জন্যেই এ ব্যবস্থাটা করতে হয়েছিল। কিন্তু খবরটা কানে আসতেই আমি ভুল বুঝলাম। নাগ্গর থেকে ছুটে গেলাম মানালী। বালুকে দেখলাম, পরিচয় হল। হঠাৎ তোমার বাবা সামান্য কারণে আমার সামনেই তিরস্কার করল বালুকে। অভিমানী বালু বিদায় নিল চোখের জল ফেলে। সে আর তোমার বাবার কাজে এল না। অমনি নাগ্গরে ফিরে এলাম।

তারপর?

ঘটনাচক্রে ভুল পথে পা বাড়াল বালু।

কি রকম।

সিজ্ন টাইমে পথের ধারে যে রেস্টুরেন্টগুলো গড়ে ওঠে তারই একটাতে রান্নার কাজ নিল ও। সে

বছর পঙ্গপালের মত কুলু মানালীর পথঘাট ছেয়ে ফেলেছিল হিপিরা। কি করে যেন তাদেরই একজন মোহগ্রস্ত করে ফেলল বালুকে। সন্তানসম্ভবা হল ও।

বালু আন্টি!

দুঃখ পেও না মা, ঘৃণা কর না। অনেক সময় দারিদ্র্যের অসহ্য জ্বালা সইতে না পেরে মানুষকে অনেক অনেক নীচে নামতে হয়।

ঝিন্নিদেবী দেখলেন তিন্‌নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কেঁদো না মা। মানুষই অবস্থার বিপাকে পাপের ভেতর জড়িয়ে পড়ে, আবার অবস্থার পরিবর্তনে নির্মল, শুদ্ধ হয়। তোমার বালু আন্টি এখন দুঃখের আগুন থেকে বেরিয়ে এসেছে নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল সোনার মত।

নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্‌নি চোখ মুছে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলে যাও মা।

হিপিরা উড়ে চলে গেল বালুকে নিঃস্ব করে দিয়ে। অসহায় বালু পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ সময় জুলিয়েনদের ফলের বাগানে একটা কাজ পেয়ে গেল বালু। পার্বতীরা এখন যে সব কাজ করছে, সেই কাজ।

তখন কি জুলিয়েন আঙ্কেলই বাগিচার কাজ দেখতেন?

দেখত, তবে জুলিয়েনের বাবা তখন বেঁচে। তিনিই ছিলেন সবকিছুর মালিক।

তিন্‌নি বলল, এখন তুমি বালু আন্টির কথা বল।

বালু বাগানের কাজে যোগ দেবার পর জুলিয়েন মাস তিনেকের জন্য ফলের বাজার স্টাডি করতে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারই ভেতর বালু যোগ দিল আমাদের বাগানে। ঠিক তখনই ঘটল দুর্ঘটনা।

কি দুর্ঘটনা মা?

বাগিচায় কাজ করার সময় একদিন পা পিছলে পড়ে গেল বালু। আঘাত পেল প্রচণ্ড। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাগিচার অন্যান্য মেয়েরা তুলে নিয়ে এসে বাবার ডিস্‌পেনসারিতে হাজির করল।

ঝিন্নিদেবী সামান্য সময় থামলেন।

তিন্‌নি তখন ঘটনাটা জানার আগ্রহে অধীর। সে বলে উঠল, মা তারপর?

কম্পাউণ্ডার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তোর বাবা বড় রকম একটা অপারেশন করল। গর্ভস্থ শিশুটি আগেই মারা গিয়েছিল, অনেক চেষ্টায় মা বেঁচে গেল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না একজন।

কে মা?

লোকনিন্দার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না তোমার বাবা।

ঐ কম্পাউণ্ডার রটিয়ে দিল বালুর ব্যাপারটা। কিছু আর গোপন রইল না। আশপাশের সমস্ত লোক ভেবে নিল তোর বাবাই এসব অবৈধ কাজ করেছে। আর তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য অপারেশান করে নষ্ট করে দিয়েছে শিশুটাকে।

আশ্চর্য! যারা আমার বাবাকে দেবতা বলে ভাবত তারাই এমন মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে!

অন্য মানুষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই মা, আমি নিজেই অপরাধী।

তুমিও!

তোর নানাকে বিষিয়ে দিয়েছিল ঐ কম্পাউণ্ডার। আমিও মা মানালী থেকে দূরে নাগ্‌গরে বসে চোখের জলে ভেসে ঐ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম।

ঝিন্নিদেবী সেদিনের কথা ভেবে গড়িয়ে পড়া চোখের জল আঁচলে মুছতে লাগলেন।

তারপর বাবার কি হল মা?

বালু তার অপরাধের কথা তোর বাবার কাছে স্বীকার করল। এ নিয়ে তোর বাবা কোন লোকের কাছে সাফাই গাইতে গেল না।

উদ্দীপ্ত হয়ে তিন্‌নি বলল, কেন যাবে বাবা? আত্মসম্মান যাঁর আছে তিনি কখনও কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন না।

এরপর একটি অবাক কাণ্ড ঘটল।

কি কাণ্ড মা?

তোর জুলিয়েন আঙ্কেল ট্যুর থেকে ফিরে এসে বাবার মুখ থেকে সব কথা শুনল। শুনেই ক্ষেপে উঠে বন্ধুর সম্মান রক্ষার জন্য একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসল।

কি রকম?

সে রটিয়ে দিল, বালুর গর্ভে তারই সন্তান ছিল। ট্যুর থেকে ফিরে এসে বালুকে সে বিয়ে করবে স্থির করে রেখেছিল। তার অনুপস্থিতিতে এই অঘটন ঘটে গেছে।

গ্রেট।

শুধু রটনা করে দিয়েই চুপচাপ বসে থাকেনি। নিজের মায়ের মতটুকুও আদায় করে নিল। তারপর বাজ্যসুদ্ধু লোককে চিঠি পাঠিয়ে বিয়ের নেমন্তন্ন করে বিরাট রিসেপশান দিল।

বালু আন্টির মনের অবস্থা তখন কি রকম?

মেয়েটি তো আসলে সরল প্রকৃতির। সে ভাবতেই পারেনি এত গভীর নরক থেকে সে কোনদিন স্বর্গের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারবে। তাই ডাক্তার আর তার বন্ধু জুলিয়েনের কাছে কেঁদে কেটে সারা হল।

বিয়ের পরও কি জুলিয়েন আঙ্কেল সমান সমাদর করতেন বালু আন্টিকে?

ঐ বোহেমিয়ান মানুষটি আজ পর্যন্ত বালুকে তার নিজের মায়ের মত সমান মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। ওর মত এতবড় হৃদয়ের মানুষ তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ আছেন কি না আমার জানা নেই।

তিন্‌নি প্রাণখুলে হেসে উঠল।

হাস্‌লি যে?

তুমি বাবাকে এতবড় কমপ্লিমেন্ট দিলে, তাই হেসে অভিনন্দন জানালাম।

অনেক দুঃখ দিয়েছি আমি তোর বাবাকে, কিন্তু এতবড় ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সেবায়, সান্ত্বনায় ভরিয়ে দিত তার চারিদিকের মানুষদের, আর আপনজনদের ভরে রাখত তার বুকের পাঁজরে।

বাবার কথায় চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তিন্‌নির।

ঝিন্নিদেবী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এখন শোন, কেন আমি জুলিয়েনের বাগান দিয়ে বাতে তোদের যাওয়াটা পছন্দ করিনি।

কেন মা?

এক সময় বদরীপ্রসাদজীর মেয়ে সিমলায় কনভেন্টে থেকে পড়াশোনা করত। তখন বেননদের সঙ্গে ওঁদের খুব ভাবসাব ছিল। বদরীপ্রসাদজী থাকতেন দিল্লীতে। সরযুদেবী কিন্তু এই মানালীর বাড়িখানি আগলে থাকতেন। আপদে বিপদে সাহায্য চাইতেন বেননদের।

এখন তো ওদের সঙ্গে খুব যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না মা।

ঠিকই বুঝেছিস, তবে আসল কারণটা জানিস না।

কি কারণ মা?

সরযুদেবীর ইচ্ছে ছিল নিজের একটি মাত্র মেয়েকে কাছে রেখে দেবার। সেজন্যে তিনি জাত খুইয়ে বেননদের ছেলে জুলিয়েনকেও জামাই করতে রাজি ছিলেন। স্বামী দূরে থাকত বলে জুলিয়েনকে কখনো সখনো সিমলা পাঠাতেন মেয়ের খোঁজখবর নিতে। অবশ্য সিমলায় জুলিয়েনদের প্রায়ই কাজ থাকত, সেজন্যে ওদের পক্ষে সিমলায় যাওয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। একবার জজসাহেবের অসুস্থ মেয়ে সুমনাকে সিমলার কনভেন্ট থেকে নিয়েও এসেছিল জুলিয়েন। সুমনাকে বিয়ে করবে এমন মতলব তার আদপেই ছিল না। কেবল কাতর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মানবতার খাতিরে এসব কাজ করত। কিন্তু অপমানিত হল একদিন।

কি রকম?

বদরীপ্রসাদজী একবার বাড়ি এসেছেন। ছুটিতে সুমনাও এসেছে। সম্ভবত সেই প্রথম তিনি স্ত্রীর মুখ থেকে জুলিয়েনকে জামাই করার প্রস্তাবটি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন জজসাহেব। আর ঠিক সেই সময়েই বাগান পেরিয়ে ওঁর বাড়ির দিকে আসছিল জুলিয়েন। জজসাহেব ঘরের ভেতর থেকে উত্তেজিত অবস্থায় স্ত্রীকে বললেন, ঐ যে লোফারটা আসছে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কানে গিয়ে বিঁধে গেল জুলিয়েনের।

এরকম অসম্মানজনক একটা কথা বলে ফেললেন এত বড় একজন সম্মানীয় লোক!

তাই বলেছিলেন মা।

শুনে জুলিয়েন আঙ্কেল সহ্য করে গেলেন?

এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল জুলিয়েন। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে জজসাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, বদরীপ্রসাদজী, এই প্রথম একজন অমানুষ, জুলিয়েন বেনন সম্বন্ধে ইতর কথা বলে পার পেয়ে গেল। আপনার জমির ওপর দিয়ে আমি এসেছি আবার জমিটা পেরিয়ে যেতে হবে, একথা ভেবে ঘৃণায় আমার সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, এই অপবিত্র ভূমি জুলিয়েন বেনন আর কোনদিন মাড়াবে না।

তিন্‌নি বলল, এ কথা আমার জানা থাকলে আমি কিছুতেই অর্ককে জুলিয়েন আঙ্কেলের অর্চার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতাম না। কিন্তু মা ...।

বল?

আমাদের সঙ্গে বদরীপ্রসাদজীদের এত ভাব ভালবাসা হল কি করে?

ডাক্তারদের পরিবারের সঙ্গে কারু বিরোধ থাকে না মা। মানুষের সেবা করাই ডাক্তারদের কাজ। তাই মানুষও তাঁদের কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা জনদরদী ডাক্তারদের উজাড় করে দেন।

এবার তিন্‌নি বলল, কাল জজসাহেবের বাড়িতে আমাকে নাস্তার নিমন্ত্রণ করে গেছে। আমি কি যাব মা?

অবশ্যই যাবে।

তুমি প্রাণখুলে বলছ মা?

নিশ্চয়ই।

জুলিয়েন আঙ্কেল জানতে পারলে কিছু ভাববেন না তো?

ঝিন্নিদেবী অবাক হয়ে বললেন, আমাদের সঙ্গে তো কারু বিরোধ নেই। তাছাড়া জুলিয়েন-বদরীপ্রসাদ বিরোধের চিরস্থায়ী না হলেও অস্থায়ী একটা সমাধান হয়ে গেছে। বলতে পারা যায় এখন ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে মুছে না গেলেও মনের গভীরে চাপা পড়ে আছে।

এটা ঘটল কি করে মা?

জুলিয়েনের বিয়ের রিসেপশানে তোর বাবা জজসাহেবের বাড়িতেও চিঠি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। জুলিয়েন এবং তার পরিবারের সবাই সেই আনন্দ উৎসবের দিনে তোর বাবার পরামর্শটি সানন্দে মেনে নিয়েছিল।

ওঁরা রিসেপশানে এসেছিলেন কি?

জজসাহেব আসেননি, কিন্তু সরযূদেবী এসেছিলেন। তিনি সোনার লকেট ঝোলানো আসল একটি মুক্তোর মালা বালুর গলায় পরিয়ে দেন। তারপর জুলিয়েনকে একান্তে ডেকে তার হাতে তুলে দেন একটি দামী ঘড়ি।

তিন্‌নি বলল, তাহলে তো মা, দুবাড়ির ভেতর আর মনোমালিন্য থাকার কথা নয়।

ঝিন্নিদেবী বললেন, ঐ একটা অনুষ্ঠান-বাড়িতে আসা-যাওয়া নিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।

তুমি এ রকম কেন ভাবছ মা?

আসলে জুলিয়েন নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করেনি, আর যাঁর সঙ্গে সংঘাত তিনি স্বয়ং আসেননি।

তিন্‌নি বলল, থাকগে মা, ওসব আমাদের ভেবে কাজ নেই।

বড়রা ওঁদের মান-মর্যাদা, হিংসা-বিবাদ নিয়ে থাকুন। আমরা নতুন জেনারেশানের সবাই বন্ধু।

পরের দিন মিষ্টি, নোন্‌তা, ফল ইত্যাদি নানা ধরনের খাবারে প্লেট সাজিয়ে সবাইকে পরিবেশন করলেন সরযুদেবী। সবাই বলতে অর্ক, তিন্‌নি আর ওঁরা দুজন।

খেতে খেতে ওঁরা নানা রকমের কথা বলছিলেন। হাল্‌কা হাসির কথায় হেসে উঠছিল সবাই। অর্ক তার বন্ধুদের বিষয়ে অনেক রকম মজার কাহিনী বলছিল।

চা পরিবেশনের সময় তিন্‌নি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই ভারটা নিল।

ভারি খুশি হয়ে উঠলেন জজসাহেব। বললেন, তোমার মায়ের হাতে অনেকবার চা খেয়েছি, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে তুমি নিজের হাতে চা পরিবেশন করছ, এর স্বাদ অন্য রকম।

অর্ক বলল, তবু কোন্ স্বাদটা একটু বেশী ভাল নানা?

দুটোই উত্তম তবে এর স্বাদটা একটু বেশী মিষ্টি।

সরযুদেবী বললেন, মাঝে মাঝে তিন্‌নির হাতের চা পেলে এ বয়সটা বড় সুখে কাটত।

হঠাৎ বদরীপ্রসাদজী একটা কথা বলে ফেললেন, তাহলে চল এই মিষ্টি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই কালিফোর্ণিয়া চলে যাই। সেখানে রোজ ওর হাতের চাটা অন্তত পাওয়া যাবে।

সরযুদেবী বললেন, তা কি করে হয়।

জজসাহেব বলে উঠলেন, কেন, ঝিন্নি তো প্রায়ই বলে, চাচাজী ছবি আঁকা শিখতে আমার বিদেশ যাবার যোগ ছিল, হল না। মেয়েটাকে যদি পাঠাতে পারি তাহলে কিছুটা অন্তত ইচ্ছা পূরণ হয়।

তিন্‌নির চা পরিবেশন হয়ে গিয়েছিল। সে এখন নিজের জায়গায় বসে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়েছে। চুমুক দিচ্ছে কাপে।

সরযুদেবী বললেন, তোমার কি ইচ্ছে তিন্‌নি?

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল তিন্‌নির মুখে। সে বলল, আগে তো ভারত-শিল্পটাকে বুঝি, তারপর বিদেশী আর্ট নিয়ে চর্চা করা যাবে।

অর্ক বলল, তুমি ভারত-শিল্প বলতে কি বোঝাতে চাইছ?

আমাদের এই হিমাচল প্রদেশেই রয়েছে কাংড়া।

এক সময় কাংড়ার পাহাড় এলাকার রাজারা শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন। ওখানে শিল্পের একটা শৈলী গড়ে ওঠে। এখন ঐ কাংড়া পেইন্টিং ভারতবিখ্যাত হয়ে গেছে।

অর্ক জানতে চাইল, আর কিছু?

আরও অনেক কিছু আছে। অজন্তা গুহাচিত্র, মোগল আর রাজপুত পেইন্টিং। ভাস্কর্যের ব্যাপারটা এর ভেতর ধরছি না।

অর্ক বলল, আমি ছবি দেখতে ভালবাসি, তবে শিল্প নিয়ে বিশেষ কোন চর্চা আমার নেই। কোন ছবি ভাল লাগে, কোনটা লাগে না। নিছক চোখের ভাল লাগালাগি।

একটু থেমে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন করল অর্ক, তোমাকে যদি ছবি আঁকা শেখার জন্য ভারত ছাড়া অন্য কোন একটা দেশ বেছে নিতে বলা হয়, তুমি কোনটা নেবে?

আমার ফার্স্ট চয়েস জাপান, তারপর ফ্রান্স।

অর্ক বলল, আমি ছবির কথা বলছি না, আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার কোন ঔৎসুক্য নেই?

যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করছেন, তাঁদের কাছে ওটা প্যারাডাইস। আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই। যতটুকু পড়েছি বা শুনেছি তাতে আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থা আমার চোখে ভাল লাগে না। বাবা মা, অথবা বুড়ো দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। তবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ওদেশে নিশ্চয়ই যেতে পারি।

জজসাহেব এবং সরযুদেবী একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তিন্‌নির কাছে আমেরিকা যাবার কথা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিন্‌নি আর অর্কের কথাবার্তা থেকে তাঁরা বুঝলেন, আমেরিকা যাবার ব্যাপারে তিন্‌নি আদপেই উৎসাহী নয়। তবে তিন্‌নির শেষ কথাটা তাঁদের প্রাণকে স্পর্শ করল। 'বুড়ো

দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না।'

অর্ক বলল, কোন দিন যদি তোমার দেশটাকে দেখার জন্যেও আমেরিকা যাবার ইচ্ছে হয় তাহলে জানবে আমাদের বাড়ির দরজায় তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা উপস্থিত আছি।

তিন্‌নি বলল, তার আগে আজকের ডিনারে তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমরা সপরিবারে সামনের দরজায় হাজির থাকব।

তিন্‌নির কথা বলার ধরনে জজসাহেব, অর্কদীপ আর সরযুদেবী প্রাণখুলে হেসে উঠলেন।

টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় তিন্‌নি বলল, আমি দুপুর থেকে ছবিঘরে বসে কাজ করব। তুমি যখন হোক চলে আসবে। একেবারে ডিনারের পর আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

তিন

দর্শনীয় স্পটগুলো ছবিঘরে বসে দুতিন দিনের ভেতরেই মোটামুটি স্থির করে ফেলেছে তিন্‌নি। দারুণ রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অর্ক। থাকার জায়গার ব্যবস্থাগুলো দুজনে মিলে পাকা করে এসেছে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে।

ভাগ্‌তুরাম ইতিমধ্যেই ইলেক্‌ট্রিক অফিসে গিয়ে ছবিঘরে যাবার রাস্তায় খারাপ বাল্‌বটা বদলানোর ব্যবস্থা করেছে। এখন রাতে ঐ পথে যাওয়া আসার কোন অসুবিধে নেই।

তিন্‌নি দরজার সামনে একটা ধবধবে সাদা, ঝালর দোলানো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়েছে। তার তিনকোণা কাচে আলো পড়ে রামধনু ঝলকায়। বনের পথে সে আলো ভারি মায়াময় মনে হয়। ওদের নীচের বাংলোর জানালা দিয়ে মাঝরাতে ছবিঘরের দিকে তাকালে মনে হয়, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র বনের মাথায় জেগে উঠেছে।

অর্ক পুরো একটি দিন ঐ ছবিঘরে কাটানোর পরিকল্পনা করে তিন্‌নিকে বলল, তিন্‌নি, ছবিঘরে পুরো একটা দিন কাটালে কেমন হয়?

তিন্‌নি বলল, দারুণ পরিকল্পনা, তবে রাত কাটাতে হলে এতগুলো মানুষকে জায়গা দেওয়া যাবে না।

অর্ক বলল, কেন নয়? আমরা মেঝেতে ঢালা একটা ফরাস পেতে তার ওপর সবাই মিলে বারোয়ারি বিশ্রাম নেব। হোল্ নাইট হাসি গান গল্প হুর্‌রে। ঘুমকাতুরেদের জন্য খোলা থাকবে তোমার ছোট্ট ড্রেসিং রুমটা। নীচে পাতা মোটা কার্পেটখানাতে দিব্যি গড়িয়ে নিতে পারবে।

ও. কে.। তোমার পরিকল্পনার জন্যে ধন্যবাদ।

মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিন্‌নি অর্কদীপের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছবিঘরের পেছনে।

একটা ছোট্ট আয়তক্ষেত্রের ওপরে একটি টানা করোগেটের শেড। তার চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা। শেডটির রঙ ভারি সুদিং-সী-গ্রীন।

ওটা আসলে একটা নার্শারী। ভাগ্‌তুরামের তদারকিতে ক্রিসেনথিমাম, ডালিয়া, হলিহক ইত্যাদির চারা সংবর্ধিত হয়।

তিন্‌নি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, দারুণ তোমার পরিকল্পনা, আমার মাথাতেই আসেনি। আমি একটু যোগ করছি, সেদিন এখানেই আমাদের পিকনিক হবে। দশ পা গেলেই ডানদিকে ঝর্ণা, এন্‌তার ড্রিংকিং অ্যান্ড কুকিং ওয়াটার পাওয়া যাবে। একটা বড় স্টোভ, প্রেসার কুকার আর কিছু বাসন কোসন নীচ থেকে তুলতে হবে। তিনটে বড় বড় প্ল্যাস্টিকের বালতি আর একটা মাঝারি ড্রাম এখানেই আছে।

অর্ক বলল, আমরা সকলে এক একটা করে পদ রান্না করব।

তিন্‌নি বলল, একটি কেরলের মেয়ে চণ্ডিগড়ে ক্যারলদের সঙ্গে ডাক্তারী পড়ছে। তার বাবা ওখানকার ডাক্তার। সেও নাকি আসছে।

অর্ক বলল, তবে ও ইড্‌লি, সম্বর ডাল অর চাট্‌নি বানাবে।

তুমি এসব খাবারের নাম জানলে কি করে আমেরিকাবাসী?

শুধু নাম জানা নয়, টেস্টও করেছি, দারুণ। ওখানে বাবার সঙ্গে কাজ করতেন এক কুট্টি। তাঁর বাড়িতে যাতায়াত আছে। ওখানে মাঝে মাঝে গেলে কুট্টি আন্টি খাওয়ান।

তুমি সেদিন কি বানাবে?

ডিনারে চিকেন স্যুপ।

তিন্‌নি বলল, তাহলে ক্যারল বানাবে ফ্রুট কাস্টার্ড।

তুমি কি বানাবে?

আমি লাঞ্চে ফ্রায়েড রাইস, কাশ্মীরি মটনকারি, ডাল আর কিছু সব্‌জি বানাব।

অর্ক বলল, আঃ, এখুনি গন্ধ পাচ্ছি রান্নার।

তুমি দেখছি দারুণ জমাতে পার, আর পেটুক তো বটেই।

আমার মাও ঠিক এই কথা বলে।

তিন্‌নি হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, দেখ আমি ঠিক ধরেছি।

অর্কও তিন্‌নির হাসিতে যোগ দিল। দুটি তরুণ তরুণীর নির্মল হাসিতে ভবে উঠল ছবিঘর।

ঝিন্নিদেবী বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে মাথা ঈষৎ কাৎ করে দেখলেন। দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

দুটো টাট্টু যোগাড় করে তার ওপর সওয়ার হয়েছে তিন্‌নি আর অর্ক। তারা এগিয়ে আসছে এদিকে। বাগানের পাশ দিয়েই পাথর বাঁধানো পথটা নেমে গেছে ভ্যালির দিকে। সম্ভবত দুই তরুণ-তরুণীর গন্তব্য ঐ ভ্যালি পেরিয়ে কোথাও।

ঝিন্নিদেবীকে দেখেই ওরা টাট্টুর ওপরে বসে হাত নাড়তে লাগল।

কোথায় চলেছিস?

এই ভ্যালির দিকে মম্‌।

কখন ফিরবি তোরা? একটু পরেই তো বিকেলের চা রেডি হয়ে যাবে।

টাট্টুর পিঠে চাপড় মেরে তিন্‌নি এগিয়ে যেতে যেতে বলল, সময়ে ফিরতে না পারলে তোমরা কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা না করেই চা খেয়ে নিও।

অর্ক যেতে যেতে হাত নেড়ে বলল, কিছু ভাববেন না আন্টি, আমরা খুব সাবধানে ভ্যালিতে ওঠা নামা করব।

ওরা পাশাপাশি চলেছে। ঝিন্নিদেবী একটা পাইনগাছের কাণ্ডে হাত রেখে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে স্মৃতির কুয়াশা সরে গিয়ে একটা ছবি ফুটে উঠতে লাগল চোখের ওপর।

তখনও বিয়ে হয়নি। ডাক্তার মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়েছিল নাগ্‌গরে কোলি-রি-দেয়ালির উৎসব দেখতে। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠান্ডায় বরফ পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল চারদিক। নরসিংলালজী এই শীতে কাবু হয়ে পড়বেন বলে আসেননি মেলায়।

একটা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে মেলার সমারোহ দেখছিল দুজনে। অপূর্ব একটা নাচ হচ্ছিল মেলা-প্রাঙ্গনে। একদল নর্তকী গোলাপী আভার পোশাক পরে পদ্মের পাপড়ির মত নিজেদের মেলে দিয়ে নাচছিল। তার চারদিকে সাদা পোশাকে তরঙ্গ তুলে বৃত্তাকারে নাচছিল একদল নর্তক। তারা পদ্মের দিকে একবার এগিয়ে যাচ্ছিল, পরক্ষণে পিছিয়ে আসছিল। ঠিক যেন সমুদ্র-তরঙ্গের এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসার ছন্দ।

দেখতে দেখতে শেষ হল বেলা আর সাঙ্গ হল মেলা। তারা ফিরে এল তাদের রাতের আশ্রয়ে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী তখন বন্ধ। সে তার কোয়ার্টারেই দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। পর্বতের ওপর নির্জন নিবাস। চারদিকে পাইনের বন। নিচে বহুদূর ছড়ানো উপত্যকা। মাঝে মাঝে নীলাভ পাহাড়। দূরে ঝক্‌ঝকে তুষার পর্বত। উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উপবীতের মত বিপাশা।

আশ্চর্য এক স্বপ্নলোকে সেদিন নিবিড়ভাবে বসেছিল দুজনে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল।

জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল কেল্লা থেকে হাউই উঠছে আকাশে। একটা শব্দ করে একসময় ফেটে গেল হাউইটা। অমনি শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল তারার ফুল।

কত ফুল যে ফুটল ঝরল সেদিন তার লেখাজোখা নেই।

সে রাতে নির্জন কোয়ার্টারের নিভৃতে ফুটে উঠেছিল দুটি ফুল। তাদের সুবাস নেবার জন্য সেই অসম্ভব শীতের রাতে কেউ উপস্থিত ছিল না। দুজনেই দুজনের আঘ্রাণে সম্মোহিত হয়েছিল। আত্মনিবেদনের মুহূর্তগুলো যে কত সুষমায় ভরে উঠতে পারে তার সাক্ষী ছিল কেবল তারা দুজনেই।

পরদিন নীচের পাহাড়ী বস্তি থেকে টাট্টু যোগাড় করেছিল তারা। তারপর আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরা মন নিয়ে টাট্টুতে চেপে তারা নদীর কূল ধরে এসেছিল নাগ্‌গর থেকে কুলুতে।

আজও কি তিন্‌নি তেমনি অর্কের সঙ্গে টাট্টুতে চেপে পাশাপাশি চলেছে খুশির ফুল ছড়াতে ছড়াতে ? দুটি হৃদয় কি আজ উন্মুখ হয়ে উঠেছে দুজনকে সবকিছু বিলিয়ে দেবার জন্য?

এ কি ভেবে চলেছে সে। অর্ক তিন্‌নির বন্ধু। বন্ধুর কাছে হৃদয় উজাড় করে সবকিছু বলা যায়, কিন্তু সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যে প্রয়োজন, বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ দুটি হৃদয়।

তিন্‌নির সেই দোসর ক্যারল বেনন। অর্কদীপ নয়।

ও বহুদূর থেকে উড়ে আসা এক যাযাবর পাখি মাত্র। ওর সঙ্গে দুদিনের বন্ধুত্ব রচনা করা যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী নীড় রচনা করা যায় না।

অবশ্য ঝিন্নিদেবী প্রতিটি মেয়ের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মেয়ে উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষভাবে তার মা তাকে শরীর, মন দুদিক থেকেই গড়ে তুলবেন। কঠিন শাসনের বদলে সহানুভূতি আর উপযুক্ত সহযোগিতাই হবে তাঁর কাজ। বড় কঠিন এ কাজ, তবু ধৈর্যহীন হলে চলবে না। মায়ের চরিত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে থাকা চাই অফুরন্ত সহ্যশক্তি, স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব। নতুন নতুন পরিকল্পনায় মেয়েকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা থাকা চাই তাঁর। মেয়ের সমস্যাগুলি বুঝতে হবে অনুত্তেজিত ভাবে। কতটা পরিমাণ সাহায্য করলে বিপদের ঝুঁকি এড়িয়ে তাকে সুখী করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে।

ঝিন্নিদেবী কেবলমাত্র চিন্তার ক্ষেত্রে এগুলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিন্‌নির ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন এগুলিকে প্রয়োগ করে চলেছেন।

তিন্‌নিকে নিয়ে তিনি ভারি সুখী। এ বয়সেই তার চরিত্রে এসেছে গভীরতা। তার সঙ্গে মিশেছে নম্রতা। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কখনো তার মনের ভাবকে ছড়িয়ে দেয় না। তার মনের ভাবগুলো ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে। তাই সেগুলো সব সময়েই বোদ্ধার কাছে মধু গন্ধে ভরা।

স্বামীকে হারিয়ে ঝিন্নিদেবীর মনে যে শূন্যতা এসেছিল, সেটাকে অন্যভাবে পূর্ণ করে দিয়েছে তিন্‌নি। তাই ঝিন্নিদেবীর প্রায়ই মনে হয়, তিন্‌নি তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেলে বুকের ভেতর অসহ্য একটা কষ্ট বাসা বাঁধবে। তবু পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে মেয়ের সুখকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন।

ডাক্তার মুখার্জীর অকালে চলে যাবার পরে ঝিন্নিদেবী যখন নিজেকে অসহায় ভাবছেন, পনেরো বছরের মেয়েটিকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঘরে এসে ঢুকলেন জুলিয়েন বেনন।

জুলিয়েন চিরদিনই কথা বলেন স্পষ্ট আর সোজাসুজি। ভারি মেজাজি মানুষ। দরিয়ার মত দিলখানা।

ঝিন্নি, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।

বলুন ভাই।

ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না গিয়ে ডাক্তারী পড়তে চলে গেল চণ্ডিগড়ে। তুমি জান, আমি চিরদিনই নিজের মতে চলি। আমার ছেলেকেও স্বাধীনতা দিয়েছি তার নিজের ইচ্ছামত চলতে।

ঠিক আপনার মত আমিও তিন্‌নিকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছি।

জুলিয়েন জোরের সঙ্গে বললেন, তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা অসংকোচে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে। ক্যারলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ ডাক্তারীতে মত বদল করলে কেন? অবশ্য যেটা খুশি তুমি পড়তে পার।

ক্যারল বলল, আসলে ডাক্তারী পড়ার কথাটা পরে মনে হল। ডাক্তার আঙ্কেল চলে গেলেন। তাঁর এত বড় অপারেশান থিয়েটার, ডিস্‌পেনসারী চালাবার মত লোক আর রইল না। বহু দূর-দূর অঞ্চলের মানুষ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় রোগের যন্ত্রণা ভুলে যেত। তারা এখন অসহায় বোধ করছে। তাই ...।

তোমার এ ডিসিশানে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

ক্যারল আবার বলল, তাছাড়া...।

ও চুপ করে গেল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তাছাড়া কি ?

ক্যারল বলল কি জান, ড্যাডি, তুমি যখন আঙ্কেলের শবযাত্রার ব্যবস্থা করছিলে তখন একটা পিলারের ধারে দাঁড়িয়ে তিন্‌নি অঝোরে কাঁদছিল। আমি তার কাছে সেই মুহূর্তে কথা দিয়েছি, ডাক্তার আঙ্কেলের মত আমি ডাক্তার হব।

আমি ক্যারলকে বললাম, ঠিক পথই তুমি বেছে নিয়েছ।

আর সেই মুহূর্তে একটি সত্যকে আমি আবিষ্কার করলাম।

ঝিন্নিদেবী বললেন, কি সত্য ভাই?

ক্যারল তিন্‌নিকে ভালবাসে। তিন্‌নি দুঃখ পাক সে সেটা একেবারেই চায় না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, ক্যারল আর তিন্‌নির ভেতর যে একটা আকর্ষণ আছে তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এ নিয়ে তিন্‌নিকে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জুলিয়েন বললেন, দরকারও নেই। ওরা ওদের মত ভাবুক, নিজেদের গড়ে তুলুক, ইচ্ছে করলে ওরা নীড় রচনার কথাও ভাবতে পারে। এ বিষয়ে তোমার কিছু আপত্তি থাকলে অসংকোচে বল।

আমি আর ডাক্তার মুখার্জী দুজনেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমাদের ভেতর কোন জাতি নিয়ে কোনরকম সংস্কার ছিল না। এসব বিষয়ে আমার মেয়ের মাথা একদম পরিষ্কার। সে জাতপাত বোঝে না। পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, শিক্ষিত, সুভদ্র একটি মানুষকে সে অনেক বেশী মর্যাদা দেয়।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আমি তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম ঝিন্নি। ভবিষ্যতে ওরা কি করবে না করবে সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু ওদের মিলনকে কেন্দ্র করে জাতিগত বাধা যদি দুটো পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে তা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, আপনি কেবলমাত্র আমার স্বামীর বন্ধু নন, আমাদের পরিবারের একজন। সুতরাং এখানে জাতিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। ওরা ওদের সঠিক পথটি খুঁজে নিক, আপনার মত আমারও এই কামনা।

সেদিন থেকে দুই পরিবারের মিলনের এক অলিখিত চুক্তিপত্র দুটি যুবক যুবতীর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

তিন্‌নি তার টাট্টুতে চড়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। সে পথপ্রদর্শিকা। পেছনে তাকে অনুসরণ করে আসছে অর্কদীপ।

শিক্ষিত ঘোড়া একসময় সঠিক পা ফেলতে ফেলতে নেমে গেল ভ্যালির নিচে। এখন চারদিকে পাহাড়, মাঝে কড়ার আকৃতি নিয়ে ভ্যালি।

ওপরের পাহাড় থেকে তিন্‌নি আর অর্কদীপকে দুটি বড় দম দেওয়া পুতুল বলে মনে হচ্ছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে, ওরা আরব্য রজনীর কোন চরিত্র। দৈত্যপুরীর বন্দীদশা থেকে নিজেদের কোনরকমে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা অবশেষে এসে পৌছল ভ্যালির মাঝখানে। একটা ছোট্ট টিলাকে ঘিরে পাহাড়ী নদীটা বাঁক নিয়ে বয়ে চলে গেছে বিপাশার টানে। ঐ টিলার সঞ্চিত মাটি পাথর ভেদ করে উঠেছে তিনটে ছোট-বড় পাইন গাছ।

জলস্রোত ঠেলে টাট্টু দুটো এসে দাঁড়াল টিলার পাশে নুড়ি পাথর মাটি জমা এক টুকরো উঁচু জায়গায়। টাট্টু থেকে নামল দুজনে। তিন্‌নি বলল, ঠিক আমার পেছন পেছন উঠে এস টিলার ওপর। আল্‌গা পাথরে পা পড়লে কিন্তু পাথর সমেত গড়িয়ে পড়তে পার নীচে।

অতএব একান্ত বাধ্য ছেলেব মত তিন্‌নিকে অনুসরণ করে টিলার ওপর উঠে এল অর্কদীপ।

তিনটি পাইন টিলার গা ঘেঁষেই উঠেছে। ঐ পাইনের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলাভ একটি পাথর। পাইন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে উত্তরে তাকালে অরণ্য-আচ্ছাদিত পর্বত দেখা যায়। তার পেছনে জেগে থাকে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ।

অর্কদীপ বলল, একটা চমৎকার ল্যান্ডস্কেপ!

তিন্‌নি বলল, এটি আমি রঙ তুলিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

সাগ্রহে অর্কদীপ বলল, আমাকে দেখাবে?

স্টুডিওতে যখন যাব তখন দেখতে পাবে। ইচ্ছে হলে নিতেও পার।

আমাকে ছবির লোভ দেখিও না। ছবি কালেকশানের বাতিক আছে আমার।

না না, কালেকশানে রাখার মত ছবি আমার নয়। মনের খুশিতে আঁকি।

তা হোক্, তোমার একটা ছবি অন্তত আমার কাছে থাক।

সে তোমার মর্জি। কতকগুলো ছবি তোমার সামনে রেখে দেব, যেটা খুশি নিও। আমি কিন্তু আঁকিয়ে হিসেবে আনাড়ি। মায়ের মত আর্ট কলেজের বড় বড় শিল্পীর কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখিনি।

তোমার মায়ের হাতের একখানা ছবি আমাকে দেবে?

তুমি সোজাসুজি মায়ের কাছে তোমার প্রস্তাবটা রেখ।

অর্কদীপ দুষ্টুমিভরা মুখে তিন্‌নির দিকে তাকিয়ে বলল, এর চেয়ে বড় কোন প্রস্তাব হয়ত আন্টির কাছে রাখতে হতে পারে, তাই ভাবছি...।

তিন্‌নি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বলল, দেখ, কেমন সূর্য ডুবছে।

অর্কদীপ সহাস্যে বলল, আমার আশাও ডুবল। এরপর তো অন্ধকার।

তার মুখখানা পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিন্‌নি বলল, দেখ দেখ কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রোদয় দেখতে লাগল।

যখন খানিকটা ওপরে উঠে চাঁদ ঝক্‌ঝক্ করছে তখন তিন্‌নি বলল, এসো আমরা বসি।

দুজনে মসৃণ একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল।

অর্ক বলল, এই নীল পাথরখানা এখানে এলো কি করে?

আসলে অনেকদিন আগে বাবাই এ পাথরখানা দূর থেকে আনিয়ে ছিলেন।

কিছু উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়।

আমার বাড়িতে দরজার মাথায়, দেওয়ালের গায়ে যেসব পাথরের মূর্তি আছে, সেগুলো কি তোমার চোখে পড়েছে?

অর্ক উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, শুধু চোখে পড়া নয়, আমি ওগুলো দেখে অবাক হয়ে গেছি। নৃত্যরত গনেশ, সরস্বতী, সূর্য ও লক্ষ্মীর মূর্তি দারুণ। অতি দক্ষ শিল্পীর হাতছাড়া ওরকম মূর্তি তৈরী করা সম্ভব নয়।

আমার বাবা ঐসব শিল্পীকে নিয়ে এসে বহু টাকা খরচ করে মূর্তিগুলি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই নীল পাথরখানা দিয়ে কোন মূর্তি গড়াবার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল।

তিন্‌নি বলল তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে খুব বেশী চেনাজানা কোন দেবদেবীর মূর্তি নয়।

তবে?

আমার বাবা তো ডাক্তার ছিলেন, তাই তিনি দেব-বৈদ্য অশ্বিনী কুমারের একটি মূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের নাম শুনিনি।

অনেক প্রাচীন দেবতা। ওষুধ প্রয়োগ থেকে অপারেশন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকটি শাখাতেই তাঁরা দুভাই ছিলেন সিদ্ধ। বাবা বলতেন, আজকাল শল্য চিকিৎসা যুগান্তর এনেছে। কিন্তু বেদ পুরাণ পাঠ কবলে জানা যায়, এত প্রাচীনকালেও অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতেন।

অর্ক বলল, পরিকল্পনাটি অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা তাঁর নীল পাথরটাকে এখানে এনেছ কেন?

আমার বাবা দূর পাহাড়ের বস্তি থেকে রোগী দেখে ফেরার সময় এই টিলার ওপর উঠে বসতেন। তিনি মনে করতেন, এই তিনটে পাইন গাছ আমাদের সংসারের সিম্বল। আমরা তাই পাইনের কাণ্ডে হেলান দিয়ে পাথরখানাকে রেখেছি। বাবাকে এখানকার মানুষ অশ্বিনীকুমারের মতই মনে করত। বাবা বলতেন, অশ্বিনীকুমারের মত সার্জেন ত্রিভুবনে কোথাও নেই, তোমরা কার সঙ্গে কার তুলনা করছ।

পথচারীরা যাবার সময় এই টিলার দিকে তাকিয়ে পাথরখানাকে নমস্কার করে যায়।

কথাগুলো বলেই তিন্নি পাথরখানার ওপর হাত বুলোতে লাগলো পরম আদরে। একসময় সে মুখ তুলে তাকাল অর্কের দিকে। এক টুকরো অপ্রস্তুত হাসির-আভা-ফুটে উঠল তার মুখে। অর্ক চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল, তিন্নির দুটো চোখ অশ্রুতে চিক্‌চিক্ করছে।

ওরা দুজনে এবার বয়ে চলা ছোট্ট জলধারার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। চাঁদের আলোয় তখন রূপোলি পোশাক পরা জলপরী নাচছে।

অর্ক মৃদু গলায় ডাকল, তিন্নি ...।

মুগ্ধ হয়ে চাঁদ আর জলের নৃত্যলীলা দেখতে দেখতে তিন্নির মনে হল, বহু দূরে স্বপ্নের জগৎ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সে ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে, হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে ঐ স্রোতস্বিনীর জল ছুঁয়ে কানে এসে বাজছে।

ও মুখ তুলতেই দেখতে পেল অর্ক তার দিকে দুচোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে।

তিন্নি এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেল। সে তার দৃষ্টি সোজাসুজি অর্কের দৃষ্টির সঙ্গে মেলাতে পারল না।

অর্ক এবার অসংকোচে তিন্নির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, আমি কি এই হাতখানা ধরে অনেক অনেক দূরের পথ এগিয়ে যেতে পারি না?

এবার তিন্নির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে তুলল। না, একবার আবেগের স্রোতে ভেসে গেলে আর কোনভাবেই বিপরীত স্রোত ঠেলে ফেরা সম্ভব হবে না।

তিন্নি বলল, বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যে হাত, তার শক্তি অসীম। সে সীমাহীন দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে। তুমি আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু অর্ক। তোমার সঙ্গে নির্দ্বিধায় এ দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ঘুরে আসতে পারি।

অর্ক যে অর্থে তিন্নির হাত ধরে দূর পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল তার সঠিক জবাব সে পেল না। কিন্তু নিরাশায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ার মত উত্তরও যে সে পায়নি, একথা ভেবে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত হল।

তিন্নি, তিন্নি,—কেউ ডাকছে বলে মনে হল।

তিন্নি শব্দের গতি লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অর্কদীপও।

মানুষটি ততক্ষণে টেনে টেনে নিজেকে এনে ফেলেছে নদীর ধারে।

তিন্নি 'যাই' বলে শব্দ করে তার অস্তিত্ব আর অবস্থানটা জানিয়ে দিল।

দুজনেই টিলা থেকে নেমে টাট্টুতে চড়ে নদী পার হল।

ভাগ্‌তুরাম এবার ঝংকার দিয়ে উঠল, তোর জ্বালায় দেখছি একদিন আমাকে পথে পড়ে মরতে হবে।

ততক্ষণে টাট্টু থেকে নেমে পড়েছে ওরা।

তিন্নি ছুটে গিয়ে ভাগ্‌তুরামের গলাটা জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরে দিতে লাগল।

অর্কদীপের সামনে তিন্নি উচ্ছ্বাসে সোহাগ জানাচ্ছে দেখে ভাগ্‌তুরাম যথেষ্ট লজ্জা পেল। তিন্নি যখন তিন বছরের তখন থেকেই সে ভাগ্‌তুদাদার কাঁধে চেপে বিশ্বভ্রমণ করত। খোঁড়া মানুষের মাথাটি জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকত কাঁধের ওপর। নামবার সময় মুখে মাথায় চুমু খেয়ে, অনেক আদর করে নামত। তাই আজও সপ্তদশী তিন্নি ভাগ্‌তুদাদার কাছে সেই তিন বছরেরটি থেকে গেছে। তবু লজ্জা পেল ভাগ্‌তুরাম। হাজার হোক্, জজসাহেবের নাতির সামনে দেখাবার মত দৃশ্য এটি নয়। একান্ত নিজস্ব আনন্দঘন মুহূর্ত এটি। শুধু দুজন অসম বয়সীর অনুভবের।

ভাগ্তুরাম গা ঝাড়া দিয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে, চটপট বসে পড় দুজনে। খোঁড়া মানুষটাকে এ্যাদ্দুর ছুটিয়ে আনলি। নে, ব্যাগ খুলে খাবার বের করে খা। ফ্লাস্কে চা আছে।

তিন্নি ঝাঁঝিয়ে উঠল, কেন তুই কষ্ট করে আনতে গেলি? আমি তো মাকে বলেই এসেছিলাম, দেরী হলে চাটা খেয়ে নিতে।

আরে, তা কি হয়, মায়ের প্রাণ তো! তোদের জন্যে বিকেলের জলখাবার তৈরী করে সাজিয়ে বসে আছে।

তিন্নি বলল, জানো অর্ক, আমার মা রাজ্যের রান্না আর জলখাবারের বই কিনবে। সে সব কিচেনে তৈরীর পরে এক্সপেরিমেন্ট চলবে আমার ওপর দিয়ে। আর পারছি না মা, বললেও ছাড়ান নেই। আসলে খাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলে আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ি।

অর্ক বলে উঠল, আরে আমার মাও ঠিক তাই। ছুটির দিনগুলোতে অবধারিত এ দেশীয় রান্না থাকবেই থাকবে। আর আমাকে তার বেশীর ভাগই খেয়ে তুলতে হবে। অবশ্য আমি হরেক রকম খাবার খেতেও ভালবাসি।

তিন্নি কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে ভাগ্তুরাম বলল, তোরা খাবি না বক্বক্ করবি? গরম খাবারগুলো জুড়িয়ে যে একেবারে ঠান্ডা মেরে যাবে।

চাঁদের আলোয় ভাগ্তুর আনা একখানা কাগজ পেতে ওরা চায়ের আসর বসাল।

দুটো করে প্যাটিজ আর একটা করে কাজু দেওয়া বরফি।

তিন্নি ভাগ্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ভাগ কই ভাগ্তুদাদা?

থলের ভেতর থেকে আর একখানা প্যাকেট বের করে ভাগ্তু বলল, আছে, আছে। মা কি কখনো আমাকে না দিয়ে পারে।

কই দেখি?

ভাগতু প্যাকেট খুলবে না, তিন্নিও ছাড়বে না। শেষে তিন্নির জয় হল। সে ভাগ্তুর হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলল।

ভাগ্তুব প্যাকেটে দেওয়া হয়েছে দুটো মেঠাই আর একটা প্যাটিজ।

তিন্নি আনুনাসিক সুরে বলল, তোর ভাগে দুটো মেঠাই কেন?

তেমন দুটোর জায়গায় একটা প্যাটিজ।

আমার ভাগটা বদলে নিতে চাইলে তুই দিবি তো?

ভাগতু তার দাবি ছাড়তে নারাজ। সে বলল, মা যেমন বুঝেছে তেমনি দিয়েছে, আমি কোনকিছু চেয়ে নিইনি।

শেষে সবাই মিলেমিশে হাসি ঠাট্টার ভেতরে ভাগাভাগি করে খেল।

অর্ক লক্ষ্য করেছে ভাগ্তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ির একটি অ্যাসেট বিশেষ। মুখার্জী বাড়ির ভালমন্দের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য বাঁধনে। ও বাড়ির পরিজনদের সে মনে করে তার রক্ত সম্পর্কের মানুষ। ঝিন্নিদেবী কিংবা তিন্নিও ভাগ্তুরামকে একান্ত আপনার জন বলেই ভেবে থাকেন। ঝিন্নিদেবী ভাগ্তুর অভিমানকে পুরো মর্যাদা দেন। তার বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখেন।

বছরে কেবল একটি দিন, কয়েক ঘন্টার জন্য ভাগ্তু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ডাক্তার মুখার্জী যখন ছিলেন তখন তিনি ভাগ্তুর মা বাবাকে ভেড় বকরী কেনার জন্য কিছু অর্থ দিতেন। কেউ যদি বলত, আপনি ওদের খোঁড়া ছেলের ভার বইছেন, তার ওপর আবার এতগুলো করে টাকা দিচ্ছেন কেন?

হেসে বলতেন ডাক্তার মুখার্জী, আমার মেয়ে জন্মাবার অনেক আগেই ভাগ্তু আমার কাছে এসেছে। ও আমার একটা ছেলে। ভাগ্তু খোঁড়া হলে কি হবে, একাই একশো। এজন্যে আমি ভাগ্তুর মা বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই অল্প কিছু অর্থ আমি তুলে দি ওদের হাতে। বুড়ো বয়সে কে ওদের খাওয়াবে। টাকাটা থাকলে, ভেড় বক্‌রী থাকলে শেষের দিনগুলো হয়তো মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে।

ভাগ্‌তুর বাবা মা যেদিন আসে সেদিন ও কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। চলে যাবার পরেও যেন ওর ঘোর কাটতে চায় না। বিপাশার কূলে কূলে, পথে প্রান্তরে, বনের গহনে ও আপন মনে অন্তত তিন চার দিন ঘুরে বেড়ায়।

ও যখন ছোট ছিল তখন বাবা মার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত পাহাড় পর্বতে, বনে বনে, নতুন নতুন বুগিয়ালে (চারণভূমি)। পাহাড়ী ঝর্ণার কূলে বসে তার ছোট্ট বাঁশুরিতে ফুঁ দিত। পাশেই সবুজ ঘাসের চারণক্ষেত্রে ফোটানো দুধ রঙের ভেড়াগুলো চরে বেড়াত। রাতে ঐ বুগিয়ালের ওপর ভেড়াদের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে ও তারা গুনতো।

আজ কত যুগ হল, সেই সব দুর্গম তুষার পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ছোঁয়া লাগা ঘাসের জমিনে পা ফেলে ফেলে সে ঘুরে বেড়ায়নি। তাই মা বাবাকে দেখলেই তার মনে পড়ে যায়, সেই সব স্বপ্নের দিনগুলোর কথা।

জলখাবার খেয়ে ওরা তৈরী হল বাড়ি ফেরার জন্য।

অর্ক বলল, এবার আমার টাট্টুতে চড়বে ভাগ্‌তুদাদা।

ভাগ্‌তুরাম চেঁচিয়ে উঠল, খোঁড়াকে ঘোড়ার লোভ দেখাচ্ছ? আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারব। খোঁড়া মানুষ ঘোড়ায় উঠলেই পড়ার ভয় থাকবে সব সময়।

আমি তোমার পাশে পাশে চলব। তোমাকে ধরে ধরেই নিয়ে যাব।

হা হা করে হাসি উড়িয়ে ভাগ্‌তুরাম বলল, তাহলেই হয়েছে আর কি। এখন ঘোড়ায় উঠলে পতন ঠেকাতে ঠেকাতে কাল সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি পৌছব।

তিন্‌নি বলল, আমার কাছে একটা সমাধান আছে।

ভাগ্‌তু বলল, কি রকম?

আগে বল, মেনে নেবে?

আচ্ছা বাবা মানব।

আমরা পাঁচজন হেঁটে যাব।

ভাগ্‌তু বলল, হেঁটে যাব বুঝলাম, কিন্তু তোর পাঁচজন কোথায়?

তিন্‌নি বলল, কেন, ঘোড়া দুটোকে ফেলে যাব নাকি? ওরাও হেঁটে হেঁটে যাবে আমাদের সঙ্গে।

রাত ন'টা নাগাদ অর্ককে জজসাহেবের জিম্মায় রেখে দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। ঝিন্নিদেবী জানালা দিয়ে ওদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

ডাক্তার মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছিল, ঐ ভ্যালির মধ্যে পড়ে। মুখার্জী সাহেব বড় ভালবাসতেন ঐ ভ্যালিটিকে। ঐ ভ্যালির ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদী, তার চারদিকে সবুজ পাইন বনে ছাওয়া পাহাড়শ্রেণী, উত্তরে ঝকঝকে তুষার পর্বত তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলত। তিনি অনেক সময় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে টাট্টুতে চড়ে নিশি পাওয়ার মত ভ্যালির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বা টিলার ওপর বসে শত বার দেখা আকাশের নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে পরিচয় করতেন।

কোনদিন অধিক রাত্রি হলে উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী স্বামীর খোঁজে পাঠাতেন ভাগ্‌তুকে। ওঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এমনি করে বসে থাকতেন জানালার ধারে।

ডাক্তার মুখার্জীর ভ্যালিতে পড়ে মৃত্যুর পর থেকে ঝিন্নিদেবী আপনজন কাউকে ভ্যালির ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

আজও তিনি তিন্‌নিদের ফেরার পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এখন তাদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

পরের দিন সকাল থেকে বিকেল মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘর গোছানোর কাজে কাটিয়ে দিলে তিন্‌নি। প্রথম মানালীতে পৌঁছেই ক্যারলদের দলটি উঠবে ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি-সংলগ্ন বাগানের প্রান্তে অতি সুন্দরভাবে সাজানো আউট হাউসটিতে। নিচে আর ওপরে দুখানা করে চারখানা রুম।

নীচের দুটি রুমের মাঝে লম্বায় ও চওড়ায় বিশাল ডাইনিং কাম ড্রইং রুম। পেছনে কিচেন। প্রতি রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ।

নীচের ড্রইং কাম ডাইনিং রুমের স্পেসটা ওপরে গিয়ে বেশ বড়সড় একখানা লাইব্রেরীতে রূপ নিয়েছে।

ওপরে কিংবা নীচে কোন মূর্তি নেই। সব কটা ঘর ঝিন্নিদেবীর পেইন্টিং দিয়ে সাজানো। নীচে বেশ বড় লন। সবুজ ঘাসের বেডের ওপর প্যাটার্ণ করা নানা রঙের ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে কাচের টপওয়ালা টেবিলের চারদিকে লাল গদী আঁটা সাদা রঙের বেতের চেয়ার পাতা। রোদ পোহানো, ম্যাগাজিন পড়া, চা-পান কিংবা বসে বসে তুষার-দৃশ্য দেখার উপযুক্ত বস্তু এগুলি। এদের নীরব আমন্ত্রণ অতিথিদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

ঠিক সন্ধ্যায় ঝলমল করে উঠল ছবিঘরের ঝাড়লন্ঠন। বর্ণালির ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সে আলো সৃষ্টি করল সাত রঙের ইন্দ্রধনু।

সেই আলো লক্ষ্য করে রহস্যঘন বনপথ ধরে উঠতে লাগল একটি যুবক। কস্তুরী গন্ধে বিহ্বল কোন একটি মৃগ যেমন করে কাঙ্ক্ষিত মৃগীর সন্ধানে বনপথ অতিক্রম করে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দুটি বিশাল বাহু প্রসারিত করে খোলা দরজার পাল্লা ছুঁয়ে দাঁড়াল সে।

আজ ওর সী-গ্রীন টি-শার্টের বুকে গাঢ় হলুদে লেখা—'ফ্রেণ্ডশিপ ইজ দ্য ওয়াইন অব লাইফ'। বন্ধুত্ব জীবনের অমৃত রসায়ন।

ছবি থেকে মুখ তুলল তিন্নি। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমায় ধরা তুলি সমেত হাতখানা গালে ঠেকিয়ে কিছু সময় তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। বুকের লেখাটি পাঠ করার পর ওর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

অর্ক, 'ফ্রেন্ডশিপ ইজ ওয়ান মাইনড ইন টু বডিজ।'

অর্কদীপ চমকে উঠে বলল, অসাধারণ।

'বন্ধুত্ব হল, দুটি দেহে একটি মাত্র মন।' যেন যৌবনের সোনার সুতোয় বাঁধা।

অর্কদীপ ঘরে ঢুকে এল। বলল, তোমার আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়লাম তিন্নি।

বন্ধু কি আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে অর্ক? তার জন্য প্রবেশেব দ্বার চিরদিনই খোলা থাকে। গৃহে এবং মনে।

অর্ক বলল, আন্টির কাছে শুনেছিলাম তুমি খুব চুপচাপ থাকতে ভালবাস, কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিন্নি বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া সবার কাছেই আমি চুপচাপ থাকতে ভালবাসি।

তুমি যখন কথা বল তখন সেটা কবিতা অথবা দর্শন হয়ে ওঠে।

অর্ক, আমাকে ওভাবে দেখো না, আমি অতি সাধারণ মেয়ে। কিছু লেখাপড়া করি, ছবি নিয়ে মেতে থাকি। এতেই আমার আনন্দ। এই যে তোমার সেই ছবি, যা আমি ঐ টিলার থেকে দেখে এঁকেছিলাম। এই সন্ধ্যায় ছবিটির তুষার-শৃঙ্গে ভোরের আলোর রঙ লাগিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হলে তুমি এটি নিতে পার। বন্ধুর উপহার হিসেবে।

আজ সন্ধ্যায় আমার এই ছবিঘরে আসা সেই লোভেই তিন্নি।

এবার একমুখ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে তিন্নি বলল, তুমি তাহলে শিল্পীর চেয়ে তার শিল্পকেই বেশী ভালবাস?

শিল্পের ভেতরেই তো শিল্পী থাকেন তিন্নি, তাঁকে আলাদা জায়গায় খুঁজতে গেলে কখনো কি পাওয়া যায়?

তুমি ঠিকই বলেছ অর্ক, আমাদের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্যের যে অপূর্ব সব নিদর্শন রয়েছে তার কোথাও শিল্পীর নাম নেই। তবু তাঁরা আছেন, এবং থাকবেনও বহুকাল, যতদিন না তাঁদের শিল্পকর্মগুলি মহাকাল গ্রাস করে ফেলে।

অর্ক বলল, আমার সামনেই কিন্তু শিল্পী তার অপূর্ব শিল্পকর্মটি নিয়ে বসে রয়েছে। আমি অভিন্ন

দুটিকেই গভীর ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই।

আবার হাসির তরঙ্গ তুলল তিন্‌নি। বলল, এক শিল্পব্যবসায়ী একদিন ঢুকেছিল এক শিল্পীর স্টুডিওতে। তাকে মহিলা শিল্পীটি যে ছবিই দেখান, সেটিই তার পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু ছবির দাম যে আকাশছোঁয়া। তাই ব্যবসায়ীটি ভাবল, শিল্পীটিকে কিনে নেওয়াই লাভজনক। একে দিয়ে আরও অনেক ছবি আঁকানো যাবে, লাভও হবে প্রচুর।

তার এই প্রস্তাবটি শুনেই পাগলা গারদের সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করেছিলেন শিল্পী।

অর্ক অমনি বলে উঠল, তোমার এখানে কোন ফোনটোন নেই তো?

এবার উচ্চ হাসির শব্দে খান খান হয়ে গেল অন্ধকার বনভূমির নীরবতা।

তিন্‌নি উপহার হিসেবে তার আঁকা ছবিটি তুলে দিল অর্কের হাতে।

সারি সারি পাইনে ছাওয়া পাহাড়। তার পেছনে উঁকি দিচ্ছে বরফের মুকুটপরা পর্বত। শ্বেত মুকুটের গায়ে সোনার কাজ। অনেক নীচে পাহাড়ের তলায় টাট্টুতে বসে একটি মানুষ। নির্নিমেষ চেয়ে আছে সোনার কাজ করা মুকুটটির দিকে।

অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে অর্ক বলল, আমার সংগ্রহে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে থাকবে।

তুমি তোমার বন্ধুকে ভালবাস, তাই এ মর্যাদা।

বিশ্বাস কর, ছবিটিও আমার চোখ আর মনকে টেনেছে। ভোরের আলোর ছোঁয়ায় রাতের জমে থাকা নীলাভ হিমেল কুয়াশার ওড়াউড়ি সমস্ত নিসর্গকে জীবন্ত করে তুলেছে।

তিন্‌নি বলল, তোমার যে ছবি দেখার আলাদা একটা চোখ আছে তাই জেনে আমি আজ বড় তৃপ্তি পেলাম। এটা আমার কাছে মস্ত বড় একটা পুরস্কার।

সামান্য ছোট্ট একটি পুরস্কার এরই সঙ্গে আমি তোমাকে দিতে চাই তিন্‌নি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তিন্‌নি অর্কের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অর্ক তার পকেট থেকে একটি চমৎকার লাল কাস্কেট বের করে তিন্‌নির হাতে তুলে দিল।

তিন্‌নি বলল, কি আছে এতে ?

খুলে দেখ।

বেশ কৌতূহল নিয়ে তিন্‌নি কাস্কেটটা খুলল। মেরুন রঙের একটা গোল্ডেন ক্যাপওয়ালা লেডিজ সেফার্স, তার সঙ্গে একই কালারের একটি ডট পেন।

এমব্রয়ডারির সুতোয় গাঁথা একটি ছোট্ট ফুলের স্তবক আঁকা কার্ডে লেখা আছে,—আমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে।

দারুণ খুশি হলাম তোমার এত সুন্দর একটা উপহার পেয়ে। আমার প্রিয় বস্তুগুলোর ভেতর পেন একটি। নানা রঙের পার্কার, সেফার্স রয়েছে আমার সংগ্রহে। তাছাড়া মন্ট ব্ল্যাঙ্ক, এভারসার্পও রয়েছে। উইংসাঙ্ দিয়ে আমি চিঠিপত্রের কাজ চালাই। মোটা নিবের একটা সেফার্স আছে। ওটি আমার পয়া পেন। পরীক্ষায় প্রতিবারই ও আমাকে উদ্ধার করে দেয়।

অর্ক বলল, প্রেমপত্রগুলোও কি উইংসাঙে লেখ নাকি ?

তিন্‌নি ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে অর্কের চুল ধরে নাড়া দিল।

অর্ক দারুণ মজা পেয়ে বলল, সত্যি করে বলই না?

তিন্‌নি আবার ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো করে দিল অর্কের একরাশ চুল।

অর্ক এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার পকেটে কিন্তু চিরুনি নেই।

তিন্‌নি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে নিজেই অর্কের এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দিতে লাগল।

এবার চুল নিয়ে শুরু হল তিন্‌নির খেলা। সিধে সিঁথে, বাঁকা সিঁথে, ব্যাক ব্রাশ, সব রকম করে সে দেখতে লাগল অর্কদীপের মুখখানা। চুলের কোন্ ভঙ্গীতে মুখের শ্রী বেশী খোলে তারই পরীক্ষা চলল কতক্ষণ। বাঁ হাতে অর্কের থুতনি তুলে ধরে দেখল। বাঁদিকে, ডানদিকে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

অর্ক নীরব। সে ঠিক বুড়োবুড়ি পুতুলের মত ঘাড় থেকে মাথাটি নেড়ে চলেছে।

কতক্ষণ পরে অর্কের স্থির মুখখানা নিজেই ঘাড় ঘুরিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে দেখল তিন্‌নি। তারপর সহাস্যে মন্তব্য করল, একেবারে ডেভিডের মুখখানা। তোমার দেহের গঠনটাও সেরকম। আর্টিস্টের দৃষ্টিতে তুমি অনেক দামী মডেল।

অর্ক বলল, এই প্রথম একজন মহিলা-শিল্পী আমাকে আবিষ্কার করল।

দুষ্টুমির হাসি হেসে তিন্‌নি বলল, এতদিন আমেরিকা মহাদেশে একজনও মহিলা তোমাকে আবিষ্কার করেননি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল?

আমি তো মহিলার কথা বলিনি, মহিলা-শিল্পীর কথা বলেছি। দুজনের ভেতর অনেক পার্থক্য আছে তিন্‌নি।

বুঝেছি, তুমি আবিষ্কৃত হলেও কোন শিল্পীর দ্বারা নও।

এবার বিশ্বাসের প্রশ্ন এল তিন্‌নি। আমেরিকার মত দেশ, যেখানে ফ্রি-মিক্সিং রেওয়াজ, সেখানে একজন স্বাস্থ্যবান চাকুরীজীবি যুবক কোন যুবতীর সান্নিধ্যে আসেনি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ক্ষেত্রে ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনাটিই ঘটেছে। আর এটি ঘটেছে আমার মায়ের জন্যে।

তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কৌতূহলী হয়ে ওঠাটা বোধ হয় সাজে না অর্ক।

শুনতে আপত্তি থাকলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু আমার বলতে কোন বাধা নেই।

তোমার মায়ের প্রসঙ্গ তুলেছ তাই আগ্রহ বেড়েছে আমার।

শোন তাহলে। মা একদিন আমাকে কাছে ডেকে বলল, তুমি বড় হয়েছ, এখন জীবনটাকে নানাভাবে ভোগ করার সময় এসেছে তোমার।

আমি বললাম, তুমি কি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইছ?

মা বলল, ঠিক তাই।

বল কি বলবে?

তুমি আমেরিকাবাসী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই। এখানকার সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। আবার তুমি যদি ভারতীয় কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাতেও আমি খুশি হব। এখন নির্বাচন তোমার।

আমি বললাম, মা, আমেরিকায় আমার জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা চাকরি সবই এখানে। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা ইন্ডিয়ান। আমার রক্তে তাঁদের সংস্কার মিশে আছে। আমি ভারতীয় কোন মেয়েকে সঙ্গী হিসেবে পেলে সবচেয়ে সুখী হব।

মা বলল কি জান?

কি?

তাহলে কোন বান্ধবীর সঙ্গে উইক এন্ড কাটানোর পরিকল্পনা বাতিল কর।

বললাম, কথা দিচ্ছি মা।

তিন্‌নি হেসে বলল, তাই ইন্ডিয়াতে এসেছ বউ খুঁজতে?

যেমন খুশি ভাবতে পার।

এবার সত্যি করে বলতো, আমেরিকা থেকে আসার সময় কার কথা মনে করে পেন-সেট্‌টা এনেছিলে?

তোমার মত কোন মেয়ের দেখা পেলে তার হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম।

সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার তোমার ওপর।

তিন্‌নি অন্যদিকে কথা ঘোরাল, মাঝখানে সিঁথি করে দেওয়ায় তোমার বিপুল চুলের ঢাল দুদিকে ভাগ হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যৌবনের একটা ছবি দেখেছিলাম। সেখানেও বিপুল চুলের মাঝখানে এমনি সিঁথি কাটা ছিল।

অর্ক বলল, আমার চুলের ওপর তোমার এত নজর কেন?

এমন ঘন আর সুন্দর চুল সচরাচর দেখা যায় না বলে। একবার উঠে দাঁড়াও তো।

অর্ক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, নির্মল খুশির মেজাজে ঠাসা এই মেয়েটি। নিরীহ ফুলঝুরিটির মত চুপচাপ পড়ে থাকে, কিন্তু সামান্যতম আগুনের ছোঁয়া পেলেই চারদিকে আলোর তারাফুল ছড়ায়।

এবার তিন্‌নি অর্কদীপের হাত ধরে তার ছোট্ট ড্রেসিং রুমের ভেতর নিয়ে গেল। প্রমাণ সাইজ একখানা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এখন নিজের রূপটি চিনে নাও। সামনেই চিরুনি পাবে, হেয়ার স্টাইল পছন্দ না হলে চুল ভেঙে নিজের মত করে নেবে। আমি বাইরে অপেক্ষায় রইলাম, তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আঁকার চেয়ারে বসে রইল তিন্‌নি।

কিছু পরে তিন্‌নির সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

তিন্‌নি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পছন্দ?

খু-উ-ব।

ভয়ে তো সিঁটিয়েছিলে, কি জানি কি হয়ে গেল।

এবার থেকে অর্কদীপ চতুর্বেদীর এই হেয়ার স্টাইলই বজায় থাকবে।

তিন্‌নি সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল।

সে হাতখানা ধরে ফেলল অর্ক।

বল, আমি কি দিতে পারি তোমাকে?

তিন্‌নি বলল, গোটা কয়েক সিটিং।

তুমি সত্যিই আমাকে মডেল করবে নাকি?

তোমার ইচ্ছে।

আমি তো তাহলে অমর হয়ে যাই।

তিন্‌নি বলল, মডেল হবার আগে ভাববে, তুমি মিকেলাঞ্জেলো অথবা পিকাসোর মডেল নও, নিতান্ত একজন নবিসের খামখেয়ালীর খেলনা।

ওতেই আমার খুশির অন্ত নেই।

চার

প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের পর ওরা দুজনে হাজির হয় ছবিঘরে। মহা উদ্যমে শুরু হয়ে যায় ছবি আঁকার কাজ। দুজনেরই উন্মাদনার শেষ নেই।

বড় নির্জনে নিভৃতে তাদের কাজ শুরু ও শেষ হয়।

একমাত্র ভাগ্‌তুরামই জানে তাদের এই নতুন পরিকল্পনার কথা। কারণ একাধারে ভাগ্‌তু তিন্‌নির ভাই, বন্ধু ও পরামর্শদাতা। সে তিন্‌নির প্রয়োজনের জিনিস ভূ-ভারত ঢুঁড়ে সংগ্রহ করে আনে।

তিন্‌নির অন্যায় ভাগ্‌তু বরদাস্ত করে না, তিন্‌নির চোখের জলও সে সইতে পারে না।

তিন্‌নি ভাগ্‌তুকে বলেছিল, আমি অর্ককে মডেল করে কয়েকটা ছবি আঁকতে চাই। আর সে ছবিগুলো যদি মনের মত হয় তাহলে তাই দিয়ে জুলিয়েন আঙ্কেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে একটা এগ্‌জিবিশান করব। তুই কি বলিস?

দারুন হবে। ক্যারলদের আসার আগে কাজ শেষ করতে পারবি?

চেষ্টা করব। আর ওদের থাকাকালীন এগ্‌জিবিশানটা করতে চাই।

মাকে বলেছিস?

তুই আমি আর অর্ক ছাড়া কেউ জানে না।

মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড, সে এক অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য! বলিষ্ঠতার সঙ্গে কোমলতার এমন অভাবনীয় মিলন ভাস্কর্যের ইতিহাসে বিরল।

ডেভিড সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তি। নগ্নতার মাধুর্য যে দর্শকের মন ও দৃষ্টিকে কতখানি একাগ্র করে তুলতে

পাবে তার প্রমাণ ডেভিড। মূর্তির পেশী, শিরা-উপশিরা, মণিবন্ধ থেকে করতল, অঙ্গুলির অর্ধ আকুঞ্চিত বিন্যাস পুঞ্জীভূত শক্তিকেই যেন প্রকাশ করছে। চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাবটি পরিস্ফুট, কিন্তু মুখ ও ললাটের রেখায় কোন কাঠিন্যের কুঞ্চন নেই।

'ল্যান্ডমার্কস অব দ্য ওয়ার্লড্‌স আর্ট' সিরিজের 'দ্য ক্ল্যাসিকেল ওয়ার্লড্' বইখানা মায়ের শেল্‌ফ থেকে বের করে এনে অর্কের হাতে তুলে দিল তিন্‌নি।

ডেভিডের মূর্তিখানা দেখ। কিভাবে দাঁড়াবে, মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কিভাবে রূপ দেবে তা ঐ ভাস্কর্যের ভেতর থেকে বুঝে নাও।

আমাদের গেস্ট হাউসের লাইব্রেরীতে বাইবেল আছে। তার থেকে ইসরায়েল ও পলেস্তিয়দের যুদ্ধের ইতিহাস এবং তার ভেতর ডেভিডের ভূমিকাটা দেখে নিও। তরুণ মেষচারক ডেভিড কিভাবে একটামাত্র পাথর ছুঁড়ে দৈত্যের মত আকৃতিবিশিষ্ট গলিয়েতকে ধরাশায়ী করেছিল, সে বিবরণ পাবে। ভাগ্‌তু দাদার কাছে সব ঘরের চাবি আছে, চেয়ে নিও দরকার মত।

সেই সঙ্গে আর একখানা বই নিও, 'লিজেন্ডস্ অব গ্রীস অ্যান্ড রোম'। তার ভেতর থেকে 'ইকো-নার্সিসাস', 'অরফিউস-ইউরিডাইস,' 'দ্য কুইন হানট্রেস অ্যান্ড আ বোল্ড হানটার' গল্পগুলো পড়ে নিও। ওগুলোর প্রধান পুরুষ চরিত্রে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। ঠিক অভিনয় নয়, জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমি তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আঁকব।

প্রথম দিন, মেষচর্মের আচ্ছাদনে কটিদেশ জড়িয়ে ডেভিডের ভূমিকায় দাঁড়াল অর্ক। একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে তার সংস্কারে বাধলো। সেজন্যে ভাগ্‌তুরামকে বলে আগেভাগে তিন্‌নি তৈরী করিয়ে রেখেছিল এ পোশাকখানা। তাই পরে শিল্পীর সামনে ডেভিডের যথাযথ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল অর্ক।

তিন্‌নি এখন মগ্ন। সে স্কেচ করল দ্রুত হাতে। রঙ দেবার সময় দেখল, অর্ক সত্যিই ডেভিডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তাকে মুগ্ধ চোখে দেখল তিন্‌নি। তারপর বলল, তুমি এখন রিলাক্স্ কর চেয়ারে বসে। দরকার হলেই আমি তোমাকে আবার ডাকব।

দু'তিনবার সিটিং দিতে হল। পরের দিন অর্ককে ছুটি দিয়ে দিল তিন্‌নি।

বলল, কাল তুমি নানা নানির আদর খেও। আমি একা বসে রঙের কাজ সারব।

ঝিন্নিদেবী বলেন, তিন্‌নির নিবিষ্টতা তাঁর চেয়েও বেশী। আর মুড এলে অতি দ্রুততার সঙ্গে নিখুঁত নৈপুণ্যে কাজ সেরে ফেলতে পারে। ওর দোষ হল, নিরন্তর অনুশীলনের অভাব। উন্নতির মূলে ক্রমাগত অনুশীলন। ভাল না লাগলেও অনেক সময় নিজেকে শাসন করে কাজে বসতে হয়।

তৃতীয় দিনে ডেভিড তৈরী হয়ে গেল।

মিষ্টি একটা ব্লুইস গ্রীনের ব্যাক গ্রাউন্ড। সেই কালারের শেডে শ্বেতপাথরের তিন ফুট পরিমাণ একটা মূর্তি জেগে উঠেছে। পাথর নয়, যেন জীবন্ত ডেভিড নামের এক অপার শক্তিশালী তরুণ হাতের নুড়িটি ছোঁড়ার জন্য উদ্যত। ডেভিডের মুখে অর্ক কিংবা মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টির বিশেষ কোন ছাপ নেই। এ যেন চিরদিনের ভ্রাম্যমান কোন মেষচারক তরুণের মুখ, যে তার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের রৌদ্র, জল, ঝঞ্ঝা থেকে। চারণভূমির সবুজ লাবণ্য তাকে বাঁচিয়েছে প্রকৃতির রূঢ়তা থেকে।

শক্তি আর লাবণ্যে পূর্ণ একটি প্রাণ যেন জেগে উঠেছে ঐ অবয়বে।

অদূরে অনেক ছোট আকারের কতকগুলো বর্শাধারী মূর্তি। তাদের সামনে আকারে ছোট হলেও ভীষণ আকৃতির গলিয়েতের কালারফুল ছবি।

শিল্পী বোঝাতে চেয়েছে, আকৃতি যত ভয়ংকরই হোক স্বাভাবিক শক্তিতে পূর্ণ একটি মানুষের কাছে সে একটি পিগ্‌মি বা বামন ছাড়া কিছু নয়।

ছবি দেখে অর্ক মুগ্ধ।

তিন্‌নি বলল, তোমার ঋজু বলিষ্ঠ অবয়ব ওতে ধরা পড়েছে, কিন্তু মুখে তোমার আদল নেই।

ইচ্ছে করেই আমি তা রাখিনি। আমি ডেভিডের মুখখানা অনন্ত যৌবনের প্রতীক হিসেবে গড়তে চেয়েছি।

এরপর একটি একটি করে গড়ে উঠতে লাগল নার্সিসাস, অরফিয়ুস, অ্যাক্টিয়নের ছবি।

ইকো অতি সুন্দর স্বভাবের একটি মেয়ে। সে গল্প করতে পারত ভারি চমৎকার। তার গল্প শোনার জন্য ভীড় জমে যেত। এই গুণটিই শেষ পর্যন্ত তার কাল হল। ইকো বা প্রতিধ্বনির কথা বলার শক্তি এমনি আকর্ষণীয় ছিল যে তার টানে স্বর্গের দেবতা জুপিটার পর্যন্ত তার আসরের শ্রোতা হয়ে গেলেন।

এসব দেখে শুনে জুপিটারের স্ত্রী জুনো এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যে তিনি ইকোর কথা বলার শক্তিই হরণ করে নিলেন। অবশ্য কেউ কোন কথা বললে ইকো তার শেষ শব্দটি কেবল উচ্চারণ করতে পারত।

ইকো লজ্জায় দুঃখে লোকালয় ছেড়ে গভীর বনের ভেতর আত্মগোপন করল।

এদিকে নার্সিসাস অতি সুদর্শন এক যুবা পুরুষ। সে শিকার করতে ভালবাসত। কারু প্রতি কোন আকর্ষণ সে বোধ করত না।

একদিন নার্সিসাস বন্ধুদের সঙ্গে বনে শিকারে গিয়ে পথ হারিয়ে বিপথে চলে গেল। সে ক্রমাগত বন চিরে চিরে সঠিক পথের সন্ধান করতে লাগল।

ঐ বনেই থাকত ইকো। সে দূর থেকে নার্সিসাসকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সে তাকে অনুসরণ করছিল, কিন্তু সাহস করে কাছে এগিয়ে যেতে পারছিল না।

এক সময় নার্সিসাস চিৎকার করে বন্ধুদের ডাক দিল, তোমরা কেউ আছ এখানে?

অমনি ইকো শেষ অক্ষরটি উচ্চারণ করল,—'এখানে'।

নার্সিসাস ভেবেছিল, সে বনে নিঃসঙ্গ ঘুরে মরছে। কিন্তু মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে অনেকটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, এসো।

অমনি ইকো উচ্চারণ করল, 'এসো।'

নার্সিসাস আরও অধীর হয়ে ডাক দিল,—'এসো, আমরা এখানে মিলিত হই।'

ইকো এবার পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর করল, 'মিলিত হই।'

সে এখন প্রবল আবেগে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নার্সিসাসকে। এইভাবে সে তার মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করল।

কিন্তু নার্সিসাস কারু রূপের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। সে ইকোকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বন চিরে এগিয়ে গেল। ইকো দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় ভেঙে পড়ল কান্নায়। কিন্তু সে ভুলতে পারল না নার্সিসাসকে।

এদিকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নার্সিসাস এলো একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে। সে জলপানের জন্য শায়িত অবস্থায় মুখ নীচু করে হাত বাড়াল।

আশ্চর্য! একে! এমন অপূর্ব সুন্দর মুখ সে আগে কোন দিনই দেখেনি। নার্সিসাস ভুলে গেল জলপানের কথা। সে নির্নিমেষ চেয়ে রইল ঐ মুখের দিকে। এমন প্রেমের স্বাদ সে আর কখনো পায়নি।

হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই জলে তরঙ্গ ওঠে। সুন্দর মুখ হারিয়ে যায়। আবার জল স্থির হলে মুখ জেগে ওঠে। নার্সিসাস হাসলে সেও হাসে। নার্সিসাসের বেদনার ছবি সে মুখেও ফোটে।

দিনের পর দিন নার্সিসাস তার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে পেতে চায়, কিন্তু অধরা অধরাই থেকে যায়।

দূরে থেকে দুখিনী ইকো সব কিছুই লক্ষ্য করে। সে বেদনায় ধীরে ধীরে দেহহীন হয়ে যায়।

এমনি করে অনাহারে অনিদ্রায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় জীবনের দীপ নিভে গেল নার্সিসাসের।

একদিন দেখা গেল, যেখানে নার্সিসাসের মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে একটি ফুল ফুটেছে। জলের দিকে তাকিয়ে সে দেখছে নিজেকে। সাদা নরম পাপড়িওলা ফুল, মাঝে উজ্জ্বল সোনালী রঙের প্রভা।

গল্প বলা শেষ হলে অর্কের মুখের দিকে তাকাল তিন্‌নি।

অর্ক বলল, বুঝেছি, আমাকে নার্সিসাসের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কিন্তু আমি নার্সিসাস নই। আমি কখনো ইকোর মত কোমল মনের একটি নারীকে পরিত্যাগ করতাম না।

তিন্‌নি বলল, তোমার স্বভাবের ভেতর কোমলতা আছে আর দৃষ্টিতে আছে সহানুভূতির ছোঁয়া, কিন্তু বন্ধু খুব চিন্তা করে দেখো, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এক একজন নার্সিসাস ঘুমিয়ে আছে। গল্পের নার্সিসাসের মত হয়ত আমরা এমন উৎকটভাবে অন্যকে উপেক্ষা করে নিজেকে উন্মাদের মত ভালবাসি না, কিন্তু প্রায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে।

অর্ক বলল, তোমার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিন্‌নি।

তাহলে কাল থেকে তুমি নার্সিসাস।

তুমি নার্সিসাসের কোন্ অধ্যায়টি নিয়ে ছবি আঁকবে? ইকোকে প্রত্যাখ্যানের পর্ব না নিজেকে ভালবাসার পর্ব?

এ কি বলার অপেক্ষা রাখে অর্ক ? নিঃসন্দেহে নার্সিসাসের নিজের প্রেমে মগ্ন হবার বিষয়টি নিয়েই ছবি আঁকব।

একটি বিশাল আয়না মেঝেতে পাতা হয়েছে। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রতিকৃতি প্রথম দেখছে নার্সিসাস। একটা বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে। এত সুন্দরও কি ত্রিভুবনে কেউ হতে পারে।

এই প্রথম ভালবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে একটি মুখ।

তিন্‌নি বলে উঠল, অসাধারণ! সে সঙ্গে সঙ্গে নার্সিসাসের এই জাগরণের মুহূর্তটিকে স্কেচে ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

এ ছবিখানা শেষ করতে লাগল পুরো তিনটে দিন। এই দিনগুলোতে তিন্‌নির অনুরোধে অর্ক রইল অনুপস্থিত।

উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে নার্সিসাস অনন্য। একটি রোমান শিকারীর বেশে সজ্জিত তরুণ ঝুঁকে রয়েছে স্বচ্ছ জলের দিকে। তার অপূর্ব সন্দুর অবয়ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলে।

একটু দূরে হাল্‌কা কোমল রঙে আঁকা এক ছায়ামূর্তি। নতজানু হয়ে বসে তরুণীটি দুহাতের পাতায় ছুঁয়ে আছে একটি তরতাজা নার্সিসাস ফুল।

অরফিউস ছবিটিতে আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে এক বীণাবাদক। তার দুখানি হাত প্রসারিত। একহাতে ধরা রয়েছে বীণা জাতীয় একটি যন্ত্র। তার চোখে মুখে সব হারানোর বিহ্বলতা। দূরে মিলিযে যাচ্ছে এক নারীর ছায়ামূর্তি। তার হাত দুটিও প্রসারিত। সে যেন বলছে, বিদায় প্রিয় বিদায়।

দ্য কুইন হানট্রেস ছবিখানি আঁকা হয়েছে বনের পটভূমিতে। অর্ধনগ্ন দেবী ডায়ানার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি। তিনি যেন বলতে চান, কে এই মনুষ্যলোকের দুঃসাহসী শিকারী, যে আমার নিভৃত বিশ্রাম কুঞ্জে ঢুকে পড়েছে।

ডায়ানার একটু দূরে নতজানু হয়ে বসে আছে শিকারী অ্যাক্‌টিয়ন, তার চোখে মুখে বিমূঢ় বিস্ময়! সারা অবয়বে অসহায়তার ছবি।

ছবির এককোণে হাল্‌কা এক রঙের একটি স্কেচ। ডায়ানার ক্রোধে অ্যাক্‌টিয়ন পরিণত হয়েছে একটি শৃঙ্গওয়ালা হরিণে। সে পালাচ্ছে বনের গভীরে। তার নিজেরই শিকারী কুকুরগুলো তাদের প্রভুকে চিনতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর।

ছবির পর্ব শেষ হলে একদিন সবকটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দুজনে।

অর্ক বলল, তোমার মত সদ্য জেগে ওঠা এক তরুণীর ভেতর যে এতখানি প্রতিভা লুকিয়েছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

তিন্‌নির মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে বলল, সংস্কৃতে একটি কথা আছে, সূর্য উদিত হলে পদ্ম প্রকাশিত হয়। তার অর্থ, সূর্যের ছোঁয়ায় পাপড়ি মেলে পদ্ম।

থামল তিন্‌নি। মুখে হাসিটি লেগে আছে।

অর্ক বলল, তুমি সূর্য আর পদ্মের উপমাটি কেন দিলে তিন্‌নি?

তোমার নামের অর্থই তো সূর্য। এর পরের অর্থটুকু বুঝতে আশা করি তোমার অসুবিধে হবে না।

ম্লান একটুকরো হাসির আভাস দেখা দিল অর্কের মুখে। সে বলল, তুমি তো আবার ছবি আঁকা শেখার জন্য আমেরিকাতে যেতে চাও না।

তিন্‌নি বলল, ও প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক। ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরেও ভাগ্য বলে একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। তার ইচ্ছা না হলে বিফল হয়ে যাবে মানুষের সমস্ত চেষ্টা। আবার যার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করিনি, সেই অভাবিত তারই খেলায় এসে যাবে হাতের মুঠোয়।

এ দেশের মানুষ বড় বেশী ভাগ্যবিশ্বাসী, তাই না তিন্‌নি?

বাবা বলতেন, নিজের পুরুষকারের ওপর ভর রেখে এগোতে হয়। শেষ ছোঁয়াটা তোমাকে ভাগ্যই দিয়ে দেবে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, অভিযোগ জানিয়ে কিছু করা যাবে না। তার বিধান শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হবে।

অর্ক বলল, এ আলোচনাটা এখন থাক। আমাদের ছবি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল।

তিন্‌নি উদ্ভাসিত মুখে বলল, তোমার আশ্চর্য অভিনয় আমার ছবি আঁকার পেছনে বিরাট প্রেরণার কাজ করেছে।

তা আমি জানি না, তবে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করে গেছি। এর আগে কোনদিনই অভিনয়ের সুযোগ আমার আসেনি। দেখো, তোমার ছবিগুলো খুব প্রশংসা পাবে।

তিন্‌নি বলল, আমরা দুজনেই এ ছবিগুলো সৃষ্টি করেছি। তাই আমাদের ভাল লাগাটাই এ ছবির শেষ কথা।

তিন্‌নি কথা শেষ করে উচ্ছ্বাসে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। সে হাত হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ উজাড় করে ধরে ফেলল অর্ক।

কতকক্ষণ দুজনে হাতে হাত বেঁধে বসে রইল। কেউ একটি কথা উচ্চারণ করল না। নীরবতাই বুঝি যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

আজকাল অপরাহ্নের দিকে ভ্যালিতে ঐ নির্দিষ্ট টিলাটির ওপর উঠে বসে থাকে দুজনে। পড়ন্ত বেলায় মায়াময় হয়ে ওঠে চরাচর। ছোট্ট নদীর স্রোতের দিকে তাকালে মনে হয় গলিত সোনার প্রবাহ। বড় কোমল লাগে চোখে।

উত্তরে তাকালে দেখা যায়, তুষার চূড়ায় শেষ সূর্যের খেলা। এখানে কথার চেয়ে নীরবে উপভোগ করাই বড় পাওয়া।

এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল পশ্চিমের পাহাড়ী জঙ্গলটা লক্ষ্য করে। এখন নিচের উপত্যকায় শুরু হয়েছে গম তোলা। সেখানে ভোজের নিমন্ত্রণ শেষ করে ওরা পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুলতে তুলতে চলে গেল।

আপেল বাগিচা অথবা ফসল ক্ষেতের কাজ সেরে একদল মেয়ে ভ্যালি পেরিয়ে ঘরে ফিরছে। শেষ সূর্যের সোনায় স্নান করছে তারা। গোলাপী আভাযুক্ত আপেলের মত রঙের ওপর সোনালী প্রলেপ পড়ছে। নয়ন ভোলানো লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠছে ওরা।

ওদের গলায় বসন্ত-উৎসবের গান। সারা দেশটা উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠেছে। গৃহজাত হয়েছে সোনালী ফসল। আপেল বাগিচায় ফুলের স্তবক ঘিরে মত্ত মধুপের গুঞ্জন।

পাইন, সিডারের বনে, অথবা আপেল অর্চার্ডের ভেতর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে এক এক পাল ভেড়া। তাদের দলটাকে সিধে রাখছে, দু'একটা লোমশ কুকুর। হাঁটু অব্দি ঝোলা ফ্রক, পাকে পাকে ছাগল লোমের মোটা দড়ি দিয়ে জড়ানো কোমর, পায়ে চম্বার মোটা নাগরা, আর মাথায় কুলুর টুপি পরে ভেড্ বক্‌রির সঙ্গে চলেছে গদ্দী পহ্‌ল। তাদের কোমর থেকে কুলহার (কুঠার) আর বজলু (থলে) ঝুলছে। তারা মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে, কখনো বা শিস্ দিতে দিতে ভেড্, বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

কয়েক দিনের ভেতরেই ওরা উঠতে থাকবে উঁচু পাহাড়ের ওপর। গ্রীষ্ম বর্ষা তুষার পাহাড়ের

কোলে কোলে নিরু ঘাসের বুগিয়ালগুলিতে ভেড় চরিয়ে কাটাবে ওরা। আবার শরৎ এলে ওরা নেমে আসবে ভ্যালিতে। রুবানায় সুর তুলবে পথ চলতে চলতে।

নদী, কুহল, ছই, ঝর্ণা, মেতে উঠবে আনন্দ গানে। ঝাঁক ঝাঁক ট্যুরিস্টদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে।

এখন বসন্তের গান গলায় নিয়ে কাজের শেষে ফিরছে তরুণীরা। তারা পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে হাসির হুল্লোড় তুলছে।

তিন্‌নি আর অর্কও উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

ওরা জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে নাচ শুরু করবে। প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে নাচবে নিদ্রাহারা রাতের নাচ।

এবার ফেরার পালা। টাট্টুতে চড়ে ফিরছে ওরা। ভ্যালি থেকে ওপরের বাঁধানো রাস্তায় উঠে এসেই মুখোমুখি হল আর এক অশ্বারোহীর।

তিনি হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিউপিডের মত সুদর্শন এই তরুণ যুবকটি কে তিন্‌নি?

টাট্টুর থেকে তিন্‌নি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। তার দেখাদেখি অর্কও। অশ্বারোহী অগত্যায় নেমে দাঁড়ালেন।

ইনি আমার আঙ্কেল, অর্ক।

অর্কদীপ নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার কথা তিন্‌নির মুখে বহুবার শুনেছি।

তিন্‌নি আমার মম্‌, তাই সব মায়ের মত নিজের ছেলের কথা একটু বাড়িয়েই বলে।

তিন্‌নি কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, একদম না।

জুলিয়েন অর্কের দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে এই প্রথম দেখলাম মানালীতে। এও জানলাম তোমার নাম অর্ক। কিন্তু সংক্ষেপে পুরো পরিচয়টি যে চাই।

বদরীপ্রসাদজী আমার নানা। আমি অর্কদীপ চতুর্বেদী। আমেরিকা গভর্ণমেন্টের একটি সংস্থায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজে যুক্ত আছি।

দারুণ খবর। এই বয়সে এতখানি ওপরে উঠেছ ইয়ং ম্যান।

তিন্‌নি বলল, ও ভাল টেনিসও খেলতে পারে।

ও, রিয়েলি!

এখনও আমি শিখছি আঙ্কেল।

একদিন এসো আমার বাড়ি আলাপ করব।

অর্ক বলল, আপনি যখন বলবেন তখনই আসব।

কাল অর্ককে নিয়ে চলে এসো তিন্‌নি, ব্রেকফাস্ট ওখানেই সারবে।

অবশ্যই যাব আঙ্কেল।

পরের দিন চায়ের টেবিলে অনেক কথাবার্তা হল। ক্যারলের বন্ধু গোষ্ঠীর জন্য ওরা কি ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে তার একটা বিস্তৃত ফিরিস্তি দিল তিন্‌নি। শেষে বলল, আঙ্কেল, আপনার ব্যাঙ্কোয়েট হলখানা তিন দিনের জন্য আমাদের চাই।

অবশ্যই পাবে, কিন্তু ওখানে তোমরা কি প্রোগ্রাম করতে চাও বল?

আমরা আমাদের বন্ধুদের অনারে ওখানে একটা ছবির এগ্‌জিবিশান করতে চাই। তার সঙ্গে রোজই কিছু নাচ্‌গানও থাকবে। ইচ্ছে করলে আপনার হোটেলের গেস্টরাও যোগ দিতে পারেন।

অবশ্যই। তাছাড়া মানালীর সরকারী অফিসার এবং বিশিষ্টজনদের আমি আমন্ত্রণ জানাব। কিন্তু মম্‌, কার ছবির এগ্‌জিবিশান হবে? মায়ের?

একজন আনাড়ী শিল্পীর হাতের কাজ নিয়ে যদি এগজিবিশান হয় তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

আরে আপত্তির কথাই বা উঠছে কেন? ঝিন্নির মেয়ে তিন্‌নির রুচি আর শিল্পবোধের ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে।

তিন্নি বলল, তবু আমি ভয় পাচ্ছি আঙ্কেল। আমাদের ছবিঘরে পেইন্টিংগুলো বন্দ আছে, আপনি নিজের চোখে একবার দেখে নিলে আশ্বস্ত হই।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি।

সারা দুপুর ধরে দুবন্ধুতে মিলে ছবিঘর গোছালো। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা ছবিগুলো। বিদেশীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা সাম্প্রতিক ছবিগুলি রইল একদিকে। অন্যদিকে তিনদিকে ভারতীয় পটভূমিতে আঁকা আগেকার ছবিগুলো রাখা হল।

ঝিলমের কূলে সন্তান কোলে নিয়ে কাশ্মীর কন্যা, কুলুতে উন্মুক্ত প্রান্তরে তরুণ তরুণীর দলের নাচ, একটি পাঞ্জাবী দলের ভাঙড়া, পুরীর সমুদ্রজলে ভোরবেলা নুলিয়াদের নৌকো ভাসানো, এমনি আরও অনেকগুলি পেইন্টিং।

জুলিয়েন মেজাজী এবং খামখেয়ালী, কিন্তু কথার মানুষ। তিনি সন্ধ্যায় এসে ঢুকলেন ছবিঘরে। তার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন ঝলন্ত ঝাড়লন্ঠনটি। ঝকঝকে আলোর চারদিকে বর্ণালীর ঝালর। একটি ইন্দ্রধনুর সাতরঙা স্নিগ্ধ বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় পাঁচ বছর পরে জুলিয়েন এলেন ছবিঘরে। শেষবার এসেছিলেন, [illegible] ছোট্ট ফুলের বাগানটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন দু'বন্ধুতে। তখন [illegible] ঝাড়লন্ঠনটিকে ঝুলতে দেখা যায়নি।

জুলিয়েন ছবিঘরে ঢুকেই বললেন, সেই ইয়ংম্যানটি কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

আপনি অর্কের কথা বলছেন?

হাঁ, সেই সুভদ্র ছেলেটি।

তিন্নি হেসে বলল, ও এখন তার নানা নানির সঙ্গে পুজোয় বসেছে।

কিসের পুজো?

আমি ঠিক জানি না আঙ্কেল। পারিবারিক কোন পুজো-টুজো হবে।

এবার জুলিয়েনের দৃষ্টি পড়ল ছবিঘরের দেয়ালগুলোর ওপর।

ওয়ান্ডারফুল! শুধু ওয়ান্ডারফুল নয়, এ দেখছি এক ওয়ান্ডার ল্যান্ড।

জুলিয়েন বলে চললেন, ঐ তো বীণাবাদক অরফিউসের ছবি। প্রিয়তমা ইউরিডাইস অকালে চলে গেলেন মৃত্যুপুরীতে। অরফিউস তখন স্ত্রীর শোকে প্রায় উন্মাদ। তিনি অনেক কষ্টে মৃত্যুপুরীর সিংহদরজা পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন স্বয়ং মৃত্যুর দেবতার সিংহাসনের সামনে। বীণাতে দেবতাকে মুগ্ধ করলেন তাঁর বীণবাদনে।

আবেগে বিহ্বল দেবতা বললেন, মর্তবাসী মানব কি চাও তুমি আমার কাছে?

আমার প্রিয়তমা পত্নী অকালে এসেছে এই মৃত্যুপুরীতে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

অসম্ভব হলেও তোমার এ প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব, কিন্তু একটি শর্তে।

বলুন।

তোমাকে অনুসরণ করে চলবে তোমার স্ত্রী। তুমি কিন্তু মৃত্যুপুরীর সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকাবে না।

অরফিউস মৃত্যুর দেবতার শর্ত মেনে আসছিলেন, কিন্তু সহসা জেগে উঠল তার মনে সংশয়,—ইউরিডাইস আমাকে অনুসরণ করছে তো?

তিনি প্রায় সীমানার কাছে এসেই পেছন ফিরে তাকালেন।

বিদায়, প্রিয়তম বিদায়!—বলতে বলতে দু'হাত অরফিউসের দিকে প্রসারিত করে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলেন ইউরিডাইস।

পুরোটাই যেন অভিনয় করে বলে গেলেন জুলিয়েন বেনন।

শেষে বললেন, অসাধারণ কাহিনী। কিন্তু মম, এই ছবিগুলির শিল্পী কে! আমি অবাক হচ্ছি তার হাতের কাজ দেখে। স্কেচে যেমন দক্ষতা, রঙের ব্যবহারেও তেমনি নিপুণতা। এই কি তোমার সেই শিল্পী?

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল তিন্নি।

কোথায় সে? তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে, সেই আমেরিকাবাসী ইয়ং ম্যানই এই ছবিগুলোর স্রষ্টা।

তিন্নি বলল, এই ছবি সৃষ্টির কাজে তার অনেকটাই দান আছে, কিন্তু সে নিজের হাতে এ ছবির একটি রেখাও টানেনি।

আমার কাছে তোমার কথাগুলো ধাঁধার মত লাগছে তিন্নি।

অর্ক কাহিনীগুলো পড়ে প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলোতে মূক অভিনয় করে গেছে। আর সেগুলো দেখে স্কেচ করে রঙ লাগিয়েছে ...।

এইটুকু বলে থামল তিন্নি।

সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বেনন প্রায় জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আদরের মম্‌কে।

তুমি এসব ছবি এঁকেছ মম্! আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না! তোমার মা নিশ্চয় দেখেছে। মেয়ের কৃতিত্বে অবশ্যই গর্বিত স্বনামধন্য শিল্পী মিসেস ঝিন্নি মুখার্জী।

না আঙ্কেল, মাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে এখনও এ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলিনি।

কিচেন থেকে হাঁক পাড়ল ভাগ্‌তু, চা রেডি।

তিন্নি বলল, আসছি।

জুলিয়েন বললেন, এখানেও কি চায়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছ নাকি?

আজই ভাগ্‌তুদাদা এখানে প্রথম চায়ের পাট বসাল।

তিন্নি ভেতর থেকে ট্রেতে করে দু'কাপ চা আর এক প্লেট পকৌড়া নিয়ে এসে দেখে খেয়ালী জুলিয়েন আঙ্কেল ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইল তিন্নি। নিজের ছবিগুলোকে দেখতে লাগল নিবিষ্ট হয়ে। দেখতে দেখতে মনে হল, এ ছবিগুলো কি তার নিজেরই আঁকা! বিশ্বাস করতেও যেন ভরসা পায় না।

কে তার হাত ধরে আঁকালেন এতগুলো ছবি! কে সেই অদৃশ্য শিল্পী, যিনি তার চোখে সাতরঙের মায়াতুলি বুলিয়ে দিলেন।

অর্ক, তুমি নিঃস্বার্থভাবে তোমার বন্ধুর হৃদয়ে প্রেরণার দীপটি জ্বালিয়ে দিয়েছ। যদি সবার দৃষ্টিতে সার্থক হয় আমার ছবি তাহলে সে সাফল্যের পেছনে তোমার অদৃশ্য ভূমিকার কথা আমি ভুলতে পারব না কোন দিনও।

পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে দাঁড়াল তিন্নি। জুলিয়েন আঙ্কেল মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে।

ঝিন্নিদেবীর চোখে মুখে বিস্ময়।

জুলিয়েন বললেন, দেখ সিস্টার, ভাল করে দেখ, এ তোমার হাতের তৈরী না তোমার ঐ শিক্ষানবিস মেয়ের।

ঝিন্নিদেবী ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাঁর মুখে কথা নেই। চোখের তারা দুটি ছবিতে নিবদ্ধ। একটি ছবি শেষ হলেই অন্যটিতে চলে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। এ যেন পদ্ম বনে উড়ে বেড়াচ্ছে দুটি ভ্রমর।

অনেক সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিন্নির নতুন আঁকা ছবিগুলো।

দেখা শেষ হলে ফিরে দাঁড়ালেন। মা মেয়ে এখন মুখোমুখি। একে অন্যের দর্পণে দেখছে নিজেকে। সৌন্দর্যে, লাবণ্যে, গড়নে দুজনেই তুল্যমূল্য।

হঠাৎ ঝিন্নিদেবীর চোখ উপচে জল নামল। তিনি মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

কতকক্ষণ পরে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিন্নি মা আর জুলিয়েন আঙ্কেলকে প্রণাম করল। তাঁরা চুম্বন করে ভালবাসা আর আশীর্বাদ জানালেন।

শেষে ঝিন্নিদেবী বললেন, অভাবনীয় কিছু কাজ তুমি করেছ তিন্নি। মনে রেখ এই ছবি আঁকতে আঁকতেই তোমার সিদ্ধি আসবে। তুমি যখন ছোট, তখন তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমি চেয়েছিলাম, তুমি বাবার মত ডাক্তার হবে। আর তোমার বাবা চেয়েছিল, মেয়ে মায়ের মত

শিল্পী হবে।

আজ তারই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

কিচেন ডোর থেকে উঁকি দিয়ে ভাগ্‌তু বলল, একবার চা নষ্ট হয়ে গেছে, ফিরে বানালাম। ঠান্ডা পকৌড়াগুলো গরম করেছি, এখন চটপট খেয়ে নেবে কি ?

তিন্‌নি কিচেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চা আর খাবার ভর্তি ট্রেখানা তুলে নিল।

ভাগ্‌তু চুপি চুপি বলল, একেবারে বেলুনের মত যে ফুলছিস রে।

তুই থাম হাঁদা।

পাঁচ

তেইশে এপ্রিল। বাতাসে তউন্দি বা গ্রীষ্মকালের ছোঁয়া লেগেছে। এদিক ওদিক ছড়ানো পাহাড়গুলোকে অনেক সময় অস্বচ্ছ মনে হয়। আসলে এ সময় এক ধরনের ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে ওঠে। তাই পাহাড়ের গায়ের দৃশ্যাবলী অস্পষ্ট হয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু বাইরের গরম পাহাড় ঘেরা ভ্যালির ভেতব নামলে কিছু বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া সারা ভ্যালি জুড়ে খেলা করতে থাকে।

তেইশে এপ্রিল। তিন্‌নির ক্যালেন্ডারে একটি চিহ্নিত দিন। ঠিক নাস্তার সময় অর্ক তৈরী হয়ে এসে গেল। নাস্তা শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়বে কুলুর উদ্দেশ্যে।

ডাক্তার মুখার্জী মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কিনেছিলেন একখানা সাদা মারুতি। তিনি সাধারণত টাট্টুতে চড়েই পাহাড়ী গাঁগুলোতে চিকিৎসা করে বেড়াতেন। ইদানিং মানালী থেকে কোথাও যেতে হলে বাসে করে যাতায়াতে তাঁর বেশ অসুবিধে হত। সময়েরও অনেকটা অপচয়। তাছাড়া নিজের ইচ্ছে মত বেরোনো যায় না, বাসের সময় ধরেই বেরোতে হয়।

এসব ভেবেই তিনি মারুতিখানা কিনেছিলেন। জুলিয়েন ওস্তাদ ড্রাইভার। তাঁর গাড়িতেই হাত পাকিয়েছিলেন ডাক্তার মুখার্জী। মারুতি আসায় স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই তিনি চলে যেতেন কুলু আর নাগ্‌গরে। কখনো সখনো দু'একদিন কাটিয়েও ফিরতেন।

তিন্‌নি অনেক সময় বাবা মার সঙ্গে যেত না। সে হয়তো মানালীতে নানা কাজে মেতে থাকতো। ঝিন্নিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ডাক্তার মুখার্জী। সে সময় প্রথম যৌবনের দিনগুলো ফিরে আসত তাঁদের জীবনে। তাঁরা অতীতের মত হাত ধরাধরি করে ঘুরতেন কুলুর আপেল বাগিচায়। কাঠবেড়ালির দুষ্টুমি দেখে হাততালি দিতেন। চিড়িপাখিদের লুটোপুটি দেখে ফেটে পড়তেন উল্লাসে।

সন্ধ্যা ঘনালে ঝিন্নিদেবী জিজ্ঞেস করতেন, আউট হাইসে থাকার ব্যবস্থা করি।

ডাক্তার মুখার্জী বলতেন, কেন, পুরানো কাঠের বাড়িতে থাকতে তোমার অসুবিধে আছে?

ঝিন্নিদেবী মনে মনে তাই চাইলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতেন না। তিনিও তাঁর অতীত দিনগুলোকে গভীরভাবে পেতে চাইতেন।

তিনি উত্তর করতেন, আউট হাউসটাকে নতুন কবে গড়ে তুলেছ, তাই বলছিলাম। পুরানো কাঠের বাড়ি, কাঠের সিঁড়িতে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে।

কিছুমাত্র না। ঐ কাঠের সিঁড়ির ওপরের ঘরটিতে শুয়ে আমি প্রথম দিনের মত কান পেতে অপেক্ষা করব সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। তোমার কানের সেই ছোট্ট দুলগুলো মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে টুলটুল করে দুলে উঠবে, সে দৃশ্য দেখার লোভ আমি আজও ছাড়তে পারিনি ঝিন্নি।

মৃত্যুর ছ'মাস আগে ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেয়ালির মেলা দেখতে টাট্টুতে চড়ে বরফের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন নাগ্‌গরে। ঝিন্নিদেবী আগে থেকে গিয়ে ওপরে ফরেস্ট বাংলোর একখানা রুম বুক করেছিলেন।

বিয়ের আগে প্রেমপর্বের মত তাঁরা সেদিনও সন্ধ্যার মুখে মেলা দেখে ফিরে এসেছিলেন নির্জন বাংলোতে। হাউই উঠেছিল কেল্লা থেকে। এখন যেটি সরকারী বাংলো। সেই প্রথম মেলা দেখার দিনটির মত ওঁরা দুজনে একই কম্বলের উত্তাপে থেকে জানালার ফাঁকে দেখেছিলেন উজ্জ্বল হাউইয়ের

আকাশপথে ওঠা নামা। আকাশ থেকে অজস্র তারাফুলের ঝরে ঝরে পড়া।

জীবনের উত্তাপ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলেও তাঁরা নাগ্গরের উৎসবে প্রায় প্রথম দিনের মতই রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন। স্মৃতির সুরভি সম্ভবত সহজে মুছে যায় না।

নাস্তা শেষ হলে তিন্নি বলল, মা, আমি যদি বাবার গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তোমার আপত্তি আছে?

ঝিন্নিদেবী বললেন, তোমার বাবাই তো হাতে ধরে তোমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বাবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। সাবধানতার কথা আমি কিছু বলব না। ওটা যে যার নিজের হুঁশিয়ারীর ব্যাপার। তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

তিন্নি বলল, অর্ক কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার মা।

দু বন্ধুতে আনন্দে চলে যাও। আশা করি রাত আটটার ভেতর ফিরে আসবে।

তুমি চিন্তা কর না মা, আমরা ঠিক সময়েই ফিরব।

অর্ক আর তিন্নির মারুতি উঁচু নিচু রাস্তায় ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল।

সারা মানালীর মানুষের কাছে তিন্নি কেবল পরিচিত নয় একান্ত প্রিয়, ঘরের মেয়েটির মত।

ডাক্তার মুখার্জীর মেয়ে হিসেবে তিন্নির ওপর শহর আর পাহাড়ী বস্তি এলাকার মানুষদের বাড়তি একটা আকর্ষণ থাকলেও তার ব্যক্তিগত চরিত্রের নম্রতা, সকলের প্রতি তার সুমিষ্ট ব্যবহার ও পরোপকারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে সবার একান্ত প্রিয় ও আপনজন করে তুলেছিল।

শহর পেরিয়ে যাবার সময় অনেকেই হাত নাড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিন্নি তার হাত নেড়ে নেড়ে ওদের প্রত্যভিবাদন জানিয়ে গেল।

এখানকার মানুষ তোমাকে খুব ভালবাসে তিন্নি।

তিন্নি মজা করে বলল, কেন, আমেরিকার মানুষ আমাকে ভালবাসে না?

অর্ক বলল, চুম্বক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাক, লোহা তার দিকে ছুটে যাবেই। তোমার ভেতর সেই আকর্ষণী শক্তি আছে তিন্নি।

গাড়িতে ব্রেক কষে তিন্নি অর্কের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, তুমি আমার সব সেরা বন্ধু অর্ক। একদিন কথা প্রসঙ্গে বাবা বলেছিলেন, জুলিয়েনের কাছে হৃদয় উজাড় করে আমি যে কথা বলতে পারি, তোমার মা আমার সব থেকে আপনজন হলেও তার কাছে সব সময় তা পারি না।

আবার গাড়ি চলল। কুলুতে পৌঁছে নিজেদের আউট হাউসে উঠল ওরা। ঢোল ময়দানের পেছনের দিকের পাহাড়ে আপেল বাগিচার এক প্রান্তে আউট হাউস। মূল বাড়িখানা পুরানো দিনের। কাঠ আর শ্লেট পাথর দিয়ে তৈরী। আউট হাউসটি পরে মজবুত করে গড়া হয়েছে। একেবারে আধুনিক সব ব্যবস্থা।

কেয়ারটেকার গোপীনাথজী ঘর খুলে দিলেন। ছোট মালিক আর তার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন। তাই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। সদা তটস্থ হয়ে আছেন।

তিন্নি বলল, চাচাজী, বাড়িখানা বেশ ছিমছাম করে রেখেছেন। মা শুনলে ভারি খুশি হবেন।

মানালী থেকে কোন চিঠিটি আসেনি মালিকের।

তাতে কি হয়েছে। আপনার ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে ভারি আরাম বোধ করছি।

এ তো আপনার মোকাম আছে ছোট মালেক।

তিন্নি হেসে বলল, এ মোকাম কার সে ফয়সালা পরে হলেও চলবে, এখন একটুখানি গরম পানির ব্যবস্থা হলে স্নানটা সেরেনি।

কেন ছোট মালেক, স্নানঘরে তো গিজার রয়েছে। এখুনি কুন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম পানিতে বালতি ভরে দেবে।

তিননি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, না না সে সব কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক জানতাম না যে ওখানে গিজার রয়েছে।

ওপরের স্নান ঘরেও রয়েছে ছোট মালেক। দুটো বাথরুমেই নতুন সাবান আর তোয়ালে রয়েছে।

চাচাজী আমরা এ বেলা দুজনে লাঞ্চ করব। বিকেল পাঁচটা নাগাদ চার পাঁচজন বন্ধু এসে পড়বে। তাদের জন্য একটুখানি হাই-টির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভেজ না ননভেজ মালেক?

ননভেজ।

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল কুন্তি।

ট্রেতে এনেছে দুকাপ চা, কিছু সলটেড কাজু আর দুটো মেঠাই।

বছর তের বয়সের মেয়েটি। ভারি মিষ্টি দেখতে। কানে দুটি ছোট্ট ঝুমকো দুল। গলায় পুঁতি আর লাল ফলের বীজের মালা। বিনুনি করেছে জরির ফিতে দিয়ে। লাল ট্যাসেল ঝুলছে।

ট্রেটি টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে কুন্তি বলল, মেমসাব লাঞ্চে কি খানা পাকাব?

তিন্নি তার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, আমি মেমসাব নই কুন্তি, আমি তোমার বড় বহিন, তিন্নি দিদি।

কুন্তি উচ্চারণ করল, তিন্নি দিদি।

তার ছোট্ট মিষ্টি মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বেলা তিনটে নাগাদ আউট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন্নি আর অর্ক। তারা কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর ক্যারল আর তার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করবে। ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে ক্যারলদের। জুলিয়েন আঙ্কেল বলেছিলেন, ওঁর অ্যামবাসেডারখানা চণ্ডিগড়ে ক্যারলের কাছেই রয়েছে। ওটা নিয়েই ও আসবে।

অর্ক আর তিন্নি রাস্তার ধারে পায়চারি করতে লেগে গেল।

এ সব অঞ্চল তিন্নির নখদর্পণে। অর্কের কাছে একেবারে অচেনা, তাই সবই শোভাময়। সে কুলুর নিসর্গ দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখতে লাগল।

এখন আপেলের ডালে ডালে ফুলের বদলে ফল দেখা দিয়েছে। বড় বড় ডুমুরের আকারে ফলগুলো ডাল ছেয়ে ফেলেছে।

ওদিকে এপ্রিলে বরফ গলতে শুরু করায় হাজারো রঙ বাহারি ফুল উঁকি দিচ্ছে পাহাড়ে জঙ্গলে। পথের ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, ছই বা স্রোতধারার তীরে তীরে উঁকি দিচ্ছে, দুলছে, কত জাতের, কত বর্ণের ফুল। রোডোডেনড্রনেও লাল ফুল শাখায় শাখায় আগুনের শিখা তুলে ধরেছে।

অর্ক উত্তেজিত গলায় বলল, ঐ তো দূরে দেখা যাচ্ছে অলিভগ্রীন রঙের একখানা অ্যামব্যাসেডার।

তিন্নি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

আরে না না, ক্যারলের অ্যামব্যাসেডারের রঙ অফ্ হোয়াইট।

অর্কও তিন্নির হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, আমি কি অতশত রঙের খবর রেখেছি নাকি। এবার অফ্ হোয়াইট দেখলেই ধরব।

আবার হাসি, ইতিমধ্যে ক্যারল যদি গাড়ির রঙটা বদলে ফেলে?

তাইতো আমি রঙের বাদবিচার না করে অ্যামব্যাসেডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

তিন্নি বলল, তাই হোক্, তুমি অফ্ হোয়াইট বাদে সব রঙের গাড়ি লক্ষ্য কর, আমি শুধু অফ হোয়াইট দেখে যাই।

দুজনের জল্পনা কল্পনার ভেতরেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের গা ঘেঁষে। লাল রঙের মারুতি ভ্যান।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ক্যারল। ধীরে ধীরে অন্য সবাই।

পরিচয় পর্ব দ্রুত সারা হল হাত নাড়া আর হাই হাই আওয়াজ তোলার ভেতর দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে এলো তিন্নিদের আউট হাউসে। আগন্তুকদের ভেতর তিনজন ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে।

তিন্নি মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে। বাকিরা নিচেই হাত মুখ ধুয়ে পোশাক ছেড়ে

সারাদিনের গ্লানিমুক্ত হতে লাগল।

ফিটফাট হয়ে ওরা এলো খাবার টেবিলে। স্যালাড, মাংসের কাটলেট আর এক প্লেট করে ঘুগনি। সঙ্গে সফ্‌ট ড্রিংক্‌স্।

পরে চা আর কিছু স্ন্যাক্‌স্ এলো।

হেভি টির পরে বাগান থেকে সদ্য তোলা কিছু গোলাপ তিন্‌নির গোপন নির্দেশে কুন্তি এনে সবার হাতে একটি একটি করে ধরিয়ে দিল।

খুশির ঢেউ উঠল। সবাই আদর করল কুন্তিকে। অনেকগুলো টফি উপহার পেল সে।

এবার মানালীর পথে আগে পিছে দুটো গাড়িই চলবে।

ওদের ভেতর কপিল সাহানি বেশ জমাটি ছেলে। ধ্রুব পোড়েল কম কথা বলে কিন্তু আসরে বসে ঠিক জায়গায় হেসে উঠতে পারে। রত্নাবলী কুট্টি কেরলবাসিনী এবং মধুরহাসিনী। হরিহরন্ কুট্টি চণ্ডিগড়ের খ্যাতিমান নিউরোসার্জেন। তাঁর একমাত্র কন্যা রত্নাবলী। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। মোহিনী আট্টমে কেরল সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্তা।

ধ্রুব আর কপিল ছুটি পড়লেই ট্রেকিংয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। পিণ্ডারী গ্ল্যাসিয়ার, অমরনাথ, মণিমহেশ, এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ওরা ঘুরে এসেছে। এবার বাসে যাবে রোটাং হয়ে লে। ফিরবে ট্রেকিং করে মানালী। তারপর সবাই মিলে ফিরবে চন্ডিগড়।

কপিল এগিয়ে এসে অর্কের কোমর বেষ্টন করে বলল, বন্ধু তোমার সঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয়, তুমি কি এ পথটুকু আমাদের সঙ্গ দেবে?

নিশ্চয়ই, তবে একটি শর্তে।

বল।

আমি আনাড়ী হাতে বাকি পথটুকু তোমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

কপিল বলল, আমরা সবাই ক্লান্ত, তোমার হাতেই নিজেদের সঁপে দিতে চাই।

সবাই হেসে উঠল। অর্ক স্টিয়ারিং ধরল। কপিল সাদা মারুতিখানার দিকে ক্যারলকে ঠেলে দিয়ে বলল, এ গাড়িতে আর ভিড় বাড়িও না গুরু।

ততক্ষণে সাদা মারুতির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে তিন্‌নি। ক্যারল তার পাশে গিয়ে বসল। লাল মারুতি বেরিয়ে গেল আগে। অর্কের পাশে বসে রত্নাবলী। সে তিন্‌নির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। তিন্‌নিও মাথাটা বের করে একমুখ হাসি উপহার দিল।

লাল মারুতির পেছনে চলেছে সাদা। তিন্‌নি নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি সামনের দিকে। পাশে বসে তাকে লক্ষ্য করছে ক্যারল।

আজ দেখা হবার পর থেকে তিন্‌নি তার সঙ্গে মুখ তুলে একটিও কথা বলেনি। অতিথি আপ্যায়নে তার আন্তরিক উত্তাপের ঘাটতি ছিল না। পরিবেশনের সময় স্বাভাবিকভাবে সে সবাইকে খাবার এগিয়ে দিয়েছে। হাসি গল্পে যোগ দিয়েছে সবার সঙ্গে। কেউ বুঝতেই পারেনি তিন্‌নির মনের গভীরে কোন দুঃখ বাসা বেঁধেছে কিনা।

ক্যারলই প্রথম কথা বলল, আমার ওপর এত অভিমান তোমার?

এ কথা কেন?

দেখা হবার পর থেকে একটিও কথা বলনি। এক মাস পাঁচ দিন পার হয়ে গেল, তোমার কোন খবর নেই।

তিন্‌নি বলল, আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, ক্যারল বেননের এমন কোন খবর নেই যা আমার অজানা। কিন্তু সে ভুলটা তুমি ভেঙে দিয়েছ।

বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছ। আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম তিন্‌নি। ড্যাডি যে আমার পাঠানো খবরটুকু হজম করতে পারবে না, তা আমি বুঝতে পারিনি।

তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আঙ্কেল আমাকে কম ভালবাসেন? তিনি খবরটা পেয়ে আমার কাছে গোপন রাখবেন, এই কি তোমার ধারণা হল? চিঠি পেয়েই আমাকে ডেকে বললেন, মম্, ক্যারল

তার বন্ধুদের নিয়ে আসছে টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল। ওরা সকলেই তোমার গেস্ট হয়ে থাকবে কয়েক দিন। সব ব্যবস্থার ভার তোমার।

এবার অন্য প্রসঙ্গে এল ক্যারল, অর্ক ছেলেটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না।

তিন্‌নি বলল, সুযোগ চলে যায়নি।

তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

যেমন করে একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হয়। কেন ঈর্ষা হচ্ছে নাকি ?

ক্যারলের মুখে হাসি, তা একটু হচ্ছে বইকি।

আমার তো কই হচ্ছে না।

তোমার কেন হবে?

বাঃ, বার ঘন্টা সুন্দরী মধুরহাসিনীকে যে পাশে বসিয়ে আনলে।

এবার হো হো করে হেসে উঠে ক্যারল জড়িয়ে ধরতে গেল তিন্‌নিকে।

গাড়ি দু'একবার বাঁক নিল। শেষে জোর ব্রেক খেয়ে থেমে গেল।

এখুনি অ্যাকসিডেন্ট হত যে।

ক্যারল জড়িয়ে ধরে বলল, দুজনের মিলনটা গভীর হত।

ক্যারলের কাঁধে মাথা রেখে সুখের দু ফোঁটা অশ্রু ঝরালো তিন্‌নি।

ক্যারল বলল, এবার আমি চালাই।

না, আড়াইশো কিলোমিটারেরও বেশী তুমি চালিয়ে এসেছ, এখন সীটে গা ঢেলে দিয়ে রিল্যাক্স্‌ কর।

আমি একা চালাইনি। কপিল, রত্নাবলীও বেশ কিছু পথ চালিয়ে এনেছে।

রত্নাবলী মেয়েটি কিন্তু বেশ। সারাক্ষণ মুখে হাসিটুকু লেগে আছে।

কপিলও দারুণ আমুদে, ধ্রুব একটু চাপা।

তোমার বেস্ট্‌ ফ্রেন্ড কপিল।

কি করে বুঝলে?

ওই তো অর্ককে ও গাড়িতে টেনে নিয়ে তোমাকে আমার দিকে ঠেলে দিলে।

দারুণ ধরেছ। এই এক বছরে তোমার বুদ্ধি দেখছি বেশ ঝকঝকে হয়েছে।

তিন্‌নি একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বলল, পড়াশোনা কেমন চলছে?

পরীক্ষকরা আমার পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হলেও আমি নিজে নই।

কেন?

বেশীক্ষণ পড়তে পারছি না। রাত নটাতেই বিছানায় ঢুকছি। অন্য বন্ধুরা বারোটার আগে কেউ বিছানায় যায় না।

ওরা এতক্ষণ কি করে?

বেশীর ভাগ পড়াশোনা করে। বাকিরা টিভি খুলে গভীর রাতের সিনেমা দেখে।

তুমি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় কেন?

একটি মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব বলে।

গাড়ির ভারতীয় চালিকাটি ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে একমাত্র ইংরেজ আরোহীকে একটি ঘুষি মারল।

সে ঘুষি পরমানন্দে হজম করল ইংরাজ যুবা পুরুষটি।

তিন দিনের ভেতর ধ্রুব আর কপিল টেন্ট এবং পোর্টার যোগাড় করে ফেলেছে। ওরা আর একটি দিন মাত্র থাকবে মানালীতে। তারপর ওদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী শুরু হবে যাত্রা।

তাই আজ রাতেই সপ্তরথীর (ভাগ্‌তুরামও অন্যতম এক রথী) অনারে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন জুলিয়েন বেনন।

ব্যাঙ্কোয়েট হলে তিন্‌নির চিত্র-প্রদর্শনীব উদ্বোধন করবেন জেলাশাসক মহোদয়। তারপর দেড় ঘন্টার ঠাসা প্রোগ্রাম। সবশেষে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ডিনারে আপ্যায়ন।

তিনদিনে ওরা সাতজন মিলে দেড় ঘন্টার ভ্যারাইটি প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সেলের পর রিহার্সেল দিযে গেছে। ডাক্তার মুখার্জীব গেস্ট হাউসের প্রশস্ত লনে একক, দ্বৈত আর সমবেত নাচেব রিহার্সেল হয়েছে। গানগুলিও শিল্পীরা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে যে যাব যন্ত্র সহযোগে।

ছবিঘরে সাতরঙা আলোর তলায় দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাসি ছড়িয়েছে। ফটোগ্রাফার মুভি ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে সে সব আনন্দঘন মুহূর্তগুলো। তিন্‌নি তার আঁকা কার্ডগুলো বন্ধুদের উপহার দিয়েছে ঐ ছবিঘরের চা-চক্রে।

সর্বত্র খুশির জোয়ার। তিনদিন অতিথিরা চষে বেড়িয়েছে মানালী। কখনো পাহাড়চূড়ায়, কখনো ভ্যালির তলায়। আবার কখনো বা ঘন সবুজ পাইন বনের নীচে আলোছায়ার ফুলতোলা ঘাসের জাজিমে।

প্রথমে ছবির উদ্বোধন হল। তিন্‌নি প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তুর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয দিয়ে দিল দর্শকের সামনে।

ছবি দেখাব শেষে শুরু হল দর্শকেব উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

জেলাশাসক ছবির একজন রসিক সমঝদার। তিনি বললেন, এত অল্প বয়সে হাতের এমন বলিষ্ঠ টান অভাবনীয়। স্কেচেব গুণে প্রতিটি ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছবির ভাবগুলো ক্যানভাসের বিশেষ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায়। তাতে ভাবটি বিস্তীর্ণ পটভূমিতে বিস্তাব লাভ করেছে। কিন্তু মূল ভাবটি কি এবং ছবির কোন অংশে তা পরিস্ফুট, আঁকার গুণে দর্শকের বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। শিল্পীর জন্য রইল আমার অজস্র অভিনন্দন।

দর্শকের ভেতর থেকে উঠল করতালি ধ্বনি। জুলিয়েন বেনন আজকের বিশিষ্ট অতিথিব হাত দিয়ে ঝকঝকে রুপোব কাজ করা ফ্লাওয়াব ভাসে শিল্পীকে একগুচ্ছ গোলাপ উপহার দিলেন।

মঞ্চের স্ক্রীন উঠলে দেখা গেল ভাগতুরাম পুরোপুরি গদ্দী পহালদের পোশাক পরে মঞ্চেব মাঝখানে বসে আছে। মাথায় পহালদেব টুপি। তার দুটো হাতে ধরা আছে বাঁশুরি। ঠোঁট দুটি ফুঁ দেবার জন্য প্রস্তুত।

উইংসের ভেতর থেকে প্রথমে ভেসে এল দুছত্র কথা ঃ মাসের পর মাস ঘর সংসার ছেড়ে গদ্দী পহালরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে যায় নতুন নতুন চারণভূমির সন্ধানে। ঘরের ভেতর বিরহিনী বধূরা চোখের জল ফেলে বলে, হে আমার প্রিয়, তোমাব আমার মাঝে আজ দুস্তর ব্যবধান। মনে হচ্ছে আমার বুকের মাঝে কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে তীক্ষ্ণধার এক তলোয়ার।

কথা শেষ হলে নেপথ্যে শুরু হল নারীকণ্ঠের গান, তার সঙ্গে বাঁশুরির সুর লহরী। ভাগতুরাম বাঁশিতে সুর তুলেছে, নেপথ্যে গাইছে তিন্‌নি।

> 'আসা ওয়ারে ওয়ারে
> তোঁসা পারে পাবে
> তেরি চলন্দি চাল বিছানি,
> সজ্জন মিলন লাগে।
> গুটকে যাফিয়াঁ পাইয়াঁ,
> খিন্ডদে খিন্ডদে সজ্জন
> খিন্ডন লাগে,
> জিয়াঁ তলোয়ারি দে
> ফাট্‌ সেইয়োঁ।'

গান থামলে ভাগতুরাম নতুন করে সুরের ঢেউ তুলল। সমস্ত গানের সুরটা সেধে নিল বাঁশিতে। এবার শুরু হল কথা ঃ

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। বল, প্রিয়তমের কাছ থেকে যে নারী দূরে রয়েছে তার বুকের হাহাকার কতখানি।

আবার গান শুরু, কান্নাভরা গলার গান ঃ

নদীরে কট্‌লা মন্‌বো ততরু চাঁষে
জাঁনা রে রুযো সজনো
তীনে গি জাঁব্‌না বোলো কিসে।

গান শেষ হল, কিন্তু বাঁশি ধরে রইল তার সুরের রেশ।

এখন সামান্য কদিনের জন্য ঘরে ফিরে এসেছে পহ্লবা। হোক্ সামান্য কটি দিন তবু খুলে গেছে আনন্দের ফোয়ারা। বাঁশিতে তাই ঢেউ তুলেছে মন মাতানো সুর।

সহসা বাঁশিওয়ালাকে ঘিরে শুরু হল উত্তাল খুশির নাচ। দুটি ছেলের মাঝে একটি করে মেয়ে। মন্ডলি রচনা করে নাচছে। ধীরে ধীরে মাতন উঠল নাচে। বাঁশুরির সুর তুফানের মত আকাশ ছুঁয়ে বাজছে। আনন্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মঞ্চ। ঘন ঘন করতালির মধ্যে নেমে এল ড্রপসীন।

পর্দা উঠলে দেখা গেল ধবধবে সাদা পোশাক পরে জরির টুপি মাথায় দিয়ে ভায়োলিনে সুর তুলেছে ক্যারল। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন যুবক। প্রসিদ্ধ বেনন পরিবারের ছেলে। প্রিন্সের মহিমায় দাঁড়িয়ে বেহালায় সুর তুলছে।

সেই সুরের টানে নাচের ভঙ্গীতে মঞ্চে এসে ঢুকল একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষের পরনে টাইট নেভি ব্লু পোশাক। মাথায় সাদা টুপি। টুপির সামনে একটি লাল পালক গোঁজা। মেয়েটির পরনে দক্ষিণী পোশাক। সুন্দর খোঁপা করে চুল বাঁধা। অনেকটা মোহিনী আট্টমের সাজে সজ্জিত।

ওরা মূক অভিনয় করে চলল কিছুক্ষণ।

বোঝা গেল, পুরুষটি সৈনিক। সে ছুটি কাটাতে এসেছিল ঘরে। কদিন আনন্দে কাটল। এবার কাজের জগতে ফিরে যেতে হবে পুরুষটিকে। মেয়েটি তাকে যেতে দিতে চায় না। পুরুষটি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, সে সৈনিক। তার আছে দেশরক্ষার দায়িত্ব। বীরের মত লড়াই করতে হয় তাকে।

ভায়োলিনে গম্ভীর নাদে দ্রুত গৎ বাজতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝনা।

নাচছে অর্ক। সৈনিকের বিক্রম নিয়ে সে বিদ্যুৎগতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা মঞ্চ।

পাশ্চাত্য নৃত্যের গতিশীলতা অর্ককে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে তীব্র বেগে। একটা ঘূর্ণি যেন ঘুরে চলেছে প্রবল শক্তিতে। তার সঙ্গে সঙ্গে দমকে দমকে ঝড়ের ঢেউ উঠছে ভায়োলিনে।

হঠাৎ নাচের তান্ডব থেমে গেল। পুরুষ স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে নারীর দিকে।

নারীর শেষ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়েছে রত্নাবলী। সে এখন মোহিনী আট্টম নৃত্যের মোহিনী।

ভায়োলিনের মধুর সুরে নাচছে মোহিনী। ওষ্ঠে হাসি, দৃষ্টিতে সম্মোহিনী যাদু। সারা অঙ্গে আমন্ত্রণের তরঙ্গ তুলে রত্নাবলী নাচছে। দক্ষিণভারতের শিক্ষিতা নর্তকীর পায়ের নূপুর যেন কথা বলছে। মোহিনীর দৃষ্টিতে আকর্ষণ, দেহে আমন্ত্রণ আর চরণের ঝঙ্কৃত নূপুর যেন তালে তালে বলছে, যেও না, যেও না, যেও না, প্রিয় যেও না।

রত্নাবলীর অপূর্ব নাচে মুগ্ধ দর্শককুল। একটু আগে অর্কের পাশ্চাত্য ভঙ্গিমায় নৃত্য পরিবেশনের সময় বিস্মিত হয়েছিল দর্শকেরা, এখন একেবারে বিমুগ্ধ।

তবু চলে যেতে হয়। সংসারের সমস্ত আকর্ষণের পাশ ছিন্ন করে দেশমাতৃকার আহ্বানে চলে যেতে হয় সৈনিককে।

যাবার আগে প্রিয়তমার জন্য রেখে যায় শেষ চুম্বন।

কোনারকের সূর্যমন্দিরে মুদিত আঁখি প্রেমিকার দেহ বামহস্তে বেষ্টন করে পুরুষ যেমন দক্ষিণ করে

তার মুখমণ্ডল তুলে ধরেছে চুম্বনের আশায়, ঠিক তেমনি রত্নাবলীর মুখখানি তুলে ধরল অর্ক গভীর আবেগে।

এরই ভেতর ভায়োলিনে বেজে উঠল বিদায়ের সুর। মুগ্ধ প্রেয়সীকে ছেড়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল বেদনা-বিক্ষত পুরুষ।

যবনিকা নেমে এল দীর্ঘস্থায়ী করতালিধ্বনির ভেতর দিয়ে।

ছোট্ট অনুষ্ঠানের ভেতর প্রাণের যে ছোঁয়া আছে তা সমস্ত দর্শক-হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে আবার মঞ্চে উঠলেন জেলাশাসক। তিনি নৃত্য, বাদ্য আর গীতের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন।

এবার ঝিন্নিদেবী প্রদত্ত সাতখানি কুলুর শাল শিল্পীদের উপহার হিসাবে দেওয়া হল।

ধ্রুব আর কপিল রোটাং গিরিপথ পেরিয়ে কেলংয়ের দিকে যাত্রা করার পর ওরা মানালীর আশপাশের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো একটি একটি করে দেখে নিল। রোটাংয়ে গিয়ে দেখে এল কান্তিময়ী বিপাশার উৎসমুখ।

এসব অর্ক আর রত্নাবলীর কাছে প্রথম দেখার রোমাঞ্চ বয়ে আনলেও ক্যারল আর তিন্নির ভেতর সে রোমাঞ্চ জাগাতে পারল না। তবু স্থানগুলোর এমন মাহাত্ম্য যে বহু-দেখা হলেও তা পুরানো হয় না।

এবার চারমূর্তি এল শহরে। কুলুর বাংলোতে আগেভাগেই এসে হাজির ছিল ভাগ্‌তুরাম। ঝিন্নিদেবী তাকে ঐ চারজনের দেখভালের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানেন, ভাগতুর নয়নের মণি তিন্নি। তাই তাকে পাঠিয়ে ঝিন্নিদেবী নিশ্চিন্ত ছিলেন সবদিক থেকে।

ওরা ভোরে নাস্তা সেরে পায়ে হেঁটে ঘুরে এল রঘুনাথজীর মন্দির। কুলুর শত শত দেবতার ভেতর রঘুনাথজীই প্রধান দেবতা।

এর পরের দিনই ওরা খুব ভোরবেলা বেরিয়ে গেল বিজলী মহাদেও মন্দির দেখতে। গাড়িতে না গিয়ে পায়ে হেঁটেই গেল ওরা। কুন্তী আর ভাগ্‌তুরাম মিলে অনেক খাবার তৈরী করে ব্যাগে ভরে দিল ওদের। দশ কিঃ মিঃ রাস্তা পাড়ি দিতে হবে, আবার মন্দির দর্শন করে ফিরে আসতে হবে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার আগে।

তবু কারে যাবার থেকে পায়দলে যাবার মাদকতাই আলাদা।

আঁকা ছবির মত চারদিকের দৃশ্যাবলী। ওরা গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ী পথে সারি দিয়ে চলতে লাগল। চিত্রহার, রঙ্গোলী, কোন কিছুর গানই বাদ গেল না।

তিন্নি বলল, গানের সুরগুলো বেশ দোলা দেয় কিন্তু নাচের দিকে তাকানো যায় না একেবারে।

রত্নাবলী বলল, আমি ঐ সুরের সঙ্গে অনেকগুলো নাচ কম্পোজ করেছি। বন্ধুরা দেখে বলেছে, ওগুলো যেমন গতিশীল তেমনি রুচিশীলও।

তোমার কম্পোজ করা নাচগুলো দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গেলে আমাদেরও গতি বাড়াতে হবে কিন্তু সেজন্যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের রিচ হেরিটেজকে বিসর্জন দেব না। অকারণ আড়ষ্ঠতা যেমন আজকের দুনিয়ায় অচল তেমনি গতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকেও আমরা আঁকড়ে ধরব না।

ক্যারল বলল, তোমার কথাগুলোয় যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, এ ক্ষ্যাপামি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

রত্নাবলী বলল, আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি ক্যারলকে। যার শেকড় নেই মাটির গভীরে সে গাছ কখনো বেশীদিন বাঁচতে পারে না। ফোক্ অথবা ক্ল্যাসিকেল, কোন নাচেরই সামান্যতম ছোঁয়া নেই ওসব নাচের ভেতর। টিন এজারদের দমিত যৌন ক্ষুধাকেই ওরা উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মুক্তি দিচ্ছে। ওরা চারটি তরুণ-তরুণী ওদের জীবনের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল। সিডার আর পাইন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটল। কুন্তী আর ভাগ্‌তুরামের প্যাক করা খাবার পথের ধারে বসে মহা আনন্দে গল্প করতে করতে খেল।

প্রায় আড়াই হাজার মিটার উচ্চতায় বিজলী মহাদেও মন্দির। খাড়া পাহাড়ী চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠতে হয়। বুক চড় চড় করে। ক্যারল আর অর্ক বেশ মজা করতে করতে ওদের কোথাও বা ঠেলে আবার কোথাও বা টেনে তুলল।

ওপরে উঠে রত্নাবলী বলল, বাব্‌বা চড়াই বটে।

ক্যারল বলল, এখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে যদি একটা ভরতনাটাম্ মুখে বোল বলতে বলতে নেচে যেতে পার তাহলে ...।

রত্নাবলী তখনও হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অ-স-ম্ভ-ব।

তিন্‌নিও হাঁপাচ্ছিল। সে রত্নাবলীকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, বোকা, তাহলে ও কি দেবে বলছিল তা জেনে নাও।

ক্যারল বলল, ও যা চাইবে তাই দিয়ে দেব। অবশ্য যা আমার আয়ত্তের ভেতর আছে।

তিন্‌নি রত্নাবলীর কানে কানে কিছু বলে দিলে রত্নাবলী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, তাহলে প্রতিজ্ঞা পূরণ কর যুবক।

ক্যারল বলল, আগে নাচ।

অবশ্যই নাচব। তবে সবার সামনে আমার প্রার্থিত বস্তুটি দিতে স্বীকার করলে আমি নাচ শুরু করব।

ক্যারলেরও জিদ চেপে গেছে। সে জোরের সঙ্গে বলল, বল কি চাও?

দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে রত্নাবলী বলল, আমি তোমাকেই চাই মাই ডিয়ার।

ক্যারল প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। অর্ক আর তিন্‌নি জোরে হেসে উঠল। শেষে ওদের হাসির সঙ্গে মিশে গেল ক্যারলের হা হা হাসির আওয়াজ।

একটুখানি বিশ্রামের পর চাঙ্গা হয়ে উঠল ওরা। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিকের দৃশ্যাবলী।

অপূর্ব সুন্দর! পার্বতী আর কুলু উপত্যকাকে এখান থেকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যায়। মন্দিরের ওপর ষাট ফুট উঁচু একটি ধাতব দন্ড রয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে বার বছরের ভেতর অন্তত একবার ঐ দন্ডের মাধ্যমে মন্দিরের ভেতর বিদ্যুৎ-সংযোগ ঘটে। তখনই চূর্ণ হয়ে যায় শিবলিঙ্গ। পুরোহিত বহু যত্নে সংগ্রহ করেন সেই ভগ্ন প্রস্তরগুলি। তারপর বিশুদ্ধ মাখনে জোড়া দিতে দিতে আবার গড়ে তোলেন সেই পূর্বের শিবলিঙ্গটি।

এর পরের যাত্রায় ওরা গেল কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর কাতরাইন আর নাগ্‌গরে।

কাতরাইন উপত্যকাটি বেশ চওড়া। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি এখানে বহুবিস্তৃত।

গভর্ণমেন্ট ট্যুরিস্ট লজ ভাড়া করে রেখেছিল তিন্‌নি আর অর্ক। ওরা বিকেলে পৌঁছে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরল হাতে হাত বেঁধে। হিমালয়ের চোখ জুড়ানো শোভা দেখল। পরের দিন কটেজের চৌকিদারকে ছুটি দিয়ে জলখাবার থেকে লাঞ্চ, সবই তৈরী করল নিজেরা।

জলখাবারে তৈরী হল, গরম গরম পরোটা আর ভিন্ডি ভাজি। ক্যারল বসে বসে এই মেনু বাতলালো। তৈরী করল তিন্‌নি।

এক একখানা করে প্লেট সাজাল রত্নাবলী। পরোটা, আচার আর ভিন্ডি ভাজি।

অকুস্থলে অর্ক গরহাজির। ক্যারল বলল, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, আমার প্লেট দাও।

ওকে খাবার দিয়ে রত্নাবলী কটেজের আশপাশ দেখে এল, অর্ক বেপাত্তা। ফিরে আসতেই তিন্‌নি রত্নাবলীর হাতে ধরিয়ে দিল তার প্লেট।

ক্যারল আর রত্নাবলী গল্প করতে করতে খেতে লাগল। সেই ফাঁকে নিজের প্লেটের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে অর্কের প্লেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল তিন্‌নি।

অর্ক কিছুটা কবি স্বভাবের। তিন্‌নি লক্ষ্য করছে, ইদানিং অর্ক মাঝে মাঝে কেমন যেন অভিমানী হয়ে উঠছে। আজ সকালে তিন্‌নিকে দূরের আপেল বাগানে বেড়াতে যাবার জন্য ইশারায় ডাক দিয়েছিল অর্ক। আর ঠিক সেই সময় কটেজের ভেতর থেকে ভোরের নাস্তা তৈরীর জন্য হাঁক দিয়েছিল ক্যারল। ভারি অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে ও। যেমন বাবার মত বিশাল হৃদয় ওর, তেমনি মেজাজী,

গোঁয়ারগোবিন্দ।

তিন্‌নি ভাল করেই চেনে ক্যারলকে। তাই সেই মুহূর্তে তার ডাককে উপেক্ষা করে অনাসৃষ্টি বাধাতে চাইল না। সে হাত নেড়ে অর্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এখন অভিমানী অর্কের মান ভাঙানোর পালা তার।

আপেল বাগানের ভেতরে ঢুকে তিন্‌নি দেখল, বাগানের শেষসীমায় কয়েকটা পাইন গাছের জটলার তলায় ঝকঝকে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে অর্ক। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ঝোরা।

কাছাকাছি পৌঁছে পা টিপে টিপে গিয়ে তিন্‌নি হাঁটুগেড়ে বসল অর্কের ঠিক পেছনে। খাবারের প্লেটটি নিচে রেখে একটুকরো পরোটা আর ভাজি হাতের আঙুলে মুড়ে নিয়ে বাঁ হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে খাওয়াতে গেল।

চমকে উঠে ফিরে তাকাল অর্ক।

তিন্‌নি বলল, বাব্‌বা, সঙ্গে আসিনি বলে এত অভিমান। এই নাও খাও।

তিন্‌নির মুখেচোখে গভীর অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে।

অর্ক হাঁ করল। তিন্‌নি ওর মুখের ভেতর ভরে দিল খাবার। অর্ক চোখ বন্ধ করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

এক গ্রাস শেষ হলে চোখ খুলল সে। সামনে তার খাবার ভর্তি প্লেট। অমনি মাথা নেড়ে জানাল, তাকে খাইয়ে না দিলে সে খাবে না।

তিন্‌নি আবারও এক গ্রাস তার মুখে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার খিদে পায় না বুঝি ?

অর্ক খাবারটা কোন রকমে চিবিয়ে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, সে কি ? তুমি এখনও খাওনি!

রত্নাবলী তোমাকে কটেজের আশপাশে খুঁজে পায়নি। আমি ওদের দুজনকে খেতে বসিয়ে দিয়ে তোমার খাবারটা নিয়ে চলে এসেছি।

তুমি জানলে কি করে, আমি এখানে আছি?

আমি একজন পামিস্ট তাই।

অর্ক অমনি তিন্‌নির চোখের সামনে হাতেব পাতাটা তুলে ধরে বলল, বল তো আমার বিয়েটা গুরুজনদের যোগাযোগের, না ভালবাসার?

গম্ভীর মুখে অর্কের হাতের রেখাতে আঙুল চালিযে তিন্‌নি বলল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভালবাসার বিয়ে।

নড়ে চড়ে বসল অর্ক। এবার বল, স্বদেশিনী বা বিদেশিনী?

বিদেশিনী।

সে কি !

তুমি তো আইনত আমেরিকার বাসিন্দে। তাই বলছিলাম তোমার ভাগ্যে ভারতীয়, উগান্ডা অথবা চীনে বউ ঝুলছে।

অর্ক জোরের সঙ্গে বলল, আমি মনে প্রাণে ভারতীয় তিন্‌নি। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার বউ হবে খাঁটি ভারতীয়।

তিন্‌নি বরদানের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, তবে তাই হোক্। এখন দয়া করে খাবারটা শেষ কর।

খাব, একটি শর্তে।

এখানেও শর্ত ?

মুখ টিপে বসে রইল অর্ক।

তিন্‌নি বলল, রাজি, এবার বলে ফেল।

তুমি আমাকে একগ্রাস খাইয়ে দেবে, তার পরের গ্রাসটা আমি তোমাকে খাইয়ে দেব।

কিন্তু আমার খাবার পড়ে রইল ওখানে।

অর্ক বলল, ওখানে গিয়ে এমনি করে তোমার প্লেটটাও সাবাড় করব।

চোপ্, বড় লোভী আর সাহসী হয়ে উঠেছ।

দুপুরে লাঞ্চের পরে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল নাগ্গর। অতি অল্প সময়ের ভেতর পৌঁছে গেল রোয়েরিক আর্ট গ্যালারির সামনে।

ডান দিকে আর্ট গ্যালারির পর দশ-পা এগিয়ে গেলেই দুটি ফার গাছের মাঝখানে দু এক খন্ড পাথর পড়ে আছে। শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক ঐ পাথর কেটে কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন।

এই নাগ্গর উপত্যকার শোভা অসাধারণ। গভীর পাইন অরণ্যে ছাওয়া পর্বত। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়গুলির গায়ে মসলিনের মত হিমেল ওড়না উড়ছে। নিচে সবুজ হলুদ শস্যের ক্ষেত। উপত্যকার ওপর দিয়ে উপবীতের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। ওপরে গভীর নীল আকাশ। ফারগাছ দুটির ফাঁক দিয়ে দেখলে সামনে দেখা যায় পীরপাঞ্জালের শুভ্র মহিমা। ডানদিকে চির তুষারাবৃত ধৌলাধার।

হাতে হাত বেঁধে চারজনে মূক বিস্ময়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির মহিমা।

এই অপার বিস্ময়ে ভরা প্রকৃতির বুকেই রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে জানতেন তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে। এই পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীটি একাধারে কবি, দার্শনিক, পুরাতত্ত্ববিদ ও মানবপ্রেমিক।

তিন্নি বলল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অসুস্থ নিকোলাস সেখানেই তাঁর আর্মচেয়ারটি পেতে দিতে বলেছিলেন। ঐ চেয়ারেই অর্ধশায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর রূপের জগতকে দেখতে দেখতে চির শান্তির আশ্রয়ে চলে যান।

ক্যারল বলল, আন্টি মানে তিন্নির মা এই আর্ট গ্যালারিতে কাজ করে গেছেন অনেক দিন। আমি ছোটবেলা প্রায়ই আসতাম এখানে।

তিন্নি বলল, শুনেছি ছেলেবেলা ভীষণ দুষ্টু ছিল ক্যারল। গ্যালারিতে ঢুকেই ও ছবি টানাটানি করত আর বলত, আমি এটা নেব আন্টি। মা ওর দাপাদাপি টানাটানিতে হিমসিম খেয়ে যেত। শেষে জুলিয়েন আঙ্কেল পাশে এসে দাঁড়ালেই চুপ।

ক্যারল বলল, বাবা কিন্তু একদিনের জন্যেও আমার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু বাবার এমন একটা পার্সোনালিটি আছে যার সামনে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ চোখ তুলে কথা বলা যায় না।

তিন্নি বলল, বাইরের আবরণটা শক্ত হলে কি হবে, আঙ্কেল ভীষণ স্নেহপ্রবণ।

রত্নাবলী বলল, এই কদিনের ভেতরেই আমি তা টের পেয়েছি।

অর্ক বলল, আমাদের ফাংশানের পরে আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, আমি অবাক হয়েছি তোমার নাচের দ্রুতলয় আর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দেখে।

রত্নাবলী হাসতে হাসতে বলল, আমাকেও আঙ্কেল একটি মজার কথা বলেছিলেন। আমি তা গোপন করে রেখেছি।

তিন্নি বলল, শিগ্গির বলে ফেল।

ফাংশান শেষ হবার পর আমাকেও আঙ্কেল বলেছিলেন, তুমি আর অর্ক আজ যে নাচ কম্পোজ করে দেখালে তাতে ইস্ট ওয়েস্টের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। তোমরা দুজনে এরকম নাচ কম্পোজ করবে, সর্বত্র দেখাও আর বিশ্বজয় কর।

তিন্নি আর ক্যারল প্রায় একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।

ক্যারল বলল, আমরাও তাই চাই।

তিন্নি বলল, অবশ্যই, অবশ্যই। আমরা জানি, আঙ্কেল যে কথাই বলেন, তা মনের গভীর থেকেই বলেন। তোমাদের ভেতর সে সম্ভাবনা তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন।

বসন্ত-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চাঁদের আলোর জোয়ার উঠেছে। চা পানের পর এক মজার কান্ড করে বসল ক্যারল।

সে বলল, এসো আমরা জ্যোৎস্না রাতে নিজেদের মনের মত একটি করে নারী অথবা পুরুষ বেছে

নিয়ে ঘুরি। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরব, চারজন একসঙ্গে নয়।

হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ল চায়ের টেবিলে।

তিন্‌নি বলল, আমরা দুজন মেয়ে আর দুজন ছেলে আছি। এখন ঠিক করতে হবে ছেলেরা না মেয়েরা নির্বাচন করবে।

ক্যারল অর্কের সঙ্গে নিচুগলায় কিছু পরামর্শ করে নিয়ে বলল, তোমাদেরই নির্বাচনের সুযোগ দিলাম, তবে লটারির মাধ্যমে।

রত্নাবলী বলল, কি রকম?

দুটো কাগজে আমার আর অর্কের নাম লেখা থাকবে। একটা পাত্রে ফোল্ড করে রাখা হবে ও দুটো। তোমাদের ভেতর যে কেউ ওর থেকে একটা নাম তুলবে। বাকিটা অন্যজনের।

তিন্‌নি বলল, আমাদের ভেতর কে আগে তুলবে?

অর্ক বলল, সেটা খুবই সোজা, টস করে স্থির করব।

সমস্ত ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটের ভেতর চুকে গেল।

ক্যারল লটারি শুরুর আগেই একটা ঘোষণা করে দিয়েছিল, আমরা আজ সঙ্গী হিসেবে যাদের পাব তারা কেবল আজ রাতটুকুর মত আমাদের হৃদয়ের সব থেকে কাছের মানুষ হবে। কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলা শেষ হয়ে যাবে।

অর্ক তিন্‌নির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারা ফরেস্ট বাংলোর পেছনে একটা শিলাস্তূপের আড়ালে গিয়ে বসল। ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ঋতু বসন্তের রঙীন ফুলগুলি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁকি দিচ্ছিল। ওরা পাইন বনের ফাঁকে তুষার পর্বতের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। পাইনের পিচ্ছল পাতা থেকে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছিল ওদের গায়ে। গরম পোশাকে গা ঢাকা থাকলেও বরফ-ছোঁয়া হাওয়ায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল সারা শরীর।

অর্ক শীতের দেশের বাসিন্দে, তাই শীতবোধ কম। কিন্তু আজ সন্ধ্যার বাতাসে শীতের তীক্ষ্মতা ছিল।

তিন্‌নি গরম পোশাক পরলেও গায়ে চাপিয়ে এসেছিল একটি পশমিনা শাল। এটি তার মা একসময় ছবি আঁকার জন্য কাশ্মীরে গিয়ে বাবাকে জন্মদিনের উপহার দেবে বলে কিনে এনেছিল।

সেটি বাবার স্মৃতি হিসেবে দু'বছর ব্যবহার করছে তিন্‌নি।

নিজের গা থেকে শালটা খুলে নিয়ে তিন্‌নি অর্কের গায়ে চাপিয়ে দিল।

অর্ক চমকে উঠে বলল, সে কি? তুমি শীতে কাঁপবে আর আমি গায়ে শাল চড়াব।

আমার গায়ের পোশাক একটা সাদা দামী পাট্টু (কম্বল)। ব্রোচ দিয়ে টাইট করে আঁটা। এ পোশাকে শীত আটকায়। ডিসেম্বর জানোয়ারীতেও কুলু ভ্যালিতে মেয়েরা এই পোশাকই পরে থাকে। মানালীতে শীত একটু বেশী, তাই একটা কুলু-শাল জড়িয়ে নেয় গায়। আমি দরকার হলে বাবার পশমিনাটা গায়ে চাপাই।

অর্ক বলল, তুমি পশমিনাটা গায়ে দিয়ে বস আর আমি তোমাকে ছুঁয়ে থাকি, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

ঝর্ণার মত শব্দ করে হেসে উঠল তিন্‌নি।

হাসি থামলে বলল, পশমিনাটা কেনার সময় মাকে দোকানদার বলেছিল, আপনি এর ভেতর আস্ত একটা আন্ডা রেখে দেবেন, দশ মিনিটে সেদ্ধ হয়ে যাবে।

অর্ক বলল, দারুণ কথা তো। তোমার মা কোনদিন পরীক্ষা করে দেখেছেন?

পাছে পশমিনার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় তাই মা পরীক্ষার ভেতর যেতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করে নিলে একটা লাভ আছে। শীতকালে গায়ে জড়ালে প্রচণ্ড গরমবোধ হবে।

অর্ক বলল, এটা একটা সুন্দর অনুভূতি, যার জন্ম বিশ্বাস থেকে।

বাবা কিন্তু এ নিয়ে মাকে খুব ক্ষ্যাপাতো।

কি রকম?

পাঁচ মিনিটের ভেতর ডিমের একটা হাফ্ বয়েল করে দাও তো খেয়ে বেরিয়ে যাই।

মা বলতো, অত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব হবে। স্টোভ ধরিয়ে কেট্‌লিতে ডিম ফেলে জল গরম করতে হবে তো। পনেরোটা মিনিট অন্তত সময় চাই হাতে।

বাবা বলতো, আরে সে পশমিনাটা কোথায় গেল, পাঁচ মিনিটেই ওর ভেতর থেকে হাফ্ বয়েল ডিম বেরিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে অর্কের হাসি আর থামে না।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমরা কেউ একজন যখন এ শাল গায়ে দিতে পারব না, তখন এসো আমরা এটিকে ভাগাভাগি করেনি।

একই শাল গায়ে জড়িয়ে বসল দুজনে। একান্ত সান্নিধ্যে অথবা শালের গুণে ধীরে ধীরে তাপ ছড়িয়ে পড়ল দুজনের ভেতর।

হাতে হাত বেঁধে বসে রইল ওরা। কতক্ষণ কারু মুখে কোন কথা নেই।

প্রথম কথা বলল অর্ক, আমরা যদি এমনি করে অনন্ত সময় হাতে হাত বেঁধে বসে থাকতে পারতাম।

তিন্‌নি একথার উত্তর না দিয়ে বলল, জানো অর্ক, এই মুহূর্তে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি একটি কথা ভেবে।

কি সে কথা তিন্‌নি?

বিয়ের আগে আমার মা আর বাবা এই ফরেস্ট বাংলোতে একরাত্রি কাটিয়ে গেছে। এই বনে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদেরই মত হাত ধরাধরি করে। একটু আগে বন-জ্যোৎস্নায় আমি যেন তাদেরই হাঁটতে দেখছিলাম। তাদের সেদিনকার রোমাঞ্চিত মনের সুরভি বনকুসুম আর বনজ্যোৎস্নায় মিশে আছে। আমি সেই গন্ধ জ্যোৎস্নার জলে স্নান করতে করতে প্রাণভরে টানছি অর্ক।

এ রাত, এই আবেগভরা মুহূর্ত কি চিরদিনের হতে পারে না তিন্‌নি?

এ জিজ্ঞাসা তোমার আমার মনের ভেতর যতদিন থাকবে ততদিনই আমরা বেঁচে থাকব দুজনের ভেতর। এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে আর এমন আকুলতা থাকবে না অর্ক। যে রাত আজ আমাদের এমন করে পাশাপাশি টেনে আনল তাকে হৃদয় ভরে উপভোগ করি এসো দুজনে।

একটি চুম্বনের স্বাদ থেকে এ রাতে কি আমি বঞ্চিত থাকব তিন্‌নি?

আমার সারা মন তোমার কথারই প্রতিধ্বনি তুলছে অর্ক। কিন্তু...।

আবার দ্বিধা কেন তিন্‌নি?

সেই পুরানো উপমা দিয়েই বলি, আগুনে একবার আহুতি দিলেই তার জিভ লক্‌লক্ করে উঠবে। সে তখন হয়ে উঠবে সর্বগ্রাসী। তুমি স্থির হও অর্ক। এর আগেও আমি তোমাকে সুস্থির হতে বলেছি। এ রাতটা নিবিড় উত্তাপে দুজনে উপভোগ করি এসো।

ক্যারল চলে গেছে অনেকটা নীচে। একটা মসৃণ, প্রশস্ত জায়গার একপ্রান্তে বসেছে ওরা। ঝর্ণাটা একটু দূর দিয়ে বইছে। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে ঝর্ণাটা। ঝিলমিল করছে জল। মনে হচ্ছে রূপার নূপুর পরে কোন জলকন্যা নাচতে নাচতে চলেছে।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্যারল হঠাৎ রত্নাবলীর দিকে ফিরে বলল, আজ রাতে ঐ ঝর্ণার মত তুমি নাচ আর আমি বসে বসে তোমার নাচ দেখি।

রত্নাবলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা যে শিলাখন্ডের ওপর রয়েছি, এক সময় এর ওপর দিয়ে বইত ঐ ঝর্ণা, তাই এই শিলাটি এত মসৃণ।

ক্যারল বলল, তাহলে ঠিক জায়গাই নির্বাচন করেছি আমরা। তোমার ভেতর শুরু হোক ঐ নৃত্যপটিয়সী ঝর্ণারই লীলা।

ব্যাগ থেকে নূপুর বের করল রত্নাবলী।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল বলল, তোমার পায়ের নূপুরটা আজ আমাকে বেঁধে দিতে দাও।

রত্নাবলী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ক্যারলের দিকে। অনুত্তেজিত গলায় বলল, তুমি কেন আমাকে

চঞ্চল করে তুলতে চাও ক্যারল। তোমার বাগদত্তা আমারও প্রিয়।

রত্নাবলী, আমরা কি আজ স্থির করিনি এ রাত তোমার আমার? আমি অন্য কিছু তো চাইনি, আর চাইবওনা তোমার কাছে, শুধু নূপুরখানা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি জানো, আমি তোমার নাচের এক অন্ধ ভক্ত, তাই সংকোচ না করে বলতে পেরেছিলাম।

নর্তকী রত্নাবলী এবার অপূর্ব এক মুদ্রায় বাম পদের ওপর বসে দক্ষিণ চরণ সামনে প্রসারিত করল। অঞ্জলিতে নূপুর নিয়ে সে হাত দুটি তুলে ধরল ক্যারলের দিকে।

তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত ক্যারলের মুখ। সে দুহাতে ধরে নিল রত্নাবলীর নূপুর।

প্রথমে প্রসারিত ডান পায়ে, পরে একই ভঙ্গিতে প্রসারিত বাম পায়ে নূপুর দুটি বেঁধে দিল ক্যারল।

এবার নত হয়ে রত্নাবলী নাচের ভঙ্গীতে নমস্কার নিবেদন করল বন্ধুকে।

দীর্ঘ সময় ধরে চরণে তাল দিয়ে মুখে বোল তুলে নাচতে লাগল রত্নাবলী। তার নূপুরের ঝংকারে মনে হল ঝিনিঝিনি শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্ণা। কখনো সাগর তরঙ্গের মত সারা দেহে ঢেউ তুলে নাচছে, আবার কখনো বা নিবেদনের ভঙ্গীতে আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়।

আপন মনে তরঙ্গে দোল খাচ্ছে এক সুসজ্জিত তরণী। বায়ু বেগে সঞ্চরণ করছে ইতস্তত। আবার কখনো প্রেমমত্ত কেকার মত থরথর কম্পনে বিস্তার করছে সম্পূর্ণ কলাপ।

নৃত্যের এত বিভঙ্গ, এত মহিমা যেন অমৃত ধারার মত গড়িয়ে পড়ছে মোহিনীর স্বর্ণকুম্ভ থেকে।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নর্তকীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারল। মনে মনে ভাবছে, এই নৃত্যপটিয়সীর একমাত্র সঙ্গী হতে পারে প্রতিভাধর নৃত্যশিল্পী অর্কদীপ।

নাচ থামল। অদূরে ঝর্ণা যেন কলকল শব্দে করতালি দিল। বায়ুর স্বননে পাইনের বনে উঠল আনন্দের উচ্ছ্বাস।

ক্যারল রত্নাবলীর হাত ধরে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যত অনুষ্ঠান তোমার দেখেছি, আজকের অনুষ্ঠান সে সবকে ছাপিয়ে গেছে রত্নাবলী।

ক্যারলের দুটি হাত ধরে রত্নাবলী বলল, প্রকৃতির এই অসাধারণ মঞ্চ আর বন্ধুর পলকহীন দুটি চোখের দৃষ্টি আমার নাচকে সারাক্ষণ প্রেরণা দিয়ে গেছে ক্যারল।

ড্যাডি তোমাদের পারফরমেন্স দেখে ঠিকই বলেছে, ইস্ট ওয়েস্টের মেলবন্ধ হয়েছে তোমাদের নাচে। তোমরা দুজনে নাচের ভেতর দিয়ে বিশ্ব ঘুরে মিলনের সেতু রচনা করতে পার।

রত্নাবলী অসংকোচে বলল, আঙ্কেলের আশীর্বাদকে আমি মাথায় ধরে রেখেছি, কিন্তু ক্যারল, অর্ক কি এ পরিকল্পনার সামিল হবে?

সে তোমার অত্যন্ত গুণগ্রাহী রত্নাবলী। আমি তার বন্ধু তিন্নির মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। আর তাছাড়া...।

থামল ক্যারল।

রত্নাবলী সাগ্রহে জানতে চাইল, তা ছাড়া কি ক্যারল?

ও এখানে এসেছে মনোমত একটি সঙ্গিনী বেছে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি কেবলমাত্র সুন্দরীই নও, ডাক্তার হতে চলেছ আর এই বয়সেই একজন গুণী শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছ। তোমার বাবা সংস্কারমুক্ত মানুষ। তুমি তার একটিমাত্র মেয়ে। তোমার ইচ্ছাকে কখনই তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।

রত্নাবলী বলল, তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি ক্যারল। তুমি শুধু আমার বন্ধু নও প্রিয়ও। আমার পক্ষে যা কিছু শুভ তাই তুমি করবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

ক্যারল বলল, জজসাহেবেরে বাড়ীতে যেদিন আমরা লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেদিন অর্কের নানি তোমাকে কিভাবে আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন দেখেছ?

আমি সেদিন নানির আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ক্যারল।

অর্কের সঙ্গিনী হিসেবে তোমাকে বেছে নেবার প্রবল ইচ্ছাই ছিল সেদিনের ব্যবহারে।

তা হতে পারে, আমি ওদিক দিয়ে কিছু ভাবিনি তখন।

এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ড্যাডি আর তিন্নির মমের ওপরেই ছেড়ে দাও।

হঠাৎ পেছন থেকে হাসির শব্দের সঙ্গে তিন্‌নির গলা ভেসে এল, বেশ জমিয়ে গল্প হচ্ছে দেখছি।
ক্যারল বলল, কেউ কাউকে আজ রাতে ডিসটার্ব করব না এমন একটা অলিখিত শর্ত ছিল।
তিন্‌নি বলল, আরও একটা শর্ত ছিল, বারটায় ডিনারে বসব, সে সময় এক ঘন্টার জন্য খাবার টেবিলে চারজনের মিলন হবে। এখন ঘড়ির দিকে তাকাও, জাস্ট বারোটা।
ক্যারল বলল, স্যরি তিন্‌নি।
শোবার সময় দুটি বেড ওরা জোড়া লাগিয়ে দিল। দুদিকে ক্যারল আর অর্ক, মাঝে দুই বান্ধবী, চারটি কম্বলে গা ঢাকা দিয়েছে চার জন।
রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপও বাড়তে লাগল। নিশ্ছিদ্র ঘুমের জগতে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল ওরা।
তিন্‌নি আপার বিয়াস ভ্যালির বাসিন্দা হলেও শীতকাতুরে। দামী দুটো কম্বল গায়ে না চাপালে তার রাত কাটে না। ফরেস্ট বাংলোতে সে ব্যবস্থা নেই। একটি করে কম্বল অতিথিদের জন্য বরাদ্দ। শীত ঋতুতে এখানে টুরিস্টের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই অতিরিক্ত কম্বল রাখার দরকার বোধ করেন না কেয়ারটেকার।
ক্যারল কিংবা অর্কের শীতবোধ তুলনায় অনেক কম। রত্নাবলী কেরলের মেয়ে। নাতিশীতোষ্ণ জায়গায় তার বাস। নাগ্গরের শীতে তার কাবু হয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু এমনিতে তার সহ্যশক্তি প্রবল। তাছাড়া সারা দেহ গরম পোশাকের বর্মে এঁটে সে শুয়েছে। এটি আবার তিননির পক্ষে অসহ্য। সে তার শরীরকে হাল্‌কা না রেখে শুতেই পারে না।
মাঝরাতে শীতের দাপটে ঘুমের ঘোরে সে অর্কের কম্বলের কিছুটা টেনে নিল নিজের গায়ে। অর্কও কিছুটা শীত বোধ করায় ঘুমের ঘোরে কম্বলের টানে জড়িয়ে ধরল তিন্‌নিকে।
এখন নিবিড় একটা উত্তাপে ভরে উঠছে তিন্‌নির সারা শরীর। সে বড় আরামে অর্কের বাহুর ভিতর নিজেকে সঁপে দিয়ে অঘোরে ঘুমুতে লাগল।
কখন ভোর হয়ে গেছে। সকালের আলো পীরপাঞ্জালের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে, পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাইন বনকে সোনার ঝরণার জলে স্নান করিয়ে, ফরেস্ট বাংলোর সবুজ ঘাসের লনে এসে সোনালী ওড়নার মত লুটিয়ে পড়েছে। তারই ওপর সাদা বেতের একটা চেয়ারে একা বসে আছে ক্যারল। অপূর্ব ভরাট মুখখানাতে ঘনিয়ে উঠেছে ব্যথার একটা ছায়া।
যে সোনালী মৌমাছি তাকে প্রতিদিন গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছে, সে হঠাৎ কখন অগোচরে তার বুকের ভেতর বিঁধে দিয়ে গেছে বিষে ভরা সূক্ষ্ম একটি হুল। সে ঐ ছোট্ট হুলটিকে কোন ভাবেই বুকের বাইরে বের করে আনতে পারছে না। এমন শক্তিমান দিলদার এক যুবক শিশুর মত অসহায় আর কাতর হয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়।
প্রথম ঘুম ভেঙেছিল ক্যারলের। সে ছোটবেলা থেকেই আর্লি রাইজার। যদিও অনেক রাত করে শুয়েছিল তারা, তবু কারু ঘুম না ভাঙলেও ক্যারল বহুদিনের অভ্যাস বশে জেগে উঠেছিল।
কাচের জানালার ভারি একটা পর্দা সরিয়ে দিতেই ভোরের নীলাভ সাদা আলো ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার এতদিনের প্রিয় মৌমাছিটির তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করেছিল সে। এরপর ঐ যন্ত্রণা নিয়েই সে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।
ক্যারলের ঠিক পরেই জেগেছিল অর্ক। সে অতি সন্তর্পণে মুক্ত করে নিয়েছিল তার বাঁধন। দুটি কম্বল ভাল করে জড়িয়ে দিয়েছিল তিন্‌নির গায়ে। তারপর পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল পাইন বনে প্রাতর্ভ্রমণে। স্বপ্নের মত একটা স্মৃতির গন্ধ তার সমস্ত মনটাকে আবেশে ভরে রেখেছিল।
রত্নাবলী জেগে উঠেই দেখল দুটি বন্ধু ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে সমস্ত আলস্য নিয়ে জড়িয়ে ধরল তিন্‌নিকে।
জাগো সখি জাগো, ভোরের সূর্য তোমাকে উত্তপ্ত চুম্বন দিতে চাইছে। অপূর্ব সুন্দর এক ভঙ্গীতে আলস্য ভাঙল তিন্‌নি। নির্মল মুখখানা আধফোটা বসন্ত-মঞ্জরীর মত হাসি ছড়াল।
সহসা লন থেকে শোনা গেল ক্যারলের গলা, তৈরী হয়ে নাও, গাড়ি এখুনি মণিকরণে যাবে।

ভীষণ জেদি আর খেয়ালী ও। সুতরাং ওরা তড়িঘড়ি গোছগাছ শেষ করে চায়ের টেবিলে হাজির হল। ওখান থেকে ওরা ডাকতে লাগল ক্যারলকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

অর্ক ক্যারলকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, তিন্‌নি তাকে বসতে বলে নিজেই ক্যারলের চা বিস্কুট নিয়ে লনে চলে গেল।

লনে ক্যারল নেই। তখন ও চলল, আরও নীচে গাড়ির কাছে।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল ক্যারল।

সামনে গিয়ে তিন্‌নি বলল, কি হল তোমার, চায়ের টেবিলে এলে না? এই নাও তোমার চা।

ক্যারল বলল, কে তোমাকে এখানে আমার জন্যে চা বয়ে আনতে বলেছে? আমার চায়ের প্রয়োজন নেই। সবাই তাড়াতাড়ি নেমে এলে আমার সুবিধে হয়।

তিন্‌নি ক্যারলের মুখ থেকে এমন কঠিন শব্দ আশা করেনি। সে চোখ ভরা জল নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মণিকরণে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে ওরা চলে গেল জারি নামের একটি পাহাড়ী গ্রামে। অনন্য সৌন্দর্যে ভরা পার্বতী উপত্যকায় মণিকরণ আর জারি। এখানে প্রধান নদী পার্বতী। বইছে উপত্যকার ওপব দিয়ে, আবার কখনো গভীর গিরিখাতের অগম্য অন্ধকার পথে।

এ অঞ্চল দেবী পার্বতীর নামে নামাঙ্কিত। এখানে পাহাড়ী মানুষরা মনে করে স্বয়ং মহাদেব মণিকরণে দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিহার করেন।

কাহিনী আছে, একসময় বিহার কালে দেবীর মণিকুন্ডলটি পড়ে যায়। দেবী সেটি খুঁজে না পেয়ে বড় কাতর হন। আসলে সেই মহামূল্য কুন্ডলটি পাতালে হরণ করে নিয়ে যায় শেষনাগ।

দেবীর কাতরতা দেখে মহাদেব তপস্যায় বসেন। তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে শেষনাগ নতমস্তকে দেবীর মণিকুন্ডলটি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সেই থেকে স্থানটির নাম হয়েছে মণিকরণ।

এই মণিকরণ নামটির মাহাত্ম্য জানার পর রত্নাবলী তিন্‌নির কানে কানে একটি কথা বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রেমরত্নটি কোথাও হারিয়েছ, তাই উগ্রতপস্যায় তোমার মহাদেবটি মৌন হয়ে আছেন। তোমার প্রেমরত্নটি স্বস্থানে ফিরে এলেই তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ হবে।

এই সামান্য একটুখানি কথায় যেন একটা আলোর ঝলক দেখতে পেল তিন্‌নি। একদিনের খেলার ছলে সে কি অর্কের হৃদয়কে অনুরাগের স্পর্শমণি দিয়ে ছুঁয়ে দেয়নি? অথবা তার অজ্ঞাতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও কি তার ভালবাসার কোয়েল অন্য কারু হৃদয়-নন্দন বনে ডাক দিয়ে আসেনি?

দুজনে যখন পাইন বনের ভেতর জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করতে করতে কখনো কথায়, কখনো গানে মত্ত হয়েছিল তখন কি তাদের সেই মন হারানোর ছবি ধরা পড়েছিল কারু চোখের আয়নায়? অথবা গভীর শীতের রাতে দুটি তরুণতরুণীর নিকট সান্নিধ্যে শুয়ে থাকার দৃশ্য কি কারু হৃদয়ে যন্ত্রণার ঢেউ তুলেছিল?

না, এসব নিয়ে আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। একদিনের প্রেম প্রেম খেলা যদি তারা করে থাকে তাহলে সে খেলার পরিকল্পনা যে করেছিল, তার কোনভাবেই ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে না।

ছোট্ট গ্রাম জারির দৃষ্টিনন্দন শোভা দেখে দুদিন পরে সবাই ফিরে এলো কুলুর আউট হাউসে।

একটি রাত কাটতে না কাটতেই খেয়ালী ক্যারল বলল, ভাগতুদাদা, দশ বারো বছর বয়সে আমি ড্যাডির সঙ্গে প্রথম যখন এ বাড়িতে আসি তখন ডাক্তার আঙ্কেল আর আন্টির সঙ্গে আমরা একদিন নদীর ধারে সুন্দর একটি টেন্ট টাঙিয়ে পিকনিক করেছিলাম। তুমিও সঙ্গে ছিলে। সন্ধ্যায় আমাদেব সঙ্গে তাঁবুটাও এ বাড়িতে ফিরে এসেছিল। সেটা কি এখনও আছে?

নিশ্চয়ই। আমি এখানে এলেই ওটিকে রোদ্দুরে দিয়ে খুব যত্নে প্যাক করে তুলে রাখি।

আমরা যদি রাইসনে গিয়ে দুদিন বিপাশার কুলে তাঁবু ফেলে থাকি তাহলে তুমি কি তাঁবুটা দেবে?

ভাগতুরাম বলে উঠল, সে কিরে, ওটা তো মানুষের থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। মানুষ না থাকলে পোকায় থাকবে। তোরা নিয়ে গেলে তাঁবুটা তবু দুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

দারুণ খুশিতে হেসে উঠল অর্ক আর রত্নাবলী।

বাজার থেকে দুদিনের ফুল র‍্যাশন নেওয়া হল। তাঁবু বাঁধা হল গাড়ির ছাদে।

একটুও কথা না বলে তিন্‌নি পেছনের ক্যারিয়ারে ভাগ্‌তুদাদার তদারকিতে গুছিয়ে তুলল র‍্যাশন।

একেবারে একান্তে পেয়ে ভাগ্‌তুরাম জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে তিন্‌নি কাল থেকে তোকে এমন মনমরা দেখছি কেন? কি হয়েছে তোর? সোনাদিদি আমাকে খুলে বল।

তিন্‌নি শুধু তার একরাশ কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে তেমনি মুখ নীচু করে র‍্যাশন গোছাতে লাগল।

বলবি না আমাকে? জানিস, কাল সারাটা রাত তোর দুঃখী, দুঃখী মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। আমি এক দন্ডের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারিনি।

তিন্‌নি উঠে দাঁড়িয়ে ভাগ্‌তুদাদার বুকে মুখ লুকিয়ে একরাশ চোখের জল ঝরিয়ে দিলে।

কে তোকে আঘাত দিয়েছে?

বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে তিন্‌নি বলল, তুই তাকে কিছু বলবি না বল?

কথা দিচ্ছি।

ক্যারল আমার সঙ্গে তিনদিন কোন কথা বলছে না। আলোচনা কবতে হলে রত্নাবলীকে ডেকে ডেকে করছে।

ভাগ্‌তুরাম ব্যাপারটাকে অতি লঘু করে দিয়ে বলল, দূর পাগ্‌লি, আমি ভাবলাম আর কিছু। ক্যারলকে ছেড়ে অন্য কাউকে মনটন দিয়ে বসে আছিস।

অমনি গুম্‌গুম্ করে কয়েক ঘা কিল পড়ল ভাগ্‌তুরামের বুকে।

আরে ওটাও তো একটা পাগ্‌লা। ঠিক ওর বাবার মত। একটুতেই আগুন ঝরাবে, পরক্ষণেই বরফ। সামান্য তাপ লাগলেই ভালবাসার নদী বইয়ে দেবে। তুই ওর ওপর অভিমান করে বসে আছিস!

এই তিনদিন পরে ভাগ্‌তুরামের কথায় ভারি একটা শান্তি পেল তিন্‌নি। ক্যারলের চরিত্র যে তার অজানা তা নয়, তবু বাবার বড় আদরের মেয়ে তাই সামান্য অবহেলাও বুকে বড় বেশী করে বাজে।

রাইসনের এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলি তখনও ধবধবে তুষাবে আবৃত। তউন্দি বা গরমকালে মধ্যাহ্নের পর সূর্যরশ্মি আর ধূলিকণায় এক ধরনের আবরণ তৈরী হয়। ওগুলি হাল্‌কা ওড়নার মত দুলতে থাকে। দূরের দৃশ্য এ সময় স্পষ্ট দেখা যায় না। তউন্দিতে সূর্যকিরণ বড়বেশী উত্তাপ ছড়ায়। দিনের কোন কোন সময়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় সারা ভ্যালির ওপর দিয়ে বইতে থাকে ভারি মিষ্টি একটা হাওয়া। জল কিন্তু সব সময়ই ঠান্ডা থাকে।

রাইসনে ঢুকে গাড়ি থামাল ক্যারল। সবাই নেমে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। ভারি শান্ত আর নির্জন এই উপত্যকা। এর উচ্চতা নাগ্‌গর থেকে বেশ কিছুটা কম। ক্যারল বলল, জায়গাটা খুবই নির্জন, তবু এখানে বাস, প্রাইভেট কারের যাতায়াত আছে। কম হলেও সরকারি হাটে লোকজন এসে ওঠে। আমরা যদি নদী পেরিয়ে ওপারে যাই আর ঐ যে পাহাড়ী বন দেখা যাচ্ছে, তার তলায় নদীর গা ঘেঁষে তাঁবু ফেলি তাহলে কেমন হয়?

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ, দারুণ আইডিয়া।

অর্ক বলল, কিন্তু নদী পারাপার কিভাবে হবে?

কিছু দূরে একটা কাঠের পুল আছে পাহাডী মানুষজনের পারাপারের জন্য। ওরা মাঝে মধ্যে ওপারের বন থেকে কাঠ কেটে আনে। পুলটা একটু নড়বড়ে তবে পারাপারের অসুবিধে হবে না।

গাড়ির কি হবে?

ক্যারল হেসে বলল, ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার না থাকলে ও আর যাবে কোথায়, এখানেই পড়ে থাকবে।

অতএব মেয়েরা সবাই র‍্যাশনের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। তাদের পেছনে তাঁবু বয়ে নিয়ে চলল অর্ক আর ক্যারল।

পুলটা সংকীর্ণ। কাঠগুলোও জীর্ণ, নড়বড়ে। অনেককাল মেরামতি হয়নি।

পুলের নীচে বড় বড় বোল্ডার পড়ে আছে। বিপাশার জল সেখানে ধাক্কা খেয়ে ফুঁসে উঠছে। পাক খেতে খেতে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওরা ঐ জীর্ণ পুলটার ওপরে দাঁড়িয়ে নীল জলস্রোতের খেলা দেখল। তারপর সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে পেরিয়ে গেল ওপারে।

তাঁবু পড়ল গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর। ঘাসের বেড়ের তিন চার হাত দূর দিয়ে নদী বইছে।

খাবার দাবার তৈরী করে মেয়েরা চলল স্নানে। আজ মধ্যাহ্ন হতে না হতেই রোদ্দুরের তেজ প্রবল।

পুলের তলায় ছোটবড় পাথর জমে আছে। সেগুলোর গা ছুঁয়ে, কখনো বা পাথর উপচে জল ছুটে চলেছে।

ওরা পুলের তলায় পোশাক রেখে স্নান সারল। বাইরের গরমে গা জ্বলছিল, এখন ঠান্ডা জলের ছোঁয়ায় দেহ জুড়িয়ে হিম।

ওরা স্নান সেরে পোশাক পরে কলরব করতে করতে চলে গেল। ভেজা পোশাক গাছের ডালে, ঘাসের জমিনে শুকুতে লাগল।

অর্ক আর ক্যারল গেল স্নান করতে। একটা শিলার ওপর দাঁড়িয়ে জলে একখানা পা ডোবাল অর্ক। সে বুঝে নিল প্রবল স্রোত আর ঠান্ডায় জলে নেমে স্নান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ শিলার ওপর বসে কোনরকমে স্নান সারল সে।

কিন্তু আশ্চর্য দুঃসাহসী ছেলে এই ক্যারল। সে ব্রীজের কিনারার কাঠে ঝুলতে ঝুলতে মাঝ নদী অব্দি চলে গেল। তারপর ঝাঁপিয়ে নামল একটা উঁচু শিলাস্তূপের ওপর। এবার সেটার একটা খাঁজের পাথর এক হাতে ধরে নদীতে শরীর ভাসিয়ে স্নান করল। স্নান শেষে আবার লাফিয়ে ধরল কাঠের সেতুর কিনারা। তেমনি দুহাতের জোরে ঝুলন্ত শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল কূলে।

ওর কীর্তি দেখে ঘন ঘন হাততালি দিতে লাগল অর্ক।

তালির শব্দ শুনে ওরা দুবান্ধবী ছুটে এল গাছতলা থেকে। ততক্ষণে চোস্ত পরে হলদে একটা গেঞ্জি গায়ে জড়িয়ে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মত নীলাকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হাসছে ক্যারল।

উৎসুক শ্রোতাদের কাছে ক্যারলের কীর্তি বর্ণনা করে শোনাল অর্ক। এরপর জোর হাততালি আর বাহবা ধ্বনিতে অভিনন্দিত হতে লাগল ক্যারল।

প্রখর সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে ওরা গিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। আজ তাপ কত সেলসিয়াসে উঠেছে কে জানে। বাতাসও যেন থমকে আছে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে অর্ক আর ক্যারল তাঁবুর ভেতর শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল। রত্নাবলী আর তিন্‌নি গেল গাছতলায় তপ্ত দুপুরের বিশ্রাম আর আলাপের জন্য।

সন্ধ্যায় ওরা বিপাশার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াল। গান গাইল, লোক-সংগীত। এ ব্যাপারে প্রধান শিল্পী তিন্‌নি। কুলু কাংড়ার অনেক লোক-সংগীত ওর জানা। দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে যে সব লোক-সংগীত শিল্পী অনুষ্ঠান করে তাদের গানের কথা আর সুর ওর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। প্রতি বছর দশেরা উৎসবে ওরা চলে আসে মানালী থেকে কুলুর বাড়িতে। দশেরার আনন্দ অনুষ্ঠানে ওদের যোগ দেওয়া চাই-ই-চাই। লোক নৃত্যের ঢংগুলিও দীর্ঘদিন দেখার ফলে ওর আয়ত্তে এসে গেছে। এইসব নিয়ে তিন্‌নির ভেতর জেগে উঠেছে এক জাত শিল্পীর প্রতিভা।

এই সন্ধ্যায় তিন্‌নি আর রত্নাবলী নাচে আর গানে বিপাশার কূল মুখর করে তুলল।

তাঁবুতে ফেরার পথে ওরা অনুভব করল, হাওয়া যেন একটুও বইছে না। সন্ধ্যার স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আর একটা দৃশ্য ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে শত শত পাখি উড়ে চলেছে।

ভ্যালির ওপরের আকাশ দিয়ে সন্ধ্যায় পাখি উড়ে যায়, এ দৃশ্য কোন নতুন নয়। কিন্তু এই ঝাঁক ঝাঁক পাখির দ্রুত পাখা টেনে চলার দৃশ্য আগে কখনো এদের চোখে পড়েনি।

অর্ক বলল, ফরেস্টে আগুন লাগলে পাখিরা এমনিভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা টেনে উড়ে পালায়।

রত্নাবলী বলল, তোমার কথা হয়ত ঠিক। খুব কাছে কোন পাহাড়ী বনে আগুন লাগতে পারে।

তিন্‌নি বলল, নীচের ভ্যালিতে অনেক আগে ফসল তোলা হয়ে গেছে, কিন্তু আপার ভ্যালিতে কোন কোন জায়গায় দেরীতে ফসল ওঠে। হয়ত বাবেলি, রাইসন, নাগ্‌গর, কাতরাইন ভ্যালিগুলোতে ফসল

উঠতে এ বছর দেরী হয়েছে। তাই ফসলের ক্ষেতগুলো থেকে শসাদানা খেয়ে ওদের এমনি করে উড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যারল শুধু একটি মন্তব্য করল, প্রকৃতির খেয়ালে কত কি যে ঘটে চলেছে, তার কতটুকুই বা আমরা বুঝি আর জানি।

শেষ পর্যন্ত ক্যারলের কথাই সত্যে পরিণত হল। রাত্রি প্রায় দুটোয় ওরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন অন্ধবেগে ধেয়ে এল প্রচণ্ড একটা দানব।

হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া নৌকোর মত সমস্ত তাঁবুটা যেন খুঁটির বাঁধন ছিড়ে উড়ে যেতে চাইল।

রত্নাবলীর ঘুম আগে ভাঙল। সে পাশে শুয়ে থাকা অর্ককে ঝাঁকি দিয়ে বলল, শোন শোন, বাইরে কি যেন একটা দাপাদাপি করছে।

অর্ক উঠে পড়ে শোনার চেষ্টা করল। তাই তো।

সে ব্যাপারটা বোঝার জন্য বেরুবার চেষ্টা করতেই তার হাতখানা চেপে ধরল রত্নাবলী।

শুনতে পাচ্ছ না, ভয়ংকর গর্জন করছে।

ততক্ষণে ওরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঝাঁকি দিয়ে টেন্টটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

তিন্নি জেগে উঠেই আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাইরে কারা শব্দ করছে। অনেকগুলোতে মিলে একটানা গোঁগানির শব্দ।

ক্যারল জেগে উঠে এক মুহূর্ত কান পেতে বলল, ঝড় ! প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে।

ও সামান্য একটুখানি পর্দা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের ঝাপটায় তাঁবুর ভেতর ছিট্‌কে পড়ল। টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো হাওয়ার দাপটে আর্ত কোলাহল জুড়ে দিল।

ওরা দু'তিনজন মিলে চাপাচাপি করে বন্ধ করল পর্দার ফাঁকটুকু।

এবার মুষলধারে শিলাবৃষ্টি শুরু হল।

মনে হতে লাগল তাঁবুর পর্দা যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে।

প্রাণফাটা কান্না শুরু হয়েছে পাইন বনে। কয়েকটা ছোটখাটো ডাল ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে এসে পড়ছে তাঁবুর ওপর।

মেঘ ডেকে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে কি ভয়ংকর তার প্রতিধ্বনি। মেঘ ডাকছে তো প্রতিধ্বনি উঠছে। মনে হচ্ছে, এরিণার ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁপছে নিরস্ত্র কয়েকটি মানুষ। চারদিকে লোহার খাঁচায় বন্দী অভুক্ত কটা সিংহ। তারা সামনে খাবার দেখে সমানে গর্জন করে চলেছে। ছেড়ে দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে অসহায় মানুষগুলোকে।

অর্ক বলল, এখন কি করব আমরা?

ক্যারল বলল, আপাততঃ চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় কি ? এখন বেরিয়ে পুল পার হয়ে সরকারি বাংলোর দিকে যেতে গেলেই সমূহ বিপদ। ঘূর্ণি ঝড়ের মুখে পড়ে বিপাশার স্রোতে ভেসে যেতে হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভাঙার শব্দ হল। জলের ছিঁটে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

টর্চ ফেলল ক্যারল। বিপাশার ছোবল তাঁবুর ভেতর অব্দি এসে পড়েছে। না জানি তাঁবুর মধ্যে বসে থাকলে কি বিপর্যয় ঘটে যায়।

ঘন ঘন কয়েকটা বাজ পড়ল। বিদ্যুতের ঝলকানি তাঁবুর ভেতর বসেও কিছুটা দেখতে পেল ওরা। মনে হল, বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন হুড়মুড় করে পাহাড় ভেঙে পড়ল।

ক্যারল বলল তোমরা বসে থাক আমি বাইরের অবস্থাটা একবার দেখে আসছি।

তিন্নি কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এ দুর্যোগে তুমি বাইরে একেবারেই যাবে না।

পাগলামি কর না তিন্নি। একটু পরেই মনে হচ্ছে বিপাশা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারি বাংলোর দিকটা পাথর আর মাটি ফেলে উঁচু করা আছে। ওটাকে সহজে টপকে যেতে পারবে না বিপাশা। আমি টর্চ ফেলে দেখে আসছি, এ বিপদ থেকে বেরুনো যাবে কিনা।

তিন্নি জেদ ধরল, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

অর্ক বলল, তোমাকে যেতে হবে না, দরকার হলে আমিই যাব সঙ্গে।

তিন্নি বলল, তুমি কেন যাবে ভাই, রত্নাবলীর কাছে তাঁবুতে একজন ছেলের অন্তত থাকা দরকার।

ক্যারলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তিন্নি। এই মুহূর্তে প্রবল দুর্যোগের ভেতরেও ক্যারল নিজেকে ভারি হালকা আর মুক্ত মনে করল। যে পাষাণভারটা এ ক'দিন সে বয়ে বেড়াচ্ছিল সেটা সহসা নেমে গেল তার মনের ওপর থেকে। সে অনুভব করল, তার বুকে বিঁধে থাকা তীক্ষ্ম কাঁটাটা এখন আর তাকে একটুও যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সেটা আছে কি খসে পড়েছে তা সে একেবারেই বুঝতে পারল না।

আকাশ ভেঙে এখন ওদের মাথার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। টর্চের আলা জ্বালার একটুও দরকার হল না। ঘন ঘন তীব্র বিদ্যুতের চমকে চরাচর দৃশ্যমান।

বিপাশার জল স্ফীত হয়ে ফুঁসে উঠেছে। ব্রীজের কাছে গিয়ে দেখল, পাটাতন ছুঁতে জলের আর খুব বেশী বাকী নেই।

স্রোতের মত জল গড়াচ্ছে ওদের গা বেয়ে।

ব্রীজের কাছে এসে ক্যারল বলল, তুমি এখানে একটুখানি দাঁড়াও, আমি ব্রীজের ওপর উঠে অবস্থাটা দেখে আসি।

ব্রীজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ক্যারল ওপ্রান্তে টর্চ ফেলল।

সর্বনাশ! জীর্ণ কাঠের সেতুর ওদিককার খানিকটা অংশ জলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তীরের কাছাকাছি যে শিলাখন্ডটি মাথা উঁচু করে মৈনাকের মত দাঁড়িয়েছিল সেটি জলের তলায় মাথা ডুবিয়েছে।

এরপর বেশী দেরী হলে ব্রীজ পার হবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো। সঙ্গে কিছ্ছু আনতে হবে না। নিজেরা প্রাণে বাঁচতে পারলেই যথেষ্ট।

বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখতে দেখতে তিন্নি তাঁবুর কাছে গিয়ে পৌছল।

বাইরে বেরিয়ে এসো চটপট, কোন কিছু নিতে হবে না সঙ্গে।

ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে তিন্নির সঙ্গে ছুটতে লাগল ব্রীজের দিকে।

ততক্ষণে পুলের একটা প্রান্তের কাঠ ধরে কোমর জলে ডুবন্ত শিলার ওপর নেমে পড়েছে ক্যারল। নামার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, কোমর থেকে নিচের অংশটুকু হাঙরে কেটে নিল। চিমটি কাটলেও সাড়া পাওয়া যাবে না।

ওরা কাছে আসতেই ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ব্রীজের মুখটা জলে পড়ে গেছে, প্রবল স্রোত বইছে ওর ওপর দিয়ে, ওদিক থেকে পেরোবার চেষ্টা কর না। আমার কাঁধের ওপর পা রেখে লাফ দাও। তিন ফুটের বেশী হবে না। আগে অর্ক এসো। তিন্নি তোমাদের পায়ের কাছে টর্চ আছে, ডাঙায় আলো ফেল।

অর্ক ক্যারলের কাঁধে পা রেখে লাফ দিয়ে ডাঙায় চলে গেল।

রত্নাবলীও সজোরে লাফ দিল। অর্ক দুহাত বাড়িয়ে লুফে নিল তাকে।

ক্যারল বলল, তোমরা দুজনে ছুটে গিয়ে চৌকিদারকে জাগাও। আমি আজ সারাদিন ওখান থেকে কোন ট্যুরিস্টকে বেরোতে দেখিনি। অনুমান, কেউ আসেনি।

ওরা ছুটল বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে।

দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি বন্ধ করেছে ক্যারল। সে আর তিন্নিকে কারু বুকের ওপর আছড়ে পড়তে দেবে না।

আমাকে টর্চ দাও।

টর্চ হাতে নিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় রেখে তাকে ছুঁড়ে দিল ডাঙায়। টর্চটা তেমনি জ্বলতে লাগল।

এসো আমার কাঁধের ওপর।

তিন্নি কাঁধে উঠে দাঁড়াতেই ক্যারল বলল, কোন ভয় নেই, লাফ দাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল দুহাতের প্রবল শক্তিতে তিন্‌নিকে যেন ঢেলার মত ছুঁড়ে দিল তীরে।

এতক্ষণ বাঁহাতে ব্রীজের একটা কাঠ ধরে ব্যালান্স রাখছিল ক্যারল, এবার দুহাতে তিন্‌নিকে ছুঁড়ে দিতে গিয়ে সে তার পায়ের ভারসাম্য হারাল। সঙ্গে সঙ্গে বিপাশার প্রবল স্রোত তাকে ব্রীজের তলায় টেনে নিল। বুকফাটা চিৎকার করে উঠল তিন্‌নি। সে টর্চের আলো ফেলে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল ক্যারলকে। তার হাহাকার মেঘের গর্জনে, বৃষ্টির শব্দে মিশে গেল।

হঠাৎ তিন্‌নির টর্চের আলো এসে পড়ল ব্রীজের তলায়। ঐ তো ক্যারল!

সে স্লিপ্ করে স্রোতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছিল ডুবে যাওয়া ব্রীজের একটা অংশ। তাই ধরে বরফ শীতল জল থেকে সে অনেক লড়াই করতে করতে তিন্‌নির ছুঁড়ে দেওয়া দোপাট্টার একটা প্রান্ত ধরে ডাঙায় উঠে এল।

ক্যারল একেবারে নিঃশেষিত। তিন্‌নির কাঁধে ভর রেখে সে দেহটাকে কোনরকমে টানতে টানতে এনে ফেলল সরকারী বাংলোতে।

ফাঁকা বাংলোর দুখানা ঘর চৌকিদার তাদের দিয়ে দিল।

বাথরুমে নতুন তোয়ালে, গীজারে গরম জল। দুখানা রুমে দুটি করে বেড আর একটি করে রুম হিটার।

রত্নাবলী ঠান্ডায় বড় বেশী কাবু হয়ে পড়েছিল। তিন্‌নি বলল, অর্ক তুমি ওকে একটু দেখো, আমি ক্যারলকে দেখছি।

ভেজা পোশাক ছেড়ে গরম জলে গা ধুয়ে তোয়ালেতে সারা দেহ মুছে নিল ওরা। তারপর বিছানা থেকে এক একখানা ধোয়া চাদর টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গ জড়াল।

রুম হিটার জ্বেলে দিতেই উত্তাপে ভরে উঠল ঘর।

এখন ঘরের আলো নিভে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ মৃদু হয়ে গেছে।

রুম হিটারের লাল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক রহস্যময়ী তরুণী।

ক্লান্ত ক্যারল তার বিছানা থেকে ডাক দিল, তুমি আজও কি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে? মৃত্যুর মুখ থেকে তুমিই তো আমাকে কূলে টেনে তুললে।

পাগলের মত ছুটে গিয়ে ক্যারলের বুকে আছড়ে পড়ল তিন্‌নি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার অভিমানের অশ্রু ঝরাতে লাগল ক্যারলের প্রশস্ত বুকের ওপর।

ক্যারল তাকে জড়িয়ে ধরল অনুরাগে, আশ্লেষে।

ভোরবেলা দেখা গেল বন্ধ জানালার কোন্ রন্ধ্র পথে একটি প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে। সে খেলা করছে এক ঘুমন্ত তরুণীর কপোলে।

মনে হচ্ছে সে তরুণী একটি আপেল বৃক্ষ। প্রথম দুটি সোনালী আপেল ফলেছে তার অঙ্গে। সেই দুটি গোল্ডেন অ্যাপ্‌ল স্পর্শ করে আছে এক ঘুমন্ত যুবরাজের দশটি শুভ্র সতেজ অঙ্গুলি।

●

সকরুণ বেণু

আমরা অনেক অনেক পথ বোটে কবে ফিরছি। কত বাঁক, কত ছোট ছোট খাল এসে মিশেছে নদীতে। এখন ভাটার নদী। খাল থেকে হুহু করে জল নেমে আসছে। শেয়ালকাঁটার ঝোপে ফুল ফুটেছে। আমি বিশুদার কাছে গলুই-এর ওপব বসে আছি। বিশুদার হাতে হাল। আমি বিশুদাকে বিরক্ত করছি।

ওগুলো কি পাখি উড়ে গেল বিশুদা?

পানকৌড়ি।

বোকার মতো আবার বললাম, কোথায় উড়ে যাচ্ছে?

বিশুদা সত্যি কত জানে। অমনি বলল, কদমা পাড়ার ঝিলে।

আবার জানতে চাইলাম, আসছে কোথা থেকে?

বিশুদা একটু থেমে গেল। হাতে ধরা হালটায় দু'একটা মোচড় মেরে নৌকোটাকে বাঁক পের করে আনল। সিধে নদীতে নৌকো চলছে এখন। বিশুদা হালে শুধু হাত ছুঁইয়ে বসে আছ। এবার আমার কথার খেই ধরে বলল, অত আন্দাজ কি করা যায় দিদি। তবে মনে হয়, ওরা ন্যাড়ার বিল ছেড়ে আসছে। ঠা ঠা রোদ্দুরের দিনে বিলের জল সূয্যি ঠাকুর চোঁ চোঁ করে শুষে নেয়। তখন ওটুকু জলে কি আর পাখপাখালি থাকতে পারে। উড়ে যায় কদমা পাড়ার ঝিলে।

ওখানে বুঝি অনেক জল?

নন্দদের পুকুর ছিল ওটা। তিনপুরুষ আগে কদমা প্রজাবা কেটেছিল। অনেক গভীর করেছিল ঝিলটা। তাই সম্বচ্ছর জল থাকে।

শেয়ালকাঁটার ঝোপ, হোগলার বন, হাব্‌লি গাছের লাল সাদা ফুলের খবর বিশুদাই আমাকে দিয়েছে। নদী জুড়ে জাল পেতেছে মালোপাড়ার জেলেরা। হারের মত দড়িতে মাছ গেঁথে শুট্‌কি করছে রোদ্দুরে।

একটা চরের ওপর মালোপাড়া। বিশুদা ঠেকিয়ে দিলে নৌকো। মা, মাসুমণি আর মেসাই সাবধানে নেমে গেল। এই চরে আজ দুপুরে পিকনিক সেরে হাজিপুরে ট্রেন ধরে ফিরব।

মায়েরা চলল মালোপাড়ার দিকে মাছ কিনতে। ঋষি একটা গল্পের বই পড়ছিল। সে বইটার আকষর্ণ হঠাৎ কাটিয়ে উঠে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নৌকোর কাণায় দাঁড়িয়ে রলল, হুর্‌রে। তারপর হনুমানের মত লম্বা এক লাফ মেরে চরে নেমে পড়ল।

রাজর্ষি এই অব্দি পড়ে উলুর দেওয়া ডায়েরির বাঁধানো খাতাখানা বন্ধ করল। উলু তাকে আজই এই ডায়েরিখানা উপহার দিয়েছে। স্মৃতির সুধায় ভরা ডায়েরির পাতাগুলো। সুধা না হলাহল? সবই মিলেমিশে একাকার। মন্থনে শুধু অমৃতই ওঠে না, গরলও উঠে আসে।

গঙ্গার ওপারে দিনান্তের ছবি ফুটছে আকাশে। জল বইছে। দুটো নৌকো পাল তুলে চলেছে। ওরা কতদূরে যাবে? গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে? তারপর? দু'টি ভিন্ন দিকে হয়ত ভেসে চলে যাবে ঝড়ের হাওয়ায়, স্রোতের টানে।

এই গঙ্গার উৎস মুখেই তো একদিন সুদীপা মাসী আর উলুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল ঋষি। উলুই প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছিল।

ঋষি, ঋষি।

নির্জন গোমুখে তখন এমনি সূর্যাস্তের আয়োজন চলছিল। প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছিল চরাচর। বাবা মার সঙ্গে রাজর্ষি গোমুখ দেখে ফিরছিল। আর ঠিক সে সময় ওপর থেকে নামছিল উলু তার মায়ের সঙ্গে।

ঋষির নাম ধরে ডাকছিল উলু। পতাকার মত হাত নাড়ছিল সে।

ঋষি চিনতে পেরেই হাত নাড়তে লাগল।

বাবা বললেন, মেয়েটি কে ঋষি?

আমরা এক ক্লাশে পড়ি বাবা, তবে সেক্সান আলাদা। খুব নাম ওর নাচে গানে। পড়াশোনাতে ও ভাল।

সুদীপা মাসী উলুর সঙ্গে নেমে এসে ঋষিদের মুখোমুখি হলেন।

দু'টি পরিবারে সেদিনই আলাপ হলো। মা বাবাকে ওখানে বসিয়ে রেখে ঋষি ওদের নিয়ে গেল গুহামুখ দেখাতে। গুহামুখে সাদা বরফ জমে আছে। সেই বরফ গলা জল বেরিয়ে আসছে প্রবল বেগে।

উঃ দারুণ ঠাণ্ডা, জমে গেলাম একেবারে।

মুখে বলছে উলু, কিন্তু হাত ডোবাচ্ছে জলে।

ঋষি জলের ওপর জেগে থাকা একটা বোল্ডারের মাথায় লাফ দিয়ে উঠে বলল, স্রোতটা কেমন পাথরটাকে পাক দিয়ে যাচ্ছে দেখ।

অমনি উলুরও ওখানে যাওয়া চাই। ঋষি হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটা ঝাঁকুনিতে ওকে তুলে নিল।

ভাগীরথী পিকের ওপরটা তখন সিঁদুর মেখে টুকটুক করছে। ওরা হাত ধরাধরি করে সূর্যাস্তের সেই সুন্দর ছবিটা দেখতে লাগল।

মা বাবার হাতছানি আর সুদীপা মাসীর কড়া হাঁকে সেদিন ওরা বোল্ডারের ওপর থেকে নেমেছিল।

গোমুখের নিচ থেকে ওপরের আসল পথটা খুঁজে পাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর আশেপাশে ছোট বড় গড়ানে পাথরের টুকরো ছড়ানো। অসাবধানে পা পড়লেই পাথরের নুড়িগুলোর সঙ্গে গড়িয়ে যেতে হবে নিচে। অবশ্য গড়াতে গড়াতে বোল্ডারের গায়ে ঠেকে গেলে কিছুটা রক্ষে।

বেশ খানিকটা অঞ্চল জুড়ে এই বোল্ডারের রাজত্ব হওয়ায় পথ চেনা ভারী মুশকিল। পাথরের চাঁইগুলোর মাথায় মাথায় চূড়া করে বড় থেকে ছোট পাথরের টুকরো সাজিয়ে রেখে গেছে কারা। ঐ চূড়াগুলো দেখেই আন্দাজে ভুলভুলাইয়ার পথটা পেরিয়ে আসতে হবে।

ঋষি সেদিন সবাইকে ধরে ধরে বিপদজনক জায়গাগুলো পার করেছিল।

খালি উলু বলেছিল, থাম্‌, তোকে ওস্তাদি করে আমকে আর ধরতে হবে না, আমি নিজেই পেরিয়ে যেতে পারব।

বোল্ডারের চিহ্ন দেখে উলু বলে, এদিকে।

ঋষি বলে, ক্ষেপেছিস, ওদিকের পথ ধরলে আবার হড়বড়িয়ে নামতে হবে নদীর ধারে। আয় আমার সঙ্গে, ঠিক পৌঁছে দেব লালবাবার ডেরায়।

উলু কিছু সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে অল্প বয়স থেকেই মায়ের কাছে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখেছে। তবে সে এমন গোঁয়ার নয় যে কারু পরামর্শ কানে তুলবে না। চারদিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিল উলু। তার মনে হলো, ঋষির আন্দাজটাই ঠিক। অমনি সবার সঙ্গে সেও ঋষিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল।

ওরা যখন লালবাবার আশ্রমে এসে পৌঁছল তখন গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে শনশনিয়ে বইল হাওয়া, ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। টিনের চালের তলায় একটা লম্বা দাওয়ায় চটের ওপর বসল সবাই হাঁটু মুড়ে। বহু যাত্রীর ভিড়ে জায়গাটাতে পা ছড়িয়ে বসার উপায় নেই।

গঙ্গোত্রী থেকে সারা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে ওরা।

ঋষি বলল, রাত ন'টার আগে ওদিকের বন্ধ ঘরগুলো খোলা হবে না। ওখানেই আসমুদ্র হিমাচলের

মানুষের একত্রে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

ওদিকে শরীরের কষ্ট ভুলে সদানন্দবাবু, সুদীপা চৌধুরী আর সদানন্দের স্ত্রী ললিতা বোস গল্পে মেতে উঠেছেন। সদ্য দেখে আসা যমুনোত্রীর গল্প হচ্ছে।

সুদীপ বলছেন, মেয়ে কিছুতেই ঘোড়া নেবে না। অনেক বুঝিয়ে বললাম, বেশ, চড়তে হবে না, খালি সঙ্গে যাবে। মেয়ে অমনি বলে, মিছিমিছি এতগুলো টাকা গুনবে? বললাম, সে আমি বুঝব।

ললিতা বললেন, ঋষিটাও তাই, কিছুতেই ঘোড়া নিল না।

সদানন্দ বললেন, আমি কখনও ওদের ওপর কিছু চাপাই না। এ বয়সের ধর্মই হলো চাপিয়ে দেওয়া যা কিছু তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

সুদীপা বললেন, এখন ওদের ভেতর স্বাধীন ভাবনার বিকাশ ঘটছে। ওদের আত্মসম্মানে আঘাত না দিয়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করাই ভাল।

ললিতা বললেন, অনেক সময় পারিবারিক কোন পরামর্শে ঋষিকে আমি জড়িয়ে ফেলি।

সুদীপা বললেন, আপনার সঙ্গে আমি একেবারে একমত। আমিও তাই করি। তবে আমাদের আচরণ এমন হবে যাতে ওদের সুন্দর একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সদানন্দ বললেন, সবই ঠিক। আমাদের মত কিছুটা সচেতন যারা তারা এসব কথা ভেবেই চলি। তবু কঠিন এ পথে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় মাঝে মাঝে।

মাথা নেড়ে সমর্থনের হাসি হাসলেন সুদীপা।

ঋষি আর উলু ততক্ষণে ব্রহ্মচারীদের রসুইখানায় ঢুকে পড়েছে। বিরাট হাণ্ডায় চা বসান আছে। তার থেকে চারটে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে চা ঢেলে নিয়ে ফিরে এল বসার জায়গায়।

একেবারে গরম ধোঁয়া উঠছে।

উলু দুটো গ্লাস ঋষির বাবা মায়ের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নিন মেসাই, ধরুন মাসুমনি। কড়া শীত, এক এক মগ চায়ে জব্দ হয়ে যাবে।

ততক্ষণে ঋষি সুদীপার হাতে চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছে। এবার একটিমাত্র গ্লাস শূন্যে তুলে বলল, এটা কে নেবে?

উলু বলল, তুই খা শীতকাতুরে, আমার চা আমি আনছি।

ঋষি বলল, আর বলতে হবে না মেমসাহেব, গোমুখে জল ছুঁতে গিয়ে দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল না?

তুই থাম ভগীরথ, আর শাঁখ বাজাসনে। আয়, পরীক্ষা হয়ে যাক কে শীতকাতুরে। চল, কে পারে এই বর্ষার ভেতর দিয়ে গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে। পারবি? বল্ পারবি?

চল্।

দুজনেই ছুটতে যাচ্ছিল, সদানন্দ বললেন, মাদার, আমাদের একখানা করে বিস্কুট না দিলে যে জমছে না।

দিচ্ছি মেসাই, বলে উলু বিস্কুট খুঁজতে লেগে গেল। সেই ফাঁকে ঋষি ছুটল রসুইখানায় আর এক গ্লাশ চা আনতে।

এবার দু'গ্লাস চা নিয়ে দুজনে বসে গেল পিঠোপিঠি হেলান দিয়ে।

সদানন্দবাবুবা বসে বসে গল্প করছেন এক জায়গায় আর এরা দুই বন্ধুতে বসেছে একটু তফাতে।

লালবাবা পুজোয় বসেছেন। যাত্রীরা সেই দাওয়ার ওপর এদিক ওদিক জটলা করে বসেছে যে যার সংসার আগলে।

গায়ে ভস্ম মেখে ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক এঁকে স্বল্পবাস লালবাবা বসেছেন পুজোয়। দাওয়ার একধারে পুজোর বেদী। নানা দেবদেবীর প্রতিকৃতি। মা গঙ্গাই বেদীর মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মচারীরা মন্ত্রপাঠ করছেন। এগিয়ে দিচ্ছেন আরতির উপকরণ। যাত্রীরা কেউ কেউ হাত জোড় করে বসেছে। ধূপ ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পূজার ফুল, পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা ব্রহ্মকমল, সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেদীতে।

বেদীর সামনে কাঠের একটি সছিদ্র বাক্স। ওতে যাত্রীরা স্বেচ্ছায় যা কিছু দান করে। দু'বেলা শুধু তরল খিচুড়ি প্রসাদ। যেদিন জোটে সেদিন খিচুড়িতে দু'চার কুচি আলু কিংবা শাকপাতা ফেলে দেওয়া হয়। তাছাড়া যে যখন পারছে লতাপাতা মেশানো ফুটন্ত চা গ্লাশ ভরে নিয়ে আসছে।

এসবের জন্যে কোন পয়সা দিতে হয় না। কেবল ঐ বাক্সে স্বেচ্ছা-দান করে যাত্রীরা কৃতার্থ হয়।

ঋষি বলল, কেউ যদি ওখানে কিছু না দিয়ে শুধু খেয়ে পালায়?

উলু গভীর বিশ্বাসের সুরে বলল, পাপ হবে।

জানিস, তুই যখন বাবাকে বিস্কুট দিচ্ছিলি আর আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম তখন এক ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখলাম।

কি কাণ্ড রে!—উলু ঋষির গা ঘেঁষে এল। কৌতূহল তার চোখেমুখে উপচে পড়ছে।

আমি বেমালুম কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

আরে ভনিতা রেখে বলে ফেল না।

রান্নাঘরের ওদিকে উঁচু গলার কথাবার্তা শুনে উঁকি দিলাম। দেখি লালবাবা একটা ছেলেকে ধমক দিয়ে বলছেন, কি বললে, গঙ্গার জল এখানে ঘোলাটে, ময়লা? বেরিয়ে যাও আমার ডেরা থেকে। গঙ্গামাঈ এর নিন্দা! ভাগো এখান থেকে।

ছেলেটার তখন হয়ে গেছে। এই বৃষ্টিতে, অন্ধকারে যাবে কোথায়। আমি পেছন থেকে ওকে ইঙ্গিত করে বললাম, বাবার পায়ে পড়ে যাও।

ও তাই করে রক্ষে পেয়ে গেল। না হলে হয়েছিল আরি কি।

ঋষির পিঠে একটা ঘুঁষি মেরে উলু বলল, দারুণ বুদ্ধি দিয়েছিস তো তুই। সত্যি ছেলেটার কি হত রে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে, বৃষ্টিতে, কনকনে ঠাণ্ডায়—ভাবতেই পারছি না। হ্যাঁরে কোন্ ছেলেটা?

ঐ যে তিনজন বসে আছে হাত জোড় করে। ডান দিকের ছেলেটা। মনে হয় তিন বন্ধুতে এসেছে।

অমনি উঠে গেল উলু। দাওয়ার ধারের খুঁটো ধরে উঁকি মেরে তিন মূর্তিকে দেখে ফিরে এল।

বেশ বড় ছেলে রে। তোর মতই লম্বাটম্বা হবে, তবে তোর আমার চেয়ে অনেকটা বড়।

ঋষি বিজ্ঞের মত বলল, বয়েস না হলে কি একা একা বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় কখনো।

উলু বলল, আমার মার সঙ্গে ঘুরতে খুব ভাল লাগে। একটুও খিচ খিচ করে না। যদি আমি কোন একটা ঘর-সাজানোর জিনিস কিনব বলি, অমনি মা বলে, কিনতে পার, তবে ভাল করে একটু ভেবে নাও, ঘরের কোন জায়গাটায় সাজিয়ে রাখবে।

ঋষি বলল, আমার বাবাও প্রতি ছুটিতে বাইরে যাবার সময় বলে, ঋষি. এবার কোথায় যেতে চাস ঠিক করে আমাকে বলবি।

ঠিক করার মানে বুঝলি? আমাকে সে জায়গাটা সম্বন্ধে পড়াশোনা করে আর খোঁজখবর নিয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে। রেস্ট হাউসটাউসে চিঠে লিখে আমাকেই যোগাযোগ করতে হবে।

উলু বলল, এ ব্যাপারে আমার মা নিজেই যোগাযোগ করে। জায়গাটা ঠিক হলে আমাকে জানিয়ে দেয়। যতদিন যাওয়া না হচ্ছে, আমি সে জায়গাটা নিয়ে খালি ভেবেই যাই।

চল্ চল্, আরতি শেষ হয়ে এল।

ঋষি আর উলু এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল। ওদের মা বাবারা একেবারে লালবাবার ডানদিকে বসে আরতি দেখছে।

শেষে সকলে প্রণাম করল। গঙ্গামাঈ-এর জয়ধ্বনি উঠল। ঋষিরাও সে ধ্বনিতে যোগ দিল।

উলু ঋষিকে ঠেলা দিয়ে বলল, ঐ যে দেখ, সেই ছেলে তিনটে কেমন গলা ফাটিয়ে গঙ্গামাঈকী বলছে।

কলকাতার স্লোগান হাঁকার অভ্যেস আছে তো।

বৃষ্টির ভেতরেই দাওয়ায় গুটিসুটি মেরে বসে গরম গরম খিচুড়ি খেল সবাই।

রসুইখানার পাশে ঝর্ণার জল রবারের পাইপের মুখ দিয়ে পড়ছিল। ঋষি আর উলু বড়দের কোন বারণ না শুনে এঁটো পাতা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

উরেব্বাবা, কামড়ে দিল যেন।

একটুখানি বাইরের হাওয়া বৃষ্টিতে বেরিয়ে হাড়ে করাত চালান কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল।

দুজনে দুজনের হাতের তেলো ঘসে ঘসে গরম করতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে সিঙ্গার মেশিন চালাতে চালাতে হিহি হিহি করে কাঁপতে লাগল, আবার দুজনে দুজনের করুণ অবস্থা দেখে হি হি করে হেসেও উঠল।

ঠিক সাড়ে আটটায় গণ-শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলে গেল। উলু আর ঋষির কাছে সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা আর রোমাঞ্চ।

নিচু দরজায় মাথা হেঁট করে কাঠের ঘরে ঢুকতে হলো সবাইকে। তিন কামরার ঘর। একটি বড়, দু'টি ছোট। এবার সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ নিজের নিজের দলবল নিয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল কাঠের মেঝেতে। গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে হচ্ছে। এক চিলতে জায়গাও ফাঁক রাখার উপায় নেই। এক একজন শুচ্ছে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লালবাবা ব্রহ্মচারীর হাত থেকে একটা করে কম্বল নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তার দিকে।

কম্বলদান শেষ হলে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন বাইরে।

দুই মায়ের মাঝে উলু। বিপরীত প্রান্তে সদানন্দ আর রাজর্ষি।

উলু ফিসফিসিয়ে বলল, এ কম্বল আমি গায়ে দেব না মা। গা কুটকুট করবে।

আমরা তো গায়ে দিয়েছি মা। যিনি এই দুর্গম জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর সম্মান রাখতে হয়।

সারা ঘরে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের লোক। যে যার ভাষায় কথা বলে চলেছে। ঘরের ভেতর জানলা নেই। তিন চারটে ছোট ছোট ফুটো আছে মাত্র। ভেতরটা বেশ গরম। বাইরে যে এত ঠাণ্ডা তা মালুমই হয় না।

ঘর এখন অন্ধকার। আস্তে আস্তে কথা কমে আসছে। ঋষি চুপি চুপি বলল, জানিস উলু, জলপিপি এখন ডাঙায় সিঁধিয়েছে। ঐ জায়গাটাই ম্যানেজ করে নিয়েছে।

উলু বিস্ময়ে বলল জলপিপি! পরক্ষণেই বলে উঠল বুঝেছি, বুঝেছি, সেই হিপি।

সুদীপা বললেন, হিপি আবার কোত্থেকে এলো রে?

তোমরা কিছু দেখনা মা। আশ্রমে ঢুকতে প্রথম যে ঘরখানা পড়ে তারই বন্ধ দরজার সামনে গেড়ে বসেছিল। একজন ব্রহ্মচারীকে বলেছিল, ঘরখানা আমাকে রাতের মত দিতেই হবে।

তারপর?

ব্রহ্মচারীজী কোন উত্তরই দেন নি। শুধু হাত নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন।

রাজর্ষি অমনি বলল, কিছু বোঝেন নি ব্রহ্মচারীজী। হিপি, মুখে যেরকম সিঙাড়া পুরে ইংরেজি বকুনি চালাচ্ছিল তা বোঝে কার সাধ্যি।

উলু বলল, থাম, হিপিরা বুঝি সিঙাড়া খায়?

ওরা সর্বভুক। সিঙাড়া তো সিঙাড়া, আরসুলা পেলেও খাবে।

নাকে কান্নার আওয়াজ তুলল উলু, দেখছেন মাসুমণি, কেমন ভয় দেখাচ্ছে ঋষি।

ললিতা বললেন, রাত হল, এখন ওসব কথা থাক। বেচারা আরসুলার নামে ভয় পেয়ে গেছে।

ঋষি অমনি বলল, অন্ধকারেই তো ওরা অভিযান চালায়। জানি না, কত অক্ষৌহিনী লালবাবা পুষে রেখেছেন। তবে সব গোরা সৈন্য। শীতে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে।

কেন বেচারাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বলতো?

ওদের ভয় কি মা, ওরা তো কামড়ায় না, সুযোগ বুঝে একটুখানি চেটে নেয় মাত্র।

উলুর গা শিরশিরিয়ে উঠল। সে আর কথা না বাড়িয়ে লালবাবার দেওয়া কম্বলখানা টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিল।

রাত বাড়ছে। নেড়া পাহাড় আর বরফের পাহাড়ে ঘিরে আছে চারদিক। ঘরের ভেতরে এতগুলো মানুষ অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি থেমে গেছে। কারণ, অদূরে ছুটে চলা কিশোরী গঙ্গার

পায়ের নূপুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ভোরবেলা উঠে মুখ দেখা গেল না সূর্যের। পাতলা মেঘের কুয়াশায় চরাচর ঢাকা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ভাগ্যিস কাল গঙ্গোত্রী থেকে এত পথ হেঁটে এসেও লালবাবার ডেরায় থেমে থাকেনি। আরও তিন কিলোমিটার পথ এগিয়ে গিয়ে গোমুখ দেখে এসেছে। বড় কষ্ট হয়েছিল ঠিক, কিন্তু আজ ভোরবেলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে আর দেখা হত না। যারা অপেক্ষা করেছিল, এখন তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে শুধু বেরসিক মেঘের কাণ্ড কারখানা দেখছে।

সদানন্দ বললেন, গোমুখ তো দেখা গেল, এখন গঙ্গোত্রী ফিরি কি করে। সরু রাস্তা, জলে ভেসে যাচ্ছে। নুড়ি পাথর ওপরের পাহাড় থেকে নিশ্চয় গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পথে।

রাজর্ষি বলল, তুমি আবার ভয় পাইয়ে দিচ্ছো মাকে। ও কিছু হবে না, ঠিক পাশ কাটিয়ে ডিঙিয়ে চলে যেতে পারব।

সুদীপা বললেন, তা যাওয়া নিশ্চয় যাবে, কিন্তু মেঘ না সরলে দু'হাত দূরের পথ যে দেখা যাবে না।

পথ দেখার জন্যে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। আকাশ একটু চকচকে হতেই গায়ে রেইন কোট চড়িয়ে বেরুল সবাই। রাজর্ষি আর উলু গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল।

মায়েরা মুখে যতই বলুন, ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে, এক্ষেত্রে পদে পদে সাবধান না করে স্বস্তি পেলেন না।

একটু অসাবধানে নিচে গড়িয়ে পড়লে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে।

চিড়বাসে এসে কোমল গরদের মত এক টুকরো রোদ দেখা দিল। বহু নিচে সুরধুনি বয়ে চলেছে। তার কূলে খানিক জায়গা জুড়ে চিড় পাইনের বন। বনের সবুজে সোনালী মাখনের মত রোদ্দুর খেলছে। একটু এগিয়ে পাওয়া গেল দু'টি ভূর্জ গাছ।

উলু আর রাজর্ষি ভূর্জগাছের পাশে গিয়ে বালি কাগজের মত হাল্‌কা ব্রাউন বেশ খানিকটা ছাল তুলে নিল।

এবার উলু ঋষির দিকে ফিরে মুরুব্বি গলায় বলল, বল্‌ তো রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ভূর্জ পাতার কথা আছে।

ঋষি আকাশের দিকে আধখানা চোখ মেলে ভাবতে লাগল।

কিছু সময় পরে উলু বলল, হবে না। হলে অনেক আগেই হয়ে যেত। তুই চাতক নয় যে তোর ডাকে মেঘ ঘনিয়ে উঠবে।

হেরে গেছি, বল।

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গানের কলিটা মনে পড়ছে?

একটু ভেবে নিয়ে রাজর্ষি বলল, 'ভূর্জ পাতায় নব গীত কর রচনা।'।

যেন তার নিজেরই জয় হয়েছে, এমনিভাবে উলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ঋষির হাত ধরে দোলাতে লাগল।

হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, কিন্তু দেখ, ভূর্জপাতা তো অশত্থ পাতার মত, ওতে গীত রচনা হবে কি করে!

রাজর্ষি বলল, এই বল্কলেই লেখা হত।

উলু বলল, গঙ্গোত্রীর দোকানে এই বাকলেই তো জিলিপি খাওয়ায় রে।

দু'বন্ধুতে কল কল কথা বলে চলেছে, পেছনে প্রায় নির্বাক হেঁটে আসছেন তিনজন। ওঁরা চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, তবু উপভোগ করছেন ছেলে মেয়েদের সকৌতুক হাসি তামাসা। মনে পড়ে যাচ্ছে নিজেদের ছেলেবেলার কথা। তখন কো-এডুকেশান ছিল ঠিক কিন্তু ছেলেমেয়েরা এমন বন্ধুর মত হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াত না। মেলামেশার ক্ষেত্রে কোথায় যেন বেশ খানিকটা ব্যবধান ছিল। ভালমন্দের বিচার বাদ দিয়ে ওঁরা এখন দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেদের কৈশোরকে খুঁজে পেয়ে ভারী খুশি।

সদানন্দ সবার পেছনে। একবার চোখ তুলে সবাইকে দেখে নিচ্ছেন। রাজর্ষি বয়সের তুলনায় একটু বেশি বাড়ন্ত। গলার স্বরে প্রথম তারুণ্যের পরিবর্তন এসেছে। বেশ কয়েক বছর আগে ডিপথেরিয়ায় এই ছেলেকে নিয়েই যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল। তখন স্কুলে ভর্তি হবার পালা। কিন্তু অসুখের ব্যাপারে পিছিয়ে গেল একটা সেসান।

রাজর্ষি সারাক্ষণ বেশ আনন্দে থাকতে ভালবাসে। স্বভাবে বন্ধু বৎসল, পরোপকারী।

প্রায় তিনটে নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল সেই জলধারার পাশে, যা ওপরের পাহাড় থেকে নেমে এসে পথ ভাসিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গার ধারার সঙ্গে ধারা মিলিয়েছে। পথের ওপরেই এখানে বড় বড় বোল্ডার এসে পড়েছে। জল, হাততালি পাওয়া নর্তকীর মত পাথরের চারপাশ ঘুরে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে।

কি সুন্দর নাচের একটি মুদ্রায় দাঁড়াল উলু। মসৃণ একটি বোল্ডারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। আর একটি পাথরের ওপর বসে তাকে অবাক চোখে দেখছে রাজর্ষি। এ যেন অন্য কেউ। একে রাজর্ষি চেনেনা। পায়ের, হাতের, সারা দেহের, বিশেষ করে চোখের কয়েকটা কাজ আপন মনে করে গেল উলু।

রাজর্ষি স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছে উলুর নাচ, শুনেছে তার গান। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সময় হাততালিতে ফাটিয়েছে অডিটোরিয়াম। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চটি প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো। মাথার ওপরে মেঘ জমে আছে। কয়েকটা চিড়গাছ পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছে নিচে। তারা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উলুর নাচ দেখছে। ঝর্ণার জল উলুর নাচের ছন্দে তাল মিলিয়েছে।

রাজর্ষির মনে হল, মেয়েটি তার অতি পরিচিত সতীর্থ নয়, কোন মানবীও নয়, যেন স্বয়ং গঙ্গা সুরলোক থেকে নেমে আসছেন নৃত্যছন্দে। সদানন্দরা এসে গেলেন। তাঁরাও বসে গেলেন এক একটা পাথরের ওপর। ঝর্ণার জল হাতে তুলে মুখে দিলেন। ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেল।

ততক্ষণ বোল্ডারটার ওপরে বসে পড়েছে উলু।

ললিতা বললেন, সুন্দর তোমার নাচের ভঙ্গী, আগে তো কখনও দেখিনি। থামলে কেন?

আমি আপনাকে নাচ দেখাব মাসুমণি। আগামী মাসে বাগেশ্বরীর প্রোগ্রাম আছে শিশির মঞ্চে।

সদানন্দ বললেন, আমি বুঝি বাদ পড়ব?

আমার মা বাদ না পড়লে আপনারা কেউ বাদ পড়বেন না।

সদানন্দ সহাস্যে সুদীপার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আপনার মেয়ে কিন্তু যথার্থ মাতৃভক্ত।

সুদীপাও হেসে উত্তর দিলেন, তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ললিতা বললেন, উলু আমাদের ভারি গুণের মেয়ে। যেমন হাসিখুশি, আসর জমানো, তেমনি আবার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।

ঋষি কি কম নাকি। ও যেভাবে আমাদের সুবিধে অসুবিধেগুলো দেখল তাতে ওকে অন্তর থেকে আশীর্বাদ না করে পারা যায় না। ওর স্বভাবের ভেতরেই মানুষের উপকার করার ইচ্ছেটা রয়ে গেছে।

ছেলের সুনামে খুশি হয়ে উঠলেন ললিতা। বললেন, আশীর্বাদ করুন ভাই, ছেলে যেন সবার কাছ থেকে ভালবাসা পায়।

ঋষি বলল, আচ্ছা, তুই একটা গান শোনা আমাদের। না হয় নাচতে হবে না।

এতটা পথ হেঁটে এসে দম পাব?

খুব পাবি। জানেন মাসীমা, ও আমার আগে আগে এসেছে। মেয়েদের ভেতর দৌড়ে ওর সেকেণ্ড প্রাইজ বাঁধা।

সুদীপার সে খবর অজানা নয়। তাই তিনি একটুখানি হেসে তাকালেন ঋষির দিকে।

সদানন্দ বললেন, দ্বিতীয় কেন? ফার্স্ট প্রাইজ পেতে বাধা কোথায়?

রাজর্ষি বলল, সে তুমি বুঝবেনা। আমাদের ইলেভেন সি-তে এক পি, টি, ঊষা আছে। কেরালার মেয়ে। তাকে হারায় কার সাধ্যি।

ললিতা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, হাঁরে, মেয়েটার নাম সত্যি সত্যি ঊষা?

না মাসুমণি, ওর আসল নাম, মণিকুন্তি। ওকে ছেলেরা পি, টি, উষা নাম দিয়েছে।

ঋষি কিন্তু ভোলেনি আসল কথাটি। সে বলল, কি রে গানের কি হলো?

উলু মুখ নিচু করে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল। ভাবখানা—গাইছি, একটু ভেবে নিতে দে।

গান এল উলুর গলায়।

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে।।'

চাঁছাছোলা বলিষ্ঠ গলা, দরদে ভরা। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। অল্প বয়সে গলা চিকন আর সুরেলা হয়।

গান শেষ হলে সদানন্দ বললেন, কলালক্ষ্মী, আমাদের উলুকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। যত্নে রক্ষা করতে পারলে নিজেও আনন্দ পাবে, অন্যকেও আনন্দ দিতে পারবে।

রোদ্দুরের সোনালী সুরা পান করতে বেরিয়ে পড়েছে ইন্দ্রের হাতিশালার পাল পাল হাতি। কিছুক্ষণের ভেতরই আকাশের সোনালী রঙ মুছে গেল। ওরা দ্রুত পা চালিয়ে চলল গঙ্গোত্রীর দিকে। এখন উৎরাই এর পথে নেমে চলেছে সবাই। চড়াই ভাঙতে বুক চড়চড় আর উৎরাই পথে পায়ের আঙুল টনটন।

মনে হল নিচ থেকে পথের বাঁক পেরিয়ে কেউ উঠে আসছে। একটু পরেই পরস্পর মুখোমুখি হল। একি! দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে উঠছেন ওপরে।

সদানন্দ শঙ্কিত বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, এই অসময়ে আপনি গোমুখের পথ ধরেছেন। পৌঁছতে তো রাত দশটারও বেশি হয়ে যাবে। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যাবেন কি করে?

আমাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

ভদ্রলোক হিন্দি ভাষাভাষি।

সদানন্দ বললেন, কোত্থেকে আসছেন?

উত্তর কাশী থেকে। কাছাকাছি গাঁওতে আমার ডেরা। বাসটা পথে বিগড়ে যাওয়ায় আমার গঙ্গোত্রী পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল।

আপনি এই ঠাণ্ডা আর ঝড়ো আবহাওয়ায় কিছুতেই গোমুখে পৌঁছতে পারবেন না। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকার ঘনাবে। তখন এই ভাঙাচোরা পথে এগোনো আর সম্ভব হবেনা। তারচেয়ে ফিরে চলুন। আজ রাতটা গঙ্গোত্রীতে কাটিয়ে কাল ভোরে রওনা হবেন।

বৃদ্ধ তবুও সংকল্প থেকে এক চুল নড়লেন না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, তাঁর একটিমাত্র ছেলে গোমুখ থেকে আরও উঁচুতে তপোবনে গিয়েছিল। সেখানে প্রবল ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনরকমে সে নেমে এসেছে গোমুখে। ইউ, পি, গভর্ণমেন্টের যে ডাকবাংলোটি তারই দাওয়ায় পড়ে আছে। এক যাত্রীর কাছে ঠিকানা দিয়েছিল। দয়ালু যাত্রীটি উত্তরকাশী থেকে একটা পোস্টকার্ডে খবরটা জানিয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, আজ পাঁচদিন পেরিয়ে গেল, না জানি সে কেমন আছে। তার মা বড় উতলা হয়ে অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ বৃদ্ধকে বাধা দেবার কোন ভাষা ছিল না। এরা সকলেই মূক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কোনরকম সহজ সমাধানই সম্ভব ছিল না।

কথা বলল রাজর্ষি, বাবা আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাব।

ললিতা বললেন, সে কি! এই পরিস্থিতিতে যাওয়া কি সম্ভব!

ওরা বাংলায় কথা বলছিল। ভদ্রলোক কিছুই বুঝছিলেন না।

সদানন্দ চিরদিনই ছেলেকে ভাল কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মূক হয়ে রইলেন।

রাজর্ষি আবার বলল, আমার জন্যে চিন্তা কর না তোমরা, আমি ঠিক বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে পৌঁছে যাব।

সদানন্দ এবং ললিতা জানেন, ছেলের মুখের কথা খসলে আর তাকে ফেরানো যাবে না। তাই ললিতা শুধু কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই যতক্ষণ না ফিরিস আমি ভাবনায় মরে থাকব বাবা।

সুদীপাকে কানে কানে কি যেন বলল উলু। ঋষি ঠিক বুঝে ফেলেছে। সে অমনি বলল, না মাসীমা উলু আমাদের সঙ্গে যাবে না। অসুবিধেয় পড়লে সবাই মিলে বিপন্ন হওয়ার কোন মানেই হয় না আমি ঠিক গঙ্গোত্রীতে ফিরে আসব উলু। তুই একদম কিছু ভাবিস না।

উলু কোন কথা না বলে গঙ্গোত্রীর দিকে হন হন করে হেঁটে চলল। ঋষি ছুটল তার পেছন পেছন। দু'বন্ধুতে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তুই কি চাস না উলু আমি ঐ বুড়ো মানুষটির সঙ্গে যাই?

একবারও বলেছি সে কথা? আমি শুধু তোর সঙ্গে যাবার কথা মাকে বলেছিলাম।

তুই আমাকে ভুল বুঝিস না উলু, তিনজন একই সঙ্গে বিপদে জড়িয়ে পড়লে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারব না। দিনের আলো থাকলে তোকে নিয়ে যাবার কোন অসুবিধেই ছিল না, কিন্তু রাতে পিছল পথে তোকে ধরব না ঐ মানুষটিকে সামলাব।

উলু অবুঝ নয়, কেবল তরুণ বয়সের প্রাণের জোয়ারে সে এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে চেয়েছিল।

রাজর্ষির কথায় শান্ত হলো উলু। পরক্ষণেই বলল, তুই না ফেরা অব্দি আমি কিন্তু ঘুমুতে পারব না।

উলুর এই একছত্র কথার ভেতর কি শক্তি ছিল জানি না, তা মুহূর্তে আর একটি তরুণ প্রাণে প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলল, একটুও ভাবিস না, আমি ঠিক তোর কাছে ফিরে আসব।

বৃদ্ধ নমস্কার করে চলবার জন্যে পা বাড়াতেই ঋষি চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়ান, আমি আসছি।

সব কথা শুনে বৃদ্ধ ঋষির হাত ধরে বললেন, বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করবেন বাবা। তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম, তিনি তোমার মত একটি কিশোরের মধ্যে এত বড় একটা প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ..।

কিন্তুর কিছু নেই। বলল রাজর্ষি।

বৃদ্ধ বললেন, আমি জীবনের শেষে এসে দাঁড়িয়েছি বাবা, মরণের ভয় আমার নেই। তোমার সামনে এখন বিরাট জীবনের পথ পড়ে আছে। অকারণে তুমি কেন জীবনের ঝুঁকি নেবে।

ঋষি বলল, আমি যদি আপনাকে না দেখতাম তাহলে আপনি নিশ্চয় একাই যেতেন, কিন্তু যখন দেখেছি তখন একা আপনাকে কিছুতেই এ বিপদে ছেড়ে দিতে পারব না।

গত্যন্তর না দেখে বৃদ্ধ থেমে দাঁড়ালেন।

উলু তার ঝোলা থেকে চার ব্যাটারীওলা নতুন কেনা টর্চটা বের করে ঋষির ব্যাগে ভরে দিল। ড্রাইফুড, বিস্কুটের প্যাকেট যেখানে যা ছিল টেনে বের করে গুছিয়ে দিল বন্ধুর ব্যাগ।

যখন যাত্রা শুরু হল তখন রাজর্ষি আর উলু এক সঙ্গে খানিক পথ গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল। সেই চির পুরাতন অথচ নিত্য নবীন গান।

'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক. ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার।।
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার
তোমারে করি নমস্কার।।'

ফিরে এল উলু। পথের বাঁকে অদৃশ্য হল রাজর্ষি আর সেই বৃদ্ধ।

গঙ্গোত্রীতে ওরা যখন এসে পৌঁছল তখন মেঘের সঙ্গে শেষ বেলার ছায়া মিশে গেছে। সারা

আকাশ থমথমে। ফেরার পথটুকু ওরা কেউ কারু সঙ্গে কথা বলেনি। ললিতা ছেলের কল্যাণ কামনায় শুধু দুর্গা নাম জপ করে গেছেন। সদানন্দ ভেবেছেন, মানুষের উপকার যে করে ঈশ্বর সব সময় তার সহায় হন। সুদীপা অবাক হয়ে ভেবেছেন, এত মহৎ একটি হৃদয় ছেলেটি পেল কোথা থেকে। একি শুধু তারুণ্যের উন্মাদনা, না রক্তের ভেতর পরোপকারের এই বীজ রয়েছে!

উলু কিন্তু সারাটা পথ মজার একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে এসেছে। সে গঙ্গোত্রীকে ভেবে নিয়েছে গোমুখ। সে যেন ঋষি আর ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে ফেলে হেঁটে চলেছে। বৃদ্ধ মানুষটি ভারী সুন্দর সব কথা বলতে পারেন। আমি একদিন তোমাদের মত ছিলাম। কত পাহাড় ডিঙিয়েছি। কত মানুষকে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে কত বৃদ্ধকে পথ থেকে পৌছে দিয়েছি তার ডেরায়। তাই ঈশ্বর সব সময় আমাকে করুণা করেছেন! এই যে রাতের অন্ধকারে আমি একা পথ চলার জন্যে তৈরি হয়েছিলাম, তিনি কিন্তু তোমাদের আমার সঙ্গী করে পাঠিয়ে দিলেন। তোমরা বৃদ্ধকে শেষ পথটুকু পার করে দিও, সে তোমাদের সঙ্গে চলতে চলতে তার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলবে। তোমরা অন্ধকে পথ পেরিয়ে যেতে সাহায্য কর, সে তোমাকে আনন্দের জগতের খবর শোনাবে। খঞ্জকে একটি যষ্ঠি দাও, সে তোমাকে দুর্গম গিরি পেরিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে।

আসলে ক্লাশে পড়াতে গিয়ে ভবদেববাবু একদিন এই কথাগুলো বলেছিলেন। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল উলুর। আজ সেগুলোই বৃদ্ধের মুখ দিয়ে আবার সে নিজেকে শোনাচ্ছে।

সরকারি ডাকবাংলোর দুটো রুম তারা আগেই বুক করে গিয়েছিল। এখন একটু ব্যবস্থা করে পাশাপাশি নিয়ে নিল।

সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু তাকে দূর করার কোন চেষ্টাই কেউ করতে পারল না। চৌকিদার খাবার ব্যাপারে জানতে এসে ঘর অন্ধকার দেখে ফিরে গেল।

মেসাই, আমি তোমাদের ঘরে ঢুকব।

সদানন্দ ললিতার পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছিলেন। উলুর গলা শুনে বললেন, দাঁড়াও মা, আমি আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।

আলো জ্বাললেন সদানন্দ। উলু সিধে ললিতাদেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মাসুমণি তুমি এত ভাবছ কেন বল তো? দেখো, কাল যখন ঋষি ফিরে আসবে তখন তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

উলুর মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে ললিতা বললেন, মন বলছে আমার মেয়ের কথা কখনো মিথ্যে হবার নয়। ঋষি ঠিক সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়তেই কনকনে একটা ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ল। অন্য সময় হলে দরজা বন্ধের তোড়জোড় পড়ে যেত, কিন্তু এ সময় কেউ উঠে গিয়ে সেটা বন্ধ করল না! একটা দুঃসাহসী ছেলে উন্মুক্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মুখোমুখি চলেছে, তার কথা ভেবে এই সামান্য ঠাণ্ডার কামড়কে সকলে উপেক্ষা করল।

সদানন্দ বললেন, তুমি এ ঘরে কিছুক্ষণ থাকতে পারবে মা? তোমার মাসুমণি তোমার সঙ্গে গল্প করে খুশি হবে। মা কোথায়?

ওঘরে জানলার ধারে অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। তাই তো মাসুমণির সঙ্গে গল্প করব বলে চলে এলাম।

বেশ করেছ।

ললিতা উলুকে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন।

তোমার কথা প্রায়ই বলে ঋষি।

তাই বুঝি?

স্কুলের অডিটোরিয়ামে ফাংশান হলে তোমার নাচ গানের খুব প্রশংসা করে ও।

ওরা সব্বাই আমাকে খুব ভালবাসে কিনা।

তুমি কার কাছে গান শিখেছ?

মায়ের কাছে।

সুদীপা গান জানেন, তা তো জানতাম না।

উলু হেসে বলল, নাচ কিন্তু মায়ের কাছে শিখিনি।

সদানন্দ বললেন, কোন্ ধারার নাচে তোমার বেশি আগ্রহ?

সব নাচই আমার ভাল লাগে, তবে সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশি দেখার পর থেকে ঐ নাচটাই আমাকে যাদু করে রেখেছে। জানেন মেসাই, ওড়িশার মন্দিরে মন্দিরে মায়ের সঙ্গে আমি মূর্তি দেখে বেড়িয়েছি। খাজুরাহো, দিলওয়ারা, বেলুর, দক্ষিণ ভাবতের কত মন্দির ঘুরে ঘুরে ভাস্করদের কাজ দেখেছি। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন জায়গার শিল্পীদের বিভিন্ন রকম দক্ষতা। তবে ওড়িশার শিল্পীদের মত মুখের ভাব ফোটাতে আমি সারা ভারতে আর কোথাও দেখিনি। সংযুক্তা নাচতে নাচতে হঠাৎ মন্দিরের গায়ের ঐ মূর্তি হয়ে যান। মেসাই, সে মুহূর্তগুলো কি যে অপূর্ব, কি বলব।

ললিতা বললেন, তুমি আমাকে শিশির মঞ্চে নাচ দেখাবে বলেছ কিন্তু। ভুলে যেও না যেন, আমি টিকিট কেটেই তোমার নাচ দেখব।

মা-সু-ম-ণি আপনি আমার নাচ দেখবেন টিকিট কেটে, এখনও এমন তালেবর আমি হইনি। বাগেশ্বরী নাটকের অনুষ্ঠান করবে। তার আগে কয়েকখানা গান আর মিনিট পঁচিশ-তিরিশ আমার নাচ, ব্যস ঐ পর্যন্ত।

তাই দেখব।

উলু বলল, সঙ্গতকার আর গায়ককে ওঁরা কিছু টাকা দেবেন। আমি ওঁদের কাছে দশখানা কমপ্লিমেন্টারি কার্ড চেয়েছি। তার তিনটেতে আপনি, মা আর মেসাই যাবেন। বাকি সাতখানার বিলি ব্যবস্থা ঋষির। ও যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

সব ক'টা অনুষ্ঠানে এমনি করে ওদের কার্ড বিলিয়ে দাও?

না দিলে রক্ষে আছে! পেছনে বসে বিনুনি ধরে হ্যাঁচকা টান দেবে না?

তাই করে বুঝি?

শুধু তাই। কেউ ক্লাসে ঢোকার আগেই ওরা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে আমার নাচের একখানা কার্টুন এঁকে তার তলায় লিখবে,—

ঐ আসে খঞ্জনা, কি নাচের ভঙ্গী

খাঁড়া হাতে তেড়ে আসে যেন রণরঙ্গী!

আবার কখনো লেখে,—

অমাবস্যার রাতে শ্যাওড়ার ডালে

বলিহারি শাঁকচুন্নি নাচে তালে তালে।

ললিতা বললেন, এরকম লেখে বুঝি? ভারী দুষ্টু ছেলে তো সব।

উলু অমনি বলে উঠল, না মাসুমণি, আমি কিচ্ছু মনে করি না। সবার সঙ্গে মিলে আমিও হাসি।

তুমি একটি বোকা মেয়ে, আমি হলে ক্লাশ টিচারের কাছে নালিশ করে দিতুম।

ওরা সব বন্ধু তো, ওদের আর কি বলব। যখন প্রাইজ পাই তখন ওরা যা করে না, আপনি ভাবতে পারবেন না; সারা অডিটোবিয়াম ফাটিয়ে দেবে চিৎকারে।

ঋষি তোমাকে জ্বালায় না?

একটুও না। ও বড় একটা হৈ-চৈ করে না, বেশ চুপচাপ থাকে। কিন্তু আমরা জানি সব দিকে ওর নজর। যে কোন কাজে ক্লাশ টিচার, এমনকি হেডস্যার ওর ওপরেই সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সদানন্দ কৌতুক করে বললেন, ও একটু মোড়লি করতে ভালবাসে, তাই না?

মেসাই, এমন করে বলবেন না। সকলের ঐ ক্ষমতাটা থাকে না। ও সবার জন্যে সব কিছু করে, তাই ওর কথা মানতে হয়।

ললিতা বললেন, ছেলেটা আমার একদম পাগল। দেখলে না, এই ঝড় আর অন্ধকারে কেমন বুড়ো

মানুষটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

উলু বলল, মাসুমণি, আপনি জানেন কিনা জানি না, ও মস্তবড় একটা কাজ করেছে।

সদানন্দ অমনি বললেন, কি কাজ মা, আমরা কিছু জানি না তো।

একটি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড ছেলে ছিল আমাদের ক্লাশে। সে আরও কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছিল। হেডস্যার তার অভিভাবককে ডেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। ঋষি হেডস্যারকে অনেক অনুরোধ করে বলল, স্যার, ওকে একটিবার সুযোগ দিন।

হেডস্যার বললেন, ও রোগ ক্যানসারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওর থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

ঋষি বলল, স্যার, শুধু আমরা নই, সব স্কুলের পড়ুয়ারাই আপনার ছাত্র। ছাত্র না হলেও ছাত্রতুল্য। আপনি ওকে আমাদের স্কুল থেকে তাড়ালেন, ও কিন্তু গিয়ে ঢুকবে অন্য আর একটা স্কুলে। সেখানেও এই একই কীর্তি করবে।

হেডস্যার বললেন, তুমি কি বলতে চাও ওকে শোধরানো যাবে?

ঋষি বলল, একবার চেষ্টা করে দেখব স্যার।

হেডস্যার বললেন, আমি ভাবছি, তুমি আবার না বিপদে জড়িয়ে পড়।

ঋষি বলল, আমি খুব সাবধানে থাকব স্যার।

হেডস্যারের ঘর থেকে ফিরে এসে ঋষি আমদের কয়েকজনকে ডেকে এইসব কথা বললে।

আমি গোপনে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি করবি?

ও গম্ভীর হয়ে বলল, কিচ্ছু ভাবিনি উলু। শুধু ঝোঁকের মাথায় স্যারের কাছে ওর জন্যে একটু সময় চেয়ে নিলাম।

এর পরের ঘটনাগুলো আমাদের জিজ্ঞেস করবেন না মেসাই। ঋষি আর আমি ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড হয়ে গেলাম। ঋষি আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড বলে বলছি না, ও সত্যি যাদু জানে। ছেলেটাকে ঐ ভয়ঙ্কর ক্রিভাসের একেবারে মুখ থেকে টেনে আনল।

ললিতা বললেন, আশ্চর্য! ও আমাদের কিচ্ছু বলেনি।

আপনি খুশি হননি মাসুমণি?

এখন ঋষির জন্যে গর্ববোধ হচ্ছে। অবশ্য তোমার জন্যেও। তবে সে সময় জানতে পারলে আমি সত্যি বাধা না দিয়ে পারতাম না।

তাই তো ঋষি আপনাকে ওসব বলেনি।

তোমার মা জানতেন?

আমি মার কাছে কিছু লুকোই না। মা সব জানতেন।

বাধা দেননি?

মা শুধু বলেছিল, তোমার বয়েস আর অভিজ্ঞতা, দুটোই কম। অবুঝের মত কাজ কর না, হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।

একটা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি এলো। ঘরের পর্দা উড়তে লাগল। এবারও ওরা জানালা বন্ধ করতে পারল না। সবাই নিশ্চুপ বসে ঋষির কথা ভাবতে লাগল।

উলু বলল, আলোটা কি নিভিয়ে দেব মেসাই?

সদানন্দ বললেন, যদি তোমার অসুবিধে না হয় তাহলে নিভিয়ে দাও।

টুক করে আলোটা অফ করে দিয়ে উলু বলল, আপনারা বরং সামান্য বিশ্রাম করে নিন, আমি ও ঘরে মায়ের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসছি।

ললিতা বললেন, অনেকক্ষণ একা একা আছেন তোমার মা, ওঁর কাছে একটু বস। আমি জানি, উনিও ছেলেটার জন্যে ভাবছেন।

উলু চলে গেল পাশের ঘরে। গঙ্গোত্রীর মন্দিরের মাথায় আলো জ্বলছে। বৃষ্টিতে সে আলো কখনো আবছা মনে হচ্ছে। সুদীপা ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে বসে বাইরের অশান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছেন।

উলু একটা চেয়ার টেনে মায়ের কাছে বসল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুড় গুড় করে ডেকে উঠছে মেঘ। সে ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

রাত তখন কত জানা নেই, উলুর ঝিমুনিটা হঠাৎ ভেঙে গেল। দরজা খোলার শব্দ একটা কানে এসেছিল। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। বন্ধ কাচের জানলার ওপারে গঙ্গার জলধারা যেখানে সূর্যকুণ্ডে প্রবলবেগে ঝরে পড়ছে সেখানে মায়াময় জ্যোৎস্না খেলা করছে।

সুইচ অন করতেই উলু দেখল মা ঘরের ভেতর কোথাও নেই। উলু বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। করিডোর পেরিয়ে একেবারে নদীর ধারে এসে দেখল, সুদীপা একুট দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ে রয়েছেন গঙ্গাদেবীর মন্দিরের দিকে।

মা, তুমি এখানে!

সুদীপা বললেন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ জোরালো একটা টর্চের আলো গঙ্গাদেবীর মন্দিরের ওপরের পাহাড়ে দেখলাম। দু'তিনবার আলোটা পাইন বনের ফাঁকে ঝলসে উঠল। আমার কেমন যেন মনে হল, ঋষির টর্চ নয়তো, যেটা তুই ওকে দিয়েছিলি। আমি অমনি বেরিয়ে এলাম। ওটাই তো গোমুখের পথ।

আর একবার ব্রীজের ওপর টর্চটা পড়তেই উলু চেঁচিয়ে উঠল, মা, ঐ তো ঋষি; আমি ওকে ঠিক চিনতে পেরেছি।

চাঁদের আলোয় ব্রীজের দিকে ছুটল উলু। এই তো ঋষি, এই তো এসে গেছে।

ওকে উলু হাত ধরে নিয়ে এল বাংলোতে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন সদানন্দ আর ললিতা। সুদীপা দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওদের তুললেন।

ললিতা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে রইলেন কতক্ষণ। সুদীপা বললেন, ঋষি তুমি স্নানের ঘরে থেকে পোশাক বদল করে এসো। কিছু খেয়ে নাও।

ফেরার পথে সুদীপা গঙ্গোত্রীর বাজার থেকে কিছু পুরী তরকারি আর ফ্লাস্কে গরম চা ভরে এনেছিলেন। সেটা বাংলোতে এসে কেউ আর খেতে পারেননি। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি নেমে আসার জন্যে সবার মনই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। খাবারটা খোলাই হয়নি। এখন সুদীপা প্লাস্টিকের প্লেট বের করে সবার জন্যে খাবার সাজালেন। ঋষির প্লেটে দু'চারটে বেশি পুরীই দিলেন। ফ্লাস্ক থেকে গরম চা বের করে ঢাললেন প্লাস্টিকের গেলাসে।

ঋষি বাথরুম থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এল। সুদীপা তার হাতে খাবার প্লেট ধরিয়ে দিলেন, সঙ্গে গরম চা।

ঋষি খাচ্ছিল। উলু হঠাৎ তার পায়ের দিকে চেয়ে বলল, রক্তের দাগ দেখছি, হোঁচট খেয়েছিস?

সঙ্গে সঙ্গে তুলোয় স্যাভলন ঢেলে ঋষির ঐ চোটলাগা আঙুলে লাগিয়ে দিল। ব্যাণ্ড-এড্ সেঁটে দিল তার ওপর।

এবার খাবার খেতে খেতে সদানন্দ বললেন, তুই এত রাতে কি করে একা ফিরে এলি ঋষি? তুই কি গোমুখে যাসনি? সেই ভদ্রলোকই বা কোথায়?

ঋষি বলল, আমরা চার-পাঁচ কিলোমিটার এগিয়েই হঠাৎ দেখলাম ভদ্রলোকের সেই ছেলে আসছে। ওদিকে প্রবল বৃষ্টি, তাই ওর দেরি হয়েছিল বেরুতে। ছেলে সুস্থই আছে।

ওঁরা কোথায়?

গাঙ্গামাঈর মন্দিরের পাশে পাহারাদারের আস্তানা রয়েছে, ওখানে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাল খুব ভোরে উঠে বাস ধরে উত্তর কাশী পালাবে।

সুদীপা বললেন, তুমি আজ এই দুর্যোগে যে কাজ করলে তা কখনও ভুলতে পারব না। তোমার বন্ধুরা সবাই যেন তোমার মত এ রকম মন পায়।

উলু নিজের প্লেট থেকে একখানা পুরী আর খানিকটা তরকারি ঋষির প্লেটে ঢেলে দিতে দিতে বলল, নে পেটুক, খা। তোর আজকের বীরত্বের প্রাইজটা তোলা রইল।

উলুর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। এখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝলমল।

।। ২ ।।

সুদীপা শেষ রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই বলিষ্ঠ দেহ। বয়সের ছাপ চুলে ছাড়া কোথাও পড়েনি।

সুদীপা কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ বললেন, মনে হচ্ছে চিনতে পারনি আমাকে?

সুদীপা বললেন, খুব কাছের মানুষই তো সব চেয়ে অচেনা থেকে যায়।

উলু কোথায়?

এদিক ওদিক কোথাও রয়েছে।

আমি ওকে দেখতে এসেছি। সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

কোন্‌টা চাও? দেখতে না নিয়ে যেতে? যদি দেখা করতে চাও বসার ঘরে চলে যাও, ও এখুনি আসবে। আর যদি সঙ্গে নিয়ে যাবার মতলব থাকে তাহলে সোজা যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।

ইন্দ্রনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। শেষে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, আসি।

কোন উত্তর দিলেন না সুদীপা। একবার তাকালেন শুধু।

ইন্দ্রনাথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় স্কুল থেকে উলু ফিরল।

তোমার বাবা এসেছিল।

কোথায়?

বললাম তো, তোমার বাবা এসেছিল, চলে গেছে।

একটু বসাতেও পারলে না!

বলেছিলাম, বসল না।

তবে বাবা এসেছিল কেন?

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

এবার চুপ করে গেল উলু। কিছু পরে বলল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা।

হাত মুখ ধোও, খেতে দিচ্ছি।

উলু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে খেতে বসল। সুদীপা পাশে বসে বললেন, বাবার জন্যে মন কেমন করছে?

কোন কথা বলল না উলু। মুখ নীচু করে খেতে লাগল।

ইচ্ছে করলে তুমি দেখা করে আসতে পার, ওর কাজের জায়গার ঠিকানা আমার জানা। বড় হয়েছ, একাই যেতে পারবে।

মাথাটা দু'দিকে নেড়ে নির্বাক উলু জানাল, সে নিজে কখনও দেখা করতে যাবে না।

সুদীপা মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, যত প্রিয়জন হোক্, যত গুরুজন হোক্, আত্মসম্মান তার চেয়েও বড়।

কি বলছ মা? উলু বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে সুদীপার গায়ে ঠেলা দিলে।

সুদীপা চোখ মেলে দেখলেন, সামনে উলু দাঁড়িয়ে। মেঝেতে একফালি নরম মিঠে রোদ লুটিয়ে পড়েছে।

আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল উঠতে। বলতে বলতেই তিনি বিছানা ছাড়লেন।

আমি কিন্তু আগে একবার তোমাকে চায়ের জন্যে ডেকে গেছি। এখন আমি আর ঋষি এক নেপালী সাধুবাবার কুঠি দেখে ফিরছি।

সাধুবাবা?

হ্যাঁ, মস্তবড় সাধু। তবে মৌনী, কারু সঙ্গে কোন কথা বলেন না।

সুদীপা বললেন, দু'বন্ধুতে তাহলে খুব নিরাশ হলে বল? পরীক্ষার আগাম ফলটা জানতে পারলে

না সাধুবাবার কাছ থেকে।

উলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি বুঝি তাই জানতে গিয়েছিলাম মা? তুমি যে কি ভাবো না।

আগের পরিকল্পনা মত সদানন্দ সপরিবারে বেরিয়ে গেলেন হৃষিকেশের উদ্দেশে। গাড়ি ধরে ওঁরা ফিরবেন হৃষিকেশ। সুদীপা আরও একদিন গঙ্গোত্রীতে থাকার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিলেন। তিনি মেয়েকে নিয়ে সরকারি রেস্ট হাউসে থেকে গেলেন। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছ অব্দি উলু ঋষিদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। দুজন দুজনের হাত ধরে দোলাতে দোলাতে চলেছে।

উলু বলল, দূর ভাল্লাগ্‌ছে না।

ঋষি বলল, দেখা না হলেই ভাল হত, কি বলিস?

ঠিক তাই।

এবার কোথাও বেরুবার আগে আমরা দুটো ফ্যামিলি প্ল্যান করে নেব।

আমি মাকে বলব, মা নিশ্চয়ই মত দেবে।

ঋষি বলল, মাসীমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

উলু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, মা তোর সম্বন্ধে কি বলে জানিস? দেশের সব ছেলে যদি ঋষির মত হতো তাহলে দেশটা হয়ে যেত দুনিয়ার সেরা।

আর তোর সম্বন্ধে কিছু বলে না মাসীমা?

মুখে প্রশংসা করতে শুনিনি মাকে। প্রাইজটাইজ নিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে বুকে জড়িয়ে ধরে। কোন কথা বলতে পারে না। এক একদিন বলে, কুঁড়িতেও গন্ধ, ফোটা ফুলেও গন্ধ। কুঁড়িতে গন্ধ থাকে বন্ধ হয়ে আর ফোটা ফুল তার গন্ধ উজাড় করে দেয়। এখন তোমাকে ছড়িয়ে দিতে হবে তোমার শ্রেষ্ঠ গুণ। সময় এসে গেছে।

বাসে উঠে পড়ল সবাই। হাত নাড়তে লাগল দু'বন্ধু, যতক্ষণ না গাড়ি বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্নটা দেখার পর সুদীপার চিন্তায় ইন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে আসতে লাগলেন। এগারোটা বছর সংসার জীবনে দুজনে কাটিয়েছেন একসঙ্গে। একাদশ বিবাহ-বার্ষিকীও উদ্‌যাপন করেছেন দুজনে একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু দ্বাদশ বিবাহ বার্ষিকীটি তাঁদের জীবনে টেনে আনল বিচ্ছেদ।

আদর্শবান হেডমাস্টারের একমাত্র মা-মরা মেয়ে সুদীপা। বাবার সঙ্গে ছায়ার মত থাকত সে। মায়ের অভাব নাকি কখনও দূর করা যায় না। কথাটা নিশ্চয় সত্যি। কিন্তু যাঁরা হেডমাস্টার হেরম্ববাবুকে দেখেছেন তাঁরা বলবেন এত বড় একটা ডিস্ট্রিক্ট কলেজিয়েট স্কুলের গুরুদায়িত্ব নিয়েও তিনি কিভাবে মেয়ের যত্ন নিতেন। গানবাজনা, খেলাধুলো, লেখাপড়া শেখানো থেকে স্বাধীন চিন্তা বিকাশের জন্য সব রকম পরিবেশই তিনি তৈরি করে দিতেন। তাই মেয়ে হল তাঁর স্বাধীনচেতা। লেখাপড়া, গানবাজনা, সব বিষয়েই আদর্শ।

বিয়ের সময় হলো। তখন সুদীপা বিয়ে পাশ করে এম, এ-তে ভর্তি হয়েছে। দেখতে খুবই আকর্ষণীয়া। আচার আচরণে সংযত-শ্রী। হেরম্ববাবুর পরিচিতরা অনেকেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, কিন্তু তিনি সবিনয়ে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করলেন। বিত্তবানেরা বাদ পড়ল। অশিক্ষিত ধনশালীকে তিনি চিরদিনই ঘৃণা করে এসেছেন। বিত্তের জোরে স্কুল কমিটির মেম্বার হয়ে মূর্খ অথচ দাম্ভিকের মত আচরণ করতে দেখেছেন তাদের। আই-এ-এস অফিসার পাত্রের জন্য প্রস্তাব এল। হেরম্ববাবু মত দিতে পারলেন না। তাঁর মেয়ে সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত কিন্তু অত্যন্ত আত্মসচেতন। সেখানে ব্যক্তিত্বের সংঘাত আসবে। তাছাড়া তাদের চলাফেরা যে সমাজে সেখানকার আচার-আচরণের সঙ্গে মিলবে না তাঁর মেয়ের এতদিনের জীবন-যাপন পদ্ধতি।

এইভাবে বর্তমান সমাজের আকাঙ্ক্ষিত বহু পাত্রকে তিনি মেয়ের জীবনসঙ্গী-রূপে মনোনীত করতে পারলেন না।

শেষে একদিন পাত্র নিজেই হাজির হলো হেরম্ববাবুর সামনে।

আমি ইন্দ্রনাথ।

স্কুল থেকে ফিরে হেরম্ববাবু নিজের কোয়ার্টারে আসছিলেন। গেটের ভেতর ঢুকেই দেখলেন সামনের বাগানে পায়চারি করছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক।

আজকাল চোখে স্পষ্ট দেখতে পান না হেরম্ববাবু। ছানি অনেকখানি এগিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কে?

আমি ইন্দ্রনাথ। বলতে বলতেই ইন্দ্রনাথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে হেরম্ববাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সামান্য সময় থমকে দাঁড়িয়ে স্মৃতির পাতা থেকে ইন্দ্রনাথকে বের করলেন।

আরে এসো এসো, কখন এলে?

খানিকক্ষণ আগে।

দীপা কি জানে, তুমি এসেছ?

হ্যাঁ, সুদীপাই গেট খুলে দিয়েছে।

হেরম্ববাবু মুখে বললেন, এসো।

বারান্দায় উঠে বললেন, বস এখানে, আমি এখুনি আসছি।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলেন, একি আচরণ দীপার! দেখেছে, চেনে, দরজা খুলে দিয়েছে, অথচ বসতে বলেনি!

ভেতরের ঘরে মুখোমুখি হলেন দীপার।

তুমি ইন্দ্রকে বসতে বলনি মা?

মৃদু হেসে দীপা বলল, আজকাল দেখছি আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস কমে আসছে।

লজ্জিত হলেন হেরম্ববাবু।

আমারই ভাবনার ভুল হলো মা।

হেরম্ববাবু জামাখানা খুললেন। সুদীপা বাবার জামা হাতে নিয়ে আলনায় হ্যাঙারে রেখে দিল। তারপর এগিয়ে এসে নিজেই হেরম্ববাবুর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে টেবিলে রাখল।

হেরম্ববাবু স্নানের ঘরে ঢুকে মুখে চোখে ভাল করে জল দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আসা মাত্রই সুদীপা তাঁর চোখে পরিয়ে দিল চশমা।

বলল, জামা পরে কাজ নেই বাবা। তুমি গেঞ্জি পরেই চলে যাও। আমি ওখানেই তোমাদের খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

হেরম্ববাবু বাইরে এসে দেখলেন, ইন্দ্রনাথ তখনও বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এসো, বস আমার পাশে।

ইন্দ্রনাথ সংকুচিত হচ্ছিল। হেরম্ববাবু জোরের সঙ্গে বললেন, এখন তুমি আমার ছাত্র নও ইন্দ্র, তুমি আমার মতই একজন শিক্ষক।

আমি চিরদিনই আপনার ছাত্র থাকব মাস্টারমশাই।

ইন্দ্র এবার একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে একটু দূরে বসল।

তোমাদের স্কুলের খবর বল। এ বছর পাশের হার কি রকম? তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট?

আমি এ বছরই হেডমাস্টার হিসেবে স্কুলের দায়িত্ব পেয়েছি।

খুব আনন্দের খবর। দীপা, দীপা, শুনে যা, তোর ইন্দ্রদা হেডমাস্টার হয়েছে।

দীপা জানে মাস্টারমশাই।

কি রকম? ও জানল কি করে?

পরক্ষণেই বললেন, বুঝেছি বুঝেছি। আমার আসার আগেই তোমার মুখ থেকে খবরটা শুনেছে।

ইন্দ্রনাথ সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার উত্তর দিচ্ছি। এবার আমাদের স্কুল থেকে পাঠান হয়েছিল একুশজনকে। সবাই পাশ করেছে। প্রথম বিভাগে পনের। দ্বিতীয় বিভাগে বাকি সব। একটি স্টার মার্ক পেয়েছে।

হেরম্ববাবু বললেন, হেডমাস্টার হিসেবে তুমি দায়িত্ব পেলে আর সঙ্গে সঙ্গে এই রেজাল্ট! তোমার এই বছরটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিন।

একটু থেমে বললেন, গভর্নিংবডির মেম্বাররা কেমন?

ইন্দ্রনাথ বলল, সবাই ছড়ি ঘোরাতে চান। নিজেদের ভেতরে দলাদলি।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুদীপা দু'থালা খাবার এনে রাখল টেবিলে। দু'গ্লাস জল আনল ভেতর থেকে। পাশে পড়ে থাকা চেয়ারখানা খাবার টেবিলের সামনে রেখে বলল, আসুন ইন্দ্রদা, বাবার মুখোমুখি বসুন। চায়ের সময় হয়ে গেছে।

এখন ইন্দ্রকে মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি বসতে হল।

তুইও বোস দীপা, অনেককাল পরে ইন্দ্র এলো।

আমি চাটা নিয়ে এসে একেবারে বসব! তোমরা খেতে খেতে ততক্ষণ গল্প কর।

এক সময় ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে ঢুকল সুদীপা। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্র আর হেরম্ববাবুর হাতে দু'কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে একটা মোড়ার ওপর বসল।

হেরম্ববাবু বললেন, মনে আছে ইন্দ্র তুমি মাঝে মাঝে বোর্ডিং থেকে এসে দীপাকে অঙ্ক কষাতে?

ইন্দ্রনাথ হেসে বলল, দীপার কিন্তু অঙ্ক একটুও ভাল লাগত না।

সুদীপা বলল, তা কেন হবে ইন্দ্রদা। কেবল আমি জিওমেট্রিটা আয়ত্ব করতে পারতাম না। আচ্ছা, তুমি ঠিক করে বল, এরেথমেটিকের অঙ্কগুলো আমার প্রায় রাইট হত কিনা?

ইন্দ্র বলল, মনে আছে দীপা, যেদিন তেল মাখানো বাঁশে বানরের ওঠানামা নিয়ে অঙ্কটা কষতে বসলাম সেদিন তুমি তো হেসেই গড়ালে।

আহা বেচারার জন্যে দুঃখ হয় এখন। একটু একটু কত পরিশ্রম করে উঠছে কিন্তু স্লীপ করে আবার নেমে আসছে কতখানি। মাঠে মারা যাচ্ছে বেচারার পরিশ্রম।

হেরম্ববাবু দার্শনিকের মত বললেন, তাই হয়, সফলতার শীর্ষে উঠতে হলে অনেক পতন উত্থান পেরিয়ে যেতে হয়।

একটু থেমে আবার বললেন, ইন্দ্র, তুমি আমার স্কুলের ফার্স্ট বয়ই শুধু ছিলে না, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ করেছ। তাই তোমার কথা বিশেষভাবে অমার মনে আছে!

মাস্টারমশাই, এম, এ, পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের পর আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম। সেও ক'বছর হয়ে গেল।

তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?

দু'বছর হল তিনি মারা গেছেন।

একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। হেরম্ববাবু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন। গ্রাম্য মানুষ, হাঁটুর ওপর মোটা ধুতি, কথাবার্তায় চেষ্টাকৃত বাঁধুনি নেই, কিন্তু নির্ভেজাল খাঁটি মানুষ। এ যুগে এসব মানুষ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে আসছে।

দীপা বলল, আমার বেশ মনে আছে, উনি একবার আমার জন্যে ওঁর বাড়ির গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে এনেছিলেন। দারুণ মিষ্টি পেয়ারাগুলো।

ইন্দ্র বলল, এখনও সে গাছটা ফল দিচ্ছে। তেমনি মিষ্টি।

হেরম্ববাবু বললেন, কলকাতায় নিশ্চয় বাসা করে আছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশায়। তবে দেশের বাড়িটা ছাড়িনি।

ছাড়বে কেন? গ্রামের এক টুকরো জায়গার ওপর দিয়েও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বয়ে যায়। বুক ভরে এখনও প্রাণবায়ু টানা যায়। তাছাড়া সবুজের দিকে তাকালে চোখ জুড়োয়। পুকুরে নাইলে সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

এরপর কিছু সময় চুপচাপ থেকে হেরম্ববাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলেন, বৌমাকে ঘরে এনেছ?

হঠাৎ একটা জরুরী কাজের অছিলায় ভেতরে উঠে গেল সুদীপা। যাবার সময় খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপ ট্রেতে তুলতে তুলতেই শুনতে পেল, এতদিন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিকে তাকাবার

ফুরসুৎ ছিল না, এখন অবশ্য কিছুটা গুছিয়ে বসেছি।

হেরম্ববাবু বললেন, মা নেই, স্ত্রী নেই, সংসার চালাবে কে? এবার বিয়ে থা কর। সংসারে শ্রী আসুক।

ইন্দ্রনাথ চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে রইল।

সুদীপা ভেতরের ঘরে বসে একটা পর্দা সেলাই-এর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু জানলার ভেতর দিয়ে ভেসে এল বাবা আর ইন্দ্রদার কথা।

হেরম্ববাবু বললেন, ম্যাথমেটিক্সে তুমি তো ফার্স্টক্লাশ পেয়েছিলে, কোন কলেজে অ্যাপ্লাই করলে না কেন?

আমি সে সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের ইউনিভারসিটির হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনিই একটা কলেজে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক ভাবলাম। মনে হল, যদি স্কুলে থেকেই ছেলেদের ভাল করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ওরা অনেক বেশি সফল হতে পারবে। তাই কলেজের মোহ ছেড়ে স্কুলেই থেকে গেলাম মাস্টারমশাই। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। হিস্ট্রিতে আপনিও তো ফার্স্টক্লাশ।

সেলাই থেমে গেল সুদীপার। ইন্দ্রনাথকে সে যেন আজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করল।

সে রাতে হেরম্ববাবুর অনুরোধে ইন্দ্রনাথ থেকে গেল সুদীপাদের বাড়িতে। জ্যোৎস্নারাতে সামনেব বাগানে ঘুরতে ঘুরতে টুকরো কথায় নিজেদের মন মেলে ধরল সুদীপা আর ইন্দ্রনাথ।

এর চার মাস পরে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সুদীপা এল ইন্দ্রনাথের সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। বিয়ের ক'মাস পরেই সে বাবার সাবজেক্টে এম, এ, পরীক্ষা দিলে, কিন্তু আশানুরূপ ফল হলো না। না হোক্, ইন্দ্রনাথের মত সে স্কুলেই কাজ করবে। আর পেয়ে গেলেও একটা চাকরি।

দু'বছরের ভেতর উলু ভূমিষ্ঠ হল। সুদীপার চাকরির জায়গাটা ছিল ইন্দ্রনাথের ডেরা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তাই সুদীপার স্কুলের কাছাকাছিই সুদীপার নামে নেওয়া হল নতুন বাসা। ইন্দ্রনাথ তার পুরনো বাসা ছেড়ে দিলে।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল একটা সুন্দর সুখী সংসার।

স্কুলকে নিজের চেষ্টায় আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করল ইন্দ্রনাথ চৌধুরী। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

পাবলিশাররা এগিয়ে এল তার অঙ্কের বই ছাপার জন্যে। বিশেষ এক পাবলিশার আগাম অনেকগুলো টাকাও দিলে।

পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারটা এতদিন ইন্দ্রনাথের ভাবনার বাইরে ছিল। এখন গভীরভাবে সেটাতেই মনঃসংযোগ করল সে।

ছাপা হল বই। নামজাদা পাবলিশার। সারা বাংলাদেশের স্কুলে স্কুলে বই-এর ক্যানভাসিং চলল। কয়েক হাজার টাকা প্রথম বছরেই রয়ালটি মিলল।

নেশা ধরে গেল ইন্দ্রনাথের। ছোট থেকে বড় ক্লাশের বই লেখা শুরু হয়ে গেল। এখন ইস্কুল আব ধ্যানজ্ঞান নয়। নতুন নতুন পুস্তক রচনাতেই সময় চলে যায়। টাকাও আসছে আশাতীত।

ইন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সুদীপা। তার মনে হলো, ইন্দ্রনাথের এতদিনের সাধনায় কোথায় যেন তালভঙ্গ হচ্ছে। হেড মাস্টারের তীক্ষ্ণ নজর এখন আর স্কুলের প্রতিদিনের কাজকর্মের ভেতর নেই। এখন তার নিজের কোয়ার্টারেই বসছে প্রতিদিনের ইন্দ্রসভা। প্রকাশকেরা ঘিরে রয়েছে তাকে। যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান এখন বড় আকারে করতে হয়। তাতে সুদীপা আর ইন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গজন ছাড়া উপস্থিত থাকে পাবলিশার মহলের অনেকেই।

ইন্দ্রনাথের হেডমাস্টার জীবনের প্রথম আঘাত এল, যেদিন স্কুলের রেজাল্টে দেখা গেল, তিরিশজনের ভেতর সাতজন ফেল। তিনজন মাত্র ফার্স্ট ডিভিসনে গেছে।

ইন্দ্রনাথ স্কুল থেকে ফিরতেই সুদীপা বলল, বেশ মুষড়ে পড়েছ মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার?

ইন্দ্রনাথ হেসে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসির ঐটুকু আলোতে মুখের গ্লানি ঘুচল না।

আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, বল কি হয়েছে?

এবার নিজেকে চেপে রাখতে পারল না ইন্দ্রনাথ। বলতে হল, রেজাল্ট খুবই খারাপ।

এরপর কোন মন্তব্য এল না সুদীপার দিক থেকে। শুধু বলল, সারাদিন পরে এলে, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চোখে মুখে জল দিয়ে এসো, আমি খাবার আনছি।

উলু ফেরে নি?

এখনও ওর বাস এসে পৌঁছয়নি।

দুজনের খাবার নিয়ে বসল সুদীপা। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। ইন্দ্রনাথ বলল, কো-এড়ুকেশানে না দিয়ে মেয়েটাকে তোমার স্কুলে রাখলেই ভাল হত।

ওসব চিন্তাধারা একেবারে বাতিল করা দরকার। ছেলে মেয়েদের ভেতর সুস্থ সম্বন্ধ গড়ে উঠুক, এটাই আমরা চাইব।

ইন্দ্রনাথ বলল, কু-ফলও তো দেখছি অনেক।

সে তো হতেই পারে। তাবলে সুস্থ, প্রগতিশীল একটা পরিকল্পনাকে তো বাতিল করা যায় না।

উলুর গাড়ির শব্দ ভেসে এল। খাবার রেখে হাতে একটুখানি জল ছুঁইয়ে সুদীপা দরজা পেরিয়ে মেয়েকে আনতে গেল।

স্কুল বাস থেকে নেমে মেয়ে ছুটে এল। সুদীপা দেখল, মেয়ে চোখ মুছছে।

কি হলো তোমার মা?

আমি জানালার ধারে বসব বলে আগে বাসে উঠতে গিয়েছিলাম, আন্টি হাত ধরে টেনে নামিয়ে দিলেন।

তুমি লাইন ভেঙে গিয়েছ নিশ্চয়ই?

বারে, রোজ লাইনে থাকি, কোনদিন জানলার ধারে বসতে পাই না। আমার বুঝি ইচ্ছে করে না।

সুদীপা কাছে থেকে উলুকে জামা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে সাহায্য করল। বেড়ানোর পোশাক পরিয়ে দিয়ে বলল, বাবার কাছে যাও, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

সুদীপা এসে শুনতে পেল, বাবার কাছে আন্টির বিরুদ্ধে মেয়ের নালিশ হচ্ছে। বুঝলো, হাত ধরে টেনে নামানোর অপমান মেয়ে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সুদীপা বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও উলু, আমরা আজ বেড়াতে যাব।

সুদীপা নিজের খাবার খেতে লাগল।

ইন্দ্রনাথ বলল, জানো, ওর, আন্টি ওকে কি বলেছে!

সুদীপা শুধু তাকাল।

বাবা মা তোমাকে এ রকম শিক্ষা দিয়েছে বুঝি?

সুদীপা চোখের ইঙ্গিতে ইন্দ্রনাথকে চুপ করতে বলল। নিজের খাবারটা খেয়ে নিয়ে উলুকে বলল, তোমারও তো দেখছি খাওয়া শেষ। হাত মুখ ধুয়ে মুছে রেডি হয়ে নাও।

উলু উঠে গেল। সুদীপা বলল, আন্টির বিরুদ্ধে ওর স্বপক্ষে কোন কিছু বোল না। ওর মনের ভেতর আন্টিদের সম্বন্ধে গভীর অশ্রদ্ধা এসে যাবে।

ইন্দ্রনাথ তখনও উত্তেজিত। বলল, আমরা শিক্ষকতা করছি, কিন্তু জানি না কেমন করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

সুদীপা অনুত্তেজিত গলায় বলল, অনেকেই হয়ত সাংসারিক নানা ঝামেলায় সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। তাই বলে সবাই রূঢ় ব্যবহার করেন, এমন নয়। আচ্ছা, এ কথা এখন থাক, চল না আমরা আজ সন্ধ্যায় ওকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আনি। ট্যাক্সি, নেব, ও বসবে জানালার ধারে। খুশিতে বকবক করবে। রেড রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি যখন যাবে তখন হু হু করে বাতাস বইবে, উলুর চুলগুলো উড়বে। দেখতে ভাবী ভাল লাগবে।

আমার একুটও সময় হবে না আজ। এক নতুন পরিকল্পনার ব্যাপারে বেঙ্গল বুক হাউসের মালিক আসতে পারেন।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার নতুন বই-এর প্রুফগুলো দেখে ফেলেছ?
স্কুলে বসেই দেখেছি। দুটো ক্লাশ ছিল, নিতে পারিনি। অন্যকে দিয়ে ম্যানেজ করেছি।
সুদীপা বলল, তোমার স্কুলের রেজাল্ট পর পর খারাপ হয়ে যাবার কারণ এটাই।
কি বললে?
আমি কি খুব আস্তে কথাগুলো বললাম।
তুমি মনে কর আজকাল আমি স্কুলের কাজে ফাঁকি দিচ্ছি, তাই এ রেজাল্ট ?
নিজেকে প্রশ্ন কর, উত্তর পাবে।
উলু এসে গেল। সুদীপা তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল।
পেছন থেকে ইন্দ্রনাথের গলা শোনা গেল, রাতেভিতে ট্যাক্সিতে একা একা ঘোরার গোঁয়ার্তুমি কোর না।
কোন উত্তর না দিয়েই সুদীপা চলে গেল।
ট্রামেই মেয়েকে নিয়ে ঘুরে আসবে। জানালার ধারে আজ বসিয়ে নিয়ে যেতে হবে মেয়েটাকে। বড্ড আঘাত লেগেছে কোমল মনে।
টার্মিনাসে গিয়ে ট্রামে উঠল সুদীপা। বসল দুজনের সিটে। জানালার ধারে বসে সত্যিই খুশি হয়ে উঠল উলু। রাতের কলকাতা আলোর মালা গেঁথে, দোকান পসার সাজিয়ে, পোশাক আশাক পরা লোকজনকে দ্রুত হাঁটিয়ে এক অপরূপ উৎসবের মিছিল বের করেছে।
হু হু হাওয়া, আলো, গাছপালা, ফাঁকা মাঠ, মানুষজন উপভোগ করতে করতে ঐ গাড়িতেই ফিরল সুদীপা মেয়েকে নিয়ে।
খেতে বসে ইন্দ্রনাথ বলল, ভাগ্যিস যাইনি, খুব বড় একটা প্ল্যান তাহলে আমার হাতছাড়া হয়ে যেত।
সুদীপা ও বিষয়ে একেবারে নীরব। বলল, আর খানিকটা ডালনা দেব?
থাক্। প্ল্যানটা কি জানো, খুব কনফিডেনসিয়াল কিন্তু। বান্ধবীদের কাউকে যেন বলে বস না।
বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না সুদীপা, চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল।
দেয়ালও যাতে না শুনতে পায় এমনি সাবধানতা অবলম্বন করে ইন্দ্রনাথ রাজহাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে বলল, শিক্ষক সংসদ যে টেস্টপেপার বাজারে ছাড়ে তার চাহিদা কি পরিমাণ, সে কথা নিশ্চয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখন ঐ টেস্টপেপারের সব খরচ খরচা আগাম শিক্ষক সংসদকে দেয় বেঙ্গল বুক হাউস।
থামল ইন্দ্রনাথ। এর পরের কথাগুলো কিভাবে গুছিয়ে বলবে তাই ভাবতে লাগল।
সুদীপা প্রথম কথা বলল, বিনা উদ্দেশ্যে বেঙ্গল বুক হাউস এতগুলো টাকা আগাম দিচ্ছে?
উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে।
কি রকম?
টেস্টপেপার ডিস্ট্রিবিউশানের পুরো ভারটা নিজেরা নিয়ে নেয়। এতে নিজেদের দাদন দেওয়া টাকাটা উঠে আসে, কিছু কমিশানও পায়।
সুদীপা বলল, তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এতে তোমার ভূমিকা কি থাকতে পারে?
ওরা ঐ টেস্টপেপারের প্রতিটি বিষয়েরই উত্তরপত্র বের করে। প্রতি বছর এমনি অনেকগুলো উত্তরপত্র বের হয়। এখন থেকে অঙ্ক আর ভূগোলের আনসারগুলো আমার ওপর করে দেবার দায়িত্ব পড়ল। লাভ যথেষ্ট কিন্তু নাওয়া খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।
তুমিও তাহলে জড়িয়ে পড়লে ঐ চক্রের ভেতর?
আমার ভূমিকা পরিষ্কার। প্রতি বছর দুটো উত্তর পত্রের বই লিখব, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাব একটা মোটা টাকা।
সুদীপা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তুমি ভাল করেই জান, ঐ প্রকাশক কিভাবে উত্তরের বইগুলো বিক্রি করে। চার টাকার চটি বই-এর দাম করে বার চোদ্দ টাকা। একখানা টেস্টপেপারের জন্যে যখন

অভিভাবকরা হন্যে হয়ে ঘোরেন তখন তাঁদের এক একখানা টেস্টপেপারের পিছনে দু'চারখানা আকাশ ছোঁয়া দামের ভুলে ভরা উত্তরপত্র কিনতে হয়।

তাতে আমার অন্যায়টা কোথায় দেখলে?

সুদীপা বলল, যে প্রতিষ্ঠানের ভেতর অন্যায় আছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অন্যায়েরই সামিল।

হো হো করে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, এরপর চোর ডাকাতের ছেলেরা পড়াশুনো করতে চাইলে তাদের অ্যাডমিশান দেওয়া হবে না। চিকিৎসার জন্য সুদখোর এলে তার চিকিৎসার সুযোগও মিলবে না।

এই ধরনের উদাহরণ দিয়ে তুমি যদি নিজেকে দায়মুক্ত মনে কর তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে নিজের বিবেকের কাছে একদিন তোমাকে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে।

সুদীপার কোন কথাই রাখতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। সে দুটো আনসার পেপারই তুলে দিয়েছে বেঙ্গল বুক হাউসের হাতে। না দিয়ে উপায়ও ছিল না তার। প্রকাশক একটি ভয়ঙ্কর প্রলোভনে ভরা টোপ তার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সরকারে তদ্বির করে এ বছর জাতীয় শিক্ষকের সম্মান তাকে এনে দেওয়া হবে।

এ সংবাদে যে কোন স্ত্রীরই খুশি হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু সুদীপার সৃষ্টি অন্য ধাতুতে। সে বলল, প্রথমতঃ ঐ টেস্টপেপার সংক্রান্ত টাকা আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান এনে দেবার জন্যে যারা নাওয়া খাওয়া ভুলে তদ্বির করছে তাদের পায়ের ধুলো যেন আমার বাড়িতে না পড়ে।

ক্ষেপে গেল ইন্দ্রনাথ।

বল, কোন্ মানুষটি সামান্যতম তদ্বির না করেই জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন? তাঁরা যদি থেকেও থাকেন তবে কোটিতে এক।

সুদীপা বলল, তোমার অনুমান সত্য বলেই ধরে নিচ্ছি। সম্মানের লোভে যে মানুষ অনেক নীচে নামতে পারে তাও আমার অজানা নয়। আর এতসব মেনে নিয়েও একটি কথা বলার আছে, তদ্বিরের পুরস্কার পেয়ে সে পুরস্কার রাখবে কোথায়। নিজের মন, বিবেক, কেউই তাকে স্থান দেবে না।

আমার সম্মানপ্রাপ্তির ব্যাপারে তুমি ঈর্ষায় কাতর হচ্ছ দীপা।

ঈর্ষায় নয়, লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছি।

লজ্জা! লজ্জা কেন?

সম্মান, খেতাব, পুরস্কার, সবই তদ্বির করে পেতে হয়। এর চেয়ে দুঃখের, লজ্জার, আত্মগ্লানির আর কি থাকতে পারে। সম্মান পাওয়ার পর সবাই তোমার জয়ধ্বনি দেবে, কিন্তু আমি তো মনে মনে জানি কতবড় গ্লানির পাহাড় চেপে বসবে বুকের ওপর।

ক্ষেপে গেল ইন্দ্রনাথ। সে সুদীপার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত হানল।

দেখ, তোমার বাবার এ মান্ধাতার যুগের আদর্শগুলো এখন একেবারে অচল।

দোহাই তোমার আমাকে যা খুশি তাই বল, কিন্তু যিনি গত হয়েছেন তাঁকে আমাদের তুচ্ছ পারিবারিক ব্যাপারে টেনে এনো না।

এবারের বিবাহ-বার্ষিকী নতুন তাৎপর্য পেল। সুদীপা, তার দিকে থেকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দু'চারজনকে মাত্র নিমন্ত্রণ জানাল। অন্যদিকে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ল ইন্দ্রনাথের। সে এখন শিক্ষক সংসদের অন্যতম প্রধান।

মানুষজন এলেই তাদের আপ্যায়ন গৃহকর্ত্রীর ধর্ম। সুদীপা ইন্দ্রনাথের বন্ধুদের সাধ্যমত তদারকি করতে লাগল। সামনের উঠোনে ফুলের টবের চারদিক ঘিরে চেয়ার পাতা হয়েছে। কানে আসছে প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক সমিতি সম্বন্ধে নানা রকম কুৎসা। তাদের চূর্ণ করার বহুবিধ পরিকল্পনা। ইন্দ্রনাথকে বার্ষিক সম্মেলনে পরবর্তী সেক্রেটারী করার কলাকৌশল।

সুদীপা প্লেট সাজিয়ে এনে ধরিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকের হাতে।

ললিত সেন হাতে প্লেটখানা নিয়েই বলে উঠলেন, বৌঠান, আর ক' দিন পরে কিন্তু হাতে প্লেট ধরে খাব না, পাত পেড়ে খাব।

পাশে বসে যাঁরা শুনতে পেলেন তাঁরা ললিত সেনকে সমর্থন করে হেসে উঠলেন। একটু দূরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা কি হলো, কি হলো বলে হাসির কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুদীপা ঘরের ভেতর ঢুকে একটু থমকে দাঁড়াল। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী, কেউ তো তা নিয়ে কোন সুন্দর মন্তব্য করছেন না।

কেবল ইন্দ্রনাথের স্কুলের তরুণ ইংরাজীর শিক্ষকটি একগুচ্ছ হলদে গোলাপ আর রবীন্দ্রনাথের পুষ্পিত বসন্তের মাদকতায় ভরা 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটি সুদীপার হাতে দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর কি রকম লাজুক চোখ-মুখ করে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল উঠোনের পাশের বাগানটায়।

সুদীপা জানালা দিয়ে দেখল, সেই তরুণ শিক্ষক অনির্বাণ এখন উলুকে প্রজাপতি ধরার খেলায় সাহায্য করছে।

সুদীপা সাজানো প্লেটের থেকে একটা তুলে নিয়ে পেছনের দরজা খুলে অর্নিবাণের দিকে এগিয়ে গেল। তার মনে হল, একমাত্র অনির্বাণই আজকের দিনটির মর্যাদা রেখেছে। সে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি।

কতকগুলি স্বার্থসন্ধানী মানুষের কোলাহল এক সময় স্তিমিত হয়ে এল। সুদীপা এতক্ষণ শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথকে। সেই আদর্শবান মানুষটা কিভাবে স্বার্থের চক্রে জড়িয়ে পড়ছে। সে আর কোনদিন মুক্তি পাবে না। মুক্তি চায়ও না।

সবাই চলে গেলেন ইন্দ্রনাথের উষ্ণ অভ্যর্থনার ভেতর দিয়ে। এরপর ইন্দ্রনাথ ঢুকল তার অফিস কাম স্টাডি রুমে। একবারও সুদীপার কাছে এল না। একগাদা প্রুফ দেখার ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল জানালার বাইরে গেটের দিকে।

সুদীপা পাশে বসে উলুকে রাতের খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে রাজকাহিনীর গল্প বলতে লাগল।

কিছু পরেই, আরে আসুন, আসুন, আওয়াজ তুলে ঘর থেকে গেটের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। সুদীপা তাকিয়ে দেখল, বেঙ্গল বুক হাইসের সেই মানুষটি।

পেছনের আলো আঁধারিতে মনে হলো, একটা লোক মাথায় কি যেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কি ওতে? ইন্দ্রনাথের কৌতূহলী গলা শোনা গেল।

সুদীপা দেবী কোথায়? তাঁর জন্যে বিশেষ করে এই উপহারটুকু এনেছি।

সুদীপা তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকাল। লোকটি এখন এগিয়ে এসেছে। আলো পড়েছে তার মাথায় ধরে রাখা বস্তুটার ওপর। প্ল্যাস্টিকে জড়ানো একটা টি-ভি সেট বলে মনে হচ্ছে।

সুদীপার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। যে ঘরে পড়ুয়া অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা রয়েছে, সে বাড়িতে টি-ভি রাখার ঘোরতর বিপক্ষে সুদীপা। শুধু পড়া নয়, টি-ভি দেখতে দেখতে নানা জিনিসই হারানোর সম্ভাবনা। সে তার কলিগদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই নানা ধরনের রিপোর্ট পেয়েছে। পরীক্ষার সাতদিন বাকি, মা বাবার ছেলের জন্যে উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেব জেদ, সে 'চিত্রহার' দেখবেই। মা জোর করে টি-ভি বন্ধ করে দিলে ছেলে মাকে ঠেলে সরিয়ে সুইচ অন করল।

এ তো বহু ঘটনার একটি। সন্ধ্যার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর তরুণ বয়স্কদের জন্য নানারকম অনুষ্ঠান। অনেক সময় শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্যও। কিন্তু তখন তো ছেলেমেয়েদের পড়া তৈরির সময়, তাহলে?

এবার ইন্দ্রনাথই এগিয়ে আগাম জানান দিল, দেখ, ভুবনেশ্বরবাবু তোমার জন্যে, মানে এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কি এনেছেন।

সুদীপার মনে হলো, সেটটা সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ দেয়। কিন্তু না, নিজের ক্ষোভকে সংযত করল সে। এটা তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আসল প্রাপক ইন্দ্রনাথ। তাকে হাতে রাখার জন্যেই এই দামী কালার টি-ভি-টি এতদূর বয়ে আনা হয়েছে।

সুদীপার সামনেই টেবিলের ওপর রাখা হলো সেটটি। ভুবনেশ্বরবাবু যেন কিছু বলছিলেন, মৃদু মৃদু হাসছিলেন তার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না সুদীপা। ক্ষোভ প্রকাশের অক্ষমতা তার কানের ভেতর ভোমরার মত বন বন করছিল।

সে অত্যন্ত সংযতভাবে বলল, বসুন, আপনার খাবার আনছি।

ভেতর থেকে খাবার নিয়ে এসে টেবিলে পরিবেশন করল। মাঝে মাঝে কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করল। চপের প্রশংসা করতে আরও দু'খানা চপ ভেতর থেকে এনে দিল।

আমাকেও এখানেই ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে দিয়ে দাও। রাত হয়েছে।

প্রতিটি বিবাহ-বার্ষিকীতে ইন্দ্রনাথ সুদীপার সঙ্গে বসেই খায়। এই দিনটিতে দুজনের স্মৃতির ফুল তুলে তুলে মালা গাঁথা যেন শেষই হতে চায় না। কিন্তু আজই তাঁর ব্যতিক্রম ঘটল।

সুদীপাকেও লেখার কাজে নামাবে, এ রকম একটা একতরফা আশ্বাস ছুঁড়ে দিয়ে ভুবনেশ্বরবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! দু'একবার নতুন টি-ভির গায়ে হাত বুলিয়ে ইন্দ্রনাথ হাই তুলল। ঘুম পাবারই কথা। সারাদিন বন্ধুদের আপ্যায়নে এবং গভীব সব আলোচনায় গেছে। তারপর চলে যাবার সময় ভুবনেশ্বরবাবু বলে গেছেন জাতীয় শিক্ষকের সম্মান তিনি তার জন্যে এনে দেবেনই। যারা বলছেন এখনও ইন্দ্রনাথ প্রবীণের দলে পড়েনি, সুতরাং এ সম্মান এত তাড়াতাড়ি কেন? তার উত্তরও তাঁদের দিয়েছেন ভুবনেশ্বরবাবু। প্রবীণতাই জাতীয় সম্মান প্রাপ্তির মাপকাঠি নয়। একজনের কর্মদক্ষতা, শিক্ষাদানের যোগ্যতা, দেশের তরুণ কিশোরদের গড়ে তোলার জন্য আত্মনিবেদন, সব মিলিয়ে তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন। সে সব গুণের প্রতিটিই একটু বেশি পরিমাণে আছে না কি ইন্দ্রনাথের ভেতর? তাহলে সম্মানে ভূষিত হতে তাঁর বাধাটা কোথায়?

এই সব নানা উত্তেজক চিন্তায় ভারাক্রান্ত মাথাটাকে ঘুমের ভেতর সঁপে দিতে চাইল ইন্দ্রনাথ।

রাত ভোর হলে ইন্দ্রনাথ জেগে উঠে অবাক হয়ে গেল। সুদীপা তার স্যুটকেশ, বেডিং প্রায় গুছিয়ে ফেলেছে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ, হচ্ছেটা কি?

ততোধিক অনুত্তেজিত গলায় সুদীপা বলল, চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

যেখানে আত্মসম্মান বজায় রেখে থাকা যাবে, সেখানে।

জায়গাটা কোথায় শুনি?

সে উত্তর আগেই দিয়েছি, আর কিছু বলার নেই।

দেখছি বংশগত পাগলামি রয়েছে তোমার মাথায়।

এরপর আর কোন কথার জবাব দেবার প্রবৃত্তি হলো না সুদীপার। সে ঘরেব ভেতর থেকে উলুর হাত ধরে নিয়ে এসে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও উলু, আমি গাড়ি ডেকে আনছি।

উলু আমার মেয়ে, আমি ওকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

এবার সুদীপা কঠিন গলায় বলল, তুমি কি কোর্টকাচারি করতে সত্যিই চাও? তাতে তোমার শত্রুপক্ষেরই সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি। জাতীয় সম্মানপ্রাপ্তির পথটা অত সুগম হবে না।

একটু কি ভেবে নিল ইন্দ্রনাথ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ বাসাটা আমার নয়, তোমার। সুতরাং আমিই সরে যাচ্ছি। মেয়েকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর কতকগুলো সংস্কারের চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাক এখানে।

চলে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। সুদীপা বলল, তোমার জিনিসপত্র, এই উপহার, সব নিয়ে যাও এখান থেকে। আর ইচ্ছে করলে পাঠিয়ে দিও বিচ্ছেদ-পত্র, আমি সই করে তোমাকে মুক্তি দেব।

সেই থেকে ছ'বছর হলো এই বাসাতেই সুখে-দুঃখে কাটিয়ে যাচ্ছে মা আর মেয়ে। স্বাধীন অথচ সংযত চিন্তার বিকাশ যাতে ঘটে মেয়ের মধ্যে সেই চেষ্টাই নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে সুদীপা।

ছ'বছরের ভেতর ইন্দ্রনাথ একটিবারের জন্যেও মেয়েকে দেখতে আসেনি। হয়ত অভিমান, হয়ত বা সুদীপার কাছে হেরে যাবার ভয়। নারীর কাছে পৌরুষ হারানোর ভয়।

কেবল ক্ষীণ একটি সুতোর সংযোগ রয়েছে এখনও। উলুর জন্মতিথিটি কখনও ভোলে না ইন্দ্রনাথ। ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় কিছু উপহার।

হঠাৎ পাওয়া উপহারে খুশি হয়ে ওঠে উলু, আবার ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকায়।

সুদীপা বলে, ইচ্ছে হলে তুমি নিশ্চয়ই নিতে পার। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যেমনই হোক্, ভুলে যেও না তুমি ইন্দ্রনাথ চৌধুরীরই মেয়ে।

উলু বাবার দেওয়া উপহারগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চোখ দুটো উদ্গত অশ্রুতে ভিজে ওঠে।

।।৩।।

কলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়ছে উলু। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ এখন বেশ নামকরা ছাত্র রাজর্ষি বোস। কিন্তু স্কুলের সেই আনন্দ মুহূর্তগুলো মুছে যায়নি দুজনের মন থেকে। দু'টি পরিবার এখন অনেক ঘনিষ্ঠ। সদানন্দবাবু সপরিবারে যখন দেশের বাড়িতে যান তখন তাঁদের সঙ্গে যান সুদীপা আর উলু। আনন্দ-ভ্রমণে সবাই তখন এক হয়ে মিশে যান।

প্রায় প্রতি রবিবার সুদীপার ডাইনিং হলে একটি চেয়ার অধিকার করে বসে রাজর্ষি!

কি রান্না করেছ আজ মাসীমা আমার জন্যে?

উলু উত্তর দেয়, ইস্ তোর একার জন্যে, আমার জন্যে বুঝি নয়।

ভেতর থেকে সুদীপা বলেন, ঝগড়া না করে গল্প কর, আমি এখুনি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

উলু বলল, একটা কবিতা পড়বি?

নতুন লিখেছিস?

মাথা নেড়ে জানাল উলু, লেখাটা নতুনই।

ঋষি বলল, আমি পড়ব, না তুই পড়বি?

তুই পড়্।

না না, তোর লেখা তোর মুখেই শুনব।

উলু উঠে গিয়ে তার কবিতার খাতাখানা আনল। শুরু হল পড়া!

যে পাখিরা এখনও বাঁধেনি নীড়
তারা পাখা টেনে টেনে
আকাশ সাগরে ভেসে যায়।
সোনালী ঢেউ-এর খেলা
রুপোলী ঢেউ এর খেলা
পার হতে হতে সেই ভেলা
কোন নামহারা সবুজের
সীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
যেতে যেতে নোঙর নামায়।
সব বন, সব গাছ তাদের আশ্রয়।
বিশেষ বনের কাছে তাদের মনের
কোন দায় নেই,
বাঁধনের নেই কোন টান।
আকাশের সীমানা কোথায়?
নাকি সীমানাবিহীন?
সোনালী রুপোলী ঢেউ
সে কি অনাদিকালের ওঠাপড়া?

সবুজ কি মরে না কখনো?
শুকনো বীজের মধ্যে
নিজেকে লুকিয়ে রাখে বন;
সমস্ত রঙকে ঐ বীজের কৌটোয়
বন্দী রাখে।
হে আকাশ,
সোনালী রুপোলী ঢেউ,
আমাদের ভাসাও ভাসাও।
হে অরণ্য পান্থশালা
দাও দাও ক্ষণিক আশ্রয়।
আবার ভাসাও—
অফুরন্ত এই প্রাণ নীড়হারা আনন্দ-যাত্রায়।

ঋষি বলল, দারুণ! মাসীমা শুনেছ উলুর কবিতা?

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, এইমাত্র শুনলাম। একেবারে নিজেদের ছবি এঁকেছে। কোন মুখই অচেনা নয়।

ডাইনিং হলের ভেতর দু'টি তাজা কণ্ঠের হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এই আনন্দ কলরব, এই হাসি গান একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল। সুদীপার ঘরে অপ্রয়োজনে আর একটিও অতিরিক্ত বাতি জ্বলল না। ভেঙে গেল ছুটির দিনে আনন্দেব হাট। একটা চাপা কান্না দেওয়ালগুলোর কোণ থেকে, বালিশের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

এক রোববার রাজর্ষি আসতে সুদীপা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা। আমি তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম বলতে পার।

উলু কোথায় মাসীমা?

ও পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

শুয়ে আছে কেন?

তাই বলতে তোমাকে ডেকে এনেছি এখানে।

রাজর্ষি উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল সুদীপার দিকে। অত্যন্ত শক্ত মনের মেয়ে সুদীপা। তার বাইরের নম্র সংযত আচরণ দেখে কখনও বোঝা যাবে না তার ভেতরের ভাব ভাবনার গতি প্রকৃতি।

শোন ঋষি, কাল থেকে উলু চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

সে কি! কেন মাসীমা?

বিচলিত হয়ো না। কাল ওর টি-ভি রেকর্ডিং ছিল। রেকর্ডিং শেষ করে অনেক দৌড়ঝাঁপের পর একটা ট্যাক্সি পেলাম। ট্যাক্সিতে এসে নামলাম বাড়ির সামনে। আর ঠিক তখনই মনে হলো, ওর রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। সন্ধ্যা কিন্তু তখনও গাঢ় হয়নি। ওর হাত ধরে বারান্দার চেয়ারে এনে বসালাম। ভাবলাম, ভেতরের দুর্বলতায় অনেক সময় মানুষ চোখে অন্ধকার দেখে। একটু বিশ্রাম করলেই কেটে যাবে। কিন্তু বেশ কিছু সময় বসার পরেও যখন ওর সে অবস্থা কাটল না তখন ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মনে হল, দীর্ঘ সময় ঘুমের ভেতর থাকলে ওটা কেটে যাবে।

কিছু খায়নি রাতে?

মাঝখানে একবার তুলে দুধ পাঁউরুটি খাইয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর?

ভোরবেলা দেখলাম, চোখের অবস্থা আরও খারাপ।

ডাক্তার সোমকে ডাকনি?

এইমাত্র সেখান থেকে এলাম। কোন ওষুধ দেননি। সব শুনে বললেন, আই স্পেশালিস্টের সঙ্গে

যোগাযোগ করুন। এখন রোববার, কার কাছে যাই। বড় ভাবনায় পড়লাম ঋষি।

কিছু চিন্তা কোর না মাসীমা, আমি দেখছি।

রাজর্ষি উলুর ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে বলল, কি হল রে তোর?

উলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

ও ঠিক হয়ে যাবে। রেডি হয়ে থাক, আমি এসে চোখের ডাক্তারের কাছে তোকে নিয়ে যাব।

রোববার অনেক খুঁজে ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফিরে এল ঋষি। একটা ট্যাক্সি ডেকে সুদীপা আর উলুকে তুলে নিয়ে ডাক্তারেব কাছে গেল চোখ দেখাতে।

অনেক সময় নিয়ে ডাক্তার মুখার্জী চোখ দেখলেন, হঠাৎ কি মনে হলো, প্রেসার দেখে তিনি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

উলুকে ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ঋষি আর সুদীপাকে বললেন, আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ব্যবহার করলেই দু'চারদিনের ভেতর ভিসানটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।। কিন্তু ওর আসল রোগ চোখে নয়, ওর অ্যাবনরমাল হাই ব্লাড প্রেসারই চিন্তার কারণ। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার সেনের কাছে নিয়ে যান। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার সেন প্যাথলজিকাল টেস্ট, এক্স-রে ইত্যাদি করে শেষ পর্যন্ত বললেন, কিড়নি ড্যামেজ হয়েছে। এখুনি ডায়ালিসিসের দরকার।

ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যাতে সুদীপা সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু উলুর মুখোমুখি হলেই তিনি মুখে প্রসন্নতার ছবি ফুটিয়ে বলতেন, অসুখ করেছে, একটু ভুগতেই তো হবে মা।

এদিকে ডাক্তার সেনের কাছ থেকে জানা গেছে, এসব রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নেই। তবে দক্ষ সার্জেন যদি কিড়নি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেন তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীব নিরাময়ের সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্যই এই ট্রান্সপ্ল্যান্টের ব্যাপারটা অত্যন্ত বায়সাপেক্ষ। তিন-চার লক্ষ টাকা দিতে হবে হস্‌পিট্যালে। কিড়নির ডোনার চাই। যে কেউ কিড়নি দিলেই চলবে না। রোগীর সঙ্গে রক্তের গ্রুপের মিল থাকা চাই। তাছাড়া কিড়নির টিসু ম্যাচিং হওয়া চাই।

কোথায় এত অর্থ, কি করেই বা মিলবে ম্যাচিং কিড়নি।

সুদীপা মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলেন, আমি জ্ঞানত কোনদিন কারো ক্ষতি করিনি মা। আমি গভীরভাবে তাই বিশ্বাস করি আমাদের ওপর হঠাৎ নেমে আসা এই মেঘ কেটে যাবেই যাবে।

উলু বলে, আমিও তাই বিশ্বাস করি মা। এই যে প্রতিদিন ঋষি এসে আমাদের এত কিছু করে যাচ্ছে, এর কি কোন মূল্য নেই? আমি সেরে উঠব মা। তোমাদের সকলের ভালবাসা আমাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দেবে।

ঋষি এসে ঘরে ঢুকল। মা মেয়ে দুজনের মুখই ভাবাবেগে গম্ভীর দেখে সে ফিরে যাচ্ছিল, পেছন থেকে উলু তার হাতখানা টেনে ধরল।

ছেড়ে দে এখন, বাইরে একটু কজে সেরে আমি আবার ফিরে আসব।

কোন উত্তর না দিয়ে উলু জোর করে রাজর্ষির হাতখানা চেপে ধরে রইল।

ডায়ালিসিস চলছে। এখন ঘন ঘন ডায়ালিসিসে বেরিয়ে যাচ্ছে জলের মত টাকা। সুদীপা বেচে দিয়েছিলেন তাঁর সব গয়না। শুধু প্রাণ ধরে বেচতে পারেন নি মায়ের সোনায় বাঁধানো চিরুণীটা। এটা নাকি মাকে দিয়েছিলেন তাঁর মা। দিদিমা বলতেন, এটা আমার সৌভাগ্যের শিরোভূষণ। সত্যিই তিনি সৌভাগ্যবতী ছিলেন। খ্যাতিমান ডাক্তার-স্বামীর কোলে মাথা রেখেই চোখ বুজেছিলেন। তার ওপর সুদীপার মা তাঁর স্বামীকে পেয়েছিলেন একজন বিদ্বান, সৎ ও ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হিসাবে। তিনিও স্বামীর সেবা পেয়েই চলে গেলেন।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়ল সুদীপার কিন্তু কেন জানি না, সে কথা ভেবেও চিরুণীটা বেচতে পারলেন না।

ভেলোর অথবা চণ্ডীগড়ে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে, শেষ চেষ্টা করতে হবে বাঁচাবার।

ইতিমধ্যে পত্রিকার অফিসগুলোতে ঘোরাঘুরি করে বিনি পয়সায় সর্বসাধারণের কাছে আবেদন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছে রাজর্ষি। রোগী বিব্রত হতে পারে তাই দাতাকে তারই বাড়ির ঠিকানায় সাহায্য পাঠাবার জন্য আবেদন জানান হয়েছে। কোথাও রোগিণীর নামের উল্লেখ পর্যন্ত হয়নি। অবশ্য পরবর্তী অধ্যায়ে রোগিণীর নাম দিয়েই রিপোর্টাররা খবর ছাপতে শুরু করেছিলেন।

সুদীপা আর উলুর সঙ্গে রাজর্ষি গেল চণ্ডীগড়ে। ওদের ওখানে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করে দিয়েই ও ফিরে আসবে। নিজের লেখাপড়ার জন্যেই শুধু নয়, বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের বিরাট দায়িত্ব তার ওপর। অবশ্য এ গুরু দায়িত্ব সে নিজেই তুলে নিয়েছে কাঁধে।

চণ্ডীগড়ে নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ শর্মা রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, অল্প দূরেই গোলাপ বাগ, তোমরা ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পার। খুবই সুন্দর।

সুদীপা অবাক হলেন ডাক্তারের কথায়। যেখানে রোগীর জীবন মরণ সমস্যা সেখানে হঠাৎ ডাক্তার দিচ্ছেন গোলাপ বাগের সন্ধান।

রাজর্ষি বলল, গোলাপ বাগ থেকে ফিরে এসে আমরা হস্‌পিট্যালে অ্যাডমিশান পাব তো ডাক্তার?

অবশ্যই।

রোগীর অবস্থা কি রকম দেখলেন?

ফিরে এসো, কথা হবে।

ওরা একখানা অটো ভাড়া করে গোলাব বাগে পৌঁছে গেল।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাগানটি বহু বিস্তৃত। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যায় না। এই স্বর্গীয় বাগানে শুধু গোলাপ ফুটে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে সংগ্রহ করা গোলাপ।

সুদীপা আপন মনে এগিয়ে চলেছেন। বুক ভরে প্রার্থনা, হে গোলাপ, তুমি তোমার বর্ণ গন্ধ দিয়ে ফুটিয়ে তোল আমার উলুকে। এই ফুটে ওঠার কালে তাকে ঝরিয়ে দিও না।

রাজর্ষি ডান হাতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলেছে উলুকে। সম্পূর্ণ না হলেও উলু আংশিক ভার রেখেছে ঋষির ওপর। খুবই আস্তে চলেছে তারা।

রাজর্ষি বলল, সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা এসেছে বিউটি কন্টেস্টে। দেখ দেখ, পোশাকের কি বাহার! তুইও নাম দিবি নাকি রে?

আচ্ছা ঋষি সত্যি করে বল, এখন না হয় রোগে চেহারাটা আমার খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু কিছুদিন আগেও কি আমি এমনি ছিলাম?

রাজর্ষি বলল, আমি মজা করছি তোর সঙ্গে। আর তুই কথাটা অন্যভাবে নিলি। অসুখের সময় কার শরীর ভাল থাকে রে। আবার অসুখ সেরে গেলে সব আগের মত হয়ে যায়।

একটু হেঁটেই হাঁপাচ্ছিল উলু। রাজর্ষি তাকে ধরে এক জায়গায় বসাল। নিজেই তার পাশে বসল।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে উলু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

দেখ দেখ, প্রজাপতিগুলো পাখনা মেলে কেমন নাচছে। সিওলে এশিয়াড হল। ওদের দেশের মেয়েরা সাদা পোশাক পরে ডানা কাঁপিয়ে নাচল। ঠিক যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি।

হঠাৎ রাজর্ষির একখানা হাত নিজের দু'হাতের ভেতর চেপে ধরল উলু। হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। চোখ দুটোতে জলছায়া।

কি হল আবার?

আমি কি আর প্রজাপতির মত, সিওলের ঐ নর্তকীদের মত নাচতে পারব?

না, তা তুই পারবি না, কোনদিনও তেমনটি পারবি না। তবে উলু চৌধুরী যা পারবে তারা তা কোনদিনও পারবে না। তোর নাচ, তোর গান একেবারে তোর নিজস্ব। তোকে আমি আগামী বছর আমাদেব স্যোস্যালে গান গাওয়াবই।

উলুর খুব ভাল লাগল রাজর্ষির কথাগুলো। তবু বলল, বেঁচে থাকলে গাইব।

তোকে মরতে দিলে তো। অত সহজ নয় রে মরা।

সত্যি, রাজর্ষির কত প্রাণশক্তি! ও কাছে থাকলে মনে হয়, তিল তিল করে রাজর্ষির প্রাণের ছোঁয়া সঞ্চারিত হচ্ছে ওর ভেতর।

সুদীপা ফিরে এসে বসলেন ওদের কাছে।

উলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, শোন মা, ঋষি বলছে ও নাকি আগামী বছর ওদের ফাংশানে আমাকে ইনভাইট করে নিয়ে গিয়ে গান গাওয়াবে।

তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে নিশ্চয়ই গাইতে পারবে মা। আমার গভীর বিশ্বাস তোমাকে আমরা একেবারে আগের মত সুস্থ করে তুলতে পারব।

চণ্ডীগড়ে পি, জি, আই, হস্‌পিট্যালের নাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে ভেলোর, যশলোক, অন্যদিকে চণ্ডীগড়। সেরা ডাক্তারদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিভাগ।

ডাঃ শর্মা বসেছিলেন ওঁর রুমে। ওদের দেখে বললেন, কেমন লাগল?

উলুই প্রথম কথা বলল, না গেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু হারাতাম।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমি সারাদিনে একবার অন্তত ওখানে যাই।

কেন যান? শুধু ভাল লাগে বলে?

কেমন করে বাঁচতে হয় তাই শেখার জন্যে। কত স্বল্প সময় তার ডালে থাকার মেয়াদ তবু কি আনন্দ, কি গৌরবে তার বেঁচে থাকা।

সুদীপা বললেন, ডাক্তার শর্মা, আপনি একজন কবি ও দার্শনিক, তা না হলে এমন করে কথা বলতে পারতেন না।

ডাক্তার শর্মা হেসে বললেন, এখন কিন্তু আমি পুরোপুরি ডাক্তার। মিস চৌধুরীকে আমি পরীক্ষা করে অ্যাডমিট করে নেব। আপনারা আপনাদের আস্তানায় নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।

রাজর্ষি বলল, ডাক্তার শর্মা, আজ রাতের গাড়িতে আমি ফিরে যাচ্ছি। কেবল মা আর মেয়ে এই হাসপাতালেই থাকবে। মেয়ে রোগী, মা তার সেবিকা।

ডাক্তার সুদীপার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি হোটেলে থাকবেন না?

ওটুকু টাকাও এখন আমার কাছে একান্ত দরকারি। আমি এই হস্‌পিট্যালের কোথাও না কোথাও ঠিক থেকে যেতে পারব।

রাজর্ষির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন সুদীপা। উলুকে নিয়ে নার্সরা চলে গেল ভেতরে।

রাজর্ষি বলল, এখানে তুমি কোথায় থাকবে মাসীমা?

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, বিরাট হাসপাতালের একটা কোণে আমি ঠিক থেকে যাব। তাছাড়া চলার পথে নার্সদের মুখে আমি যে মিষ্টি হাসিটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে বিপদে ওদের সাহায্য ঠিকই পাব।

আমি তোমাকে কোন ঠিকানায় টাকা পাঠাব?

সুদীপা খুবই শক্ত মনের মেয়ে, তবু এই মুহূর্তে চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠল। তিনি রাজর্ষিকে কাছে টেনে নিয়ে তার হাতটা কিছুক্ষণ চেপে ধরে রইলেন। এই নিঃস্বার্থ যুবকটির ভেতর সমুদ্রের মত বিশাল একটি মনের পরিচয় পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অসুস্থ বন্ধুর জন্য এতখানি করা, সে বোধ করি এই বয়সের তরুণরাই পারে।

সুদীপা বললেন, আমার গয়না বিক্রির কিছু টাকা সঙ্গে এনেছি। ডায়ালিসিস্ কয়েকবার ঐ টাকাতেই চালিয়ে নেব। পরে অপারেশনের দরকার হলে টাকা লাগবে।

আরো কিছু টাকা হঠাৎ কোন দরকারের জন্য কাছে রাখা ভাল। আমি কি ডাঃ নেগীর নামে এই হাসপাতালের ঠিকানায় পাঠাব?

সুদীপা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

ইউরিমিয়া স্টার্ট করে গিয়েছিল। এখন ঈশ্বরের হাতের সূক্ষ্ম সুতোর ওপর বাঁচা মরা নির্ভর করছে। লাংসে, পেটে জল জমে গিয়েছিল। সারা শরীর ফুলে উলুকে আর কোন রকমে চেনা যাচ্ছিল

না। ডায়ালিসিসের ফলে উপসর্গগুলো কমে গেল। শেষে ফোলা কমে গিয়ে সারা শরীর কংকালের আকার ধারণ করল। ভেতরে চেতনা আছে রোগীর কিন্তু বাহ্যজ্ঞান প্রায়ই থাকে না।

সুদীপা তাঁর আশ্চর্য এক আকর্ষণীয় প্রভাবে হাসপাতালের সমস্ত নার্স আর রোগীদের বড় প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন। নার্সরাই তাঁকে স্টোভ আর রান্নার সামান্য সরঞ্জাম এনে দিল। দিনান্তে একবার মাত্র তিনি খাবার তৈরি করে নিতেন। হাসপাতালের একটি প্রান্তে সতরঞ্চি বিছিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন।

কোন রোগীর কাছে গিয়ে বললেন, কেমন আছেন বাবা? আজ মুখ-চোখের চেহারাটি বেশ ভালই মনে হচ্ছে।

অন্যজনের কাছে গিয়ে বললেন, অত দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? মিঃ নিখাঞ্জ মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই এসে পড়বেন। আমি তাঁকে অফিস রুমে কথা বলতে দেখে এসেছি। হয়ত দু'একদিনের ভেতর তোমার ছুটি হয়ে যাবে।

নতুন বউটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

স্বামী দরজা দিয়ে ঢুকতেই বেডের কাছ থেকে সরে গেলেন সুদীপা। হলের কোণ থেকে বলে উঠলেন শুভ্র শ্মশ্রূওয়ালা এক বৃদ্ধ, কি মা, তুমি তো আমার কাছে এলে না আজ?

সুদীপা হেসে বললেন, আসছি বাবা।

নিচে নেমে গেলেন সুদীপা। এ সময় একটি লোক ফুল নিয়ে বসে। সুদীপা তার কাছ থেকে সুন্দর একটি গোলাপ কিনে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। হলের সেই বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে গোলাপটি দিয়ে বললেন, এটি আপনার জন্য এনেছি বাবা।

বৃদ্ধ গোলাপটি হাতে নিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। সুদীপা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সে সময় শুধু তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার মুখখানা।

বৃদ্ধ বললেন, কেমন আছে মা তোমার মেয়ে?

আপনাদের সকলের কাছে আমি আসি বাবা, ওর জন্য দয়া ভিক্ষা করতে।

বৃদ্ধ বললেন, ভগবান যদি আমার সামান্য পরমায়ুটুকু ওকে দেন তাহলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে মা।

আমি মেয়ের জন্য কারু পরমায়ু চাই না বাবা, কেবল চাই আশীর্বাদ।

বৃদ্ধ চোখ দু'টি বন্ধ করে করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে সুদীপার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সেদিন সুদীপা করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা ভেতরের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দুই গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সুদীপা সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েটিকে টেনে নিলেন বুকের কাছে।

কি হয়েছে বোন, কাঁদছ কেন?

জানা গেল মেয়েটির স্বামী সেরিব্রাল অ্যাটাকে চেতনা হারিয়ে এখানে রয়েছেন। ডাক্তাররা বলছেন, বাহাত্তর ঘন্টার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়।

সুদীপা বললেন, কিচ্ছু ভেব না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুদীপার আন্তরিক ব্যবহারে মেয়েটি বড় শান্তি পেল। সুদীপা যখন শুনল বাহাত্তর ঘন্টা না পেরুলে মেয়েটি কিছুই খাবে না তখন জোর করে তাকে নিজের ঐ আস্তানায় টেনে নিয়ে গিয়ে দুধ আর ফল খাওয়ালেন। বললেন, মনে আনন্দ রাখ, না হলে আনন্দময়ের আশীর্ব্বাদ পাবে কি করে।

ক'দিন পরে মেয়েটি পেছন থেকে সুদীপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি দিদি।

সুদীপা ঘুরে দেখলেন, সেই মেয়েটি। একটু দূরে তার স্বামী দাঁড়িয়ে হাসছেন। এইমাত্র রিলিজ অর্ডার পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

তোমাদের দেখে খুব খুশি হলাম বোন। তুমি তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি যোগাযোগ রাখব।

আর দিদির একটা কথা মনে রেখ, যত বিপদই আসুক, মনটাকে যতদূর সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করবে।

এক সন্ধ্যায় ডাক্তার শর্মা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ সুদীপাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে হাসপাতালের বাইরে দেখা করতে বললেন।

সুদীপা বেরিয়ে এলেন হাসপাতালের বাইরে।

ডাক্তার তাঁর গাড়িখানা বিশেষ একাট জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মিসেস চৌধুরী, প্রায় দু'মাস হল মেয়েকে নিয়ে আপনি এখানে রয়েছেন। কিভাবে রয়েছেন তা আমার অজানা নয়। তাছাড়া হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে আপনার আচরণ কেবল সিস্টারদের নয়, আমাকেও অভিভূত করেছে। অন্যদিকে আমি আপনার ঐ ফুলের মত সুন্দর মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারছি না।

এইখানে সুদীপা বাধা দিয়ে বললেন, ডাক্তার শর্মা, আপনি যেভাবে আমার মেয়ের চিকিৎসা করছেন, তাকে স্নেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছেন, সেটাই আমার কাছে বড় পাওয়া। এরপর আমার ভাগ্য আর আমার মেয়ের ভাগ্য।

কিন্তু মিসেস চৌধুরী, স্নেহ আর সেবা দিয়ে এ ধরনের রোগীকে যে সারিয়ে তোলা যায় না, তা আপনি জানেন।

সুদীপা বললেন, আমাকে তো আপনারা পরীক্ষা করেছেন, আমার রক্তের গ্রুপ 'ও'। ম্যাচিং টিসু। সুতরাং আমার একটা কিড়নি মেয়েকে দিতে কোন অসুবিধেই নেই।

সে সব ঠিক আছে মিসেস চৌধুরী। কিন্তু এ দেশে কিড্নি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারটা এখনও অনেকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। এখানকার সার্জেন রোগীদের নিয়ে একটা পরীক্ষা চালাচ্ছেন মাত্র। আপনি কি চান আপনার মেয়ে এখানে একটা গিনিপিগের মত অপারেশান টেবিলে উঠুক?

আপনার কথা শুনে বড় অসহায় মনে হচ্ছে ডাঃ শর্মা। শুনেছি দেশের বাইরে গিয়ে অপারেশান করাতে চাইলে কয়েক লাখ টাকার দরকার। আমি যে কপর্দকশূন্য।

আমি আপনার মেয়ের মুখের দিকে তাকালেই আমার ছোট মেয়েটির মুখের সঙ্গে বড় সাদৃশ্য দেখতে পাই। তাই ওকে আমি এই পরীক্ষার ভেতর ফেলে দিতে চাইছি না। আপনি যে করে পারেন ওকে ইণ্ডিয়ার বাইরে নিয়ে চলে যান।

কোথায় নিয়ে যাব আপনি বলে দিন?

ডাঃ শর্মা বললেন, লস্‌এঞ্জেলসে সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেন্টার রয়েছে। ওখানে ডাক্তার রবার্ট মেগুেস যদি রোগীকে হাতে নেন তাহলে আপনার মেয়ে পুনর্জীবন লাভ করতে পারে।

সুদীপা মেয়েকে নিয়ে এক মুহূর্ত দেরি না করে কলকাতায় ফিরে আসতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই কি আসা যায়। সার্জেনরা কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। শেষে ডাক্তার শর্মা রিলিজ অর্ডার লিখে মা আর মেয়েকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। ট্যাক্সি ছুটে চলল এয়ারপোর্টের দিকে। হাতে এমন পয়সা নেই সুদীপার যে তিনি প্লেনের দুটো টিকিট কিনতে পারেন। তবু তাঁর মনে হলে প্রায় একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে তিনি তাঁর মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

বিধাতার আশ্চর্য খেলা, পথের ধারে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি দেখেই হাত তুললেন। ড্রাইভার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুদীপা তাকে ট্যাক্সি থামাতে বললেন।

ট্যাক্সি থামলে ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন।

অত্যন্ত করুণ গলায় বললেন, আমার প্লেন ছাড়তে আর বেশি বাকি নেই কিন্তু একটা অটো অথবা ট্যাক্সি পাচ্ছি না। আপনারা কি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন?

সুদীপা বললেন, হ্যাঁ। উঠে আসুন।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে গাড়িতে উঠলেন। সুদীপা কথায় কথায় জানতে পারলেন ভদ্রলোক ভাকরা নাঙালের চিফ ইনজিনিয়ার।

উলুর অসুখের কথা শুনে এবং কেমন করে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে মা হস্‌পিট্যাল

ছেড়ে চলে এসেছেন জানতে পেরে অভিভূত হলেন ইন্‌জিনিয়ার সাহেব।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলেন, তাঁর ফ্লাইট বিশেষ কারণে ক্যানসেল হয়েছে। অমনি ভদ্রালোক টিকিট কেটে আনলেন।

অসহায়ের মত লাউঞ্জে বসেছিলেন সুদীপা, মেয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে। ভদ্রলোক টিকিট দুখানা উলুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই সামান্য উপহারটুকু তোমাকে দিলাম। তারপর স্যুটকেশ খুলে চেক বই বের করে আড়াই হাজার টাকার একটা অঙ্ক লিখে নাম সই করলেন। সুদীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ট্যাক্সি ফেয়ারের কিছুটা অংশ আমাকে শেয়ার করতে দিলে খুবই তৃপ্তি পাব।

ভদ্রলোক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মা আর মেয়েকে প্লেনে তুলে দিলেন।

সুদীপা জানলার ধারে বসে শুধু চেয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। ঈশ্বরের করুণা যে কোন্‌পথে নামে তা কে বলতে পারে।

।। ৪।।

রাজর্ষি চণ্ডীগড় থেকে ফিরে এলে সদানন্দবাবু আর ললিতা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সদানন্দ বললেন, সংবাদপত্রে 'একটি তরুণী মেয়ের জীবনসংশয়,' বিজ্ঞাপনটি বেরুনোর পর থেকে প্রতিদিন এই ঠিকানায় অজস্র চিঠি আসছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা ইতিমধ্যেই জমে গেছে ঋষি।

এত বিপদের ভেতরেও খুশি হয়ে উঠল রাজর্ষি। তাহলে মানুষ এখনও পুরোপুরি মেসিন হয়ে যায়নি। প্রাণের ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করতে পারলে করুণার ধারা এখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

খানিক বিশ্রামের পর সে চিঠিগুলো নিয়ে বসল।

গ্রাম বাংলার এক দর্জির চিঠি তার হাতে পড়ল। লোকটি লিখেছেন, সারাদিন রোজগার করে আমি আমার সংসার চালাতে পারি না। কিন্তু কাগজের খবরটা শুনে দিলটায় বড় কষ্ট হলো। তোমার জন্যি পাঁচটা টাকা পাঠালাম মা, আর আল্লার দোয়া মাঙছি।

আর এক ছাপোষা কেরাণীর চিঠি—আমার বৃদ্ধা মা মরণাপন্ন। তাঁর টিনের স্যুটকেশে সারা জীবনের সঞ্চয় পাঁচশো তেইশ টাকা। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী টাকাটা আপনাদের ঠিকানায় পাঠালাম। সঙ্গে যোগ হলো আমার সাত বছরের ছেলের টিফিনের পয়সা থেকে জমানো এগারোটি টাকা।...

একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা ভবতারিণীর চরণে উলুর নিরাময়ের জন্য পুজো দিয়ে একটি প্রসাদী বেলপাতা আর একশো এক টাকার নোট পাঠিয়েছেন। টুকরো বেলপাতাটি এসেছে খামে আর টাকা এসেছে মণি অর্ডারে। দু'ছত্র চিঠিও লিখেছেন, আমার মেয়েটি স্কুলে পড়তে পড়তেই ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে। আমার আর মা ভবতারিণী ছাড়া কেউ নেই। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে তোলেন।

গীর্জায় উলুর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করে নানেরা ললিতা দেবীর কাছে একটি অতি সুন্দর ব্যাগে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। ঐ ব্যাগের ভেতর লাল, সবুজ, হলুদ কাগজের একটা গোছা। তার প্রত্যেকটির ওপর প্রভু যীশুর অমরবাণী লেখা রয়েছে।

শুধু টাকা নয়, শুধু হৃদয়ের উত্তাপে ভরা চিঠি নয়, একাধিক মানুষ তাদের রক্তের গ্রুপ জানিয়ে কিডনি দেবাব জন্য প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে রাজর্ষির মনে হল, সে ছুটে যায় উলুর কাছে। পড়িয়ে আসে চিঠিগুলো। বলে আসে, মানুষ মরেনি, মবে না কখনও।

রাজর্ষির হাতে তখনও ধরা আছে একটা চিঠি। ইনসিওর করে একটা টাঙাওয়ালা চিঠি আর সোনার দুটো চুড়ি পাঠিয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকে।

লিখেছে, আমি আগে ডাকাতি করতাম, এখন টাঙা চালাই। খুব বর্ষা পড়ছিল এক রাতে। পথঘাট জলে ডুবে গিয়েছিল, কোন গাড়ি বের হল না রাস্তায়। আমি এক ভদ্র ঘরের জেনানাকে ঠিক সময়ে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দিলাম। তাঁর ছেলের ভারি বিমারের টেলিগ্রাম এসেছিল। ট্রেনে উঠতে পেরে

তিনি এমন খুশি হয়েছিলেন যে আপনার হাত থেকে দুটো চুড়ি খুলে দিলেন। আমার কোই নেই। চুড়ি দুটো পাঠালাম। খুকির বিমার ভাল হলে বহুৎ শান্তি মিলবে।

এ চুড়ি বেচবে না রাজর্ষি। এমন চুড়ি জীবনের বিনিময়েও বেচা যায় না। আর ঐ দর্জির পাঁচটা টাকা সে বাঁধিয়ে রেখে দেবে।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে কয়েকখানা চিঠি নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একখানাতে চোখ আটকে গেল। এক ভদ্রলোক লিখেছেন : রাজর্ষিবাবু, সংবাদপত্রে অল্পবয়সী মেয়েটির অসুস্থতার খবরে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছি। আমার বাসার ঠিকানা ও পথনির্দেশ দিয়ে পাঠালাম। আশা করি খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। নির্দিষ্ট স্টপেজে বাস থেকে নেমে যে চায়ের দোকানটি দেখবেন বজ্রগোপাল বিহারের নাম জিজ্ঞেস করলেই ওদের কেউ আপনাকে এখানে পৌঁছেও দিয়ে যেতে পারে। আপনি এলে সব কথা হবে। আমি ঐ অসুস্থ মেয়েটির ব্যাপারে আপনাকে হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারি।

নাম প্রকাশে আমি অনিচ্ছুক। যে কোন দিন চারটের পর 'বজ্রগোপাল বিহারে' এলেই আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

চিঠিখানা পকেটে নিয়েই কলেজ থেকে গড়িয়া এসে সোজা নরেন্দ্রপুরেরর বাস ধরল রাজর্ষি। নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে সেই চায়ের দোকান। দু'তিনটি যুবক চা খাচ্ছিল। তাদের কাছে 'বজ্রগোপাল বিহারের' নাম করতেই একটা ছেলে বেরিয়ে এল। হাত উঁচিয়ে খোয়া ফেলা একটি রাস্তা দেখিয়ে বলল, ঐ রাস্তায় চলে যান। যেতে যেতে নারকেল গাছ ঘেরা একটা পুকুর আর টালির বাড়ি পাবেন।

বলতে বলতেই ছেলেটি থেমে গেল। চায়ের দোকানের কাউকে বলল, আমি এখুনি আসছি। তোরা যেন আবার চলে যাস না।

রাজর্ষিকে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজর্ষি ছেলেটির পাশে পাশে যেতে যেতে বলল, ওখানে কি কাজটাজ হয় ভাই। .

তাও জানেন না, ওখানে অনাহারি মাস্টারমশায় থাকেন। বিনি পয়সায় এ তল্লাটের সব ছেলেমেয়েদের পড়ান।

অনাহারি মানে?

ঐ তো বললাম, মাইনে নেন না।

ওটা কি ফ্রি স্কুল?

না মশায়, স্কুলটুল নয়। আশপাশের ইস্কুল থেকে ছুটির পর দল বেঁধে ছেলে মেয়েরা আসে। তারা বিনি পয়সায় অঙ্ক শেখে, ইংরেজির পড়াটড়া গ্রামারট্রামার বুঝিয়ে নেয়। এমন মাস্টার নাকি ভূ-ভারতে নেই। আমার ভাইটাও আসে।

যুবকটি রাজর্ষিকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। রাজর্ষি কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে দেখল, সৌম্য চেহারার একটি মানুষ বাঁধান ঘাটের পাটে বসে আছেন। সে মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি কোত্থেকে বাবা?

আমাকে আপনি দেখা করবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। আমিই রাজর্ষি। ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং এর ছাত্র। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে রাজর্ষির হাত ধরে বললেন, আমি সংবদপত্রের বিজ্ঞপ্তির তলায় আপনার নাম দেখে ভেবেছিলাম, আপনি মেয়েটির নিশ্চয়ই অভিভাবক। বয়স্ক ব্যক্তি।

না, আমি ওর অভিভাবক নই।

মেয়েটি কি আপনার বোন?

না,বন্ধু। স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম। দেখুন, আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে খুব খারাপ লাগবে।

ঠিক আছে। খবরের কাগজে মেয়েটির নাম ছিল না, কি নাম ওর?

উলু চৌধুরী।

কি বললে!

রাজর্ষি আবার নামটা উচ্চারণ করে বলল, আপনি চেনেন নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, প্রায় সবাই ওকে চেনে। রেডিওতে ও অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান গায়। ওর গান শুনলে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখে জল এসে যায়।

হ্যাঁ, গানের ব্যাপারে আমার বন্ধুটি অনেকেরই পরিচিত।

ভদ্রালোক বললেন, তুমি এসো বাবা আমার সঙ্গে।

ঘরের ভেতর রাজর্ষিকে এনে বসালেন। বাইরের আলোয় তখন কাঁচা হলুদের রঙ লেগেছে।

ভদ্রলোক রাজর্ষির পাশে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জিজ্ঞেস করলেন। শেষে বললেন, চণ্ডীগড়ের লেটেস্ট খবর কি?

ভাল নয়। আজ সকালেই একটা চিঠি এসেছে, ওরা ওখানে অপারেশান করাবে না, অনেক অসুবিধে দেখা দিয়েছে। ওখানে থেকে চলে আসার চেষ্টায় আছে।

কিন্তু কলকাতায় তো অপারেশান হবে না।

না, উলুকে এখন আমেরিকা পাঠাবার জন্য শেষ চেষ্টা করতে হবে। বহু টাকার দরকার।

ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন, কিভাবে যোগাড় হচ্ছে? কত টাকাই বা দরকার?

প্রথমে অন্তত লাখ পাঁচেক টাকা হাতে নিয়ে যেতে হবে। তারপর প্লেনের ভাড়া আছে।

বিপুল অঙ্কের বোঝা, ভদ্রলোক চিন্তাক্লিষ্ট মনে হলো। তুমি কয়েকদিন পরে এসো, আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করব। একদিন ছিল যখন চেষ্টা করলে হয়ত সবই পারতাম, কিন্তু এখন প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছি। সমস্ত সম্পদ আমি পেছনে ফেলে রেখে এসেছি।

ভদ্রলোকের কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল রাজর্ষি। বলল, এই যে আপনি মুখে সাহায্যের কথা বললেন এতেই আজ আপনার কাছে আসাটা আমার সার্থক হয়ে গেল। আমি নিশ্চয়ই আর একদিন আপনার কাছে আসব।

রাজর্ষি নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক তার পেছন পেছন এলেন।

কিডনি যোগাড় করতে পেরেছ?

রাজর্ষি বলল, ইতিমধ্যে ষাটজন কিড্‌নি দেবার জন্য তৈরি। সবারই রক্তের গ্রুপ 'ও'। তবে মাসীমা চণ্ডীগড়ে পরীক্ষার পর লিখেছেন, তাঁর কিড্‌নি মেয়ের জন্যে একেবারে ম্যাচিং।

ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তাহলে একটা সমস্যার সমাধান হলো। এখন প্লেনের ভাড়া আর অপারেশানের ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ।

রাজর্ষি বলল, আমার মন বলছে, এত মানুষের শুভেচ্ছা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। উলু ঠিকই চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যেতে পারবে।

রাজর্ষি তার ব্যাগ হাতড়ে দু'খানা চিঠি বের করল। ভদ্রলোকের হাতে চিঠি দুটো ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন।

ঢাকা থেকে শান্তনু হাসান খান লিখেছেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তর সালের যুদ্ধে অনেককেই হারিয়েছি। আমার কোন ছোট বোন নেই। আমার ব্লাড গ্রুপ 'ও'। সানন্দে আমি আমার হিন্দু বোনটিকে একটি কিড্‌নি উপহার দিতে চাই। চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম।

ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেল। তিনি কাপড়ের কোণে মুছে নিলেন।

সৌদি অ্যারেবিয়া থেকে মিঃ করুণাকরণ লিখেছেন, হিন্দুস্থান টাইমস্ পড়ে তোমার অসুখের খবর জানতে পারলাম। তোমার এই কষ্ট আমাদের সকলেরই কষ্ট। আমরা ছুটিতে সপরিবারে ইওরোপে বেড়াতে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার অসুখের খবর জেনে আমাদের খুশির ভ্রমণে যাবার ইচ্ছে একেবারে চলে গেছে। ভ্রমণের জন্য আমরা যে অর্থ খরচ করব ঠিক করেছিলাম তা তোমার কাছে পাঠালাম। তুমি রোগমুক্ত হলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না।

চিঠি পড়া শেষ করে ভদ্রলোক দু'খানা চিঠিই রাজর্ষির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কয়েকদিন

পরে তুমি চলে এসো আমার এখানে। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, আমি বাবা নামের প্রত্যাশী নই। তাই আমার সঙ্গে, তোমার দেখা হবার ব্যাপারটা যেন তৃতীয় আর কেউ জানতে না পারেন!

রাজর্ষি বলল, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ঘরে ফিরে বাবার কাছ থেকে রাজর্ষি জানতে পারল উলুরা প্লেনে কলকাতা ফিরে এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সদানন্দের অফিসে ফোন করে সুদীপা খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন।

কেমন আছে উলু?

কালই ডায়ালিসিসে নিয়ে যেতে হবে।

পরের দিন বেশ কয়েক ঘন্টা উলুর ডায়ালিসিস চলল। রাজর্ষি কলেজ কামাই করে বসে রইল সেখানে। জোর করে সুদীপাকে পাঠিয়ে দিল তাঁর স্কুলে।

ডায়ালিসিসের শেষে ক্লান্ত উলুকে রাজর্ষি নিয়ে এল ঘরে।

উলু বিছানায় শুয়ে ঋষির হাত ধরে বলল, তুই আমার কাছে থার্কাব। আমাকে ছেড়ে যাবি না তুই?

রাজর্ষি ওর ক্ষতবিক্ষত হাতখানায় ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি তোকে ছেড়ে চলে যাব, এ ভাবনা তোর মাথায় এলো কি করে উলু। যদি কোথাও যাই তাহলে জেনে রাখ, তোকে সঙ্গে না নিয়ে যাব না।

উলু অনেক অবসন্নতার ভেতর থেকে নরম এক টুকরো রোদ্দুরের মত হেসে বলল, তুই এমন মজা করতে পারিস না ঋষি।

যাব্বাবা, সত্যি বললেও যদি তুই বিশ্বাস না করিস তাহলে আমার কি বলার আছে বল।

এবার উলু নিজেই মজা করে বন্ধুর দিকে একটা চোখ টিপে হাসল।

কয়েকদিন পরে সুদীপার ঘরে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। রাজর্ষি এল একখানা চিঠি হাতে করে। প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তর থেকে এসেছে। উলুকে অ্যাড্রেস করে লেখা।

তোমার এবং তোমার মায়ের জন্য প্লেনে আমেরিকা যাতায়াতের দুখানা টিকিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মিনিস্ট্রি অব ট্যুরিজিম এবং মিনিষ্ট্রি অব হেলথ্ এর সঙ্গে যোগাযোগ কর।

সুদীপা বললেন, এ অঘটন কি করে ঘটল ঋষি!

রাজর্ষি বলল, নানা দিক থেকে চেষ্টা হচ্ছে মাসীমা, এ তারই ফল।

কলেজ শেষে প্রাইম মিনিস্টারদের সেক্রেটারিয়েট থেকে লেখা চিঠি পকেটে নিয়ে রাজর্ষি ছুটল বজ্রগোপাল বিহারে।

চিঠি দেখলেন মাস্টারমশায়। বললেন, কাজ হয়েছে। কিন্তু তুমি আমার চেষ্টার কথা বলনি তো কোথাও?

আপনি আমাকে আগেই তো বারণ করে দিয়েছেন।

তবু আর একবার মনে করিয়ে দিলাম। শ্রেয় কাজে বাধা অনেক। এখন আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি আবার ঐ অসুস্থ মেয়েটির নামে ট্যুরিজিম আর হেল্‌থ্ এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তোমার ঠিকানাতে উত্তর আসামাত্রই আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোর।

নিশ্চয়ই মাস্টারমশায়।

উত্তর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো। একেবারেই নৈরাশ্যজনক। দু'টি ডিপার্টমেন্ট থেকেই জানান হয়েছে, ভারতের চারটি হাসপাতালে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট চলছে। তুমি এদেশেই চেষ্টা কর। আমরা দুঃখিত, তোমাকে বাইরে যেতে দিতে পারছি না বলে।

চিঠি নিয়ে আবার ছুটল ঋষি মাস্টারমশায়ের ডেরায়। সে এখন রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

বেশ খানিক সময় স্থির হয়ে বসে থেকে মাস্টারমশায় বললেন, চেষ্টা আমাদের করে যেতেই হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি এক কাজ কর রাজর্ষি, ঠিক ছ'দিন পরে এমনি সময় চলে এসো আমার এখানে।

রাজর্ষি, ফেরার পথে কেবল মাস্টারমশায়ের কথাই ভাবতে লাগল। জীবনের যা কিছু পার্থিব

সম্পদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষটি তপোবনের আচার্যের মত সাধারণ জীবন-যাপন করছেন। বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে চলেছেন ছাত্রদের। সারাদিনের সামান্য আহার্য নিজের হাতেই তৈরি করে নিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, কত বিশাল একখানা হৃদয় নিয়ে জন্মেছেন মানুষটি।

ঠিক পাঁচদিন পরেই সন্ধ্যার ডাকে একটি সরকারী খাম এল। তার ভেতর আমেরিকা যাবার টিকিট আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

পরের দিন সেই সব সঙ্গে নিয়েই মাস্টারমশায়ের ডেরায় ছুটল রাজর্ষি।

রাজর্ষিকে দেখে দূর থেকেই তিনি বললেন, যাবার টিকিট পেয়ে গেছ তো?

রাজর্ষি কাছে গিয়ে বলল, আজ আমাকে বলতেই হবে, এ অসাধ্যসাধন আপনি কি করে করলেন।

সুস্থির মানুষ। মুখে কোন ভাবাবেগ নেই। বললেন, এক নামী ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুকে নিয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিলাম। তাঁরই চেষ্টায় এত তাড়াতাড়ি জট খুলে গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাটাও সহজ হয়ে যাবে।

একটু থেমে বললেন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে রাজর্ষি। বন্ধুর জন্য ক'জনই বা এমন নিঃস্বার্থ চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে! শোন, পঁচাত্তর হাজার টাকার মত একটা সঞ্চয় আমার আছে, আর এই বাড়ি, বাগান, পুকুর মর্টগেজ রেখে তিরিশ হাজার পেয়েছি। এই এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা আমি তোমার বন্ধুকে দিতে পারলাম।

রাজর্ষি কোন কথা বলতে পারল না, সে মাস্টারমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মাস্টারমশায় আবার বললেন, তুমি আমাকে বার বার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে, তাই আগেভাগে সব কিছু বলে দিলাম।

রাজর্ষির আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। সে শুধু বলতে পারল, মানুষের জন্যে এত ভালবাসা অপনার?

ও কথা বল না রাজর্ষি। আমি খুবই ছোট মাপের মানুষ। আমারও স্বার্থ রয়েছে এখানে। একটি তরুণ অথবা তরুণী মেয়ে পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই ঝরে পড়ছে জানতে পারলে আমি নিশ্চয়ই তার জন্যে সাধ্যমত করতাম। কিন্তু উলু চৌধুরীর জন্যে কিছু করার ভেতরে আমার একটা ঋণ শোধের ব্যাপার আছে।

ঋণ শোধ! আপনার!

হ্যাঁ বাবা। কত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এ মেয়েটির হৃদয় আকুল করা গান শুনে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। সে ঋণ তো আমাকে শোধ করে যেতে হবে। পৃথিবীর কাছে, মানুষের কাছে আমরা যে কতভাবে ঋণ করি তার লেখাজোখা আছে।

সংবাদপত্র লিখল, অবশেষে তরুণী উলু চৌধুরীর আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, '—'নম্বর ফ্লাইটে আমেরিকা যাত্রার ছাড়পত্র মিলল। আমরা তার শুভগমন ও সুস্থদেহে প্রত্যাবর্তন কামনা করি। লস্‌এঞ্জেলসে ডাক্তার মেগুিসের চিকিৎসাধীনে থাকার অভিপ্রায় তাঁদের।

যাত্রার আগে একটি চিঠি এল। এক অত্যন্ত শুভার্থী মানুষ লিখেছেন। অসুখের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়।

তোমার যাত্রা শুভ হোক। তোমার মহীয়সী মা তাঁর একটি কিড়নিই শুধু তোমাকে দান করছেন না, পক্ষীমাতা যেমন করে তার পক্ষপুটে শাবককে আগলে রাখে, তেমনি করে তোমাকে আগলে নিয়ে চলেছেন অচেনা আমেরিকার পথে।

ভয় নেই, ওদেশে কয়েকবারই আমি গিয়েছি। আমি রাজনীতির ছাত্র নই। আমি শুধু বলতে পারি, রাজনীতির খেলার বাইরেও আর একটা আমেরিকা আছে, যেখানে হরগোবিন্দ খোরানা রিসার্চের সুযোগ পায় এবং নোবেল পুরস্কারও।

তুমি যখন যাত্রা করবে তখন জানবে ভারতের শত শত মন্দির, মসজিদ আর গীর্জায় তোমার জন্য

প্রার্থনা হচ্ছে। তুমি যে বিমানে যাত্রা করছ তা ভারী হয়ে উঠবে ভারতের অগণিত নরনারীর ঐকান্তিক শুভকামনা ও ভালবাসায়।

উলু রাতে তার ডায়েরীর পাতায় লিখল ঃ ঋষিকে ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে। ও-আমার প্রাণের বন্ধু, ও আমার নিভৃত অন্তরের সখা। আমি ঠিক যখনই ওর কথা ভাবি, একটু গভীরভাবে ভাবি, ও প্রায় তখনই আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। কখনও রক্ত মাংসের শরীরে, কখনও আমার কল্পনায়।

আমি অনেকদিন ভেবেছি, বন্ধুত্বের সংজ্ঞা কি? একের সুখদুঃখ অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা? পরস্পরের সমবেদনার অশ্রু নিজেদের তপ্ত বুকে মেখে নেওয়া? না আরও অতিরিক্ত কিছু? বন্ধুর জন্য বন্ধুর অনেক ত্যাগ স্বীকার? জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুর তুলনা করা চলে? বন্ধু বোধহয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককেও ছাড়িয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হতে পারে, সাংসারিক সম্বন্ধে চিড় ধরতে পারে, স্বার্থের সংঘাত আসতে পারে, কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধুত্বে কোন খাদ নেই, বিচ্ছেদের কোন প্রশ্ন নেই, আর পরস্পরের সাংসারিক জীবন থেকে দুজনে দূরে থাকে বলে ভাঙনের কোন ঢেউ এসে লাগে না পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে।

ঋষি চিরদিনই আমার বন্ধু হয়ে থাকবে, এ কথা যখনই ভাবি তখনই প্রথম বর্ষার ফুটে ওঠা কদম্বের মত রোমাঞ্চিত হই।

আচ্ছা, বন্ধুত্বের সঙ্গে ভালবাসার সীমারেখা কোথায়? আমি কি ঋষির সঙ্গে ভালবাসার সূক্ষ্ম বাঁধনে বাধা পড়ে গেছি? এটা কি বন্ধুত্বের অতিরিক্ত কিছু?

সে যাই হোক্, ঋষিকে ছেড়ে আমি অন্য গোলার্ধে যাচ্ছি।

আজ সন্ধ্যায় এসে আমার কাছে বসেছিল। কতক্ষণ আমরা গল্প করলাম, আবার কতক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটল। সারাক্ষণ ওর হাত ছিল আমার হাতের মুঠোয়। আমরা ঐ নীরবতার সময়গুলোতে দুজনকে বুকের গভীরে অনুভব করছিলাম।

কথা বলল ঋষি, আমরা পৃথিবীর দুটো বিভিন্ন দিকে থাকব, উলু। তুই যখন সূর্যের আলোয় স্নান করতে থাকবি তখন আমি রাতের গভীরে ডুবে থাকব। আবার তোর চন্দ্রোদয়ে আমার সূর্যস্নান।

আমি বললাম, আয়, আমরা একটা প্ল্যান তৈরী করি। যখন এ গোলার্ধে তুই ঘুমোবি তখন আমি শুধু তোর কথা ভেবে যাব। আর আমি যখন ঘুমের ভেতর ডুবে যাব তখন তুই ভাববি আমার কথা।

ঋষি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, দারুণ প্ল্যান। অক্ষরে অক্ষরে আমরা মেনে চলব।

কিন্তু ঋষি...

ও তাকাল আমার দিকে।

যদি দিনের আলোয় আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর সে ঘুম কোন দিনও না ভাঙে?

ঋষি তেমনি তাকিয়ে রইল।

আমি আবার বললাম, তাহলে সে অবস্থায় পরিকল্পনা ভাঙার দায়ে দায়ী করতে পারবি না আমাকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ঋষি। আমি তাকে ঠ্যালা দিয়ে বললাম, কি হল, একটা উত্তর তো দিবি?

ও এবার মুখ খুলল, প্রতিজ্ঞা করেছিলি না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবনটাকে ছিনিয়ে আনবি?

করেছিলাম।

তাহলে, সে ঘুম আর কোনদিনও ভাঙবে না, সে প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? নিজের মনের দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞাকে আবেগ দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করছিস কেন?

বেশ, আমি আমার ঘুমের কথাটা না হয় ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ও আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর পুরে নিয়ে বলল, উলু আমার বন্ধু, সে কখনও হারতে জানে না। সে লড়াই করে বাঁচার মত বাঁচতে জানে।

আমি তখুনি মনে মনে বললাম, ঋষি, তুই যদি আমাকে তোর মনের মধ্যে এমনি করে ধরে রাখিস চিরিদিন, তাহলে আমি মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে লড়াই করে নিশ্চয়ই জয়ী হব।

আজ ঋষি চলে যাবার পর কেন জানি না রবীন্দ্রনাথের গানের এই কটি ছত্র বুকের ভেতর গুঞ্জন করে ফিরছে।

'চিরসখা, ছেড়োনা মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর,
নির্জনসজনে সঙ্গে রহো।।'

।। ৫।।

তখন সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠেছে। ঝলমল করছে এয়ারপোর্ট।

সিকিউরিটি জানতে চাইল টাকার পরিমাণ।

সুদীপা বললেন, তাঁর কাছে যে ডলার আছে তার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'লাখ টাকা। তারা সুদীপার মুখ থেকে মেয়ের অসুখের কথা শুনে বেশি নাড়াচাড়া করল না। শুধু বলল, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে কোন বন্ধু এসেছে?

না।

তবে এয়ারপোর্ট থেকে এতগুলো ডলার নিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে গুলি করে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেবে।

সুদীপা বড় বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি সিকিউরিটির আওতার ভেতর একটি কোণে কাচের এনক্লোজারের ধারে বসে রইলেন। ক্লান্ত উলু মায়ের বুকে মাথা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নির্বান্ধব দু'টি অনভিজ্ঞ মহিলা।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একটি মুখ ভেসে উঠল কাচের এনক্লোজারের বাইরে। একটি তরুণীর মুখ। সন্ধানী দু'টি চোখের তারা এদিক ওদিক কাকে যেন খুঁজে ফিরছে।

চার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ মিলে গেল। মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল উলু। এস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে বাইরে দাঁড়ানো তরুণীটির দিকে।

জয়া।

বিস্ময়ে আনন্দে একাকার হয়ে গেল উলু। সুদীপা ততক্ষণে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও বিস্মিত।

জয়া আর তার স্বামী বিজয়তিলক ধরাধরি করে ওদের সুটকেশ দুটো বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

গাড়ি চালাচ্ছে বিজয়তিলক। পাশে বসে রয়েছেন সুদীপা। পেছনে উলু আর জয়া দুজন দুজনকে জড়িয়ে বসে আছে। স্কুল জীবনের দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

উলু বলল, এখন বলত, কেমন করে আমাদের আসার খবর পেলি?

জয়া অমনি সুদীপাকে লক্ষ্য করে বলল, বলুন তো মাসীমা, আমি কোথা থেকে খবর পেলাম, কেন ওকে বলতে যাব। ও কি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল ওর এই অসুখের কথা?

সুদীপা বললেন, ক্রটিটা অবশ্যই আমাদের দিক থেকে মা।

আপনাকে জড়াব না মাসীমা, ও কি দুটো বছর বন্ধুর কোন খোঁজ রেখেছে?

তুই তো বিয়ে করেই দেশ ছাড়লি, আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিলি? কাউকে দিসনি। তীর্থ একদিন আমার কাছে এসেছিল তোর ঠিকানার খোঁজে। আমি ফুলরাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর ঠিকানা জানে কিনা, কিন্তু সেখানেও ভোঁ ভোঁ। মাসীমা, মেসোমশাই শান্তিনিকেতনে উঠে গেছেন। এবার বল্, দোষটা আমাদের কোথায়?

জয়া মুহূর্তে ও প্রসঙ্গের ইতি টেনে দিয়ে উলুর ডায়ালিসিস করা হাতখানায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, নাচের সময় স্কুলের স্টেজে তোর এই হাতে কত মুদ্রা ফুটে উঠতে দেখেছি, কি করে

ডাক্তাররা এমন সুন্দর হাতখানায় ছুঁচ ফোটায় রে!

উলু বলল, ভাগ্য জয়া।

থাম্, ঠিক জায়গায় ঐ ভাগ্যেব দেবতাই তোকে এনে ফেলেছে। এখানে ডাক্তার মেণ্ডিস তোকে দেখবেন তো?

সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি জয়া, তুই কি করে জানলি আমি ডাক্তার রবার্ট মেণ্ডিসকে দেখাব বলে এখানে এসেছি?

লস্‌এঞ্জেলস্-এ এসেছিস যখন ঐ ধন্বন্তরি ছাড়া কাকে আর দেখাবি বল্? এ রোগে ওঁর জুড়ি সার্জেন দুনিয়ায় মেলা ভার।

জয়া ডাক্তার মেণ্ডিস সম্বন্ধে এ ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যখন করছিল তখন সুদীপার ক্লান্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাহলে ডাক্তার নির্বাচনে তাদের কোন ভুলই হয়নি। এখন অবশ্য ভাগ্যের দেবতাদের আশীর্বাদের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।

সুদীপা বললেন, আমরা প্রায় লাস্ট মোমেন্টে টিকিট পেয়ে চলে এসেছি। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের সময় সুযোগ কোনটাই হয়নি।

জয়া বলল, সবই হয়ে যাবে মাসীমা। আপনি জেনে রাখুন, উলু এখান থেকে সুস্থ হয়ে ফিরবে।

উলু বলল, আসল রহস্যের সমাধান কিন্তু এখনও হয়নি জয়া।

বেশ, ধাঁধার উত্তর এখুনি পেয়ে যাবি, আগে বল্, ক'দিন আমার ওখানে থাকবি?

কম করে বছরখানেক।

এবার উলুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জয়া ফিসফিসিয়ে বলল, পারব না ভাই অতদিন রাখতে। আমার সুন্দরী বন্ধুটির দিকে পতিদেবতার নজর চলে যাবে।

দু'বন্ধুতে এই সামান্য রসিকতায় খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে জয়া বলল, শুনুন মাসীমা, (এ্যই, তুই কান চেপে রাখ) আমি এখন ইংরেজির সঙ্গে একখানা করে বাংলা খবরের কাগজ রাখি। সেই খবরের কাগজে আগাম বিজ্ঞপ্তি ছিল কোন তারিখে, কত নম্বরে ফ্লাইটে আপনারা এখানে আসছেন। তার থেকেই আপনাদের আসার হদিস পাই। উলু এখানে আসছে অথচ আমি তাকে দেখতে পাব না, সে কি হয় নাকি।

উলু বলল, আমরা কত আনন্দ করতাম ইস্কুলে। কে কোথায় যে সরে গেল, কেউ আর কারুর কথা মনে রাখে না।

জয়া অমনি বলল, আমি দূরে সরে এসেছি ঠিক কিন্তু তোকে অন্তত ভুলিনি। জয় কে জিজ্ঞেস কর, ও আমার চেয়েও তোকে বেশি চেনে।

আবার হেসে উঠল উলু। অমনি বেজে উঠল গান। বিজয়তিলক টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছে। উলুর গলার ছ'খানা গান টেপ করা।

সুদীপা বিস্মিত! উলু অবাক।

কোথায় পেলি এ গান?

জয়া বলল, কি ভুলো রে তুই, একটুও মনে পড়ছে না?

উলু মাথা নাড়ল। এতগুলো গানের উৎস সে আবিষ্কার করতে পারল না।

আমার বিয়ের রাতটা তোর মনে পড়ে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর বাসরে বসে অনেকগুলো গান গেয়েছিলাম। তবে একসঙ্গে তো গাইনি, কথা, হাসি, হল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে গেয়েছিলাম।

সবই জয়ের বন্ধুরা টেপ করে রেখেছিল, তার থেকে জয়ই ষড় ঋতুর সংকলনটি আলাদা টেপ করে রেখেছে।

বাজছিল গান। আশ্চর্য! প্রতি ঋতুর বাছাই করা একটি করে গান ও গেয়েছিল। প্রকৃতি আর প্রেম পর্যায় থেকে নির্বাচিত গান। বর্ষা বসন্তের গানে ছিল প্রেমের রোমাঞ্চ আর শিহরণ। অন্য ঋতুগুলির কেবল মহিমার বর্ণনা। বড় দরদী গলায় সেদিন গানগুলো গেয়েছিল উলু। আজ নিজের গলার গান

শুনে নিজেকে চিনতে পারল না। একটা কান্না মেঘের মত গুমরে গুমরে উঠতে লাগল তার বুকের মধ্যে। চোখে সজল মেঘের ছায়া। আর কি কখনো সে এমন করে গান গাইতে পারবে। যা একবার হারায় তাকে কি সহজে ফিরে পাওয়া যায়। সে সুরের পাখি কণ্ঠের খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে বনের কোন্ বিজনে। আয়, আয় করে ডাকলেও, ভোগের থালা নিয়ে সাধলেও সে পাখি আর ফিরবে না।

শেষ গানটি বেজে উঠল ডি, এল, রায়ের গান।

'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা
ওগো সযতনে তুমি নাশিবে।
... ...
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
ওগো তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
আমার মুখপানে চেয়ে হাসিবে।'

এ গানের সুরে এমন একটি সকরুণ প্রতীক্ষার ভাব আছে যা প্রতিটি পিপাসু হৃদয়কে স্পর্শ করবেই।

গানটি শেষ হলে জয়া বলল, বিজয়তিলকের এটি সবচেয়ে প্রিয় গান। ও যে কতবার এ গানটা বাজায় তার হিসেব নেই। তুই এখন গান গাইতে পারবি না?

উলু শুধু মাথা নাড়ল। সে অক্ষম। চোখ দুটো তার বিপুল জলভারে টলমল করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি এসে ঢুকলো জয়াদের কম্পাউণ্ডের ভেতর।

পরের দিনই অসুস্থ উলুকে সামনের একটি হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। ক'দিন দুর্বলতার ভেতর কাটল তার কিন্তু মনের মধ্যে সব সময়ই আনন্দের আসা যাওয়া। এখানেও বন্ধুর জন্য বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপ।

জয়া বলে, তুই স্কুল ম্যাগাজিনে কত ভাল কবিতা লিখতিস, এখন সে সব চর্চা কি ছেড়ে দিয়েছিস?

উলু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে জানায়, সে কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছে। মুখে বলে, ডায়েরী লেখার অভ্যেসটা এখনও যায়নি। ঐ ডায়েরীর ভেতর কখনও কখনও দু'চার ছত্র এসে যায়।

ওদের কথার ভেতর ঘরে নক করে বিজয়তিলক।

আসতে পারি?

জয়া বলে, মহিলা মহলে নাক গলাবার দরকার কি মশাই?

উলু বিছানার ওপর উঠে বসে মিষ্টি হেসে বলে, আসুন আসুন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে বিজয়তিলক।

জয়া বলে, ও তোর গান শুনতে এত ভালবাসে, তুই আসবি শুনে ক্যাসেট রেডি করে রেখেছে।

উলু ম্লান হেসে বলে, আমার দুর্ভাগ্য, এ যাত্রায় গৃহস্বামীকে গান উপহার দিতে পারলাম না।

বিজয় বলে তাতে কি হয়েছে, সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে একখানা ক্যাসেট গানে ভরে পাঠিয়ে দেবেন।

আবার হাসল উলু: মনে থাকবে।

সেই সন্ধ্যায় সবার চোখের আড়ালে ও একটা কবিতা লিখল।

যখন ওরা স্বামী-স্ত্রীতে সুদীপাকে নিয়ে সামান্য টুকিটাকি মার্কেটিংএ বেরুল তখন বিজয়তিলকের পড়ে থাকা ক্যাসেট আর টেপ রেকর্ডার নিয়ে উলু বসে গেল সেই কবিতাটা টেপ করতে। বার বার নিজের কণ্ঠস্বর মুছে ফেলল। শেষে নিজে যখন নিজের স্বাভাবিক গলার স্বরটুকু চিনতে পারল তখন কবিতাটা ক্যাসেটের মধ্যে ধরে যথাস্থানে রেখে দিল।

লস্এঞ্জেলস্এ সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেন্টারে যাবার দিন গাড়িতে বসে উলু বলল, জয়া, এবার তোদের কোন গান উপহার দিতে পারলাম না। তুই কবিতার কথা বলেছিলি না? তোদের জন্যে

অক্ষম হাতের এক টুকরো কবিতা রেখে এসেছি।

কোথায় রেখে এলি?

সংগোপনে, সবার অগোচরে বন্ধু বিজয়তিলকের নতুন ক্যাসেটে তুলে রেখে এসেছি।

সেদিন সুদীপা আর উলুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে রাতে ফিরে এল জয়া আর বিজয়তিলক। বিশ্রামের মাঝে চালিয়ে দিল টেপরেকর্ডার। নতুন ক্যাসেটে বেজে উঠল উলুর মিষ্টি গলা। পুরনো গানের মত সতেজ নয় এ কণ্ঠ, তবু মায়াময়। ক্লান্তির ভেতরেও আশ্চর্য এক জীবনের স্পন্দন আছে।

প্রবাসে সুজন বন্ধুর আশ্রয়ে
যে আতিথ্য পেলাম,
তার উষ্ণতা ভরে নিয়ে গেলাম
আমার হৃদয় পাত্রে।
ভোরবেলা জানালা খুলে
প্রতিদিনই দেখেছি আমি সেই পাখিটিকে,
যে আমাকে গান শুনিয়ে যেত,
সুন্দর সোনালী জীবনের স্বপ্নেভরা গান।
সে গানে সে বলত—
তোমাকে দিলাম আমার সুর
যে সুর তোমাকে পৌঁছে দেবে
জীবনদেবতার আনন্দ ভবনে।

রোজই কোন না কোন ফুল
কুঁড়ির ঘোমটা খুলে তাকাত।
তাদের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলেই
দুলে দুলে বলত, দেখ জীবন কত সুন্দর!
অফুরন্ত আনন্দের রঙ লাগিয়ে দিলাম
তোমার চোখে।

অনন্ত ঘুমের অতলে যদি কোনদিন
তলিয়ে যাই আমি—
তখনও এই পাখির গানে,
এই ফুলের ঘোমটা খোলার উৎসবে
আমি বেঁচে থাকব, রোদের মত সোনালী উত্তাপে ভরা
তোমাদের ভালবাসায়।

সুন্দর একটি চ্যাপেল। সংলগ্ন খ্রীষ্ট সেবিকাদের আবাস। তাঁদের দ্বারা পরিচালিত (ডটারস্ অব চ্যারিটি) হাসপাতাল—সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেন্টার।

কো-অর্ডিনেটার বারবারা এগিয়ে এসে বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, আপনারা অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন। আপনাদের প্রয়োজন কি? কোত্থেকেই বা আসছেন?

সুদীপার গলা কাঁপছে, আমরা ইণ্ডিয়া থেকে আসছি, এই হাসপাতালের ডাইরেক্টর ডাক্তার মেণ্ডেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আগে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন?

না, একেবারে ইণ্ডিয়া থেকে সোজা তাঁর কাছে চলে এসেছি।

অপেক্ষা করুন—বারবারা ভেতরে চলে গেলেন। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, আপনারা

সামনের ঐ রুমে চলে যান, ডাক্তার মেগুেস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সুদীপা ঘরে ঢুকেই দেখলেন, দীর্ঘদেহী সৌম্যদর্শন এক পুরুষ বসে রয়েছেন। মুখে প্রসন্নতার একটা আলো এসে পড়েছে।

সুদীপার এতদিনের রুদ্ধ আবেগ, বেদনা এই মানুষটির কাছে মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ডাক্তার মেগুেসের সামনে তিনি নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

ডাক্তার মেগুেস উঠে দাঁড়ালেন। সুদীপার মনে হলো, ঐ পোশাকের আড়ালে যীশুখ্রীষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন।

সুদীপার হাত ধরে তুললেন মেগুেস। সামনের চেয়ারে দুজনকে বসতে বলে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

বল, আমি তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?

সুদীপা তখনও আবেগমুক্ত হননি। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, দুটো কিড়নিই নষ্ট হয়ে গেছে আমার মেয়ের। তুমিই ডাক্তার এই দুঃখী মেয়েটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পার। বহু কষ্টে বহুদূর থেকে আমি তোমার নাম শুনে ছুটে এসেছি। অতি সামান্য ক'টি ডলার আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

ডাক্তার মেগুেস সুদীপার সঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। তিনি কো-অর্ডিনেটর বারবারাকে ডেকে বললেন, নার্সদের টেবিল রেডি করতে বল, আমি এখুনি এই পেসেন্টকে এগজামিন করব।

একজামিন শেষ করে ডাক্তার নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন। সুদীপাকে বললেন, কিড়নি কোথায়?

আমি দেব, ডাক্তার মেগুেস। এই দেখুন আমার ব্লাড, টিসু এবং অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্ট।

ডাক্তার ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মনে মনে কিছু ভাবলেন। আবার বারবারাকে ডাকলেন ডাক্তার মেগুেস।

পেসেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ, এখুনি ব্লাড দেবার ব্যবস্থা কর। অপরেশানের একটা ডেট তাড়াতাড়ি ফিক্স করলে ভাল হয়। হ্যাঁ আর একটা কথা, মাদার কিড়নি দেবে। এই মহিলার বাইরে না থাকাই ভাল। নানারীতে কয়েকদিন থাকার একটা ব্যবস্থা করে দাও। অপারেশানের আগে হসপিট্যালে এনে রাখবে।

উলু আর সুদীপা বারবারার সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন।

নার্স এল উলুকে বেডে নিয়ে যাবার জন্য।

আমি যাচ্ছি মা।

দীর্ঘদিন পরে মা আর মেয়েতে এই ছাড়াছাড়ি। সুদীপা বললেন, কোন ভয় নেই মা, তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

উলু বলল, না মা, আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না। তুমি তো রয়েছ।

উলু চলে গেলে সুদীপার বুকটা হু হু করে উঠল। তিনি উদাস দৃষ্টিতে সামনের গীর্জার চূড়ার দিকে চেয়ে রইলেন।

বারবারা এবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বাস্তবে। হাতে একটা বিল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই অ্যামাউন্টটা এখন দিয়ে দিতে হবে।

সুদীপা দেখলেন কুড়ি হাজার ডলারের একটা বিল।

সব কুড়িয়ে আমার কাছে বার হাজার ডলারের মত রয়েছে, এর বেশি একটিও নেই।

এবার বারবারা একাই ডাইরেক্টর মেগুেসের চেম্বারে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, দাও, যা আছে তাই দাও। তুমি দারুণ লাকি। ডাইরেক্টরের সুনজরে পড়ে গেছ। ডাক্তার মেগুেস বললেন, অলৌকিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ও যা দিতে পারে তাই নাও, ওকে প্রেসার দিও না।

কনভেন্টে সাময়িকভাবে থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হলো সুদীপার।

ঠিক পনের দিন পরেই ফিক্স হলো অপারেশানের ডেট।

পাঁচদিন থাকতেই হাসপাতালে আনিয়ে নেওয়া হল সুদীপাকে।

অপারেশানের দু'দিন আগে ঋষির চিঠি নিয়ে এল জয়া আর বিজয়তিলক। ওদের ঠিকানা দিয়েই ঋষিকে চিঠি লিখেছিল উলু।

ঋষির হাতের লেখা দেখেই উলু উল্লসিত হয়ে উঠল। চিঠিখানা ওদের সামনে খুলে পড়ল না সে। বালিশের পাশে রেখে দিল।

তোদের কত কষ্ট দিচ্ছি জয়া। পরশু এসেছিস, আবার আজ এলি।

তোকে হাসপাতাল থেকে যেদিন মুক্ত করে আমার ডেরায় নিয়ে যেতে পারব সেদিনই হবে আমাদের ছুটোছুটির শেষ।

ম্লান একটা হাসি উলুর মুখে ফুটে উঠতে দেখেই জয়া বলল, হাসছিস যে বড়? এই বলে যাচ্ছি, কিছুদিনের ভেতরেই দেখবি তোর সেই চেনা পাখিটা উড়ে এসে জানলার বাইরে গাছের ডালে বসে গান গাইছে আর তুই বিছানায় বসে ওর গান শুনছিস।

উলু বলল, সেদিনটা যেন ফিরে পাই। তাহলে সবাই মিলে গান আর গল্পের মজলিস বসাব।

বিজয়তিলক বলল, অবশ্যই।

জয়া বলল, আজ উঠছি রে। ওকে কাজের ব্যাপারে খানিকটা দূরে যেতে হবে। যাবার আগে মাসীমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

ওরা পাশের ঘরে উঠে যেতেই ঋষির চিঠিখানা প্রবল আগ্রহে হাতে তুলে নিল উলু। উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল তার।

চিঠিতে ঋষি লিখেছে ঃ

প্রিয় উলু, দমদম থেকে তোদের প্লেন আকাশে মিলিয়ে যাবার পর সেই যে মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিলাম, আজ তোর চিঠি পেয়ে তার অবসান হল।

তুই জয়ার কথা লিখেছিস, ওকে চিনব না কেন। সবার পেছনে লাগত, কিন্তু ওর কথায় কোন খোঁচা ছিল না। আনন্দ কৌতুকে ও আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তুই জয়ার সঙ্গে তোর হঠাৎ যেভাবে দেখা হয়ে যাবার কথা লিখেছিস, তা পড়ে যে কোন লোকের মনে হবে, এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

জয়ার বিয়েতে আমরা পনেরজন বন্ধু চারটে ব্যাচকে সমানে পরিবেশন করে গেছি। তুই তো গানে মাৎ করে দিয়েছিলি।

ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়ে যাওয়াটা আমাকে এমনি নাড়া দিয়েছে যে আমি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বসে আছি, একটা অঘটন ঘটবেই। আর সে অঘটন ঘটাবেন ডাঃ মেণ্ডেস। তোর সুস্থ হয়ে ফিরে আসাটা আমার বুকের মধ্যে খোদাই হয়ে গেছে।

বহুদিন একটি মানুষের কথা বলব বলব বলে বলা হয়নি। সেই নিঃস্বার্থ, পরোপকারী মানুষটি না থাকলে আজ আমার পক্ষে সব আয়োজন করে তোকে আর মাসীকে ওখানে পাঠান সম্ভব হত না। তিনি নাম প্রচারে অনিচ্ছুক তাই দেশে থাকতে ওঁর কথা তোকে বলিনি। সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আয়, ওঁর সঙ্গে তোর আর মাসীমার আলাপ করিয়ে দেব। প্রাচীনকালের ঋষিদের মত উনি প্রায় তপোবনের জীবন-যাপন করেন। ছেলেদের পড়া বুঝিয়ে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। এ যুগে এ কথা ভাবতে পারিস? এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটির কাছে দাঁড়ালে বোঝা যায় মনুষ্য সমাজে আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

মাসীমাকে বলিস, আমার সমস্ত কাজের উৎস তাঁর অফুরন্ত প্রেরণা। সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অপরিচিত অবস্থায় কেউ যে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কঠিন একটা লড়াই এর মধ্যে, তা ভাবাই যায় না।

তুই লিখেছিস, যদি অপারেশান সাকশেসফুল হয় তাহলে আরও এক দেড় বছর ওখানে থাকতে হবে। তা হোক, অপারেশানের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে বৈকি। আমি মাঝে মাঝে কিছু টাকা তোর কাছে পাঠিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

তুই লিখেছিস, আমি যেন শরীরটাকে ঠিক রাখি। অত সহজে আমার শরীর টসকায় না রে। ফিরে এসে দেখবি, আমি একটা জাম্ববান হয়ে গেছি।

শোন, তুই আমাকে চিঠি লিখে যাবি, আর আমি তোকে টাকার পর টাকা (তো যত সামান্যই হোক)

পাঠিয়ে যাব। অন্তত সে টাকায় তোর খাম কেনার খরচটা তো উঠবে।

আর শোন, আমি সেদিন ডাক্তার মেণ্ডেসের স্বপ্ন দেখেছি। হুবহু তুই যেমন লিখেছিলি। ঠিক তেমনি লম্বা, সৌম্য চেহারার মানুষটি।

কোথায় দেখা হলো শুনতে নিশ্চয় তোর কৌতূহল হচ্ছে। একেবারে আমাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের ঘরে। স্যারের চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছেন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমি অন্ততঃ তিনবার চোখ মুছে ওঁর দিকে তাকালাম। ডাক্তার মেণ্ডেস তো?

আমার দিকে চোখ পড়তেই উনি গোটা তিনেক আঙুল নেড়ে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, এত উদ্বিগ্ন হলে চলে। সুস্থির হয়ে ভাববে, কাজ করবে, তবেই জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমার মিষ্টি বন্ধুটি ভালই আছে, আমি জানি, ও আমার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখেছে, তাই আমার অপারেশানের কাজটাও সহজ হয়ে যাবে।

স্বপ্ন ভেঙে যেতে মনে হল, ইনি এমন এক ডাক্তার, যাঁর ওপর নিশ্চিন্তে সব ভাবনা ছেড়ে দেওয়া যায়। হ্যাঁ শোন, তোর গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছি। একটি গরবিনী গোলাপ ফুটেছে। তোর জন্যে অনেক শুভেচ্ছা আর মাসীমার জন্য প্রণাম রইল।—ঋষি।

সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেন্টারের কাজ নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। বারবারা অপারেশানের আগের করণীয়গুলো করতে শুরু করে দিয়েছেন। নিয়মমাফিক কাজ। সুদীপার বেডের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কি স্বেচ্ছায় কিড়নি দিচ্ছ, না অন্যের প্ররোচনায়?

আমি শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দেই দিচ্ছি।

আবার বারবারার প্রশ্ন, তুমি কি হিন্দু?

প্রশ্নের নিহিত অর্থটা বুঝলেন সুদীপা। বললেন, আমি হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, কোন ধর্মাবলম্বীই নয়। আমি মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী। আমার মেয়েও তাই।

একটু থেমে বললেন, আমাদের মৃত্যু হলে তোমাদের সুবিধে মত সৎকার কোর। আমাদের কোন কিছুতে আপত্তি নেই।

অপারেশানের দিন ভোরবেলা বারবারা এসে বললেন, আজ দশটায় শুরু হচ্ছে অপারেশান, তোমার কিছু বলার আছে?

সুদীপা বললেন, অপারেশান থিয়েটারে যাবার আগে আমি কি আমার মেয়ের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারব?

বারবারা বললেন, নিশ্চয়ই। তোমার পাশেই হটলাইনের ব্যবস্থা আছে, কথা বল।

সুদীপা ফোন করলেন, উলু, কেমন মনে হচ্ছে মা?

ব্যাপারটা দারুণ থ্রিলিং মনে হচ্ছে মা। জন্মের সময় একবার তুমি আমার ভেতর প্রাণের স্পন্দন এনে দিয়েছ, আবার তুমিই আমাকে পুনর্জন্ম দিতে চলেছ মা।

কোন ভয় নেই সোনা, আমরা ঠিকই এখানে নতুন জন্ম পেয়ে বাড়ি ফিরে যাব।

ফোনটা রেখে দিতেই একটা মুখ মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল সুদীপার চোখের সামনে। সে মুখ তার স্বামীর।

সুদীপা সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত জোড় করে মনে মনে বললেন, আজ জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য তোমার আশীর্বাদ চাইছি। অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একদিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নানেরা, অন্যদিকে নার্স আর ডাক্তারের দল। মাঝখান দিয়ে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রথমে এল উলু। মায়ের স্ট্রেচারের পাশে এসে দাঁড়াল তার স্ট্রেচার। বারবারা বললেন, মেয়েকে আশীর্বাদ কর।

সুদীপা চোখ বন্ধ করে মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এরপর ডাক্তার, নার্স ও

নানেরা ক্রস করে উলুর কপালে চুম্বন করলেন।

সাত তলায় অপারেশান থিয়েটার। লিফটে উঠে গেল উলু।

এবার মায়ের পালা। মেণ্ডেসের কাছে স্ট্রেচার আসতেই মেণ্ডেস বললেন, ঈশ্বরের কাছে তোমার এবং তোমার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা কর।

হঠাৎ সুদীপার মনে হলো তাঁর সামনেই মেণ্ডেসের মূর্তিতে স্বয়ং ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখিনি, তুমিই আমাদের ঈশ্বর। তুমিই আমাদের আশীর্বাদ কর।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপার ভুল সংশোধন করে বললেন, ও কথা বোল না। বরং বল, প্রভু, তুমি ডাক্তার মেণ্ডেস এবং তাঁর সমস্ত দলকে আশীর্বাদ কর।

প্রভুর আশীর্বাদ পেলে আমরাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাব।

সাত তলায় পাশাপাশি দু'টি কাচের ঘরে দু'টি অপারেশান টেবল। ডক্টর বোগার্ড করবেন সুদীপার অপারেশান। ডক্টর মেণ্ডেস আর ডক্টর চ্যাটার্জী করবেন উলুর অপারেশান। সাতশো কিঃ মিঃ দূর থেকে ডক্টর মেণ্ডেসের ডাকে উড়ে এসেছেন ডক্টর চ্যাটার্জী।

মা মেয়ে দুজনই দুজনকে দেখছে কাচের ভেতর দিয়ে। দুজনই হাত তুলল, পবিত্র সুন্দর হাসিতে পরস্পর পরস্পরের অন্তর ভরে দিল।

ডাক্তার ইনজেকশান দিলেন। একটা মিষ্টি ঘুম নেমে এল। চেতনা লুপ্ত হলো।

ধীরে ধীরে যখন চৈতন্য ফিরে এল তখন দূরাগত ধ্বনির মত কানে বাজতে লাগল,—তুমি ও তোমার মেয়ে দুজনেই সুস্থ রয়েছ। তোমার কিড্‌নি তোমার মেয়ের শরীরে সুন্দরভাবে কাজ করে চলেছে।

ওদিকে উলুর ঘরেও শোনা যেতে লাগল ঐ একই সম্প্রচার। ডক্টর চ্যাটার্জীকে দিয়ে বাংলায় টেপ করিয়ে ডক্টর মেণ্ডেস প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন।

অপারেশানের পরের সতেরোটি মাস মা ও মেয়ের প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে দিন যাপন। সপ্তাহে এক-দু'বার করে ডাক্তার মেণ্ডেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তিনি পরীক্ষা করে পরবর্তী সপ্তাহে পুনরায় আসার নির্দেশ দেন। এমনি চলতে থাকে পরীক্ষা। সুদীর্ঘকাল পরীক্ষার পরেই পাওয়া যাবে দেশে ফেরার অনুমতি।

এই চিকিৎসার অর্থ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? হসপিট্যালের ঋণ জমে যাচ্ছে পর্বত প্রমাণ। মাঝে মাঝে বারবারা হাতে ধরিয়ে দেন বিল। কর্তৃপক্ষ আর ঋণ ফেলে রাখতে চান না। যেমন করেই হোক শোধ দিয়ে দিতে হবে। সুদীপা বিল হাতে নিয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকেন মেণ্ডেসের ঘরের সামনে। চোখ পড়লেই মেণ্ডেস হাতছানি দিয়ে ডাকেন।

সুদীপা কান্না ভেজা চোখে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বলে যান।

ডক্টর মেণ্ডেস বলেন, ওঁরা নিয়ম মেনে কাজ করেন তাই স্বাভাবিকভাবেই বিল তোমার হাতে দিয়ে যান। তুমি বিলটা আমার হাতে দিয়ে যেও, আমিই পেমেন্ট করব।

দ্বিতীয়বার ডক্টর মেণ্ডেসের কাছে নত হয়ে চোখের জলে কৃতজ্ঞতা জানালেন সুদীপা।

বাংলাদেশ আকাদেমী, বিভিন্ন বাঙালী প্রতিষ্ঠান মা মেয়েকে সাহায্যের জন্য সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। প্রাণঢালা গান গাইলেন সুদীপা সে সব অনুষ্ঠানে। বেতারের 'এ' গ্রেড আর্টিস্ট তিনি। মেয়েও বেতার শিল্পী। দুজনের গান শ্রোতাদের প্রাণ স্পর্শ করল। তাঁরা বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করলেন মা ও মেয়েকে।

বাংলাদেশ আকাদেমীর অনুষ্ঠান শেষে জয়া আর বিজয়তিলকের সঙ্গে ফিরছিল ওরা। টাকার চেকখানা জয়ার হাতে তুলে দিয়ে উলু বলল, রেখে দে এটা।

জয়া নিজের ব্যাগে সেটা পুরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে বলল, আগের দুটো চেক আমার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিলি, কই হসপিট্যালের বিল মেটালি না তো? ও বিল ফেলে রাখার নয়। সব ফেলে আগে ঐ ঋণশোধ করে যা।

হাসল উলু, হাতটা টিপল জয়ার। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ, 'রেখে দে না।'

বুদ্ধিমতী জয়ার বুঝতে বাকি রইল না যে, উলু একই সঙ্গে হসপিট্যাল ও জয়াদের ঋণশোধের একটা তাল করছে।

জয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, জয়, গাড়ি ঘুরিয়ে উলুকে হসপিট্যালে অথবা এয়ারপোর্টে পৌছে দাও। ও যেখানে যেতে চায় যাক্।

উলু হাসছে দেখে জয়া আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, কি কুক্ষণেই না এয়ারপোর্টে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আশ্চর্য, ভেবেছিস কি তুই!

সুদীপা বললেন, তোমাদের দু'বান্ধবীর ভেতর আমি কি কোন কথাই বলতে পারব না মা?

একদম না, মাসীমা। পরে যা বলবেন, কান পেতে শুনব আর মাথা পেতে মেনে নেব।

অগত্যা সহযোগী যোদ্ধা ছাড়াই দু'বন্ধুতে লড়াই চলল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আকাদেমীর চেকখানা জয়া জোর করে গুঁজে দিয়েছে উলুর হাতে।

উলু বলল, বেশ, এ চেকখানা না হয় আমি রেখে দিচ্ছি। কিন্তু যদি কখনও হসপিট্যালের বিল মিটিয়ে তোকে দেবার মত দিন আসে তাহলেও নিবি না?

জয়া বলল, আমি কি কিছু আসা করে তোকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি? না, আমার স্বামী দুজন অতিথিকে খাওয়াতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বলে তোর এ করুণা?

উলু এবার গলা তুলে বলল, তুই আমাদের আলোচনার ভেতর আবার বিজয়তিলককে টেনে আনছিস কেন? তোদের ভালবাসার দানকে আমি লঘু করে দেখছি এ ধারণা তোর এল কোথা থেকে! যা করেছিস তোরা, তা যে কোনভাবেই পরিশোধের নয়, এটুকু বোঝার ক্ষমতা কি আমার লোপ পেয়েছে জয়া?

জয়া বলল, একজন অসুস্থ বান্ধবীর জন্যে যে কেউই করত এটুকু। একে মস্ত বড় করে দেখার কিছু নেই।

ও কথাটা আমি মেনে নিতে পারলাম না জয়া। থাক তর্ক। তুই আমাকে আগের দুটো অ্যামাউন্ট দিয়ে দিস। তিনটে মিলিয়ে হাসপাতালের খানিকটা শোধ হয়ে যাবে।

বিজয়তিলক হেসে বলল, হোলি অ্যালায়েন্স। বলেই চালিয়ে দিল টেপ—

'এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসের অবলুণ্ঠন সারা হল।।

... ...
শিশির সিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব প্রণয় দোলায় দোলো।।'

বাসরের সেই গান। সলজ্জ জয়ার চোখের পাপড়ি খুলে যাচ্ছে, ওষ্ঠে ফুটে উঠছে প্রণয়-মধুর হাসিটি। উলুর কণ্ঠ মাতোয়ারা করে তুলেছে বাসর ঘরে বন্দী ক'টি হৃদয়।

গাড়ির ভেতরেই জয়া জড়িয়ে ধরেছে উলুকে। নিঃশব্দে দু'বান্ধবীতে বসে বসে ছবি দেখছে। সেদিনের সে বাসর ঘরের মুগ্ধ ক'টি মুহূর্তের ছবি।

ফিস্ ফিস্ করে জয়া বলল, সেদিনগুলোকে তুই অক্ষয় করে রেখেছিস তোর গানে। তোর ঐ ঋণ আমি শুধব কেমন করে বল?

এমন ঋণও আছে জয়া যা কখনও শোধ করা যায় না। শোধ দিতে গেলে ঋণদাতাকে আহত করা হয়।

কেমন করে তোকে বোঝাব উলু তুই আমাদের দুজনের জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিস কতখানি।

আমার হৃদয়ের পেয়ালাটা কিন্তু অপূর্ণ নয়। তোরা আমাকে গান দিতে পারিসনি ঠিক কিন্তু প্রাণের উত্তাপে বুকখানা ভরে দিয়েছিস। আমি যে মৃত্যুর অন্ধকার ঠেলে আলোর জগতে আবার ফিরে এলাম তোদের প্রাণের সোনার সুতোর টানে।

জয়া কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে বলল, যদি টেনেই এনে থাকি তাহলে সেটা নিজেদেরই স্বার্থে। তোর মুখে গান শুনব বলে।

আমেরিকার পর্ব শেষ হবার আগে একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে উলু তার সতেজ গলায় একখানি গান উপহার দিল—'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।'

উপস্থিত সকলের বুকেই সেদিন স্মৃতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল।

সতেরোটি মাস শেষ হলো আর শীতের চাদর সরে গিয়ে দ্বিতীয়বার বসন্ত নামল লসএঞ্জেলসের প্রসারিত গাছের শাখায়।

'ডটার্স অব চ্যারিটি' চ্যাপেলের বাগানে যে গাছগুলি সুদীপাদের আসার সময় সোনালী আর বাদামী পাতা ত্যাগ করেছিল তাদের ডালে ডালে এখন ফুলের মহোৎসব। আপেলের ডাল সাদা আর পিঙ্ক ফুলে বসন্তকে আহ্বান জানাচ্ছে। পাখিরা সুরের জলসায় মেতে উঠেছে।

মা ও মেয়ে পরীক্ষার জন্য এসে দাঁড়ালেন মেডিকেল সেন্টারে।

ডক্টর মেগুেস পরীক্ষার শেষে ওদের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চ্যাপেলের চূড়ার ওপরে নীল আকাশ। ফলের বাগান থেকে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি।

মেগুেস উলুর পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি এখন অনেক সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছ। দেশে ফেরার জন্য মনে কেমন করছে, তাই না? তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার। আমি প্রেসক্রিপশান লিখে ছেড়ে দেব।

উলু আবেগে ডাক্তার মেগুেসের হাতখানা মাথায় তুলে নিল।

সুদীপা বললেন, ডাক্তার মেগুস, আপনি ওর প্রাণ দিয়েছেন। আমরা সব দিক থেকে আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

মেগুেস হেসে বললেন, তোমাদের গানের একখানা ক্যাসেট আমার জন্যে পাঠিয়ে দিও, তাতেই যত ঋণ সব শোধ হয়ে যাবে।

ডাক্তার মেগুেসের প্রেসক্রিপশান নিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে একটা মেডিকেল স্টোরে। সুদীপা কেমিস্টকে বলল, আপনাদের একটা বিল পেমেন্ট করা হয়নি, অনুগ্রহ করে সেটা নিয়ে নিন, আর এই নতুন প্রেসক্রিপশানের ট্যাবলেটটা রোগীর জন্য বিশেষ জরুরী, ওর এক শিশির দাম কত যদি জানতে পারি তাহলে ভাল হয়।

কেমিস্ট এক শিশি, মানে একশোটা ট্যাবলেটের দাম যা বলল তা কেনার সামর্থ ছিল না সুদীপার। কিন্তু এ ট্যাবলেট দীর্ঘকাল মেয়েকে রোজ কয়েকটি করে খেয়ে যেতে হবে। দেশে এ ট্যাবলেট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেমিস্ট সুদীপাদের পূর্ব পরিচিত। বয়স্ক মানুষটি সুদীপার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন। সুদীপা অকপটে সব কথা বললেন। উলুকে নি৻ খুব মজা করতেন ভদ্রলোক। বললেন, ডক্টর মেগুেস ছেড়ে দিলেন আর তুমি চলে যাচ্ছ? আমাদের ছেড়ে যেতে একটু মায়া হচ্ছে না?

উলু মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল। ভদ্রলোক সুদীপাকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে ভেতরে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন বেরুলেন তখন হাতে একটি প্যাকেট। উলুর হাতে প্যাকেটটি দিয়ে বললেন, এই ওষুধ কোম্পানির ডাইরেক্টারকে তোমাদের কথা জানিয়ে আমি ফোন করেছিলাম, তিনি দশ শিশি সুন্দর প্যাকেটে মুড়ে তোমাদের উপহার দিতে বলেছেন।

সুদীপা আর উলুর ধন্যবাদ জানাবার ভাষা ছিল না। মা মেয়ে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে করমর্দন করে বেরিয়ে এল।

আবার সেই আকাশ পথে ঘরে ফেরা। দমদমের মাটি স্পর্শ করামাত্র উলুর চোখ ভিজে উঠল। কলকাতা, তার প্রিয় কলকাতা। সমস্ত অপূর্ণতার ভেতরেও কি দুর্বার আকর্ষণ তার। মৃত্যুর প্রাসাদের গোলকধাঁধায় সে হারিয়ে গিয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে ফিরেছে। হাজার দরজা, পায়নি পথ। অবশেষে এক দয়ালু পুরুষ তাঁর হাত ছুঁইয়ে দিতেই আসল দরজা খুলে গেল। মৃত্যুর অতল থেকে সে উঠে এল

আনন্দময় জীবনের কূলে।

এনক্লোজারের বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে! উলু বলল, মা, তুমি মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসো, আমি গেটের কাছেই রয়েছি।

দ্রুত পা চালিয়ে উলু গেটের দিকে আসতে লাগল। পলকহীন দুটো চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। লসএঞ্জেল্‌সের পথে চলার সময়, সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছে এই চোখের স্পর্শ।

ঋষির কাছটিতে এসে দাঁড়াল উলু! কারো মুখে কোন ভাষা নেই। দুজনে শুধু দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় ঋষি তার লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ধরল উলুর হাত। সঙ্গে সঙ্গে উলুর চোখ থেকে ঝরে পড়ল একরাশ যুঁই ফুল। ঋষি বন্ধুর মাথাটিকে পরম আদরে বুকের কাছে চেপে ধরে রইল।

সুদীপা এলেন এনক্লোজারের বাইরে। উলু ততক্ষণে তার সিক্ত চোখ দুটো মুছে নিয়েছে।

ঋষি সুদীপাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সুদীপা ঋষিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার ছোট্ট গোপাল মূর্তিটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাবা। তাকে যখনই পুজো সেরে আদর করতে গিয়েছি তখনই তোমার মুখখানা ভেসে উঠেছে সেখানে।

ঋষি গাড়ি ঠেলে সুটকেশ দুটো এনে তুলল ট্যাক্সিতে। ওদের দুজনকে পেছনে বসিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল সে, উলু তাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসালে। গাড়ি ছুটে চলল ভি. আই. পি. রোড ধরে। উলুর পাঁচটা আঙুলে ঋষির পাঁচটা আঙুল তখন বন্দী হয়ে আছে। তারা কোন কথা বলছে না, কিন্তু আঙুলের স্পর্শে অনেক অন্তরঙ্গ কথা বলে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে কেবল সুদীপার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে ঋষি। উলু এখন তাকিয়ে আছে ইস্টার্ণ বাইপাসের প্রসারিত প্রান্তরের দিকে। সে যখন এ পথ দিয়ে প্লেন ধরতে গিয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল, এ পথ তার জন্য আর কোন দিনও খোলা থাকবে না। কিন্তু আজ তার মনে হলো, পথ বন্ধ হয় না কোনদিন। সে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বিশ্ব পরিক্রমা করে বেড়ায়। মৃত্যুলোকেও হয়ত এমনি একটা কোন পথ আছে। অন্ধকার সে পথে চলতে চলতে হঠাৎ আলোকিত একটা পথে এসে পড়া যায়।

ঘরের দরজায় এসে গাড়ি থামতে ওরা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল। উলু আগে ছুটে গেল তার বাগানের দিকে। সিঙ্গাপুরী রঙন গাছটা থোকা থোকা লাল ফুলে বাগান আলো করে রেখেছে। শুধু কি লাল ? লালের মাঝে মাঝে এক একটা হলুদের ফুলকি। ঠিক যেমন দগদগে লাল আগুনের সঙ্গে সোনালী হলুদ আগুন ঝলসে ওঠে।

এ বাড়িতে প্রাণের যে আগুনটুকু নিভু নিভু হয়েছিল অনুকূল বাতাসের ছোঁয়ায় তাই যেন জ্বলে উঠেছে শত শিখায়।

উলুর সফল অপারেশান আর ফিরে আসার খবর বেরুল সংবাদপত্রে। তার সঙ্গে উলুর একছত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—'সবারে আমি নমি।'

এবারও ডাকবাক্স প্রতিদিনের শুভেচ্ছাপূর্ণ চিঠিতে ভরে উঠল।

যে সব আত্মীয়স্বজন সুদীপার আমেরিকাযাত্রাকে অতিরিক্ত দুঃসাহসিকতা ভেবে মনে মনে বিরূপ হয়েছিলেন, তাঁরাই আগে এসে মা আর মেয়েকে প্রশংসার বাণীতে প্লাবিত করে দিয়ে গেলেন।

আজ উলুর চোখে সব রঙই উজ্জ্বল, সব মানুষই আনন্দময়। পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলেই একরাশ হাসি ছড়িয়ে আলাপে মেতে উঠছে।

ঋষি এসে বলে, এই যে ভি, আই, পি, শেষ হলো জন সংবর্ধনা?

উলু হেসে বলে, কেউ ভি, আই, পি, খেতাব পায় প্রতিভায় কেউ বা পায় জীবন-সংকটে। শেষেরটাই আমার শিরোপা।

গল্প চলে দুজনের। সময় গড়িয়ে যায় কোথা দিয়ে কেউ টের পায় না। ডাক্তার মেণ্ডেস, জয়া, বিজয়তিলক, বার বার ফিরে ফিরে আসে। একই কথা ফিরে আসে বক্তার উচ্ছ্বাসে, তাতে শ্রোতার ক্লান্তি নেই।

কথা হয়, দীর্ঘ দেড় বছরে দুজনের জমে ওঠা চিঠিগুলোর নানা প্রসঙ্গ ধরে। কখনো অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে, কখনো বর্ষণে প্লাবিত হয় উলুর বুকের আঁচল। সান্ত্বনার দীর্ঘ বলিষ্ঠ একটা হাত এগিয়ে আসে। অমনি মেঘ কেটে যায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে ওঠে দুজনের মুখ। একদিন ঋষি এলো না, অমনি উলুর উজ্জ্বল মনে কোথা থেকে ছায়ারা এসে ভীড় জমাল। ঋষি এল পরদিন। উলু এক বুক অভিমান নিয়ে বলল, দিনান্তে সব কাজের শেষে একটিবারও কি বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ান যায় না ঋষি?

অপরাধীর গলায় ঋষি উত্তর দিল, এ ভুল আর কখনও হবে না উলু।

একদিন সুদীপা বললেন, তুমি যে হৃদয়বান মানুষটির কথা চিঠিতে লিখেছিলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি তো শান্তি পাচ্ছি না বাবা। কাল আমাদের নিয়ে চল তাঁর আশ্রমে। আড়াল থেকে যে বিরাট কাজ আমাদের জন্যে তিনি করেছেন, তাঁকে একটি প্রণাম না জানিয়ে এলে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাবো না।

ঋষি বলল, যদিও তিনি সর্বত্যাগী, আড়ালে থাকতেই ভালোবাসেন, তবু এই আনন্দ তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। মাসীমা, আমি নিশ্চয়ই কাল ওখানে নিয়ে যাব তোমাদের।

পরের দিন সেই নরেন্দ্রপুরের পথে 'ব্রজগোপাল বিহারে' তিনজনে যাত্রা করল।

পথটা চলে গেছে মাঠ ঘাট গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে। সূর্যের সেতারে বাজছে বেলা শেষের রাগিণী। উলু ঋষির হাত ধরে আনন্দে চঞ্চল হরিণীর মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে।

মাস্টারমশায় সবেমাত্র ছেলেদের ছুটি দিয়ে তাঁর বেলা শেষের উপবেশনের জন্য নির্দিষ্ট বাঁধা ঘাটের পাটটিতে পা রেখেছেন, ঋষি পেছন থেকে ডাক দিল, মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়, দেখুন আজ কারা এসেছে।

মাস্টারমশায় ফিরে দাঁড়াতেই সুদীপা আর উলু এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়াল। প্রশান্ত চোখ মেলে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মানুষটি।

হঠাৎ রাজর্ষির সামনে পট পরিবর্তন হয়ে গেল। সে মূঢ়ের মত চেয়ে রইল আশ্চর্য, অভাবিত এক নাটকের দিকে। যে নাটকে কোন সংলাপ ছিল না, কেবল মূক অভিব্যক্তি। উলু জড়িয়ে ধরেছে মাস্টারমশায়কে আর মাস্টারমশায়ও বুকে চেপে ধরেছেন উলুকে। সুদীপার দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর প্লাবন।

রাজর্ষি বহুদিনই মাসীমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে, বৈধব্যের কোন চিহ্ন যাঁর মধ্যে নেই তাঁর স্বামী কোথায়? কিন্তু তার কিংবা তার পরিবারের রুচিশীল মন কখনো সুদীপা অথবা উলুর কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। আজ সব জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল।

কতক্ষণ সুদীপাদেবী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করলেন একান্তে। তারপর আলাপে যোগ দিল উলু। ঋষিরও ডাক পড়ল সেই মিলন মহোৎসবে।

ফিরতে অনেক রাত্রি হল। ইন্দ্রনাথ টর্চ নিয়ে বাস রাস্তা অব্দি সবাইকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

উলু বলল, বাবা, আবার কবে আসব?

ইন্দ্রনাথ বললেন, দুটো আস্তানাই তো রইল মা। তোমাদের খুশিমত চলে এসো।

সুদীপা মেয়েকে চুপি চুপি বললেন, বাবাকেও বাসায় আসতে বল।

উলু, বলল, বাবা, তোমাকেও বাসায় আসতে হবে কিন্তু।

হাসতে লাগলেন ইন্দ্রনাথ, যাব রে যাব। আমি আর তোদের না দেখে কি থাকতে পারি।

সুদীপা আর উলু নিজেদের গানের একটি ক্যাসেট তৈরি করে পাঠিয়ে দিল লস্এঞ্জেলসে ডাক্তার মেগুেসের ঠিকানায়। সুদীপা উলুর সব খবর জানিয়ে একটা চিঠিও লিখলেন।

মাসখানেক পরে উত্তর এল। ডাক্তার মেগুেস লিখেছেন ঃ

প্রিয় ভগ্নী, তোমার পাঠানো উপহার এখন আমার প্রতিদিনের বিশ্রামের সঙ্গী। আমি সকালবেলার

সোনালী আলোর মত সুন্দর উজ্জ্বল একটি মেয়েকে ঐ গানের ভেতর খুঁজে পাই। আর তোমার গান শুনতে শুনতে মনে হয়, জননী বসুন্ধরা নিদ্রাহীন চোখে তাঁর আহত, তাপিত সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে আছেন। ধন্য দেশ ভারতবর্ষ যেখানে এ যুগেও মা এমন করে নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করে সন্তানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত!

তোমাদের জন্য যা করেছি, সে আমার কর্তব্য। তার জন্য ঋণস্বীকারের প্রয়োজন নেই। তোমাদের দুজনকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। সেই আমার অনেক পাওয়া। যদি কোনদিন ক্যালকাটাতে যাই তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

তোমরা দুজনেই আমার
ঐকান্তিক শুভেচ্ছা নিও।
রবার্ট মেণ্ডেস।

প্রতিদিনের মত সেদিনও ঋষি এসে ঢুকল উলুর ঘরে। আজ একটু আগেই সে বেরিয়ে এসেছে কলেজ থেকে। উলু ঋষিকে বেলা শেষের আগে প্রায় কোনদিন কাছে পায় না, আজ আগেভাগে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠল।

ঋষি ঘরে ঢুকেই বলল, আজ কি একটু বেরুনো যাবে?

কেন নয়, নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায় জানতে পারি কি?

ঋষি কম কথা বলে চিরদিন। হয়ত উত্তরটা দিতে গিয়ে সে সংকোচ বোধ করত, আর দাঁড়িয়ে থাকত চুপচাপ। কিন্তু আজ সে স্পষ্ট করেই বলল, 'বাল ব্রজ বিহারে' শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কাছে।

উলুর গলায় বিস্ময়, বাবার কাছে! এ সময়? কিন্তু কেন?

মাসীমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওঁরা দুজনে দাঁড়াবেন একসঙ্গে আর আমরা দুজনে ওঁদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নেব।

ঋষির হাতখানা মুঠো করে ধরে উলু মাথা নিচু করে বসে রইল কতক্ষণ। পরে সে উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে তার ডায়েরিটা বের করে আনল।

ঋষির হাতে ডায়েরিটা তুলে দিয়ে বলল, তুমি আজ যে প্রস্তাব আমার কাছে বয়ে এনেছ তা যে কোন তরুণীর কাছে শুধু কাম্য নয়, গৌরবের। কিন্তু ঋষি, এই আশার ছলনায় আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারছি না, এ যে আমার কত বড় যন্ত্রণা তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবনা। সুখের নীড়, বল কোন্ মেয়ে না গড়ে তুলতে চায়? দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির স্বপ্ন বল কে না দেখে? তবু আমি সব জেনে সে স্বপ্নে তোমাকে জড়াতে পারব না ঋষি। তোমাকে ভালবাসি বলেই এই কঠিন যন্ত্রণার ভারটুকু আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

কিছু সময় নীরব থেকে উলু আবার বলল, এই ডায়েরিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। এ আমার পরম ধন, ঋষি। এ শুধু তোমাকেই দেওয়া যায়। আর এমন কিছু আমার সঞ্চয়ে নেই যা তোমাকে দিয়ে আমি গভীর তৃপ্তি পেতে পারি।

ঋষি উলুর এতগুলো কথার উত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। সে নীরবে উলুর ডায়েরিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত উলুর দৃষ্টি সজল মেঘের ছায়ার মত ঋষিকে অনুসরণ করে চলেছিল, কিন্তু চোখের আড়াল হতেই বিছানার ওপর ভেঙে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে অঝোর বর্ষণ নেমে এল সেই মেঘ থেকে।

গঙ্গার তীরে বসে ডায়েরির শেষ পাতাটি শেষ সূর্যের আলোয় মেলে ধরল রাজর্ষি। আমেরিকা যাবার অব্যবহিত আগে উলুর এটি ডায়েরির পাতায় শেষ আঁচড়।

আর কিছু সময় পরেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে আমার এ পরিচিত পরিবেশকে পেছনে ফেলে। ওদেশে গিয়ে আমি যদি কিছু হারাই, যা আমার জীবনের চেয়ে দামী বলে মনে করি, তা ঋষির

প্রতিদিনের নিবিড় সান্নিধ্য।

এখানে ঋষি দিনান্তে একবার করে আমার পাশে এসে বসে। ও কোন কথা বলে না। শুধু আমার ডায়ালিসিসের ক্ষত বিক্ষত হাতখানা ধরে বসে থাকে। নীরবতাই ওর ভাষা। ওর একটি মাত্র উচ্চারণ, গানের মত আমার কানে, আমার প্রাণে এসে বাজতে থাকে,—উলু।

ডায়েরির শেষ পাতাটি বন্ধ করল রাজর্ষি। অন্ধকারের তরল প্রবাহ মিশে যাচ্ছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে। এই মুহূর্তে একটা কথার স্রোত উঠে আসছে রাজর্ষির বুকের ভেতর থেকে।

—আমি তোমাকে তেমনি করে পেতে চেয়েছি উলু, যেমন করে একটি প্রিয় ফুলকে মানুষ আঘ্রাণে, স্পর্শে একান্ত নিবিড় করে পেতে চায়। নাইবা এল আমাদের জীবনে একটি আলোকিত সন্ধ্যা, হাসি গান আর সানাই-এর সুর—আমরা দুজনে হাতে হাত বেঁধে চলব সুখ দুঃখের পথ পেরিয়ে। থাক না এ জন্মে আর সব মানুষের মত সুখ-নীড় রচনার সাধ। আমরা শুধু দুজনকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে বলব, আমরা বন্ধু— বন্ধুত্বের চেয়ে বড় বন্ধন আমাদের আর কিছু জানা নেই।

●

কমল হীরে

এক

হোটেল ফিডালগোর ব্যাঙ্কোয়েট হল তখন আলোর স্নিগ্ধ প্রবাহে স্বপ্নময়। যথাস্থানে বসান ফ্লাওয়ার বোকেগুলো ডেলিগেটদের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল।

জানালার পর্দা গলে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছিল এক এক ঝলক হাওয়া। তাতে শীতের কামড় ছিল না, শুধু ছড়িয়ে পড়ছিল মিষ্টি মধুর একটা রোমাঞ্চ। আরবসাগরের তীরে গড়ে ওঠা শহর জনপদে এ সময় শীত থাকে না। ক্রীসমাস উৎসব সবে শেষে হয়েছে। চার্চ, পথঘাট এখনও আলোর মালায় সাজানো। গোয়ার রাজধানী পানাজী তিরিশে ডিসেম্বরেও উৎসব-নগরী।

কারুকাজ করা হেভি স্ক্রীনখানা সরিয়ে ঠিক পৌনে নটায় হলে এসে ঢুকল শীলা আধারকার। সঙ্গে সঙ্গে সারা ব্যাঙ্কোয়েট হলে ছড়িয়ে পড়ল একটা চাঞ্চল্য।

মূল সভাপতি ডক্টর রায় নিজের ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে প্রফেসার আধারকারের দিকে মৃদু হেসে তাকালেন। শীলা আধারকার কাছে এগিয়ে এসে মাথাটা ঈষৎ নিচু করে বলল, আমি কি ঠিক সময়ে আসিনি স্যার।

হেসে বললেন ডক্টর রায়, ঠিক সময় মানে, এমন সেকেন্ডের কাঁটা ধরে চলতে বোধহয় ইংরেজদেরও কদাচিৎ দেখা যায়।

কথাগুলো উনি একটু জোরেই বলে উঠলেন, তাই সারা হলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

শীলা আধারকারও সে হাসিতে যোগ দিল। তার জন্যে নির্দিষ্ট আঠারো নম্বর চেয়ারটির দিকে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল সে।

পিঙ্ক ফুলওয়ালা সাদা সিফনের শাড়ির ওপর হাল্কা ইয়লো কার্ডিগানখানা বেশ মানিয়েছে। আলোর তরঙ্গে সাদা একখানা প্রমোদ তরণী যেন এইমাত্র ভেসে এল হলুদ একটুকরো পাল তুলে। একত্রিশটি বসন্তে পৌঁছেও শীলা আধারকার যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্যে পুষ্পিতা। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শান্ত এক ধরনের শ্রী মিশে আধারকারকে সকলের চোখে করে তুলেছে আকর্ষণীয়া।

আঠারো নম্বরে এসে বসল শীলা আধারকার। ডান দিকে মডার্ন হিস্ট্রি গ্রুপের হেলপার সুমিত সরকার। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র, সেখানেই বছর দশেক অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসির বিনিময় করল। শ্যামবর্ণ সুমিত। বেশ লক্ষণীয় দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। প্রাণবন্ত। সারাক্ষণ যেন পরোপকারে প্রস্তুত।

এ কদিন হিস্ট্রি কংগ্রেসের বিভিন্ন গ্রুপ ডিসকাশানের ফাঁকে ফাঁকে টি-ব্রেক অথবা টিফিন, লাঞ্চে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। এর আগের তিনটি বছরের ভেতর দু'বছর দেখা হয়েছিল কিন্তু সৌজন্যমূলক চেনা পরিচয় আলাপ পর্যন্ত গড়ায়নি। গত বছর হিস্ট্রি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেয়নি আধারকার। সে ছিল আমেরিকায় তার স্বামী ডক্টর বিজয় আধারকারের সঙ্গে।

বিয়ের অব্যবহিত পরেই বম্বের সোফিয়া কলেজ থেকে দু'বছরের স্টাডি লিভ নিয়ে স্বামীর কর্মস্থানে গিয়েছিল সে। একটি বছর যেতে না যেতেই ফিরে এসে জয়েন করেছে কলেজে।

শীলা আধারকার আট বছর বয়সে তার বাবাকে হারায়। স্কুল মিস্ট্রেস মা-ই তাকে একদিকে শিক্ষাদীক্ষা, অন্যদিকে সংগীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন।

বিজয় আধারকারের সঙ্গে হঠাৎ শীলার বিয়েটাও যেন কেমন রহস্যময়।

মেয়ের বয়েস যত বাড়ছে, মা ততই অস্থির হয়ে উঠছিলেন। একটি সুপাত্রের হাতে পড়ুক তাঁর সর্বগুণান্বিতা মেয়ে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু এমন মেয়ের পাত্র যথার্থই দুর্লভ হয়ে ওঠে। মেয়ের কিন্তু তাতে বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না। সে উনত্রিশটি বসন্তের ভেতরেই তার পি-এইচ-ডি ডিগ্রি অর্জন করল। আর সংগীতে সে তখন যথেষ্ট নাম করে নিয়েছে। বেতার আর দূরদর্শনের সে নিয়মিত বি-হাই শিল্পী।

শীলা আধারকারের জীবনের এমন উজ্জ্বল মুহূর্তে ডক্টর আধারকারের হঠাৎ বোম্বেতে আবির্ভাব। তিনি এসেছিলেন নিজের দেশ থেকে একটি সঙ্গিনী নির্বাচন করে নিয়ে যেতে। আমেরিকায় ক্যানসার রিসার্চের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তাঁর অবদান বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে তাঁর অনভিজ্ঞতা ভাবিয়ে তুলেছিল বন্ধুদের। তাঁদের পীড়াপীড়িতেই শেষ পর্যন্ত মধ্য যৌবনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন আধারকার।

উভয়পক্ষের পরিচিত কোন ব্যক্তির যোগাযোগের ফলে দুটি ভিন্নমুখী প্রতিভার সংযোগ ঘটল সংসারধর্মের ক্ষেত্রে। শীলা আধারকার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল তার নতুন সংসার রচনা করতে।

কিন্তু একটি বছর মাত্র। আমেরিকা থেকে ফিরে এল আধারকার। আরও বেশী করে ডুব দিল তার এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি, রিসার্চের কাজে। কয়েকটি মূল্যবান পেপার বিশিষ্ট কাগজে ছাপা হল। এদিকে প্রখ্যাত ওস্তাদের তালিমে এগিয়ে চলল নিরলস কণ্ঠসাধনার কাজ।

জীবনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতা ছিল শীলা আধারকারের কিন্তু উচ্ছলতা ছিল না। তাই বন্ধুর সংখ্যা ছিল তার বড় সীমিত। শীলা আধারকাব সম্বন্ধে বহুজনের কৌতূহল থাকলেও কৌতূহল চরিতার্থ হবার সহজ কোন পথ ছিল না। তাই তাকে ঘিরে গড়ে উঠছিল অনেক কল্পিত কাহিনী।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর ডক্টর আধারকারের সঙ্গে তার সেপারেশানের ব্যাপারটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে কানাকানি আর গুঞ্জনের অন্ত ছিল না। কিন্তু ডিভোর্সের প্রকৃত কারণটা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল কৌতূহলীদের কাছে।

গোয়া হিস্ট্রি কংগ্রেসে বোম্বে গ্রুপের কাছ থেকেই সুমিত সরকার শুনেছিল শীলা আধারকারের সংসার জীবনের দুর্যোগের কথা। আর পাঁচজন শ্রোতার মাঝখানে এসে পড়ে হঠাৎই তার কানে গিয়েছিল কথাটা। কিন্তু তাকে নিয়ে সরস আলোচনা চালাবার মত প্রবৃত্তি কিংবা সময় কোনটাই তার ছিল না। শীলা আধারকারকে সে অত্যন্ত সংযত স্বভাবের আর সম্ভ্রান্ত আচরণের মেয়ে বলেই জেনে এসেছে। তার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তাই প্রথমে সে খানিকটা বিচলিত হয়েছিল। পরক্ষণেই সে ও ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে লেগে গিয়েছিল নিজের কাজে।

কালকের ট্রিপেই কি আপনি সাইট সিইংএ বেরুচ্ছেন? —ঘাড় কাৎ করে সহজ ভঙ্গীতে সুমিত সরকারকে প্রশ্ন করল শীলা আধারকার।

সুমিত বলল, এখন ক্রীসমাসে ট্যুরিস্ট মরশুম চলছে, বাস পাওয়াই দায়। শুনেছি দুখানা বাস যোগাড় হয়েছে। এতগুলি ডেলিগেট আর তাদের ফ্যামিলি। জায়গা পাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠবে।

শীলা আধারকার বলল, আপনার যদি অসুবিধে না থাকে চলে আসতে পারেন আমার গাড়ীতে। একটা প্রাইভেট কারের সঙ্গে কথা বলেছি। ছেলেটি ভোরবেলাতেই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াবে বলেছে।

না না অসুবিধে থাকবে কেন, কাজের শেষে এখন তো বেড়াবারই পালা। আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ।

শীলা আধারকার গাড়িতে সুমিতকে সঙ্গী হিসেবে নেবার প্রস্তাব করেই কিন্তু সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। যদি তার আমন্ত্রণ যে কোন কারণেই হোক সুমিত সরকার গ্রহণ না করে তাহলে নিজের মনেই ফিরে এসে আঘাত দেবে নিজের প্রস্তাবটা। এখন সুমিতের সহজ উত্তরে সে শুধু স্বস্তিবোধই করল না সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার সঙ্গে বেরুলে আপনার কিন্তু বেশ খানিকটা অসুবিধে হবে প্রফেসার সরকার।

কি রকম?

এই যেমন ধরুন, গান সম্বন্ধে কিছুটা ক্ষ্যাপামি আছে আমার। আমি বাঁধা রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ হঠাৎ কোন গাঁয়েগঞ্জে লোকসংগীতের খোঁজে ঢুকে পড়তে পারি। আর সোজা কথা বলতে কি এই উদ্দেশ্যেই বাসের সীট ছেড়ে .প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করেছি।

এ তো উত্তম প্রস্তাব। বেড়ানোর ব্যাপারে সব সময় নির্দিষ্ট রাজপথ ধরে চলতে আমারও আপত্তি।

আরও একটি ছোট্ট কারণে আমি সঙ্গী খুঁজছিলাম।

কারণটা শোনার জন্য হেসে তাকাল সুমিত সরকার।

শীলার মুখে সংকোচের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, একা একা গাড়ীতে অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে পুরোপুরি সাহস পাচ্ছিলাম না।

দুই

অফ হোয়াইট রঙের পদ্মিনী ভোরের নরম রোদ সর্বাঙ্গে মেখে হোটেল ফিডালগোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সুমিত সরকার আর শীলা আধারকার ঢুকে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

মাণ্ডভী নদীর তীর ধরে প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলল গাড়ী। নদীর জল ছুঁয়ে ভেসে আসছিল ভোরের গন্ধ। বাঁহাতে নেহ্রু ব্রীজের ওপর উঠে গেল গাড়ী। শঙ্খধ্বনির মত একটি হর্ন বেজে ওঠা মাত্র মাণ্ডভী নদীর বুকে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য ছবি। শত শত যাযাবর হাঁস জল ছেড়ে আকাশের বুকে ওড়ার জন্য পাখা মেলে দিয়েছে। শুভ্র বুক আর ডানায় লেগে আছে ভোরের সোনার নরম মিষ্টি রঙ।

অবাক হয়ে দুজনেই সেদিকে চেয়েছিল। শীলা আধারকার বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল। তার ডানদিকে বসে একই সঙ্গে দুটো ছবি দেখছিল সুমিত সরকার। জলের হাঁসগুলোর উড়ন্ত লীলা আর ডাঙার রাজহংসীর অপূর্ব প্রোফাইল। শীলা আধারকারের হংসগ্রীবায়ও তখন খেলা করছিল ভোরের একফালি রোদ।

ওরা ব্রীজ পেরিয়ে নর্থ গোয়ার রাস্তায় এসে পড়ল। বাঁ দিকে পাহাড়ী বন। শীত ঋতুতেও শ্যামল। দশ বার জন গোয়ানিজ মেয়ে সাদা চোলি আর হাঁটু অব্দি ঢাকা লুঙ্গির মত সাদা শাড়ি জড়িয়ে বনের দিকে চলেছে। ওদের হাতে কাটারি জাতীয় একধরনের অস্ত্র। বনের ভেতর হয়ত ডালাপালা কাটার কিছু কাজ চলবে।

নারকেল গাছের সারি। সবুজ পাতার ঝালর থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে সকালের ঝলমলে রোদ। অদূরে বনে ঢাকা পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ধবধবে একটি চার্চ। নীল আকাশ আর শ্যামল সমারোহের ভেতর রোদে ভরা সাদা গীর্জাটি ঈশ্বরের প্রিয় একটি আবাসগৃহ বলে মনে হচ্ছে।

অপূর্ব! শীলা আধারকার চার্চটির দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল।

সুমিত সরকার বলল, ছবিতে ধরে রাখার মত।

গাড়ী থামিয়ে দুজনেই নেমে পড়ল। দুটো নারকেল গাছের ফাঁকে ওরা কম্পোজ করে নিল গীর্জার ছবিখানা। শীলা আধারকার প্রথমে ক্লিক করল তার পেনটাক্সে দুশো টেলি লাগিয়ে। সুমিত সরকার তার নিকোম্যাটে টেলি ছাড়াই তুলল।

শীলা আধারকার বলল, আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে।

সুমিতের চোখে জিজ্ঞাসা, কি রকম?

মাণ্ডভী নদীর ওপর উড়ন্ত হাঁসের ছবি নেওয়া হল না।

হেসে বলল সুমিত, নিরাশ হবার কি আছে! এখনও হাতে রয়েছে তিনটে দিন। মাণ্ডভী ঘুরে ফিরে আসবে। যাযাবর হাঁসগুলোও এখন সহজে মাণ্ডভী ছাড়ছে না।

গাড়ী চলেছে। নারকেল বাগানের ভেতর লাল টালির বাড়িঘর। চারিদিকে শুরু হয়ে গেছে প্রভাতী কর্মব্যস্ততা। গৃহস্থের উঠোন ঘেঁষে গাড়ী চলেছে। নানা রঙে চিত্রিত একটি তুলসীমঞ্চ উঠোনের মাঝখানে।

শীলা বলল, গোয়াতে খ্রীষ্টান আর হিন্দুর সহাবস্থান বেশ মজার ব্যাপার।

সুমিত বলল, যেমন?

এই ধরুন বিয়ে হল চার্চে, বউ নিয়ে ঘরে ফিরে হোমের আগুন জ্বেলে সপ্তপদীটা সেরে নিলে।

সত্যি!

ঠিক এতটা হয়ত এখন আর নেই তবে কয়েক জেনারেশান আগে এই রীতি এখানকার প্রায় সব জায়গায় চালু ছিল বলে শুনেছি।

সুমিত বলল, এরকম একটা কারণ কি আমরা অনুমান করতে পারি—অস্ত্র উঁচিয়ে অথবা অর্থ ছড়িয়ে যাদের হিন্দু থেকে খ্রীষ্টান করা হয়েছিল তারা আসলে মনেপ্রাণে হিন্দুই থেকে গিয়েছিল।

শীলা সোচ্ছ্বাসে বলল, ঠিক অনুমান করেছেন আপনি। গোয়ার ইতিহাসও তাই বলে। সামান্য দু'একখানা পোশাকের লোভে অথবা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে চার্চে একাসনে বসতে পাবে বলে বহু মানুষ খ্রীষ্টান হত। তারা চার্চের প্রার্থনায় যোগ দিত, আবার প্রতিবেশী হিন্দুদের হাতে মন্দিরে পুজোর উপচার পাঠাত সংসারের মঙ্গল কামনা করে।

সুমিত কৌতুক করে বলল, এ যে সেই ধরনের কথা হল—খ্রীষ্টান হয়েছি বলে কি জাত ধর্মটাও খুইয়ে বসব।

মৃদু হেসে শীলা বলল, ঠিক তাই।

ছোট্ট এক টুকরো বাজার পড়তেই শীলা গাড়ী থামাল।

আসুন, এখানেই সকালের চা-পর্বটা সেরে নিই।

একটু থেমে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল, আপনিও নেমে আসুন, চা আর খাবারটাবার কিছু খেয়ে নিন!

আনুমানিক বছর পঁচিশেক বয়েস হবে ছেলেটির। শীলার ডাকে গাড়ী লক করে সে নেমে এল।

তিন প্লেট খাবার অর্ডার দিয়ে আনাল শীলা। সঙ্গে তিনটে চা।

খাবার শেষে সুমিত আগেভাগে বেসিনে মুখ ধুয়ে কাউন্টারে পয়সা দিতে যাচ্ছিল, শীলা পেছন থেকে বলে উঠল, প্লীজ ওটা আমাকে দিতে দিন। আপনি আজ আমার অতিথি।

এ কথার পর আগ বাড়িয়ে দিতে গেলেই ভদ্রতার সীমা ভাঙতে হয়, তাই সুমিত মুখে হাসি মেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দর কাজকরা মানিব্যাগের থেকে ততোধিক সুন্দর আঙুলে করকরে কটি নোট আর কয়েন বের করে কাউন্টারে দাম চুকিয়ে দিলে শীলা।

ড্রাইভার আগেভাগেই গাড়ীতে গিয়ে বসেছিল। শীলা আর সুমিত উঠে বসল। গাড়ী চলল আরওয়ালেম প্রপাতের দিকে।

চুপচাপ বসে থাকার পাত্র নয় সুমিত, তবু চুপচাপই বসেছিল সে। শীলা এইটুকু জার্নির ভেতরেই সুমিতের আনন্দ উচ্ছল স্বভাবের পরিচয় পেয়েছিল। তাই সুমিতকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল,

কি হল আপনার, একেবারে চুপচাপ যে?

সুমিত সস্মিত মুখে সামনের দিকে চোখ রেখে বলল, অতিথির মত আচরণ করবার চেষ্টা করছি।

সুমিতের কথা বলার ভঙ্গীতে শীলা আধারকার একমুখ হেসে বলল, আজ নিশ্চয়ই আপনি আমার অতিথি, কিন্তু কাল সাউথ গোয়া ট্যুরে আমি হব আপনার অতিথি, রাজি তো?

সুমিত সরকার বলল, তাহলে বরং আমরা কেউ কারো অতিথি নয়, আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু। আজ আপনি সবকিছু খরচ করবেন, কালকের খরচখরচা আমার।

শীলা আধারকার বলল, বেশ, তাই হবে কিন্তু...।

আবার কিন্তু কিসের?

মানে খরচ করতে গিয়ে এ দুদিনের গাড়ীভাড়ার আদ্দেকটা আবার দিয়ে দেবেন না যেন। ওটা একেবারে আমার নিজস্ব, কারণ প্রাইভেট কারে করে ঘোরার পরিকল্পনাটা আমার। আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি সঙ্গটুকু দেবার জন্য।

বেশ তাই হবে, আপনার সঙ্গে কথা বাড়াব না।

গাড়ি চলেছে। দুদিকে ক্ষেত। শীতের ফসলক্ষেতে নেমে পড়েছে মেয়েরা। তারা কোমর ভেঙে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে দুটো হাতে মা ধরিত্রীর সম্পদ সংগ্রহ করছে। এখানে মেয়েদের আঁটসাট শাড়িতে রঙের বাহার। চারদিকে প্রাণের ধারা নদীর প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। বেশ খানিক পথ পেরিয়ে আসার পর ছোট্ট মালভূমির মত একটি প্রান্তর পড়ল। রোদ চড়ছে। এদিকে গাছপালার সংখ্যা কম। বাড়ীঘরের হদিস মিলছে না।

শীলা তার ব্যাগ হাতড়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছিল।

সুমিত বলল, কি রত্ন হারালেন?

জলের দুটো বোতল ভরে রেখেছিলাম, বেমালুম ভুলে গেছি আনতে।

এখন তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়?

পেলে আর কি করব বলুন।

আরে আরে ঐ যে একখানা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত দাঁড়িয়ে। ওখানে জলের সন্ধানে যাই চলুন।

গাড়ি থামিয়ে দুজনে নামল। পথ থেকে খানিকটা ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে বাড়ীর সামনে আসা গেল।

দু'একটা গাছ বাড়ীর এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়ে। শীতে রিক্তপত্র। বাড়ীটি আয়তনে বেশ বড়, কিন্তু পরিত্যক্ত। লাল টালির ছাদে কালোর ছোপ পড়েছে। মাঝে মাঝে জীর্ণ পাঁজরের ফুটো দিয়ে গলে ঝরে পড়ে গেছে রক্তরাঙা টালি। সামনে এক চিলতে বারান্দা বেরিয়ে। ছাদের দুই প্রান্তের জোড়মুখে চমৎকার কাঠের জাফ্‌রির কাজ। প্রায় অক্ষত তবে বহুকাল রোদে পুড়ে বর্ষার ভিজে তার বর্ণ, জৌলুস, সবই হারিয়ে বসে আছে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। না, দরজার পাল্লা নেই। রুক্ষ ফাঁকা প্রান্তরের বুকে এ যেন একটা হন্টেড হাউস।

ওরা দুজনে খোলা দরজা দিয়ে কার যেন অদৃশ্য আকর্ষণে পরিত্যক্ত ঘরখানার ভেতর ঢুকে গেল। মোট ন'খানা কক্ষযুক্ত বাড়ী। কোন ঘরেই কোন আসবাবপত্র ছিল না। গৃহের মালিক অস্থাবর সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। যে উদ্দেশ্যে অনেক সমারোহে একদিন গৃহপ্রবেশ হয়েছিল, সে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের সমাপ্তি ঘটে গেছে অনিবার্য কোন কারণে। অন্দরের একখানা ঘরে তিনটি জানালায় তিন টুকরো পর্দা আব্রু রক্ষার চেষ্টা করছিল। রোদে, হাওয়ায় জীর্ণ ছিন্ন পর্দাগুলো তখনও বুকের বেতাল ধুকপুকুনির মত মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

পাশের একখানা ঘর থেকে শীলার গলা শোনা গেল, এখানে জল নেই, একটা খালি কুঁজো পড়ে আছে।

ঘরের ভেতরের উঠোনে ফুটো টালির ছাদ চুইয়ে যে রোদ্দুরটুকু এসে পড়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছিল সুমিত। শীলার গলার 'জল নেই' শব্দটা এক ধরনের শুষ্ক হাহাকারের মত শোনাল।

সুমিত সরকারের কেন যেন মনে হল, এ বাড়িখানার শুরু থেকে সমাপ্তির ইতিহাসের সঙ্গে শীলা আধারকারের জীবনের কোথায় যেন একটা মিল আছে। সে শুধু শুনেছে, শীলা আধারকারের সঙ্গে তার স্বামীর একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। এর বেশী সে কিছু জানে না। একটি সুন্দর সমৃদ্ধ গৃহ হঠাৎ পরিত্যক্ত হলে যেমন একধরনের অব্যক্ত শূন্যতার সৃষ্টি হয়, শীলা আধারকারের জীবনটাও কি তাই নয়। বিধাতাপুরুষ শীলা আধারকারকে গড়বার সময় একটু বেশী রকমের পক্ষপাতিত্বই দেখিয়েছিলেন দেহসুষমা থেকে হৃদয়রঞ্জনী গুণাবলীর সমন্বয়ে শীলা আধারকার হয়ে উঠেছিল স্বজাতীয়াদের ঈর্ষার কারণ আর পুরুষ সমাজের উদ্দীপনা আর প্রেরণার উৎস। সেই অনন্যা নারীর সংসারজীবনে হঠাৎ যদি নেমে আসে ভাঙন তাহলে সেটা ভাগ্যবিধাতার কি ধরনের কৌতুক তা বুঝে ওঠা সত্যিই শক্ত। এই মুহূর্তে সুমিত সরকারের মনে হল, সে শীলা আধারকারের দুঃখ-দিনের সবচেয়ে নিকটের বন্ধু। সে জানে, অত্যন্ত সংযত স্বভাবের মেয়ে শীলা তার গভীর দুঃখের দিনেও কারু সহানুভূতি চাইবে না, তবু মনে মনে বন্ধুর দুঃখে দুঃখবোধ করার মধ্যে একধরনের তৃপ্তি খুঁজে পেল সুমিত সরকার।

ঘরের ভেতর থেকে শূন্য কুঁজোখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল শীলা আধারকার। মুখে একধরনের হাসি লেগে আছে। হাসি আর কান্নার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যে হাসি, একটুখানি হাওয়ার দোলায় যাকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারে, এমন হাসি হেসে সুমিত সরকারের সামনে এসে দাঁড়াল শীলা আধারকার। সুমিত ভাবল, দুঃখকে অপহরণ করে কেমন অক্লেশে হাসতে পারে শীলা।

দেখুন, কেমন সুন্দর কাজ-করা একটা কুঁজো।

সুমিত কি ভেবে যেন বলল, পাত্র আছে পানীয় নেই। এমন সুন্দর একটা পাত্র, ভরা থাকবে সুধায় তা নয় আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে শূন্য।

শীলা আধারকার সুমিত সরকারের এই অর্থবহ কথাটির তাৎপর্যটুকু ধরতে পারল না। আর ধরা সম্ভবও ছিল না। দুজনের ভাবনার নদী তখন ভিন্ন দুটি খাতে বইছিল।

ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি লক্ষ্য করে চলতে লাগল রাস্তার দিকে। শীলা কিন্তু হাতের কুঁজোটি ছাড়েনি।

সুমিত বলল, জলের জন্য এসে লাভ হল জলপাত্র।

শীলা বলল, কুঁজোর নক্সাটা বড় ভাল লেগে গেল, তাই ছাড়তে পারলাম না।

প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রীর পুরাবস্তু সংগ্রহ আর কি।

হাসি ছড়িয়ে শীলা বলল, যেমন খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে বস্তুটি একেবারে পুরাতন না হলেও মডার্ন হিস্ট্রি গ্রুপে পড়ে না। পোর্সিলেনের জিনিস, ময়লায় ওর কৌলিন্যটা চাপা পড়ে গেছে। আর এর নক্সাটিও ভারতীয় নয়। আমার মনে হয় গোয়াবাসী কোন পর্তুগীজের আউট হাউস ছিল এটা। বস্তুটি হয়ত লিসবন থেকে আনা।

সুমিত সরকার কৌতূহলী হয়ে কুঁজোটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

আপনার অনুমানের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে। ময়লা দেখে আমি কুঁজোটাকে মাটির তৈরী বলে ভেবেছিলাম।

শীলা আধারকার বলল, তাহলে বলুন, এ যাত্রায় আমি একেবারে ঠকে যাইনি।

ঠকবেন কেন, আপনি ছাই উড়িয়ে সোনা না পেলেও তার চেয়ে কম মূল্যবান জিনিস পাননি।

ওরা গাড়িতে এসে বসল। 'গিরি' গ্রাম পেছনে ফেলে ওরা একসময় উঠে এল লাল ছোট ছোট টিলায় ছাওয়া 'মূলগাঁও'তে। দূরে দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস। পথের দুদিকে কাজুবাদামের গাছ তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েক ঘর দরিদ্র মানুষের খড়ে ছাওয়া বাসস্থান। এরা হয়ত কোন সম্পন্ন মানুষের

বাদাম বাগানের তদারকির কাজে নিযুক্ত।

এর কিছু পরেই বর্ধিষ্ণু গ্রাম সংখালি। সবুজ নারিকেল বাগানের ভেতর সম্পন্ন মানুষের গৃহস্থালীর চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেল। একটা জলস্রোত গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে চলে গেছে। ছোট ছোট কটি ছেলেমেয়ে ঐ স্রোতের ভেতর পা ডুবিয়ে পারাপার করছে। কৌতুকে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

গাড়ি এসে ঢুকল রুদ্রেশ্বর মন্দিরেব সীমানায়। গম্বুজওয়ালা মন্দিব। সামনে গোয়াবাসীদের নিজস্ব ধারায় নানা বর্ণে চিত্রিত তুলসীমঞ্চ।

তুলসীমঞ্চের পাশ দিয়ে ওরা উঠে এল অনতিউচ্চ টিলার ওপর। সামনের পাহাড় থেকে গড়িয়ে নীচে ঝরে পড়ছে গেরুয়া রঙের একটা জলধারা। ঐ জলপ্রপাতের পাশেই জংলী গাছের ঝোপ। জলের কণাগুলো ছিট্‌কে পড়ছে সেইসব গাছের পাতায়। সূর্যের আলো পড়ে জলকণাগুলোতে ধরেছে রামধনুর রঙ।

সুমিত সরকার টিলার গা বেয়ে একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সে প্রপাতের ছবি নেবে। রামধনুর রঙ কচি সবুজ পাতায় খেলা করছে, তার মেজাজই আলাদা।

এদিকে টিলার অন্য পিঠের নির্জনে চলে এলো শীলা আধারকার। সে একটা পাথরের চাঁইএর ওপর বসল। মাথার ওপর একটা গাছ ডালে পাতায় ছত্রছাযা বচনা করেছে। নীচেব দিকে ক্যামেরা তাক করে মন্দিরের একটা ছবি তুলল। এমন সময় টিলার খানিক ওপর থেকে একটি তরুণী মেয়ের হাসি জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল।

শীলা পেছন ফিরে ওপরের দিকে তাকাল। একটি সদ্যবিবাহিত দম্পতি বলেই মনে হল। নিবিড় হয়ে বসে ছেলেটি কথা বলে যাচ্ছিল আর মেয়েটি মাঝে মাঝে ছড়াচ্ছিল হাসির মুক্তো। একটা কচি সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছ তাদের মাথার ওপর। হাল্কা ভায়োলেট রঙের ফুল ফুটেছে। পরিবেশটি মধুচন্দ্রিমা যাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বড় মনোরম। ওরা হয়ত বোম্বে থেকেই এসেছে।

হঠাৎ বোম্বের কথা মনে পড়ল কেন তার। বোম্বের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন আর একটা দৃশ্যপট ফুটে উঠল চোখের সামনে।

মুখোমুখি বসে আছেন ডাক্তার আধারকার। মা হবু জামাই আর মেয়েকে নিভৃত আলাপের সুযোগ করে দিয়ে অন্দবে গেছেন জলযোগের ব্যবস্থায়।

আধারকার সুদর্শন বলিষ্ঠ পুরুষ। মুখে প্রসন্নতা, চোখে গভীরতা। সামনের কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে।

প্রথম কথা বললেন আধারকার, আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জেনেছেন তা জানি না তবে আমার নিজের মুখে কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করছি।

শীলা তাকিয়ে রইল আধারকারের দিকে।

এই মে-তে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে আমার। আপনি নিশ্চযই বলতে পারেন বিয়ের বয়েস অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমি। তবু বিয়ে করতে চাইছি তার সামান্য একটা কারণও আছে। ক্যানসারের ওপর যে রিসার্চ করছি সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। দিনরাত্রির অনেকগুলো ঘণ্টা আমার ল্যাবরেটারিতে কেটে যায়। বাড়ি ফিবেও নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। মনে করেছি বাড়ীতে কাজ চালানোর মত একটা ল্যাবরেটারি তৈরি করে নেব। আর সেই সঙ্গে থাকবে আমার আশেপাশে এমন একজন কেউ, যিনি শুধু আমার সংসারের ভার নেবেন না. আমার সবকাজে থাকবে তাঁর অফুরন্ত প্রেরণা।

শীলা বলল, আমি কিন্তু আপনার সাবজেক্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

না না অভিজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার কথা উঠছে না। আব আমার রিসার্চের সহকারিণীকেও আমি চাইছি না। কাজের মাঝের অবসরটুকু যিনি ভরিয়ে দেবেন তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে তেমনি একজন সঙ্গিনী

পেতে চাই আমি।

ডক্টর আধারকারের কথাগুলো ভাল লাগল শীলার। সে বলল, আপনি যে বস্তু নিয়ে রিসার্চ করছেন, এখনও তা মানুষের কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

হাসলেন ডক্টর আধারকার। বড় নির্মল সে হাসি। বললেন, ভালবাসা দিয়ে সব ভয়কেই জয় করা যায়। আমি ঐ ভয়ঙ্করের প্রেমে পড়ে গেছি বলতে পারেন।

কেন জানি না সেই মুহূর্তে শীলার বড় ভাল লেগে গেল মানুষটিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পরেও একটি পরিচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল শীলার বাড়ীতে। সুসজ্জিত মণ্ডপের তলায় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তপদীও হয়েছিল। শীলার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সজ্জিত বাসরে ডক্টর আধারকারের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল।

ডক্টর আধারকার, মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না?

শীলা, কষ্ট হবে জেনেও তো আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একটু থেমে শীলা আবার বলেছিল, আমার মা বিয়ের পর তাঁর বাবাকে ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন কিন্তু সংসার হাতে পেয়ে তাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠলেন।

ডক্টর আধারকার, এটাই মেয়েদের ধর্ম।

শীলা, মৃদু হেসে, হয়তো তাই।

হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেলেন ডক্টর আধারকার, আমাদের বয়েসের অসমতাকে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে তো শীলা?

আপনি তো আমার কাছে কিছু গোপন করেননি। আমি সবকিছু জেনে শুনেই তো এ বিয়েতে আমার মত দিয়েছি।

তোমার চাকরী?

দু'বছরের স্টাডি লিভ নিয়েছি। চাকরী রাখা না রাখা আমার ইচ্ছের ওপর।

কিছুক্ষণ আগে তোমার বান্ধবীদের অনুরোধে তুমি গান গাইলে। তোমার গলা যে এত মিষ্টি তা জানতাম না।

শীলা সেদিন ডক্টর আধারকারকে বোধকরি আরও মিষ্টি একটি হাসি উপহার দিয়েছিল।

এরপর শীলা কথা বলেছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, রাত শেষ হয়ে এলো, আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন। কাল আবার ন'টায় সায়েন্স সেমিনারে আপনাকে যেতে হবে। সারাদিন তো ঠাসা প্রোগ্রাম। সেই ডিনার শেষ করে ফিরবেন।

তুমিও তো সে ডিনারে আমার সঙ্গী।

হ্যাঁ, আমাকেও তো ওঁরা স্পেশাল ইনভিটেশান কার্ড দিয়ে গেছেন।

তাই বলছিলাম, তুমিই বরং বিশ্রাম নাও।

আর আপনি?

দিনরাত জেগে ল্যাবরেটারিতে কাজ করার অভ্যেস আমার। ক্লান্তিকে অনেকখানি জয় করে ফেলেছি।

না না তা হয় না। আপনি জেগে থাকবেন আর আমি ঘুমোব, তা কি হয়!

আচ্ছা বেশ, এসো দুজনে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তারপর পরশু তো ভোরবেলাই অজন্তা পাড়ি দিতে হবে।

শীলা প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে ফুলের রাশি বিছানা থেকে সরিয়ে ডক্টর আধারকারের বিশ্রামের আয়োজন করে দিয়েছিল। ডক্টর আধারকার শুয়ে পড়লে লাইট অফ করে তাঁর পাশটিতে

সেও স্থান করে নিয়েছিল সলজ্জ সংকোচে। সেদিন তার মনে হয়েছিল, জীবনে দুজন না হলে সম্পূর্ণ হওয়া যায় না। শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, বিশ্বাসে, নির্ভরতায় একটি নারী আর একটি পুরুষের সম্মেলন।

একখানা গাড়ী নিয়ে ওরা বেরিয়ে গিয়েছিল অজন্তা আর ইলোরায়। ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর শিল্পের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এসব জায়গায়। প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে শীলা ইলোরা আর অজন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল সেদিন আর অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রের কৌতূহল নিয়ে সেসব কথা শুনছিলেন ডক্টর আধারকার।

অজন্তার গুহাচিত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে ডক্টর আধারকার বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই চিত্রাবলীর ক্ষয়রোধ করা অসম্ভব নয়। শুধু অজন্তা বলে নয়, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে রক্ষা করতে বিশ্বের সমস্ত বিশেষজ্ঞ মানুষদের সম্মিলিত হওয়া দরকার।

ফেরার পথে বলেছিলেন, শীলা, আমি বিজ্ঞানী, বাস্তব জগত ও জীবন নিয়ে আমার কাজ। দেবদেবীর তথাকথিত মহিমা সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। বিশেষ কোন ধর্মমত সম্বন্ধেও আমার আগ্রহ কম। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি। মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্প ভাস্কর্যগুলি ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চার্চ, মসজিদ, চৈত্য, গুম্ফা, মন্দির সবজায়গাতেই মানুষের শিল্পরুচি বিশেষ মহিমায় রূপ লাভ করেছে।

শীলা বলেছিল, তোমার কথাগুলির ভেতর অনেক সত্য রয়েছে।

ডক্টর আধারকার প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলেছিলেন, তুমি এমনভাবে মন্দির আর গুহাচিত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করছিলে যাতে অতীত আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

অজন্তা চিত্রবলীর একটা কালেকশান আমার কাছে রয়েছে। ছবিগুলোর সঙ্গে আগে থেকেই আমার পরিচয়।

জান শীলা, আমার এই দেশটাকে পুরোপুরি জানার আগেই প্রবাসী হয়ে গেলাম।

সেদিন একটা বিষণ্ণতার সুর বেজেছিল ডক্টর আধারকারের কথায়। শীলার স্পর্শকাতর মনে সে সুর প্রতিধ্বনি তুলেছিল। সে সান্ত্বনার ছলে বলেছিল, আমাদের এই স্বল্পকালের জীবনে কতটুকুই বা পাওয়া যায় বল। তবু যতটুকু পাই তার জন্যেই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সৃষ্টিকর্তার কাছে।

উদ্ভাসিত মুখে আধারকার বলেছিলেন, নিশ্চয়।

শীলা ঐ কথার প্রসঙ্গ ধরে বলেছিল, আমাদের দেশের মন্দিরে মন্দিরে কত ভাস্কর অপূর্ব সব মূর্তি রচনা করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁদের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবু সেই অপূর্ণতার ভেতরেও তাঁরা অনেক কিছু পেয়ে গেছেন।

ডক্টর আধারকার প্রসঙ্গটাকে একটু ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়ে বলে ছিলেন, তুমি শুধু প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রীই নও একটা দার্শনিক মনের অধিকারীও।

ফেরার পথে খাণ্ডালার কাছে যখন ভোরের নীলাভ আলো মসলিনের মত কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের মাথায় ফুটে উঠেছিল তখন ডক্টর আধারকার শীলার মুখখানা সেদিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দেখ, ভোরের প্রকৃতি কেমন সলজ্জ বধুটির মত কুয়াশার ওড়নায় মুখখানা ঢেকে রেখেছে।

শীলা মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে বলেছিল, আমি যদি ইতিহাসের ছাত্রী হয়েও দার্শনিক হই তাহলে তুমি বিজ্ঞানী হয়েও কবি।

শীলার হাতখানা চেপে ধরে ডক্টর আধারকার বলেছিলেন, এটা সঙ্গগুণে বলতে পার। তোমার স্পর্শেই আমার কবিত্ব লাভ হল শীলা।

আর একখানা হাত স্বামীর হাতের সঙ্গে মিলিয়ে তরুণী উষার মত সেদিন প্রকৃতির আরশিতে নিজেকে দেখেছিল শীলা আধারকার।

এর পর তাদের বোম্বেতে অবস্থিতির সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। এক রাতে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে উড়ল গগনবিহারী বিহঙ্গ। নীচে এয়ারপোর্টের আলোগুলো দীপাবলীর দীপের মত জ্বলতে জ্বলতে একসময় জোনাকির ঝিকিমিকি তুলে নিভে গেল। অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রগুলি শীলা আধারকারকে তাদের আলোকিত ইশারা দিয়ে নিয়ে চলল সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের দিকে।

প্রফেসার আধারকার...। বায়ুতরঙ্গে যেন বহুদূর থেকে ডাকটা ভেসে আসছিল। ক্রমে সে ডাক শীলা আধারকারের স্মৃতির নিভৃত দরজাটাকে ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। শীলা সচেতন হয়ে উত্তর দিল, এই যে আমি।

সুমিত টিলাটা বেষ্টন করে শীলার পাশে এসে দাঁড়াল।

আপনাকে না দেখতে পেয়ে কতক্ষণ ডাক হাঁক করলাম। তাতেও যখন সাড়া পেলাম না তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

শীলা হেসে বলল, হারিয়ে যাইনি দেখে আশ্বস্ত হলেন তো।

তা বলতে পারেন।

এখন তাহলে নেমে যাই চলুন।

দুজনে পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে নেমে এল রাস্তার ওপর। শীলা পিছন ফিরে দেখল, দম্পতিটি রামধনুর খেলা দেখেছে।

এবার গাড়ি ছুটল মাইম লেকের দিকে। পথে পড়ল দত্তাত্রেয় মন্দির। স্থানটি বট অশত্থ ও অন্যান্য শ্যামল বৃক্ষে ছায়াচ্ছন্ন। পথের ওপরেই একটি সুসজ্জিত তোরণ। তার ভেতর দিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নেমে এল ওরা। সামনেই মন্দির। নাটমণ্ডপে তখন জনসমাগম। খবরে জানা গেল, কাল পূর্ণিমা। ডিসেম্বরের পূর্ণিমা তিথিতে দত্তাত্রেয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উৎসব। পুরোহিত ওদের বললেন, থেকে যান, কাল উৎসব দেখে ফিরবেন। ওরা আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল কিন্তু সময়াভাবে থাকা যে সম্ভব নয় তাও সবিনয়ে জানাতে ভুলল না।

সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ অনুষ্ঠানভূমির ওপর শোভা পাচ্ছে। যজ্ঞভূমিতে হোমকুণ্ড স্থাপিত হয়েছে। আগামী কাল সকাল নয় ঘটিকা থেকে দ্বিপ্রহর দুই ঘটিকা পর্যন্ত চলবে যজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম। পঁচিশ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অংশ গ্রহণ করবেন স্তোত্র পাঠ ও হোমের ক্রিয়াকর্মাদিতে। সন্ধ্যায় আলোর মালা ও আতস বাজিতে স্থানটিকে মনে হবে ইন্দ্রলোক। সহস্র সহস্র পুণ্যার্থীর সমাগমে সাক্‌খেলি গ্রামের এই শতবর্ষের পুরাতন ত্রি-মূর্তির মন্দির হয়ে উঠবে মহাপুণ্যভূমি।

পুরোহিতকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই তিনি দেবতার আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ ওদের হাতে দিয়ে বললেন, মঙ্গল হোক আপনাদের। শুভ হোক সংসারযাত্রা।

শীলা আধারকার ফিরে আসতে আসতে মনে মনে পুরোহিতমশায়ের আশীর্বাদের কৌতুকটি উপভোগ করছিল। নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মানুষটি তাদের দেবভক্ত কোন দম্পতি ভেবে বসে আছেন।

সুমিতের মুখে কোন কথা ছিল না। রাস্তার ওপর গাড়ীতে উঠে আসার সময়টুকু সে এলোমেলো কতকগুলো চিন্তার ভেতর ডুবেছিল।

গাড়ি আবার ছুটল মাইম লেকের পথে। সুমিতকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শীলা বলল, কি এত ভাবছেন?

সুমিতের গোপন মনের খবর যেন জানাজানি হয়ে গেছে এমনি একটা ভাব নিয়ে সে চমকে তাকাল শীলার মুখের দিকে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, ভাবনার পাখিগুলো সারাক্ষণ উড়ে ফিরছে, ওদের যে কোন একটির ওড়ার ছন্দ, গলার সুর নিয়ে মনে মনে গবেষণায় মেতে উঠলে ক্ষতি কি।

কপট গাম্ভীর্য মুখে টেনে এনে শীলা বলল, এ বিষয়ে আপনার উপযুক্ত গাইড হতে পারবেন পক্ষীতত্ত্ববিদ ডক্টর সালেম আলি সাহেব।

প্রথমে প্রাণখুলে হেসে উঠল সুমিত সরকার। সঙ্গে সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিল শীলা আধারকার। পাশে সবুজ পাতায় ছাওয়া একটা গাছের ডালে বসেছিল কতকগুলো রঙিন পাখি। তারা ওদের হাসির তরঙ্গে পাখা ভাসিয়ে বনান্তরালে উড়ে চলে গেল।

চারদিকে পাহাড়। বনের সবুজ ঢেকে দিয়েছে পাহাড়ের রুক্ষ শরীর। শীতেও সবুজের শ্যামল সমারোহ। গাড়ী এসে থামল মাইম লেকের ধারে।

শীলা চারদিকে চেয়ে বলল, একেবারে ছবি। প্রকৃতির গাছপালা, মানুষের সাজান বাগান, সব মিলে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে আঁকা একটা চোখ জুড়ানো ল্যান্ডস্কেপ।

সুমিত ড্রাইভারকে বলল, এখানে আমরা বেশ কিছু সময় কাটাতে চাই। আপনি বরং কাছে পিঠে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিন।

সুমিত ড্রাইভারের হাতে লাঞ্চের টাকা দিতে যাচ্ছিল, সে অমনি বলল, খাবার আমার সঙ্গেই আছে, টাকার দরকার হবে না। কিন্তু সাহেব, আপনাদের লাঞ্চের কি ব্যবস্থা করেছেন?

শীলা বলল, কাছে পিঠে কোন হোটেল নেই?

না মেমসাব, এ তল্লাটে কোন হোটেল নেই। তবে লেকের ঐ প্রান্তে যে ডাক-বাংলোটা গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে, ওখানে খাবার পাওয়া যেতে পারে।

শীলা বলল, যদি ওখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকে তাহলে আপনি আপনার লাঞ্চ সেরে নিয়ে আমাদের জন্য দুটো অর্ডার বুক করে আসুন। ততক্ষণ আমরা লেকটা একটু ঘুরে দেখি।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে জানাল, মেমসাহেবের কথা মত কাজ হবে।

ওরা সুন্দর সাজান গাছপালা আর অজস্র মরসুমী ফুলের কেয়ারী পেরিয়ে লেকের কাছে নেমে এল। একটা বাঁধান চাতাল রেলিং দিয়ে ঘেরা, তার ওপর ফুলে ছাওয়া লতানে গাছের চন্দ্রাতপ। চাতাল থেকে কয়েক ধাপ লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে লেকের জল অব্দি। সাদা রঙ করা কয়েকটা নৌকো বাঁধা আছে সেখানে।

সিঁড়ি বেয়ে নৌকোতে নেমে দাঁড়াল সুমিত। শীলা চাতালের রেলিং ধরে ঝুঁকে সুমিতের কাণ্ড দেখছিল। তার মুখে মিষ্টি একটা হাসি। সুমিত নৌকোতে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করে বলল, প্লীজ নড়বেন না। হাসি, কান্না যা মুখে লেগে আছে, দয়া করে তা যেন মুছে ফেলবেন না।

শীলা আধারকারের মুখের হাসি আরও খানিক বিস্তৃত হল। সুমিতের ক্যামেরা সেই মুহূর্তে ক্লিক্ করল।

এবার সুমিত রো করার ভঙ্গীতে দাঁড় ধরে বসা মাত্র শীলা তার ক্যামেরায় সে ছবি ধরে রাখল।

সুমিত অমনি বলে উঠল, আমি কিন্তু নৌকো চালাতে জানি। এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী একসঙ্গে মিলেছে, সেখানে আমি কতদিন নিজে নৌকো করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

শীলা ঝুঁকে বলল, পরীক্ষা দিতে পারবেন?

এখুনি প্রস্তুত। নাবিক হিসেবে আপনি আমার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন।

সুমিতের কথা শুনে কি ভেবে একটু হাসল শীলা। পরক্ষণেই নেমে গিয়ে বসল নৌকোতে। সুমিত শেকল খুলে নৌকো ভাসিয়ে দাঁড় টেনে চলল। গভীর জলে দাঁড়ের ঘায়ে চারদিকে হীরে মতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আকাশে তখন জ্বলছে মধ্যাহ্নের সূর্য। লেকের মাঝামাঝি এসে সুমিত হঠাৎ দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ডান কাঁধখানা চেপে ধরে কাতরাতে লাগল।

শীলার গলায় উদ্বেগ, কি হল?

মুখে কষ্টের ছাপ, সুমিত বলল, ডান হাতখানাতে ক্র্যাম্প ধরল হঠাৎ।

শীলা এগিয়ে গেল সুমিতের কাছে। অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে নিশ্চয়?

তা হচ্ছে। আপনি বরং দাঁড়টা টেনে বাংলোর দিকে যাবার চেষ্টা করুন। নৌকোটা এদিক ওদিক ঘুরছে।

আমি একেবারে আনাড়ী।

কাতারাতে কাতরাতে সুমিত বলল, আমি যেমন করে টানছিলাম, আপনি তেমনি চেষ্টা করে দেখুন, ঠিক পারবেন। অসহ্য যন্ত্রণা, আমি হাত নাড়তে পারছি না।

অগত্যা আনাড়ীর হাতে দাঁড় উঠল। নৌকো নড়ল, কিন্তু সে ডাক-বাংলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল।

শীলা আধারকারের অসহায় গলা শোনা গেল, এ যে পাহাড় আর জংগলের দিকে চলে যাচ্ছে।

সুমিত বলল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ওদিকে কোন বসতি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আর এখান থেকে এই দুপুরবেলা চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।

শীলা আধারকার অনেক জোরে, অনেক কসরৎ করে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে বাংলোর ঘাটে ভেড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। অবাধ্য নৌকোটা এক বিদুষী যুবতীর সব প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাকে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলে।

সুমিত উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা নেড়ে বলল, এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন, আপনার শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেছে।

শীলা দাঁড় ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে সুমিতের মুখের দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সুমিত এখন পাকা হাতে দাঁড়ের ঘায়ে জল তোলপাড় করে নৌকোটাকে নিয়ে চলল বাংলোর দিকে।

শীলা বলল, আপনার হাতের ব্যথা?

আর ব্যথা। এখুনি ঐ জংগলে নৌকো ভিড়িয়ে দিতেন আপনি। বাঘ ভালুকের খপ্পরে পড়ে জানটা যেত। হাতের ব্যথার চেয়ে প্রাণটা রক্ষা করা অনেক জরুরী।

শীলা আনুনাসিক স্বরে অনুযোগ জানিয়ে বলল, হাতের ব্যথা আপনার মিথ্যে অভিনয়।

মিথ্যে হোক আর সত্য হোক আপনার পরীক্ষা হয়ে গেল।

কি রকম?

মাথায় মাথায় পাশ নম্বর পেয়ে উৎরে গেলেন।

সে আবার কি?

আপনার পরিশ্রম আছে, বিপদে সংগ্রামের চেষ্টা আছে, তাই পাশ নম্বর। আর আসল বিষয়টার ওপর বিন্দুমাত্র দখল নেই তাই ফুল মার্কসের সেভেন্টি পারসেন্ট বরবাদ।

শীলা তখনও আনুনাসিক, আপনি দারুণ একখানা কৌতুক করলেন যা হোক।

আমি দেখছিলাম, সংসারের হাল আপনি কতখানি ধরতে পারেন।

যা হোক সেখানে আপনার হাতে অন্তত পাশমার্কটাও তো পেয়েছি।

তা পেয়েছেন। আর চেষ্টা যখন আছে তখন সিদ্ধিও একদিন অবশ্যম্ভাবী।

নৌকো ডাকবাংলোর ঘাটে এসে ভিড়ল। নামতে নামতে শীলা বলল, বেশ একখানা মজা হল আজ, মনে থাকবে অনেকদিন।

সুমিত বলল, আপনি যে কোন কিছুকে ফেস করতে ভয় পান না, এ সত্যটা আমার মনে থাকবে সারা জীবন।

ওরা উঠে দেখল, বাংলোর লনে গাড়ীর চালকটি দাঁড়িয়ে আছে। সে বাংলো থেকেই ওদের নৌকোতে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

দুটো মিলের ব্যবস্থা ছিল। লেকের হাওয়া আর নৌকো চালানোর পরিশ্রম মিলে চনচনে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল।

খেতে বসে খুব সাপ্টে খাচ্ছিল সুমিত। খাবার ব্যাপারে বন্ধু মহলে তার কিছু নামডাক আছে। শীলা সুমিতের খাবার রকম সকম লক্ষ্য করে নিজেই বোল থেকে তার ডিশে বেশী বেশী পরিবেশন করতে লাগল। প্রথমটা সুমিত বুঝতে পারেনি, পরে একসময় সে ডিশ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কি হল? বেশ তো খাচ্ছিলেন।

সুমিত তেমনি চুপ, কথা বলে না।

শীলা এবার বলল, সারা লেকের জল দাঁড়ের ঘায়ে তোলপাড় করে এলেন, ব্রহ্মাণ্ড গিলে খাবার কথা, এরই ভেতর হাত গুটিয়ে নিলেন!

আর আপনি? নিজে না খেয়ে আস্ত একটি রাক্ষসকে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন।

কে বলল খাইনি! তাহলে এতগুলো খাবার কি উধাও হয়ে গেল?

সুমিত চুপচাপ কিছু সময় শীলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, নাঃ, আপনার আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। বাইরে থেকে আপনাকে যত আধুনিকাই মনে হোক না কেন, আপনি মনে মনে সেই সীতা সাবিত্রীর যুগেই হাঁটছেন। পুরুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ আপনাদের রক্তে।

হেসে বলল শীলা আধারকার, হয়ত তাই। আর তাছাড়া আমি তো প্রাচীন ইতিহাসেরই লোক।

সুমিত বলল, অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন, এখন দয়া করে আমাকে একটু পরিবেশনের সুযোগ দিন।

কোপ্তার বাটিটা সুমিত উপুড় করে দিতে যাচ্ছিল শীলা আধারকারের প্লেটে, শীলা সময়মত বাঁ হাতখানা বাটিতে ঠেকিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, আমাকেই ভাগটা করতে দিন। আদ্দেকের কানাকড়িও আপনাকে বেশী দেব না।

খাওয়া শেষ হলে ওরা সামনে রাখা গাড়ীতেই বেরিয়ে যেতে মনস্থ করল কিন্তু সমস্যা হল নৌকোটা নিয়ে। যথাস্থানে তাকে রেখে আসার দায়িত্ব আছে। একে তো কাউকে না বলেই এনেছে, তার ওপর অস্থানে ফেলে রেখে যেতে বিবেকে বাধল। অগত্যা সব মনোবাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আবার নামতে হল জলে।

সুমিত বলল, এবার আপনি একখানা দাঁড় ধরুন, আমি অন্যটা। দুজনে একতাল মিলিয়ে দাঁড় টানব, অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি নয়। দেখুন না, ওপারে পৌঁছানোর আগেই আপনার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

সোৎসাহে শীলা একদিকের দাঁড় অধিকার করে বসল।

ওপারে লেকের সংলগ্ন রাস্তায় গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ওরা নৌকো যথাস্থানে বেঁধে রেখে গাড়ীতে গিয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। উত্তেজনা তখনও শীলা আধারকারের সারা মন জুড়ে। সে বন্ধু সুমিত সরকারের নির্দেশমত তালে তালে দাঁড় টেনে এসেছে, প্রায় কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি।

এখন গাড়ি ছুটেছে আরব সাগরের তীর লক্ষ্য করে। সূর্যাস্তের আগে বিখ্যাত কটি সী-বীচ ঘুরে দেখতে হবে।

শীলাই প্রথম কথা বলল, যে কোন বিষয়ে শিখে নিতে বেশ এক ধরনের আনন্দ আর উত্তেজনা আছে।

যেমন? আমি বলতে চাইছি, কি প্রসঙ্গে আপনার এ ভাবনাটা এলো।

এই ধরুন না, আজ আপনার কাছ থেকে নৌকো চালানোর কৌশলটা শিখে নিলাম। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে নতুন কিছু শিখতে পেরে।

খুব স্বাভাবিক। যে মাঝি ত্রিবেণীতে আমাকে নৌকো চালাতে শিখিয়েছিল সে এখন বুড়ো হয়ে

গেছে, নৌকো চালাতে আর পারে না। আমি প্রায়ই মানুষটার কাছে যাই, গল্প করি। এখনও ওর কথার নব্বই ভাগ জলের স্রোত আর নৌকোকে কেন্দ্র করে।

শীলা বলল, আপনি এখনও মানুষটিকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রশংসনীয়।

না না, নিন্দা প্রশংসার ব্যাপার নয়। যে মানুষটির কাছে কোন কিছু শিখেছি সে আমার গুরু। তাকে সঙ্গ দিলে নিজেরই আনন্দ।

আপনিও তাহলে এদিক থেকে আমার গুরু।

গম্ভীর গলায় সুমিত বলল, কি করে বলি বলুন, এখনও গুরুদক্ষিণা পাইনি।

ও এই কথা, কি চাই বলুন?

বিশেষ কোন চাহিদা নেই, শিষ্যার যা অভিরুচি।

তাহলে যে কদিন গোয়া দর্শন হবে সে কদিন গুরুর গুরুভোজনের দায়িত্ব বহন করবে শিষ্যা।

তথাস্তু। যথা লাভ।

দূরে পাহাড়ের আভাস। মাঝে চলেছে ক্ষেতের কাজ। মসৃণ পীচের রাস্তা। গাড়ি চলেছে ঝড় তুলে। শীলার চূর্ণ চুলের রাশি মাঝে মাঝে কপালে আর মুখে ঝাপটা খেয়ে পড়ছে। দু হাতের আঙুল বুলিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে শীলা। সুমিতের চোখ আটকে যাচ্ছে সেই একটুকরো দৃশ্যে।

সুমিত ভাবছে, দেহে মনে এমন পরিপূর্ণ একটা সৃষ্টি কি করে বিফল হয়ে যায়! শিক্ষা, সংস্কৃতি, চরিত্রের ভারসাম্য, সহজ সপ্রতিভ ব্যবহার, সব কটি গুণই যার সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত, সে কি করে ব্যর্থ হয়ে যায় একটা সুখের নীড় রচনা করতে। কেন শীলার স্বামী এমন একটি তুলনাহীনা নারীকে বেঁধে রাখতে পারলেন না! যে কোন প্রতিভাধর পুরুষের একান্ত কাম্য হতে পারে যে নারী, সে আজ পরিত্যক্তা। এ যেন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা।

সুমিতের মনে হয়, শীলা যদি তার জীবনের বন্ধ ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টে যেত তাহলে মানুষের জীবনের অনেক অকথিত আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যেত তার ভেতর। কিন্তু এ নারী স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া। যার কাছে সখ্য কখনও সংযমের সীমা লঙ্ঘন করে না। যার পুষ্পিত বসন্ত-শোভা দূর থেকে দেখে তারিফ করতে হয়, কাছে গিয়ে স্পর্শ করার অধিকার পাওয়া যায় না। বনভূমির অন্তরালে আরও কিছু শোভা, সৌরভ থেকে যায়, যা তার একান্ত নিজস্ব।

ভাগাতর বীচের কাছে এসে গাড়ীটা থেমে গেল। সামনে দিগন্ত ছোঁয়া নীল কালির সমুদ্র। পাহাড়ের খণ্ড খণ্ড চাঁই সাগরের জলে স্নান করছে। কয়েকটি নারকেল গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে হীরের ঝলক। সূর্যকিরণের সঙ্গে সাগরতরঙ্গের লেনদেন। স্থানটি নির্জন। দু'চারটি দর্শনার্থী পুরুষ মহিলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

গাড়ি থেকে নেমে নরম বালিতে পা ডুবিয়ে শীলা আধারকার ভারী খুশি হয়ে উঠল। সে বসে পড়ে মুঠো ভরে বালি কুড়োতে লাগল।

পেছন থেকে সুমিত বলল, কি কুড়োচ্ছেন?

স্বর্ণরেণু। সোনার ধুলো।

বলতে বলতেই উঠে পড়ে ত্রস্ত পায়ে নীচের একটা বোল্ডারের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। মাথার ওপর দুলছে নারকেল গাছের আন্দোলিত পাতার ঝালর।

সুমিত জলের ঝিলমিল, নারকেল গাছ, বোল্ডারের ওপরে দাঁড়ান এক নারীকে ক্যামেরায় বন্দী করে নিল।

ছবি তোলা শেষ করে ক্যামেরাখানা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখামাত্র শীলা ওপর থেকে চোখ তুলে সুমিতের দিকে চেয়ে বলল, কি, ক্যামেরা বের করছেন না যে? এই ছোট্ট স্পটটা ভাল লাগছে না বুঝি?

সাবজেক্ট আমার ঠিক হয়ে আছে। শুধু আপনার একটুখানি সাহায্যের প্রয়োজন।

বলুন।

ঐ বোল্ডারের ওপর আপনি বসুন। চেয়ে থাকুন ডানদিকের সমুদ্র লক্ষ্য করে। আমি আপনার মুখের ডান দিককার প্রোফাইলটা ক্যামেরায় ধরতে চাই। আর আপনার ঐ বালুরঙের ওড়নাখানা শাড়ির প্রান্তের মত ছড়িয়ে দিন পায়ের তলায়।

অসংকোচে তেমনি করে বসল শীলা আধারকার। গায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো শালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরে এসেছে সে। শ্যাম্পু করা ঘন চুল হাওয়ায় দোল খাচ্ছে কাঁধের ওপর।

সুমিত ছবি তুলল। ক্যামেরা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বলল, এ ছবিখানা যদি মনের মত হয় তাহলে নোবল প্রাইজ পাওয়া কোন কবির কয়েক ছত্র কবিতা তুলে আপনাকে প্রেজেন্ট করব।

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুটি প্রশ্নের উত্তর চাই।

বলুন।

প্রথম প্রশ্ন, কোন কবির কবিতা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কবিতার সেই ছত্রগুলি কি ?

এই তো মুশকিলে ফেললেন, পুরো সারপ্রাইজটা মাটি।

আমার কাছে যে মুহূর্তে নতুন কিছু আসে, সেটাই সারপ্রাইজ। আপনার মুখে কবি আর কবিতার নাম শুনলে সেই সারপ্রাইজ আসবে।

সুমিত বলল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

শীলা গভীর শ্রদ্ধায় বলল, ভাষান্তরে তাঁর বহু রচনা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমে ইংরাজিতে তর্জমা করে বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়ে মূল বাংলায় কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাল সুমিত।

'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে,
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।'

আপনি এমন দরাজ সুরেলা গলায় আবৃত্তি করতে পারেন তা জানতাম না।

সুমিত হেসে বলল, এটা আপনার কাছে অতিরিক্ত সারপ্রাইজ, তাই না?

হেসে মাথা নাড়ল শীলা। বলল, গলায় সুরের কাজ থাকলে উপভোগের ক্ষেত্রে ভাষা যে কোন বাধাই নয়, তার প্রমাণ পেলাম।

সুমিত বলল, আস্তাবল তৈরি, সাজপোশাক আর চাবুকও এসে গেছে, এখন কেবল অশ্বের আগমনের প্রতীক্ষা।

তার মানে?

উদ্ধৃতির ব্যবস্থা পাকা, সেটা আবার গ্রহীতার জানাও হয়ে গেছে, এখন ফটোখানা ভালোয় ভালোয় উৎরোলে বাঁচি।

শীলা বলল, এত কষ্ট করে বসলাম, সামনে নীল সমুদ্রের দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম, সব কি বিফলে যাবে ভেবেছেন? কখনও না।

আপনার লাক আর আমার হাতযশ।

একটা দুর্গ শরীরে প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে অদূরে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শীলা বলল, ঐ দেখুন, ছাপোরা ফোর্ট। কান পাতুন, হয়ত শুনতে পাবেন কামানের গর্জন।

আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

শীলা বলল, অতীতের দরজায় কান পাতলে শোনা যাবে বইকি।

এবার ওরা এল আঞ্জুনা বীচে। ভাঙা ভাঙা নীচু পাথর ছড়ান অঞ্চল। মাঝে মাঝে নারকেল গাছের সারি। গাছের জটলার ভেতরে ছোট ছোট কুটির পাতায় ছাওয়া। নীচে বালু বিছানো সী-বীচ। এইসব কুটিরে হিপি হিপিনীরা মনের সুখে নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটায়। হোম থেকে সামান্য যেটুকু অর্থ আসে তাতে ওদের দিন চলে যায়। বছরের পর বছর ওরা এমনি করে কাটিয়ে যাচ্ছে ওদের দিনরাত্রি সমুদ্রতীরের এই স্বর্গরাজ্যে। তাই গোয়ার আঞ্জুনা বীচের নাম হয়েছে হিপিদের স্বর্গলোক।

ওরা বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, ছেলেপুলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, সমুদ্রে রাত নেই, দিন নেই স্নান করে পরমানন্দে। গান শোনে, আরব সাগর থেকে ভেসে আসা হাওয়ার সঙ্গে নারকেল পাতার ঘর্ষণে যে মর্মর ধ্বনি ওঠে, সেই গান। নিজেরা গীটার বাজায়। জ্যোৎস্না রাত্রে চাঁদের আলো যখন নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে বালুর জমিনে রহস্যময় আঁকিবুঁকি তৈরি করে তখন ওরা তারই ওপর বসে গীটারে তোলে সাগরতরঙ্গের সুর।

ওদের পুরুষ আর নারী নিরাবরণ থাকতেই ভালবাসে। দিনে যে সব ভ্রমণার্থী আঞ্জুনা বীচে এসে দাঁড়ায় তারা অবাক হয়ে দেখে সমুদ্র-স্নান সেরে হয়ত একটি নারী, হয়ত বা একটি পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্নদেহে উঠে এল। তারপর দীর্ঘ বালুর জমিনে চরণ-চিহ্ন এঁকে চলে গেল নারকেল কুঞ্জের অভ্যন্তরে তাদের নির্দিষ্ট আস্তানার অভিমুখে। ওদের দেখলে মনে হবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার আগে গার্ডেন অব ইডেনে অসঙ্কোচে ঘুরে ফিরছে সম্পূর্ণ নিরাবরণ আদম আর ইভ।

শীলা আর সুমিত বসেছিল একটা উঁচু পাথরের চাঁই-এর ওপর। হিপি মেয়েপুরুষেরা চলাফেরা করছে। ওরা তাকিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। কেউ কেউ ঢেউ ভেঙে স্নানের খেলায় মেতেছে। কারু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সুমিত উঠে দাঁড়াল। শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, যাবেন নাকি তীর ধরে খানিকটা এগিয়ে?

শীলা সারাদেহে আলস্যের ঢেউ তুলে বলল, একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনি বরং ঘুরে আসুন, আমি এখানেই আছি।

সুমিত অগত্যা একাই সমুদ্রতীর ধরে বাঁদিকে এগিয়ে গেল।

সুমিত চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে শীলা আধারকার। একটি প্রাণচঞ্চল যুবক ডক্টর সুমিত সরকার। বড় সুন্দর স্বাভাবিক আচরণে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। শীলার ভাল লাগে এমনি অসংকোচ ব্যবহার।

অনেক অনেকখানি দূরে সুমিত চলে গেল। আকার ছোট হতে হতে একটা বালির টিবির আড়ালে সুমিত অদৃশ্য হয়ে গেল। শীলা চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই চোখের ওপর ফুটে উঠল আর একখানা ছবি। ঠিক সুমিত যেখানে অদৃশ্য হল সেখানে থেকেই বেরিয়ে এল আর একটা আকার। এত দূর থেকে নারী কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ছবিখানা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পুরুষ না রমণী? সংশয়ও ঘুচল। একটি নগ্ন নারী এগিয়ে আসছে। সোনালী চুলের প্রপাত নেমেছে পিঠ আর দুটি কাঁধ ছুঁয়ে। আরও কাছে আসতে দেখা গেল নারীর বুক জুড়ে রয়েছে একটি শিশু। রমণীর মুখে মাতৃত্বের অপার আনন্দ-ছবি। শীলার মনে হল, এতক্ষণ আঞ্জুনা বীচের যে নগ্নতা তার চোখকে পীড়িত করছিল, এই একটুকরো ছবি তার সব গ্লানি মুছে দিল। চিরদিনের ম্যাডোনা তার অপার স্নেহসিক্ত দৃষ্টি নিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। এই তো নারীর পরিপূর্ণতা। সে জননী হয়ে পূর্ণ করেছে তার নারীসত্তাকে। সেই মুহূর্তে একটা ব্যথার তরঙ্গ মনের অতল থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার

দেহের কোষে কোষে। এ ব্যথা অসহ্য কিন্তু বড় আনন্দের। শীলা আধারকার দু'চোখ বুজে সেই বেদনভরা আনন্দের আস্বাদ নিতে লাগল।

এবার ওদের গাড়ী চলল আগুয়াদা ফোর্টের দিকে। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক দুর্গ। এখন প্রবেশমুখে 'প্রবেশ-নিষেধ'এর নোটিশ টাঙান।

গাড়ী থেকে নেমে গেট পেরিয়ে ডানদিকে অফিস ঘর। লাইট হাউসে ওঠার জন্য এখানে টিকিট কেটে নিতে হয়।

শীলা টিকিট কেটে নিয়ে একখানা টিকিট সুমিতের হাতে দিয়ে বলল, আপনি আগে ওপরে উঠে যান। বাতিঘরের ঘোরানো বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আপনি একখানা হাত আরব সাগরের দিকে প্রসারিত করে রাখবেন।

আর আপনি নীচে দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে আমার ছবি তুলবেন, এই তো? কিন্তু আরব সাগরের দিকে হাতখানা প্রসারিত করে দেবার অর্থ?

প্লিজ প্রফেসার সরকার, আমাকে এখন আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আপনি দয়া করে ওপরে গিয়ে আমার সামান্য ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করুন।

তথাস্তু।

সুমিত ঢুকে গেল লাইট হাউসের ভেতরে। লোহার খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাতিঘর সংলগ্ন ছাদে। এ সময় অন্য কোন দর্শনার্থীর ভীড় ছিল না। সে নীচে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত নাড়ল। শীলা ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে তাক করে আছে। এবার সুমিত বাধ্য ছেলের মত এগিয়ে গেল সামনে। দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ তটরেখার ক্ষীণ আভাস। ডান হাতখানা সেদিকে প্রসারিত করে উদাত্ত কণ্ঠে সুমিত কালিদাসের সেই বহু প্রচলিত শ্লোকটির আবৃত্তি করতে লাগল। এমনি নির্জন পরিবেশে, সমুদ্রের দূর তটরেখায় নারকেল কুঞ্জের সবুজ হাতছানি দেখে কবি কালিদাস সম্ভবত তাঁর বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেছিলেন।

'দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।'

কতক্ষণ আপন মনে এমনি হাতখানা সমুদ্রতটরেখার দিকে প্রসারিত করে আবৃত্তি করছিল সুমিত। সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল শীলা।

সুমিত কিন্তু হাতও নামাল না, মুখও ফেরাল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

শীলা সহাস্যে বলল, কি হল, এখনও হাত তুলে যে?

যাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে হাত উঠিয়েছি, তিনি আজ্ঞা না দিলে সে হাত নামাই কোন সাহসে।

শীলা নিজেই হাসতে হাসতে সুমিতের হাতখানা ধরে নামিয়ে দিয়ে বলল, সংস্কৃত আবৃত্তিও আপনার অসাধারণ। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, স্বরক্ষেপণের ক্ষমতা, সব দিক থেকে অনন্য।

সুমিত বলল, এইসব প্রশংসাবাক্য শোনাবেন বলেই কি আমাকে ওপরে সমুদ্রের দিকে দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে দাঁড়াতে বলেছিলেন?

না, সুমিতবাবু, তার চেয়েও কিছু বেশী।

কি রকম?

আপনি এই লাইট হাউসের মত এক আলোর দিশারী। আপনার ছাত্রছাত্রীদের সামনে আপনি আলোকিত বাহুটি প্রসারিত করে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

আপনার উপভোগ্য ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ।

ওরা দুজনে লাইট হাউসের ওপর থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটি মনোরম মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। সবুজ গাছগুলি ঢালু বেয়ে সমতলের দিকে নেমে গেছে। নীচ থেকে ঘুরে ঘুরে গাড়ী আসছে ফোর্টের দিকে। দূরে কালানগুটে বীচের আভাস। হাঁসুলির মত নীল সমুদ্র বাতিঘরটিকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়ছে। দূরে ডোনাপলার আভাস। ঐ তো নদী জোয়ারী তার জল উজাড় করে দিচ্ছে সাগরে।

নীচে বাঁদিকে ফোর্টের একাংশ জেলখানায় রূপান্তরিত। ডানদিকে পাঁচতারকার হোটেল 'তাজ আগুয়াদা'। হোটেলের নীচে স্নানার্থীদের জন্য তাজের নিজস্ব ছোট্ট সী-বীচ।

ঘড়ি দেখে শীলা বলল, সূর্যাস্তের বড় বেশি দেরি নেই। আমরা সৈকতের রানী কালানগুটেতে গিয়ে অস্তসূর্যকে নমস্কার জানাব।

ওরা লাইট হাউস থেকে নেমে এল। এবার গাড়ী চলল কালানগুটে বীচের দিকে। সবুজ নারকেল বীথি পেরিয়ে গাড়ী দাঁড়াল অজস্র দোকানপাটের একদিকে। নানারকম পুরাতন দ্রব্যাদির পশরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছে ব্যবসায়ীরা। এর ভেতর আর্কষণীয়, বিরাট বিরাট চাদরের ওপর সুদৃশ্য প্রিন্ট আর এপ্লিকের কাজ।

সুমিত আর শীলার সে সব দেখার সময় ছিল না। তারা ভীড় ঠেলে নেমে গেল প্রশস্ত সোনালী বালুর জমিনে।

নানা পোশাকের নারী পুরুষ ভীড় জমিয়েছে সমুদ্রতীরে। বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রূপের আনন্দ মেলা। ছোট শিশুরা অল্প ভেজা বালি নিয়ে ঘর তৈরি করছে মহা উৎসাহে। মা বাবা একটু দূরে বসে পরিতৃপ্তির চোখে লক্ষ্য করছেন তাদের ক্রিয়াকর্ম। তারা ভাঙছে, গড়ছে, দৌড়চ্ছে। একটু তফাতে একটা বালুর টিবির ওপর বসে দার্শনিকের দৃষ্টিতে একটি মানুষ চেয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে।

হৈ হৈ করতে করতে একদল মেয়ে বাজারের পথ থেকে নেমে আসছে সমুদ্রতীরে। হাতে ধরা পাতার ঠোঙাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নিজেরা উড়ে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের জলের দিকে। সম্ভবত ঐ ঠোঙাতে তারা চানা জাতীয় কিছু খাচ্ছিল। এখন ওরা ঢেউ-এর সঙ্গে খেলা করতে করতে পোশাকের প্রান্তগুলো ভেজাচ্ছে। কোন স্কুল থেকে মনে হয় বেড়াতে এসেছে ছাত্রীর দল। টিচাররা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শাসনের ভঙ্গীতে কি যেন বলছেন। তাঁদের কথার সামান্য টুকরোও ওদের কান পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। মাঝপথে হাওয়া আর সমুদ্রের ডাক কথাগুলোকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে কোথায় যেন নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত হচ্ছে। রক্তগোলক থেকে বিচ্ছুরিত আভায় ভরে গেছে চরাচর।

সুমিত বলল, এবার আমার পালা। দয়া করে সমুদ্রের জলে অঞ্জলি ভরে সূর্যকে ডানদিকে রেখে দাঁড়ান।

শীলা বাক্যব্যয় না করে বাধ্য মেয়ের মত তাই করল। সুমিত চমৎকার একটি সিল্যুয়েট ছবি তার ক্যামেরায় বন্দী করে রাখল।

শীলা তেমনি তর্পণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুমিত এগিয়ে গেল তার দিকে। বলল, ছবি কখন তোলা হয়ে গেছে, এখনও স্থির হয়ে কি ভাবছেন?

শীলা তখন যেন অন্য কোন মানবী। গভীর গলায় বলল, ভাবছি, একটি নারী, উদ্বেলিত সমুদ্র, অশান্ত সূর্যাস্ত।

।। ৩।।

গাড়ি যখন পানাজীতে এসে পৌঁছল তখন কিশোরী সন্ধ্যা তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মাণ্ডবীর কূলে সন্ধ্যার রমণীর আলোকসজ্জা।

গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল শীলা। যুবক ছেলেটি বলল, আপনারা সোঁরাও আইল্যাণ্ডে নাচগানের আসরে গিয়েছিলেন কি?

শীলা মাথা নেড়ে জানাল, তাদের ওখানে যাওয়া হয়নি।

আপনারা তো কালকের দিনটা মাত্র গোয়াতে আছেন। টিকিট পেলে এখুনি মোটর বোটে চলে যান। দেখেশুনে আনন্দ পাবেন।

শীলা বলল, আমাদের নতুন হোটেল খুঁজে রুম বুক করতে হবে। যা ভীড়, পাব কিনা জানি না। এখন আবার গান শুনতে গেলে ফিরে এসে মাণ্ডবীর তীরে রাত কাটাতে হবে।

যুবকটি বলল, সে ভার আমাকে দিন। নটায় বোট আপনাদের নিয়ে ফিরে আসবে। আমি ঐ সামনের গ্লাস হাউসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। ঐখান থেকেই মোটর বোট সোরাঁও আইল্যাণ্ডে যাওয়া আসা করে। চলুন আমার সঙ্গে, টিকিট পাওয়া যায় কিনা দেখি।

যুবকটি ওদের প্রায় কোন কথা বলার সুযোগ দিল না। সুমিত আর শীলা গ্লাস হাউসের দিকে যেতে যেতে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

দুটো টিকিট পাওয়া গেল। বোট এখুনি ছেড়ে যাবে।

শীলা ড্রাইভার ছেলেটিকে বলল, তোমার টাকাটা নাও।

ও ফিরে এসে দেবেন, সময় নেই, উঠে যান।

শীলা বলল, আমাদের জন্য দু'খানা সিঙ্গল রুমের ব্যবস্থা রেখ ভাই।

যুবকটি মাথা নাড়ল। ওরা মোটর বোটে ঢুকে বসল।

মাণ্ডবী নদীর বুকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। মোটর বোট নেহেরু ব্রীজের তলা দিয়ে পেরিয়ে এল। নেহেরু ব্রীজকে একটা আলোর তৈরী সেতু বলে মনে হচ্ছে।

জলের বুকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। এত উজ্জ্বল রূপোর কুচি সারা দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার উজাড় করেও একে কেনা যাবে না। শীলা আর সুমিত পাশাপাশি বসে জলের বুকে এই আলোর খেলা দেখছিল। তাদের মুখে কথা ছিল না। ঝিরঝিরে হাওয়া সারা দিনের ক্লান্তি মুছে দিয়ে যাচ্ছিল। এপার ওপার দুপারেই ছায়াছায়া ঝোপ যেন জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে মাণ্ডবীর বুকে চতুর্দশী চাঁদের রুপোলী তীরের খেলা। ঐ তো দূরে একটা পাহাড় অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাহাড়ে, নদীতে ছায়াময় বনে মায়াময় হয়ে উঠেছে তন্বী রাত্রি।

সুমিত শীলার হাতে নাড়া দিয়ে বলল, বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখুন, কি অপূর্ব একখানা চার্চ।

শীলা সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরাল। মুখের থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ।

নদী মাণ্ডবীর বুকে জেগে উঠেছে একখণ্ড ডাঙা। কালো আলখাল্লা পরা সবুজ বৃক্ষগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় স্নান করছে। সামনে ধবধবে সাদা গীর্জা, চূড়াটি গগন স্পর্শ করেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় চার্চের আলোকসজ্জা। মনে হচ্ছে হলুদ গাঁদাফুলের মালায় সাজান হয়েছে সারা গীর্জাটি। সেই গীর্জা তার আলোকসজ্জা নিয়ে প্রতিবিম্ব দেখছে জলের আর্শিতে।

বোট পেছনে জলের ঘূর্ণি তুলে চার্চ পেরিয়ে এল। অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে গেল গাঁদার মালা।

চার্চ মুছে যেতেই সুমিত বলল, কেমন একটি ছবি দেখালাম বলুন?

ভোলার নয়।

অতশত বুঝি না, আপনি অন্য যে কোন একখানা ছবি দেখালেই চলবে।

সঙ্গে সঙ্গে শীলা সুমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি দৃশ্যের দিকে।

জনৈকা পৃথুলা ভদ্রমহিলা সম্ভবত তার শীর্ণ স্বামীকে শালের খুঁটি ভেবে হেলান দিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন।

সুমিত বলল, সন্দেহ নেই, দৃশ্যটি পরম উপভোগ্য। মনে হয় মোহময়ী প্রকৃতির প্রভাবে মূর্ছিতা।

আট কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বোট এসে স্পর্শ করল সোরাঁও আইল্যান্ডের মাটি। ছোট সমতল জায়গায় একটি আসর পাতা। তার পেছনে কয়েকখানা চেয়ার। দর্শকদের বসার আসন। সবশেষে সোরাঁও আইল্যান্ডের জ্যোৎস্না ধোয়া নারকেল বীথি।

শীলা সুমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ওমা, এরা কোথায় ছিল, আমাদের সঙ্গে একই বোটে এল বুঝি !

সুমিত বলল, তাইতো দেখছি। বোটের সামনে যে একটুকরো ঘর, ওর মধ্যেই ছিল, আমরা দেখতে পাইনি।

পাঁচটি মেয়ে বোটের ছাদে পা ঝুলিয়ে বসেছে। সাদা ব্লাউজ আর লাল ফুলওয়ালা ফ্রকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। সারা আসরের চারদিক ঘিরে আলো। দুটি ছেলে ঐ মেয়েদের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে গীটার। তারা সাদার ওপর লালের আঁকিবুকি কাটা জামা পরেছে। প্যান্ট, নিকষ কালো। পেছনে মাণ্ডবী নদী। তার ও-প্রান্তে কুয়াশার মসলিনে ঢাকা রাতের পাহাড়।

আসরের একপ্রান্তে বোট ঘেঁষে বসেছে বাদকের দল। ঢাপ, ডাব্লি, স্প্যানিশ গীটার, ঝাঁজ, তাসা আর স্যামেল নিয়ে বসেছে সবাই। মাঝে সম্ভবত পরিচালক বসে। তার হাতে একটি বীণা। পর্তুগীজ আর ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণে তৈরী আসর। প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে পরিচালক্ ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

প্রথমে 'দেখানি' নাচ সুরু হল। গোয়ার বড় পরিচিত ও প্রিয় নাচ এটি। পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের সঙ্গে কোঙ্কনী সংস্কৃতি ও নৃত্যের অপূর্ব মিশ্রণ। নাচের ভঙ্গী আর মুদ্রায় কথক আর ভরতনাট্যমের সুস্পষ্ট প্রভাব।

বোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চার পাঁচটি মেয়ে। হলুদ, সবুজ, লাল কাঞ্জিভরমে সেজেছে। কিন্তু উগ্রতা নেই সাজসজ্জায়। আঠারো বিশ বছরের চারপাঁচটি তরুণী। মুখভরা সহজ মিষ্টি হাসি। বাঁ হাতে চিত্রিত মাটির পাত্র। তার ভেতরে প্রজ্জ্বলিত মাটির প্রদীপ।

ওরা বোট থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঐকতানে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর বেজে উঠল। বোটের ছাদে যে মেয়েগুলি বসেছিল তারা হাততালি দিয়ে গান গাইতে লাগল।

'হান্‌ভ সায়ারা
পাইলতাদি ভাইতা'-- -

নাছছে মেয়েগুলি। চমৎকার আরতির মুদ্রা। তারই ভেতর পূজারিণীর অভিব্যক্তি। কখনো বা ভরতনাট্যমের নয়ন আর মুখ বিভঙ্গ। আবার কখনও কথকের পদচারণা।

নাচটি শেষ হলে এক ধরনের আরতির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে।

নর্তকীর দল পূজার পরিবেশটি রচনা করে আবার বোটের মধ্যে ফিরে গেল। এ সময় ঝাঁক (ঝাঁঝর), স্যামেল (খঞ্জনীর মত), আর ঢোল্‌কি বাজছিল। ধীরে ধীরে সে শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

এরপর এল ফুগ্‌ডি নর্তকীরা। গণেশ চতুর্থী উৎসবের নাচ এটি। ভগবানের কাছে বর্ষার প্রার্থনা। কিন্তু ওরা যে গান দিয়ে শুরু করল তাতে বর্ষার প্রার্থনা ছিল না, ছিল প্রভাতে তুলসীকে সেবা করার কথা।

সূর্য উঠেছে, তুমি এখনো ঘুমিয়ে! তুলসীর সেবা কর। জল ঢাল, কুমকুম লাগাও।

'উগাওয়ালা সূর্যদেব
আজুনি বন্দু কাইয়ো করি।
তুলসী বেহনি সেবা করু।'

সাদা পাটোলা পরেছে চারটি মেয়ে, সঙ্গে লাল ব্লাউজ। তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে। একটি বৃত্ত রচনা করে নাচছে তারা।

এবার মেষপালিকারা ফুগ্‌ডি নাচ কেমন করে নাচে তাই দেখান হল। ওরা পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে হাতে হাত বেঁধে নাচল। এ সময় কোন বাজনা বাজল না। মেয়েগুলি এগিয়ে পিছিয়ে নাচল, আর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক ধরনের বন্য পাহাড়ী সুর।

এবার শুরু হল ফোক্‌ সঙ্‌। একটি ছেলে গালে আঙুল ঠেকিয়ে গানটি গাইলে। বিচ্ছেদের গান, বিরহের গান।

গানটির টাইটেল হল ঃ 'কাজি যা যা যা যা।'

'সাইউ দিজেন্দু
কি ভো আলি
ই ভলতু যা।
মইস নাউ ভলতৌ
পুরকে পুরকে সেরা।'

মেয়েটি ছেলেটিকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যাবার সময় বলে গেছে, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। কতদিন গেল, তবু সে তো ফিরে এল না। আমি জানি না, কথা দিয়ে কেন সে এল না।

সারা সন্ধ্যার আকাশকে ভারাক্রান্ত করে চিরবিরহের সেই সুর ছড়িয়ে পড়ল,—'সে তো এল না, সে তো এল না। যারে সঁপিলাম প্রাণ মন দেহ'।

সুমিত চকিতে একবার তাকাল শীলার দিকে। শীলা তখন ঘাড় গুঁজে কোঙ্কনী ভাষার কথাগুলো নোট করে চলেছে।

সুমিত ভাবল, শীলা যে উদ্দেশ্যে কনডাকটেড ট্যুর এড়িয়েছিল তার অনেকখানিই এখানে এসে সফল হল। শীলার ভেতর এমন ধরনের সচেতনতা আছে যা জগত আর জীবনের কোন রসকেই বৃথা যেতে দেয় না।

অনেকগুলি নাচ গানের ভেতর দিয়ে গোয়ানিজ কালচারের পরিচয় রাখলেন উদ্যোক্তারা। এবার তাঁরা পরিবেশন করলেন তাঁদের শেষ নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানটি।

এটি 'ডেকনী' নাচ। বিয়ের উৎসবে গানসহ এই নাচের বিশেষ চলন আছে গোয়ানিজ সমাজে।

দুটি মেয়ে থালার ওপর প্রদীপ নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল। সমস্ত আসরটা তারা প্রদক্ষিণ করতে লাগল তালে তালে পদবিভঙ্গে। ডানহাতে উত্তোলিত মাঙ্গলিক ডালা, বাঁ হাতখানা লীলাভরে দুলিয়ে চলেছে। কোন একটি গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে যেন চলেছে ওরা। হ্যাঁ, ওরা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই চলেছে। মাণ্ডবী নদীর ওপারে ওদের প্রিয় সখির বাড়ী। আজ তার বিয়ে। সেখানে নাচের নিমন্ত্রণ আছে ওদের।

সহসা ঐকতানে গুরুগরু ধ্বনি শোনা গেল। তার যন্ত্রে বায়ুর শন শনঃ শব্দ। ঝড় এল মাণ্ডবীর কূলে। মেয়েদের চলার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে থেমে গেল। ওরা বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ তুলে প্রকৃতির রুদ্ররূপ একবার দেখে নিল।

মাঝি মাঝি, ও ভাই মাঝি, কোথায় তুমি?

'আউ সাইবা পোন্টরি ওয়েত্তা
মাখাওয়াইট দাকোই'।

আমরা নদীর ওপারে যেতে চাই. পথ দেখাও।

হঠাৎ আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল এক যুবক মাঝি। তার হাতে একটি ছোট্ট হাল। সে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল ঃ

'ওইলা ওইলা ডংরা
উদগ ওয়াউঁতা—'

দুটো পাহাড়ের মাঝখানে নদী। দেখছ না কি তীব্রবেগে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এ আথালপাথাল নদী পার করব কেমন করে।

হাল নেড়ে নেড়ে নাচের ভঙ্গীতে মাঝি বলতে লাগল, না না না না, আমি নাও ভাসাব না।

মেয়ে দুটো তখন নাচের ভঙ্গীতে হাত নেডে বলল, 'গে গে গে সাইবা।' তোমাকে আমরা নিশ্চয় কিছু দেব, খুশি করেই দেব।

মাঝি তবুও মাথা নেড়ে বলল. 'মাকানাকা গো'। চাই না আমি কিছুই চাই না গো।

মেয়েগুলিও নাছোড়। তারা কানের ঝুমকো, হাতের কাঁকন খুলে দিতে চাইল। যে করেই হোক আজ রাতে তাদের বিয়ের আসরে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু মাঝির সেই এক গোঁ. সোনা দানা যাই দাও, যেতে আমি পারব না।

শেষে হতাশ হয়ে মেয়ে দুটি বসে পড়ল মাটিতে। কিছু পরে ওরা নিজেদের ভেতর কিছু একটা পরামর্শ করে উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বলল, ও ভাই মাঝি, বিয়ে হয়েছে তোমার?

মাঝি মাথা নেড়ে জানাল, না।

দ্বিতীয় মেয়েটি অমনি বলল, কথা দিচ্ছি মাঝি ভাই, তোমার বিয়ের দিনে আকাশ ভেঙে পড়লেও আমরা দুজনে ঠিক তোমার বাসরে নাচতে যাব।

এই কথাটি তরুণ মাঝিটিকে উতলা করে দিলে। সে আনন্দে হালটি ধরে জুড়ে দিল নাচ। তুফান যতই উঠুক, পার তোমাদের করবই।

এরপর তিনজনেরই শুরু হল নাচ। দুটি মেয়ে হাতে মাঙ্গলিক থালি নিয়ে বসে বসে দেহ দোলাচ্ছে, আর মাঝি হাল ধরে টলোমলো তুফানের মাঝে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাবার ভঙ্গীতে নাচছে।

এমনি করে নাচতে নাচতে তারা মাণ্ডবী নদীর দিকে যেতে লাগল। শেষে একসময় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল বোটের মধ্যে।

দর্শকদের করতালিধ্বনি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সোরাঁও আইল্যান্ডের অরণ্য পাহাড় আর মাণ্ডবীর জলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এবার উঠে দাঁড়ালেন বীণা হাতে সেই পরিচালক। বললেন, দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ যদি কোন কিছু অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তাহলে গোয়াবাসী হিসেবে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করব।

দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে না দেখে শীলা বলল, কিছু একটা করতে হয় আমাদের, না হলে মান থাকে না।

সুমিত বলল, আমি একটা গান গাইতে পারি, শচীন দেব বর্মণের গাওয়া গান।

এস, ডি, বর্মণের গান গাইবেন! দারুন জমবে।

আর আপনি? আপনি গান গাইবেন তো?

না, আপনি গান, আমি নাচব কথক।

তাল মান লয় বোল, কে বলবে, কে বাজাবে?

ওরা যেমন পারে বাজাক, আমি ঐ মেয়েদের কাছ থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিয়ে নাচব।

উঠে দাঁড়াল সুমিত। এগিয়ে গেল আসরের মাঝখানে। ইংরেজিতে প্রথমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল আর, ডি, বর্মণের সেই বিখ্যাত গান, 'পদ্মার ঢেউ রে...'

আশ্চর্য সুরেলা গলায় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুমিত গাইল পদ্মার গান। শীলার মনে হল, সামনের ঐ মাণ্ডবী নদী প্রমত্তা পদ্মায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

সকলের করতালিধ্বনি আর অনুরোধে সুমিত হেমন্তের গাওয়া কালজয়ী সেই রানার গানটি পরিবেশন করল।

উদ্যোক্তারা সুমিতকে ছাড়ল না। গানের শেষে তাকে আপ্যায়নের জন্যে ধরে নিয়ে গেল বোটের মধ্যে।

সুমিত বলল, দর্শকদের ভেতর আমার বান্ধবী শীলা আধারকার রয়েছেন। তিনি উঁচুদরের নাচিয়ে আর গাইয়ে। তাঁকে নাচের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারেন।

অমনি উদ্যোক্তারা মহা উৎসাহে ঘোষণা করল শীলা আধারকারের নাম। কত্থক পরিবেশন করবেন শীলা আধারকার।

সুমিত উদ্যোক্তাদের নূপুরের কথা বলতেই একটি নর্তকী মেয়ে বোটের ভেতর থেকে নূপুর নিয়ে আসরে ছুটল। শীলা ততক্ষণে আসরে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি গিয়ে শীলার পায়ের কাছে বসে নূপুর পরাতে লেগে গেল। শীলা বাধা দিতে গেল, সে নিজেই পরে নেবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে শীলার পায়ে নূপুর পরিয়ে ছাড়ল।

শীলা 'বেহালা', 'তাসা' আর 'মাদলমে'র বাদকদের বলে এল, আমি মুখে বোল বলব আর পায়ে কাজ তুলব। আপনারা সেই মত বাজাবেন। আমি কিন্তু উঁচুদরের কোন শিল্পী নই, আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন।

আসরে এসে বোলের সঙ্গে সঙ্গে পা আর চোখের কাজ শুরু করল শীলা।

যাদুর ছোঁয়ার মুহূর্তে জমে উঠল আসর। বোটের ছাদে গোয়ানিজ শিল্পীদের সঙ্গে বসে মোহময়ী নর্তকী শীলা আধারকারকে দেখছিল সুমিত। এ অন্য আর এক শীলা। সারাদিন একই গাড়ীতে যে মেয়েটির পাশে বসে সে ঘুরে বেড়িয়েছে তার সঙ্গে এ মেয়েটির আদপেই যেন কোন মিল নেই।

অভিনয়ে, লীলা বিভঙ্গে, পদচারণায় শীলা দর্শকচিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল কতক্ষণ। তার ঠাট, সেলামী, আমদ, তোড়া টুকরা, পরশ, ভাব, গৎভাব, লয়কারী আসতে লাগল পর্যায়ক্রমে। প্রতি পর্যায়ে এক একটি করে পাপড়ি মেলে শীলা যখন নিজেকে কুঁড়ি থেকে পুষ্পে বিকশিত করছিল, তখন সুমিত ভাবছিল, সে বসে আছে কোন বাদশার সাজান নৃত্য বাসরে। অতিথির আসনে বসে সে দেখছে, বেহেস্তের কোন হুরীর নৃত্যলীলা। নর্তকী যখন সাগরের তরঙ্গের মত নৃত্যছন্দে খুশির হীরে মতি ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে তখন পুলক রোমাঞ্চে কেঁপে উঠছে দর্শকের চিত্ত। আবার যখন সে পিছিয়ে যাচ্ছে তখন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হাহাকার করে উঠছে সমস্ত হৃদয়।

এবার কামালী পরণে চক্রাধারে ঘুরতে লাগল শীলা আধারকার। তেহাই-এর শেষে প্রথম আবর্তনে সমে এসে প্রথম ধা পড়ল, দ্বিতীয় আবর্তনে দ্বিতীয় ধা এবং সবশেষের আবর্তনটি সমে আসা মাত্রেই পড়ল শেষ ধা।

শীলা সেলামী দিতে দিতে পিছিয়ে গেল দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে।

দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতে লাগল। মনে হল, হাজার পায়রা পাখায় শব্দ তুলে ভেসে গেল জ্যোৎস্নার মায়াভরা আকাশে।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না সুমিতের চোখে। সারাদিনের খুঁটিনাটি ছবিগুলো চলচ্চিত্রের মত ভেসে যাচ্ছিল চোখের ওপর দিয়ে। গোয়ার নদী, বন, পাহাড়, সাগর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সেই সব প্রাকৃতিক সম্পদের ভেতরে কোহিনূরের মত জ্বল জ্বল করছিল

একটি নক্ষত্র। যার হাসির দ্যুতি, কমনীয়তা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু সে থাকে ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে।

পাশের ঘরে কি শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে? না সে তারই মত বিছানায় শুয়ে সারাদিনের পথযাত্রার স্বপ্ন দেখছে? শীলার সুখময় স্মৃতির কোন কোণ থেকেই কি একটিবারের জন্যেও সুমিত বেরিয়ে আসছে না? হয়ত বা সব স্মৃতির বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছে শীলা আধারকার।

হঠাৎ সুমিতের মনে হল, যদি ডিভোর্সই হয়ে থাকে তাহলে আধারকার তার পূর্ব পদবীতে ফিরে যেতে পারে, অথবা বহাল রাখতে পারে তার পূর্ব স্বামীর পদবীটি, অথবা...। এই অথবার কাছে এসে আটকে গেল সুমিতের ভাবনা। কিছু পরে স্থির হয়ে ভাবল, শীলার মত রূপে গুণে এমন আকর্ষণীয়া একটি নারী যে কোন প্রতিষ্ঠাবান পুরুষের কাম্য হতে পারে। তখন শীলা গ্রহণ করবে তার নতুন স্বামীর পদবী।

হঠাৎ সুমিত যেন নিজের ভেতর খানিকটা সাহস ফিরে পেল। সে ভাবল, শীলা সরকার নাম হলে শীলার কানে শুনতে কি খুব খারাপ লাগবে? হয়তো, হয়তো নয়। কে এর উত্তর দেবে। যে শুয়ে আছে একটি দেওয়ালের ওপারে সে কি উঠে এসে উত্তর দিয়ে যাবে এই প্রশ্নের।

সুমিত কল্পনায় দেখল, তার সামনে একটি পুষ্পিত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষের ডালে একটি পাখি। সে নিরন্তব তার বসন্ত-বেদনার ডাক পাঠিয়ে চলেছে। আমি একা, আমি একা, আমি একা। আমার একাকীত্বকে ভেঙে দিতে তুমি কি আসবে না?

চার

যে তরুণী একদিন এখানে তার প্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষা করে বসেছিল সে আর কোনদিনও ফিরে আসবে না এখানে। সাগরের নীল জল তাকে ঢেউ-এর দোলায় দোলাতে দোলাতে নিয়ে গেছে অতল জলের তলে। সেখানে নুড়ি পাথর আর বালির বিছানায় সে শুয়ে আছে। সমুদ্র-শৈবাল সেই কেশবতী কন্যার কেশ নিয়ে হাল্কা নাচের খেলায় মেতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের হাওয়ায় ভেসে আসে তার দীর্ঘশ্বাস। টিলার ওপরে বসে যে সব মানুষ আর মানুষী মার্মাগাঁও উপসাগরের ঢেউকে নীচে আছড়ে পড়তে দেখে তারা সেই ভাঙা ভাঙা শব্দে শুনতে পায় একটি ডাক— ডোনা পাওলা, ডোনা পাওলা।

টিলার ওপর বসে ইংরাজিতে তার ডায়েরির পাতায় এই কটি কথা লিখেছিল সুমিত। একটি তরুণীর ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসকে বুকে ধরে পানাজীর সাত কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী টিলা 'ডোনা পাওলা'।

শীলা বলল, ডায়েরির পাতায় কি লিখছেন এমন তদ্‌গত হয়ে। হিসেবপত্র নাকি?

সুমিত বলল, হিসেবই কষছি, তবে জীবনের পাতায় যোগবিয়োগের হিসেব।

শীলা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল উপসাগরের নীল জল আর সাদা ফেনার দিকে চেয়ে। সে এখন সুমিতের বেঞ্চের পাশে এসে দাঁড়াল।

চলমান জীবনের হিসেব নাকি?

সুমিত বলল, না, ঠিক চলমান জীবনের হিসেব নয়, আমি কষছি 'ডোনা পাওলা'র জীবনের অঙ্ক।

উৎসুক হল শীলা আধারকারের আঁখি-পাখি। তবে শিষ্টাচারের সীমা পেরিয়ে সে সুমিতের ডায়েরিখানা চাইতে পারল না।

সুমিত শীলার মনোভাব বুঝতে পেরে ডায়েরিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পাগলের প্রলাপ। অঙ্কে ফেল করা ছেলের আইনস্টাইন হবার সাধ।

শীলা ডায়েরিখানা হাতে তুলে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

সামান্য কয়েক সেকেন্ড পরে সুমিতের দিকে চোখ তুলে বলল, আপনি আসলে সাহিত্যের ছাত্র। পুরোপুরি একজন কবি।

সুমিত বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, কবিতার রোগে যাকে ধরে সেই কবি হয়। সেদিক থেকে আমাকে কবি না বলে রোগী বলতে পারেন।

সত্যি আপনার এই কছত্র লেখা দারুণভাবে মনকে স্পর্শ করে।

আপনার প্রশংসার জন্য সকৃকজ্ঞ ধন্যবাদ। এখন চলুন মীরামার বিচে যাই।

ওরা এল মীরামার বেলাভূমিতে। তাল তমাল নয়, তাল নারকেলের বনবীথিতে বড় স্নিগ্ধ, বড় ছায়াময় স্থানটি। সবুজ বীথির নীচে চেয়ার পাতা। ওরা দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল। কিছু জলখাবারের অর্ডার দিল। এখানে নীল সমুদ্রের ধারে শ্যামল বৃক্ষের তলায় রেস্তোরাঁ।

এখন শীলা নিজের চেয়ারখানা সুমিতের কাছে টেনে নিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসল।

সমুদ্রের কাছে এসে সমুদ্র না দেখলে মন ভরবে কেন?

সুমিত বলল, তাইতো আমি আগেভাগেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছি। ঐ দেখুন মাণ্ডবী আরব সাগরে তার জল উজাড় করে দিচ্ছে।

শীলা আঙুল তুলে বলল, ঐ বুঝি নদীর মোহনা?

তাইতো দেখছি। ম্যাপও তাই বলছে।

বালিগুলো দেখছেন কেমন সোনালী?

সকালের রোদ সী-বীচটাকে আরও সুন্দরী করে তুলেছে।

ওরা প্রভাতী জলযোগ শেষ করে উঠে পড়ল।

সুমিত বলল, ঐ দূরে একটা সুন্দর প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে।

শীলা অমনি বলল, ওটা নিশ্চয়ই গভর্নরের প্রাসাদ।

আপনি কি করে জানলেন?

যেমন করে আপনি মাণ্ডবীর মোহনার ঠিকানা দিলেন।

আচ্ছা রেস্তোরাঁর ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

শীলা অমনি একটি বয়কে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

সুমিত বলল, আচ্ছা, ওটা কি গভর্নর্স হাউস?

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল, সাহেবের অনুমান ঠিক।

এবার ওরা চলল 'বম জেসাস অব ব্যাসিলিকা'র দিকে।

গোয়ার অতি প্রসিদ্ধ চার্চ এই 'বম জেসাস'। এর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ, এখানে সন্ত ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মরদেহ রক্ষিত আছে।

পনের শত বিয়াল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার প্রথম ভারতভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করেন। তারপর নিরবচ্ছিন্ন কয়েকটা বছর ধরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান সময়। পর্তুগালের রাজাকে লেখা তাঁর একখানা চিঠি থেকে জানা যায়, ভারতের মানুষ খ্রীষ্টধর্মকে কিভাবে গ্রহণ করত।

তিনি সেদিনের গোয়ানিজ খ্রীষ্টানদের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, এদের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে একটা শার্ট অথবা প্যান্টের লোভে। এইসব সাধারণ মানুষগুলি ইউরোপীয়দের সঙ্গে গীর্জায় একাসনে বসতে পারে, শুধু সেই গৌরব লাভের জন্য খ্রীষ্টান হয়ে যায়।

জেভিয়ারের ধর্মপ্রচারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পথের ওপর দিয়ে একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটে চলতেন। শিশুরা তাঁর পেছন পেছন ছুটত, যুবা বৃদ্ধ নারীপুরুষ জড় হত তাঁর চারদিকে।

তিনি অতি মধুর স্বরে, কখনও সংগীতের সুরে বাইবেলের কথাগুলি সহজ করে বলতেন।

এইভাবে তিনি বহু মানুষকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরক্ত করে তোলেন। হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে তিনি রোগীদের সেবা করতেন। বিচারে যেসব আসামী চরমদণ্ড পেত তিনি অনেক সময় তাদের কাছে থাকতেন। তাদের জন্য চোখের জল ফেলে প্রভুর কাছে জানাতেন প্রার্থনা।

গাড়িতে 'বম জেসাসে'র দিকে যেতে যেতে সুমিত সেন্ট জেভিয়ার সম্বন্ধে ভাবছিল এই সব কথা।

সুমিতকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে শীলা বলল, কি ভাবছেন প্রফেসার সরকার? নিশ্চয়ই সেন্ট জেভিয়ারের কথা।

আপনি তো দেখছি জাত জ্যোতিষী।

এতে জ্যোতিষের কি আছে। যাচ্ছি বম জেসাস, একজন ঐতিহাসিক মৌন হয়ে বসে বসে কিছু ভাবছেন, স্বাভাবিকভাবেই সেন্ট জেভিয়ার এসে পড়েন।

হ্যাঁ প্রফেসার আধারকার, ঐ আশ্চর্য মানুষটির কথাই ভাবছিলাম।

আমিও ভাবছিলাম ওঁর কথা, ওঁর শেষ দিনগুলোর কথা।

সুমিত অমনি বলল, সেন্ট জোভিয়ার ক্যানটন যাবার পথে প্রকিকূল অবস্থায় সানশিয়ান দ্বীপে থাকতে বাধ্য হন। ওখানে ২রা অথবা ৩রা ডিসেম্বর ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ওঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ওখান থেকে ওঁর বডি গোয়ায় এল কি করে সেটা আমার সঠিক জানা নেই।

যতটুকু শুনেছি, ওখানে সেন্ট জেভিয়ারের দেহ কবরের ভেতর ছিল। তারপর সান্তাক্রুজ জাহাজে ঐ দেহ মালাক্কাতে আনা হয। জাহাজে আনার সময় ক্যাপ্টেন কিছু চুন ঐ কফিনের ভেতর ঢেলে দেন। ঐ দেহ পুনরায় মালাক্কাতে কবরস্থ করা হয়। মালাক্কার নিয়ম অনুযায়ী কফিনের বদলে শুধু মাটির গর্তেই সেন্ট জেভিয়ারের দেহটিকে প্রোথিত করা হয। পরে একসময় মালাক্কায় খ্রীষ্টান মিশনের চার্জ নিয়ে যিনি আসেন তিনি শ্রদ্ধাবশত জেভিয়ারেব দেহ মাটি থেকে খুঁড়ে দেখতে যান। কি আশ্চর্য! দেহে এতটুকু পচন ধরেনি।

ঐ অলৌকিক দেহটি এরপর নিয়ে আসা হয় গোয়াতে। অবিশ্বাসী ডাক্তার এবং কোন কোন যাজক দেহটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পবীক্ষা করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। তাঁরা আবেগে চোখের জল ফেলতে থাকেন।

আপনি তো সেন্ট জেভিয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন দেখছি।

শীলা বলল, একসময় কৌতূহলী হয়ে ওঁর সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা করেছিলাম।

এখনও কি দেহ তেমনি রয়েছে?

শুনেছি, দেহ শুকিয়ে এসেছে। এখন তাকে রাখা হয়েছে কাচের আধারে।

সুমিত বলল, চলুন, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে।

শীলা বলে চলল, বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে সেন্ট জেভিয়ারের দেহটিকে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বাইরে এনে রাখা হত। অত্যুৎসাহী ভক্তদের কেউ কেউ তাঁর পায়ের আঙুল, মাথার চুল প্রভৃতি সুকৌশলে কেটে নিয়ে চলে গেছে। এক পর্তুগীজ মহিলা, নামটা যতদূর মনে পড়ছে, ডোনা ইসাবেল ডা ক্যারম, স্মৃতিরক্ষার জন্য দাঁত দিয়ে পায়ের কড়ে আঙুলটা কেটে নিয়ে গেছেন। ফাদার জেনারেল ক্লড অ্যাকোয়াভিভার আদেশে ডান হাতের কিছু অংশ কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোমে। তারপর প্যারিস, জাপান থেকে বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছে জেভিয়ারের মরদেহের কিছু কিছু অংশ। শুধু দেহই নয়, ইউরোপের কোন একটি দেশের সম্রাজ্ঞী বহু অর্থের বিনিময়ে কিছুদিনের জন্য সেন্ট জেভিয়ারের বালিশটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুমিত মন্তব্য করল, মানুষটি যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল পীড়িতের সেবা করে, দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করে অশান্ত ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবার মৃত্যুর পরেও তাঁর ঐ দেহের বিশ্রাম জুটল

না।

গাড়ি এসে গেল 'বম জেসাসে'। ওরা গাড়ি থেকে নেমে বিশাল চত্বর পেরিয়ে চার্চের ভেতরে ঢুকে গেল।

বহু প্রাচীন স্মৃতির সংগ্রহশালা এই বম জেসাস। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু।

সুমিত বলল, সব শেষে আমরা দেখব সেন্ট জেভিয়ারের অমর দেহ।

শীলা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই।

একসময় সবকিছু দেখার শেষে ওরা এসে দাঁড়াল সেন্ট জেভিয়ারের মরদেহের সুসজ্জিত আধারের সামনে। কিন্তু হায়, অনেক উঁচুতে রাখা হয়েছে সে আধার। নীচ থেকে দেহটিকে যথাযথ দেখা সম্ভব নয়।

শীলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম খুঁটিয়ে দেখব বলে। এতটা নিরাশ হতে হবে ভাবিনি।

তাকে প্রবোধ দেবার ছলে সুমিত বলল, রুপোর আধারটার দিকে চেয়ে দেখুন, চোখ জুড়িয়ে যাবে।

শীলা বলল, নীচে পাথরের তৈরি সুরম্য স্মৃতিসৌধটি আগে দেখুন। দেবদূত, ফুল আর পাতার মালা, সেন্ট জেভিয়ারের পবিত্র কর্মের চিত্রিত রিলিফ, সব মিলে এক অসাধারণ শিল্পকর্ম।

ওরা পাথরে তৈরি স্মৃতিসৌধটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

শীলা বলল, ইতালীর এক ডিউক, ফার্দিনান্দ্ সেকেন্ড এই অপূর্ব পাথরের সৌধটি তৈরি করিয়ে দেন। সেকালে ফ্লোরেন্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পী জিওভানী বাতিস্তা দশ বছর পরিশ্রম করে এই দর্শনীয় বস্তুটি তৈরি করেন।

বম জেসাস থেকে বেরিয়ে ওরা ঢুকল 'সে ক্যাথিড্রালে'। বিশাল চার্চ। অপূর্ব সাজান বেদী আর প্রশস্ত প্রার্থনার হল।

শীলা কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ বলে উঠল, ঐ তো, ঐ তো সেই রিলিফ।

সুমিত বলল, কিসে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রফেসার আধারকার?

ঐ দেখুন বেদীর তিনদিকে সেই ধর্মযাজিকার মূর্তি, যাঁকে হত্যা করেছিল এক পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন।

হ্যাঁ, রিলিফে তাইতো দেখছি, কিন্তু ঘটনাটি কি?

শীলা বলল, যতটুকু শুনেছি, এক ধর্মযাজিকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে এক দুর্বৃত্ত ক্যাপ্টেন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। ধর্মযাজিকা অস্বীকার করায় তার কাছে দুটো প্রস্তাব পাঠান হয়। হয় বিয়ে নয় মৃত্যু!

ধর্মযাজিকা মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় বলে মনে করেন। ঐ দেখুন ধর্মযাজিকার কাছে প্রস্তাব করা হচ্ছে। কয়েকটি রিলিফে ঘটনাটি বোঝান হয়েছে। আর ঐ শেষেরটিতে দেখুন, অস্ত্রাঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে মস্তক।

বাতিদানে বসান আছে বৃহৎ আকারের কতকগুলি মোমবাতি। বিশাল হলঘরখানা এখন শূন্য, নিস্তব্ধ। অস্পষ্ট আলোছায়ায় এক গভীর গম্ভীর পরিবেশ। হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওদের দুজনেরই মনে হল, 'সে ক্যাথিড্রালে'র সর্বত্রই অখণ্ড এক পবিত্রতা বিরাজ করছে।

ওরা এবার এল একটি তোরণের সামনে যা ভাস্কো ডা গামার স্মরণে তৈরি হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ আর ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে এসেছিলেন ভাস্কো ডা গামা। তাঁর গোয়ায় অবতরণ স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পর্তুগীজরা এই প্রবেশ-তোরণটি তৈরি করায়।

ভারত ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার অধ্যায়গুলিকে আলোচনা করতে করতে ওরা আবার এসে উঠল গাড়িতে। গাড়ি চলল দক্ষিণ গোয়ার মন্দিরগুলি লক্ষ্য করে।

মাঝপথে গাড়ি থামাল শীলা আধারকার। পাহাড়ের কোলে একটি গ্রাম। ঠিক গ্রাম বলা যায় না, মধ্যবিত্ত মানুষের আট দশখানা ঘর। সবুজ গাছ-পালায় ছায়াচ্ছন্ন। তেমনি উঠোনে চিত্রিত তুলসীমঞ্চ।

শীলা গাড়ি থেকে নেমে বলল, আমি এই গ্রামে কিছু সময় থাকতে চাই। ঘরবাড়ি দেখে মনে হচ্ছে এটি আধুনিক জগতের স্পর্শ থেকে কিছু দূরে। এখানে হয়ত প্রাচীন গোয়ার লোকাচারের কিছু কিছু পবিচয় পাওয়া যেতে পারে।

সুমিত বলল, চলুন না, 'মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'

ওরা পথের একপাশে গাড়ি রেখে গ্রামের ভেতর ঢুকল। গাছগাছালির আড়াল পেরিয়ে ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল যেখানে দু'তিনটে দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। খবর নিয়ে জানা গেল, এখানে এক ডাক্তারবাবুর বাড়ি। পানাজীর হাসপাতালে তিনি কাজ করেন। সপ্তাহে যে তিন দিন বাড়ি আসেন সেই দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু রোগী এসে ভিড় জমায়। খুব নাম-ডাক ডাক্তারবাবুর।

চলুন মিঃ সরকার, রোগ সারিয়ে আসি।

সবিস্ময়ে সুমিত বলল, আপনার রোগ ওখানে সারবে!

পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি।

দু'চার পা এগিয়ে যেতেই ওদের চোখে পড়ল একটি হোটেল। লোকজন মধ্যাহ্নের আহারে বসেছে। শীলা অমনি বলল, আচ্ছা প্রফেসার সরকার, এখানে আমরা লাঞ্চটা সেরে নিতে পারি।

অবশ্যই। বেলা যত চড়ছে ক্ষিদেও তত বাড়ছে।

ওরা গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে খেতে বসে গেল। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হল পোস্ত দিয়ে চিংড়ি ভাজা। যার কোঙ্কনী নাম, তড়েলি সুংতা। তারওপর ডাল আর বেইগনকা ভাজি। ভাজি অর্থে, তরকারি।

শীলা দেখল, এই কটি পদ দিয়েই বেশির ভাগ লোক খেয়ে চলে যাচ্ছে। এবার হোটেলের কর্তা ওদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু?

কি আছে আর?

দড়িয়ারা মাছের হোমণ্ড।

অর্থাৎ দড়িয়ারা নামের একপ্রকার ছোট মাছের কারি।

তাই নেওয়া হল। সঙ্গে দিল 'শোল কড়ি'। একটি ছোট্ট বাটিতে লাল জলের চাট। শোল গাছের ছাল শুকিয়ে জলে ফেলে দিলে রঙটা লাল হয়ে যায়। তার সঙ্গে নুন, লেবু, লঙ্কা মিশিয়ে তৈরি হয় এই মুখরোচক পানীয়।

খাওয়ার শেষ পর্বে কি ভেবে সুমিত বলল, প্রফেসার আধারকার আপনি বরং ডাক্তারের বাড়ি থেকে একাই ঘুরে আসুন। আমি সামনের ঐ বটগাছের আলোছায়ায় বসে এইসব গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি দেখি।

আর কাব্য রচনা করি।

সুমিত হেসে বলল, চাইকি আপনাকে একটা উপহারও দিতে পারি।

খাওয়াব শেষে শীলা গেল ডাক্তার কাশীনাথ গোবিন্দ জালমীরের বাড়ী। ইতিমধ্যে ডাক্তারের নামটা জানা হয়ে গিয়েছিল। সুমিত পরিকল্পনা মত আশ্রয় নিল অদূরে বটগাছের তলায়।

এক ভদ্রমহিলাকে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাশীনাথের স্ত্রী বিদ্যা কাশীনাথ জালমীর এগিয়ে এলেন। উঠোনের যেদিকে ডাক্তার জালমীরের চেম্বার সেখানে রোগীদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে।

বিদ্যা জালমীরের বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসির চিরস্থায়ী একটি প্রলেপ আছে।

আপনি কি ডাক্তার জালমীরের কাছে এসেছেন?

শীলা সস্মিত নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বলল, আপনার কাছেই এসেছি।

এবার বিস্ময়ের ছায়া পড়ল বিদ্যা জালমীরের মুখে।

শীলা কয়েকটি কথায় তার উদ্দেশ্যটি জানাতে গিয়ে বলল, আমি নিজে একজন সংগীতশিল্পী। এখানকার গ্রাম্য সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় আমি পেতে চাই। সে বিষয়ে আপনি যদি আমাকে কিছু সাহায্য করেন। অবশ্য একেবারে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি।

না না, সে রকম কিছু না।

আপনি নিশ্চয়ই ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন?

একেবারেই না। রান্নাবান্নার কাজ শেষ। এখন ডাক্তার জালমীরকে রোগী দেখার ব্যাপারে কিছু সাহায্য করছিলাম। অবশ্য ওঁর কম্পাউন্ডার সারাক্ষণই রয়েছেন। আরে, আপনাকে এতক্ষণ উঠোনেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন, ঘরের ভেতরে বসি।

ভদ্রমহিলা শীলাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলার ওপর। সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন শোবার ঘর।

গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে শীলা একখানা চেয়ারের ওপর বসল। হঠাৎ বিদ্যা জালমীর নীচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই সরবত জাতীয় এক ধরনের পানীয় নিয়ে এলেন।

শীলা ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি এখুনি দুপুরের খাওয়া শেষ করেছি মিসেস জালমীর।

এ তো কোন খাবার নয়, সামান্য পানীয়।

শীলা সরবতটুকু চুমুক দিয়ে পান করল।

বিদ্যা জালমীর বললেন, এখন কি জানতে চান বলুন?

সেই প্রসন্ন হাসি মিসেস জালমীরের মুখে।

শীলা বলল, আপনাদের লৌকিক অনুষ্ঠানের ওপর যদি কোন গান থাকে তাহলে তাই যদি একটু গেয়ে শোনান।

বিদ্যা জালমীর বললেন, যদি কথাগুলো নোট করে নিতে চান তাহলে কাগজ কলম এনে দিচ্ছি।

আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার ব্যাগেই রয়েছে।

বিদ্যা জালমীর বললেন, আপনাকে এখন যে গানটি শোনাব, সে গান গাইতে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

শীলা সবিস্ময়ে বলল, সে কি!

আপনার ছেলেমেয়ে?

না, মিসেস জালমীর।

আমার একটি মেয়ে, এখন স্কুলে গেছে। যে গানটি আপনার কাছে গাইব তা গাইতে গেলে বুকখানা হু হু করে ওঠে। আগে গানটা শুনুন। এ গান বিয়ের দিনে মেয়েকে সাজাবার সময় গাইতে হয়।

'আইবা পাকড়ে লেইক যালি,
বার বরষ পোষলি, ব্যর্থ যালি;
একে দাড়িয়ে আইচে দুধ,
একে দাড়িয়ে বেকন,
বার পনিচি আইচি মায়া বিসরলি।'

শীলা অনুভব করল গানের সুরে একটা ব্যথার রেশ গুমরে গুমরে উঠছে।

এবার ব্যাখ্যা করে দিলেন মিসেস জালমীর।

কন্যা জন্মাল বরেরই জন্য। বার বছর পালন করলাম, হায় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। পান্নার একদিকে দুধ অন্যদিকে ওষুধ। বার বছরের কথা সব ভুলে গেলি!

এখানে দুধ আর ওষুধের তাৎপর্য হল, ক্ষুধার মুখে দুধ খাইয়েছি আর অসুখের সময় ওষুধ।

শীলা বলল, কথা আর সুরে এক ধরনের ব্যথা ঝরে পড়ছে। সবার ওপরে মিসেস জালমীর আপনার গলার প্রশংসা না করে পারছি না।

বিদ্যা জালমীর একটু সলজ্জভাবেই বললেন, ডাক্তারও সেই কথা বলেন। উনি আমার কখানা গান টেপ করে নিয়ে গেছেন পানাজীতে।

একবার ওপরের জানালা দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে উঁকি মারলেন মিসেস জালমীর। তারপর বললেন, একটুখানি বসতে হবে ভাই, আমি এখুনি আসছি।

শীলা, বলল, বড্ড অসময়ে এসে পড়েছি, আমি বরং আসি।

না না, বসুন। চেম্বারে বসলে মানুষটি নাওয়া খাওয়া একেবারে ভুলে যান। বলেন, কতদূর থেকে কত আশা নিযে মানুষগুলো এসেছে, তাদের ফিরিয়ে দিই কি করে।

কি আর করা যায়, জরুরী তলব দিয়ে দু'এক মিনিট ভেতরে ডেকে নিয়ে যা হোক কিছু মুখে গুঁজে দিই।

বিদ্যা জালমীর কাঠের সিঁড়িতে চরণধ্বনি তুলে নেমে গেলেন।

শীলা আধারকার শূন্য ঘরে বসে ভাবতে লাগল তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির কথা।

মায়ের বড্ড কষ্ট হয়েছিল ওকে বিদায় দিতে। বিদ্যা জালমীরের গানের ভাষাই সব মায়ের মনের ভাষা। এ গানের সুরে মায়ের বুকে অশ্রুনদী বয়ে যায়।

মায়ের কষ্টের বহিঃপ্রকাশ চিরদিনই বড় কম। তাই বিদায় দেবার সময় মা শুধু বুকে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখেছিল। চোখে জলের ধারা ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণাকে মা আশ্চর্য ক্ষমতায় চেপে রাখতে পারত।

ডক্টর আধারকার শাশুড়ীকে প্রণাম করতে গেলে মা তার হাত দুটো ধরে শুধু বলেছিল, আমি যতটুকু পেরেছি বাবা গড়ে দিয়েছি। এরপর সম্পূর্ণ করার পালা তোমার।

আধারকার বলেছিলেন, আপনি তো পূর্ণ করেই আমার হাতে তুলে দিলেন, এখন একে সযত্নে রাখা আর মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার।

আমেরিকায় ডাক্তার আধারকারের কোয়ার্টারটি ছিল বেশ মনোরম। প্রয়োজনের বেশী ঘর ছিল না ঠিক কিন্তু খোলামেলা জায়গা ছিল অনেকখানি। গাছপালা, লন আর ফুলের বাগানে ভরে উঠেছিল জায়গাটা।

নিজের দেশ থেকে নিজের রুচিমাফিক ঘর সাজানোর অনেক জিনিস নিয়ে গিয়েছিল শীলা। একেবারে ভারতীয় কায়দায় সাজিয়েছিল ঘর, পর্দা, বেডকভার, ছবি, মূর্তি, পেতলের পিলসুজটি থেকে সবকিছু।

ডক্টর আধারকার একদিন তাঁর বিদেশী বন্ধুদের পার্টি দিয়েছিলেন, তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন শীলার রুচির। মহিলারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ও প্রশ্নমালায় বিব্রত করে তুলেছিল শীলাকে।

ওঁরা যখন চলে গিয়েছিলেন তখন আধারকার শীলাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, আজ তোমার জয় হল শীলা। ওরা ভারতীয় রুচির নমুনা দেখে গেল। কিন্তু আমার চোখ সেদিনই তোমার জয়ের গৌরবকে দেখবে যেদিন তুমি রুচির দিক থেকে শুধু ভারতীয় থাকবে না, আন্তর্জাতিক হবে।

কথাটা শীলার মনে ধরেছিল। সে বলেছিল, চেষ্টা করব।

রোজ গলা সাধত শীলা। ডক্টর আধারকার তাঁর কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে গেলে সে তানপুরা নিয়ে বসে যেত। কতক্ষণ কণ্ঠ সাধনা চলত তার। গুরু খোদাবক্সের মূর্তিখানা বার বার তার চোখের সামনে ফুটে উঠত। তালিম দেবার সময় যেমন কঠোর, স্নেহ দেখাতে গিয়ে তেমনি বিগলিত। এ বিষয়ে শীলার

গুরুভাগ্য সত্যই ঈর্ষণীয়।

নিজের দেশে থাকতে শীলা প্রায় প্রতিটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে উপস্থিত হয়ে বড় বড় গুণীর গায়কীর সঙ্গে পরিচিত হত। তার ইতিহাস বিষয়ক রিসার্চের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংগীতের নানা ঘরাণা, নানা গায়কী বিষয়ক রিসার্চ।

আমেরিকায় বসে সে সুযোগ পেত না শীলা। মাঝে মাঝে মনটা হু হু করে উঠত, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিত সে। নিজের ইচ্ছাতেই সে গ্রহণ করেছে এ জীবন। তাই কারুর ওপর দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশের উপায় ছিল না তার।

শীলা কিছুদিনের ভেতরেই ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠল। ডক্টর আধারকারের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে লাগল সে। কিন্তু ডক্টর আধারকারের সাংসারিক প্রয়োজনের দিকটা ছিল বড় সীমিত। দীর্ঘকাল একক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মিঃ আধারকার নিজের সামান্য কাজ নিজেই করে নিতেন। শীলা আসার পরে সে-ই খুঁটিনাটি সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিল। মাঝে মাঝে বাধা দিতেন ডক্টর আধারকার কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় খুশিও হতেন মনে মনে।

উইক এন্ডে বেড়াতে যেতেন শীলাকে নিয়ে। সমুদ্রতীর, প্রপাত, বন, পর্বত কোনটাই বাদ ছিল না। ডক্টর আধারকার শিশুর মত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। হৈ হৈ করতেন, ক্ষণে ক্ষণে নতুন খাম-খেয়ালিতে মেতে উঠতেন। শীলাকে তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে পাহাড়ে উঠতে হত, ঢেউ-এর মাথায় চড়ে সমুদ্রস্নান করতে হত।

কিন্তু কাজের জগতে ফিরে আধারকার অন্য মানুষ। কথা মুখে প্রায় নেই বললেই চলে। আপন রিসার্চের দুরূহ চিন্তায় আপনি মশগুল।

শীলা আসার পরে কোয়ার্টারে ছোট্ট একটি ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিয়েছিলেন আধারকার। তাতে তাঁর কাজের অগ্রগতির সুবিধে হলেও দাম্পত্য জীবনের অলিখিত কতকগুলি আনন্দের শর্ত উপেক্ষিত হচ্ছিল।

শীলার চোখের ওপর আজও ছবির মত ভেসে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা। বাগানের ফুলে ফুলদানিটি সাজিয়ে শীলা রেখে দিয়ে এসেছে ডক্টর আধারকারের স্টাডিতে। কোন একটা বই পড়তে পড়তে তারিফের চোখে দেখছেন ডক্টর আধারকার। করিডোরে দাঁড়িয়ে তাই লক্ষ্য করছে শীলা। হঠাৎ কি হল, শীলাকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর আধারকার। মুখোমুখি হতেই থমকে থেমে দাঁড়ালেন। কি একটা বলবেন বলে এসেছিলেন কিন্তু সবকিছু হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন।

শীলা বলল, কিছু বলবে?

অসহায়ের মত শীলার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন আধারকার। বললেন, না, তেমন কিছু বলার নেই।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই কথাটা মনে পড়ে গেল। অমনি বললেন, জাপানী প্রথায় ভারী সুন্দর সাজান হয়েছে তোমার ফুলদানীটি। তবে...।

তবে কি?

তবে গাছের ডালে ডালে যখন ওরা ফুটে থাকে তখন সে শোভার কোন তুলনাই হয় না। আজ ভোরবেলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তোমার তোলা ঐ ভিক্টোরিয়া রোজটিকে দেখছিলাম, পূর্ণ প্রাণ থেকে যেন চারদিকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। ওকে হঠাৎ ফুলদানিতে দেখতে পেয়ে কেমন যেন কষ্ট লাগল।

আমি তো কখনও এমন করে ফুল নিয়ে ভাবিনি। বাগানের ফুল তুলে আর ফুলদানি সাজাব না। দরকার মত মার্কেট থেকেই নিয়ে আসব।

আমার কথায় তুমি কিছু ভাবলে?

না না, ভাবব কেন, তোমার এ ধরনের সেন্টিমেন্টকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি।

ডক্টর আধারকার স্টাডিতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমি জানি, তুমি আমার সেন্টিমেন্টের মূল্য দেবে।

সেদিন শীলার মনে হয়েছিল, যে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে তাজা প্রাণগুলোকে ছিনিয়ে আনার জন্যে লড়াই করছে, তার বুকে একটা তাজা ফুলের মৃত্যুও যে ব্যথার ঢেউ তুলবে, এ তো স্বাভাবিক।

ডক্টর আধারকারের চরিত্রের ছোট ছোট পরিচয় শীলাকে অনেক সময় অভিভূত করে রাখত।

একদিন শীলার চোখে পড়ল ডক্টর আধারকার স্নানের ঘর থেকে স্টাডির দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। কোমরে নামমাত্র একখানা তোয়ালে জড়ানো। সর্বাঙ্গে জল ঝরছে।

শীলা কিচেন থেকে স্টাডিতে পৌঁছে দেখে র‍্যাক থেকে একখানা বই নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে চলেছেন ডক্টর আধারকার। তাঁর মাথার চুল থেকে ঝরে পড়া জলে ভিজে যাচ্ছে বইএর পাতা। সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই তাঁর।

সম্ভবত রিসার্চের বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন স্নানের ঘরে। হঠাৎ বইটির দরকার পড়ে যায়। তাই পরিস্থিতি আর পরিবেশ ভুলে স্টাডিতে বইটির খোঁজে ছুটে যান।

শীলা সেদিন অতি সাবধানে শুকনো একখানা তোয়ালে দিয়ে অনেক যত্নে ডক্টর আধারকারের চুল থেকে জলের ধারা মুছে নিয়েছিল।

আজ বিদ্যা জালমীরের সংসার জীবনের ছবি দেখে শীলার মনে পড়ে গেল আত্মভোলা, কাজ পাগল ডক্টর আধারকারের কথা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন মিসেস জালমীর। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন—বড় দেরী হয়ে গেল ভাই, ওঁকে একমুঠো খাইয়ে এলাম।

না না, আমি দিব্যি ছিলাম। অসুবিধে বরং আমিই ঘটিয়েছি।

কিছু না, কিছু না। উনি তো রোগী ফেলে খেতেই চান না। বলেন, অসুস্থ মানুষগুলো এসে লাইন দিয়েছে, আমি কি করে খেতে যাই বল।

আমি জোর করে ওঁকে ধরে এনে খাওয়াই। বলি, তুমি বাঁচলে তবে তো তোমার রোগী বাঁচবে। আচ্ছা ভাই, আমরা যে আলোচনায় বসেছিলাম, এখন তাই আবার শুরু করা যাক।

কত গান গেয়ে গেলেন বিদ্যা জালমীর। নোট নিয়ে গেল শীলা আধারকার দ্রুত হাতে। বর্ষা আবাহন, ফসল তোলা, লৌকিক প্রেম-কাহিনী, আরও কত বিষয়ের গান। শেষে বিদ্যা জালমীর বললেন, যে গান দিয়ে প্রথমে শুরু করেছিলাম, তেমনি একখানা গান দিয়ে শেষে করছি। এটি কন্যা-বিদায়ের গান।

রুমড়াচা সানিত আনি
ভাঙরা চা ঘড়িত,
তুকা ইতলানো আই বাপা চো
যাচ সড়িন।
ইয়া ঘরচি লেক যাতা পর ঘরা,
পরঘরা যাতা না কায় মক্ষী
রাজ করুন আনন্দন যাইসি।

রুমড়া গাছের ফুল ঝরে গেল (মেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল)। সোনার ঘড়ির সময় এখন (আনন্দের সময় এখন)। মা বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ। এখন অন্য ঘরে যাও। সেখানে সংসার কর সুখে।

বিদ্যা জালমীরকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না শীলার তবু আসতে হল। উঠোন পেরিয়ে

আসতে আসতে শীলা অনুভব করছিল, শান্তির একটা হাওয়া ডক্টর জালমীরের সারা সংসার ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা এবার এল মন্দির দর্শনে। মঙ্গেশ, মহালসা, রামনাথ, শান্তা দুর্গা। শান্তির দেবী শান্তা দুর্গা। গর্ভগৃহে ঝোলান রয়েছে সারি সারি ঝাড়লণ্ঠন। রামনাথ মন্দিরে লক্ষ্মী নারায়ণ আর রামের মূর্তি। আধুনিক স্থাপত্যের চিহ্ন এই মন্দিরের সর্বত্র। মহালসা মন্দিরে দেবী নারায়ণীর অধিষ্ঠান। কালো পাথরে তৈরি মূর্তি। ভেতরে নাটমণ্ডপের দুধারে অনেকগুলি শতদীপা পিলসুজ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দোতলার ছাদ সমান উঁচু দীপাধার।

মঙ্গেশ মন্দিরের দীপাধারটি সত্যিই দর্শনীয়। চার পাঁচতলা উঁচু পেতলের অপূর্ব দীপস্তম্ভটি প্রবেশ পথের সামনেই বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বিগ্রহ শিব। মন্দিরকে কেন্দ্র করে মঙ্গেশ গ্রাম। সংগীতের সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকার এই গ্রামেরই কন্যা। বছরে একটি দিন দেবতার চরণে তিনি নিবেদন করেন সংগীতের ডালি।

পূজার ফুল নৈবেদ্য নিয়ে শীলা ঢুকল মন্দিরের ভেতর। সুমিত দীপস্তম্ভের ছবি নিল। সে এবার শীলার খোঁজে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করল। ঐ তো শীলা বসে রয়েছে। একেবারে স্থির পূজারিণী মূর্তি। শিবের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে শীলা আধারকার। দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত।

সুমিতের মনে হল, এই নারীর ভেতর কল্যাণী গৃহবধূর পবিত্রতা বিরাজ করছে। আধুনিক জীবনকেও প্রয়োজন মত গ্রহণ করেছে কিন্তু আধুনিক জীবনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ওকে গ্রাস করতে পারেনি।

সেই মুহূর্তে একটি সত্য সুমিতের মনে উদিত হল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর গৃহে একটি কল্যাণী বধূ পুরুষের জীবনে অপরিহার্য।

মঙ্গেশ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শীলা আধারকার দাঁড়াল দীপস্তম্ভের কাছে। চোখ দুটি বন্ধ করতেই তার মনে হল, অনন্ত অন্ধকারের বুকে প্রাণের এক একটি প্রদীপকে কে যেন জ্বালিয়ে চলেছে। বাতাসে দু'একটি নিভে যাচ্ছে, আবার তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে কেউ। এমনি একটির পর একটি জ্বলতে জ্বলতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল সমস্ত দীপস্তম্ভটি।

গাড়ি এসে থামল কোলভা বীচে, রুপালী বালির সৈকত কোলভা। অদূরে সবুজ নারকেল বীথি। কিছুদূরে সবুজ পোশাক পরে পাহাড় নেমেছে সমুদ্রস্নানে। সারি সারি নৌকো ভেসে আছে সমুদ্রের অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে। নৌকোর ভেতর শেষ বেলায় তেমন কোন কর্মচঞ্চলতা নেই। এইমাত্র একখানা নৌকো সাগর ঢুঁড়ে কিছু মানিক নিয়ে এল। অমনি নারকেল বীথির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল মেয়ে। জেলেরা জাল ঝেড়ে রুপোলী মাছ বের করে বালির ওপর ঢেলে দিল। ওরা রঙীন শাড়ি ঘুরিয়ে মাছের চারদিকে গোল হয়ে বসে মাছ বাছতে লেগে গেল।

সুমিত ভাবল, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সে তার ক্যামেরায় ধরে রাখল রঙবাহারী শাড়ী পরা মেছুনিদের ছবি।

ফটো তোলা শেষ হলে সে তাকিয়ে দেখল, শীলা কোথাও নেই। কি আশ্চর্য! এক মিনিটে মেয়েটি উবে গেল নাকি!

সামনে সাজপোশাক খোলা কতকগুলো নৌকো রুপোলী বালির বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল। নিকষ কালো গায়ে কোলতারের লাবণ্য। প্রতিটি নৌকোর পাশে শুয়ে আছে তার ছায়া-সঙ্গিনী।

কিন্তু শীলা কোথায়? ঐ দূরে যে সারি সারি নৌকো তীর ছুঁয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে আছে, সেখানে পৌঁছতে গেলেও তো সময় চাই।

গভীর জলের থেকে হুস্ করে ভেসে ওঠার মত সামনের একটা নৌকোর আড়াল থেকে মাথা তুলল শীলা। তারপর এঁকেবেঁকে এক একটা নৌকো পেরুতে পেরুতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল

সামনের দিকে। শেষ নৌকোখানার আড়াল থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ান মাত্রই একঝাঁক সী-গাল শব্দ তুলে লম্বা ডানা হাওয়ায় ভাসিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে উড়ল। সূর্যের শেষ সোনায় ওদের সাদা বুক আর পাখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ক্লীক, ক্লীক, ক্লীক। দারুণ কয়েকটা শর্ট নিল শীলা।

সুমিত এতক্ষণ দেখছিল শীলাকে। তার মনে হচ্ছিল তারই মনের আঁকাবাঁকা অলিগলিতে শীলা নামের একটি মেয়ে চুপি চুপি পা ফেলে চলেছে। হঠাৎ সী-গালগুলো সূর্যের সোনা মেখে আকাশে ডানা মেলে দিতেই তার মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশার পাখিগুলো এমনি করেই কি ঝকঝকে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। শীলা কি পারবে সুমিতের ভাবনার পাখিগুলোকে তার মনের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতে ?

গাড়ি ছুটে চলেছে মার্মাগোয়া লক্ষ্য করে। ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক সমুদ্রবন্দর এটি। কেবল বড় নয়, সৌন্দর্যেও তুলনারহিত। ড্রাইভার ছেলেটি বলেছে, সূর্যাস্ত যদি দেখতে চান মার্মাগোয়া চলুন। ওখানে চৌগুলেদের জাহাজ মেরামতের বিশাল ইয়ার্ড আর অফিস আছে। পাঁচটার পরে অফিস বন্ধ হয়ে যাবে, গেটও বন্ধ। ওখানকার কেয়ারটেকার আমার পরিচিত। গেট খুলে অফিস কম্পাউন্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে নারকেল গাছের ফাঁকে সূর্যাস্ত দেখা জীবনের এক বিরল অভিজ্ঞতা।

এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারান যায় না। গাড়ী ছুটে চলল ঈপ্সিত সূর্যাস্তকে লক্ষ্য রেখে।

ডানদিকে বসেছে সুমিত, বাঁয়ে শীলা। সাইড গ্লাস নামিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে শীলা আধারকার। ভাবনার গভীরে ডুবে আছে সে। সুমিতও ভাবছে। আজ তাদের গোয়াবাসের শেষ রাত্রি। পরদিন শীলা কর্মস্থলে চলে যাবে প্লেনে। আর সে, দুদিনের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে করতে রাতের বাস ধরে চলে যাবে বম্বে। আনন্দের রোশনাই হৃদয়ের আকাশে কয়েক মুহূর্ত আলোর ফুল ছড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শীলা আধারকার পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল। সুদূর পশ্চিমে, আমেরিকা নামে একটি মহাদেশ। তারই এক অতি ক্ষুদ্র কোণে ডক্টর আধারকার নামে এক বিজ্ঞানীর কোয়ার্টার। তিনি দুরারোগ্য একটি ব্যাধি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী শীলা সামনে এসে দাঁড়াল।

এ উইক এন্ডে আমাদের বেড়াতে যাবার প্ল্যান তো এখনও করলে না?

ডক্টর আধারকার হাতের বইখানা টেবিলে রেখে বললেন, এ শনিবার আমাকে রিসার্চের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হবে শীলা। তুমি বরং মিঃ আর মিসেস লরেন্সের সঙ্গে ওদের খামারবাড়িতে কাটিয়ে এস। তোমাকে পেলে ঐ প্রবীণ দম্পতি খুবই খুশি হবেন।

লরেন্সরা দীর্ঘকাল ডক্টর আধারকারের প্রতিবেশী। তাঁরা সজ্জনও। তবু ডক্টর আধারকারের প্রস্তাবে এই প্রথম আহত হল শীলা। একটা সপ্তাহে কোথাও যেতে না পারার জন্য ক্ষোভ নয়। ডক্টর আধারকারের মত মানুষের রিসার্চের কাজে আটকে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনাও নয়। কিন্তু প্রবীণ এক দম্পতির সঙ্গে উইক এন্ড কাটাবার প্রস্তাবেই যত আপত্তি শীলার। একটি বয়স্ক মানুষকে শ্রদ্ধা জানান এক কথা আর তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা ভিন্ন কথা। এই বোধটুকু ডক্টর আধারকারের নেই, এটাতেই দুঃখ পেল শীলা। এই প্রথম ডক্টর আধারকারের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করল সে।

উইক এন্ডে কোথাও না যেতে পেলে আমি খুব মুষড়ে পড়ব, এমন একটা ধারণা তোমার না থাকাই ভাল।

ডক্টর আধারকার বুঝলেন, সরল বুদ্ধিতে তিনি সমাধানের যে সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তা ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর অসহায়ভাবে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মানুষটির এই অসহায়ত্ব শীলার সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনে আঘাত হানল। সে জানে, ঘোরতর সংসারী মানুষ অন্যভাবে ঘুরিয়ে কথাটা বলত। কিন্তু এ মানুষের কাছ থেকে সে কৌশল আশা করা যায় না। শীলা জানে এই সরলতাটুকুই ডক্টর আধারকারের সম্পদ।

শীলা এবার গলার স্বর কোমল করে বলল, তুমি একা থাকবে কাজ নিয়ে আর আমি ওঁদের খামারবাড়িতে গিয়ে আনন্দ করব, এ আমি পারব না। বরং তোমার কাছে থাকতে আমার ভালই লাগবে।

শনিবার রাতে ল্যাবরেটারি থেকে ফিরলেন ডক্টর আধারকার। ঘরে ঢুকলেন ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে। শীলা ঘরে ছিল না। তিনি বাথরুমে ঢুকে দেখলেন শীলা সব কিছুই গুছিয়ে রেখে গেছে। স্নান সেরে বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন কিচেনে রাতের খাবার রেডি। ডক্টর আধারকার ড্রইং রুমে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলেন অলসভাবে। হয়ত বাইরে কোথাও গেছে, এখুনি এসে পড়বে শীলা।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে শীলা ঘরে ঢুকল। ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে এক পাঁজা রেকর্ড।

ও, তুমি এসে গেছ। কতক্ষণ? কিছু খাওয়া হয়নি তো?

ডক্টর আধারকার বললেন, স্নান সেরে দেখলাম, কিচেনে ডিনার রেডি। ম্যাগাজিন ওল্টাতে ওল্টাতে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

আমি এখুনি টেবিলে ডিনার সার্ভ করে দেব, তুমি ডাইনিং রুমে চলে এসো।

দুজনে খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। ডক্টর আধারকার বললেন, কি সব বাজার করে আনলে?

ও কয়েকখানা রেকর্ড।

কাদের রেকর্ড?

বিতোভেনের প্যাথেটিক সোনাটা, প্যাস্টোরাল। মোজার্টের একটা পিয়ানো বাদন। ইহুদী মেনুহীন আর রবিশঙ্করের ডুয়েট।

দারুণ দারুণ সব ব্যাপার বল।

তোমার তো শোনার সময়ই হয় না।

আমার দুর্ভাগ্য শীলা। একদিন একটি নিগ্রো ছেলে এসে বলেছিল, আমি গান গাইতাম, এখন আমার গলা থেকে গান হারিয়ে গেছে। তোমরা এত রিসার্চ করছ, পার না আমার গলার সুরটাকে ফিরিয়ে দিতে?

কি প্রাণবন্ত তরুণ, নামী একটা হোটেলে সংগীত পরিবেশন করত। বেচারার চাকরিটা গেছে। প্রাণটুকু ঝুলছে একটা ক্ষীণ সুতোর বাঁধনে। সেই থেকে সঙ্গীত কানে এলেই আমি কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ি।

শীলা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, আমার মন্তব্যের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

না না, আমি কিছুই মনে করিনি। ক্যানসারে ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হল বলে কি পৃথিবী থেকে গান হারিয়ে যাবে।

শীলা ছেলেটির প্রসঙ্গে মনে মনে খুবই ব্যথিত হয়েছিল, সে কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, তোমার কথা মত আমি এখন আন্তর্জাতিক হবার চেষ্টা করছি।

কি রকম?

দেশী বিদেশী সবরকম সুরস্রষ্টা ও সংগীতবিদের সম্বন্ধে পড়াশোনা করছি।

খুব ভাল। মিউজিক লাইব্রেরী মেম্বার হয়ে যাও।

অনেক আগেই হয়ে গেছি। এখন আমি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সংগীতের দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ভেতর অন্তর্নিহিত মিলটুকু খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি।

তুমি নিশ্চিত সফল হবে শীলা।

কি করে বুঝলে?

কাজের ভেতর তোমার নিষ্ঠা দেখে।

তুমিও তো গভীর নিষ্ঠায় তোমার কাজ করে চলেছ, নিশ্চয়ই একদিন সফল হবে। আর সেদিন সারা দুনিয়া তোমার জয়ধ্বনি দেবে।

আমি প্রশংসা চাইনা শীলা। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের মুখে প্রাণের হাসি ফোটাতে পারলেই সার্থক হবে আমার সাধনা।

এবার গুরু কথাগুলোকে লঘু করে দিয়ে ডক্টর আধারকার বললেন, তুমি আর একটি বিষয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছ শীলা।

যেমন?

রান্নার ব্যাপারে। এমন চাইনিজ, মোগলাই, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ ডিসের সমন্বয় আমি বড় একটা দেখিনি।

শীলা হেসে বলল, ডক্টর আধারকারের স্ত্রী ওটাতেই আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে বসে আছেন।

কিছুদিন ধরে আধারকারের পরিবারে জীবনযাত্রার ব্যাপারে ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি চলছিল।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল ডক্টর আধারকারের। যখন আধারকার একক জীবন যাপন করতেন তখন বালাই ছিল না ওসব অনুষ্ঠানের। বিয়ের পর শিলা এ অনুষ্ঠান চালু করল। সে ডাকতে চেয়েছিল আধারকারের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে। বাধা দিলেন ডক্টর আধারকার। বললেন, ছোটদের আর জগতবিখ্যাতদের জন্মদিন পালন করা যেতে পারে, আমি ওদের কারু দলেই পড়ি না।

শীলা বলল, তুমি আমার চোখে অনেক বড়, বিখ্যাতদের একজন।

বেশ, তাহলে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তুমি থাকবে আর আমি থাকব। আর তৃতীয় কেউ থাকবে না।

শীলা শেষে তাই মেনে নিয়েছিল। সে ঘর সাজিয়েছিল নিজের হাতে। একটি নতুন পোশাক তৈরি করিয়ে রেখেছিল। উইক এন্ডে বেড়াতে গিয়ে ডক্টর আধারকারের একটি সুন্দর ছবি তুলেছিল সে। সেটিকে এনলার্জ করিয়ে চমৎকার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিল সারপ্রাইজ দেবে বলে। রান্নার পদগুলোও করেছিল ডক্টর আধারকারের রুচি মাফিক। চারখানা সিলেক্টেড রেকর্ডের ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন খাঁ, মেনুহীন, বড়ে গুলাম আলী খাঁ, শুভলক্ষ্মী।

ডক্টর আধারকার রাত নটাতে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, আমাকে জরুরী কনফারেন্সে শিকাগো যেতে হবে আজ রাতের ফ্লাইটে। ডক্টর বার্নার্ড আসছেন। তিনি পেপার পড়বেন। যদিও আমার রিসার্চের সঙ্গে তাঁর পেপারের যোগ নেই তবু আমার কিছু প্রশ্ন আছে। সেগুলোর সঠিক উত্তর আমার রিসার্চের কাজে সহায়ক হবে বলে মনে করি। ওঁর আসার খবরটা বড় দেরীতে পেলাম, তাই।

শীলা একটিও কথা বলল না। নীরবে সব কিছু গোছগাছ করে দিয়ে শুধু বলল, খাবার সময় হবে?

ডক্টর আধারকার বললেন, প্লেনেই খেয়ে নেব।

আর একবার এমনি এক ঘটনা ঘটল। ইউরোপ ট্যুরের সব ব্যবস্থা পাকা। কদিন শীলা দর্শনীয় স্থানগুলোর ভূগোল, ইতিহাস নিয়ে বেশ উত্তেজনার ভেতর সময় কাটাচ্ছিল, এমন সময় একটা ট্রাঙ্ককলে সব তছনছ হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়া থেকে জুলজির এক অধ্যাপক বন্ধু আসছেন, তিনি আধারকারের সঙ্গে রিসার্চের বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে চান। ঐ বন্ধুটিও ক্যানসার রিসার্চের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়েছেন।

মুহূর্তে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ডক্টর আধারকার শীলাকে একান্তে টেনে নিয়ে বললেন, যদি আমার

বন্ধু এখানে একটা ফর্টনাইট কাটান তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে শীলা? বিয়ের আগেও আমার এখানে এসেই উঠত।

শীলা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, তার কোন অসুবিধে হবে না।

মহাখুশিতে শীলাকে জড়িয়ে ধরে সেদিন ডক্টর আধারকার বলেছিলেন, আমি জানতাম,তুমি আমার কথা রাখবে।

শীলা সেদিন ডক্টর আধারকারের সামনে মৃদু হেসেছিল কিন্তু একান্তে গিয়ে ভেসেছিল চোখের জলে। না, ইউরোপ ভ্রমণে যেতে পারেনি বলে নয়, না যেতে পারার জন্য স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য সান্ত্বনাটুকু পেল না বলে।

মাঝে মাঝে ডক্টর আধারকারকে তার বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হত। নিজের মন ছাড়া শীলা আধারকারেরও যে মন বলে একটা কিছু থাকতে পারে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতনতার পরিচয় ছিল না ডক্টর আধারকারের আচরণে।

শীলা মনে মনে বড় অস্থির হয়ে উঠত। ডক্টর আধারকারকে সে যদি মুখোমুখি বিতর্কের মাঝখানে টেনে আনতে পারত তাহলে হয়তো মনের ভার কিছুটা লাঘব হত তার। কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষটি যে তার সব স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে বিশ্বজনের সেবায়। তাকে তুচ্ছ পারিবারিক বিতর্কে টেনে এনে লাভ কি। তাছাড়া মানুষটি সাংসারিক তর্কবিতর্কে একেবারেই অপটু। এ বিষয়ে যুদ্ধের আগেই বসে থাকেন পরাজয় বরণ করে।

এই পরিস্থিতিতে শীলা নিজেকে বেশি করে ঢেলে দিতে চাইল নিজের সাধনায়। সে পাগলের মত রাত্রিদিন রেয়াজ করে চলল। কিন্তু 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'। সেই দোসরটি কোথায়, যে তার গানের সঠিক জায়গায় বাহবা দিয়ে উঠবে।

ডক্টর আধারকারের কাছ থেকে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন আগে শীলাকে আর একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল। বলা যায়, এই সামান্য ঘটনাই ত্বরান্বিত করল তার দেশে প্রত্যাবর্তন।

ইন্দো আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির উদ্যোগে রবিশঙ্কর ইহুদী মেনুহীনের সেতার ও বেহালার যুগল-বন্দীর ব্যবস্থা হয়েছিল। মোটা অঙ্কের দুখানা টিকিট কেটেছিল শীলা। কদিন ধরে ঐ আলোচনাই হচ্ছিল। উত্তেজনায় তির তির করে কাঁপছিল শীলার মন।

ঠিক যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন ডক্টর আধারকারের ল্যাবরেটারি থেকে ফোন এল—তুমি অনুষ্ঠানে চলে যাও শীলা, আমার আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কারণটা পরে জানবে।

শীলা একাই যেতে পারত কিন্তু ইচ্ছে করেই যায়নি। অনেক রাতে সেদিন ফিরেছিলেন ডক্টর আধারকার। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলেন তবু অপরাধীর একটুকরো হাসি লেগেছিল মুখে।

খাওয়া দাওয়া চুকলে প্রতিদিনের অভ্যেস মত দুজনে কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে বসল ড্রইং রুমে। শীলা নিজের মনের ক্ষোভকে চেপে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

ডক্টর আধারকার পকেট থেকে ছোট্ট একটি চিঠি বের করে শীলার দিকে এগিয়ে দিলেন।

শীলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল।

প্রিয় ডক্টর আধারকার,

হাসপাতালে সকলের মুখে শুনেছি তোমার নাম। তুমি নাকি ক্যানসার বিজয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছ। আমি আঠারো বছর বয়সেই এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েছি। আমি ডেভিডকে ভালবাসি। সে প্রতিদিন বহুদূর থেকে আমাকে দেখতে আসে। হাতে হাত রেখে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। চলে যাবার সময় বলে, আবার আসবো। আমি জানি, এমন আসা যাওয়া করতে করতে একদিন এসে দেখবে, বিছানা শূন্য, রোগী নেই। ও সেদিন বড় আঘাত পাবে ডক্টর আধারকার।

আচ্ছা তুমি কি পার না তোমার রিসার্চের কাজকে একটু ত্বরান্বিত করতে? আমার যে ডেভিডের জন্য বেঁচে থাকার বড় দরকার।

মৃত্যুপথযাত্রিণী
'সারা'

শীলা চিঠিখানা পড়ে দুঃখ পেল। কিন্তু এর প্রতিকারে কিই বা সে করতে পারে। তাই চুপচাপ বসে রইল।

ডক্টর আধারকার এবার অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

আজ তুমি অনুষ্ঠানে কেন যাওনি শীলা?

কি করে জানলে তুমি?

আমি অনুষ্ঠান শেষ হবার সময় হলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাকে দেখতে পাইনি।

একা যেতে আমার ভাল লাগেনি, তাই যাইনি।

এবার অত্যন্ত কোমল গলায় ডক্টর আধারকার বললেন, শীলা, আমি জানি কত বড় অবিচার আমি তোমার উপর করে যাচ্ছি। স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদা তুমি আমার কাছ থেকে পাওনি। তোমার দিনরাত্রির নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে দেব, এমন ক্ষমতা আমার নেই। মনে হয় তোমাকে আমার ঘরে এনে আমি একটি প্রাণসম্পদে ভরপুর নারীর প্রতি অবহেলা করেছি।

একটু থামলেন ডক্টর আধারকার। শীলা কোন মন্তব্য করল না, মেঝের লতাপাতা আঁকা কার্পেটের দিকে চেয়ে বসে রইল।

এবার আধারকার আরও গাঢ়স্বরে বললেন, শীলা মানুষই ভুল করে আবার সে ভুল সংশোধনের ভার সেই তুলে নেয়। আমি তোমাকে বিবাহিত জীবনে অনেক ছোট বড় সুখ থেকে বঞ্চিত করেছি, এ সত্য আমি নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারব না। তাই আজ তোমার কাছেই একটা সমাধানের প্রস্তাব রাখছি। এই মুহূর্তে আমার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। তুমি দুদিন এ নিয়ে তোমার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া কর, তারপর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে আমাকে তোমার মতামত জানিও।

শীলা এবার মেঝের কার্পেটের থেকে মুখ তুলে ডক্টর আধারকারের দিকে তাকাল। কি প্রস্তাব ডক্টর আধাবকার তার কাছে রাখতে চায়।

প্রস্তাব রাখলেন আধারকার। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে যোগ দাও তোমার কলেজের কাজে। আবার শুরু কর গুরু খোদাবক্সের কাছে তোমার সংগীত সাধনা। যখন প্রথম তোমার মুখোমুখি হই তখন আমি আমার স্বার্থের দিকটাই দেখেছিলাম। আমার ছন্নছাড়া সংসারটাকে তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে তুলবে এই ছিল আমার গোপন মনের ইচ্ছে। সেদিন জানতাম না কত বড় সম্পদ তোমার ভেতর লুকোনো আছে। দিনের পর দিন সেগুলো পরিচর্যার অভাবে শুকিযে যাচ্ছে। এখানে তোমার চারিদিকে একটুখানি অনুকূল হাওয়া কোথাও নেই। তাই ভাবলাম আর নয়, তোমার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে আমি আর দাঁড়াব না।

আমার দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাব আছে। যদি কোন সহৃদয় যুবক তোমাকে নিয়ে নতুন করে সংসার রচনা করতে চায় তাহলে তোমাদের মিলিত জীবনের প্রতি থাকবে আমার পূর্ণ সমর্থন। সেক্ষেত্রে আইনসংগত স্বীকৃতি পেতে কোন অসুবিধেই হবে না তোমার।

এরপর আমার শেষ প্রস্তাব হল, তুমি আমার মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছ শীলা। যে রকম জীবনই তুমি দেশে যাপন কর না কেন, যেদিন তোমার মনে হবে এ মানুষটার কথা, অথবা তোমার সাজান এই ঘরের কথা, সেদিন মনে কোন দ্বিধা না রেখে চলে এসো এ সংসারে। অগোছাল সংসারটাকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তোলার কোন বাধা থাকবে না তোমার।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বাক্যহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে রইলেন ডক্টর আধারকার। হাতের

পাতায় মুখ ঢেকে পাথরের প্রতিমার মত স্থির হয়ে রইল শীলা।

গাড়ি মার্মাগোয়ায় চৌগুলেদের অফিস কম্পাউন্ডে এসে ব্রেক কষল। ড্রাইভার ছুটে গিয়ে লোহার গেট খোলার ব্যবস্থা করে দিলে। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে শীলার ভাবনায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। সুমিত বলল, তাড়াতাড়ি চলুন প্রফেসার আধারকার, সূর্য সমুদ্রের বুকে বড় দ্রুত নেমে আসছে।

ওরা দৌড়ে অফিসের পেছনে একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড়াল। ওপরে টিলার গায়ে হেলান দিয়ে অফিস। নীচে খাড়াই খাদ সমুদ্রের জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ান। তাদেরই ভেতর থেকে বাঁকা কটি নারকেল গাছ সমুদ্রের দিকে দেহ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম সাগরের হাওয়া মাথার জটিল জটায় লেগে সারা শরীর দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য এখন রক্তবর্ণ। নারকেল গাছের ফাঁকে সে প্রস্তুত হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার জন্যে।

কি উত্তাল, কি নীলাভ অশান্ত সমুদ্র। নীচের বোল্ডারগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে আহত দানবের মত আর্তনাদ করছে।

আকাশে লালের বর্ণচ্ছটা। সমুদ্রের নীল শিরা ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত। বহু দূরে উত্তাল ঢেউ-এর চূড়াগুলো লোহিত নাগের মত এগিয়ে আসছে ফণা তুলে।

সুমিত আকাশ আর সমুদ্রের সেই অশান্ত মিলন-লীলাকে কয়েকটি সটে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। শীলা কিন্তু অচঞ্চল। অপলকে সে চেয়ে রইল সীমারেখাহীন আরব সাগরের দিকে।

সূর্য ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই মারণযজ্ঞে। দুটো চোখ কেন জানি না হাতের পাতায় বন্ধ করে ফেলল শীলা আধারকার। হঠাৎ তার হাতখানা ধরে সুমিত বলল, কি হল শীলা?

শীলা চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, এত বড় সূর্যের এই আত্মনাশ আমি সইতে পারছিলাম না সুমিত।

এই মুহূর্তে অনির্বায এক একাত্মতায় দুজনে দুজনকার নাম ধরে ডাকছিল।

সুমিত বলল, পেছনে, চেয়ে দেখ শীলা, কি আশ্চর্য চন্দ্রোদয়।

পূর্ণিমার চাঁদ একটি গাছের ডাল আর ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে অপরূপ মহিমায় আটকে ছিল।

শীলা বলল, কোন কিছু হারায় না, তাই না সুমিত? এ চাঁদের ভেতর দিয়েই তো বিলীন হয়ে যাওয়া সূর্য বলছে, আমি হারাইনি, কখনও হারাই না।

ঐ গাছটার দিকে শীলার হাত ধরে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে যেতে সুমিত বলল, শীলা এই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত জীবনে বার বার ফিরে ফিরে আসে না। আজ এই দুর্লভ ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে, মাত্র কয়েকটা বছর আগে এমনি চন্দ্রোদয় লগ্নে কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল না।

চাপা একটা উত্তেজনায় সুমিতের গলা কাঁপছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইছিল আর একটা গলার প্রতিধ্বনি।

এখন শীলা শান্ত, নিস্তরঙ্গ। সে সুমিতের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করে বলল, এসো সুমিত আমরা ঐ মসৃণ পাথরটার ওপর বসি।

দুজনে গাছের তলায় চাঁদের স্ফটিক জলে ধোয়া পাথরখানার ওপর বসল।

কয়েক মুহূর্ত কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে। এবারও শীলাই কথা বলল প্রথমে, আমরা এখন পরস্পরের সব চেয়ে বড় বন্ধু সুমিত।

সুমিত হাত বাড়িয়ে শীলার হাতখানা ধরে তার কথার সমর্থন জানাল।

আমার একটা অতীত আছে সুমিত, সেই অতীতটা তোমার সামনে মেলে ধরতে চাই।

সুমিত বলল, আমাদের অতীত এই মুহূর্তে জীবনের পাতা থেকে ধুয়ে মুছে যাক্ শীলা।

না সুমিত, আমার অতীত মুছে যাবার নয়। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে শোন আমার অতীতের কথা।

সুমিত চেয়ে রইল শীলার মুখের দিকে। শীলা একে একে বলে চলল তার বিবাহিত জীবনের

কাহিনী।

আমাকে ডক্টর আধারকার তার প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য দুটো দিন সময় দিয়েছিল। আমি কিন্তু সেই দুদিন কিছুই ভাবতে পারিনি।

এক সময় ডক্টর আধারকার আমাকে ডেকে বলল, কিছু স্থির করলে শীলা।

আমি প্রথমে কিছু না বলে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপর ওর দিকে চেয়ে বললাম, আমি কিছু ভাবতে পারছি না, তুমি বলে দাও আমি কি করব?

ডক্টর আধারকার আমাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, সমস্যাকে খুব সহজভাবে নিতে হয় শীলা। আমার অভিমত যদি জানতে চাও তাহলে বলি, কিছুকাল দেশে চলে যাও তুমি। সেখানে থাকতে থাকতে তোমার মনের কাছ থেকেই সত্য উত্তরটি পেয়ে যাবে।

সুমিত কি ভেবে বলে উঠল, ঠিকই বলেছেন ডক্টর আধারকার।

শীলা বলল, আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি সুমিত। আজই এই চন্দ্রস্নাত আরব সাগরের তীরে।

সুমিতের সমস্ত সত্তা এখন উন্মুখ উত্তরটি শোনার জন্য। সে নিষ্পলক চেয়ে রইল শীলার মুখের দিকে।

শীলা শান্ত আর গভীর গলায় বলল, আমাকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে সুমিত। যে মানুষ সবার মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে, নিজের সুখের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি, তাকে আমি না দেখলে আর কে দেখবে। আমার আনন্দ, আমার সুখ আমি তারই সেবায় উৎসর্গ করে দিতে চাই।

এক বিচিত্র অনুভূতি সুমিতের কণ্ঠকে সেই মুহূর্তে রুদ্ধ করে দিল। একসময় নিজেকে সংযত করে নিয়ে সুমিত বলল, শীলা, বন্ধু হিসেবে তোমার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত না জানিয়ে পারছি না। কোহিনূর সম্রাজ্ঞীর মুকুটেই মানায়।

বন্ধুর দিকে পরম বিশ্বাসে হাতখানা প্রসারিত করে দিল শীলা। সে হাত গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগে স্পর্শ করল সুমিত।